"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

ঝড়ের আলো।

Allahabad. —শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত।

৪৪শ বর্ষ]　　বৈশাখ, ১৩২৭　　[১ম সংখ্যা

সাল্‌-পহেলী

শূন্যে ঘোরে সূর্য্য শত সোনার চাঁপা ছড়িয়ে রে!
অগাধ আকাশ—নাগর-দোলার দেশ!
চক্রে চলে চন্দ্র-তারা জ্যোতির পরাগ উড়িয়ে রে!
নাইক সুরু, নাই সে গতির শেষ।
সেই অশেষের অনির্দ্দেশে অলখ্‌-লেখার দাগ দিয়ে,
নূতন হ'য়ে নিচ্ছে চিরন্তন;—
ডালিম্‌-ফুলে উথ্‌লে পুলক,—কুসুম-ফুলে ফাগ দিয়ে,—
চন্নাদের গায় দিয়ে চন্দন;—
স্বপন-পুরে চল্‌ছে উড়ে দেখিয়ে আঙুল কোন্‌ দূরে,
না পাই এঁচে কয় কি ইশারায়,
আশার আলোয় গলিয়ে আঁধার জ্বালিয়ে বাতি কর্পূরে,
চাঁদের চোখে চমক দিয়ে চায়!
উড়িয়ে ফুঁয়ে তুলোট-পুঁথি ধূলোট খ্যালে চুলবুলে—
ফুল-বিলাসী দখিন হাওয়া, তাই,
সুর হেনে তিন পিচ্‌কিরি পিক জাগায় জাগিয়ে বুলবুলে,
পাপিয়া-শামার কণ্ঠে বিরাম নাই!

সিঁদুর-মাখা সোনার মোহর কৃষ্ণচূড়া তাই ঢালে
সদর-পথে দরাজ ক'রে মন,
আনন্দেরি মুদ্রা ঝরে বকুল-ফুলের টাঁকশালে,
আলোয় আলো গন্ধরাজের বন!

*   *   *   *

পাওনা-দেনার গদিতে আজ গাওনা চলে দিল্-খোলা,
দমকা খরচ করছে বেনের দল,
কেবল-ধূনো-গঙ্গাজলে আজ খুসী নয় হাটখোলা,
আজকে সেথায় চল্‌ছে গোলাপ-জল!
চল্‌ছে খুসীর সওদা শুধু চল্‌ছে নিছক শিষ্টতা
প্রসন্নতার সদাব্রত আজ,
আনন্দ আজ মূর্ত্তিমন্ত, কুটিল ভুরুর ক্লিষ্টতা
তলিয়ে গেছে কোন্ অতলের মাঝ!
পান্না-পাঁতির ছিল্‌কে দিয়ে সাজিয়ে অশথ দেবদারু
তরুণ হ'তে ডাকছে তরুর দল.
নূতন পাতার নূতন খাতা!…আজ বাকী না রয় কারু
খুল্‌তে হৃদয় ভুল্‌তে অকৌশল।
বাতিল হ'ল বকেয়া কেতাব, আর যেন না যায় দেখা
অসংখ্য ভেল অসংখ্য ভুল তার,
নিরঙ্ক এই নূতন খাতায় নিষ্কলঙ্ক লেখ্ লেখা,
পঙ্কে ফুটুক পদ্ম চমৎকার!
জানিয়ে দে রে এই প্রভাতের নবীন প্রভার দেব্‌তাকে
নূতন হবার শক্তি চিরন্তন,
ডুবিয়ে দে রে অনুশোচন, যা কিছু আক্ষেপ থাকে
আজকে ক্ষ্যাপা! সব দে বিসর্জ্জন।

তাজা হবার তাগিদ্ এল সৃজন ক'রে নওরোজে,
জঞ্জালে আজ আগুন জ্বালার দিন,
চাকার ভিতর চল্‌ছে চাকা,.. বুঝ্ আছে যার সেই বোঝে,
জমায় পাড়ি অগাধ জলের মীন।

* * * *

দিন কিনে নে প্রাণের হাটে ঘুর্ণি-ঘোরার মাঝখানে
বৃহৎ প্রাণের চাই রে রসদ চাই,
নূতন তারে সাজিয়ে সেতার চল্ সে গুণীর সন্ধানে,—
নবীন প্রাণের গান আছে যার ঠাঁই।
প্রাচীন শাখী তরুণ হ'ল কিশলয়ের হাস্যে রে,
বিশ্বে চলে রসের রসায়ণ,
নূতন তালে রক্ত চলে হিয়ায়, হাওয়ার লাস্যে রে,
নবীন আলোয় বিভোল্ দু'নয়ন!
চিরদিনের ঘুরন্-পাকে এই যে নূতন মন-গড়া
এর সাথে আজ মিলিয়ে নে রে হাত,
অশোক-ফুলের স্তবকে, ছাখ্, রাঙা-চেলীর গাঁট্‌ছড়া
জর্দ্দা-চেলীর উত্তরীয়ের সাথ!
বাঘছালে যার নাগের বাঁধন তার দু'নয়ন ঢুল্‌ছে রে
ভুল্‌ছে সে আজ বিষাণ-বাদন তার,
আরম্ভেরি বোল্ কেবলি ডম্বরু তার তুল্‌ছে রে,
অম্বরে ভায় স্বয়ম্ভু-ওঙ্কার!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কথিকা

এবার মনে হল মানুষ অন্যায়ের আগুনে আপনার সমস্ত ভাবী কালটাকে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েচে, সেখানে বসন্ত কোনোদিন এসে আর নতুন পাতা ধরাতে পারবে না।

মানুষ অনেকদিন থেকে একখানি আসন তৈরি করচে। সেই আসনই তাকে খবর দেয় যে তার দেবতা আস্‌বেন, তিনি পথে বেরিয়েচেন।

যেদিন উন্মত্ত হয়ে সেই তার অনেকদিনের আসন সে ছিঁড়ে ফেলে সেদিন তার যজ্ঞস্থলীর ভগ্নবেদী বলে, "কিছুই আশা করবার নেই, কেউ আস্‌বে না।"

তখন এতদিনের আয়োজন আবর্জ্জনা হয়ে ওঠে। তখন চারিদিক থেকে শুন্‌তে পাই, "জয়, পশুর জয়।" তখন শুনি, "আজও যেমন, কালও তেম্‌নি। সময় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বলদের মত, চিরদিন একই ঘানিতে একই আর্ত্তস্বর তুল্‌চে। তাকেই বলে সৃষ্টি। সৃষ্টি হচ্চে অন্ধের কান্না।"

মন বল্‌লে, "তবে আর কেন? এবার গান বন্ধ করা যাক্! যা-আছে কেবল-মাত্র তারই বোঝা নিয়ে ঝগড়া চলে, যা নেই তারি আশা নিয়েই গান।"

শিশুকাল থেকে যে-পথের পানে চেয়ে বারে-বারে মনে আগমনীর হাওয়া লেগেচে, যে-পথ দিগন্তের দিকে কান পেতেছে দেখে' বুঝেছিলুম ওপার থেকে রথ বেরল, সেই পথের দিকে আজ তাকালেম, মনে হল সেখানে না আছে আগন্তুকের সাড়া, না আছে কোনো ঘরের।

বীণা বল্‌লে, "দীর্ঘপথে আমার সুরের সাথী যদি কেউ না থাকে তবে আমাকে পথের ধারে ফেলে দাও।"

তখন পথের ধারের দিকে চাইলুম। চম্‌কে উঠে দেখি, ধুলোর মধ্যে একটি কাঁটাগাছ; তাতে একটিমাত্র ফুল ফুটেচে।

আমি বলে উঠ্‌লুম, "হায়রে হায়, ঐ ত পায়ের চিহ্ন!"

তখন দেখি দিগন্ত পৃথিবীর কানে-কানে কথা কইচে, তখন দেখি, আকাশে আকাশে প্রতীক্ষা। তখন দেখি চাঁদের আলোয় তালগাছের পাতায়-পাতা কাঁপন ধরেচে, বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দিঘির জলের সঙ্গে চাঁদের চোখে-চোখে ইসারা।

পথ বল্‌লে, "ভয় নেই।" আমার বীণা বল্‌লে, "সুর লাগাও।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রং-বেরং

(নাটিকা)

প্রথম দৃশ্য

[বুড়োশিবতলায় 'জটে'-বাবার আশ্রম। একদিকে একটা বটতলায় ভাঙা শিবমন্দিরের ঘাট। একহাতে আঁকশী, একহাতে সাজি নিয়ে পার্ব্বতী-বুড়ির প্রবেশ।]

পার্ব্বতী। ফুল তুল্লেম, ফল পাড়লেম, ঠাকুর তো এখনো ভিক্ষে করে ফিরে এলেন না;—সন্ধ্যে উৎরে যায়; যাই বাটটা গঙ্গাজলে ধুয়ে রাখি।

(নেপথ্যে ঘুঘু ডাকলো।)

আ মর্! ঘুঘুটা আবার মন্দিরের উপরে বাসা বাঁধতে লেগেছে!

ঘুঘু। বৌ—বৌ—

পার্ব্বতী। দূর হ! দূর হ! বাসা বাঁধবার আর জায়গা পাওনি বৌকে নিয়ে! ঠাকুরের ঘরে ঘুঘু-চরাতে চাও!

ঘুঘু। বৌ, ওগো বৌ!

পার্ব্বতী। রোস্ তো, এই আঁকশী দিয়ে তোর ঘুঘুর বাসা চুর করি! বৌ নিয়ে ঘর করাচ্ছি ঠাকুরের আশ্রমে! (আঁকশী নিয়ে তাড়া) যাঃ—যাঃ, দূর হ!

(জটে-বাবার প্রবেশ।)

জটে। ও পার্ব্বতী, বলি হচ্ছে কি ও?

পার্ব্বতী। রোজ তাড়াব, আর রোজই এসে ওই ঘুঘুটা বাসা বেঁধে এখানে ঘরকন্না বসাবার চেষ্টা করবে। এটা আশ্রম—তা বোঝে না!

জটে। তা ওর যদি ইচ্ছে হয় বাঁধুক না বাসা। এখানে তো অনেক জীব-জন্তু বাসা বেঁধেছে—না হয় ওরা দুটিতে থাকলো; এতে তোমার এত আপত্তি কেন?

পার্ব্বতী। দুটি যদি হতো আপত্তি ছিল না। দুটি, তারপর দশটি, এমনি করে শেষে এখানে পালে-পালে ঘুঘু চরলেই মুস্কিল!

(ঘুঘু ডাকলো।)

জটে। ঘুঘুর ডাক আমায় বড় মিষ্টি লাগে, ওদের তাড়িও না;—তুমি এখন আপনার ঘরে যাও।

পার্ব্বতী। তা থাক ঘুঘু-জটো। (স্বগত) কাল সকালেই জুটোকে বিদায় করছি।

জটে। ভাবছ আমি কাল যখন ভিক্ষেয় বেরোবো আর তুমি ওদের আস্তে-আস্তে এখান থেকে বিদায় করবে,—কেমন বুড়ি?

পার্ব্বতী। ছিঃ, ছিঃ, ঠাকুর জানতে পেরেছেন!—ঠাকুর, অপরাধ নিওনা। একটা কথা বলবো-বলবো করছি কদিন—

জটে। তা বলেই ফেল না—

পার্ব্বতী। আমি কিছু টাকা জমিয়েছি।

জটে। সে তো ভালো কথা পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী। একলা আমি অনেক টাকা নিয়ে কি করবো—

জটে। ইহকালের কাজে লাগিয়ে দাও, নয় তো—

পার্ব্বতী। ইহকাল তো কেটে গেল

একরকমে, এখন পরকালের জন্যে আমি ওই টাকাটা—

জটে। সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও? তা তো হবার জো নেই পার্ব্বতী;—টাকা তো সঙ্গে যাবে না!

পার্ব্বতী। টাকা যাবে না জানি, কিন্তু টাকা দিয়ে যা কিছু পুন্নি করবো, তার ফলটা তো সঙ্গে যাবে?

জটে। তা তো আমি ঠিক বলতে পারিনে পার্ব্বতী। পণ্ডিত-মশায়কে শুধিয়ো।

পার্ব্বতী। তাঁকে শুধিয়েছিলেম। তিনি বলেন এই বুড়ো শিবের মন্দির আর ঘাট টাকা খরচ করে বেশ করে পলস্তারা ছিমেণ্ট দিয়ে নতুন করে দিতে। আর এই বন-জঙ্গল কেটে সাফ করে এখানে একটা ধর্ম্মশালা বসিয়ে দিতে।

জটে। সর্ব্বনাশ! তাহলে আমি যাবো কোথা? এই যে নানা জীবজন্তু নিয়ে আমি এখানে—(নন্দীর প্রবেশ) ওহে নন্দী, পার্ব্বতীর কথা শোনো, উনি এখানে একটা ধর্ম্মশালা বসিয়ে পুন্নি করতে চাচ্চেন!

নন্দী। ভালোই তো! ধর্ম্মশালা হয় তো, ঠাকুর মোহন্ত হয়ে গদীতে বসে আরাম করবেন।

জটে। নন্দী, তুমি কালই পার্ব্বতীকে ওঁর বাপের বাড়ী পৌঁছে আসবে।

পার্ব্বতী। কেন ঠাকুর, আমি কি অপরাধ করলেম যে আমাকে চরণ-ছাড়া করবেন?—আমি কিছুতে যাবো না; এইখানে পড়ে থাকবো।

জটে। এ আশ্রমটা তোমার, না আমার —শুনি?

পার্ব্বতী। আমি তো বলিনি আশ্রমটা আমার!

জটে। তবে যে এটাকে ভেঙে-চুরে নতুন করতে চাচ্ছ?

পার্ব্বতী। নতুন করে দিতেম তো ভালোই হতো। তা ঠাকুর, তোমার যখন তা ইচ্ছে নয়, তখন এমনিই থাক্; আমি রোজ ঝাঁটিয়ে যাবো।

জটে। কিন্তু খবরদার! সাপ, ব্যাং, মশা, মাছি, বোল্‌তা, ঘুঘু, পায়রা, গরু, ছাগল কাউকে কিছু বলেছ কি তোমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়েছি!

(মন্দিরের মধ্যে প্রস্থান।)

নন্দী। ঠাকুর আজ হঠাৎ চট্‌লেন কেন?

পার্ব্বতী। কি জানি বাবা! দুটো ঘুঘু, ঠাকুর যেখানটিতে আসন কোরে বসেন, তারি উপরে বাসা বাঁধচে দেখে আমি তাড়াতে চাইলেম, দেখেই ঠাকুর রেগে গেলেন!

নন্দী। তাহলে তো ঠাকুরমা তোমার কাজ গেল! আঁক্‌শী দিয়ে কিছু পাড়তেও পারবে না, ঝাঁটা দিয়ে কিছু ঝাঁটাতেও পারবে না।

পার্ব্বতী। গজাক্ গে তোমার ঠাকুরের বাগানে চোর-কাঁটা আর মনসা! ভেঙে পড়ুক এই মন্দিরটা তোমার ঠাকুরের—

নন্দী। চুপ, চুপ, অমন কথা বলতে নেই!

পার্ব্বতী। তাতে আমার কি এল-গেল? মন্দির ভেঙে পড়লে ঠাকুরেরই লোকসান; ঝাঁটা আর আঁকশীর কাজ আমার তাতে করে তো বন্ধ হবে না একদিনও! চল্লুম, এখন শিবরাত্তিরের জোগাড় দেখি। (প্রস্থান।)

(একটা ভৃঙ্গার হাতে ভৃঙ্গীর প্রবেশ।)

ভৃঙ্গী। ছুটি চাইলে? ঠাকুর কি বল্লেন?

নন্দী। মেজাজ আজ বড় খারাপ। বুড়িটা চটিয়ে গেছে। ছুটি চাইতে সাহস হল না।

ভৃঙ্গী। তুই বড় বোকা, কোনো ছুতোয় অমনি ছুটিটা চেয়ে বসতে হয়!

নন্দী। সময় পেলুম কোথা যে চাইবো? —এসেই দেখি ধুন্ধুমার বেধেছে!

ভৃঙ্গী। তাহলে এখন উপায়?

নন্দী। এইখানেই দুজনে ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে গান করা যাক্।

ভৃঙ্গী। টিক্‌টিকিটি পর্য্যন্ত কেউ বাকি নেই, সবাই চলেছে—আর আমরা-দুটিতে থিয়েটার দেখবো না?

নন্দী। ঠাকুর এলেন জটে-বাবা সেজে, আমরা এলেম তাঁর চেলা সেজে বুড়ো শিবতলায়,—এই তো এক থিয়েটার! আজ এই দেখ! ঠাকুর যদি কৃপা করেন তো পৃথিবীতে যখন এসেছি, তখন থিয়েটার দেখে যাবোই-যাবো।

(জটে-বাবার প্রবেশ।)

জটে। দেখ-দেখি তিনখানা কি কাগজ আমার সিদ্ধির ঝুলিতে ছিল। কে দিয়ে গেল কিছুই মনে নেই।

নন্দী। এ যে দেখি থিয়েটারের টিকিট!

ভৃঙ্গী। কই দেখি?

জটে। কিছু পত্তর-টত্তর না তো? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এঁরা কিছু খবর পাঠাননি তো?

ভৃঙ্গী। আজ্ঞে না। আমাদের নামে দুটো পোষ্টকার্ড ভৈরবী দিদি পাঠিয়েছেন।

জটে। তোমার দিদি ভালো আছেন তো?

ভৃঙ্গী। আজ্ঞে না। তার ভারি অসুখ! স্বর্গ থেকে দেবতাদের তাড়িয়ে দৈত্যরা তাঁকে পিঞ্জরাপোলে বন্ধ করে বড় কষ্ট দিচ্ছে, তাই তিনি আমাদের একটিবার দেখতে চেয়েছেন।

জটে। তাইতো—নন্দনপুর তো কম রাস্তা নয়! তাহলে আজ রাতে আর তোমরা ফিরতে পারছ না বোধ হচ্ছে।

নন্দী। কাল ঠাকুরের ধ্যান ভাঙবার আগেই আমরা এসে হাজির হবো, কেবল রাতটুকু—

জটে। তবে যাও। আমার আসন, ভৃঙ্গার, ত্রিশূল—

ভৃঙ্গী। সব মন্দিরের মধ্যে গোছানো আছে।

(জটের প্রস্থান।)

ভৃঙ্গী। এই তো ছুটি হয়ে গেল, চল এখন সেজে-গুজে বার হওয়া যাক্।

নন্দী। ঠাকুরের সামনে মিছে কথাগুলো বল্‌লি কেমন করে?

ভৃঙ্গী। না হলে টিকিট ক'খানা মারা যায় যে!

নন্দী। আর যখন ঠাকুর শুনতে পাবেন মিছে কথা বলেছিস্?

ভৃঙ্গী। কি করে শুনবেন আমরা কোথায় গেছি?

নন্দী। ঠাকুরমা যদি বলে দেয়?

ভৃঙ্গী। আরে মুখ্যু, ঠাকুরমা জানবে কেমন করে আমরা কোথায় গেলুম, কোথা থেকেই বা এলুম?

নন্দী। ঠাকুরমা যে শুধিয়েছিল আমাকে—দিদি, কেমন আছে? আমি বলেছি আজ গৈরবীদির লেখা পেয়েছি, সে ভালো আছে।

ভৃঙ্গী। তবেই আমার মাথা খেয়েছ! আচ্ছা, কথা কইতে জানিস্‌নে তো কথা কোস্ কেন বল্‌তো? তোকে পৃথিবীতে এসে পর্য্যন্ত মানা করছি—ওরে কথা কস্‌নে! কইতে জানিসনে তো মৌনী-বোবা সেজে থাক্।

নন্দী। আমি তো মিছে বলিনি, সত্যিই যা তাই বলেছি।

ভৃঙ্গী। সত্যি বোলে কারো কিছু লাভ হল? লাভের মধ্যে আমাকেই বিপদে ফেল্লি, আর টিকিট ক'খানাও মারা গেল!

নন্দী। কিন্তু কাল যখন ঠাকুর সব কথা শুনবেন, তখন যে টিকিটের সঙ্গে আমরাও মারা যাবো, তার কি?

ভৃঙ্গী। তুই থাম তো! তোকে মুখ বুজে থাকতে বল্লুম না, আবার কথা কচ্ছিস! চুপ্, কে আসছে দেখ্!

(পার্ব্বতীর প্রবেশ।)

পার্ব্বতী। বাবা নন্দী, আমাকে বাপের বাড়ীতে রেখে এসো;—ঠাকুরের মুখের কথা আমি ঠেলবো না।

নন্দী। সে কি ঠাকুর-মা! আমরা যে এখন অন্য জায়গায় যাচ্ছি। কাল গেলে হবে না?

ভৃঙ্গী। চুপ্, ফের্ মুখ খুলেছিস্!

পার্ব্বতী। কোথায় যাচ্ছ বাবা তোমরা?

ভৃঙ্গী। ঠাকুরমা, আমরা তো তোমার বাপের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিনে, ঠিক তার উল্টো দিকে চলেছি যে!

পার্ব্বতী। কোথায় বাবা?

ভৃঙ্গী। তা তোমায় বল্‌তে পারবো না ঠাকুর-মা!

নন্দী। তুই কি যে বলিস তার ঠিক নেই! তুমি ওর কথা শুনোনা ঠাকুর মা! আমি কাল নিশ্চয়—

পার্ব্বতী। এই রাতের বেলায় দুজনে কোথায় যাচ্ছিস, শুনি?

ভৃঙ্গী। ঠাকুরকে যদি না বল তো বলি।

পার্ব্বতী। লুকিয়ে বুঝি শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হচ্ছে?

নন্দী। না ঠাকুর-মা, শ্বশুর-বাড়ী কেন?

ভৃঙ্গী। তুই থাম্ না। ঠাকুর-মা শুনবে কোথায় যাচ্ছি? কিন্তু ঠাকুরকে বোলো না, তাহলে আর সেখানে যাওয়া হবে না। আমরা থিয়াটার দেখতে যাচ্ছি।

পার্ব্বতী! সে আবার কি,—থেটার?

ভৃঙ্গী। সেখানে নাচ, গান, সং, কত কি দেখা যায়! তুমি যাবে ঠাকুর মা?

পার্ব্বতী। তা চলনা, দেখে আসি। কিন্তু মেয়েমানুষ আমাকে সেখানে যেতে দেবে তো?

ভৃঙ্গী। কেন দেবে না?—টিকিট থাক্‌লেই দেবে।

পার্ব্বতী। আমার ত টিকি নেই, খোঁপা!

ভৃঙ্গী। আমার তিনটে টিকিট আছে তাতেই হবে। কিন্তু যদি ঠাকুর জানতে পারেন তাহলে—

পার্ব্বতী। কেন জানবেন?—তাঁকে তো আর আমি বলতে যাচ্ছিনে! চল, চুপি-চুপি বেরিয়ে পড়ি।

(ভেঁপু দিয়া মটর-গাড়িতে সাহেবী-সাজে

ধর ; সঙ্গে বোম্বাই-সাজে শ্রী।)

পার্ব্বতী। একি, শ্রীধরের একি সাজ! ছোট-বৌ দেখছি! ওমা, লক্ষ্মীঠাকরুণের কি সাজ!

শ্রীধর। দাদা কোথায়?

ভৃঙ্গী। আজ্ঞে তিনি হাত-মুখ ধুয়ে এই ঘরে একটু আরাম করতে গেছেন।

শ্রীধর। খবর দাও, দাদাকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে এসেছি।

ভৃঙ্গী। আজ্ঞে তাঁর মেজাজটা আজ কাল থেকে—

(শ্রীধরের ভেঁপু বাদ্য। জটের প্রবেশ।)

জটে। কি একটা বিকট আওয়াজ হল? কে?

শ্রীধর। আমি শ্রীধর। চলুন দাদা, আজ আপনাকে থিয়েটার দেখিয়ে আনি। এখনো প্রস্তুত হননি? টিকিট তো আমি সকালেই কিনেছি।

জটে। সব ভুলে গেছি ভাই! আমার ও-সব মনে থাকে?

শ্রীধর। আর তো সময় নেই, চট্ করে চলে—

জটে। তা চলনা! আমার আবার সাজ কি!

শ্রীধর। এই বেশেই?

পার্ব্বতী। আমাদের আর বেশ কি বল!

জটে। তুমিও যাবে নাকি? সেখানে অনেক বাইরের লোক!

পার্ব্বতী। বৌ যাচ্ছে আর আমি যাব না?

নন্দী। ঠাকুরমা তো যাচ্ছিলেনই আপনাদের সঙ্গে।

ভৃঙ্গী। তোর কি মুখ কিছুতে বন্ধ হবে না! ঠাকুর, আমরা কোনোদিন মটোরে চড়িনি, থিয়েটারও দেখিনি।

জটে। মটোরে আবার চড়ে নাকি? সে তো খায়!

(মুখে রুমাল দিয়া শ্রীর হাস্য।)

শ্রীধর। একেই বলে মোটর-গাড়ি, আর যেখানে যাচ্ছি, সেটা থিয়েটার।

জটে। ওঃ, তাই বল! তা এতে এত লোক চাপালে ঘোড়া টানবে কেমন কোরে? তাহলে আমি বরং থাকি, ওরাই যাক্।

শ্রীধর। এর নাম হাওয়া-গাড়ী, মানুষের তৈরী। এতে ঘোড়া নেই, আপনি চলে। যত জন খুসি,যতদূর খুসি, চলে যান্।

জটে। তাই নাকি! তবে চল সবাই।

(শ্রী আর পার্ব্বতী ভিতরে উঠলেন, সামনে বসলেন শ্রীধর ও জটে, পিছনে নন্দী-ভৃঙ্গী।)

মটোর। র-র-র-র!

জটে। দেখো, দেখো! সামলে চল—একটু আস্তে ভাই!

শ্রীধর। কিছু ভয় নেই।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ইন্দ্রের স্মোকিংরুম। ফিট্-বাবু-বেশে ইন্দ্র। সাহেবী-বেশে, কেউ ড্রেসস্যুট, কেউ পাঞ্জাবী ইত্যাদি বিচিত্র বেশে দেবগণ। ঘরের দেয়ালে ইন্দ্রের রাজাবাহাদুর-বেশে মাথায় পালক বুকে তকমা ও চাপরাস দেওয়া অয়েল পেন্টিং।]

ইন্দ্র। চন্দর, কটা বাজালো হে?

চন্দ্র। (হাতঘড়ি দেখে) সাড়ে-আট দেবরাজ!

ইন্দ্র। তাহলে যাওয়া যাক চল থিয়েটারে। ওহে সূর্য্যি, একটু গরম হয়ে নাও।

সূর্য্যি। আমায় কাল সকালেই অফিস করতে হবে, আমি আর যাব না ভাবছি।

ইন্দ্র। তাহলে দনু বড় রাগ করবেন। চল দেখে আসা যাক্, কি নতুনতর কাণ্ড হবে শুনছি। তোমার তেষ্টা ভাঙল বরু?

নারদ। ভরত-মুনিকে বাদ দিয়ে নাটক যা হবে, তা বুঝতেই পারছি।

ভরত। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা কেউ নেই; নাটক যা হবে তা—

ইন্দ্র। নাটকখানা লিখলেই বা কে, বইটার নামই বা কি?

ভরত। তা জানিনে, শুনেছি মানুষের লেখা। পাত্র-পাত্রী সব দেবতার বাহন জন্তু-জানোয়ার।

(ব্রহ্মার কাঁচা-পাকা দাড়ি, চসমা-চোখে গরদের ধুতি-চাদর-পরা উপাচার্য্য-বেশে প্রবেশ।)

ইন্দ্র। (তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলিয়া) পিতামহ!

পিতামহ। ওহে ইন্দ্র, কি কার? মহা বিপদ উপস্থিত। দনুর ওখানে নিমন্ত্রণ অথচ আমার—

নারদ। সে ছেলে-ছোকরার দলে আপনি নাই গেলেন! তাছাড়া থিয়েটার হল একটু—

ব্রহ্মা। একটু কি, একেবারে অশ্লীল! কিন্তু তবু একবার যেতে হয়। দেব-দানবে হাঙ্গামা-ঝগড়ার পরে একটা সন্ধি হয়েছে; দনু ঝেঁটিয়ে চাকর-বাকর মায় সহিস-কোচমান পর্য্যন্ত টিকিট দিয়েছে, আমি না গেলে কি ভালো দেখায়! কিন্তু আমার গাড়ী নেই, তোমাদের সঙ্গেই—

ইন্দ্র। তাইতো, আমাদের একটু ঘুরে যেতে হবে—

ব্রহ্মা। তবেই তো মুস্কিল!

ইন্দ্র। আপনি নারদের সঙ্গে আসুন—আমরা এগোই। (প্রস্থান।)

নারদ। চলুন, তাহলে আমরাও এগোই।

(সকলের প্রস্থান।)

(ফ্যান্-হাতে বাতাস খেতে-খেতে শচীর প্রবেশ। সঙ্গে নন্দনী দাসী।)

শচী। গাড়িতে আমার পানের ডিবেটা তুলে দে নন্দনা! ইনি বুঝি বেরিয়েছেন?

নন্দনা। হাঁগো দেবরাণী, এ কি থ্যাটার দেখার ধুম গো! সারা রাতটা আজ ভোগাবে! আগে হতো কেষ্টো-যাত্রা কি রাম-লীলে তো দেখে পুণ্যি হতো। কি ধেই-ধেই, ভালো লাগে না বাপু! ওই যে কান্সার্ট না কিসের বাদ্যি, সেটা যে লাগে কানে, মাগো মা, যেন কর্ণ বধির করে দেয়! (পানের ডিবেটা গুছাইয়া নেওয়া।)

শচী। আয়না চট্ করে।

নন্দনী। এই যে যাই, চল দেবরাণী!

শচী। জয়ন্ত কোথায়?

নন্দনী। সে ওই যে লালটুপি পোরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

শচী। সে ছেলেমানুষ, সেখানে গিয়ে কি করবে?

নন্দনী। কাত্তিক গণেশ থেটারে যাবে শুনে, সেও নেচেছে—

শচী। আরে, সে সেখানে গিয়েই বাড়ি যাবার জন্যে কান্না ধরবে; বড় মুস্কিল হবে!

নন্দনী। ছেলেমানুষ দেখবে না?—সেখোরা সবাই যাবে! একটু বোতলে দুধ ভরে নিয়ে চল, খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব অখন।

শচী। তাই নে সব গুছিয়ে। ভালো জ্যোঠা! নিয়েই গেলেই পার্তেন তাঁর সঙ্গে। আমার স্কন্ধে ঝঞ্ঝাট চাপিয়ে গেলেন!—নে চট্ করে চল্।

(পাখা নাড়িতে-নাড়তে প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

[হুঁকো টানিতে-টানিতে একটা নামাবলী গায়ে সাজ-ঘরের কর্ত্তা গরুড় ও মুখে চুনকাম-করা সখীবেশে ষ্টার একট্রেস্ তারিণী।]

তারিণী। দেখুন না আমার মুখের রংটা কেমন হয়েচে! আর-একটু সাদা মাখি—(চুনের প্রলেপ।)

গরুড়। নাও, নাও, চট্‌পট্, আর দেরী নেই! একটু যেন বেশী সাদা হল বোধ হচ্ছে—

তারিণী। বেশী হয়েচে? (আয়নায় দেখে) কই না তো!—গালে একটু লাল দিলেই হবে। (লাল লেপিয়া) আমার চোখের কাজলটা আর একটু টেনে দিন্ না—

গরুড়। নাও, নাও, ডানা-দুখানা চট্ করে বেঁধে নাও, পালকের টুপিটা—

তারিণী। (টুপি পোরে) একি বিশ্রি দেখাচ্ছে! এই কাগজের ফুলগুলো—

গরুড়। আবার ওগুলো নিয়ে টানা-টানি কেন? ও যে অন্য লোক পরবে।

তারিণী। তা কি হবে? আমি এ টুপি পোরে সং সাজতে পারবো না।

গরুড়। আরে, তোমার পার্ট যে পাখীর! এ-রকম করলে তোমাকে নিয়ে কাজ-চলা দায়!

তারিণী। আমার মাথা বড় ঝিম্-ঝিম্ কর্‌ছে। বোধ হয় মাথা ধরলো। টুপিটা যে গরম বাপ্!

গরুড়। তা থাক্, তোমার যা ইচ্ছে পোরে নাও, আমি আর কিছু বলতে চাইনে।

(এক-গালে-রং হারার প্রবেশ।)

হারা। আমার মটুকটা কে নিয়ে এল?

গরুড়। মটুক কি? তোমার যে ঝুঁটি পরবার কথা। লক্কা-পায়রা সেজে বেরোতে হবে, জাননা?

হারা। পরী-দিদিকে পায়রা সেজে যা দেখাচ্ছে ভাই, কি বলবো, হেসে বাঁচিনে! ও যেমন পরতে গেল এই সাজ, আমি বলে—

গরুড়। ফের এখানে গোল করতো ঘাড় ধরে বের করে দেবো! যাও নিজের জায়গায়।

(শ্রীধরকে টানিতে-টানিতে দনুর প্রবেশ।)

শ্রীধর। মাই ডিয়ার দনু, কি করছ? ওদের সাজতে দাও।

দনু। ধ্রুবতারা! মাইফ্রেণ্ড শ্রীধর, ধ্রুবতারা!—

গরুড়। বাবু যে! হুজুর, আপনি এখানে—

শ্রীধর। এই যে গরুড়, তোমাকেই একবার দেখতে এলেম। মাইডিয়ার ফেলো! লেট আস্ গো, ঘণ্টা দিচ্ছে ওদিকে!

দনু। দিলেই বা ঘণ্টা, একটু রিফ্রেস্‌ড্ হয়ে নেওয়া যাক্; চল ওধারে। (প্রস্থান।)

গরুড়। তাহলে তারিণী, আর তুমি সাজতে দেরী করো না, সব তৈরি—

(প্রস্থান।)

তারিণী। (মুখে চুণ লেপিতে-লেপিতে) আমি কিছুতেই ওই বিশ্রি পালকগুলো পরছি নে।

(পেণ্টারের প্রবেশ।)

পেণ্টার। আমার আঁকার তুলিটা কে নিলে? ব্যস্, এটাকে রং-জুবড়ে দফা খেয়ে বসে আছ?—নিজেও বহুরূপী সেজেছ!

তারিণী। তা যাওনা, তোমার রং-তুলি নিয়ে ওদের সাজাওগে, আমি নিজেই সাজতে জানি।

পেণ্টার। এ রকম সেজে বার হলে লোকে বলবে কি?

তারিণী। তোমার সে ভাবনা কেন?

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

[ড্রপ-সিনের উল্টো পিঠ। পর্দ্দার একটা ফুটো দিয়ে আলো আসছে। শুম্ভ নিশুম্ভ দুই প্রমটার ও ম্যানেজার। ধুতির উপরে সার্ট ও চটি পায়ে, গায়ে চাদর নেই।]

শুম্ভ। সবাই তো এসেছেন—আর দেরি কেন? দেখছ কি ভাই নিশুম্ভ?

নিশুম্ভ। রয়েল-বক্স এখনো খালি দাদা!

শুম্ভ। দেখ। এই যে ফিচ্ কোম্পানির বড়-সাহেব এসে বসলেন। আর দেরি না। রয়েল-বক্সের ডাইনে কে হে কালা-সাহেবটি?

নিশুম্ভ। শ্রীধর, দেখছ না?

শুম্ভ। আর পাশেই ওঁর শ্রী বুঝি? ওহে, ওদিকে যে আমাদের ঠাকুর-মশাই বসে!

নিশুম্ভ। ষ্টেজ-বক্সে বসলো কে?

শুম্ভ। একদিকে নারদ, একদিকে ভরত; দুই সমজ্দার দুই পাশে। নিশুম্ভ, বলে দাও, সবাই যেন সাবধানে একটু করে, ভুল-চুক না হয়।

নিশুম্ভ। ইন্দ্র-চন্দ্র এঁরা এসেছেন তো দাদা?

শুম্ভ। কাউকে দেখছিনে। না, না, ওই যে সবাই পিটে বসেছেন।

নিশুম্ভ। দেবতারা চিরকাল পিটে বসেন দেখছি!

(ঘণ্টা ধ্বনি।)

শুম্ভ। চল, চল, আর দেরি নয়। ঐ আসছেন ধ্রুব-তারার ধ্রুব, আর আদুরে ছেলে পেল্লাদ! ভোগালে!

(যাত্রার দলের রাজ-বেশে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের টলিতে-টলিতে প্রবেশ।)

প্রহ্লাদ। সব তো রেডি?

ধ্রুব। খঞ্জন-খঞ্জনী, বুল্‌বুল্, ময়ুয়া—এরা কোথা?

শুম্ভ। তারা সাজ পরচে। তোমরা বসলে প্লে আরম্ভ হবে।

নিশুম্ভ। ওদিকে নয়, ও গ্রীণ রুম্! এই বাইরে যাবার পথ।

শুম্ভ। সাইড্ দোরটা বন্ধ করে দাওনা। বাজে লোক কেন আসতে দিচ্ছ?

নিশুম্ভ। আর নয়, কন্‌সার্টের ঘণ্টা দাও।

(কন্‌সার্ট আরম্ভ।)

সিন্‌সিফ্টার। যত লোক এইখান দিয়ে যাতায়াত করবে! দাড়গুলো জড়িয়ে গেছে, ড্রপ্ তুলি কেমন করে?

নিশুম্ভ। দেখো, কপিকলটা না বিগড়ে যায়! টান এইবার।

(বাঁকিয়া-চুরিয়া ড্রপ্ উঠিল।)

পঞ্চম দৃশ্য

[অন্ধকার একটা আঙিনার ডানদিকে একটি পোড়ো বাড়ীর খোলা জানলা। গরাদের ওপারে মিট্‌মিটে আলো বাতাসে নিভছে, জ্বলছে। আঙিনার বাঁদিকে হেলে-পড়া-মাচায় ঠেস দিয়ে ঝুমকো-লতা বাতাসে দুলছে; তারি শিয়রে নীল আকাশে একটি তারা। পোড়ো-বাড়ীর জানলা দিয়ে দু-একটা ফুলঝুরি আলোর ফুল্‌কিগুলো অন্ধকারে ঝরিয়ে-ঝরিয়ে দিয়ে নিভে গেল। একটা শ্যামাপাখী সিটি দিলে। কোলা-ব্যাঙের করতাল বাজলো; কাকগুলো ঘুমের ঘোরে একবার কাকা করে ডেকে থামলো।]

(বসন্ত-বাউরী, কোকিল, পাপিয়া আর কুকুরের একে-একে প্রবেশ।)

পাপিয়া। পিউ!

কোকিল। উহুঃ, মরে যাই, বসন্ত এল, উহুঃ!

পাপিয়া। সে রইল মানে—পিউ রে পিউঃ!

বসন্ত-বাউরী। পিউ বোলেও ফল নেই, উহু কোরেও লাভ নেই। বল, বৌ কথা কও বৌ—

কুকুর। রও, গোল কোরোনা, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী আসছেন।

[বেঙ্গমীর হাত ধরে বেঙ্গমা, সঙ্গে একে-একে পাশাপাশি ময়ূর আর পেরু, বক আর হাঁস, লক্কা-পায়রা আর দাঁড়কাক বাবুই ও ভালচড়াই আসরে এলেন। খঞ্জন-খঞ্জনী এসে নাচ-গান আরম্ভ করলে।]

(গান)

আসা-যাওয়ার বাঁকে-বাঁকে
থেকে-থেকে দেখা পাওয়া।
বারে-বারে হারিয়ে গিয়ে
কাছে দূরে খুঁজে পাওয়া।
থেকে-থেকে হেসে চাওয়া,
ফিরে-ফিরে কেঁদে যাওয়া,
বারে বারে নতুন করে
তোমায়-আমায় দেখা পাওয়া।

বেঙ্গমা। ভোরে আলো ঝলক দিয়ে আসে ঘুরে।
বেঙ্গমী। ভরা সাঁঝে ঝিলিক দিয়ে চলে দূরে।
সকলে। বাজিয়ে নূপুর ঝুমুর-ঝুমুর আসা-যাওয়া,
গেয়ে যাওয়া, হেসে চাওয়া,
থেকে-থেকে দেখা পাওয়া।

(কাক-সন্ধ্যার একটু আভা নীল-আকাশে পড়লো। টিং টিং কোরে সংপাচটার ঘড়ি দিতে-দিতে চাকা-মুখ ঘড়ির প্রবেশ।)

ময়ূর। কেও, কে আসে ও?

ঘড়ি। সঃ কালঃ।

বেঙ্গমা। এরি মধ্যেই কাল এলো?

বেঙ্গমী। নাচ-গান সুরু হতে না হতে?

ময়ূর। ভাই দাঁড়কাক, তুমি কি ডেকেছিলে যে কাল আসছে?

কাক। ভাই ময়ূর, তুমি ডাকলে নাকি, যে অকালে বাদলা এসে আসরটা ভেঙে দিতে চাচ্ছে?

পেরু। হাঁস, বক, লক্কা-পায়রা এঁদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ ডেকেছেন!

লক্কা। ভাই পেরু, তুমিই ডেকেছ এবং এখনো ডাকছ!

খঞ্জন-খঞ্জনা। ওগো শুনলেনা, কোকিল ডাকলো, পাপিয়া ডাকলো, বসন্ত-বাউরীও ডাকলো, কাল আর না এসে থাকতে পারে!

কোকিল। আমরা ডাকলেম এলো বসন্তকাল; আর তোমরা তাল দিয়ে নেচে

ডাকলে কিনা, তাই আসছে নিদেনকাল —তাল-বেতাল সঙ্গে করে!

ঘড়ি। শুনছো পায়ের শব্দ—এক, দুই, তিন—ফাঁক!

বাবুই। কোথায় হে তাল-চড়াই, জড়-ভরতটি হয়ে রইলে কেন? লাগাও না ঠুম্‌রী! বলি ও বুল্‌বুল্‌, ও ময়ুয়া, এগিয়ে এসো, কোণে কেন?

চড়াই। ওই ঢিমে-তেতালা আসছে, দেখনা।

(কাছিমের প্রবেশ।)

বেঙ্গমা। কি হে কাছিম-সাহেব, এত দেরী যে?

কাছিম। এমনিই বা কি দেরী হয়েছে, খরগোস তো এখনো পৌছান নি! এই খোলটা বেঁধে নিতেই যা—

কুকুর। দেরী বোলে দেরী! এতক্ষণ ধরে তোমার পায়ের শব্দ পাচ্ছিলুম যে মনে হলো বুঝিবা কাল এলো!—কিন্তু তুমি এলেনা কাছাকাছি!

কাছিম। ভোমরা-ভুমরা এসে গেছে?

ঘড়ি। অনেকক্ষণ! তুমি এখন খোলে চাঁটি দিলেই হয়।

কাছিম। কোথায় গো ভ্রমর-ভ্রমরী, কীর্ত্তন ধরো—

(গান)

তা দিন্, দিন্ তা, দিন্ দিন্ দিন্ তা,
ডিমে তা ঢিমে তা লে—!
তা দিয়ে লেরে, দিয়ে নেরে তা,
দেরে তা, দিগে তা, দিগে দিগে তা,
দিয়ে নেরে তা, দিগে দিয়ে তা,
তা দিগে তা।

(কোরাস্)

কাক। দিও তা, দিও তা।
কোকিল। তা দিয়ে নিও নিও!
কাক। না না তা!
কোকিল। তা দিয়ে দিও দিও।
সকলে। ওদিও না, দিও না,
দিও দিও দিও তা।

(রঙ্গতা-শেয়ালের নাচিতে-নাচিতে প্রবেশ।)

শেয়াল। বা-হোয়া! বা-হোয়া!

হুতুম-পেঁচা। খুব ধুম লাগায়ো, খুব ধুম্!

সারস। এন্ কোর্! এন্ কোর্!

টিয়াপাখী। ক্যা—পি—টা—ল্!

রাজহাঁস। (টলিতে-টলিতে) এক্-সেলেন্! এক্ সেলেন্!

বেঙ্গমী। হেসে খেলে নাও—

বেঙ্গমা। মনের সুখে হরদম্—

(নেপথ্যে রামশিঙে বাজালো।)

ময়ূর। কেও, আসে কেও?

(আত্মারামের প্রবেশ।)

আত্মারাম। আমি রামপাখী।

(শিঙে বাজাইয়া নাচগান।)

(গান)

পালাঃ, এবার শিঙে-ফোঁকার পালা
সুরু হলরে, ও আমার আত্মা-রামপাখী, পালা!
শিঙে দে ফুঁকে, রামশিঙে দে ফুঁকে!
নেচে চল শিঙে-ফোঁকার তালে-তালে
পা ফেলে যাবার পালা সুরু করে দিয়ে, পালাঃ।

কাছিম। আরে বাবা, এ কেমন বেয়াড়া তাল?—কোমর যে দুল্‌তেই চায় না!

কুকুর। পালাই-পালাই ডাক ছাড়ালে যে!

কাক। এর চেয়ে যে কোকিলও গায় ভালো।

কোকিল। ওটা তুমি বাড়িয়ে বলছ! এই শেয়াল জানেন, তুমি-আমি দুজনের মধ্যে গান ভালো কার।

(আত্মারামের শিঙেতে ফুঁ। তাড়াতাড়ি ছুঁচোর প্রবেশ।)

ছুঁচো। কেত্তন হচ্ছে নাকি?

লক্ষ্মীপেঁচা। হয় নি, হবে; এসনা এই দিকে।

(গোঁফ-ফুলিয়ে বেরালের প্রবেশ।)

বেরাল। সে ছুঁচোটা গেল কোথা?

পেঁচা। সে এইমাত্র এদিক দিয়ে চলে গেছে! (পেটে হাত বুলাইলেন।)

কুকুর। সভার মাঝখানে ছুঁচোকে তাড়া করে এসো, তুমি তো ভারি অভদ্র হেঃ।

বেরাল। এটা সভা নাকি? আমি বলি শোভাযাত্রা!

আত্মারাম। আমি ভাবলেম গঙ্গাযাত্রা হচ্ছে; শিঙে-ফুঁকতে-ফুঁকতে চলে এসেছি।

ময়ূর। (প্যাখম ছড়িয়ে) তুমি কোন্ দেশী পাখী হেঃ!

কাকাতুয়া। (ঝুঁটি উঁচাইয়া) দেখছনা শোভাযাত্রা!

পেরু। (গলার থলি নেড়ে গম্ভীর সুরে) দেখছনা শোভাযাত্রা!

(সকলে একে-একে আত্মারামের মুখের কাছে ঝুঁটি ও ল্যাজ নাড়িয়া)

তুমি কোন্ দেশী পাখি হেঃ!

(আত্মারামের গান)

যেখানে গয়া গঙ্গা কিংবা কাশী
সব কিছু না মেলে,
সেই দেশেরই ছেলে আমি
..সেই দেশেরই ছেলে!
যেখানে বাঁকা কথার হাউই ওড়ে,
ফাঁকা কথার ফানুস,
সেই দেশেরই মানুষ আমি,
সেই দেশেরই মানুষ!
যেখানে ঘরে-ঘরে পটোল তোলে,
বাইরে তোলে ঝিঙে,
যে-দেশেতে ফোঁকে সবাই
আমার মতো শিঙে,
যে-দেশটা শূন্য ভরে উড়ছে যেন ফানুস্!
সেই দেশেরই আত্মা আমি, সেই দেশেরই মানুষ!

ঘড়ি। তুমি শিঙে-ফোঁকা মানুষ, পাখীদের মধ্যে কেন? যাও শিং-এর দলে যাও।

আত্মারাম। তোমারও তো কালো কাঁটার মতো ছুঁচোলো শিং দেখছি, তুমি এখানে কেন?

বেরাল। নেও! ওই সরু-ছটি কাঁটার মতো, ও দুটো বুঝি? শিং ঝাঁটা গোঁফ!

ঘড়ি। এ ঝাঁটা দিয়ে শিঙে যে ফোঁকে, কিম্বা যে শিঙে-ফোঁকার কাছে যায়, এমন কি নাও যায়, তাদের সবাইকে ঝাঁটিয়ে বিদায় করি আসর থেকে।

(নেপথ্যে)

এক আঁকড়ি-বাড়কে ছাড়া!

[একটুখানি বিদ্যুৎ চমকালো, দূর থেকে বিষ্টি আর বাতাসের শব্দ পাওয়া গেল।]

কুকুর। কেমন জোলো আর লোণা হাওয়া দিলে, দেখেচো?

ঘড়ি। দেখতে পাচ্ছিনে, কিন্তু বোধ করছি পষ্ট আমার কল-বলে মর্চে ধরছে!

কাছিম। (পেট চাপড়াইয়া) আমার খোল্‌টা চ্যাপ্ চ্যাপ্ করছে!

আত্মারাম। শিঙে যতই ফুঁ কচ্ছি, কেবলি শব্দ হচ্ছে ঘড় ঘড়!

শেয়াল। এই আত্মারামটা এসে অবধি মনটা কেমন আন্‌চান্ করছে—

বেরাল। সব যেন ভিজে-ভিজে ঠেকছে—!

সকলে। দাও ঘাড়-ধোরে আত্মারামকে দূর করে!

বাবুই। চলুক্, চলুক্, নাচ-গান চলুক্! গোল কর কেন?

তালচড়াই। সেই ভালো।

(গান)

ছিছি মিছিমিছি কর কিচিমিচি!
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে
কেউ বসে আছি কেউ চলে গেছি
সুখে কিম্বা মনদুখে।
ছিছি মিছিমিছি খিটিমিটি বাবুইহাটি খুটিনাটি!

বাবুই। তোমার নাম তাল-চড়াই, কিন্তু তোমার গানের না আছে তাল, না আছে ছন্দ! নাইকো মাথা, নাইকো মুণ্ড!

তালচড়াই। ঠিক বাবুই-পাখীর বাসাটির মতো! (দূরে ঝড়-ঝাপ্টার শব্দ উঠলো, পোড়ো-বাড়ার জান্‌লাটা ঝমাৎ ঝমাৎ কোরে খুল্লো, বন্ধ হলো।)

কোলাব্যাং। কড়মড় কড় কোঁচি? —দেবতা দাতো-খামাটি দিউকে হাসি কিড়ি!

কাছিম। আরে থাম্‌রে বাপু, তুই আর কিড়-মিড়ি করিসনে।

কাক। ঘাড়িতে কি বল্‌ছে?

ঘড়ি। এক-আঁকড়ি এক-আঁকুশী এল বোলে!

আত্মারাম। আঁকড়ি-বুড়ি আঁকশী নিয়ে? তাহলে এবার আত্মারামের কথা ফুরোলো—

ছাগল। (দাড়ি নেড়ে) তব্যা নট্যে গাছও মুর‍্যালো! (শাক ভক্ষণ।)

আত্মারাম। রাম রাম ভাইসকল! (রাম-শিঙেতে ফুঁ।)

শেয়াল। (আত্মারামের ঘাড় ধোরে) খবরদার! এখানে শিঙে ফুঁকোনা! বাইরে চল।

বেরাল। ছুঁচোটা গেল কোথায়? শিঙে-ফোঁকার সঙ্গে-সঙ্গে তাকেও কেত্তন করতে পাঠালে হতো যে!

পেঁচা। (পেটে চাপড় দিয়ে) একটু আগেও এখানেই তো ছিল আর তো দেখতে পাচ্ছিনে!

কাক। ফরসা হয়ে গেছে—আর তুমি দেখতে পাও! আমি কিন্তু দেখছি এইখানে— (পেঁচার পেটে খোঁচা।)

পেঁচা। আঃ কি! ভালো লাগছে না খোঁচা।

কুকুর। আঁকড়ি-বুড়িটা আসছে।

কাছিম। সব মাটি দেখছি! আমোদ টামোদ সব গুড়োতে হল এইবার!

কুকুর। বুড়িটার গায়ের বাতাস, কি পায়ের শব্দ পেলেই মনে পড়ে যায়—বুড়ো হয়েচি, দাঁতও পড়েছে—

সজারু। মনে পড়ে চুল পেকেছে, আর গাটা অমনি কাঁটা দিয়ে ওঠে!

কাছিম। বোধ হয় যেন কোমরে বাত ধরেচে!

পেঁচা। চোখে ছানি পড়ে আসছে!

ময়ূর। আর আমার মনে হয় সর্ব্বাঙ্গে উকুন লেগেছে আর পাখার পালকগুলি একটি কোরে খসে-খসে পড়ছে! কেমন

হে কাক, তোমার কি ঠিক এমনি মনে হয় না?

কাক। ঠিক উল্টো। বুড়িটাকে দূরে থেকে দেখি আর ইচ্ছে হয় প্যাখম-ছড়িয়ে নাচি, আর ওকে ডাকি—আয়, আয়!

ময়ূর। সে-ডাকটা সবাই পছন্দ করে মনে কর নাকি?

বেড়াল। আহা, বুড়ি তো নয় যেন ষষ্ঠী-ঠাকরুণ!

কুকুর। ষষ্ঠীর কাছে যাওনা, যষ্টিমধু খাওয়াবে এখন!

খরগোস। বুড়ির ওই সাদা চুলগুলি গর্ত্তের মধ্যে বিছিয়ে শুতে কি আরাম বলতো! যেন পালঙ্কের গদিতে—

রাজহাঁস। তাইতো হে ছোক্‌রা, ভারি জ্যাঠামো শিখেচ যে!

বক। বুড়ির কাছে তুলোর গদির ফরমাস দিতে যাওনা!

সারস। দুটি কান ধোরে বুঝিয়ে দেবে তুলো-ধোনা কাকে বলে!

ব্যাং। শরীলটাতো ভাই দিন-দিন শুকিয়ে গেল। ভাবনায়-ভাবনায় ঘুমিয়ে আরাম নেই। বুড়ি ওই বাড়ি-গাছটা দিয়ে হয়তো দেখ্‌ব কোন্‌দিন কুয়োর তলা থেকেও আমায় বঁড়সি-গাঁথা করে তুলেছে! কোনো-রকমে যদি ডানা গজাতে পারতেম, তবে একদম ওই হিমালয় পর্ব্বতটার ওপারে ওই নীল জায়গাটায় গিয়ে তলিয়ে থাকতেম।

ঈগল। হিমালয়ে যেতে-যেতেই গায়ে তোমার যেটুকু জল আছে, জমে গিয়ে, তুমি শীলটি হয়ে এসে পড়তে ঠক্ করে বুড়ির ঘরের দাওয়ায়, আর বুড়ি অমনি আঁকুশী দিয়ে টেনে নিয়ে টুপ্ করে তোমায় গালে ফেলে দিত!

কাছিম। ঠিক বলেছ, বুড়ির ভয়েই তো আমি কাঠ হয়ে কেঠো ব'নে গেছি! রোজ রাতে স্বপ্নে দেখি বুড়ি যেন আঁকুশীতে গেঁথে আমায় আকাশের উপর শূন্যে ঝুলিয়ে দেয় আর ঝুপ্ করে আমি এসে পড়ি মেঘের উপর থেকে আরাকুট পর্ব্বতের চূড়োয়।

বেঙ্গমা। আঁকড়ি-বুড়িকে আমার তো এতটুকুও ভয় করে না।

বেঙ্গমী। একটুও নয়; আমরা দুজনে যে ভাব করে নিয়েছি।

বেঙ্গমা। একেবারে এক হয়ে গেছি। ভয় দেখাবে কাকে? বুড়ি চিনে উঠতেই পারে না কে বেঙ্গমা, কেই বা বেঙ্গমী!

কাক। কই, আমিও আদর করে তো বুড়িকে কতবার ডেকেছি, এমন কি ওর আঁকশীটাকে দাঁড় কল্পনা করে দাঁড়কাক হয়েও বসে থাকি—বুড়ির ওই পোড়ো-বাগানটাতে; কিন্তু তবু তো ওর তাড়া মাঝে-মাঝে খেতে হচ্ছে এখনো!

বেঙ্গমা। কিন্তু বুড়ি আমাদের তাড়া মোটেই দেয় না, দিতে পারেও না।

বেঙ্গম। আমরা যখন-তখন তার ভাঙা ঘরখানাতে গিয়ে ঢুকি, বার হই; বুড়ি আমাদের স্বাগে আর ঝিমোয়, হাই তোলে, তুড়ি দেয়।

বেঙ্গমা। তাড়া কখনো দেয় না।

কাছিম। এমন অঘটন ঘটলো কি করে, শুনি?

কুকুর। এও তো বড় আশ্চর্য্যি! সবাই ভয় করে যাকে তোমরা দুটিতে—

বেঙ্গমা। আর ভয়ের বাইরে অনেক কাল হল চলে গেছি।

ব্যাং। যে সবাইকে বঁড়সী-গাঁথা করে একদিন-না-একদিন টেনে তুলবেই, তার ভয়ের বাইরে গেলে কি উপায়ে শুনিনা ?

বেঙ্গমা। সে অনেক দিনের কথা। পৃথিবীর প্রথম-ছেলে প্রথম-মেয়ের খেলা-ঘরের একটি কোণে আমরা দুটি বেঙ্গমা-বেঙ্গমী বাসা বাঁধলুম।

বেঙ্গমী। একটি কোণ, তাতে দুটি পাখী—যেন প্রাণ আর ধড় একসঙ্গে রয়েছি।

বেঙ্গমা। যেন এক-ফুলের দুই ভোম্‌রা, তেমনি সেই একটি বাসায় আমরা দুটি।

বেঙ্গমী। একখানি মাটির খেলাঘরে সেই ছেলে-মেয়ের সঙ্গে এক-হয়ে রয়েছি।

কাছিম। তারপর ? তারপর ?

বেঙ্গমা। তারপর একদিন আঁকড়ি-বুড়ি এসে বল্লে, বেঙ্গমী তোমায় যেতে হবে! বেঙ্গমী কাঁদতে লাগল। ছেলে-মেয়েটাও কাঁদতে থাকলো—

কুকুর। তারপর ?

বেঙ্গমা। বেঙ্গমাকে বুড়ি নিয়ে চল্লো, আমিও সঙ্গে-সঙ্গে চল্লুম, ছেলে-মেয়েটিও চল্লো —না-না বোলে কাঁদতে-কাঁদতে—

কাক। কোথায় গেলে তারপর ?

বেঙ্গমা। তারপরে বুড়ি রেগে আমাদের দুজনেরই ঘাড়-মট্‌কে রাস্তায় ফেলে চলে গেল!

কাছিম। আহাহা! তারপর ?

বেঙ্গমা। তারপরে কি হলো তাতো জানিনে; বোধ হয় সেই রাস্তার ধারেই পড়ে রইলেম ভাঙা-চোরা—

বেরাল। নেও, তারপর ?

কুকুর। তারপরে ? তারপরে ?—

বেঙ্গমী। তারপরে দুজনেই আমরা স্বপ্নে বেঁচে উঠলুম—

বেঙ্গমা। নিরালা নিবিড় একটি ঝোপে দুটি পাখী।

কাক। বুড়ি এসে আর ঘাড় মট্‌কালে না ?

বেঙ্গমা। মট্‌কালে বই কি! কিন্তু যতবারই মট্‌কালে বেঁচে উঠলুম—

বেঙ্গমী। সবুজ ক্ষেতের একেবারে বুকের মাঝে একটি অক্ষয় বট, তারি একটি খোপে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী!

বেঙ্গমা। আহা!

(গান)

ও আমার
ভাঙা-খাঁচার বিহঙ্গী!
নিবিড় খোপের বিহঙ্গ—
ও আমার বিহঙ্গ!
সোনার দাঁড়ে বনের টিয়া,
বনে সোনার কুরঙ্গ,
ও আমার বিহঙ্গ!
নীল-গগনের বিহঙ্গী!
রূপসাগরের বিহঙ্গ!
স্বপনপুরের বিহঙ্গী—
আমার স্বপন-বিহঙ্গ!
ওরে প্রাণ-বিহঙ্গী!
ওহে প্রাণ-বিহঙ্গ!
খেলাঘরের বিহঙ্গী!
ফুলবনের বিহঙ্গ!

কাছিম। আমিও তো স্বপন দেখি—আকাশে উড়লুম আবার আকাশ থেকে

পড়লুম, ভেঙে চুরমার্ হয়ে গেলুম স্বপ্নের সঙ্গে। জেগে উঠে দেখি, যে-কাছিম সেই কাছিমই আছি; বুড়ির ভয়ও রয়েছে তেমনি।

কাক। আমি রোজই দেখি, স্বপনের ছানার ড্যালা মুখে নিয়ে উঁচু ডালে বসে আছি, শেয়ালটা বল্‌ছে, গান গাওনা! গান গাই, ছানা পড়ে, শেয়াল পালায়, আবার স্বপন ঘুরে আসে ছানার ড্যালা হয়ে, কিন্তু ওই বুড়িটাকে তো কোনোদিন স্বপন বলে মনে হয় না!

কুকুর। তবে যে তুমি বল্লে বুড়িকে তোমার ভালো লাগে, দেখলেই আয় আয় বোলে ডাকতে ইচ্ছে হয়!

কাক। হয় তো! কিন্তু একেবারে বুড়ির ভয় তো যায় না! কিন্তু এও আবার—

কুকুর। আরে ভাই, কিন্তুও নেই, আবার এও নেই,—আছে বুড়িটা! স্বপন আমারো একটা কেন, দুটোতিনটে আছে। কোনোটাকে দেখি জলের মধ্যেকার ছায়ার মতো, কোনোটা বা দেখি যেন ধর্ম্ম-অবতার হয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়েছি—স্বর্গের সিঁড়ি টোপ্‌কে! কিন্তু বুড়ি এসে এক-একবার যখন গলার ছিকল্‌টায় টান লাগায়, তখন সে স্বপ্ন ছুটে যায়, আর বুকের কাছটা টন্-টন্ করে ওঠে, তার করলে কি?

বেঙ্গমা। তোমরা যে স্বপন দেখো; আমাদের দুটির তো তা নয়!

কাছিম। তবে কি? আমাদের সঙ্গে তফাৎটা কি তোমাদের স্বপনের?

বেঙ্গমা। তোমরা স্বপনকে দেখো, আর স্বপন দেখে আমাদের।

বেঙ্গমী। তাই আমরা স্বপ্নময় হয়ে গেছি স্বপ্নের দিষ্টিতে—

বেঙ্গমা। আমরা যে স্বপ্নলোকে চলে গেছি; সেখান থেকে বুড়িটাকেও দেখি—স্বপ্ন বই আর কিছু নয়!

তেলাপোকা। এ কখনো হতে পারে কি?

কাঁচপোকা। কেন হবে না? তুমি তো তেলাপোকা, কিন্তু আমি দেখি যখন তোমাকে, তুমি দেখতে-দেখতে কাঁচপোকা হয়ে যাও, আর সবুজ ঝক্‌ঝক্ করতে থাকো, যেন সাত-রাজার ধন তক্তে-তাউসের একখানি পান্নার তক্তি!

ব্যাং। তাহলে আমার আঙটিটাকে ভুয়ো জিনিষ তো বলা যায় না!

বেঙ্গমা। কিছুতেই নয়।

কাছিম। তা হলে আমি এবার রোজই আকাশে উড়বো, দেখি বুড়িটা কি করে!

কাক। আমিও ত গান গাইছি—এবার থেকে বেপরোয়া!

কুকুর। স্বপনের ছিকল্ বুনে এবার গলায় সাতনরী হার ঝোলাচ্ছি, দেখ না!

কাঁচপোকা। স্বপ্নের এবারে তক্তে-তাউস বানিয়ে একেবারে সাজাহান বাদশা হয়ে বসচি।

তেলাপোকা। স্বপ্নের এবারে সরষে-ক্ষেত বুনে ফেলছি।

পেঁচা। আমি স্বপ্নের ছুঁচোবাজি লাগিয়ে দিচ্ছি, দেখনা।

পেরু। এবার থলি নয়, স্বপ্নের বস্তা বাঁধছি।

ময়ূর। আঁকুড়ি-বুড়ি গেল কোথায়? (প্যাখম ছড়াইয়া) দেখে যাক্ স্বপ্নের চাল-চিত্তির!

জোনাক-পোকার দল। স্বপ্নের ফুল-ঝুরি!

ঝুম্‌কোলতা। আর ঝুম্‌কোফুলের ঝাড়!

(গান)

আলোর ফুলঝুরি, কালো ঝুমকো ফুল,
এক-স্বপনে গাঁথা দুটি, বঁধুর কানের দুল!
স্বপ্নে-গাঁথা আলো, স্বপ্নে-গাঁথা ফুল!
স্বপ্ন-চাঁদমালা, বিনি সুতার হার,
নীল সে পরশমণি স্বপ্ন-পারাবার!
স্বপন আলোর টিপ, শুকতারাটি জ্বলে
জ্বলে সাঁঝে দীপ, স্বপ্ন দিয়া জ্বলে!
স্বপ্ন-নদী বহে—চলে সোনার তরী,
বাতাস গেল কহে—মরি, মরি, মরি!
ছায়া-করা কূলে, স্বপন-নদী পার,
বঁধু গাঁথেন ফুলে, বঁধুর স্বপন-হার,
তারি বরণ-ডোলা. স্বপ্নে দেয় দোলা—
আলোর ফুলঝুরি, কালো ঝুমকো-ফুল।

সকলে। আসুগ্‌গে এখন বুড়ি, আর ভয় কারি নে!

(নৃত্য গীত)

ঘুমে-জাগায় মিলিয়ে গিয়ে
চলে সেথা লুকোচুরি;
সেখানেতে আলো-ছায়া
ভাঙে-গড়ে মায়াপুরী।
কাজল-রেখা সজল কোরে
বাদল এল যেই পারেতে,
উড়িয়ে দিয়ে আলোর আঁচল
স্বপন চলে সেই ধারেতে!

কুকুর—ঘুমে-জাগায় মিলিয়ে গিয়ে—
হাঁস—মায়াতরী বারে-বারে—
বক—চলে সেথায় ঘুরি ঘুরি—
চড়াই—চলে যেথা লুকো-চুরি—
কাছিম—ঘুমে-জাগায় মিলিয়ে গিয়ে!
কাক—যেখানেতে আলো-ছায়া
ময়ূর—ভাঙে-গড়ে মায়াপুরী!
বেঙ—ঘুমে-জাগায়—(নৃত্য)

[সকাল হলো। ঘড়ি ছটার ঘণ্টা দিলে। আঁকুড়ি-বুড়ি আঁকশী ঠুকে প্রবেশ করলেন।]

বুড়ি। চল চল, ফরসা হল আর স্বপন দেখে না!

পেঁচা। কোথায় যেতে হবে?

বুড়ি। বাসায়, আর কোথায়!

বেঙ্গমা। চল তবে সবাই—

বেঙ্গমী। বাসায় গিয়ে স্বপন দেখি।

সকলে। আর ভয় কি! ভয় ক্যা, ভয় ক্যা! মিছি মিছি ই—ই—

(ড্রপ্ পড়ে গেল।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[ড্রপসিনের সম্মুখ ভাগ। ড্রপের গায়ে সীতা-হরণের একটা বীভৎস ছবি আঁকা। তারি সামনে দিয়ে দেব-দেবী ও দর্শকরা একে-একে বাড়ী চলেছেন। দনু একধারে দাঁড়িয়ে সবাইকে আপ্যায়িত করছেন।]

নারদ। কেমন দেখলে হে আচার্য্য?

ভরত। যা ভেবেছি তাই, যেমন গান-বাদ্য, তেমনি নাট্য, তেমনি দৃশ্য! বিপরীত ব্যাপার!

নারদ। আত্মারামকে তো মন্দ লাগলো না—

ভরত। ঢোঁক!

(প্রস্থান।)

জটে। (দনুর প্রতি) অতি পরিপাটি হয়েছে হে, জিনিষটার রস পাওয়া গেল।

দনু। ঐ সাম্‌নের কামরাটায় একটু বসুন, ভিড় কম্‌লে যাবেন।

ব্রহ্মা। অনেকগুলি ছেলে-ছোক্‌রা দেখলেম, ওদের এ-সব জায়গায় আসতে দেওয়া ঠিক নয়।

দনু। আপনার কেমন লাগলো ?

ব্রহ্মা। বইটা তেমন রুচি-সঙ্গত হয় নি, তোমরা ডন্‌ জুয়ানটা প্লে করলে না কেন ?

(ব্রহ্মা ও জটের প্রস্থান।)

(শ্রীধরের প্রবেশ।)

দনু। আই সে শ্রীধর ! তুমি এখন যেও না।

শ্রীধর। সঙ্গে মিসেস্ আছেন, আর-একদিন হবে এখন, দাদাকে আবার পৌছনো চাই।

(প্রস্থান।)

(পার্ব্বতী সঙ্গে দেবীগণের প্রবেশ।)

দনু। কেমন দেখলেন ঠাকুর-মা ?

পার্ব্বতী। বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর কথাটুকু বেশ লাগলো, আর যাত্রার শেষে একটা সং দিলে ভালো হতো, কেবলি কান্না, একটু হাসি না হলে চলে, কি বলিস্ ছোট বৌ ?

শ্রী। কান্না কোথায় পেলে দিদি ? আমার ভাই বেশ লাগলো। কেবল নাচ-গান হাসি-তামাসা, ভরত-মুনির দেব-যাত্রা দেখে-দেখে চোখ পচে গেছে, কেবলি উর্ব্বশী, মেনকা আর রম্ভা !

শচী। ছোট মা ঠিক বলেছেন, বিদ্যেধরী-গুলোর নাচ দেখলে গা জ্বলে যায় !, ধেই ধেই—

নন্দনী। (জয়ন্ত কোলে) এর চেয়ে আমাদের বারোয়ারি-তলার যাত্রার দল কত যে ভালো গায়, শুনতে যদি মা !

জয়ন্ত। মা, দেখ, দেখ, কেমন ছবি লিখেচে !

দনু। ওহে, লেডিজ্‌দের ক্লোক্‌রুমের দরজাটা খুলে দাও ; আর বল সেখানে চা, সেণ্ডউইচ, আইস্‌ক্রিম পাঠিয়ে দিতে—

খানসামা। মেমসাব, ইস্ তরফ চলিয়ে।

(দেবীগণের প্রস্থান খানসামার সঙ্গে।)

(ইন্দ্র, চন্দ্র ও দেবগণের প্রবেশ।)

দনু। বাস্, তা হচ্ছে না, চল চল একটু রিফ্রেস্‌ড্ হবে।

সূর্য্য। আমার কাল আবার আফিস আছে।

দনু। চল তো, একটু রিফ্রেস্‌ড্ হবে ! কাল সিক্ লিভ নিও। খানসামা—বয় !

(বিঁড়ি-মুখে দুই খুদে-বয়।)

"আমি সেই দেশেরই ছেলে,
আমি সেই দেশেরই ছেলে।"

(গান মুখস্থ করিতে-করিতে প্রস্থান।)

সমাপ্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক হীনাবস্থা

(ফরাসী হইতে)

অধুনা, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে ভারতের ক্ষতি হইতেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষতি।—দেশটা দরিদ্র। রাজকর সংখ্যায় বেশী না হইলেও উহা গুরুভার। কারণ উহার একাংশ হইতে, ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের পেন্‌শন্‌, অথবা ভারত ইংলণ্ডের নিকট হইতে যে প্রভূত ধন ঋণ লইয়াছে তাহার সুদ দিতে হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষতি।—গ্রেট্‌-ব্রিটেন ভারতে যে শাসনপদ্ধতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে; ত্রিশকোটি লোক বিদেশী রাজাকর্ত্তৃক যথেচ্ছভাবে শুধু যে শাসিত হইতেছে তাহা নহে, বিদেশী গণতন্ত্রের দায়িত্ব-বিশিষ্ট কর্ম্মচারীগণের দ্বারাও শাসিত হইতেছে; ভবিষ্যতের গুরুতর প্রশ্নাদি সম্বন্ধে, এমন কি, যে সকল প্রশ্ন সাক্ষাৎভাবে ইংরেজের স্বার্থ-বিরুদ্ধ সেই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে ভারতবাসী দিগের সহিত পরামর্শ করা হয় না, পরন্তু ইংরেজদেরই সহিত পরামর্শ করা হয়।

ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনৈতিক অনিষ্ট নিবারণের সাহায্যকল্পে, ইংরেজের দুইটি কর্ত্তব্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ শাসনব্যয় ও সামরিক ব্যয় কমানো, পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান বেশী বেশী করা, ভূমিকরের বণ্টন আরও ভাল করিয়া করা। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায়িক শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়া, এবং যাহাতে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে এইরূপ সমস্ত সামাজিক সংস্কার-কার্য্যে আনুকূল্য করা।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি একাধারে উদার ও একটু বেশী-ভারতীয়-ভাবাপন্ন করিবার জন্য সভ্যজাতি-গৃহীত মূলতত্ত্ব-অনুসারে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি আর-একবার নূতন করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা উচিতঃ—যথা, প্রদেশ বিভাগগুলির স্বায়ত্তশাসন, প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের ক্রমশঃ বিস্তারসাধন, শাসনবিভাগের সমস্ত কাজেই ভারতবাসীকে প্রবেশাধিকার দেওয়া।

কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে আর একটি গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে। সেই সময় নিকটে আসিয়াছে যখন ভারতের আইন-কানুন নিরবচ্ছিন্ন আর ভারতীয় আইন-কানুন রূপে থাকিতে পারে না।

অষ্টাদশ-শতকে যুক্তি-বাদীরা (rationalist) এবং উনবিংশশতকের প্রারম্ভে উদারনৈতিকেরা এই মূল তত্ত্বটি স্বীকার করিয়াছেন যে, সকল লোকই একই রকমে শাসিত হওয়া উচিত। ইহা হইতেই ফরাসী উপনিবেশে দেশীয় লোকেরা স্থানীয় শুল্ক স্থাপন সম্বন্ধে সার্ব্বজনিক মত প্রকাশের অধিকার লাভ করে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল। জাতিতত্ত্ববিদ্যা বলিলেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বভাবতই গভীরতর পার্থক্য আছে; যে দেশের যে সভ্যতা, তাহা সেই দেশের সাক্ষাৎ ও অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-ফল। আজিকার দিনে, ক্রমবিকাশের মতটাই প্রবল; বিভিন্ন সভ্যতা একটি সমগ্র মানবীয় সভ্যতারই

কতকগুলি খণ্ডাংশ মাত্র এইরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে। কিংবা সেইদিকে মতের প্রবণতা দেখা যাইতেছে। পক্ষান্তরে দৃষ্টান্তস্বরূপ জাপান দেখাইয়াছে যে, খুব সম্প্রতি য়ুরোপের যে সকল জাতি সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছে তাহারা যেরূপ সত্বর য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বৈষয়িক উন্নতি সমুহ গ্রহণ করিয়াছে জাপানও সেইরূপ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্যই পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ, তাহাদের উপরে উপনিবেশকে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে শাসন করা, তথাকার ভৌতিক ব্যবস্থার নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা, এবং তত্রত্য লোকদিগকে প্রাচীন কালোচিত জীবনমাত্র নির্ব্বাহ করিতে দেওয়া আর আবশ্যক বোধ করেন না। ঐ সব দেশ বিজিত হইবার পর প্রথম কয়েক বৎসর এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উপযোগী হইলেও, উহা ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতি স্বীকার করে যে, এশিয়া ও আফ্রিকার জনসমাজ একপ্রকার অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু আসলে সকলই পরিবর্ত্তিত হয়; কতকগুলি সমাজ কালক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় এবং কতকগুলি পশ্চাতে হটিয়া যায়; এবং যে সকল সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়, তাহারা ন্যূনাধিক দ্রুতভাবে অগ্রসর হয়। যখন হইতে এসিয়ার ইতিহাস ভাল করিয়া জানা গিয়াছে তখন হইতেই ইহারও পরিচয় আমরা পাইয়াছি যে, এশিয়ার মত ও বিশ্বাস ও রীতিনীতির মধ্যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ লুই ও আলেকজাণ্ডারের আমলে জনসমাজের মধ্যে যতটা পার্থক্য, আকবর ও অশোকের সময়কার জনসমাজের মধ্যেও ততটা পার্থক্য দেখা যায়। য়ুরোপের অর্থনৈতিক সমুন্নতি, গত শতকের অর্দ্ধাংশের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে এবং য়ুরোপের প্রভাবাধীনে এশিয়ার কতকগুলি রাষ্ট্রের য়ুরোপেরই ন্যায় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে! তথাকথিত বৈজ্ঞানিক শাসনপদ্ধতি, আসলে সব-চেয়ে অ-বৈজ্ঞানিক; কেননা প্রথাকে আইনরূপে দাঁড় করাইয়া, যে সব জনসমাজ বরাবর ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া আসিতেছে, ঐ পদ্ধতি সেই সব সমাজকে অচল করিয়া রাখিবার দিকে যেন উন্মুখ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মারণ

না হ'ক রূপসী, মুখ চোক্ খাসা, রঙটি তাহার কালো
কুৎসিত বলে, বেহারী তাহার, প্রিয়ারে বাসে না ভালো।
লয় না তাহার যতন আদর, দেখে না তাহারে চোখে,
নিকটে আসিলে নিজে চলে যায়, তাড়াইয়া দেয় বোকে।

নহে বেহারীর স্বভাব ত ভালো, বিষম স্বেচ্ছাচারী,
বালিকা ভার্য্যা, তাহার উপরি হ'ল আক্রোশ ভারী!
মূর্খ সে, তার খেয়াল উঠিল, যতই হউক ক্ষতি,
কুরূপা সতীর হাত হতে ঠিক লভিবে অব্যাহতি।

গেল সে গোপনে বৃদ্ধা জনেক হাড়ীর ঝিএর কাছে,
শুনেছে তাহার তন্ত্র-মন্ত্র, টাটকা-টোটকা আছে;
জানে সে মারণ, উচাটন কত, বশীকরণের টিপ্,
শুনেছি কেবল মুখের বাতাসে জ্বালাইতে পারে দীপ।
দ্বাদশ মুদ্রা ফুরান্ হইল গোপনে তাহার সাথে,
মারণ করিয়া মারিবে বধূরে, অমাবস্যার রাতে।
ছটি দিন ধার চলিবে সাধন, গোপনে আগ্ন জ্বালি,
বেহারী নিতুই সুমুখে তাহার বসিয়া রহিবে খালি।

গভীর নিশিতে জ্বালিল বহ্নি, বিজন নদীর কূলে,
হাড়িনী তাহার রুক্ষ জটাটা তুলিয়া বাঁধিল শিরে;
গভীর সিঁদুর কপালে লেপিয়া, বিকট মন্ত্র হাঁক,
সাক্ষী করিল আকাশ-পাতাল, চন্দ্র-সূর্য্যে ডাকি;—
নিরীহ অবলা বালিকা বধিব, শুন কামাখ্যা-মায়ি,
আমি নির্দ্দোষী, তুমিও সাক্ষী, সোয়ামী উহার দায়ী!
সিঁদুরে রমণী-মূর্ত্তি আঁকিয়া সেদিন ফিরিল ঘরে,
বেহারী নিশীথে শিহরি উঠিল স্বপনে দারুণ ডরে।

পরদিন রাতে বেহারী তেমনি গেল সে নদীর কূলে,
আজিকে তাহার কি এক আঘাত লাগিছে মরম-মূলে।
গঙ্গা-মাটীর মূর্ত্তি গড়ায়ে, বলিল হাড়িনী "আমি
বধিব ইহারে, আমি নির্দ্দোষী জেনো অন্তর্যামী!"
বেহারীর পানে চাহিয়া বলিল, "এই বিল্বের কাঁটা
পুতুলের গায় ছোঁয়াইব যেই ঘুচিবে তোমার লেটা!"
বেহারী বলিল আর কাজ নাই, টাকা লয়ে দাও ছাড়ি,
দুখিনী আমার থাকুক ঘরেতে কাজ কি তাহারে মারি!

হাড়িণী তখন রুষিয়া বলিল ঊর্দ্ধে তুলিয়া আঁখি,
"চামুণ্ডারে কি ফিরাইতে পারি এতদূরে আমি ডাকি ?
বিষের কাঁটা ফুটাইব আমি এই পুতুলের গলে,
এখনি !"—বেহারী কাঁদিয়া পড়িল তাহার চরণ তলে।
"রক্ষা কর গো, সে অভাগী মোর পরাণের চেয়ে প্রিয়,
আমার সাথেতে সুখে সংসার করিতে তাহারে দিও।"
হাড়িণী বলিল, "হবে না, হবে না, এই সে পুতুল ছুঁয়ে,
শপথ করিবি তবে সে শুনিব লুটাইয়া এই ভুঁয়ে।"

"ভালোবাসি তারে, ভালোবাসি তারে, ভালোবাসি আমি বড়,
এবারের মত ফের চামুণ্ডা, একবার দয়া কর।"
কাঁদিল বেহারী হাড়িণী তখন আপন বক্ষ চিরে,
সদ্য শোণিত তিন ফোঁটা দিল অনল-কুণ্ডে ধীরে।
চামুণ্ডা যান্ হইয়া শান্ত, বেহারী ফিরিল ঘরে,
সুখে সংসার করে দুইজনে গলাগলি বধূ-বরে।
এখনো বধূরে হাসিয়া হাড়িণী বলে, "আমি দোষী মূলে,
'বশীকরণের' মন্ত্র পড়েছি মারণের কথা ভুলে।"

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চাঁদবিবির কথা

দুটো লোক আমাকে ভালো বেসেছিল! একজন খুন হয়েছে, আর একজনের সেজন্যে ফাঁসি হয়ে গেল।

আজ তাই বসে-বসে ভাবছি—কেন? আমি কী এমন একটা লোক—যার জন্যে দু দুটো লোক প্রাণ দিলে!

চাষার ঘরে, মুসলমানের ঘরে এমন রূপ বড় একটা মেলেনা—তা ঠিক! তবু—

কি-ই বা এমন আমার রূপ! মা-বাপে আদর করে নাম রেখেছিল—চাঁদবিবি। কিন্তু কৈ, তবু পঁচিশ বছর বয়স হলো, ছেলে কোলে করতে পারলাম না ত! এ জন্মে আর পারবও না, বোধ হয়।

সেই কোন্ ছেলেবেলায় আমার বিয়ে হয়েছিল। গাঁয়ের মধ্যে সব-চেয়ে শান্ত শিষ্ট ছেলেটির সঙ্গে বাপ-মা আমার বিয়ে দিয়েছিল।

ওগো, অত ভালো লোকের সঙ্গে কেন তোমরা এ পোড়ারমুখীর বিয়ে দিলে?

একটু বড় হ'ত না হ'ত তার বাপ-মা দুজনেই, কবরের মধ্যে আশ্রয় নিলে। সে এসে তার শ্বশুর-বাড়ীতে থাকতে লাগল। আমাকে আর শ্বশুর-ঘর করতে হোল না। বড় ভাগ্যবতী আমি!

তার পর আট বছর এক সঙ্গে কেটেছে। কি ভালোই সে বেসেছিল আমাকে! একলা আমার ভয় করবে বলে একটা রাত্তির কখনও আমাকে ফেলে যায় নি। পাড়ার মেয়েরা সেজন্যে কত হাসাহাসি করেছে।

আমায় একলা ফেলে গিয়ে আজ তার কত কষ্টই হ'ল, না জানি!

বেশ হয়েছে, কতবার কত লোকে তোমায় বলেছে যে, তোমার স্ত্রী অসতী। তুমি হেসে তা উড়িয়ে দিয়েছ। কতবার আমি নিজে তোমায় বলেছি তুমি একটা আপদ, আমার পথে কাঁটা, তবু তুমি হেসেছ, তবু তোমার বিশ্বাসের অন্ত দেখিনি। বেশ হয়েছে!

করিমদ্দি তোমার বড় বন্ধু ছিল, না? তোমার যখন বন্ধু, তখন আমারও তাকে খাতির-যত্ন করা দরকার। তুমি ঘরে থাক আর নাই থাক, সে এলে আমি দুটো মিষ্টি-কথা এক-ছিলিম তামাক তাকে দেবই তো। সে যে তোমার দোস্ত। ঠিক, তা নৈলে পাড়ার লোক তোমাকে "সিধা লোক" বলবে কেন? সেই করিমদ্দিই তো এক কোপে তোমার গলা কাটলে! আর সেই করিমদ্দিরই তো কাল ফাঁসি হয়ে গেল। বেশ, হরে-দরে সেই একই। সিধা লোকটা যেখানে গেল, চালাক লোকটাও সেই একই যায়গায় পৌঁছে গেল। পড়ে রৈলাম কেবল আমি। এ-জন্মে আর ছেলের মুখ দেখতে হোল না।

সে দিন সন্ধ্যা থেকে তুমি বাড়ি নেই, করিমদ্দির ওখানে গেছ; রাত হয়ে গেল, এলে না—রাগ করে আমি গিয়ে শুলাম। দোর খোলা রৈল। কখন ঘুমিয়েছি, জানি না, হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম, কোথায় যেন তুমি শুয়ে আছ, আর তোমার সারা গা দিয়ে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। প্রাণ আমার গুর্-গুর্ করে উঠল—ভয়ে কেঁদে উঠলাম। ঘুম ভেঙে গেল—চোখ মেলেই দেখি, করিমদ্দি আস্তে-আস্তে এসে সিন্দুকের উপর বসল। তাকে দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠল।

—সে কোথায়?

—দরকার কি? সে আর আসবে না—বলে করিমদ্দি হাসবার চেষ্টা করলে। সেই পরশু দিনকার আমার সেই হাসির এই উত্তর। বললুম,—যাও, যাও, তুমি এখনি চলে যাও, নাহলে এখনি আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকব।

ভ্যাবা-চ্যাকা হয়ে করিমদ্দি বেরিয়ে গেল। ভারি চালাক, পালোয়ান করিমদ্দি। গাঁয়ের মধ্যে সেরা লাঠিয়াল, সেরা সড়কিবাজ। একটা মেয়েমানুষের হাসির জন্যে নিজের জান তুচ্ছ ক'রে মানুষ খুন করে—আবার একটা মেয়েমানুষের কড়া কথায় সুড়্-সুড়্ করে অন্ধকার ঘর ছেড়ে চলেও যায়। ঘেন্না করি আমি অমন পালোয়ানকে!

সে দিন উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, —তোমার স্বামী তোমায় ভালোবাসতো?

হেসে আমি জবাব দিলাম,—খুব।

তারপর জিজ্ঞাসা হোল করিমদ্দির সঙ্গে তোমার ভালোবাসা ছিল?

এবারো আমার হাসি এল, বল্লাম,—মোটেই না।

দু-দুটো লোক আমায় ভালোবেসেছিল। একজন খুন হোল, আর একজন ফাঁসি-কাঠে চড়ল। এ-জন্মে আর আমার ছেলের মুখ দেখা হোল না।

শ্রীঃ—

গৌরীদান ও পূর্ব্বরাগ

ছেলেরা চিরকালই বুড়দের ঠাট্টা ক'রে এসেছে;—পাকা-চুল ও টিকি নিয়ে টানাটানি ক'রে তারা চিরকালই একটা মজা পেয়েছে।

আজকালকার দিনে "সনাতন পন্থী" "প্রাচীনের দল" প্রভৃতি নানারূপ সম্ভাষণ বুড়রা পাচ্ছেন; ছেলেরা কতকটা এগিয়ে এসেছে এবং বুড়দের টিকি ধ'রে তাদের সঙ্গে-সঙ্গে টেনে নিতে চাচ্ছে; তাতে চুলের গোড়ায় অবশ্যই একটা বেদনা হচ্ছে, কিন্তু ছেলের হাতে এই দৌরাত্ম্য তাঁদের সয়ে থাকতে হবে, না হোলে উপায় নেই।

আচ্ছা, এই যে গৌরীদান-প্রথাটা ছিল—তাতে কি দম্পতী পূর্ব্বরাগের সীমানার বাইরে গিয়ে পড়্তেন? আমরা অনেকেই ভুক্ত-ভোগী সুতরাং আমাদের জীবিতাবস্থায় যাঁরা কল্পনার শরাসন হাতে নিয়ে তীর ছুড়্বেন, তাঁরা লক্ষ্য ভেদ করতে পার্বেন ব'লে আমরা তো কথনই মেনে নেব না।

আমাদের সময় ১১ বছরের ছেলে ও ৬।৭ বছরের মেয়ের বিয়ে ভদ্রঘরে প্রায়ই হোতে দেখেছি। প্রবন্ধ-লেখক স্বয়ং সেই দলের। এই বিয়ে নিয়ে যে এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ হচ্ছে, তা' অনেকেরই বাপ-মায়ের উপর গিয়ে পড়ছে। তা' পড়ুক, কিন্তু তাঁরা কি প্রেমশাস্ত্রের একবারেই ধার ধার্তেন না? আমি তো বলি, তাঁদের প্রেম-চর্চ্চাটা এখনকার চেয়ে অনেক সময়ই কোনো অংশে অল্প হোত না।

শিশুকালে বিয়ে ক'রে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎই হোত না, স্ত্রী তো একটা মোড়কের মধ্যে পুলিন্দা হোয়ে বাল্য-জীবন কাটিয়ে দিতেন। তিনি শাশুড়ীর কোলে-কাঁখে, ননদের সঙ্গে হেঁসেলে দিন কাটিয়ে রাত্রে কোনো গুরুজনের বিছানায় শুয়ে পড়তেন। বিয়েটা তো তখন পুরুতের মন্ত্র-পড়ার সঙ্গে সমাপ্ত হোয়ে মুল্তুবী থেকে যেত। যে পর্য্যন্ত তিনি বড় না হোতেন, সে পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে বাড়ীর আর-আর সকলের সম্বন্ধ একটা পাকাপাকি রকমের হতে থাকতো। এইভাবে পারিবারিক জীবনের দীক্ষা গ্রহণ ক'রে তিনি কৈশোর অতিক্রম ক'রে হঠাৎ একদিন স্বামীর কাছে, অভিনব-ভাবে ধরা দিতেন। বহুদিনের পাওয়া জিনিষ ব'লে তিনি পুরোনো বা বাসি হোয়ে

যেতেন না। যৌবন তাঁকে নূতন ক'রে সাজিয়ে এনে স্বামীর ঘরে উপঢৌকন দিয়ে যেত। চারিদিকের বাধা বিঘ্নের মধ্যে, চারিদিকের লজ্জা, ভয়, সকৌতুক দৃষ্টি ও পরিহাসের পাহারার মধ্যে সে প্রেম যে কি মধুর ও দুর্ল্লভ বস্তুর মত হৃদয় অধিকার ক'রে নিত, তা আর কি বলব! কবি লিখেছেন—"ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়ে, ফেরয় কতই পাকে।"—পরস্ত্রীর ছায়ায় ছায়া লাগাবার এ চেষ্টা নয়; তা' কি কখনো অবরোধের মধ্যে কেউ করতে পারে? নিতান্ত-আত্মীয় ভিন্ন সেই অবরোধের মধ্যে ঢোক্‌বার কারু অধিকারই যে নেই! স্বামীর সঙ্গে কুলবধূর প্রেমের প্রথম-অধ্যায়ে এইরূপ শতশত লুকোচুরী ভাবের মধ্যে—সংকোচে বাধ-বাধ, আনন্দের পূর্ণতায় ভরপুর প্রেম বিকাশ পেতে থাক্‌তো। গুরুজনের শাসন ও চারিদিকে লজ্জার পাহারার মধ্যে এই পূর্ব্বরাগ বড় দুর্ল্লভ হয়ে উঠ্‌তো। অবাধ-মিলনে প্রেমের এই দিক্‌টা তেমন মধুর হোতেই পারে না! সেই অতিগোপনে অস্ফুট প্রেমালাপে অবিদিত-গত-যামা রাত্রি পুইয়ে যেত। দিনের বেলা কথা বল্‌বার কোন সুযোগই থাক্‌তো না, মুখখান দেখবার জন্যে লোলুপ চোখ দুটি এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়াত ও গুরুজনের ভয়ে ঈপ্সিত স্বর্গে পৌছতে না পেরে কণ্টক-ক্ষত ভ্রমরের মত বেড়ার বাইরে চ'লে যেত। সেই পূর্ব্বরাগকে ছেলেরা যতই ছোট ক'রে দেখুন না কেন,—বুড়দের কাছে সেটা মস্ত বড় জিনিষ;—সকল ঘটনার উপর সেই ঘটনা, সকল স্মৃতির উপর সেই স্মৃতি।

সুতরাং ছেলেরা যদি বলেন—আগেকার দিনের লোক প্রেমের আস্বাদ বাড়ীতে পান নি, তাই বিদ্যাসুন্দরের কেচ্ছা ও বৈষ্ণব-তত্ত্ব লিখে মনের ঝাল মিটিয়েছেন, তা আমরা মান্‌ব না। আমরাই তার সাক্ষী; চাক্ষুষ যা হোয়েছে, তাই লিখ্‌ছি, তাঁদের কাল্পনিক অভিযোগে কান পাতবো না।

তারপর বাইরের জিনিষ নিয়ে টানাটানির একটা চেষ্টা বহুযুগ থেকে মনুষ্য-সমাজে চলে এসেছে। রাবণ সীতাকে নিয়ে টানা-টানি ক'রে দশটা মাথা খুইয়েছিলেন; এখনকার দিনেও একটা মাথাওয়ালা প্রেমিক যে এ বিষয়ে একান্ত নিরাপদ, তা বল্‌তে পারি না। আইন তার বিরুদ্ধে, সমাজ তার বিরুদ্ধে, এবং এক্ষেত্রে তাঁকে প্রশংসা করতে পারে—একান্ত কুসঙ্গী ও সমধর্ম্মী ছাড়া—আর কোন লোক আছে বলে আমরা জানি না।

যদি বিবাহ জিনিষটা উড়িয়ে দিতে চান—তা' দিন, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু যতদিন তা' না দিতে পার্‌বেন, ততদিন স্বামী হয়ে স্ত্রীকে অশেষ কষ্ট দেবেন, কিংবা স্ত্রী হয়ে স্বামী-বেচারীর মাথায় দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দেবেন—এটা কি ঠিক্? রসের দোহাই দিয়ে এ সকল চলে না। কেউ-কেউ শকুন্তলার কথা তুলেছেন—কিন্তু শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের বিয়ে হওয়ার পরে অবাধ-মিলন হয়েছিল। এমন কি, বিদ্যাসুন্দরের গল্পেও দেখা যায় দুজনের গন্ধর্ব্ব-মতে বিয়ে হওয়ার আগে কোনো প্রেমাভিনয় হোতে পারে নি।

পূর্ব্বরাগ হ'য়ে বিয়ে হোলেই যে প্রেম খুব শক্ত একটা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা পায়

এবং গুরুজনের নির্ব্বাচিত বিবাহে যে তা হয় না, এমন কথা কেউ জোর কোরে বল্‌তে পারেন না। নিজেদের নির্ব্বাচন দ্বারা বিয়ে ঠিক্ ক'রে পরস্পরকে অবিরত তালাক্ দিয়ে য়ুরোপ-আমেরিকার দম্পতীরা তাঁদের বাসর-ঘরকে আদালতে পরিণত ক'রে ফেলেছেন। এবং আপনাদের মধ্যে যাঁদের দিদিমা বা ঠাকুরদাদা জীবিত আছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে জান্‌তে পারবেন, তাঁদের বিবাহিত জীবনের প্রথম-দিকটা—নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে কিরূপ অপূর্ব্ব প্রেমের সিন্দুররাগে মণ্ডিত হোয়ে উঠেছিল। তাঁরা এ সকল কথা বল্‌তে লজ্জা বোধ করেন--এখনকার মত তাঁদের মুখরতা নাই, কিন্তু এই স্বাভাবিক সঙ্কোচই তাঁদের প্রেমের গাঢ়তাকে আরও বেশী ক'রে প্রতিপন্ন ক'রে জানাচ্ছে।

গৌরীদানের পর বউটি সেই ছোট্ট-খাট্টো হয়েই ব'সে থাকে নি—সে বড় হয়েছে এবং যখন তার দেহ ও মনে যৌবনশ্রী ফুটে উঠেছে তখন তার চিত্তে প্রেমের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। অবরোধের আড়ালে ছিল বলে এ বিষয়টিতে যেন ভুল না হয়। ঝোপের আড়ালে প'ড়ে থেকেও গোলাপটি গন্ধ দিতে ভোলে না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ উভয়ের মনেই কোনো-কোনো স্থানে বহুর জন্য লালসা থাকে,—যাদের কামনা নিত্যই নূতনের মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করতে চায়। আধুনিক গল্প-লেখকগণের চেষ্টা হচ্ছে এই ভাবটির প্রশ্রয় দেওয়া—ইহা ভাল কি মন্দ, তা জানি না। আমাদের আইন যদি একটা গণ্ডী দিয়ে থাকে, সমাজ যদি একটা গণ্ডী দিয়ে থাকে—তবে সাহিত্যেই বা সে গণ্ডী থাকবে না কেন? তা না' হলে চারিদিকের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে যে!—এবং ফলে এই দাঁড়াবে যে ঘরে-ঘরে কলহ, খুনোখুনি এবং নীরব-চিত্তদাহে বাঙ্গলা দেশের কুঁড়েঘরগুলি একেবারে ধ্বংস পাবে। অপরাপর জাতির কর্ম্মক্ষেত্র বাইরে—সুতরাং ঘরের চিন্তায় তাদের আসে-যায় না, কিন্তু আমরা দাঁড়াব কোথায়? আমরা অতিরিক্ত-মাত্রায় রসিক সেজে যে এমন কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হ'তে পারি যে নিজের খোড়ো ঘরে দেশলাইয়ের কাটি জ্বালিয়ে তামাসা দেখ্‌বো—এটা বড় আশ্চর্য্য!

বৈষ্ণবদের কথা উঠেছে। তাদের বর্ণিত প্রেম—একটা খেয়াল নয়; সেটা প্রেমের একটা দুশ্চর তপস্যা। রাধা বনপথে ছুটে চলেছেন দেখে সখীরা বল্লে—"অমন কোরে পিছলপথে ছুটে চল্লে, তুই পড়ে যাবি ও পাথরে মাথা ঠেকে তোর প্রাণ যাবে।" রাধিকা বল্লেন—"আমি আগেই জান্‌তুম—তার বাঁশী শুনলে আমি ঘরে থাক্‌তে পারবো না, কোন্ রাস্তা ভাল কোন্ রাস্তা মন্দ তা দেখ্‌বার অবসর থাক্‌বে না; এজন্য আঙ্গিনায় জল ঢেলে সারা রাত্রি ধরে আমি পিছল-পথে চলা অভ্যাস করেছি।"

এ সকল সাধনার কথা। এই প্রেম একটা দুর্জ্ঞেয় অসীম রাজ্যে যাবার পথ;—এ পথ দিয়ে একটি লোক একবার নিজে চলে জগতকে বুঝিয়েছিলেন, বৈষ্ণব-পদগুলির অর্থ কি। উহা কাল্পনিক টীকার প্রতীক্ষা রাখে না। যে অবস্থায় এই জাতি-কুলশীল ও শাস্ত্র-বিহিত পথ-বিরোধী প্রেমের জন্ম হয়—এবং যে অবস্থায় উহা ভূতলে আবির্ভূত

হোয়ে ঊর্দ্ধলোক স্পর্শ করে—তা' প্রেমের চরম কথা। যিনি এই প্রেমের অবতার, করতাল-মৃদঙ্গ-মন্দিরার শব্দের সঙ্গে যিনি এই প্রেমের টীকা-টিপ্পনি নিজ জীবন দিয়ে ক'রে গেছেন, তাঁর চরিত প'ড়ে এই প্রেমের আলোচনা করবেন—তা না হ'লে যদি উপন্যাস-বর্ণিত নায়ক-নায়িকার প্রেমের সঙ্গে বৈষ্ণব-প্রেমের তুলনামূলক সমালোচনা কর্‌তে যান, তবে বিদ্যাপতির কথায় আমরা বল্‌বো :—

কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বারোয়ারি উপন্যাস

সেবারকার চূড়ামণি-যোগে গঙ্গাস্নানের ফলটা মৈত্রমহাশয় হাতে হাতেই পেয়ে গেলেন। যোগস্নান যে এমন অব্যর্থ ফলপ্রদ, সেটা প্রত্যক্ষ করে হরনাথ মৈত্র দু'হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কলকাতা থেকে দেশে ফিরে এলেন।

ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। সেবার চূড়ামণি-যোগে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে হরনাথ তাঁর যুবতী বিবাহিতা সুন্দরী কন্যা কমলাকে কলকাতায় রেখে এলেন। হরনাথের স্ত্রীর সঙ্গে এই সুযোগে কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় করে নেবার জন্য তাঁদের গ্রামের অনেকগুলি স্ত্রীলোকও সঙ্গে এসেছিলেন। স্নানের পর পরস্পরের আঁচলে গেরো বেঁধে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে তাঁরা থেমে গেলেন। সেটা একটা চৌমাথা। সেখানে অসম্ভব ভিড় জমেছে। একজন ইংরেজ পাদ্রী সেখানে দাঁড়িয়ে বাংলায় বক্তৃতা দিচ্ছিল—হে বাঙ্গালার মনুষ্যসকল, তোমরা কি! তোমাদের কি সামান্য বুদ্ধি-শক্তিও নাই? গঙ্গাস্নান করিলেই যদি মনুষ্য স্বর্গে যাইতে পারিত, তবে ত গঙ্গাবাসী কুম্ভীর, হাঙ্গর ও ইলিশ মৎস্যের অত্যাচারে দেবতারা স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত। তোমাদের বিবেচনা-শক্তি কি শয়তানে একেবারে হরিয়া লইয়াছে? যে গঙ্গায় স্নান করিলে ধৌত বসন মলিন হইয়া যায়, সে গঙ্গায় স্নান করিলে মনের ময়লা কিরূপে ধৌত হইতে পারে?"—ইত্যাদি। সাহেবকে ঘিরে এত লোক দাঁড়িয়েছে যে তার মধ্যে দিয়ে পথ করে বেরিয়ে যাওয়া এক রকম অসম্ভব। সবাই দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, কেউ বা সাহেবের মুখে বাংলা বুলির তোড় শুনে অবাক হচ্ছে, কেউ বা তার যুক্তি শুনে হাততালি দিচ্ছে।

মৈত্র মশায় মেয়েদের আগে আগে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে চলেছিলেন আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাদের সাবধান

করে দিচ্ছিলেন। এই জায়গাটাতে এসে তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে দিলেন—বেশ সাবধানে হাত-ধরাধরি করে থেকো।

ঠিক সেই সময়ে একটা লোক হঠাৎ এক চড় মেরে পাদ্রীর মাথার টুপিটা উড়িয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে আরো কতকগুলো ছোঁড়া সেই পাদ্রীর দলের উপর গিয়ে পড়ল। তারপরে দুই দলে হাতাহাতি জুতোজুতি সুরু হয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে কে যে কোথায় গিয়ে পড়ল তার ঠিকানা নেই। হরনাথ তাল সামলাতে সামলাতে প্রায় আধপোয়া রাস্তা দূরে গিয়ে পড়লেন। কাছেই একটা ঘোড়-সওয়ার পুলিশ রাস্তার উপর ছবির মতন দাঁড়িয়েছিল। মারামারি চলেছে দেখে সে ঘোড়া-সমেত একেবারে সেই ভিড়ের মধ্যে এসে পড়তেই যে-যার পালাতে আরম্ভ করলে। কাদা ছেটকানোর মতন চতুর্দ্দিকে মানুষ ছিটকে পড়তে লাগল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে সেখানকার হট্টগোল একেবারে সাফ হয়ে গেল।

মৈত্র মহাশয় আবার মেয়েদের জড় করে বল্লেন—এই দিক দিয়ে এস—

মৈত্র-গিন্নী চাপা গলায় স্বামীকে ডেকে বল্লেন—ওগো কম্‌লি কোথায়? তাকে যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—

—কি আপদ, সে আবার গেল কোথায়? তখন থেকে বলছি, সব সাবধানে চল—

হরনাথ প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকলেন, —কম্‌লি—কমলা।

কোথায় কমলা! সেই চেঁচামেচিতে কেউ কি কারো ডাক শুনতে পায়?

মেয়েদের একপাশে দাঁড় করিয়ে হরনাথ তখনি সেই বিশাল জনসমুদ্র হাতড়ে ঠেলে তোলপাড় করে বেড়াতে লাগলেন। মাথায় পাগড়ী বুকে জরির হরফের তক্‌মা লাগান ভলান্টিয়ারের দল মেয়েদের গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিচ্ছিল, তিনি তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে কমলাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক ধরে চেঁচিয়েও যখন কোন কিনারা হল না, তখন মেয়েদের বাসায় রেখে এসে তিনি পুলিশে খবর দিতে গেলেন।

প্রায় মাসখানেক ধরে পুলিশ, হরনাথ আর ভলান্টিয়ারের দল কলকাতার সহর তোলপাড় করে ফেল্লে কিন্তু কমলাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। মোট কথা, যুবতী মেয়ে কলকাতার রাস্তায় এমনিভাবে হারিয়ে গেলে বাপে যা করে থাকে, তা সবই হল, হল না কেবল কমলার সন্ধান। হরনাথের সঙ্গে যাঁরা পুণ্যসঞ্চয় করতে কলকাতায় এসেছিলেন, তাদের নিয়ে তিনি দেশে ফিরে গেলেন।

চব্বিশ পরগণার কোন এক গ্রামে হরনাথের দেশ। নিজগ্রামে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি আছে। লোকটী সাদাসিদে কিন্তু বড় রাগী। মনে যা আসে তখনি সেটা ভাষায় প্রকাশ করে ফেলা তাঁর একটা বড় বদ অভ্যাস ছিল। রেখে-ঢেকে কথা বলতে তিনি পারতেন না। তাঁর কয়েক ঘর ধনী যজমান আছে। যজমানী না করলেও তাঁর সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হবার অন্য উপায়ও ছিল। হরনাথের ঊর্দ্ধতন চার-পাঁচ পুরুষ ঐ কাজ করে বেশ দু-পয়সা করে গিয়েছিলেন। নগদ টাকা ছাড়া তাঁর লাখেরাজ জমিও ছিল বিস্তর; তাই থেকে সংসার বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই চলে যেত। শাস্ত্রপাঠ ও নানারূপ ক্রিয়া-

কর্ম্মে হরনাথের বড় বেশী রকমের অনুরাগ ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যজমানী করে বেড়ালে ক্রিয়া-কর্ম্মের বিশেষ অসুবিধা হয় বলে তিনি বেছে বেছে কয়েকটী ঘর নিজের জন্যে রেখে বাকি ঘরগুলি গ্রামের অন্য অন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিলেন। গ্রামে আরও কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে। কিন্তু তাদের কারো অবস্থা হরনাথের মত স্বচ্ছল নয়। বিপদে আপদে অনেকেই তাঁর কাছে থেকে সাহায্য পেত, কাজেই দেশের মধ্যে তাঁর অনুগত লোকের অভাব ছিল না। গ্রামের সনাতন সন্ধ্যা-বৈঠকটী মৈত্র মহাশয়ের চাতালেই নিয়ম করে প্রত্যহ বসত। কাঁদতে কাঁদতে সাদাসিদে হরনাথ কমলার হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সকলের কাছে খুলে বলে ফেল্লেন। কিন্তু দেখলেন যে, কমলার কথাটা সেখানে বলবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, কারণ সকলেই এ ব্যাপার জানে; শুধু জানে যে তাই নয়, তিনি যা জানেন তার চেয়েও তারা ঢের বেশী জানে। বাড়ীর ভিতরে এসে হরনাথ গিন্নীকে ডেকে বল্লেন—এর চেয়ে মেয়েটাকে যমের হাতে তুলে দিয়ে এলেও নিশ্চিন্ত হতুম।

মৈত্র-গৃহিণীর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। পাশাপাশি শায়িত দুটী মুমূর্ষু রুগীর মধ্যে একজন মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে উঠলে আর একজন তার দিকে যে রকম দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, সেই রকম দৃষ্টিতে তিনি একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। স্বামীর যন্ত্রণায় কোনরকম সহানুভূতির কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না। কি করে কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, ব্যাপারটা তাঁর ধারণাতেই ঠিক আসছিল না। বছর কয়েক আগে বিয়ের পরদিন শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় কমলা কেঁদে বলেছিল—ওমা, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না—কলকাতার সেই বিরাট ভিড়ের মধ্যে থেকে কান্নার সেই পরিচিত সুরটা যেন তাঁর কাণে ভেসে আসতে লাগল।

বছর দশেক আগে এই গ্রামে এক গৃহস্থ পরিবারে কি একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল, তাই নিয়ে সারা গ্রামে দু-তিন বছর ধরে খুব ঘোঁট আর দলাদলি চলেছিল। এই সম্পর্কে দু' একটা মামলা পর্য্যন্ত আদালতে গড়িয়েছিল। তারপর এই ক' বছর কোন রকম উত্তেজনার অভাবে গ্রামের ছোট-বড় সব সম্প্রদায়ই কেমন যেন মুষড়ে দিন কাটাচ্ছিল। কমলার অন্তর্দ্ধানের দিন কতক পরেই গ্রামবাসীরা হঠাৎ বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। তাদের নির্জ্জীব রসনা অনেককাল পরে একটা নতুন রসের স্বাদ পেয়ে বেশ সজীব হয়ে উঠল।

মৈত্রজার চাতালের বৈঠক আর তেমন জমে না। ক্রমে আড্ডাটী ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সেটী অন্য আর-এক জায়গায় স্থানান্তরিত হল। কমলা সম্বন্ধে প্রত্যহ নতুন নতুন কথা আবিষ্কৃত হতে লাগল। অবশেষে একদিন জানতে পারা গেল যে যোগেন মিত্রের ছেলে হরেন বাবাজী কমলাকে সরিয়ে রেখেছে। হরেন কলকাতার কলেজে পড়ে, আগে থাকতেই নাকি তার সঙ্গে কমলার সব ঠিকঠাক করা ছিল। শুধু এতদিন সুযোগের অভাবে তারা পালাতে পারে নি, এইবার

সুযোগ পেয়ে তারা রয়েছে। অনেকদিন আগে থাকতেই কমলার সঙ্গে হরেনের প্রণয় ছিল। লুকিয়ে তাদের পরামর্শ চলত, এটাও অনেকে লক্ষ্য করেছে। তবে যোগেন মিত্রের ছেলের নামে ফস্ করে কিছু বলে ফেলতে এতদিন কেউ সাহস করে নি; আর ব্যাপারটা যে এতদূর পর্য্যন্ত গড়াবে তা কেউ ভাবেও নি। তবে কি না, যখন এতটা হল, তখন আর না বলে চুপ করে থাকাটা ভাল দেখায় না, তাই শশী মুখুয্যে একদিন সন্ধ্যা বেলায় প্রায় জন-পনেরো-ষোলো লোকের কাছে খুব গোপনে এই বার্ত্তাটী প্রকাশ করে ফেল্লে। সঙ্গে সঙ্গে শশী সবাইকে বলে দিলে—দেখো, যেন কথাটী প্রকাশ না হয়। তা হলে যোগেন মিত্তির আর আমার ঘাড়ে মাথা রাখবে না। জান ত আমি তার কাছে চাকরি করি—

শশী মুখুযো গ্রামের জমিদার যোগেন মিত্রের খাতাঞ্জিখানায় কাজ করত। কিছু-দিন আগে গ্রামের এক আধা-বয়সী, কৈবর্ত্ত বিধবার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই নিয়ে মৈত্র মশায় শশীর বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ হয়ে কৈবর্ত্ত-রমণীর প্রতি অনুরাগী হওয়ার জন্য তিনি তাকে সামাজিক দণ্ড দিতেও চেষ্টা করেছিলেন। এই জন্য হরনাথের উপর শশীর মনের ভাব বিলক্ষণই তিক্ত ছিল। সে অনেকদিন থেকেই তার উপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এতদিন পরে সে সুযোগ মিলল।

হরনাথের সেই ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবার জন্য সেদিনকার সন্ধ্যা বৈঠকে শশী যে কথাটী বলেছিল, সেটী তার তার নিছক কল্পনা নয়।

হরেন ও কমলা প্রতিবেশী। ছেলেবেলা থেকেই তাদের দুজনের মধ্যে ভাব ছিল। এক গ্রামেরই ছেলে-মেয়ে, শিশু কাল থেকে এক জায়গায় তারা বেড়ে উঠেছে, এক সঙ্গেই খেলা করেছে, এক পুকুরে এক সঙ্গে সাঁতার কেটেছে। গ্রামের অন্য মেয়েদের সঙ্গে যে হরেনের ভাব ছিল না তা নয়, তবে কমলাদের বাড়ী তাদের পাশেই—সেইজন্যে তাদের মধ্যে মেশামেশিটা বেশী ছিল। কাজেই অন্য মেয়েদের চেয়ে কমলার সঙ্গে হরেনের ভাব একটু বেশী হবার সুযোগও ঘটেছিল।

এই ঘটনার বছর কয়েক আগে একদিন কি কারণে হরেন স্কুলে যায় নি। দুপুর বেলাটা বাড়ীতে বসে না থেকে সে মৈত্রদের খিড়কীর বাগানে ঢুকে একটা পেয়ারা গাছে চড়ে মনের সুখে ডাঁসা পেয়ারা চিবোচ্ছিল, এমন সময় সে দেখতে পেলে, যে কমলা বাগানের একধারে দাঁড়িয়ে কি একটা চিঠি পড়ছে। কমলা তখন সদ্য শ্বশুর-বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে, কার চিঠি সে এত মন দিয়ে-পড়ছে, সেটা বিচক্ষণ হরেনের মস্তিষ্কে আসতে বেশী দেরী হল না। পেয়ারা চিবোতে চিবোতে তার মাথায় দুষ্ট-সরস্বতী চাপল। সে গাছ থেকে নেমে পা টিপে টিপে কমলার পিছনে গিয়ে খপ্ করে তার হাত থেকে চিঠিটা ছোঁ মেরে নিয়ে একেবারে দৌড় দিলে। কমলা এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে ফিরে দেখলে, হরেন তার চিঠিটা কেড়ে নিয়েছে। লজ্জায় তার মুখ দিয়ে প্রথমটা কোন কথা বেরুল না। তারপর

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কমলা বল্লে—হরেন দা, চিঠি দিয়ে দাও—ভাল হবে না, বলচি—

হরেন নির্ব্বিকার চিত্তে বাঁ হাতের পেয়ারাটাতে একটা কামড় মেরে কমলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করলে—

—প্রাণের কমল—

কমলা আর সহ্য করতে না পেরে চিঠিখানা কেড়ে নেবার জন্য হরেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হরেনও নাছোড়বন্দা—দুজনে যখন চিঠি-কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত, এমন সময় তারা দেখতে পেলে, কমলাদের খিড়কার ধারের রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে শশী মুখুয্যে একদৃষ্টে তাদের পানেই তাকিয়ে রয়েছে। শশীকে দেখেই হরেন চিঠিখানা ফেলে দিয়ে সে তল্লাট থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কমলা চিঠিখানা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর চলে এল।

সেদিন সমস্ত-ক্ষণ হরেনের মনটা ভয়ে ভয়ে কাটল। তার মনে হচ্ছিল, খেয়ালের মাথায় কাজটা করে ফেলা ভাল হয় নি। হরেনের বাবা ভয়ানক কড়া লোক ছিলেন, তিনি যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারেন যে, সে মৈত্রদের কমলার সঙ্গে চিঠি-কাড়াকাড়ি করছিল, তাহলে আর তিনি তাকে আস্ত রাখবেন না। কমলার সঙ্গে আপোষ করে ফেলবার জন্য সে সেই দিনই সন্ধ্যা বেলা তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাকে বল্লে—কম্‌লি, কাউকে বলিস্ নে যেন ভাই—

কমলার রাগ তখনো পড়োন, সে বল্লে—না, বলবে না বৈ কি! দাঁড়াও, কালই আমি গিয়ে মাসিমাকে বলে দিয়ে আসব।

হরেন অনুনয় করে বল্লে—তোর পায়ে পড়ি ভাই, লক্ষীটি, আর কক্ষনো তোর চিঠি পড়ব না।

অনেক কষ্টে কমলাকে ঠাণ্ডা করে সে বাড়ী ফিরল, কিন্তু শশীকে ঠাণ্ডা না করা অবধি সে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

শশীর চেহারাটা অত্যন্ত কদাকার, তার উপরে তার একটা চোখে ছানি ছিল। গ্রামের ভাল ছেলেরা আড়ালে আর দুষ্টু ছেলেরা সামনেই তাকে কাণা-শশী বলে ডাকত। হরেনও শশীকে দু' একবার কাণা-শশী বলে ডেকেছে। সে জানত যে, এবার শশী আর তাকে ছাড়বে না। ক'দিন দারুণ দুর্ভাবনায় দিন কাটাবার পর হরেন যখন দেখলে যে শশী সে কথাটা নিয়ে কোনরকম উচ্চ-বাচ্য করলে না, তখন সে নিশ্চিন্ত হল।

শশী কিন্তু যে ব্যাপারটা সেদিন নিজের চোখে দেখেছিল, সেটা ভুলতে পারলে না। হরনাথের উপর তার যে-রকম আক্রোশ ছিল, তাতে সেই দিনই সে একটা কুৎসা রটিয়ে দিত, কিন্তু এর মধ্যে তার মনিব-পুত্র থাকাতেই সব মাটী হয়ে গেল। সেই থেকে সে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ কমলা হারিয়ে যাওয়ায় সে সেই পুরোণ ঘটনার সঙ্গে যোগ রেখে একটা গল্প বানিয়ে তা' প্রচার করে দিলে।

২

যোগেন মিত্র এই গ্রামের জমিদার। একালের শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তিনি একালের শিক্ষার উপর বিষম চটা ছিলেন।

যোগেন নিজের হাতে সমস্ত জমিদারী দেখতেন। তিনি নিজে যা বুঝতেন তার উপর অন্য কারো কথা বলবার যো ছিল না। এই স্বভাবের জন্য যোগেন জীবনে অনেকবার ঠকেছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর স্বভাবের কোন রকম পরিবর্ত্তন হয় নি। গ্রামে তাঁর অসীম প্রতিপত্তি ছিল। এক কথায়, তাঁর ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত। ছেলে বেলায় পিতা-বর্ত্তমানে যোগেন কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতেন। হঠাৎ কি কারণে পড়াশুনা ছেড়ে দেশে ফিরে এসে বাপকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি আর পড়বেন না, নিজেদের জমিদারীর কাজ দেখবেন। যোগেনের বাবা ছিলেন, সেকেলে মানুষ। ছেলের এই মতিগতি দেখে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে তখনি তাকে কাজে লাগিয়ে দিলেন। সেই থেকে যোগেন নিজের জমিদারী চালিয়ে আসছেন। পিতার অবর্ত্তমানে সে সম্পত্তি বেড়েই চলেছে, ক্ষতি কিছুমাত্র হয় নি। কলকাতা নামক স্থানটীর উপর যোগেন হাড়ে-চটা ছিলেন। সেখানকার নাম শুনলেই তিনি এমন সব আপত্তিকর কথা বলতেন যে সে সব কথা শুনলে অতি নিরীহ কলকাতাবাসীর পক্ষেও ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ত। নিজ-গ্রামে তাঁর প্রতিপত্তির অন্ত ছিল না, আর নিজের বাড়ীতে আড়ালেও তাঁর নিন্দে করতে কারো সাহস হত না। হরেন স্কুল থেকে পাশ করে বেরোবার পর যোগেন তাকে দপ্তরের খাতা চাপা দেবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কি কারণে ঠিক জানা যায় না তিনি তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে সম্মত হয়ে তাকে কলেজে পড়তে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

হরেনের ইচ্ছে ছিল, সে কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়বে। কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবার পর তার বাবা বল্লেন, এবার জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম শিখতে আরম্ভ কর! পিতার মুখের উপরে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলবার মতন সাহস হরেনের কেন, সে বাড়ীর কারো ছিল না। তবুও একবার সে মাকে দিয়ে তার মনের ইচ্ছাটা কর্ত্তাকে জানিয়ে দিলে।

যোগেনের মেজাজটা সেদিন কেন যে অত ভাল ছিল, তা তাঁর স্ত্রীও বুঝতে পারলেন না। তিনি এক রকম হাল ছেড়ে দিয়েই কথাটা স্বামীর কাছে পেড়েছিলেন। কিন্তু আরজী পেশ হতে না হতেই সেটা পাশ হয়ে গেল দেখে তিনি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। গিন্নীর মার-প্রাণে কে যেন ভিতর থেকে বলতে লাগল যে তাঁর হরেন ভবিষ্যতে নিশ্চয় একটা বড়লোক হবে তাই ঠাকুর দয়া করে কর্ত্তার এমন সুমতি দিয়েছেন।

কমলার অন্তর্দ্ধান হওয়ার কথাটা গ্রামের ভদ্রলোক এমন কি চাষা-ভুষোদের মধ্যে প্রচার হয়ে গেলেও গ্রামের জমিদার যোগেন মিত্তিরের কাছে সেটা আশ্চর্য্য রকমে গোপন রইল। যোগেন বাবু অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে তিলটি পর্য্যন্ত নিজের অস্তিত্ব গোপন করে পালাতে পারত না। কিন্তু এই সংবাদটা কেমন করে তাঁর কর্ণকুহর ডিঙ্গিয়ে একেবারে অন্দর-মহলে গিয়ে প্রবেশ করলে।

জমিদার বাড়ীর গৃহিণী হলেও যোগেনের স্ত্রী উমাসুন্দরীর নিজের কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। যোগেনের কড়া মেজাজ আর শাসনের আব-হাওয়ায় থেকে সে বাড়ীতে কারো ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠবার অবকাশ পেত না। তিনি ঘর আর বাইরের এমন মালিক ছিলেন যে সেখানে উমাসুন্দরীর মতন ভাল মানুষের নিজে বুঝে কোন কাজ করবার উপায়ও ছিল না। তাঁর কাছে যখন খবর এল যে, তাঁর ছেলে ওবাড়ীর কমলাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, তখন তিনি মর্ম্মাহত হয়ে পড়লেন। কথাটা স্বামীকে জানাবার যো নেই, তাহলে হয়ত নিজের সর্ব্বনাশই টেনে আনা হবে, কারণ যোগেন ত প্রথমে হরেনকে কলকাতায় পাঠাতে চায়নি, শুধু তাঁরই অনুরোধে তিনি রাজী হয়েছিলেন। তারপর এই সংবাদ পেলে তিনি হরেনের উপর কি রকম শাস্তির বন্দোবস্ত করবেন, সেটা উমাসুন্দরী কল্পনাতেও আনতে পারলেন না। হয়ত তিনি রাগের মাথায় হরেনকে বিষয়-চ্যুত করবেন। নিজের ব্যক্তিগত কোন মত না থাকলেও মা হয়ে সেটা কেউ সহ্য করতে পারে না। একবার তাঁর মনে হল, লুকিয়ে হরেনকে একখানা চিঠি লিখে সংবাদটা সত্যি কি না তার সন্ধান করলে বোধ হয় ভাল হয়। হরেন যে এতবড় একটা কাণ্ড করে ফেলেছে, সেটা তাঁর মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিল না। যে ব্যক্তি এই সংবাদটি উমাসুন্দরীর কাছে প্রকাশ করে ছিল, সে বলেছিল, ইতিপূর্ব্বেই হরেনের সঙ্গে কমলার প্রণয় ছিল। কিন্তু মা হয়েও ঘুণাক্ষরে সে প্রণয়ের কথা জানতে পারেন নি ভেবে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। আবার ভাবলেন, হয়ত বা হতেও পারে,—কোন্ মা আর নিজের ছেলেকে এ বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে? হরেনকে চিঠি লেখবার কথা মনে হতেই আর-এক সমস্যা এল, চিঠি কে লিখে দেবে? আর চিঠি লিখলেও কর্ত্তার হুকুম আর পাঠ না হলে কোন চিঠির ত দেউড়ী পার হবার উপায় ছিল না।

এই সত্য-মিথ্যা আশা-নিরাশার দারুণ তোলাপাড়া বুকে নিয়ে উমাসুন্দরী দিন কাটাতে লাগলেন। জমিদার বাড়ীতে জমিদার সম্পর্কীয়া অনেক মেয়ে বাস করতেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে নিজের ছেলের সম্বন্ধে এই বিষয় নিয়ে কোন মন্ত্রণা কি আলোচনা তিনি করতে পারতেন না। এই চিন্তা আর তার জন্যে মার প্রাণে যে অসহ্য যন্ত্রণা,—সেটা তাঁকে একাই ভোগ করতে হত। ওদিককার মৈত্র গৃহিণীর চেয়ে উমাসুন্দরীর মানসিক কষ্টটা কম ছিল না। উমাসুন্দরীর ইচ্ছা হচ্ছিল, একবার কমলার মার কাছে গিয়ে রহস্যটা বেশ ভাল করে বুঝে আসেন। তাঁরা দুজনেই সেই ছেলেবেলায় বৌ-অবস্থায় এই গ্রামে এসেছিলেন। নববধূর সেই অসহায় অবস্থা থেকে আজ পর্য্যন্ত সুখে দুঃখে তাঁদের প্রণয় বেড়েই চলেছিল, হঠাৎ এই কাণ্ডটা হয়ে যাওয়াতে কমলার মার কাছে তাঁর মুখ দেখাতে লজ্জা করতে লাগল। মৈত্র-গৃহিণী আগে প্রায় রোজই দুপুর বেলা একবার করে পাড়া বেড়াতে বেরুতেন, কিন্তু তীর্থ থেকে অত বড় লজ্জার ডালি মাথায় নিয়ে দেশে ফিরে আসবার পর তাঁকে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যেত না।

কমলার কথা নিয়ে গ্রামের মধ্যে যে ঘোঁট আর আন্দোলন চলেছিল, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই সেটা নিভে আসতে লাগল। গ্রামের বৃদ্ধেরা প্রথমে কথাটা নিয়ে বেশ হৈ-চৈ বাধিয়ে ছিলেন; কিন্তু যোগেন মিত্রের ছেলের নাম শুনে হঠাৎ তাঁরা যেবার বেমালুম চেপে গেলেন। যুবাদের দল থেকে নামতে নামতে কাহিনীটা শেষে দেশের ছেলেদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কমলার একটী ছোট ভাই ছিল, তার নাম অরুণ। অরুণ হরেনের ভাই নরেনের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত। দিদি কলকাতায় হারিয়ে যাওয়ার পরে তাদের বাড়ীতে ও বাইরে যে ব্যাপার চলেছিল, নিতান্ত বালক হলেও অরুণের সেটা বোঝবার বয়স হয়েছিল। এর মধ্যে কতখানি লজ্জা আর কতটা সামাজিক লাঞ্ছনা তাদের ভোগ করতে হচ্ছে, আর তার মধ্যে কতটুকু বা তার প্রাপ্য, সেটা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করত। স্কুলের মাষ্টাররা পড়াতে পড়াতে এক একবার আড়-চোখে, কখনো বা স্থির দৃষ্টিতে যখন তার মুখের দিকে তাকাত কিংবা সমপাঠীরা যখন তার দিকে চেয়ে বা তাকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে নানা কথা বলাবলি করত, কাণে তা শুনতে না পেলেও অরুণের বুকের মধ্যে তখন এমন একটা জায়গায় গিয়ে সে কথাগুলো বাজতে থাকত যে তার বেদনায় সে বেচারী অস্থির হয়ে উঠত। বুকের মধ্যে লজ্জা আর অপমানের এই দারুণ বোঝাটা তাকে একলাই বয়ে নিয়ে বেড়াতে হত, কারণ তার যে বয়স এবং যে অবস্থা, তাতে প্রাণের বন্ধু পাওয়া শক্ত। অরুণ তার বাপ-মাকে তার দিদির কোন কথা জিজ্ঞাসা করত না। তাঁরা যে কষ্ট ভোগ কচ্ছেন, তা দুবেলা সে নিজের চোখেই দেখতে পেত, এটুকু সে বুঝত যে সে কিছুই জানতে চাইলে তাঁরা বেশী কষ্ট পাবেন—এই ভেবেই সে চুপ করে থাকত।

অরুণের দিদি আর নরেনের দাদাকে নিয়ে লোকের মুখে-মুখে যে কুৎসাটা রটেছিল, তাতে অরুণ আর নরেন দুজনেরই মনের অবস্থা সমান হওয়া উচিত ছিল। কথাটা যখন প্রথম প্রচার হয়েছিল, তখন অরুণের দেখা-দেখি নরেনও লজ্জায় মুষড়ে পড়েছিল; কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই ক্লাশের ছেলেরা তাকে বুঝিয়ে দিলে, এর মধ্যে তার লজ্জা করবার কোন কারণ নেই; কারণ মেয়ে যে-তরফের, লজ্জাটাও যে সেই তরফের। ক্রমে এমন দিন এল, যখন ক্লাশের ছেলেরা নরেনের দাদার বাহাদুরী দিতে আরম্ভ করলে। স্কুল বসবার আগে ছেলেদের মধ্যে যখন এই নিয়ে গল্প চলত আর তারা যখন হরেনকে বাহাদুর ছেলে বলে তারিফ করত, তখন এমন দাদার ভাই মনে করে নরেনও মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করতে লাগল। হয়ত ক্লাসের ছেলেরা কমলা-সম্বন্ধে আলোচনা করছে,—তার মধ্যে কেউ একটা বিশ্রী রহস্য করে উঠল, তাতে সমস্ত ছেলে অমনি একেবারে ছাত ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছে, এমন সময় ধীর ভাবে ম্লান মুখে এসে অরুণ ক্লাসে ঢুকল। হঠাৎ সে হাসি থেমে গেল, কেউ হয়ত তখনো হাসি থামাতে পারে নি, মুখে কাপড় দিয়ে আড় চোখে অরুণের দিকে তাকিয়ে তখনো হাসছে,—কিসের কথা চলছিল, কিসের জন্য এত হাসি, সেটা জানতে না পেলেও ব্যাপার বুঝতে

তার দেরী হত না। কখন কখন এমনও হত যে ছেলেরা অন্য কথা নিয়ে হাসি-তামাসা করছে—কিন্তু সে মনে করত যে তার দিদির কথা নিয়েই আলোচনা চলেছে। এ রকম দুঃসহ জীবন যাপন করা ক্রমে সে বেচারার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। অরুণ মনে মনে ভাবলে যে, সে আর স্কুলে যাবে না। কাউকে না জানিয়ে একলা কলকাতায় গিয়ে সে দিদির সন্ধান করবে।

একদিন সকাল বেলা স্কুলে যাবার সময় সে তার মাকে জানিয়ে দিলে যে আজ থেকে সে আর স্কুলে যাবে না। পড়া-শুনার উপর তার খুব মনোযোগ ছিল, অন্য ছেলেদের মত সে কখনো স্কুলে যেতে আপত্তি করে নি। স্কুলে যাবে না শুনে মা জিজ্ঞাসা কল্লেন—স্কুলে যাবিনা কেন রে? কি হয়েছে?

এ কেনর কোন জবাব ছিল না। কি যে হয়েছে তা সকলেই জানে অথচ মুখ ফুটে কারো বলবার কিছু নেই। অরুণ এই কেনর জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে অশ্রুসিক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—স্কুলে যাবিনে কেন, বাবা? কি হয়েছে?

অরুণ একেবারে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বল্লে—তোমার পায়ে পড়ি মা, আর আমায় তুমি স্কুলে যেতে বলোনা।

এতদিন ধরে স্কুলে তার উপর যে পীড়ন চলছিল, আবেগের মুখে তা সে সব খুলে বল্লে। ছেলের কথা শুনে মাও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। মৈত্র মশায় বাইরের চাতালে বসে কি করছিলেন, হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনে তিনি ভিতরে এসে স্ত্রীর কাছ থেকে ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন; তারপর ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

যোগেন মিত্তির তখন সবেমাত্র দপ্তরে এসে বসেছেন। ফরাসের উপর একটা উঁচু জায়গায় তাকিয়া হেলান দিয়ে তিনি ফর্সীতে তামাক টানছিলেন, আর চারদিকে আট দশ-জন কর্ম্মচারী এদিক ওদিক ছড়িয়ে বসে আছে, তাদের আশে-পাশে ছোট লম্বা বেঁটে নানান্ আকারের খাতা ছড়ানো রয়েছে—তার মধ্যে কতগুলো খোলা, কতকগুলো বন্ধ। কাজ চলেছে, দপ্তর জম্‌জম্ করছে—এমন সময় ঝড়ের মত ছুটে হরনাথ সেই ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর সে মূর্ত্তি দেখে দপ্তরের সবাই ভয় পেয়ে গেল। ডান হাতে পৈতেগাছা জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে হরনাথ যোগেনকে বল্লেন—মশায়, এর একটা প্রতিকার করুন। আপনি গ্রামের জমিদার, আমাদের রক্ষক, কি দোষে আমার উপর এতটা অবিচার চলেছে, সেটা আমি জান্‌তে চাই।

হরনাথের কথাবার্ত্তা আর ঐ রকম মূর্ত্তি দেখে দপ্তরের সবাই তাঁর আসার কারণ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু যোগেন মনে করলেন, হয়ত জমিজমা নিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কারো গোলমাল বেধেছে। তিনি তাঁকে বসতে জায়গা দিয়ে বল্‌লেন—বসুন, বসুন, অত উত্তেজিত হয়েছেন কেন? ব্যাপার কি, খুলে বলুন দেখি।

হরনাথের চোখ দিয়ে তখন আগুন বেরুচ্ছিল, তিনি চীৎকার করে বল্লেন—ব্যাপার খুলে বল্‌তে হবে? কি হয়েছে, তা গ্রামের কে না জানে!

যোগেন কোন বিষয়ে বেশী ভণিতা করা

আদৌ পছন্দ করতেন না। বিরক্ত হয়ে কর্ম্মচারীদের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মৈত্র মশায়ের কি হয়েছে, তোমরা কেউ জানো?

কর্ম্মচারীদের অধিকাংশই তখন খাতায় মুখ জুব্‌ড়ে একমনে কাজে লেগে গেছে। দু'-একজন তাঁর গলা শুনে খাতা থেকে মুখ তুলে মুখের উপর এমন একটা ভাব আনলে, যেন মনে হল, তারা এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানে না।

শশী বরাবরই কর্ত্তার চোখের আড়ালে এক কোণে বসে কাজ করত। হরনাথের আগমনে তার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠেছিল। তার মনে হল, এবার বুঝি সাত পুরুষের বাস্তু ভিটের মায়া ত্যাগ করতে হল। মনে মনে দেবতার নাম স্মরণ করে সে খাতায় নাক ঘসতে লাগল।

বিরক্ত হয়ে যোগেন বল্লেন—কৈ মশায়, কেউ ত কিছু জানে না। আপনিই খুলে বলুন।

হরনাথ বল্লেন—কমলাকে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা জানেন ত?

যোগেন এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এঁ্যা, কমলি! কেন, সে কোথায় গেছে!

—কোথায় গেছে! আপনার গুণধর পুত্র তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। এই বলে হরনাথ কমলার অন্তর্দ্ধানের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলে গেল।

যোগেন জীবনে কখনো এত আশ্চর্য্য হন্‌নি। সব চেয়ে তাঁর আশ্চর্য্য লাগল এই যে, কথাটা গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই জানে, তিনিই জানেন না, অথচ তাঁর বাড়ীর সঙ্গেই এই বিশ্রী ব্যাপারটার এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যোগেনের মনে হতে লাগল, হয়ত আরও কত কথা, কত ব্যাপার তাঁর বাড়ীতে ও গ্রামে তাঁর চোখ-কাণের অন্তরালে হয়ে যাচ্ছে। নলটা মুখ থেকে জোর করে ছুঁড়ে ফেলে তিনি ডাক দিলেন—শশী—

শশী ততক্ষণ নিজের হাতে নাক-কাণ মলে রণচণ্ডীর দোহাই পাড়ছিল, কর্ত্তার আওয়াজ শুনে কুঁজো হয়ে হাত দুটো জোড় করে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে কর্ত্তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

যোগেন বল্লেন—এ সম্বন্ধে যা জান, সমস্ত কথা খুলে বল। একটি কথা গোপন করলে তোমাকে এ গ্রাম-ছাড়া করব। আমার নাম যোগেন মিত্তির—

দপ্তরের সবাই মনে করলে, আজ বুঝি তাদের সামনে একটা ব্রহ্মহত্যা হয়! সকলে নিশ্বাস হয়ে শশীর সেই গরুড়ের মতন মূর্ত্তির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

সন্ধ্যা বৈঠকে সকলকার সামনে শশী গোপনে যে বার্ত্তাটি প্রকাশ করেছিল, এতদিনে তার সব কথাগুলো ভাল করে মনেও ছিল না। কাজে কাজেই কাঁপুনির সঙ্গে আমতা-আমতা করতে করতে কমলা ও হরেন সম্বন্ধে সে দস্তুর-মতন একটি নূতন ইতিহাস সদ্য সদ্য বানিয়ে বলে দিলে। শশী বল্লে—হরনাথ দেশে ফিরে আসার পর তার মামাতো ভাইয়ের শালা পশ্চিম যাচ্ছিল, সেই ট্রেণে সে হরেন আর কমলাকে যেতে দেখে তাকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়েছিল।

যোগেন তক্তাপোষের উপর প্রচণ্ড একটা

ঘুসি মেরে বল্লেন—উল্লুক, এ কথা আমায় এতদিন বলনি কেন?

শশী টাল খেতে খেতে চার পাঁচ পা পিছনে সরে গিয়ে বল্লে—আজ্ঞে, ভয়ে কর্ত্তা।

যোগেন আর কাউকে কিছু না বলে দপ্তর ছেড়ে উঠে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন।*

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

বৈদিক দেব-নামানুসারে খৃষ্টধর্ম্মের একটী ঈশ্বর-নাম

খৃষ্টধর্ম্ম, ধর্ম্মের নূতন সংস্করণ, অথচ ইহা আর্য্য জাতীয়দিগের উদ্ভাবিত ধর্ম্ম নহে। ইহা সেমিটিক জাতির উদ্ভাবিত ধর্ম্ম, সুতরাং ইহাতে যে আর্য্য-সাধারণ কিছু থাকিতে পারে, তাহা সহজে প্রত্যয়যোগ্য হইবার কথা নহে। কিন্তু পুরাণ ও ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মের প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে আর্য্য ধর্ম্মের নিদর্শন খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান ঈশ্বর-তত্ত্বের সংস্রবেই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা সেই প্রমাণই উপস্থিত প্রসঙ্গে প্রদর্শন করিব।

'ভগ' বেদের অন্যতম প্রাচীন দেবতা। তিনি আদিত্য-দেবতা বিশেষ। তিনি পাশ্চাত্য বৈদিক পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের ভাগ্যদেবতা (God of fortune) বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। অধ্যাপক-প্রবর বেদজ্ঞ ব্লুমফিল্ড্ সাহেব তদীয়—"The Religion of the Veda" ('বেদের ধর্ম্ম') নামক পুস্তকে ভগ যে কেবল ভারতীয় দিগেরই প্রাচীন দেবতা নহেন, পরন্তু পারসীক ও পাশ্চাত্যদিগেরও দেবতা, সে সম্বন্ধে স্পষ্টই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

"Bhaga, 'Fortune' is not only Indo-Iranian but even Indo-European." The Religion of the Veda by Maurice Bloomfield P. H. D. L. L. D. P. 130.

তিনি বিভিন্ন ভাষার তুলনা দ্বারাই তদীয় উপরি-উদ্ধৃত মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এস্থলে তদীয় উক্ত তুলনাটী উদ্ধৃত হইতেছে:—

---

* এই উপন্যাস আগাগোড়া একজন না লিখিয়া প্রতিমাসে বিভিন্ন লেখক ইহাকে অগ্রসর করিতে থাকিবেন। প্রতিবার নূতন হাতের ইঙ্গিতে চালিত হইয়া ইহা কত বিচিত্র পথে ঘুরিবে এবং কোথায় কি ভাবে সমাপ্ত হইবে, তাহা এখন কাহারো অনুমান করিবার যো নাই;—না লেখক, না পাঠক! লেখকদের মধ্যে আমরা কয়েকজন নামজাদা ঔপন্যাসিককে পাইয়াছি। তাঁহাদের নাম ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আগামী সংখ্যায় লিখিবেন—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

"On more limited Indo-European territory appears another general term, Slavic bogu, old Persian baga, Avestan bagha "god," Sanskrit bhaga "god of fortune." Ibid P. 109.

পাশ্চাত্য অধ্যাপক মহোদয় 'ভগ' নামে মঙ্গল বা শ্রেয়: দাতার ভাব যেমন দেখিতে পাইয়াছেন, তেমনই ইহাতে নিত্যজাগ্রত মানব-হিতেচ্ছার ভাবও সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাইয়াছেন। এই প্রকারে 'ভগ' নামে মঙ্গলময় ঈশ্বরের তাত্ত্বিক ধারণা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"The word is again of clear origin: It means spender of goods, or blessings. It contains the abstract conception of a good God, embodying an eternal and never-slumbering wish of mankind." Ibid P. 109.

আমাদের সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে 'ভগ' নামের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণের চেষ্টা করিলে, আমরা অধ্যাপক মহোদয়ের কৃত ব্যাখ্যা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি। অধ্যাপকবর যে 'ভগ'কে ভাগ্য-দেবতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ভাগ্য শব্দ যে ভগশব্দের যৌগিক (derivative) শব্দরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ভগ' শব্দের যৌগিকশব্দরূপে 'ভাগ' শব্দও সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। এই ভাগ শব্দও ভাগ্য অর্থেরই প্রতিপাদক। 'মহাভাগ' শব্দে ভাগ শব্দের ভাগ্যার্থের প্রয়োগই দেখা যায়। ইহা হইতে 'ভগ' যে ভাগ্য-বিধাতা দেব তাহা বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। 'ভগ' শব্দের যৌগিক শব্দ ছাড়িয়া, যথা ভগ শব্দটীর মূলার্থ বিচারের দ্বারা ইহার একটী নূতনার্থের সন্ধান আমরা পাইতে পারি। 'ভগ' শব্দ ভজ্ ধাতু হইতে নিষ্পাদিত হইয়াছে। এই ভজ্ ধাতুর অর্থ 'ভজনা,' উপাসনা। সুতরাং 'ভগ' শব্দের বুৎপত্তি-গত অর্থ হয় ভজনীয়, উপাস্য। এই মূল 'উপাস্য' অর্থ হইতে, ঈশ্বরার্থটী সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে।

'ভগ'দেবের এই বিশেষ 'উপাস্য' অর্থ দ্বারা তিনি যে বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই প্রাধান্য মূলেই যে তাঁহার নাম বৈদিক আর্য্যদিগের ন্যায় অপর আর্য্যদিগের মধ্যেও প্রচার লাভ করিবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

অধ্যাপক ব্লুমফিল্ড্ পাশ্চাত্য শ্লেভজাতি ও আসিরিক পারসীক জাতির মধ্যে 'ভগ' নামের প্রচলন প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু আসিয়া-মাইনরের গ্রীক্‌দিগের মধ্যেও যে এই নাম প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারও সন্ধান তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"The "Phrygian" Zeus Bagaios reported by the Greek glossographer Hesychios is nothing but the Persian Baga." Ibid P. 109. foot-note.

এখানে গ্রীক্‌দিগের প্রধান দেব জিউসের (Zeus) সহিতই 'ভগ' নামটী সংযোজিত

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে ভগদেবের বিশেষ প্রাধান্যের প্রমাণ যেমন পাওয়া যায়, তেমন পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে তাঁহার ঈশ্বররূপে পরিণতির যথেষ্ট আভাসও পাওয়া যায়। বস্তুতঃ 'ভগ'দেব স্লেভদিগের মধ্যে এরূপই গৌরব লাভ করেন যে স্লেভ-জাতি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও তাহাদের নবধর্ম্মের ঈশ্বরকে নবনামে অভিহিত না করিয়া তাহাদের ঈশ্বরের পুরাতন অভিধাই তাহারা তাঁহাকে প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বেদবিৎ পণ্ডিত রেগোজিন তদীয় Vedic India—(বৈদিক ভারত) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ বক্তব্য করিয়াছেন :—

A fourth, Bhaga, quite impersonal and only occasionally mentioned along with the others, is of great interest to us because of his name, which, in a very Slightly modified form, Bogh, has been adopted by the entire slavic branch of the Indo-European family of nations as that of God—the one God of Christian monotheism." Vedic India by F. A. Ragozin P. 155.

পাঁচ হাজার বৎসরেরও প্রাচীনতম বৈদিক দেবতা যে অধুনাতন খৃষ্টধর্ম্মের পরম দেবতা বা পরমেশ্বরের সহিত এরূপ সমঞ্জসীভূত হইবে, তাহাতে বৈদিক দেব-কল্পনা যে কতদূর উন্নত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত, তাহার যেমন আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া যায়, বৈদিক ধর্ম্ম যে নিত্য বা সনাতন ধর্ম্মের লক্ষণাক্রান্ত তাহারও তেমনই আশ্চর্য্য আভাস ইহা হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কাল-বৈশাখী

তেরো

বিনোদের কথা

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এটা ত জানা কথা! মানুষের মন নিয়ে এতকাল আমি মিছেই নাড়াচাড়া করি-নি! ওজন করে' করে' সব কাজ আমি করেছি! তাই আমি একটুও আশ্চর্য্য হই-নি! কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে আশ্চর্য্য হয় সেই মূর্খরা,—সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত ভেবে চিন্তে, আগে থাকতে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে যারা কাজ করতে জানে না! উকিলের ছেলে নেপোলিয়ন যদি সম্রাট হয়েছেন বলে' নিজেই বিস্মিত হয়ে যেতেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাঁর মাথা থেকে রাজমুকুট খসে পড়ত!

আমার একান্ত অবহেলায়, কঠোর ব্যবহারে, কর্কশ কথায় প্রভার মন যাতে আমার প্রতি বিরূপ হয়ে, মিষ্টভাষী, মধুর-

প্রকৃতি, রূপবান পুরন্দরের দিকে আকৃষ্ট হয়, সে-পক্ষে আমি বিন্দুমাত্র চেষ্টার ক্রটি করি-নি। পুরন্দরের সঙ্গে প্রভার মেলা-মেশাতেও আমি কোন বাধা দিই নি। তারা যখন একসঙ্গে বসে কথাবার্ত্তা কইত, আমি তখন সাধ্যমত তাদের কাছে যেতুম না। তাদের মনের স্বাভাবিক গতিকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে, আমি সুধু আড়ালে বসে তাদের উপরে নজর রাখতুম—অথচ তারা একদিনও এ সন্দেহ করতে পারে-নি যে, একজনের খরদৃষ্টির পাহারা তাদের মাথার ওপরে দিনরাত সজাগ হয়ে আছে !··· আমি কি বাহাদুর নই ?

নীতিবাগিশ চিরকাল যাদের ভয় করে' আসছেন, বিচারকরা যাদের ঠেঙিয়ে অন্ন-বস্ত্রের যোগাড় করেন, সন্ন্যাসীরা যাদের হাত এড়াতে অরণ্যে পালিয়ে যান, সংসারীরা যাদের সঙ্গে দিবারাত্র লড়ে লড়ে শ্রান্ত, আহত, পরাহত হয়ে পড়্‌ছে—সেই কুবৃত্তি-গুলিই মানুষের মনের যথার্থ স্বাভাবিক, সদা-প্রস্তুত, বলবতী বৃত্তি। সমাজ-সংসারের কৃত্রিম বিধি-ব্যবস্থায় মানুষ তার মনের সেই অস্বাভাবিকতা দমন করতে চেষ্টা পায় বটে, কিন্তু সে চেষ্টা সত্যসত্যই সফল হয় কি ? অনেক মানুষ এই কুবৃত্তিগুলিকে হাতে-নাতে কাজে খাটাতে সাহসী হয় না, জগতে তারা তাই সাধু বলে' বিখ্যাত। কিন্তু এই নিছক কাপুরুষতার সঙ্গে আসল সাধুতার তফাৎ যে আকাশ-পাতাল ! এই সাধুর দল কি নিজের বুকে হাত দিয়ে নিজের কাছে জোর করে' বল্‌তে পারে, 'পর-স্ত্রী দেখে মনে-মনেও আমি তাকে কখনো কামনা করি নি ?' হ্যাঁ, এমন সাধু হয়ত দু'চারজন আছে—কিন্তু এই বৃহৎ বিশ্বের কোটি কোটি মনুষ্যের মধ্যে তাঁরা কি গণ্য হতে পারেন ?

মহাভারতকে অনেকে দেখেন ধর্ম্ম-পুস্তকের মত, কেউ দেখেন ইতিহাসের মত, কেউ দেখেন কাব্যের মত, কেউ দেখেন রূপ-কথার মত,—আমার কাছে কিন্তু এই মহা-ভারত মনোবিজ্ঞানের একখানি মহাগ্রন্থ ! একালে অনেকেই কথায়, কাব্যে, উপন্যাসে মনোবিজ্ঞানকে ফুটিয়ে তুল্‌তে যান্, কিন্তু মহাভারতের মহাকবির পায়ের নখের সঙ্গে এঁদের কারুর তুলনা হয় না। মানুষ যে মনে মনে প্রায়-পশু, এই মহা সত্যটা মহা-ভারতের পাতায় পাতায় বুঝিয়ে দেওয়া আছে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও যে মনে মনে কত-বড় ভয়ানক কথা ভাবতেন, মানুষের স্বাভাবিক পশুত্বকে যে নর-দেবতার মত বরণীয় মুনি-ঋষিরা পর্য্যন্ত আপনাদের বিরাট জটাজুটের ভারে নিষ্পেষিত করে' ফেলতে পারেন-নি, মহাভারতের মহাকবি কবিত্বের আড়ালে সে সত্য-কথাও গোপন করেন নি ! বাস্তবিক, কী সাহস ছিল এই মহাকবির !

হ্যাঁ, ফাঁক্ পেলেই আমাদের বাইরের মনুষ্যত্বকে পায়ে দলে' ভিতরের পশুত্ব জেগে ওঠে। প্রভা যাতে সেই ফাঁকটা পায়, আমি তারি বন্দোবস্ত করেছি। ফলে যা স্বাভাবিক, প্রভা তাই করেছে।

পতন বড় সাংঘাতিক ! পাহাড়ের ধারে যে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি তার পাশে কখনো থেক না। কেননা, তোমার সঙ্গী দৈবগাতকে যদি পড়ে যায়, তাহলে পড়্‌বার সময়ে তোমাকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে !

—অতএব প্রভার সঙ্গে পুরন্দরেরও পতন দেখে আমি আশ্চর্য্য হই-নি। কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি, পুরন্দরের সততার উপর আমার কিছু কিছু বিশ্বাস ছিল। তার ঐ বলিষ্ঠ চরিত্রকে এতদিন আমি মনে মনে ভয় করতুম। ভেবেছিলুম, সহজে তাকে বাগানো যাবে না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নেমে আজ আমি দেখছি, মানুষের ওপরে এতটুকু বিশ্বাস করাও আমার পক্ষে ভ্রম হয়েছিল! এত সহজে পুরন্দর হার মান্‌লে! এককথায় পর-স্ত্রীর আলিঙ্গনে!... ...ধিক!

....শ্রীকে এতদিনে একেবারে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছি। রূপ তার অসামান্য হ'লেও শক্তি তার সামান্য, আমার এই নাগপাশের বাঁধন এড়িয়ে আর সে যাবে কোথায়? ভবিষ্যতে সে আমার—সে আমার!

ওঃ, প্রতিশোধ কি মধুর! এখনি থেকেই আমি যেন তার আস্বাদ পাচ্ছি!...

কিন্তু না, এখন আত্মহারা হবার সময় নয়, মাছ সবে টোপ গিলেছে, এখনো খেলিয়ে তাকে ডাঙায় তোলা হয়-নি, এখনো সূতো ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে পারে।... ...

—পালাবে? উঃ, এ-কথাটা মনে কর্‌তেও বুক কেঁপে ওঠে! তাহলে আমি কি বাঁচব? এ কী সাধনার ফলে আজ আমি সিদ্ধির পথে এসে দাঁড়িয়েছি, নিজের অপমানের যন্ত্রণায়, পরাজয়ের দুঃখে, নিষ্ফলতার আক্রোশে কত বৎসর আজ দীন-হীনের মত দগ্ধে দগ্ধে মরে' আসছি, তা কি আমি জীবনে কখনো ভুলব? তারপর এই অমানুষিক আয়োজন —লোকে যা ধারণা করতে পরে না, আমি তাই কার্য্যে পরিণত কর্‌তে চলেছি! আমার জীবনের সকল সামর্থ এতেই ব্যয় হয়ে গেছে যে! এ আয়োজন ব্যর্থ হ'লে, সেই দণ্ডেই আমি পাগল হয়ে যাব! পালাবে? আমার হাত ছাড়িয়ে শিকার পালাবে? না, অসম্ভব, অসম্ভব!

কিন্তু আর একবার ভেবে দেখি, চক্রান্তের খাঁচাটা রীতিমত শক্ত হয়েছে কিনা —তার মধ্যে শিকার পালাবার কোন ছিদ্র আছে কিনা?

শ্রীর কুসংস্কারে সুবিধা পেয়ে পুরন্দরের অ্যারারুটে আমি আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছি। শ্রী ভাবছে, এটা তার স্বামীকে বশ করবার ওষুধ! তাকে আমি বলেছি, এ ওষুধটা শ্রী যদি নিজের হাতে স্বামীকে খাইয়ে না দেয়, তাহলে এতে কোন ফল হবে না! এতক্ষণে শ্রী নিশ্চয়ই আমার কথামত কাজ করেছে।

আমাকে আরো দু-একবার আর্সেনিক ব্যবহার কর্‌তে হবে। একেবারে বেশী করে' দিলে ব্যাপারটা সন্দেহজনক হয়ে উঠ্‌তে পারে। উপস্থিত যে মাত্রায় দেওয়া হচ্ছে, পুরন্দরের দেহে তাতে কোনরকম পরিচিত রোগের সাংঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ পাবে। এই মাত্রায় অনেক সময় কলেরা বা অতি-সারের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ারও সম্ভাবনা। তাহলে ত ভারি সুবিধাই হয়! লোকের চোখে খুব সহজেই ধুলো দিতে পারব।

আমি ছাড়া এ-বাড়ীতে যাতে আর নতুন ডাক্তার না আসে, সে ব্যবস্থাও করা চাই। নিতান্ত যদি আন্‌তে হয়, তাহলে আর উপায় নেই—কিন্তু না আসাই ভালো।

অবশ্য ডাক্তার এলেই যে ভিতরের কথাটা ফস্ করে' ধরে ফেল্‌বে, সে ভয়ও কম। তবু, বলা ত যায় না—সাবধানের মার নেই!

তবে একটা কথা আমার মনে রাখা উচিত। কারুর সন্দেহ না জাগিয়ে যত-শীঘ্র কাজ হাঁসিল করা যায় ততই মঙ্গল। দেরি নয়, দেরি নয়।

পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলে, শ্রীকে আমি গ্রহণ কর্‌ব।...কিন্তু শ্রী কি আমাকে আত্মদান করবে? ঐখানেই আমার একটু খট্‌কা আছে। শ্রীর মত চরিত্রের রমণী ঠিক স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে না, অন্ধবিশ্বাস তাদের সর্ব্বস্ব। আমি হলপ করে' বল্‌তে পারি, অন্ধবিশ্বাসই অনেক রমণীর সতীত্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। নিজেদের কোন চরিত্রবল থাক্ আর না থাক্, অন্ধ-বিশ্বাসের জোরেই তারা ঠিক বাঁধা পথ ধরে চল্‌বে—সে সময়ে যমকেও তারা ভয় করবে না। শ্রীর এই অন্ধবিশ্বাস আগে আমাকে দূর কর্‌তে হবে। এটা অবশ্য একদিনের কাজ নয়; কিন্তু পরিণামে তাকে আমি বশ কর্‌বই!

আর, কিছুতেই সে যদি আমার বশ না হয়, তাহলে শেষটা আমাকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। স্বামীর মুখে স্বহস্তে সে বিষের পাত্র তুলে দিয়েছে! এ সত্য আমার মুখে তখন সে জানতে পার্‌বে! তারপর? ভীরু স্ত্রীলোক সে, পুলিসের হাতে পড়বার ভয়ে—দেশব্যাপী নিন্দার ভয়ে, সে কি তখন হতাশ হয়ে আমার পায়ের তলায় এসে আশ্রয় নেবে না?

বিষ খাইয়ে পুরন্দরকে মার্‌তে আমার আর একটুও আপত্তি নেই! তোমাদের সমাজের বাঁধা নিয়মেও সে এখন অপরাধী। সে আমার স্ত্রী-হরণ করেছে। সুতরাং তাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিতে চাই! প্রথম-বারেও শ্রীকে সে আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছিল। একসভা লোকের সাম্‌নে আমার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল, সকলে মিলে সভা থেকে আমাকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিল, সমাজে আমাকে একঘরে হ'তে হয়েছিল! এ সব অপমানের প্রতি-শোধ নেওয়া কি আমার কর্ত্তব্য নয়? তখন আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, সে প্রতিজ্ঞা কি আমি পালন কর্‌ব না? না, পুরন্দর বন্ধু-বেশে আমার জন্ম-শত্রু, শত্রু-নিধন করা কোন শাস্ত্রেই অধর্ম্ম বলে না।

বাকি রয়েছে প্রভা। ওকে নিয়ে আমি কি কর্‌ব? ওকে দিয়ে আমার আর কোন কাজ হবে না। ওকে দিয়ে যা করিয়ে নেব ভেবেছিলুম, তা সিদ্ধ হয়েছে। অমন একটা অকেজো বোঝাকে আর ঘাড়ে-করে লাভ নেই।... ...ঠিক কথা। ও আপদকে বিদায় করে' দেওয়াই ভালো। সমাজের বাঁধা বুলি স্পষ্টই বল্‌ছে, স্ত্রী ততক্ষণ পর্য্যন্ত পালনীয়, যতক্ষণ সে স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী নয়। কলঙ্কিনী স্ত্রীকে ত্যাগ করাই মনুর বিধান। সে বিধান শিরোধার্য্য করাই আমার পক্ষে এখন প্রশস্ত।

* * *

দুপুর বেলায় পুরন্দরের বাড়ীতে গেলুম। এতক্ষণ প্রতিমুহূর্ত্তে আমি আশা কর্‌ছিলুম, পুরন্দরের অসুখ বেড়েছে বলে' এই বুঝি

শ্রী আমাকে. ডাকিয়ে পাঠায়! কিন্তু কৈ, কেউ.ত এল না! এর কারণ কি?

বাড়ীতে ঢুকেই শ্রীর দেখা পেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, পুরন্দর কেমন আছে।

শ্রী বল্‌লে, "ঘুমোচ্চেন।"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, "ঘুমোচ্চে? ...অ্যারারুট্‌টা খাইয়ে দিয়েচ ত?"

—"হ্যাঁ।"

—"খেয়ে কিছু বলেনি ত?

—"না।"

—"যন্ত্রণা-টন্ত্রণা কিছু হয়-নি ত?"

—"না। অ্যারারুট খেয়ে এতক্ষণ উনি শুয়ে শুয়ে বই পড়েছিলেন। এখন গিয়ে দেখলুম, ঘুমিয়ে পড়েচেন।"

আর্সেনিকের একটি অদ্ভুত লক্ষণ আছে। সময়ে সময়ে তাতে জ্ঞান আর যন্ত্রণা দুইই লোপ পেয়ে যায়। তবে কি পুরন্দর অজ্ঞান হয়ে গেছে? তার মূর্চ্ছাকে কি শ্রী নিদ্রা ভেবে নিশ্চিন্ত আছে?

কিন্তু গিয়ে দেখ্‌লুম, তাও নয়। পুরন্দর সত্যসত্যই নিদ্রিত। তার নাড়ী পরীক্ষা করে' দেখ্‌লুম। কোনই তফাৎ বুঝতে পারলুম না।

মনে ভারি একটা খটকা লেগে গেল। এ হ'ল কি? বেরিয়ে এসে শ্রীকে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "পুরন্দর অ্যারারুটটা ফেলে দেয় নি ত?"

—"না ঠাকুরপো, না। খালি খালি এককথাই জিজ্ঞাসা করচ কেন বল দেখি? ওঁকে আমি নিজে হাতে করে' অ্যারারুট খাইয়েচি।"

শ্রীকে আর-কিছু না বলে চলে এলুম। এমন ত হবার কথা নয়! অতখানি আর্সেনিক হজম করে' কেউ কি অনায়াসে ঘুমিয়ে থাকৃতে পারে? অসম্ভব! শ্রী নিশ্চয় কিছু ভুল করেছে। আচ্ছা, কাল যাতে পুরন্দর আমার সাম্‌নেই অ্যারারুট খায়, তারি ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। এ-সব কাজ পরের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে নেই।

হঠাৎ দেখ্‌লুম, জানলার কাছ থেকে প্রভা সরে' যাচ্ছে। আজ সকালে আমি যখন অ্যারারুট তৈরি করছিলুম, তখনো যেন জানলার কাছ থেকে ছায়ার মত কি-একটা সরে যেতে দেখেছিলুম।

প্রভা এ-রকম লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখ্‌ছে কেন? সে কি কিছু সন্দেহ করেছে? না, সন্দেহ আর কি কর্‌বে?

কিন্তু মনের ধুক্‌ধুকুনি ঘুচ্‌ল না। আস্তে আস্তে উঠে প্রভার ঘরে গেলুম।

আমাকে দেখে প্রভা পিছন ফিরে বসে রইল।

আমি বল্‌লুম, "প্রভা, আমার ঘরটা বাসর-ঘর' নয় যে, যখন-তখন তুমি সেখানে আড়ি পেতে বসে থাক্‌বে।"

প্রভা জবাব দিলে না।

—"শুনচ? কথা কইচ না কেন?"

প্রভা ফিরে বস্‌ল। আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "তোমার কথার জবাব দেওয়া দরকার মনে কর্‌চি না।"

—"তুমি স্পষ্ট করে' কথা বল্‌ছ দেখে আমি সুখী হলুম। আমিও এখন তোমাকে গোটাকতক স্পষ্ট কথা বলতে চাই।"—এই বলে' আমি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে প্রভার সাম্‌নে বস্‌লুম।

—"দেখ প্রভা, তোমাকে আমি ভালো না বাস্‌লেও স্ত্রীর আর-সমস্ত অধিকার থেকে আমি তোমাকে বঞ্চিত করি-নি!"

প্রভা তীক্ষ্ণ স্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ, তুমি আমার পেটে ভাত দিয়েচ, পরোণে কাপড় দিয়েচ, আর—যাতে আমার পতন হয় তার পথও বেশ খুলে দিয়েচ! এ-কথা আমি মানি।"

প্রভা যে দেখ্‌ছি উল্টে আমাকেই আক্রমণ কর্‌তে চায়! এর জন্যে ঠিক প্রস্তুত ছিলুম না, অধীরভাবে বল্‌লুম, "তোমার পতনের পথ খুলে দিয়েচি কি-রকম?"

—"ভেবে দেখ।"

—"ভেবে দেখব? কি ভেবে দেখ্‌ব? যা বল্‌চ তা তোমার ভ্রম।"

—"দেখ, আমাকে আর জ্বালিও না। —তোমার পায়ে পড়ি। আমি সব বুঝি। ভ্রম তোমার—তুমি ভাব পৃথিবীতে তোমার মত বুদ্ধিমান্ লোক আর নেই। দেখো, এই ভ্রমই তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে।"

—"প্রভা, তুমি এমন সুরে কথা কইচ, যা আমি পছন্দ করি না।"

—"যা পছন্দ কর না, তা সাধ করে' শুন্‌তে চাইচ কেন? আমি ত বল্‌চি, আমাকে রেহাই দাও। তোমার সংসারে থেকে আমারও প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেচে, এখান থেকে এখন একেবারে মুক্তি পেলেই আমি বর্ত্তে যাই।"

—"হ্যাঁ, আমিও তোমাকে একেবারে মুক্তি দিতে চাই। তোমাকে আমি আর বইতে পারচি না। বুঝলে?"

—"এ কথা আজ কেন, অনেকদিন আগেই বুঝেচি। কিন্তু এতদিন আমি চলে যেতে চাই-নি বলেই তুমি বুঝি দায়ে পড়ে আমার ভার সহ্য করে' ছিলে?"

—"ঠিক। কিন্তু এখন দেখ্‌চি আর সহ্য করা চলে না। তুমি মাত্রার বাইরে গিয়েচ। কাল রাত্রে স্বচক্ষে যে দৃশ্য দেখেচি—"

—"সে দৃশ্যের কথা তোমাকে আর খুলে বল্‌তে হবে না। এখন আমাকে একটু বিশ্রাম কর্‌তে দাও। আজকেই আমি তোমার বাড়ী থেকে বিদায় হয়ে যাব—"

—"কিন্তু তোমার ওপরে আমি অবিচার কর্‌তে চাই না। আমি যখন তোমার স্বামী, তখন আইনত তোমার ভরণ-পোষণের জন্যে আমি দায়ী। তুমি যেখানে যে-ভাবেই থাক, মাসে মাসে আমি তোমাকে অর্থসাহায্য কর্‌ব।"

—"কিন্তু তোমার দয়ার দানে আমার একটুও লোভ নেই। নিজের অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা আমি নিজেই কর্‌ব-অখন। দেশে আমার ভাই আছেন, সেখানে আমি ফ্যাল্‌না নই।"

প্রভা এমন সহজ ভাবে এই নির্ব্বাসন-দণ্ড নিলে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মনে হ'ল, সে যেন আগে থাকৃতেই আমাকে ত্যাগ করে' যাবে বলে' প্রস্তুত হয়েছিল। তার গর্ব্বিত প্রকৃতিকে একটুও খর্ব্ব করতে পারলুম না বলে' আমার মনে দুঃখ হ'ল। কিন্তু একদিক দিয়ে তাকে আঘাত দিতেই হবে। ভেবে-চিন্তে শেষটা বল্‌লুম, "হ্যাঁ, সুধু তোমার ভাই কেন, আরো অনেকের কাছেই তুমি ফ্যাল্‌না নও। সে কথা আমি জানি।"

—"তোমার কথার মানে ?"

—"অতি স্পষ্ট। আমি বা তোমার ভাই তোমাকে ত্যাগ করলেও, পুরন্দর তোমাকে ত্যাগ করবে না। যতদিন তোমার রূপ-যৌবন আছে, পুরন্দর তোমারে ফুলদানির তোড়ার মত সাজিয়ে রাখবে। তোমার আর ভাবনা কি ?"

কিন্তু প্রভা আমার এ খোলাখুলি আক্রমণে একটুও বিচলিত হ'ল না। আমার কথা সে যেন আমোলেই আনলে না। আমার চোখের উপরে তার শান্ত চোখ রেখে, স্থির স্বরে সে বললে, "পুরন্দরবাবুকে চিনতে হ'লে, তোমাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তপস্যা করতে হবে। মাটির ভিতরে যে-সব অন্ধকারের পোকা থাকে, নীলাকাশের উদারতা বোঝা তাদের কাজ নয়।"

প্রভাকে আহত করতে পারলুম না। বরং তার সাহস দেখে আমারি মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কোনরকমে আত্ম-সংবরণ করে' বললুম, "তোমার উপমার অর্থ বোঝা একটু শক্ত। কবিতা পড়া বা শোনা কোনকালেই আমার অভ্যাস নেই তা জান ত ?"

—"আগেই ত বলেচি, বুঝতে তুমি পারবে না! তোমার অত্যাচারে অন্ধ হয়ে পুরন্দরবাবুর পায়ের তলায় আমি আশ্রয় নিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু তিনি আমাকে মা বলে' ডেকে আমার মুখ রক্ষা করেছেন, আমার মোহ ভেঙে দিয়েছেন, আমার নারীত্বের মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সেই মুহূর্ত্তের ভুলের জন্যে যে পাপ, সে পাপ আমার হয়েচে বটে—কিন্তু আমার দেহ এখনো নিষ্কলঙ্ক।"

—"কিন্তু আমি যে স্বচক্ষে দেখেচি—"

প্রভার সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে উঠল! কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে উঠে, দুই চোখ মুদে সে প্রবল বেদনায় অস্ফুট স্বরে বললে, "তুমি যা দেখেচ, তার জন্যে আমিই দায়ী—আমিই দায়ী! কি নিষ্ঠুর তুমি গো,—নারীর এই গভীর কলঙ্কের কথা তার নিজের মুখে না-শুনে তুমি ছাড়লে না—" বলতে বলতে দ্রুতপদে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

............কিন্তু এ কী শুনলুম! এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষাতেও পুরন্দরের মন তাহলে বিকৃত হয়ে যায়-নি! পশুত্বই তাহলে সব মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয় ?......

না, না, না! আমি বিশ্বাস করি না,—প্রভার মিথ্যা কথা!

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

চয়ন

মৎস্যনারী বা জলবালা... মানুষ অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছে।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত The Gentleman's Magazineএর ২১৮ পৃষ্ঠায় 'মার্মেড' বা সাগর-বালার এই বিবরণটি বাহির হইয়াছিল।—

"সম্প্রতি লণ্ডন-সহরে সাগর-বালার যে দেহটি প্রদর্শিত হইতেছে, সেণ্ট জার্মেন মেলায় বৎসর-কয়েক পূর্ব্বে প্রদর্শিত সাগর-বালার সঙ্গে তাহার যথেষ্ট আকৃতি-গত পার্থক্য আছে। পূর্ব্বে-প্রদর্শিত সাগর-বালাটিকে দেখিতে ছিল কৃষ্ণবর্ণ; কারণ আফ্রিকার সমুদ্র হইতে তাহাকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল। কিন্তু এবারকার সাগর-বালাটি য়ুরোপীয় সমুদ্রের বাসিন্দা। তাই তাহার গায়ের রঙও সাদা। কালো সাগর-বালাটিকে দেখিলেই নিগ্রো রমণী বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এবারকার সাগর-বালাটিকে অবিকল যুবতী য়ুরোপ-সুন্দরীর মত দেখিতে।

তাহার চোখদুটি সুন্দর হাল্‌কা নীলরঙের; নাকটি ছোট্ট, টিকলো; মুখের হাঁ বড় নয়; ঠোঁটদুখানি পাতলা; চিবুকটি সুগঠিত ও

মৎস্যনারী

(সি, এন, কেনেডির আঁকা)

জেলের ছেলে ও জলবালিকা। (হার্বার্ট, এফ, ড্রেপারের আঁকা)

মাছ ধরতে,—জলবালা! (হার্বার্ট, এফ, ড্রেপারের আঁকা)

রাখাল ও জলবালা

(আর্থার হ্যাকারের আঁকা)

কণ্ঠদেশ পুরন্ত। কেবল ইহার কাণদুটি মানুষের মত নয়,—ইল-মাছের মত। শুনা যায়, কোন কোন সাগর-বালার মাথায় চুল আছে, কিন্তু এটির মাথায় নাই। ইহার বক্ষস্থল ভরাট ও সুদর্শন; হাত-দুখানির গড়ন বেশ মাফিকসই, কিন্তু আঙুলে নখ নাই। সাগর-বালাটির কোমর হইতে নীচের দিকটা সমস্ত ঠিক কডমাছের মত। ইহাদের কণ্ঠস্বর নাকি এমন চমৎকার, যে শুনিলেই মানুষের মন ভুলিয়া যায়; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ঝড় না উঠিলে ইহাদের মুখে কথা ফোটে না।"

প্রেতের অস্তিত্বের মত মৎস্যনারীর অস্তিত্বের কথাও গভীর রহস্যে অস্পষ্ট। সেকালে মৎস্যনারাদের সঙ্গে প্রায়ই নাকি মানুষের দেখাশুনা হইত, কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যুগে মৎস্যনারীরা ডুমুরের ফুলের মত হইয়া গিয়াছে। কয়েক বছর আগে শোনা গিয়াছিল, স্কটল্যাণ্ডের কাছে সেট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপে, সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়া জেলেরা একটি মৎস্যনারীকে, জালের ভিতরে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু কথাটা সত্য কি বাজেগুজব, সেটা ঠিকমত জানা যায় নাই।

বৈজ্ঞানিকরা মৎস্যনারীর কথা হাসিয়াই

উড়াইয়া দেন। প্রবন্ধের প্রথমেই আমরা সাগরবালার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর যে বর্ণনা তুলিয়া দিয়াছি, বৈজ্ঞানিকদের মতে সেটিও তাহা গাঁজাখুরি। তাঁহারা বলেন, মানুষ চোখের ভ্রমকে সত্য বলিয়া মনে করাতেই এই উদ্ভট কল্পনার উদ্ভব হইয়াছে। সীলদের ভাবভঙ্গী দূর হইতে ঠিক মানুষের মতই দেখিতে। নাবিকরা আগে যখন অপরিচিত সমুদ্র-পথে গিয়া পড়িত, তখন দূর হইতে সাগর-শৈলের উপরে বা জলের ভিতরে সীলদের দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকেই মৎস্যনারী বলিয়া ভ্রম করিত।

তরুণী অবাক হয়ে মৎস্য-বালাকে দেখচে

(চিত্রকর, ই, এফ, ক্রটনাল)

কিন্তু যে যাহাই বলুক, কবি বা চিত্রকররা ও-সব সত্য-মিথ্যা লইয়া একটুও মাথা ঘামান না। সমুদ্রে মৎস্যনারী থাকুক আর না থাকুক, তাতে তাঁদের কিছুমাত্র আসে-যায় না—সম্ভব-অসম্ভবের কথা ভাবিতে গেলে তাঁহাদের কল্পনার বাগানে ফুল-ফুটানো যে দায় হইয়া উঠিবে! তাই প্রাচীন কুসংস্কারের যুগেও মহাভারত ও ওডিসি-ইলিয়াডের কবি মৎস্যনারীকে যেমন অনায়াসে কাব্যে স্থান দিয়াছেন, একালের এই বৈজ্ঞানিক যুগেও কবি টেনিসন তেমনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে গাহিয়াছেন :—

Who would be
 A mermaid fair,
Singing alone,
 Combing her hair
Under the sea
 In a golden curl,
With a comb of pearl.
 On a throne ?

জলবালার প্রেম

(এফ, ডবলু, ওয়াটার হাউসের আঁকা)

বাস্তবের অতি-কঠোরতায় আহত হইয়া মানুষরা যখন অসম্ভবের ঘরে যায়, তখন কল্পনার চন্দনপ্রলেপে তাহারা অনেকটা আশ্বস্তি অনুভব করে। কবিরা সেই কল্পনার বাণী শোনান এবং চিত্রকররা তাহাকে মূর্ত্তির মধ্যে আকার প্রদান করেন। জলবালারা চিত্রকরদের প্রাণকে কতটা অভিভূত করিয়াছে, এই প্রবন্ধের বিখ্যাত চিত্রগুলিই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

আর্টে ঘোড়া

যে-সব শিল্পী বাস্তবতার একান্ত অনুরাগী, ঘোড়ার মূর্ত্তি আঁকিতে বা গড়িতে বসিয়া তাঁহারাও প্রহসনের সৃষ্টি করিয়া ফেলেন। ইহার কারণ আর কিছুই নয়। শিল্প-বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চোখের সাম্‌নে নগ্ন নর-মূর্ত্তিকে আদর্শ-স্বরূপ দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়। ফলে অনেকদিনের চেষ্টা ও শিক্ষার পরে ছাত্রেরা নর-মূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থান সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা করিয়া লইতে পারে।

কিন্তু শিল্প-বিদ্যালয়ে জীবন্ত ঘোড়াকে আদর্শরূপে আনিয়া রাখিবার নিয়ম নাই। ফলে ছাত্রেরা জীবন্ত ঘোড়াকে সাম্‌নে রাখিয়া হাতে-নাতে কাজ করিতে পারে না। কাজেই শিল্পক্ষেত্রে মানুষের মত ঘোড়ার মূর্ত্তিও নির্দ্দোষ, স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত বা গঠিত হয় না।
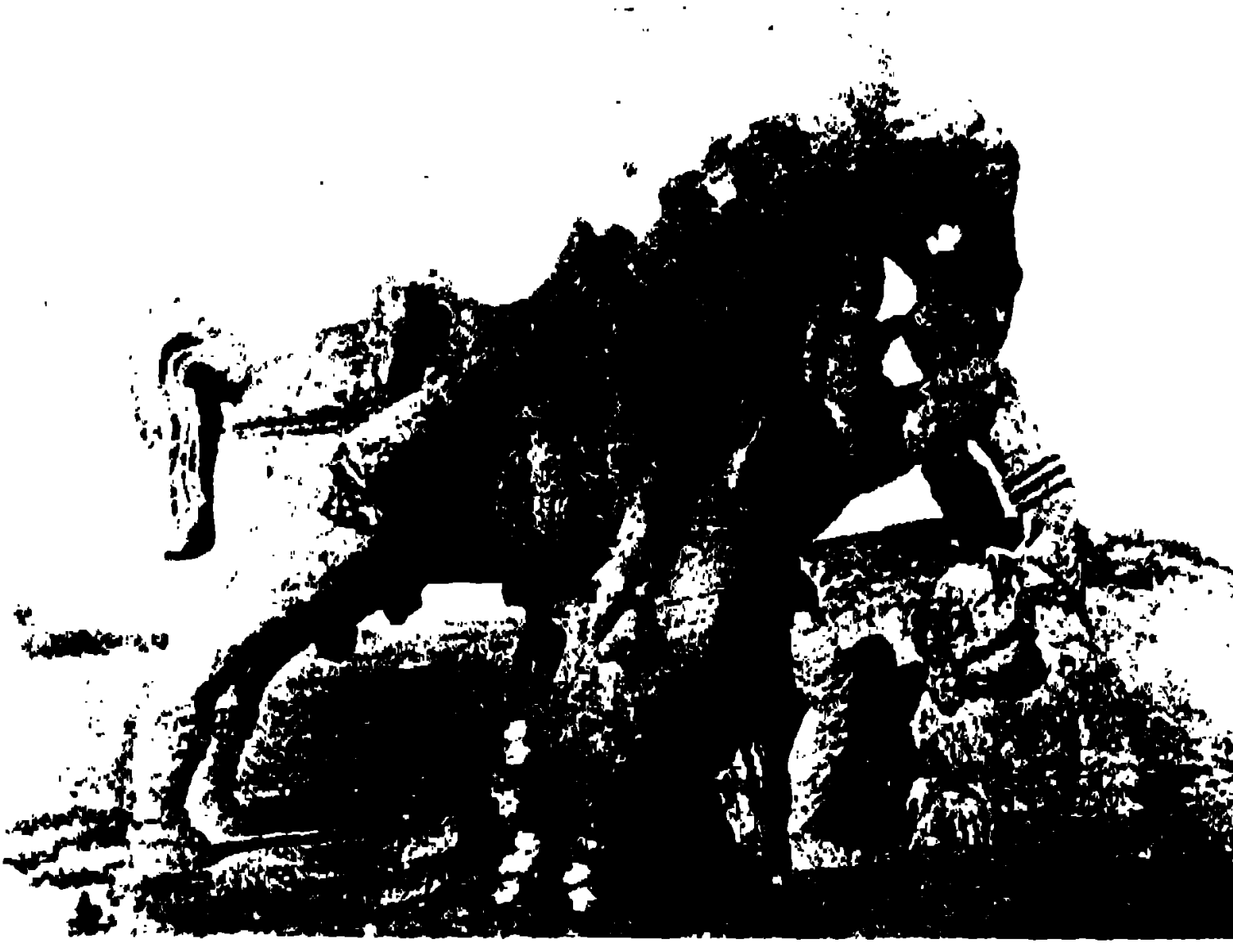
কণারকের ঘোড়া

লণ্ডনের একটি মনুমেণ্টের অশ্বমূর্ত্তি

বড় বড় সহরের প্রকাশ্য স্থানে, পিঠে সওয়ার লইয়া যে-সব ঘোড়ার মূর্ত্তি স্মৃতিস্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাতে বাস্তবতা প্রকাশের চেষ্টা আছে যথেষ্ট, কিন্তু যথার্থ প্রকাশ আছে অল্পমাত্র। অধিকাংশ ভাস্করই উপযোগী আদর্শের অভাবে, গাড়ী-টানা মড়াখেগো ঘোড়া দেখিয়া মূর্ত্তি গড়ে এবং তাহারই পিঠে সওয়ারকে চাপাইয়া দেয়! গাড়ী-টানা ঘোড়া আর চড়িবার ঘোড়ার ভিতরে যে কি আকাশ-পাতাল তফাৎ, সেটা তাহাদের ধারণায় আসে না। এমন কি রুবেন, ভেলাজকুয়েজ ও ড্যুরারের মত ওস্তাদ-শিল্পীরাও ঘোড়ার মূর্ত্তি আঁকিতে গিয়া যা তা কাণ্ড
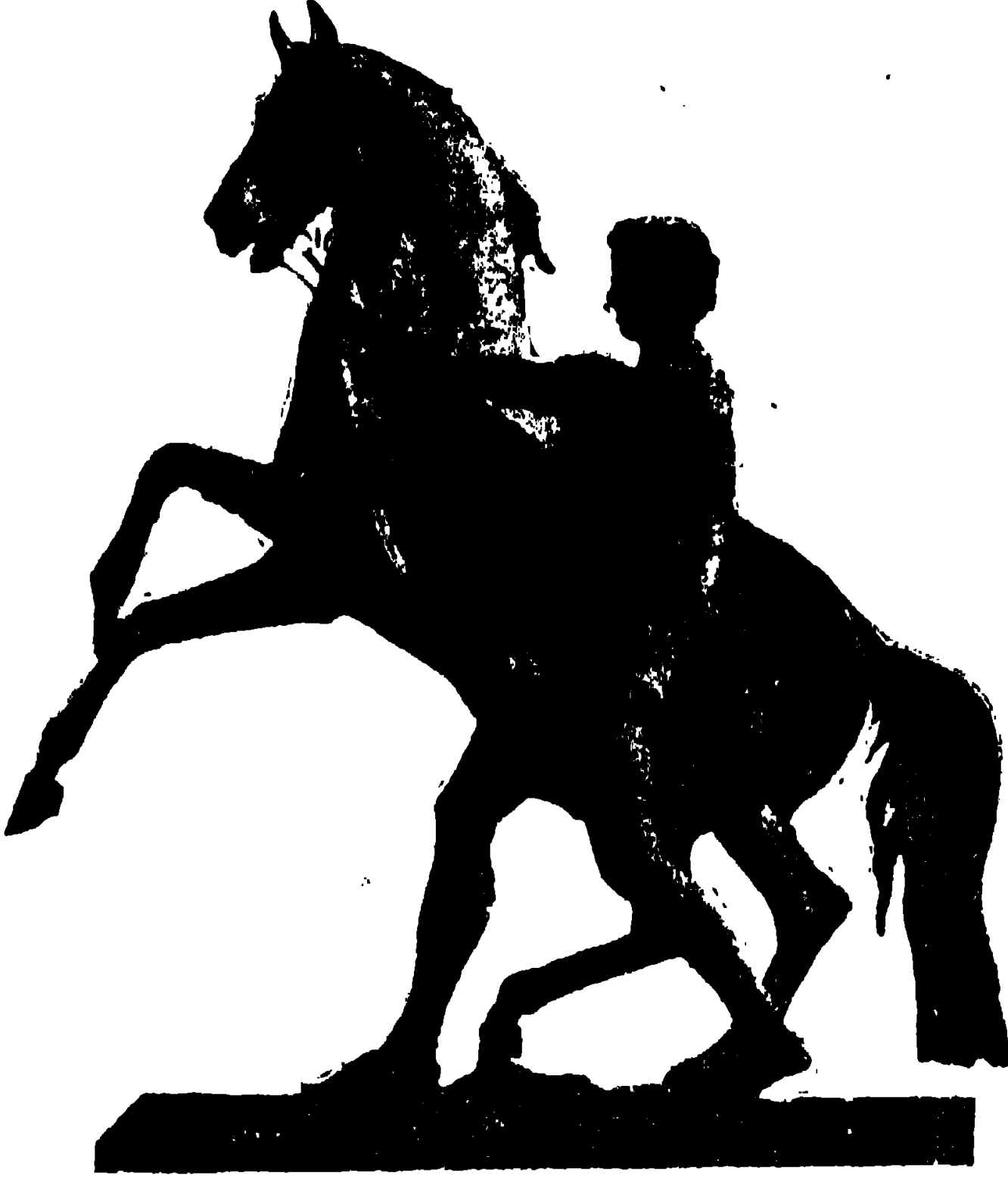
ব্যারণ ক্লটের গড়া ঘোড়া

করিয়া ফেলিয়াছেন। কোন কোন ভাস্কর ঘোড়ার দ্রুতগতি ও সতেজ ভাবের আভাস দিয়াছেন বটে, কিন্তু গঠন নির্ভুল করিতে পারেন নাই।

একালের মধ্যে অশ্বমূর্ত্তি গঠনে সব-চেয়ে নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন, ব্যারন ক্লট। রুশিয়ার পেট্রোগ্রাডে আনিট্স্কিন সেতুর উপরে তাঁহার গঠিত যে চারিটি ঘোড়ার মূর্ত্তি আছে, তার চেয়ে নির্দ্দোষ ও সুন্দর ঘোড়ার মূর্ত্তি আর কোথাও নাই।

আমরা ব্যারন ক্লটের গড়া একটি ঘোড়ার ছবি এখানে দিলাম। (এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিটির সঙ্গে কণারকের প্রাচীন শিল্পীর গঠিত অশ্বমূর্ত্তির কি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে! কণারকের ঘোড়াটি এখন ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার হইলেও এবং তাহার ভিতরে উচিত-মত স্বাভাবিকতা না থাকিলেও, এই দুই দেশের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পের মধ্যে যে একই গতির বিদ্যুৎ ছুটিতেছে এবং একই ভাবের ধারা বহিতেছে, সেটা যিনিই দেখিবেন, তাঁহাকেই মানিতে হইবে।)

শ্রীপ্রশাদদাস রায়।

আশ্চর্য্য ঘড়ি

জন মুয়ারের ঘড়ি

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক স্বর্গীয় জন্ মুয়ারের একটি বিখ্যাত ঘড়ি ছিল। তাঁহার ছাত্রজীবনে তিনি ঐ ঘড়িটী ব্যবহার করিতেন, পরে Wisconsin State Historical Societyর মিউজিয়মকে তাহা দান করিয়া যান। কাজ করিবার ঝোঁকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হইত বলিয়া সকালে ওঠা তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। প্রথম প্রথম পায়ের আঙুলে দড়ি বাঁধিয়া ভৃত্যকে দিয়া ভোর পাঁচটার সময় তিনি দড়ি টানাইয়া লইতেন। এই উপায়ে কয়েকদিন বেশ কাজ চলিয়াছিল, কিন্তু পরে অন্যান্য ছাত্রেরা আসিয়া তাঁহাকে বিছানা হইতে টানিয়া ফেলিতে সুরু করিল। অবশেষে তিনি একটি ঘড়ি উদ্ভাবন করিয়া সমস্ত কাজ সোজা করিয়া লইলেন।

প্রথমত তিনি দেবদারু তক্তা দিয়া একটি তেপায়া খাট বানাইলেন। খাটের মাথার দিকে দুইটি ও পায়ের দিকে একটী পায়া; এই পায়ের দিকের পায়াতে একটী পেরেক এমন ভাবে লাগানো থাকিত যে উহা তুলিয়া লইলে খাটখানি পড়িয়া যাইত।

একটী লম্বা দড়ির একপ্রান্ত সেই পেরেকে বাঁধা ও অপরপ্রান্তে ঘড়ির কাছাকাছি একখণ্ড পাথর। রোজ শুইবার আগে দড়িটী ঘড়ির সঙ্গে লাগাইয়া লইলে প্রত্যহ প্রাতে পাঁচটার সময় ঘড়ি নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ করিত। ভদ্রলোকের বিছানা হইতে উল্টাইয়া পড়ার গোলমালে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাথর-পড়ার শব্দে বাসাসুদ্ধ সকলেরই ঘুম ভাঙিয়া যাইত। ইহা ছাড়া তিনি এই ঘড়ির কলের সাহায্যে ইচ্ছামত সময়ে আগুন ধরাইতে পারিতেন বা পড়িবার সময় বই খুলিতে এবং বন্ধ করিতেও পারিতেন।

গাছের গুঁড়ির ঘড়ি

ঘড়িটী দেখিতে নিতান্তই অদ্ভুত। প্রায় আড়াইশত বৎসরের পুরাতন একটী ফার্ গাছের গুঁড়ি কুঁদিয়া, ভিতরে কলকব্জা বসাইয়া ঘড়ি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঘড়ির এক মুখ সমচ্ছেদ (section) করিয়া কাটিয়া ঘড়ির চাকামুখ তৈরি করা হইয়াছে। ঘড়িটী শুধু দেখিতেই অদ্ভুত নহে, আকারেও বেশ বড়-সড়। চাকামুখটির পরিধি ৩½ ফুট হইতেও বেশী (প্রায় আড়াই হাত) এবং মিনিটের কাঁটাটি দুই ফুটের উপর (প্রায় দেড় হাত)।

এঞ্জিন-মূর্ত্তি ঘড়ি

এ ঘড়িটি দেখিতে রেলগাড়ীর এঞ্জিনের মত; কান্‌সাসের (Kansas) এক কারিগরের তৈরি। এঞ্জিনের নক্সাদার কামরার গায়ে নকল আবলুস কাঠের চাকামুখ এবং উহা চুনী ও সবুজ বৈদ্যুতিক আলো দিয়া সাজানো। ইহা ছাড়া কামরার ভিতরে এবং এঞ্জিনের বাহিরের নানা অংশে ছোট-বড় আরও অনেক আলো আছে। ঘড়ির কলের সঙ্গে এই সমস্ত আলোর যোগাযোগ থাকায়, প্রত্যহ সন্ধ্যা ছয়টা হইতে আরম্ভ করিয়া ভোর ছয়টা পর্য্যন্ত আলো জ্বালিবার ব্যবস্থা আছে। ঘড়ির চাকামুখের আলোক-সমষ্টির সঙ্গে কামরার ভিতরকার ও বাহিরের

অন্যান্য আলোক-সমষ্টির এককালীন যোগ নাই; যে কোন আলোক-সমষ্টি স্বতন্ত্রভাবে জ্বলিতে পারে। প্রত্যেক বিভিন্ন আলোক একটির পর একটি করিয়া প্রতি পনেরো সেকেণ্ড অন্তর জ্বলিয়া ওঠে, এবং তিন সেকেণ্ড থাকিয়া নিবিয়া যায়। কলকব্জা সাধারণ ঘড়ির মত এবং একদমে আট দিন চলে। আধ ঘণ্টার এবং সময়ের ঘণ্টার সাঙ্কেতিক ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনের চাকাও ঘুরিতে থাকে, কিন্তু রেল-পথের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ না থাকায় চলিতে-ফিরিতে পারে না।

জুয়াড়ীর ঘড়ি

জুয়াড়ীর ঘড়িই ইহার উপযুক্ত নাম; কারণ দেখিলে মনে হয় যে,জুয়াখেলার যাবতীয় সরঞ্জাম দিয়া উহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। দাবার ছকের তৈয়ারী চাকামুখের উপরে এক হইতে বারো পর্য্যন্ত বিন্দুযুক্ত চৌকা গুটী দিয়া সময়-সংখ্যা নিরূপণ করা হইয়াছে। ছোট কাঁটার লম্বাদিকের মাথায় হরতনের নক্সা এবং অপরদিকে চিড়িতন। তেমনি বড়কাঁটার লম্বাদিকের মাথায় রুহিতন এবং অপরদিকে ইস্কাবন। একটী চৌকা গুটীতে ছোট কাঁটা ও বড় কাঁটা একসঙ্গে বসাইয়া ঘড়িতে জুড়িয়া দেওয়া আছে। ঘড়ির মাথায় একসারে নয়টী বোড়ে, তিনটি বিলিয়ার্ডবল্ এবং একজোড়া বিলিয়ার্ড খেলিবার ছড়ি আড়াআড়ি করিয়া রাখিয়া ইহার শোভা বৰ্দ্ধন করা হইয়াছে।

চিরায়ুষ্মতী ঘড়ি

পেনসিলভেনিয়ার Mr. Drawbaughএর আপিসের এই অদ্বিতীয় ঘড়িটি, সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর সুপ্ত-বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চালিত হইতেছে। ঘড়িটি পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোনদিন বন্ধ ছিল না। বহু পূর্ব্বে Mr. Drawbaughএর পিতা এইরূপ একটি ঘড়ির কল্পনা করেন। পরে Mr. Drawbaugh সেই কল্পনানুযায়ী এই ঘড়িটি প্রস্তুত করেন। গতিকে অবিশ্রান্ত ভাবে কাজে লাগাইবার জন্য অন্যান্য যে-সমস্ত আবিষ্কারক মাথা খাটাইয়াছেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাগ্রগামী। ঘড়িটি উচ্চে চার হাত এবং উহার আধমণী দোলনটি শক্তি-কেন্দ্রের (motor) কাজ করে। একখানি স্থায়ী চুম্বক (magnet) এবং আর একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক (Electro magnet) দ্বারা আকর্ষিত বৈদ্যুতিক শক্তিতে উহা চলিতেছে। দীর্ঘে-প্রস্থে দুই হাত এবং চার হাত গভীর করিয়া মাটি খুঁড়িয়া ঘড়িটি বসাইতে হয়। মাটির নীচের ধাতুঅংশগুলিকে উপযুক্ত ভাবে বাষ্পিত (moist) রাখিবার জন্য কয়লা দিয়া গর্ত্ত বুজাইতে হয়। ভাল করিয়া উহা বসানো হইলে সম্বৎসরে এক সেকেণ্ডেরও এদিক-ওদিক হয় না।

পাঁজী ঘড়ি

পৃথিবীর নানাদেশ হইতে ছোট বড় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া ওয়াসিংটনের Mr. Frank Friede এই ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার আকার অত্যন্ত বড়—দীর্ঘে-প্রস্থে সমান—দুই হাত; উচ্চে সাড়ে তিন হাত, এবং একশো আটটি চাকামুখ উহাতে সংযুক্ত আছে। শুধু সময় দেখা

ছাড়া উহাতে আরও অনেক জিনিষ দেখা যায়; যথা—নানাদেশের জাতীয় পতাকা, দেশের বিভিন্ন শাসনপ্রণালী, যাবতীয় ডাক-টিকিট, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের রাজধানীর নাম এবং ভাষা। ইহাতে সৌর-জগতের গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদির সমস্ত গতিবিধি পরিলক্ষিত হয়, যথা—তিথি, গ্রহণ ইত্যাদি। ভিতরের কলকব্জার মধ্যে পাঁচশো চাকা আছে। পুরানো ফনোগ্রাফ, সেলায়ের কল, মেয়েদের টুপীর কাঁটা, ছাতা-ভাঙা ইত্যাদি দিয়া উহার বেশীরভাগ অংশ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ভাঙা ষ্টোভের ঘড়ি

ফিলাডেলফিয়ার ষ্টোভ মেরামত করার কারখানায় এই ঘড়ি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। আকারে উহা বেশ বড়, তিন হাত লম্বা এবং দুই হাত চওড়া। বিশেষত্বের মধ্যে উহা অত্যন্ত ভারী (৪৷০ মণ) এবং ইহাতে একটি অভ্রের চাকামুখ আছে, তাহাতে Stove Repairs এই বারোটি অক্ষর দিয়া সময়-নিরূপণের অক্ষর লেখা আছে। যেমন ১এর বদলে S, দুই বদলে T, তিনের বদলে O, ইত্যাদি। পাঁচ শো উনিশটি ভাঙা ষ্টোভের টুক্‌রা ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে লাগিয়াছে।

মাধ্যাকর্ষক ঘড়ি

এই ঘড়ির নির্ম্মাতা একজন ফরাসী, নাম Mr. Eugene Walser। আশ্চর্য্যের মধ্যে এই যে, উহার কোন অংশে একটিও স্প্রিং নাই এবং সেই জন্য উহাতে দম দিবারও প্রয়োজন হয় না। ঘড়িটি দেখিতে চক্রাকার। একটি ঈষৎ-ঢালু টেবিলের উপর হইতে আস্তেআস্তে গড়াইবার সময় কলকব্জা আপন-আপন কায করিয়া যায়। ভিতরের চাকামুখটি গড়াইবার সময় ঘুরিয়া যায় না, উহা একভাবেই সোজা হইয়া থাকে। একমাস অন্তর ঘড়িটিকে টেবিলের উঁচুদিকে তুলিয়া দিলেই উহার দম দেওয়ার কাজ হয়।

চারুচন্দ্র রায়।

লর্ড নর্থক্লিফ

যাঁহারা ইংরেজী খবরের কাগজের একটু-আধটু খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁহারা সকলেই লর্ড নর্থক্লিফের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। অনেকের মতে ইংলণ্ডে তিনিই এখন সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী লোক। তিনি এখন সকলের নিকট Napolean of the Press নামে সুপরিচিত। পনেরো বৎসর বয়সে বালক নর্থক্লিফ প্রথমে লণ্ডনের একটি ছোট সংবাদ-পত্রে এক সামান্য লেখকরূপে কাজ আরম্ভ করেন এবং আজ এই চল্লিশ বৎসর মাত্র বয়সে তিনি প্রায় চল্লিশখানি খবরের কাগজ ও মাসিকপত্রের মালিক। কেবল মালিক নন, তাঁহার কলমের খোঁচায় অনেক মন্ত্রী ও বড়-বড় যোদ্ধাকেও পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। অনেকে বলেন যে, একমাত্র তাঁহার কাগজেই ইংলণ্ডের জন-

সাধারণের মতামত ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়।

নর্থক্লিফ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং তাঁহারা ভাই-বোনে এগারো জন। মা ছিলেন আইরিস্ এবং তাঁহারই উৎসাহ ও প্ররোচনায় নর্থক্লিফ আজ এত বড় শক্তিবান লোক হইতে পারিয়াছেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ও তাঁহার ভাই পঁচিশ হাজার পাউণ্ডে "ইভিনিং নিউজ্" নামে এক সংবাদপত্র কিনিয়া, স্থায়ীভাবে কারবার আরম্ভ করেন এবং ১৮৯৬ খৃঃঅব্দে তাঁহার বিখ্যাত "ডেলি মেল" প্রকাশিত হয়। "ডেলি মেলে"র নাম অবশ্য সকলেই শুনিয়াছেন। এরূপ সর্ব্বত্র প্রচারিত খবরের কাগজ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এই সংবাদ-পত্রের কারবার এখন এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহার সংবাদপত্রের কাগজ যোগাইবার জন্য তাঁহাকে নিউ ফাউণ্ড-ল্যাণ্ডে কয়েকটি প্রকাণ্ড কাগজের কারখানা স্থাপন করিতে হইয়াছে। এই সকল কারখানা কেবলমাত্র তাঁহার সংবাদপত্রের কাগজই যোগায়।

তাঁহার সংবাদ-পত্রগুলিতে হাজার-হাজার লেখক, কম্পজিটার ও সংবাদদাতা প্রভৃতি কাজ করিতেছে। একমাত্র তাঁহার কাগজের কার্য্যালয় হইতেই পাঁচহাজার কর্ম্মচারী যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। সমস্ত কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করার এবং সমস্ত কাজ একসূত্রে গাঁথিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ। ইংলণ্ডের প্রত্যেক বড় সহরেই তাঁহার কাগজ আছে এবং সমস্ত কাগজের মধ্যেই একসময়ে একই-প্রকার মত প্রচারিত হয়। কোথাও কোন গণ্ডগোল নাই। সমস্তই ঘড়ীর কাঁটার মত চলিতেছে।

এই যুদ্ধের সময় তাঁহার অনেক শত্রু হইয়াছে। গেল যুদ্ধের ছয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি দেশবাসীকে বলিয়া আসিতে-ছেন যে, জার্ম্মেণীর সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে। তখন হইতেই তিনি দেশবাসীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেশবাসী তখন সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। অনেকেই বলিয়াছিলেন, তিনি যুদ্ধপ্রয়াসী এবং সেইজন্যই দেশবাসীকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। কিন্তু যেদিন জার্ম্মেণী বেলজিয়মের সীমা অতিক্রম করিল বলিয়া ইংলণ্ড যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল, সেইদিন ইংরেজকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, লর্ড নর্থক্লিফ প্রকৃতই একজন তীক্ষ্ণদর্শী দেশহিতৈষী পুরুষ। তিনি জার্ম্মাণদের একজন প্রধান শত্রু। যুদ্ধের সময় উড়োজাহাজ ও 'ডেষ্ট্রয়ারে'র সাহায্যে জার্ম্মাণেরা দুইবার তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু দুইবারই তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়।

কেণ্টের সমুদ্রের ধারে এলম্‌উড নামক জায়গায় তিনি সাধারণত বাস করেন। ভোরে চারিটার সময় উঠিয়া তিনি প্রথমে খবরের কাগজগুলি পড়িতে আরম্ভ করেন। পড়া হইয়া গেলে কোন্ খবরটি নূতন, কোন্‌টির সমালোচনা করিতে হইবে এবং কোন্ জিনিষটি প্রতিবাদ বা সমর্থন করিতে হইবে, তাহা তিনি এই সময়েই মনে-মনে স্থির করিয়া

নেন। তাহার পর ইংলণ্ডের যেখানে-যেখানে তাঁহার কাগজ আছে, সেই সেই নগরেই টেলিফোঁয় তাঁহার মতামত শুনিয়া সম্পাদকেরা সেই অনুসারে লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লেখা পড়িলে বোধ হয়, তিনি একজন গর্ব্বিত ও অহঙ্কারী লোক। সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে লেখাই যেন তাঁহার একমাত্র কাজ। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে একবার-মাত্র মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, তাঁহার মত বিনয়ী ও বন্ধুবৎসল লোক খুব কমই আছে।

যুদ্ধের সময় তাঁহার কাগজগুলির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলিয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি দিনের পর দিন প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ইংলণ্ডের লোকবল, অর্থবল, ও অস্ত্রশস্ত্র শত্রুর তুলনায় খুবই কম। জয়লাভ করিতে হইলে এই সকল অভাব পূরণ করিতে হইবে। আমরা খুব বড়, আমরা নির্দ্দোষী, এবং আমাদের কোন অভাব নাই—এইরূপ ঘোষণা করিলে জয়লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই এবং এইজন্যই লর্ড কিচেনারের পদত্যাগের জন্য তিনি তাঁহার খবরের কাগজে একটা আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। সাধারণ লোক তাহাতে ক্ষেপিয়া উঠিল। অনেক স্থানে তাঁহার খবরের কাগজগুলিকে পুড়াইয়া ফেলা হইল। কিন্তু তিনি তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ তাঁহাকে উচ্চপদ দিতে চাহিলেন। কিন্তু লর্ড নর্থক্লিফ প্রকাশ্যভাবে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার পক্ষে গবর্মেণ্টের কোন কাজ করা অসম্ভব; কারণ তাহা হইলে সংবাদপত্রে স্বাধীন মত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

বাস্তবিক, তাঁহার মত ক্ষমতাশালী স্বদেশ-হিতৈষী লোক বর্ত্তমানযুগে খুব কমই আছে। এমন কি একদিন জার্ম্মান কাইজারকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, প্রকৃতপক্ষে লর্ড নর্থক্লিফই ইংলণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

মার্কিণ বৈজ্ঞানিক মাইকেলসন্

অধ্যাপক অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন্ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃত বিজ্ঞান বিভাগের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ। Munsey's Magazineএ তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। জড়-জগতের নব নব রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, ইনি আজ বিশ্বের মধ্যে পরিচিত ও একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞানের কয়েকটি অসাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার ও সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক কয়েকটি যন্ত্র উদ্ভাবন করায়, জগতের বুধমণ্ডলী তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ 'নোবেল প্রাইজ' ও 'কপ্লী মেডেল' (Copley medal) উপহার দিয়া বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়াছেন। সমস্ত মার্কিণ মুল্লুকের মধ্যে একমাত্র ইনিই কেবল লণ্ডনের রয়েল সোসাইটীর প্রদত্ত ঐ দুর্লভ 'কপ্লী মেডেল'

পাইয়াছিলেন এবং জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য, আমেরিকার মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে 'নোবেল' পুরস্কার অর্জ্জন করেন।

ইনি বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তকারী আবিষ্কার ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করা সত্ত্বেও দেশের জনসাধারণের অনেকেই এখনও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানে না। কারণ মাইকেলসন্ কোনদিনই দেশের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নিজের যশোদুন্দুভি বাজাইবার চেষ্টা করেন নাই। নীরবে একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় একাগ্রচিত্তে আজ এই সুদীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর কাল তিনি মুগ্ধ হৃদয়ে প্রকৃতির মর্ম্মকাহিনী তন্ময় হইয়া শুনিতেছেন;—আর জাগতিক বৈজ্ঞানিক সমাজ এই সিদ্ধ আচার্য্যের মুখে রহস্যময়ী প্রকৃতির অশ্রুত গোপন বার্ত্তা শ্রবণে আনন্দে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া বিজ্ঞানের এই পরম ভক্ত পূজারীকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে।

উৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে ক্ষুদ্রতম পরিসরের পরিমাপ পাওয়া যায়, তাহারও এক-পঞ্চাংশ অর্থাৎ প্রায় দশলক্ষ অংশে বিভক্ত এক ইঞ্চির পঞ্চম মাত্রা ১/৫০০০০০০ পর্য্যন্ত পরিমাপ করিবার অতি সূক্ষ্ম উপায় ইনি আবিষ্কার করিয়াছেন। মাত্র একইঞ্চি পরিমাণ প্রশস্ত কোনও উজ্জ্বল মসৃণ কাচখণ্ডের উপর একত্রে পঞ্চাশৎ সহস্র সরল সমান্তরাল রেখা, সমসূত্রে অঙ্কিত করিবার একটি অদ্ভুত যন্ত্র ইনি উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রচলিত দৈর্ঘ্যমানের যে নির্ভুল নিরিখ ইনি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা এতদূর সঠিক যে, বিশলক্ষের মধ্যে একাংশের অধিক যে অঙ্ক ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। আলোক-বেগের কল্পনাতীত প্রচণ্ড গতির হিসাব নির্দ্ধারিত করিয়া ইনি যে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর! সর্ব্বশেষ পৃথিবীর ভূম্যাবরণের কাঠিন্যের মান নির্দ্দেশ করিয়া বিজ্ঞান-জগতে ইনি আপনার অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

নতুন-খাতার নিমন্ত্রণ

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
তোমাদের ভাই নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা ;—
এসো বন্ধু! এসো, এসো—টল্‌তে-টল্‌তে মদের গেলাস হাতে করে নিয়ে;
আর, তুমি কে গো? তুমিই না সেই বাস্তু-ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দিয়ে
সহরেতে বাঁধ্‌লে বাসা? ওড়াও, ওড়াও, ফুর্ত্তি ওড়াও! লজ্জা কি হে?
নিজের কড়ি উড়িয়ে দিলে তুমি,
বাপের বাড়ি কল্লে শ্মশানভূমি ;—
মারো-নি ত একটি পয়সা কারো!
লোকের কথার ধার তুমি কি ধারো?

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
তোমাদেরও নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পা ।,—
এসো, এসো—জেল-খালাসী, পকেট-মারা, চোর-ডাকাত আর খুনী-জনের সেরা,
নির্ব্বিচারে তোমরা সবাই সবাক্কবে! নাইক হেথায় বিচার কিংবা জেরা;
করুন সে সব কুঁচ্‌কে ভুরু চস্‌মা চোখে দিয়ে—যে লোকেরা
নিজেরা সব এক-একটি ধর্ম্মপুত্র যেন!
তোমরা তাতে লজ্জা পাবে কেন?
সুবিধে ও সুযোগ থাকলে পরে,
বিচারক যে, বন্ধ হয়ত থাকতো হাজত-ঘরে!

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
সকলকারি নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা।
তোমরা কারা দাঁড়িয়ে আছ সরে?
জাত গিয়েছে মুর্গী খেয়ে? বিলেত গিয়ে? বিধবা-বিয়ে করে?
ঝাড়ু মার তাদের মাথায়, যারা তোমায় শাস্ত্র দেখায়, বিধান দিয়ে করেছে এক-ঘরে।
মানুষকে যে পর করে দেয়, বলো গিয়ে সে সব চসম্‌-খোরে
—"আমরা তোদের তোয়াক্কাটা কি রাখি!
আমাদের সব ফাঁকে রেখে নিজেই তোরা পড়ে গেলি ফাঁকি!
তোদের অন্ন একশোগুণে ঘৃণ্য মুর্গী চেয়ে,
প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা খেয়ে!"

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
তোদেরও ভাই নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা।
তোরা চামার? তোরা চাঁড়াল? জল খেতে নেই তোদের হাতে, এম্‌নি তোরা অস্পৃশ্য
বলেন যে সব মহাপ্রভু, তাদের টোলের নইক আমি শিষ্য।
সত্যিকারের চামার, চাঁড়াল তারাই, যারা এমন সোনার বিশ্ব
অত্যাচারে কালো করে, ভরিয়ে তোলে ক্রন্দনে!
ছুঁইনা সে সব শুদ্ধাচারী পৈতে-ধারী দুর্জ্জনে—
তাদের বাতাস লাগাইনেকো গায়।
আয়, তোরা আয়, বুকের পরে আয়!

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
তোমাদের ভাই নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা,—
এসো, এসো, সবাই এসো জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে—আসতে বারণ তাদের শুধু খালি,
যারা ভণ্ড, মিথ্যেচারী, বকধর্ম্মী—পেশা যাদের গায়ে দেওয়া কালী।
আর, দিক্‌বিদিকে লাগিয়ে ধাঁধা হুহু করে হাঁকিয়ে হাওয়ার গাড়ি
দিন-দুপুরে মাঝ-সহরে মানুষ মারে যারা,
খুনীর অধম সে সকল জন ধনমদে মত্ত মাতোয়ারা!
তাদের ত বাদ দিতেই হবে আমার এ মজ্‌লিসে
হউন তিনি প্রিয় শ্যালক, মাতুল কিংবা পিসে!

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
নিয়ে এসো নতুন প্রীতি,
নতুন গীতি-গল্প-গাথা;
পরস্পরে জড়িয়ে বুকে সবাই মিলে করি এস প্রাণের কোলাকুলি,
সুখ-দুঃখের নাগর-দোলায় সকল ভাইয়ে একসঙ্গে দুলি;
মনের মাঝের গোপন-ব্যথা এস সবাই বলি খোলাখুলি;
হৃদ্‌কমলের পদ্মমধু হাতে-হাতে বিলাই সকলে
তুচ্ছ হিংসা, তুচ্ছ ঘৃণা, তুচ্ছ বিরোধ-বিষের বদলে;
এস, সবার বুকে আশার প্রদীপ একশো-মুখে দিই জ্বেলে,
ভয়ের মুখে তুড়ি মেরে এগিয়ে চলি পা-ফেলে!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্কলন

ভারত ইতিহাস-চর্চ্চা

আমি অন্যত্র একথার আলোচনা করিয়াছি যে ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। কেন নহে তাহার কারণ আছে।

প্রত্যেক জাতির এক একটি সাধনার বিষয় আছে। এই মূলগত সাধনাটি লইয়াই সেই জাতির সকল লোক আঁট বাঁধে। নর্ম্মানে স্যাক্সনে মিলিয়া ইংরেজ যখন এক হইয়া গেল, যখন তাহাদের মধ্যে সমাজভেদ রহিল না তখন তাহাদের মধ্যে একটা বড় ভেদ রহিল—রাজার সঙ্গে প্রজার স্বার্থের ভেদ। সেই ভেদ যখন একান্ত থাকে তখন রাজার খেয়ালের জন্য প্রজাদের দুঃখ ও ক্ষতি হইতে থাকে। সেই ভেদ বিলুপ্ত করিয়া রাজশক্তিতে নানা প্রকার বাঁধ বাঁধিয়া পরস্পরের সামঞ্জস্য সাধনের ইতিহাসই ইংলণ্ডের ইতিহাস। অর্থাৎ ইংলণ্ডের যে-

সমস্যা প্রধান ছিল সেই সমস্যার সমাধান লইয়াই তাহার ইতিহাসের পরিণতি ঘটিয়াছে।

ইংরেজি ইস্কুলের ছাত্র ভারতের ইতিহাসে সেই রাষ্ট্রীয় ধারার পথই খুঁজিতে থাকে। খুঁজিয়া না পাইলে বলে ভারতের ইতিহাস নাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার ভারতের ইতিহাস সেখানেই ভারতের সমস্যা যেখানে।

প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য। যাহারা বাহিরে পাশাপাশি আছে অন্তরে তাহাদিগকে মিলিতেই হইবে। এই মিলন-চেষ্টাই মানুষের ধর্ম্ম, এই মিলনেই মানুষের সকল দিকে কল্যাণ। সভ্যতাই এই মিলন।

আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজায় প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি-সম্প্রদায়ের। এই সকল নানা উপজাতির বর্ণভাষা আচার ধর্ম্ম চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অথচ ইহারা সকলেই প্রতিবেশী। ইহাতে একদিকে যেমন পরস্পরের লড়াই চলিতেছিল তেমনি আর একদিকে পরস্পরের সমাজ ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন চেষ্টারও বিশ্রাম ছিল না। কি করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠে অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয়, এই দুঃসাধ্য-সাধনের প্রয়াস বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার সমাধান হয় নাই।

য়ুনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের ইতিহাসে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহার সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের কিছু মিল আছে কিন্তু অমিলও যথেষ্ট। সেখানে য়ুরোপের নানাস্থান হইতে নানাজাতি মিলিয়েছে। কিন্তু তাহারা একই বর্ণের সুতরাং তাহাদের মিলনের বাধা সুগভীর নহে। তাহা ছাড়া, য়ুরোপের সকল উপজাতির মধ্যে সভ্যতার রূপভেদ নাই। নিগ্রোদের সমস্যার কোনো ভাল মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত সেখানে হয় নাই বলিয়া কেবলি দুঃখ অত্যাচার, অবিচারের সৃষ্টি হইতেছে ইহাতেই মনুষ্যত্বের পীড়া ঘটে। এই পীড়া দুর্ব্বল সবল উভয়কেই স্পর্শ করে। তাহা ছাড়া এসিয়াবাসীদের সম্বন্ধে শুধু আমেরিকায় নহে য়ুরোপের সকল উপনিবেশেই বিরোধ চলিতেছে। এসিয়াবাসীকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিলে এই বিরোধ দেশের বাহিরে গিয়া কালক্রমে আরো প্রবল হইয়া জমিতে থাকিবে এবং একদিন ইহার হিসাব নিকাস করিতেই হইবে। আমেরিকার ইতিহাসে আর একটা ব্যাপার দেখিতে পাই তাহাকে ঐক্যসাধন না বলিয়া একাকারীকরণ বলা যায়। যে কোনো জাতীয় লোক আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে আসে ভাষায়, আচারে, ব্যবহারে তাহাকে সম্পূর্ণই আমেরিকান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে রাষ্ট্রীয় দিক হইতে সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্যমূলক মানব-সভ্যতার দিক হইতে ইহাতে ক্ষতিই ঘটে। সৃষ্টিতত্ত্বে যে পরিণতিক্রিয়া দেখি তাহাতে একাকারত্ব আরম্ভে দেখা যায় কিন্তু বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে একের মধ্যে বিভাগ ও সেই বিভাগের মধ্যে ঐক্য প্রকাশ হইতে থাকে। যদি রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পক্ষে একাকারত্বই একান্ত আবশ্যক বলিয়া ধরা হয়, তবে বলিতেই হইবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঐক্যের আদর্শ নহে। ইহাতে একপ্রকার স্বাধীনতার লোভে মানুষের গভীরতর স্বাধীনতাকে বলপূর্ব্বক বলি দেওয়া হয়। সমস্যার ইহা প্রকৃত সমাধান নহে বলিয়াই ইহাতে জগতে এত নিগূঢ় হ্রাস ও ব্যাপক দুঃখের সৃষ্টি হইতেছে।

ভারতবর্ষে নানা জাতির এই সংঘাত ও সামঞ্জস্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বৈদিকযুগ বৌদ্ধযুগে, বৌদ্ধযুগ পৌরাণিক যুগে পরিণত হইয়াছে। এই সৃষ্টির উদ্যমে রাজা ও রাষ্ট্রনীতি প্রধান শক্তি নহে। অবশ্য বিদেশী রাজা যখন হইতে ভারতে আসিয়াছে তখন হইতে এই স্বাভাবিক সৃষ্টিকার্য্য বাধা পাওয়ায় আর একটি অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে। এই জন্যই ইংরেজ যাহাকে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করে ভারতে সেই ইতিহাস মুসলমান অধিকারের পরে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অর্থ এমন নহে যে বিদেশী রাজত্বের পর হইতে ভারত-ইতিহাসের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে পূর্ব্বের চেয়ে আমাদের ইতিহাস জটিল হইয়াছে, আমাদের

দুরূহ সমস্যায় আরো একটি নূতন গ্রন্থি পড়িয়াছে। এখনো আমাদের মধ্যে ভেদের সমস্যা। এই ভেদ সমাজের ভিতরে থাকিতেই অন্য দেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে কিছুতেই ঠিকমত খাটিতেছে না। আমরা অন্য দেশের নকলে যে সব পন্থা অবলম্বন করিতেছি, বারম্বার তাহা ব্যর্থ হইতেছে।

যাহা হউক, আমাদের দেশের এই সামাজিক ইতিহাসের ধারা এখনো আমরা আগাগোড়া অনুসরণ করিয়া দেখি নাই; অনেকটাই অস্পষ্ট আছে এবং অনেক জায়গাতেই ফাঁক পড়িয়াছে। বিশেষত যেহেতু আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্ম্মতন্ত্রমূলক সেইজন্যই আমাদের নিজেদের আজন্মকালীন সামাজিক সংস্কার ও ধর্ম্মবিশ্বাস কুয়াশার মত আমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সত্যকে নিরপেক্ষভাবে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে বাধা দিতেছে। যেটুকু গোচর হইয়া উঠিতেছে তাহা বিদেশী ঐতিহাসিকদেরই চেষ্টায়।

কিন্তু নিজের দেশের ইতিহাসের জন্য চিরদিনই কি এমন করিয়া পরের মুখ তাকাইয়া থাকা চলিবে?

বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধানযুগ। ইহা আর্য্য ভারতবর্ষ ও হিন্দু ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্য্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধযুগে সেই সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি এক-ধর্ম্মবন্যায় ভাঙিয়াছিল—শুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্ম্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল। তারপরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিকযুগ এবং হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানের সন্ধি স্থল বৌদ্ধযুগ। এই যুগে আর্য্য ও অনার্য্য এক গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে আদান-প্রদান ও রফানিষ্পত্তির চেষ্টা হইতে থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন; তাই সকল দিকেই বেশ সুসঙ্গত রকমে রক্ষা হইয়া গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আভ্যন্তরিক নানা অসঙ্গতির জন্য আমরা অন্তরে বাহিরে দুর্ব্বল রহিয়াছি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে পদেপদেই বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া আমাদিগকে চলিতে হয়,—যাহা কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মিলাইয়া লওয়া নহে, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমরা প্রধানত আশ্রয় করিয়াছি।

যাহাই হউক, আমাদের এই বর্ত্তমান যুগকে যদি ঠিকমত চিনিতে হয় তবে পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধিযুগের সঙ্গে আমাদের ভালরূপ পরিচয় হওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্ম্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব-ইতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর। শ্যাম চীন জাপান জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই জন্যই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মত হইয়াছিল যাহার ভিতর দিয়া নানাজাতির নানা ক্রিয়াকর্ম্ম মন্ত্র পূজার্চ্চনা ভারতে প্রবাহিত এবং এক মন্থন-দণ্ডের দ্বারা মথিত হইয়াছে।

এই মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্ম্মের নিজেরই বিশুদ্ধ স্বরূপগত, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণজনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগুলি নূতন নহে, ইহারাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি। দিনের বেলায় যেমন তারা দেখা যায় না তেমনি বৈদিককালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন নানাজাতির

সম্মিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধযুগের শেষভাগে ইহারাই আর সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করিবার চেষ্টা, যাহা নিতান্ত অনার্য্য তাহাকে আর্য্যবেশ পরাইবার প্রয়াস ইহাই হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা।

অতএব, ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের ধারা যাঁহারা অনুসরণ করিতে চান তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া এই মহাযান বৌদ্ধপুরাণ সকলের অনুশীলন করিতে হইবে। বিশ্বভারতীতে কোনো ছাত্র যদি এই অনুশীলনে নিযুক্ত হইতে পারেন তবে আনন্দের বিষয় হইবে। এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য সিংহলের মহাস্থবির মহাশয় আছেন এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত অধ্যাপনার অধ্যক্ষতা করিতেছেন, অতএব এখানে এই কাজ আরম্ভ করার সুযোগ আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন। চৈত্র ১৩২৬।

অতিথি

একটি সত্য আছে, সেটি মানুষের অন্তরতম। বোধ করি, সেই জন্যেই তাকে আমরা ভুলে থাকি। বাইরের নানা টানে নানা দাবীতে আমাদের বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, সকলের চেয়ে অন্তরের এবং কাছের কথাটিতে আমাদের মন যায় না।

সে কথাটি এই,—আমাদের জীবনের দ্বারে একজন অতিথি আছেন।

একদিকে তিনি দেবেন আর আমরা নেব, এর সামঞ্জস্য করতে হলে, আরেকদিকে আমরা দেব আর তিনি নেবেন এইটুকু থাকা চাই, নইলে দানের ভারে আমরা নেমে পড়ব। তাই তিনি আমাদের দ্বারের কাছে এসে অপেক্ষা করেন; নিজের কর্ত্তৃত্বরাজ্যে যেমন প্রভুরূপে থাকেন তেমন ভাবে নয়, আমাদের কর্ত্তৃত্বের সংসারে অতিথিরূপে। আমরা তাঁকে কতটুকু জায়গা ছেড়ে দিই, তাঁর জন্যে আমাদের কতটুকু সেবার আয়োজন, সেইটুকুতেই আমাদের তরফ থেকে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সত্য হয়।

সেইজন্যেই যেমন বলচি, পিতা নো বোধি, তুমি যে পিতা এই বোধ আমাকে দাও, তেমনি করেই আমাকে প্রার্থনা করতে হবে, তুমি যে আমার অতিথি এই বোধ আমাকে দাও। পিতার বোধ হচ্চে তাঁর কাছ থেকে পাবার, অতিথির বোধ তাঁকে দেবার।

যখন ভালবাসি তখন দেওয়াতে আর বাধা থাকে না। এই যে অতিথি আমাদের ঘরে আশ্রয় চেয়েচেন, আর বলেচেন, তোমার সম্পদ তুমি একলা ভোগ কোরো না, আমাকেও স্মরণ কোরো। তবু পারিনে দিতে; সব জায়গাই আমার "আমি" জুড়ে থাকে, আমার সব শক্তিই এই "আমি"র দাবী মেটাতেই ব্যাপৃত। তাঁকে দাঁড় করিয়েই রাখি। এমন কেন হয়? প্রেম নেই বলে; দিতে তাই আনন্দ নেই। তাই কেবলি বলি, তুমি রোসো, আমার সময় নেই, আমার অনেক কাজ।

সংসারে সত্য হব এবং সংসারকে সত্য করব, এইটে হল মানব জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধন করবার জন্যেই আপনাকে প্রত্যহ বল্‌তে হবে, "সকলের চেয়ে বড় যিনি তিনি অন্তরের মধ্যে এসেছেন, ছাড় সব ছোট কথা ছোট বাসনা।" বল্‌তে হবে, "সকলের চেয়ে প্রিয় যিনি তিনি হৃদয়ে এসেচেন, আপনার স্বার্থকে আনন্দে তাঁর কাছে বিসর্জ্জন কর।"

সংসারে প্রতিদিন যদি বলি, আমিই আছি, আমার মধ্যে আমার চেয়ে বড় কেউ নেই, তাহলেই বড় সত্যকে বাদ দিয়ে সংসারটাকে দেখি, তাহলেই ওজন ঠিক থাকে না, তাহলেই বিপদ বাধে, তাহলেই সব চেয়ে বড় ঠকা ঠক্‌তে হয়।

যিনি বিশ্বের অধীশ্বর তিনি আমার অতিথি হয়ে এসেচেন, আমার জীবনে এইটেই সব চেয়ে বড় সত্য কেন? কেননা, এইখানে দুটি সত্যের মিলন হয়েচে— একটা হচ্ছে তিনি বড়, আরেকটা হচ্চে আমিও ছোট নই।

একরকম বড় আছে সে অভিভূত করে, আমার সব কেড়ে নিয়ে জবরদস্তি করে ; সে যত বড়ই হোক তার কাছে নত হওয়া, তার কাছে আত্মাবমাননা। কিন্তু এ ত তা নয়। তিনি সকলের চেয়ে বড় হয়ে আমাকে চাইলেন। তাতে তিনিও বড় রইলেন আমাকেও বড় করলেন। যিনি কর্তৃত্ব করেন, তিনি এইখানে আমার কর্তৃত্ব মানেন। আমি ভুলে থাকি, তাঁকে ফিরিয়ে দিই, কিন্তু তিনি দরজা ভাঙেন না, অপেক্ষা করেন। তিনি বলেন আমি এসেচি তোমাদের হৃদয় নিতে ; খাজনা নিতে নয়।

এই যে সূর্য্য, এ সমস্ত সৌরজগতের অধিপতি। এই পৃথিবীকে সে বেঁধেচে তার নিজের সঙ্গে। সকালে পূর্ব্বদিগন্তে যখন সূর্য্য দেখা দেয়, যখন তার করাঘাতে অন্ধকারের কপাট খুলে যায়, তখন পৃথিবী পুলকিত হয়ে অনুভব করে সমস্ত সৌরমণ্ডলের সূর্য্য বিশেষভাবে তারই আপন হয়ে তার দ্বারে অতিথি, তাই আনন্দে সে তার ফুলের সাজি সাজিয়ে ধরে, তার নহবতে প্রভাতী সুর বাজিয়ে দেয়। এই পূজায় তার নিজের মহিমা বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায়।

এই সকালে সূর্য্য পৃথিবীর দ্বারে এল, সে ত প্রভু ভাবে এল না, আনন্দের সুর বাজিয়ে এল। পৃথিবী যদি তার সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটন না করত, যদি বন্ধ থাকত তার ঘর, তাহলে কি অমঙ্গলই হত, চারিদিকে কি অন্ধকার, কি নিরানন্দ!

এমনি করেই অসীম পুরুষ প্রত্যেক মানুষের আত্মার দ্বারে তারই বিশেষ অতিথি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বলচেন, আমি যে প্রভু সেই কথাটি ভুলে যাও, মনে রাখ আমি একান্তভাবে তোমার, আমাকে গ্রহণ কর। আমি জোর করব না, আমার সৈন্যসামন্ত আনিনি, আমি তোমার সমান হয়ে এসেচি। তাঁর এই কথাটি যদি মন দিয়ে শোনবার সময় করে নিতুম, তাহলে সব টানাটানি কাড়াকাড়ি শান্ত হয়ে যেত, আনন্দে সমস্ত চিত্ত গান গেয়ে উঠত, বলত, এস, এস, সবই তোমার।

মানুষের আমিত্ব আপনাকেই মেনে সার্থক হয় না, আপনার চেয়ে বড়কে মেনে সার্থক হয়। যতক্ষণ এইটি সে না মানে ততক্ষণ নিজের সব চেয়ে বড় অধিকার সে পায় না। তার সব চেয়ে বড় অধিকার হচ্চে আত্মদানের অধিকার। যতক্ষণ তার দেবার কৃপণতা, ততক্ষণ আপনার উপর তার পূর্ণ অধিকার নেই। তাঁকে যখন সত্য করে আপন অতিথি বলে মানি সেই অধিকার পাই। তখন প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁকে বলি, আমার ধনজন-মান সব তোমার হোক্! তখন আমার ইচ্ছার উপর আমার চরম কর্তৃত্ব হয়, তখন আমি ইচ্ছা করেই বল্‌তে পারি, "আমি সব দিলুম।"

এই যে আমার "আমি" বিশ্বের সকলের উপরে মাথা তোলবার জন্যে ব্যগ্র, চন্দ্র সূর্য্য তারা সকলেই এর স্পর্দ্ধা স্বীকার করচে, "হাঁ, তুমি খুব বড়।" এই যে বড়, এই যে খুব বড়, একে আনন্দে নত হয়ে বল্‌তে হবে, "আমি কিছুই না।" সেই আতিথ্য-সৎকারের মহা দিনটির জন্যেই দুঃখ পেয়ে আঘাত পেয়েও সকলে একে মেনে নিচ্চে। যদি সে দিন না আসে, যদি আপনাকে দেবার অধিকার না পাই, তবে সে বড় দুঃখ,—শুধু একা আমার নয়, সকলের।

নোট্‌কে ভাঙাতে পারলে তবেই যেমন তার অর্থ, তেমনি আমার "আমি"কে ভাঙাতে পারলে তবেই তার অর্থ পাব। নোট্‌টাকেই যদি শেষ বলে জানি, যদি সেটাকে নিয়ে কাগজের নৌকো বানিয়ে খেলা করি, তা হলে সেটা হল ফাঁকি। "আমি"কে নিয়ে তেমনি যদি খেলা করে যাই, তাহলে তার থেকে তার সত্যকে পাওয়া গেল না, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত ফাঁকি রয়ে গেল। আমাদের জীবনের যিনি অতিথি তাঁর সেবার আয়োজনের জন্যে ঐ আমিটিকে ভাঙাতে হবে, ওকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে তবে ওকে সার্থক করতে হবে। এ হলেই যা দিলুম তার চেয়ে অনেক বেশী পেলুম। সেই অনেক বেশী পাবার ব্যবস্থা আছে। বীজকে যদি সঞ্চয় না করে রোপন করতে পারি, তাহলে যেমন বীজের অহমিকা বীজের কৃপণতা বিদীর্ণ হয়ে তার চেয়ে যে অনেক বেশি সেই উদ্‌ঘাটিত হয়, তেমনি আমার সেই অতিথি ভূমার কাছে আপনাকে দিয়ে ফেল্‌লে তবেই এর পরিপূর্ণতা কঠিন আবরণকে দ্বিধা করে ফেলে অন্ধকার থেকে আলোকে প্রকাশিত হয়।

সেই প্রকাশের জন্যেই আমাদের প্রার্থনা, অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও, আমার আপন হতে তোমাতে নিয়ে যাও। সেই জন্যেই আমাদের প্রার্থনা, হে আবি আমার কাছে আবির্ভূত হও—অর্থাৎ আমার মধ্যে তোমার যে প্রকাশ সেইটে যেন অপ্রকাশিত না থাকে, অতিথিকে যেন না দেখে ফিরিয়ে না দিই। যদি সেই প্রকাশ আমার কাছে মোহের আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন থাকে, তাহলে, রুদ্র, শোকদুঃখ অভিঘাতে বাধা ভেদ করে তোমার দক্ষিণ মুখ আমার জীবনে অবারিত কর, এবং তেন মাং পাহি নিত্যম্; তাহার দ্বারা আমাকে নিত্য রক্ষা কর। দুঃখ হতে রক্ষা করা নয়, তোমার প্রকাশের বাধা হতে রক্ষা কর, হে রুদ্র, দুঃখের দ্বারাই রক্ষা কর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন। চৈত্র ১৩২৬।

শিল্পী

শিল্পী ছবি আঁকত।

রাজার সেগুলো পছন্দ হ'ত না; সভাসদগণের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠত; নাগরিকেরা মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

শিল্পীর তবুও ছবি আঁকার বিরাম ছিল না।

কিন্তু এমন একদিন এল যখন শিল্পীর অনশন-ক্লিষ্ট হাত হ'তে তুলিকা আপনিই খ'সে পড়ল।

গৃহলক্ষ্মী বল্লেন—রাজার কাছে যাও; তাঁর কৃপা-কটাক্ষে তোমার সকল অভাব দূর হ'য়ে যাবে।

মানস-প্রিয়ার আধ-আঁকা ছবিখানি তুলে রেখে শিল্পী রাজসভায় এসে দাঁড়াল।

রাজা বল্লেন—উদ্যানবাটিকার ভিত্তিগাত্রে আমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী তোমার তুলির মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

সভাসদেরা আশ্বাস দিলে—আশাতীত পুরস্কার পাবে।

নাগরিকদের আশা হ'ল—দেয়ালজোড়া ছবি দেখে চক্ষু সার্থক করবে।

রাজপ্রসাদতুষ্ট হাতে শিল্পী আবার তুলিকা তুলে নিলে।

শতেক রাজার মুখচ্ছবি ভিত্তিগাত্রে ফুটে উঠল; অমাত্যদের ভাবহীন মুখের ছায়া অলিন্দের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেতে লাগল, নাগরিকদের প্রাণহীন মুখের রেখা শোভাযাত্রার মধ্যে ছড়িয়ে রইল।

শিল্পীর কাজ সাঙ্গ হবার পর—

রাজা তাকে শিরোপা দিলেন; সভাসদেরা দিলে—বাহবা; নাগরিকেরা দিলে—অভিনন্দন।

শিল্পীর মুখ গর্ব্বে, আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল।

শিল্পীর বাড়ীর ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তার মানস-প্রিয়ার অর্দ্ধসমাপ্ত মুখখানি রেখায় সমাপ্ত হ'য়ে উঠল।

কিন্তু তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল না—শিল্পীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও।

রংএর সঙ্গে রং মিশল, রংএর 'পরে রং পড়ল; কিন্তু মুখের সে মৃত্যু-বিবর্ণ ভাব কিছুতেই ঘুচল না।

শিল্পী আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে, বিত্ত সম্পদ দূরে ফেল্লে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিলে; কিন্তু সে মুখে প্রাণের আভাস ফুটে উঠল না।

শিল্পী তখন কলাদেবীর দ্বারস্থ হ'ল।

দেবী বললেন—শিল্পীর বুকের রক্ত দিয়েই আমি তার মানস-প্রিয়ার মুখে জীবনের আভা ফুটিয়ে তুলি; শিল্পীর মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তার মানস-প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি।

শিল্পী বল্লে—আমার সেই শ্রেষ্ঠ বলি আজ গ্রহণ করুন।

দেবী উত্তর করলেন—তা' তো পারি না। স্বর্ণমুদ্রার রঙে যে দিন তুলি রাঙিয়েছিলে, সে দিন হ'তে তুমি মৃত। তোমার আত্মবলিদানে অধিকার নাই, ফলও নাই।

শিল্পীর সংজ্ঞাহত হাত থেকে তুলিকা খসে পড়ল! আর মানসপ্রিয়ার প্রাণহীন মুখ শূন্যে চেয়ে রইল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

সবুজপত্র। পৌষ, মাঘ ১৩২৬।

শিল্পীর উপসংহার

শিল্পী আর তুলি ধরলে না। বিশ্বকর্মার পুজোর ঘরে যে হাতুড়ি ছিল, তাই নিয়ে রাজার দেওয়া সোনা পিটে সোনার পাত গড়তে আরম্ভ করলে। দিনে রাজার কাজ কোরে যত সোনা পায়, রাতে এসে হাতুড়ি পিটে সেই সোনার তারে মানস-প্রতিমার নূতন মূর্ত্তি নূতন ছাঁচে গড়ে। কলাদেবী এসে-এসে দেখেন আর বলেন—"কি করছ? কার মূর্ত্তি গড়ছ? এটা নিয়ে করবেই বা কি?" শিল্পী কথাই কয় না।

সোনার প্রতিমা গড়া হলো। তখন বাকি সোনা যা রইল, তাই নিয়ে শিল্পী একটা সোনার মন্দির গড়তে শুরু করলে। কলাদেবী এসে বল্লেন—"মন্দির গড়ছ কার?" শিল্পী নিরুত্তর রইল। তারপর মন্দির উঠল। পাথরে-সোনায় চিত্র-বিচিত্র মন্দিরের সোনার চুড়ো গিয়ে ঠেকল—রাজবাড়ির চুড়োর অনেক উপরে মেঘে-মেঘে সোনালি আভা ধরিয়ে! রাজা মন্ত্রীকে শুধোলেন—"এটা কি, রাজবাড়ি ছাড়িয়ে উঠলো?" মন্ত্রী বল্‌লেন—"শিল্পীর আস্পর্দ্ধা আর স্বাধীনতার ধ্বজা!" রাজা বল্লেন—"ওটা কাল সকালেই নামিয়ে দিও ধূলোতে!" এদিকে কলাদেবী বল্লেন—"শিল্পী, মন্দির তো গড়লে, কিন্তু ওখানে প্রতিষ্ঠা করবে কি?" শিল্পী উত্তর দিলে—"দেবী যাকে বলবেন তারি প্রতিষ্ঠা হবে ওখানে।" দেবী বল্লেন—"রোসো, তুলি দিয়ে যে মানস-প্রতিমা লিখেছিলে তার তো ওখানে প্রতিষ্ঠা হতে পারে না!—মন্দির গড়েছ কি, এক-একখানি পাথর তোমার বুকের রক্ত দিয়ে জমিয়ে?" শিল্পী ঘাড়-নেড়ে বল্লে—"না, সোনা গলিয়ে পাথরে পাথর জুড়েচি—হাতুড়ি পিটিয়ে; রক্তের লেশ নেই, আগাগোড়া গলা-সোনা আর নিরেট-পাথর!" কলাদেবী বল্লেন—"তা হলে ঐ জায়গাটা আমার পক্ষে ঠিক হবে। আমার থাকবার ঘরখানা গেল-ঝড়ে উড়ে গেছে।" শিল্পী বল্লে—"তাই হোক!" কলাদেবী রত্নবেদীতে উঠে বসলেন। শিল্পী তাঁকে নমস্কার করে ঘরে গেল।

এদিকে রাতারাতি রাজার সাবল সোনার কলাভবনে এসে অকস্মাৎ হানা দিলে। চুড়ো ভেঙে পড়লো রত্নবেদীর উপরে—কলাদেবী যেখানে শিল্পীর নৈবেদ্য সামনে রেখে বসেছিলেন। সকালে এসে শিল্পী দেখলে মন্দির নেই, কেবল পাথর আর সোনার স্তূপ। সে তারি উপরে আপনার তুলি আর হাতুড়ি নিয়ে কখনো ছবি লেখে, কখনো ভাঙা পাথর কেটে নূতন মূর্ত্তি গড়ে আর কখনো সোনা গালিয়ে সোনার প্রতিমা ঢেলে চলে। রাজা কিম্বা বেরসিক কেউ কিনতে এলে বলে—"এর দাম—এমনি আর-একটা মন্দির!" রসিক এলে বলে—"দাম নেই, বখশিস্ নিয়ে যাও।"

জনৈক শিল্পীর ওয়েষ্ট-পেপার-বাস্কেট হইতে উদ্ধৃত।

ঘুমের ব্যাঘাত

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাড়ার মধ্যে ভক্তপ্রবর গঙ্গারাম হাতীর প্রবল হরি-সংকীর্ত্তন দিন-দিন এমন বিকট রূপ ধারণ করতে লাগল যে ভালোমানুষ ভামিনীভূষণও একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সে কী তাদের ভীষণ চীৎকার!—মৃদঙ্গের খচখচ আর খঞ্জনীর খচমচ! কানে ত তালা লাগেই, প্রাণও পালা-পালা করতে থাকে। রাত্রির নিস্তব্ধতার বুকের উপরে মহাসুরের এই তাণ্ডব নৃত্য দেখে বলতে

ইচ্ছে হয়, 'ওগো প্রলয়, আর কত দেরী? বাঙালী যে কি-রকম নিরীহ, সহিষ্ণু তার প্রমাণ যে-পাড়ায় হরি-সংকীর্ত্তনের দল আছে, সে-পাড়াটি একবার বেড়িয়ে না এলে বোঝা যায় না। জগাই-মাধাই যে কেন কলসীর কাণা ছুঁড়ে মেরেছিল, তার প্রকৃষ্ট টীকা, পাড়ায় একটা হরিসভা থাকলে বোধ হয় আর অন্যত্র খুঁজতে হয় না।

সমস্ত দিন আপিসে খেটে-খুটে এসে ভামিনীকে রোজ সন্ধ্যাবেলা বড়-ছেলেটিকে পড়াতে বসতে হয়—মাষ্টার রাখবার সামর্থ্য ত নেই! তারপর সংসার-অভিনয়ে প্রেয়সীর সঙ্গে নানা রকম সুরে অ্যাক্টিংএর রিহার্সাল না দিলে, দাম্পত্যজীবন নিতান্তই বেসুরো, নীরস হয়ে ওঠে। তারপর টুকিটাকি ফাইফরমাশ, নানা আদর-আব্দার-নালিশ খাটাও আছে। এতদিনে এ সমস্ত-রকম পরিশ্রমই ভামিনীভূষণের অনেকটা গা-সহা হয়ে এসেছিল; সারা দিনের ক্লান্তির পর রাত্রির বিরামের ক্রোড়ে শুয়ে সে যখন আরাম করত, তখন দেখে বেশ স্পষ্ট বোঝা যেত যে সমস্ত দিনের খিটিমিটি, দ্বন্দ্ব-ঝগড়ার গ্লানি নাসিকার গভীর ফুৎকারে সে বেপরোয়া ঝেঁটিয়ে দিচ্চে। এই ঘুমের সুখেই বেচারা বেঁচে ছিল। এখন তার উপরে মৃদঙ্গের ঘন-ঘন চাঁটি পড়াতে তার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হল! দিনে-রাতে নিদ্রা না থাকলে মানুষ বাঁচে কেমন কোরে?

হাতীর কীর্ত্তন চল্‌ত রাত বারোটা-একটা পর্য্যন্ত; কোনো-কোনো দিন উৎসাহের ঝোঁকে দুটো-তিনটেও বেজে যেত। প্রথম-প্রথম এই উৎপাত ভামিনীভূষণ বাঙালীর স্বভাব-জাত সহিষ্ণুতায় তেমন-কোরে গায়ে মাখ্‌তনা;—কোনো-রকমে চোখ-কান বুজে থাকত; কিন্তু ক্রমেই বেগতিক হতে লাগল। তবু তাকে সহ্য করতে হত। কারণ তা না করলে উপায় কি? একটা উপায় আছে বটে—বাড়ী-বদ্‌লে অন্যত্র উঠে যাওয়া; কিন্তু সে কি কম হাঙ্গাম? তার চেয়ে এই যমযন্ত্রণা সহ্য করা যে ঢের বেশী সহজ! আর কাঁহাতকই বা সে বাড়ি বদলায়? এই আট মাসের মধ্যে একটা-না-একটা উৎপাতে তাকে ছ'বার বাড়ি বদ্‌লাতে হয়েছে; এবং যেখানেই গেছে, সেইখানেই একটা-না-একটা আপদ শনির মতো তার পিছন-পিছন ফিরেছে। সে কী লাঞ্ছনা! বাড়ী বদ্‌লাতে গেলেই দেখা যায় যে, বিশ্বসুদ্ধ লোক হৈহৈ-কোরে তার বিরুদ্ধে লেগেছে;—আপিসের সাহেব, বাড়ির গৃহিণী, রাস্তার পাহারা, বাজারের কুলি, পথের ভিখিরী, গেঁড়াতলার গাঁট-কাটা, চোর-ছ্যাঁচড়া, এমন কি আকাশের কাক-চিল পর্য্যন্ত! এতগুলি শত্রুর' মুখে ছাই দিয়ে বাড়ি-বদলাতে মনকে রাজি করানো শক্ত! তারপর যে-পাড়ায় গিয়ে উঠবে, সেখানে যে কেবল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরদের বাস, এমন ত বলা যায় না! হয় ত এর চেয়েও সাংঘাতিক উৎপাত সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে; ভামিনীভূষণের পায়ের সাড়া পেয়ে তারা গর্ত্তের ভিতর থেকে কেউটে-সাপের মতো গর্জ্জে উঠবে! তার চেয়ে এই বেশ!

কিন্তু এই বেশটা জোর-কোরে মনকে মানালেও, কান সেটা কিছুতেই মান্‌তে চায় না; সে কেবল ত্রাহি ত্রাহি করে; তাতে যখন

উপায় হয় না, তখন মাথার সঙ্গে পরামর্শ কোরে তাকে বিদ্রোহী কোরে তোলবার যোগাড় করে। পাপিষ্ঠ কর্ণকুহর হরিনাম-সুধায় শীতল না হয়ে জগাই-মাধাইয়ের মতো কেন যে দিনে-দিনে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল তা কে বলবে? আর তার সঙ্গের সাথী প্রাণের ইয়ার পাবও চোখ-দুটোকে উস্কে-উস্কে এমন ঘূর্ণিত রক্তবর্ণ করে তুলে যে ঘুম-বেচারা ভয়ে পাখা-মেলে নীল-আকাশে উধাও হয়ে পালালো! সমস্ত দিন খাটুনি, তার উপর এই নিদ্রার অভাব—বেচারা ভামিনী যেন পাগলের মতো হয়ে উঠল। কি যে করবে, কিছুই ঠিক করতে পারলে না। তার উপরে বিস্ফোটকের মতো আপিসেও এক নতুন লাঞ্ছনা আরম্ভ হল। দুপুরবেলা একটু ঝিমুনি এলেই বড়-বাবু ভীমগর্জ্জনে বোলে উঠতেন—"বলি ভামিনী, ওকি হচ্ছে? তুমি কি আফিং ধরেছ? না গাঁজা খাও? অমন-করে ঢুলচ কেন?" হায়, এও অদৃষ্টে ছিল? শেষে নেশাখোর অপবাদ! ছেলে-বেলায় যখন লেখাপড়া করত, তখন বেশী উঁচু ক্লাস অবধি ভামিনী প্রমোশন্ পায়নি বটে, কিম্বা প্রথম-দ্বিতীয় এই শ্রেণীর প্রাইজ্ পাওয়াও তার অদৃষ্টে ঘটেনি; কিন্তু যে-কয়েক দিন স্কুলে ছিল, তার প্রত্যেক বছরই সে সচ্চরিত্রতা এবং ভালোমানুষির জন্যে একখানা কোরে প্রাইজ্ পেয়েছে। সেই সব প্রাইজের বই —প্রাচীন বটতলার পকেট গীতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, এবং আধুনিক বাজারের 'নীতিশিক্ষা' প্রভৃতি বিবিধ সৎগ্রন্থ এখনো সে যত্ন-কোরে তুলে রেখেছে। গৃহিণী মধ্যে-মধ্যে সেগুলিকে জঞ্জাল বোলে উল্লেখ করলে, তার বুকের পাঁজর যেন খসে পড়ে! ভামিনীভূষণ চরিত্রটাকে সঠিক রাখবার জন্যে এখনো সেই নীতিশিক্ষা মাঝে-মাঝে খুলে পড়ে;—পাছে কোথাও কিছু বেগোল হয়ে যায়! এই প্রাইজ নিয়ে তার মনে খুব-একটা অভিমানও আছে। কোথাও লেখাপড়ার কথা উঠলেই সে যে ছেলেবেলায় বিস্তর প্রাইজ পেয়েছিল, একথা বোলে গর্ব্বপ্রকাশ করতে ত্রুটি করেনা;—এবং এ-গর্ব্বটা লোকাভাবে যখন-তখন বিশেষ কোরে প্রকাশ পায় গৃহিণী এবং ছেলেদেরই কাছে। সদৃষ্টান্তে ছেলেদের মনকে প্রাইজের দিকে প্রলুব্ধ করবার জন্যে এই বইগুলি সে তাদের খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখায়; কিন্তু ছেলেরা যে তার মলাট দেখে প্রলুব্ধ হচ্ছে তা মোটেই বোধ হয় না। বেচারাদের ভবিষ্যৎ ভেবে ভামিনী ভারি মুসড়ে পড়ে; আর মনে-মনে বলে, আজকালকার ছেলেরাই এমনি! এ হেন সচ্চরিত্র ভামিনীভূষণের নেশাখোর-অপবাদ যে কতদূর মর্ম্মান্তিক, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বেচারা কি করবে? সকলরকম দুঃখের সঙ্গে এ দুঃখও তাকে সইতে হল! নইলে যে চাকরি যাবে।

মনের দুঃখ সহা যায়, কিন্তু রাত্রে ঘুম না হওয়া, সে যে অসহ্য! বিশেষত ভামিনীভূষণের মতো লোকের পক্ষে। সংসারে তার ঐ একটিমাত্র সুখ ছিল, সেটিও যদি যায়, তবে আর বাঁচা কেন? মানুষের জীবনে অনেকরকম সখ থাকে, ভামিনীর সখ ছিল এই ঘুমের। এই ঘুমের চারদিকটি কেমন কোরে মনোরম কোরে তোলা যায়, কি কোরে সেটিকে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে নেওয়া যায়, মনে-

মনে দিনরাত সে তারই আলোচনা করত এবং যেটুকু অতিরিক্ত ব্যয় মাঝে-মাঝে করত, সে তার এই ঘুমেরই আস্‌বাবের জন্যে; অন্য কোনোদিকে তার বাজে-খরচ ছিলনা। যদি কখনো তার বড়মানুষ হবার স্বপ্ন মনে আসত, সে তার সমস্ত-বড়মানুষীটাকে এই ঘুমের বিছানায় ঢেলে দিত;—বড়মানুষীর সমস্ত সুখ-ঐশ্বর্য্য এই ঘুম দিয়েই সে সম্ভোগ করতে চাইত। যে যাই বলুক, সে বলত এই ঘুমের সখ' সে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না! সকালে, বিকেলে, দুপুরে যখনই ফুরসৎ মেলে একটু গড়িয়ে নিতে পারলে, সে ছাড়ত না। পাছে ঘুম নষ্ট হয় এই ভয়ে রাত্রির নিমন্ত্রণে কালিয়া-পোলাও সে জীবনে অনেকবার অনায়াসে ত্যাগ করেছে; থিয়েটারের দিক ত সে মাড়াতই না; গৃহিণী আব্দার ধরলে, হয় পাড়ার লোক, নয় কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে সে-রাত্রে বেশ-একটু আরাম করে ঘুমিয়ে নেবার আয়োজন করে নিত। যখন দেখত সকাল ছটার আগে থিয়েটার থেকে গৃহিণীর ফেরবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তখন বলত —আহা, শয্যাটি আজ কি নিষ্কণ্টক!—অবশ্য বলত মনে-মনে; নইলে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবার খুবই সম্ভাবনা ছিল।

সাধারণ-মানুষে যেমন ঘুমোয়, ভামিনীও তেমনিই ঘুমোত,—চাই কি, কিছু অতিরিক্ত ঘুমোত বল্লেও চলে; কিন্তু তবু তার খুঁৎ-খুঁতুনির অন্ত ছিল না। বেচারার জীবনে একটা মস্ত আপশোস্ এই ছিল যে সে ভালো-কোরে ঘুমতে পায় না! কচি ছেলে যেদিন রাত্রে কান্না জুড়ত, সেদিন বেচারা মনের দুঃখে বলত—"আমি বনবাসী হব!" পাছে স্বামী সত্যই বনবাসী হয়ে যায়—ঘুমের প্রতি তার যে রকম মায়া তা সে হতে পারে—এই ভয়ে তার গৃহিণী প্রাণপণে মুখ-চেপে ছেলেদের কান্না বন্ধ রাখবার চেষ্টা করত। তাইতেই ভামিনীভূষণ কোনো-রকমে সংসারে টিঁকে ছিল। কিন্তু আর বোধ হয় টিঁকতে দিলে না! পাড়ার যে-রকম হাতীর মাতামাতি আরম্ভ হয়েছে, তার চাপনে প্রাণটা যদি নাও যায়, মাথাটা যাবে নির্ঘাত!

উপায় কি? ভামিনীভূষণ অনেক ভেবে কোনো উপায় ঠাহর করতে পারলে না। গৃহিণীর পরামর্শ চাইলেই সে বলবে বাড়ি বদলাতে। সে তো ঐই চায়! সে বলে—"বাড়ি ছেড়ে কোথাও তো বেরুতে পাই না, মাঝে-মাঝে বাড়ী বদল করলে, তবু একটু বেড়ানো হয়।" কাজেই ভামিনীভূষণ সেদিকে ঘেঁসলে না। কি করলে উপায় হবে, সেই কথা নিজের মনে ভেবে-ভেবে বেচারা আরো মাথা গরম করতে লাগল।

সেদিন বিকেলে কর্ম্মক্লান্তদেহে বিষণ্ণ বদনে ভামিনী আপিস থেকে বাড়ী ফিরচে, এমন সময় মেডিকেল কলেজের সাম্‌নের ফুটপাথে বসে একটা হিন্দুস্থানী-ধরণের লোক চীৎকার কোরে বল্লে—"শুনিয়ে বাবুজি!"

ভামিনী কি ভাবতে-ভাবতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ডাক শুনে চম্‌কে উঠল। তার দিকে চাইতেই হিন্দুস্থানীটা অত্যন্ত আদরের সঙ্গে বল্লে—"আইয়ে, ইধার আইয়ে!"

ভামিনী মন্ত্রচালিতের মতো সুড়্‌সুড়্ কোরে এগিয়ে গেল। হিন্দুস্থানীটা তার

মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"আপ্‌কা মনমে বহুৎ দুখ্‌ হ্যায়!"

বেচারা ভামিনী খোট্টাই-মুখের এই কোমল সমবেদনায় একেবারে গলে গেল। তার দুঃখের কি অন্ত আছে? রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, এতবড় দুঃখটা সে বোলেই এখনো বহে বেড়াচ্চে!—এ যে কী দুঃখ দুনিয়ার কেউ ত বোঝে না, বল্‌তে গেলে কেবল ঠাট্টাই করে; আর এই পথের লোকটা কিনা ডেকে তাকে সমবেদনা জানাচ্চে!

হিন্দুস্থানীটা বল্লে—"হিঁয়া বৈঠিয়ে!"

ভামিনী গদগদ হয়ে ফুটপাথের উপরে উবু হয়ে বসে পড়ল। হিন্দুস্থানীটা বল্লে—"বাবুজি, কাহে এৎনা দুখ্‌ পাতা হ্যায়?"

কি আশ্চর্য্য! ভামিনী একেবারে অবাক! তার মনের মধ্যে দুঃখ যে লুকোনো আছে, এই বাইরের লোকটা কি করে তা জানলে? সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কি কোরে জান্‌লে আমার দুঃখের কথা?"

সে বল্লে—"হাম্‌ সব জান্‌তা হ্যায়—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান!"

"ও-ও তাই বটে!" মনে-মনে এই কথা বোলে ভামিনী যেন বিস্ময়ের একটা অন্ত খুঁজে পেলে।

হিন্দুস্থানীটা বল্লে—"আপকা কাহে এৎনা দুখ্‌, উয়ো জান্‌তা হ্যায়?"

ভামিনী ঘাড়-নেড়ে বল্লে—"না!"

"শুন্‌ লিজিয়ে!" বোলে ফুটপাথের উপরে খড়ির কতকগুলো দাগ কেটে এক-জোড়া পাশা ঝাঁ-কোরে তার উপর ফেলে দিয়ে বল্লে—"ইয়ে দেখিয়ে!"

ভামিনীভূষণ মাটির উপরে খড়ির সেই হিজিবিজি দাগগুলো অবাক হয়ে দেখ্‌তে লাগল; কিন্তু তার মধ্যে কি যে দেখ্‌তে হবে, তা সে ঠিক বুঝতে পারলে না।

হিন্দুস্থানীটা বল্লে—"দেখা?"

ভামিনী ঘাড়-নেড়ে বল্লে—"হ্যাঁ!"

হিন্দুস্থানী বল্লে—"অব্‌ তো বিশ্‌ওয়াস্‌ হুয়া!"

কি বল্লে ঠিক হবে ভামিনী স্থির করতে না পেরে বল্লে—"হুয়া!"

হিন্দুস্থানী বল্লে—"তব্‌ এক কাম্‌ কিযিয়ে! আঁখ মুদ্‌ কর্‌ আপ্‌কো ইষ্ট-দেবতাকো নাম্‌ লেকে উন্‌কা মূর্ত্তি ধ্যান কিযিয়ে!"

ভামিনী এইখানে একটু ফাঁপরে পড়ল। তার ইষ্টদেবতার নাম যা, তার স্ত্রীর নামও তাই;—দুজনেই কালী। ইষ্টদেবতার নাম কোরে তাঁর মূর্ত্তি ধ্যানে আনবার যতবার সে চেষ্টা করে, ততবারই তার স্ত্রীর চেহারা মনে এসে পড়ে। কি আপদ! এর জন্যে যতই সে হাঁকু-পাকু করতে লাগল; ততই তার মাথাও কেমন গুলিয়ে যেতে লাগল, শেষে কিছুতেই আর কালী-মায়ের চেহারা মনে আসে না! চোখ খুলতে দেরী দেখে হিন্দুস্থানীটা তার গায়ে হাত বুলিয়ে বোলে উঠল—"আপ্‌ বড়া ভকত্‌ হ্যায়! দেবতাকো নামসে তন্ময় হো গিয়া। হুয়া, হুয়া, অব্‌ আঁখ্‌ খুলিয়ে,—দেবী প্রসন্ন হুয়া!"

কি করে? ভামিনী তাড়াতাড়ি চোখ খুলে ফেল্লে। হিন্দুস্থানীটা বল্লে—"কুচ্‌ ডর্‌ নেই, আপ্‌কো ভালা হোগা। ইয়ে মাদুলি লেও, ধারণ করো, সব্‌ কুচ্‌ দুখ্‌কা শান্ত হো যায়েগা।"

ভামিনী কৃতজ্ঞ-চিত্তে মাদুলিটা জোড়-হাতে গ্রহণ করলে। তারপর দাম কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা কোরে যেমন পকেটে হাত দিতে যাবে' অম্‌নি হিন্দুস্থানীটা তার দুটো হাত সজোরে চেপে ধরে বল্লে--"নেই, নেই! হাম্‌ আপ্‌সে কুছ লেগা নেই!"

ভামিনী তার বদান্য দেখে একেবারে অবাক! সত্যিকার মহাপুরুষ বটে! সেই মাদুলি হাতে নিয়ে সে মহাফুর্ত্তির সঙ্গে বাড়ির দিকে ছুটল। এই ছোট্ট মাদুলিটির গুণ সে যেন সদ্য-সদ্য প্রত্যক্ষ করলে; এই তো এটা হাতে পাবা-মাত্রই তার মনের বিষণ্ণতা ক্রমে-ক্রমে দূর হয়ে যাচ্ছে!—নিদ্রাপুরীর নিঝুম অন্তপুরের পথ তার চোখের সামনে যেন ধীরে-ধীরে খুলে যাচ্ছে! এমন একটা দুর্লভ সামগ্রী বিনামূল্যে পাওয়াতে তার ফুর্ত্তি শতগুণ বেড়ে উঠছিল। গিন্নীকে এ-সব কথা এখন বল্‌বে, কি, পরে একেবারে তাক্‌ লাগিয়ে দেবে, এই ভাবতে-ভাবতে সে বাড়ী এসে পৌছল। বাড়ী পৌছতেই গিন্নী বল্লে—"ওগো, একটা পয়সা দাও তো, খোকার জন্যে বিস্কুট আন্‌তে দেব, সে বড় কাঁদচে।" ভামিনী পকেট থেকে ব্যাগ্‌ বার করতে গিয়ে একেবারে থ হয়ে গেল। এ-পকেট ও-পকেট বার-বার হাৎড়েও ব্যাগ্‌ পাওয়া গেল না। গিন্নী বল্লে—"কি গো, তোমার মুখ অমন শুকিয়ে গেল কেন?"

ভামিনী বল্লে—"সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার ব্যাগ্‌ চুরি গেছে!"

"সে কি গো! কি কোরে চুরি গেল?"

"তা ত জানি না।"

গিন্নী তখন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করলে, আপিস থেকে বেরিয়ে ভামিনী কোথায়-কোথায় গিয়েছিল। মহাপুরুষের কথাটা ভামিনী লুকোবার অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত চাপ্‌তে পারলে না। গিন্নী আদ্যোপান্ত সব শুনে বল্লে—"হয়েছে!"

"হয়েছে কি?"

"তোমার ঐ মহাপুরুষটিই ব্যাগ্‌টিকে মহাপ্রস্থানে পাঠিয়েছেন।"

ভামিনী বল্লে—"সে কি রকম?"

"রকম এই যে, যখন তুমি চোখ-বুজে ইষ্ট-দেবতার নাম স্মরণ করছিলে, সেই অবসরে—"

ভামিনী বাধা দিয়ে বোলে উঠল—"চুপ্‌, চুপ্‌! অমন কথা বল্‌তে নেই—পাপ হবে!"

গিন্নী ধমক দিয়ে বল্লে—"থামো তুমি!"

ধমক খেতেই ভামিনী ভারি মুস্‌ড়ে গেল। গিন্নী বল্লে—"তুমি যখন চোখ বুজে ছিলে, সে সময় তোমার গায়ে সে হাত দিয়েছিল?"

ভামিনী আম্‌তা-আম্‌তা কোরে বল্লে—"হ্যাঁ দিয়েছিল।"

গিন্নী বল্লে—"তুমি যখন মাদুলির দাম দেবার জন্যে পকেটে হাত দিতে গিয়েছিলে, তখন সে তোমার হাত চেপে ধরেছিল?"

"ধরেছিল!"

"ব্যস্‌, তবেই বোঝা গেছে!"

মনে-মনে ভামিনী মহাপুরুষকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু গিন্নীর ঐ কথাগুলো মনের মধ্যে এমন-একটা সন্দেহ ধুঁইয়ে তুল্‌তে লাগল যে মহাপুরুষকে কিছুতেই রক্ষে করা গেল না! আর তার মুস্কিল

ছিল এই যে গৃহিণী যখন তাকে কোনো জিনিষ বোঝায়, তখন তা এমন-কোরে বুঝিয়ে দেয় যে না-বুঝে তার আর উপায় থাকে না।—মনে হয় সত্যিই ত! যাকে সে প্রথমে দুঃখের অন্ধকারে ভাস্করের মতো দেখেছিল, গিন্নীর কথায় শেষে সে তস্করে পরিণত হয়ে গেল। কি করবে বচারা?

ভামিনী স্ত্রীকে প্রবোধ দেবার আর-কিছু না পেয়ে বোলে উঠল—"যাক্, মাদুলিটা ত পাওয়া গেছে—সেইটেই মস্ত লাভ। ওতে যদি আমার ভালো হয়, ব্যাগ্‌টা না হয় গেলই!"

গিন্নী ঠোঁট বেঁকিয়ে বল্লে—"ঐ ভুয়ো মাদুলিটায় তোমার ভালো হবে?"

ভামিনী আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"ভুয়ো কি রকম?"

"এই দেখনা!"—বোলে গিন্নী মাথার একটা কাঁটা দিয়ে মাদুলির ভিতর থেকে কতকগুলো কাগজের কুঁচি বার করলে।

ভামিনী ব্যস্ত হয়ে বল্লে "কর কি?—কর কি? কোন্ দ্রব্যের কি গুণ, তা কি তুমি-আমি জানি!"

গিন্নী বল্লে—"ওর গুণ যা, তা অনেকক্ষণ টের পাওয়া গেছে। হাতে আস্‌তেই তোমার একটা লোক্‌সান্ হল।"

নাঃ, এমন অকাট্য প্রমাণের পর আর তর্ক করা চলে না। ভামিনী হেঁটমুখে আপিসের কাপড় ছাড়তে উঠে গেল। অন্যদিন যে ঘুমটুকু হয়, সে-রাত্রে ব্যাগের শোকে সেটুকুও হলনা। মাদুলির ফল হাতে-হাতে পাওয়া গেল!...

কীর্ত্তনের জ্বালায় কি করি, কি করি কোরে ভামিনী যতই অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগল, হাতীর কীর্ত্তন ততই সজোরে চলতে থাকল। ভামিনীর সমস্তদিন কাজে-কর্ম্মে কাটত; রাত্রি এলেই তার বুকটা ধড়াস্ কোরে উঠত—ঐ রে কীর্ত্তন এলো! বুড়ো-বয়সে কীর্ত্তনের ভয় তার যতটা হল, ছেলেবেলায় জুজুর ভয় ততটা ছিলনা। শেষে ঘুম-ঘুম-কোরে ব্যস্ত হয়ে ঘুম-হওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। অনেকে ঘুমের নানা টোট্‌কা-টুট্‌কি বল্লে; কিন্তু তাতে কি হবে? যম যাকে ভয় করে, সেই হরিনামের কাছে টোট্‌কা! ওদিকে যেমন খোলে চাঁটি পড়া, এদিকে ভামিনীর কাঁচা ঘুম চম্‌কে উঠে কোথায় যে পলায়ন করে, সারারাত আর দেখা দেয়না। বিছানায় পড়ে রাত-ভোর সে যে কী কষ্ট, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝবে? বিশেষ ভামিনীভূষণের—যার জীবনের সখই হচ্ছে ঘুম! অবশেষে একজন এক পাকা পরামর্শ দিলে; বল্লে—দেখো, শোবার আগে একটু-কোরে সিদ্ধি খেয়ে শুয়ো,—খুব ঘুম হবে। কথাটায় প্রথমে ভামিনী ভারি রুখে উঠল। কী, সে সিদ্ধি খাবে? নেশাখোর হবে? কখনোই না! তারপর সকলে যখন বুঝিয়ে বল্লে ঔষধার্থে সুরাপান নীতি-বিরুদ্ধ নয়, তখন সে ঠাণ্ডা হল।

কি করে? প্রাণের দায়ে শেষে তাকে সিদ্ধি সেবন করতে হল। প্রথম-প্রথম দু-চার দিন বেশ ঘুম হল—এক-ঘুমে রাত কাবার! ভামিনী মনে-মনে তারিফ কোরে বল্লে—"বাঃ, চমৎকার জিনিষ ত!" কিন্তু দুদিন না যেতেই নেটের পাৎলা পর্দ্দা ছিঁড়ে গেল। সে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে, হঠাৎ ঘুমপুরীর সিংহদ্বার ভেদ

কোরে বোল্-হরিবোলের সিংহনাদ তার কানে গিয়ে পৌঁছতে আরম্ভ করলে! প্রথমে মনে হত অনেক দূর থেকে যেন একদল খ্যাপা-হাতী ছুটে আসছে; তাদের বৃংহিতের রেশ কানে এসে লাগছে; তার পর ক্রমেই তারা কাছাকাছি এসে কানের কাছে কুলোর মতো কান দুলিয়ে, শুঁড় নেড়ে, দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌তে থাকে—"বোল্ হরিবোল! বোল্ হরিবোল্!" আর সঙ্গে-সঙ্গে গোদা-গোদা পা ফেলে নৃত্য!

মাঝ-রাত্রে থাম্‌কা খ্যাপা হাতীর মুখে এই হরিবোল-বলার অনুরোধ শুনে ভামিনীর প্রথমটা ভারি হাসি পেত, তার পর রাগ হত—তার পর ছম্‌ছমে রাতের অন্ধকারে বুকের ভিতরটা কেমন ঢিপ্ ঢিপ্ করতে থাকত; সে পাশ-ফিরে শুয়ে অন্যমনস্ক হবার যতই চেষ্টা করত, ততই মনে হত যেন আরো কানের কাছে আরো জোরে সেই নাছোড়বান্দা বোল্ হরিবোল স্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হয়ে একসঙ্গে হাজার দামামা পিট্‌তে আরম্ভ করেছে। তখন মাথার ভিতরকার রক্তধারা ঘূর্ণীর মতো কেবলই ঘুরপাক খেতে-খেতে টগ্‌বগ্ কোরে ফুটে উঠত। তখন তার যেন খুন চাপত;—ইচ্ছা হত এখান ছুটে গিয়ে হাতীর কীর্ত্তনীয়া দলের পাষণ্ড ক'টার গলা এমন-জোরে টিপে ধরে, যাতে চিরদিনের মতো তাদের স্বর বন্ধ হয়ে যায়! 'তাতে গৃহিণীরও কোনো আপত্তি ছিল না; তার আপত্তি ঐ পাষণ্ড কথাটায়। সে জিভ-কেটে বল্‌ত—"ছি ছি, পাষণ্ড বোল না ওদের! অপরাধ হবে!" ভামিনী বল্‌ত—"খুব বলব! পাষণ্ড, ভণ্ড, ষণ্ড—সব বল্‌ব!"

কিন্তু এত বোলেও কোনো ফল হল না। ভামিনীভূষণের ভামিনী দেখ্‌লে এমন কোরে চল্‌তে থাকলে স্বামী উন্মাদ হতে আর বেশী দেরী লাগবে না; সে বল্লে—"ওগো, কাজ নেই এখানে থেকে, চল অন্য পাড়ায় যাই।"

ভামিনী এতদিন যা ভয় করছিল, শেষটা তাই ঘট্‌ল। হা অদৃষ্ট!

গৃহিণী আবার বল্লে—"বেশী দেরী কোরোনা, বুঝলে!—চটপট্ একটা বাড়ী ঠিক কোরে ফেল।"

ভামিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—"আচ্ছা!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাসা বদল কোরে ভামিনীভূষণ সপুত্র-পরিবার নূতন পাড়ায় উঠে এসেছে। বাড়ী-খানা ছোট, কিন্তু দোতলা। নীচে আর-কারা ভাড়াটে আছে; উপরের মহল ভামিনী-ভূষণ অধিকার করলে। পাড়াটা দেখে মনে হয় বেশ ঠাণ্ডা—কোনো উপদ্রব নেই। সরু গলির ভিতরে এই বাড়ী;—বেশ অন্ধকার-অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে—গ্রীষ্ম কালে দিবা-নিদ্রার ভারি উপযোগী। তাই দেখে ভামিনীর মন খুব খুসি হয়ে উঠল। তখন গ্রীষ্মকাল, রবিবারের দুপুরগুলো বেশ আরামে কাটবে মনে কোরে ভামিনীর আহ্লাদ আর ধরে না। অবশ্য, ভাড়া নেবার আগে, এই বাড়ীর কাছে কোথাও হরিসংকীর্ত্তনের দল আছে কিনা, সেটা সে ভালো করে খোঁজ নিয়েছিল। খবর পাওয়া গেল প্লেগের বছর একটা কীর্ত্তনের দল তৈরি হয়েছিল বটে,

কিন্তু তার পর থেকে তার আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। বাস্, তবে আর ভাবনা কিসের! ভামিনী একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলে একমাসের আগ্রিম ভাড়া বাড়িওয়ালাকে দিয়ে বাড়ীটা তখনই ঠিক কোরে ফেল্লে। এমন চিজ্ হাত-ছাড়া করা কি উচিত? বাড়ীটা সবদিক থেকেই সুবিধে মনে হল। ভাড়া কম, জায়গা বেশ নির্জ্জন, আর পাড়া-প্রতিবেশীরা নিরীহ লোক বোলে ত মনে হয়;— ভামিনী যেমনটি চায়! মালপত্র বয়ে আনার যে হেঙ্গাম, এই বাড়ীর গুণ দেখে ভামিনীর কাছে সেটা যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে এল। মনে হল চোখকান বুজে কোনো-রকমে জিনিষগুলো একবার এনে ফেল্তে পার্‌লে, আর তাকে পায় কে! নাকে সর্ষের তেল দেবারও দরকার হবে না—দিব্যি ঘুমতে পারবে! সে গৃহিণীকে বল্লে—"ওগো চল, আজই চল!"

গৃহিণী বল্লে—"সে কি, আজই?"

সে বল্লে—"আজই নয় ত কি!—সে বাড়ী দেখে অবধি এখানে একদণ্ড আর তিষ্ঠতে ইচ্ছে করছে না!"

গৃহিণী বল্লে—"তোমার তো দেখা? আমি একবার না দেখলে হবে না;—আমায় নিয়ে চল, আমি দেখে আসি, তারপর ঠিক কোরো।"

"তুমি আর দেখ্‌বে কি? সে ঠিক হয়ে গেছে।"

"তবেই আমার মাথা খেয়েছ! ঠিক হয়ে গেছে কি গো!"

"ভাড়া-পত্র আমি চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। আমি কি তেম্‌নি বোকা?—আগে খোঁজ নিয়েছি সেখানে কীর্ত্তনের দল আছে কিনা, তবে ভাড়া করেছি।"

"শুধু কীর্ত্তনের দল দেখলে তো চল্‌বে না; বাড়ী কেমন, তা তো দেখতে হবে?"

"তা কি না দেখেছি? আহা, যেমন নিঝুম, তেমনি ঠাণ্ডা!"

"ঠাণ্ডা কি গো?"

"হ্যাঁ গো ঠাণ্ডা!—রোদ থেকে তেতে-পুড়ে গিয়ে সর্ব্বাঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল—চোখে ঘুম আস্‌তে লাগল।"

"তবেই হয়েছে! অমন স্যাঁতা বাড়ীতে টিঁকব কেমন কোরে? ছাদে জল পড়ে না ত?"

জল পড়ার কথা শুনেই ভামিনীর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। মনে পড়ল আর-এক বাড়ীর কথা—বর্ষার জলে সারারাত সেই বাবুই-ভেজা! তার পর স্বহস্তে সেই ছাদ মেরামত করতে পরের মৈ-বেয়ে উঠে, নামবার সময় মৈ না পেয়ে ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে অবস্থান! সে কী লাঞ্ছনা! আবার যদি সেই রকম হয়? ভাবতে-ভাবতে ভামিনীর চোখ কপালে উঠতে লাগল; মুখ দিয়ে আর কথা বার হল না। গৃহিণী তাকে চুপ থাকতে দেখে আবার জিজ্ঞাসা করলে—"কি গো, ছাদ-টাদগুলো ভালো করে দেখেছ ত?"

ভামিনী ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে চেয়ে বল্লে—"না, তাড়াতাড়িতে ঐটেই দেখা হয় নি।"

গৃহিণী রেগে উঠে বল্লে—"এত তাড়াতাড়িটা কিসের হল শুনি?"

তাই ত, এত তাড়াতাড়িটা যে কিসের,

সে-কথা ভামিনী কিছুতেই মনে আনতে পারলে না।”

গৃহিণী বল্লে—“দরজা-জান্‌লা সব দেখেছ ভালো কোরে? গরাদে, ছিট্‌কিনি, এ সব আছে ত?”

ভামিনী সে-সব দেখেনি নিশ্চয়! বাড়ীটি বেশ স্নিগ্ধ, ঘুমের একান্ত উপযোগী, এইতেই সে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল; অন্য জিনিষের খবর করার কথা তার মনেই ওঠেনি; কিন্তু সে-কথা স্ত্রীর কাছে কবুল করতে সাহস হচ্ছিল না। একটা কবুল কোরে ইতিমধ্যে অপ্রতিভ হওয়া গেছে, আবার কি অপ্রতিভ হতে হবে? এই ভেবে সে একটা ফাঁকির পথ খুঁজতে লাগল।

তাকে চুপ থাকতে দেখে স্ত্রী বল্লে—“বুঝেছি! এ সব দেখবার বুদ্ধি তোমার ঘটে থাকলে ত?”

পুরুষের বুদ্ধির উপর মেয়েমানুষের টিট্‌কারি, যার দেহে এতটুকু পুরুষ-রক্ত আছে, তার পক্ষে সহ্য করা শক্ত। ভামিনী আর চুপ থাকতে পারলে না, সে বোলে উঠল—“ছিট্‌কিনি, গরাদে না থাকে, নাই আছে, তোমার তাতে কি?”

গৃহিণী বল্লে—“আমার কিছু নয়! চোরের সুবিধে হবে কতটা তাই ভাবছিলুম।”

ওরে বাপরে! সে যে বড় ভয়ানক কথা! চোর-জিনিষটার উপর পুরুষমানুষ হলেও ভামিনীর ভারি ভয় ছিল। তাই ত, কাজটা বড় বেফাঁশ হয়ে গেছে ত! এখন কি করা যায়? গৃহিণীকে না দেখিয়ে বাড়ী-ঠিক-করাটা যে ভালো হয়নি, ভামিনী এখন তা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলে। কিন্তু আর ত উপায় নেই, ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে যে! তখন ভামিনীর অভিমান হতে লাগল স্ত্রীর উপরে। সেই তো তাকে বাড়ী ভাড়া করতে পাঠালে, নইলে সে কি যেত? এখন তাকে দোষ দিলে চল্‌বে কেন? বাড়ী ভাড়া করতে যখন গেছে, তখন বাড়ীর ভাড়াটা দিয়ে ফেলা এমন কি অন্যায় হয়েছে? সে ত দিতেই হবে। নইলে ভাড়া পাওয়া যাবে কেন? হ্যাঁ, বটে, বাড়ীর ছাদ, দরজা, জান্‌লা, এসবগুলো তার দেখা উচিত ছিল। সে কি বল্‌ছে উচিত ছিল না? দেখা হয়নি, অদৃষ্ট! অদৃষ্টে থাকে ভাঙা জান্‌লা গলে চোর আসবে, ভাঙা ছাদ বয়ে জল পড়বে! সে তার কি করবে? সে-বাড়ীতে এখন যেতেই হবে—উপায় ত নেই। গৃহিণীও সেটা বেশ বুঝেছিলেন; তাই আর উচ্চবাচ্যে ফল নেই দেখে চুপ কোরে গেলেন। ভামিনী হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল!

সেদিন রবিবার সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে ভামিনী কতকগুলো মুটে ডেকে আনলে। তাদের মাথায় ঠুন্‌কো জিনিষগুলো দিয়ে, একটা গোরুর গাড়ীতে বাকি জিনিষ চাপিয়ে সে নতুন বাড়ীর দিকে রওনা হল। ফিরে এসে ছেলে এবং গৃহিণীকে নিয়ে যাবে গৃহিণী বলে দিয়েছিল—দেখো, সাবধানে জিনিষ-গুলো নিয়ে যেও, যেন কোনো মুটে মোট নিয়ে না পালায়! ভামিনী মুটেদের দিকে তাই খুব খরদৃষ্টি রেখে রাস্তায় চলছিল। হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়েছে আর অম্‌নি একটা মুটে সোজা-পথে না গিয়ে সাঁ-কোরে ডাইনের গলিতে বেঁকে পড়েছে। বাস্‌রে! কলকাতার মুটেগুলো কি সয়তান! দিনে ডাকাতি করে? কিন্তু ভামিনীর চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ

নয়! সে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে বল্লে—"ব্যাটা, পাজি চোর! জানিস্ তোকে এখনি পুলিশে দেব।"

মুটে ফিরে-দাঁড়িয়ে বল্লে—"কেয়া, তোম্ মাতোয়ালা হ্যায়?" এত বড় স্পর্দ্ধা, নিজে চুরি কোরে ভামিনীকে মাতাল বলা! ভামিনীর সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠল;—নেশাখোর অপবাদ সে কিছুতেই সইতে পারে না। সে চেঁচিয়ে বল্লে—"রোস্ ব্যাটা, তোকে মজা দেখাচ্ছি।" বোলে, সে কি মজা দেখাবে, সেইটে মনে-মনে রাস্তার চারিদিকে খুঁজছে, এমন সময় পিছন থেকে এক ভদ্রলোক এসে বল্লে—"কি মশায়, এত গোল কিসের?"

ভামিনী বল্লে—"দেখুন ত মশায়, আমার মাল নিয়ে এই মুটে-ব্যাটা পালাচ্চে। বল্‌তে গেলুম, তা চোখরাঙানি কত!"

ভদ্রলোকটি বল্লে—"এ মাল আপনার কি! এ যে আমার জিনিষ!"

ভামিনীর ভারি ভয় হল। সে বেশ বুঝতে পারলে এইবার চোরের উপর জুয়াচোরের পাল্লায় সে পড়েছে। সর্ব্বনাশ! চোরের হাতে নিস্তার ছিল, এর হাতে আর নিস্তার নেই! এরা দিনকে রাত করতে পারে। সে কাতর কণ্ঠে বল্লে—"দোহাই আপনার, এই গরীব-ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করবেন না!"

ভদ্রলোকটি যেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"কি বলছেন আপনি?"

ভামিনী হাত জোড় কোরে বল্লে—"এ গরীবকে রেহাই দিন—ধনেপ্রাণে মারবেন না কর্ত্তা!"

ভদ্রলোকটির বিস্ময় যেন উত্তরোত্তর বাড়তেই লাগল। তার এই ন্যাকামির ভান দেখে ভামিনীর বোধ হল লোকটা পাকা জুয়াচোর বটে! ভদ্রলোকটি বল্লে—"ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি।" ইতিমধ্যে রাস্তায় বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে; ভামিনীর মুটেরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না। সবাই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে—"কি হয়েছে? কি হয়েছে?" কি যে হয়েছে, মাথামুণ্ড কেউই জানে না, তবু যার যা খুসি সে সেই-রকম একটা উত্তর দিচ্ছে। কেউ বল্‌ছে চুরি, কেউ বল্‌ছে খুন, কেউ বল্‌ছে মারপিট, কেউ বল্‌ছে বোম', কেউ বল্‌ছে গাড়ি-চাপা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রকম চারিদিকে একটা গোলমালে ভামিনী ক্রমেই ধাঁধা খেয়ে যেতে লাগল। ভয় হল, একটা মুটের মাল ত গেছে, এইবার বাকিগুলোও না যায়! কি করবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে সে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। বাবুটি বল্লে—"কি মশায়, চুপ করে রইলেন কেন? কি বল্‌বেন বলুন, নয় ত আমার মুটে ছেড়ে দিন।" ভামিনী তখনো মুটের হাত চেপে আছে; সে-হাত ছেড়ে দিতে তার বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগল—হায়, এতগুলো মাল জুয়াচোরে ঠকিয়ে নিয়ে যাবে? কিন্তু উপায় কি? বেশী গোলমাল করলে হয়ত ছুরি মেরেই চলে যাবে। চুপ থাকাই ভালো। তবে একবার শেষ-আবেদনটা করে দেখা যাক্, এই ভেবে ভামিনী বল্লে—"তাহলে নিতান্তই আমার জিনিষগুলি আপনি নিলেন?"

ভদ্রলোকটি হেসে বল্লে—"আচ্ছা দেখুন দেখি ভালো কোরে, এ মাল আপনার?"

না?" বোলে তিনি মুটেকে মোট নামাতে হুকুম করলেন।

কি ভয়ানক! জুয়াচোরটা শুধু চুরি নয়, যাদুও জানে!—বেমালুম সমস্ত জিনিষের চেহারা বদলে দিয়েছে!

ভামিনী কি বলবে থতমত খেয়ে ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ একটা কথা মনে এল। তার মুটেরা সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে তাদের এক, দুই, তিন কোরে গুণে শেষে এক-গাল হেসে বল্লে—"না মশায়, ও জিনিষ আমার নয়—ভুল হয়েছে।"

ভদ্রলোকটি হাসতে-হাসতে মুটে নিয়ে চলে গেলেন; ভামিনীও নিজের মুটেদের ও গোরুর গাড়ী নিয়ে নতুন বাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তাই দেখে রাস্তার লোকেরা এ-ওর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কেনই বা এই গোলমাল, আর কেনই বা ওরা দুজনে বকাবকি করতে-করতে হঠাৎ ফিক্-কোরে হেসে যে যার পথে চলে গেল, কেউ বুঝতেই পারলে না। অবাক কাণ্ড!

মুটের মাথা ও গোরুর গাড়ির বুক থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে রেখে ভামিনীর মনে পড়ল, এইবার স্ত্রী আর ছেলে-পুলেদের আনতে হবে। পা বাড়াতে গিয়েই দেখে মহা মুস্কিল! এত জিনিষ এখন আগলায় কে? জিনিষ আগলাতে গেলে স্ত্রীকে আনা হয় না; স্ত্রীকে আনতে গেলে জিনিষ আগলানো হয় না। তবে উপায়? ভামিনী একটা মোটের উপর বসে-পড়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল—কি করা যায়? যতই যে
...তে লাগল ততই মনে হতে লাগল—
বুঝতে

করবার কিছুই নেই! হয় স্ত্রীর মায়া ত্যাগ করতে হয়, নয় জিনিষের মায়া ত্যাগ করতে হয়;—দুটোকে রাখার উপায় কিছুতেই নেই। ভাবতে-ভাবতে ভামিনীর চোখে কান্না এল। রাত জেগে-জেগে তার মাথা এমন গরম হয়ে উঠেছিল যে এখন একটুতেই তার কান্না পায়। তার কেবলই মনে হতে লাগল—হায়, হায়, তালা-চাবিগুলো কেন আনলুম না? তাহলে তো এ-বিপদে পড়তে হত না! কিন্তু হায়, হায়, করলে ত তালা-চাবি ছুটে আসে না, তবে উপায় কি? ভামিনী নিরুপায় হয়ে একেবারে ভেঙে পড়ল। তার সর্ব্বাঙ্গ এলিয়ে এল;—সে সেই মোটটার গায়ে হেলে-পড়ে চুপটি-কোরে আধ-শোয়া আধ-বসা অবস্থায় পড়ে রইল। এমনি কোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটতে লাগল। ইতিমধ্যে ঘুম একটু এসেছিল কি-না, সে খবর আমরা ঠিক জানিনা—অন্তত ভামিনী তা স্বীকার করে না।

হঠাৎ ছেলে-পুলেদের কলরব আর স্ত্রীর গলার আওয়াজ পেয়ে ভামিনী চম্‌কে উঠল। স্ত্রী এসে বল্লে—"আচ্ছা লোক তো তুমি! এই-আস, এই-আস কোরে বসে-বসে বেলা শেষ হয়, তবু তোমার দেখা নেই! এখানে দিব্যি বসে আছ! ভাগ্যিস্ বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নিয়েছিলুম, নইলে আসতুম কি কোরে বলো দেখি?"

স্ত্রীকে ফিরে-পেয়ে ভামিনীর যে আহ্লাদ হল, তাতে এই তিরস্কার তার গায়েই লাগল না। সে সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে-ফেলে উঠে দাঁড়াল।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে—"বলি, আমাদের আনতে গেলে না কেন?"

ভামিনীর মনে ভারি অভিমান হল। সে কেন যে কি করে, সে-দুঃখের কথা কেউ যদি বুঝত, তাহলে তার দুঃখ কিসের! সে কিছু না বোলে চুপ কোরে রইল। এই বাড়ী-বদ্‌লানোর হেঙ্গামে তাকে কত নির্যাতন সইতে হল, তার জন্যে আহা-উহু বল্‌বার কেউ নেই, আছে কেবল তার যেখানে ত্রুটি, সেইখানে খোঁচা দিয়ে তাকে জর্জ্জরিত কোরে তোল্‌বার লোক! হায় রে অদৃষ্ট!

ভামিনীর মুখ দেখে গৃহিণীর বড় মায়া করতে লাগল। সে বুঝলে রাত জেগে-জেগে বেচারার মাথার ঠিক নেই, তাই কি করতে কি করে ফেলছে! সেই জন্যে এই কথা নিয়ে সে আর কোনো উচ্চবাচ্য করলে না।

বাড়ীর অনেক দোষ ছিল, বাড়িতে পা দিয়েই তা গৃহিণীর চোখে ঠেকেছে; কিন্তু সে সব কথা তুলে স্বামীকে এখন উৎপীড়িত করতে তার মায়া হল। আহা বেচারা! নিদ্রাভঙ্গ স্বামীকে প্রফুল্ল করবার জন্যে সে বরং উল্টো রকমের কথা বলতে সুরু করলে।

সে বল্লে—"বাঃ, বেশ বাড়ী হয়েছে ত!"

কথাটা যেন ভামিনীর বিশ্বাস হল না; সে বল্লে—"সত্যি তোমার বাড়ী পছন্দ হয়েছে?"

গিন্নী বল্লে—"কেন, বেশ বাড়ী ত! খারাপ ত কিছুই দেখ্‌ছি না! তোমার পছন্দ আছে।"

ভামিনী হাঁফ্-ছেড়ে বাঁচল। মাঝে-মাঝে গৃহিণীর কাছ থেকে এম্‌নিতর প্রশংসা পায় বোলেই তার জীবনটা এখনো দুঃসহ হয়ে ওঠেনি! সে তখনি উৎসাহের সঙ্গে মোটপত্র সরিয়ে বাড়ী গুছোতে লেগে গেল।

স্ত্রী তার হাত ধরে বল্লে—"থাক, তুমি অনেক খেটেছ, একটু জিরোও।" বোলে সে স্বামীকে একখানা মাদুর পেতে দিলে। সেইখানে বসে জানলার ফাঁক দিয়ে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভামিনীর মনে হল যেন তার জীবনের কালো মেঘ কেটে গিয়ে শান্তির শুভ্রজ্যোৎস্না দেখা দিচ্চে! সে সেই মাদুরে শুয়ে পড়ল। গৃহিণী সংসার গুছোতে লেগে গেল।

বাজার থেকে খাবার আনিয়ে খেয়ে সেদিন খুব সকাল-সকাল শোয়া হল। ভামিনী আজ অনেকদিন পরে সুনিদ্রায় মুখদর্শন করবার আশায় বালিসগুলি ভালো-কোরে গুছিয়ে নিয়ে, চাদরটি পরিষ্কার-কোরে ঝেড়ে, হাতে একখানি ছোট্ট পাখা নিয়ে আরাম কোরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। তার মুখে-চোখে একটি অখণ্ড নিশ্চিন্ততার আবেশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। আজ সমস্ত দিন বেজায় পরিশ্রম গেছে, মানসিক উৎকণ্ঠাও ঢের কাটাতে হয়েছে—এইবার সে-সমস্তের অবসান হবে, এই আশা বুকে নিয়ে সে ধীরে-ধীরে চোখের পাতাটি বুজতে যাচ্ছে, এমন সময় একটা কথা মনে পড়ল। সে গৃহিণীকে ডেকে বল্লে—"দেখ, ভালো কথা মনে পড়েছে। কাল আটটার আগে আমায় যেন ঘুম থেকে ডেকে তুলো না—বুঝলে?" গৃহিণী খোকার জামার বোতাম টাঁকতে-টাঁকতে ছুঁচের সুতোটা দাঁতে কেটে বল্লে—"আচ্ছা।"

ভামিনী অভিমানের সুরে বল্লে—"অমন কোরে দাঁতে-দাঁত দিয়ে বলছ কেন? ভালো-করে বল। অনেকদিন পরে ঘুমটা আসছে—"

গৃহিণী হেসে বল্লে—"আচ্ছা। কোনো ভয় নেই তোমার, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও।"

ভামিনী বল্লে—"আর দেখ, খোকা যদি কেঁদে ওঠে, তাকে তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে দিয়ো—বুঝলে ?"

গৃহিণী বল্লে—"আচ্ছা !"

একটু চুপ কোরে থেকে ভামিনী আবার বল্লে—"দেখ, শুনচ ? রাত্রে যদি বৃষ্টির ঝাট্ আসে, আস্তে-আস্তে উঠে জান্‌লাটা বন্ধ করে দিয়ো তাড়াতাড়ি।"

গৃহিণী বল্লে—"সে সব হবে এখন, তুমি ভেবো না।"

বৃষ্টির কথা তুল্‌তে গিয়ে ভামিনীর বুকটা আবার ছাঁৎ করে উঠল! ছাদ দিয়ে যদি সত্যিই জল পড়ে? তবেই ত সব মাটী! তার ঐ অত কুণ্ডি জলের এই একটু আমেজ পেয়েই মিইয়ে আসতে লাগল। সে পাশ ফিরে শুয়ে মনের উপর একটা সজোরে ধমক-দিয়ে বল্লে—নাঃ! ছাদ দিয়ে জলটল্ পড়ে না।

সে যেমনটি মনে করছিল, তত শীঘ্র নিদ্রাদেবী তাকে দর্শন দিলেন না। একটার পর একটা ভাবনা এসে জাগরণের নানা আঁকা-বাঁকা পথে তাকে ঘোরাতে লাগল। যাকে বেশী আশা করা যায়, সেই দুনিয়ায় বেশী-কোরে ভোগায়! থেকে-থেকে ভামিনীর মনে একটা আপ্‌শোস্ আস্‌তে লাগল—এই এতখানি সময়টা বৃথা বহে যাচ্ছে। সে একবার চোখ খুলে সাম্‌নের কুলুঙ্গিতে টাইমপিশ্‌টার দিকে চেয়ে মনে-মনে হিসেব করে নিলে, এখনো যদি ঘুম আসে, তাহলে পুরো বারো-ঘণ্টা তার মারে কে। এতক্ষণ ঘড়ি নিয়ে কোনো আপদ ছিল না; একবার যেই তার দিকে চেয়ে দেখা কি অমনি আস্কারা পেয়ে সেটা কানের কাছে এমন টিক্‌টিক্ আরম্ভ করলে যে ভামিনী ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। সে আবার গৃহিণীকে ডেকে বল্লে—"ওগো, ঘড়িটা ওখান থেকে সরাও তো, বেজায় কানের কাছে টিক্‌টিক্ কর্‌ছে।" গৃহিণী ঘড়িটা দূরে সরিয়ে রাখতে ভামিনী আর-একবার পাশ-ফিরে শুলো। তারপর এটা-ওটা ভাবতে-ভাবতে, অন্ধকারে এদিক-ওদিক চল্‌তে-চল্‌তে হঠাৎ হোঁচট-খেয়ে একেবারে নিদ্রাদেবীর কোলের উপরে গিয়ে পড়ল।…

ঘুমের ঘোরে ভামিনীর হঠাৎ মনে হল, একটা প্রবল ভূমিকম্পে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ভয়ঙ্কর টল্‌মল্ করছে। তারি ধাক্কায় ঘুম-ভেঙে সে দেখে গৃহিণী তার গা ধরে সজোরে নাড়া দিচ্ছে আর বলছে—"ওগো, শুন্‌ছ—শুন্‌ছ ?"

ভামিনী ভয়ে-ভয়ে বল্লে—"কি ?"

"ওগো ওঠো, শিগ্‌গির ওঠো !"

ভামিনী গলার স্বর আরো ছোট কোরে বল্লে—"কেন ?"

"ঐ শুন্‌তে পাচ্চ ?"

সেই অচেনা জায়গায় অন্ধকারে পাছে বিদ্‌ঘুটে কিছু শুনতে হয়, সেই ত্রাসে ভামিনী তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে কান চেপে ধরলে।

গৃহিণী চীৎকার কোরে বল্লে—"শুন্‌তে পাচ্ছ কি ?"

ভামিনী কান চেপে ফিস্‌ফিস্-কোরে বল্লে—"না, পচ্ছিনা। তুমি কি শুন্‌চ, বলনা।"

গৃহিণী বল্লে—"ঐ যে থাম্‌লো, আর তো কোনো আওয়াজ নেই।"

ভামিনী বল্লে—"বাঁচা গেল! তুমি এখন শুয়ে পড়।"

খানিক সব চুপ্‌চাপ্‌। একটু বাদে গৃহিণী আবার ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে বল্লে—'ঐ-ঐ-ঐ শোনো

ভামিনী আচম্‌কা এই নাড়া পেয়ে তড়াক্‌ কোরে বিছানায় উঠে বসল। এবারে আর কান চাপবার কথা তার মনেই ছিল না। সে খোলা-কানে স্পষ্ট শুন্‌তে পেলে, কোমল-কণ্ঠে করুণ-সুরে নীচের মহল থেকে কে চীৎকার করছে—"কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষে কর—রক্ষে কর!"

সর্ব্বনাশ! ভামিনীর শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে আসতে লাগল। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গৃহিণী বল্লে—"আহাহা, খুন করে ফেল্লে গো!"

খুন! ভামিনীর চোখের সাম্‌নে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একবার ঘুরে গেল! সে এক-লাফে বিছানা থেকে মাটিতে এসে দাঁড়াল। আবার করুণ-সুরে শব্দ উঠল—"ওগো রক্ষে কর—রক্ষে কর!" সেই সুর কাঁদতে-কাঁদতে দূর-আকাশে মিলিয়ে গেল। ভামিনীর মনে হল যেন এক অসহায় বিপন্ন নারী তার পায়ের উপরে আছড়ে পড়ে কেঁদে মৃত্যুর কবল থেকে আশ্রয় চাইছে! দারুণ মৃত্যুভয়-মাখা দুটি আঁখি তার মুখের দিকে তুলে বুক-ফাটা সুরে বল্‌ছে—"ওগো আমায় বাঁচাও, তুমি বাঁচাও!" ভামিনী আর স্থির থাকতে পারলে না; ঝড়ের মতো ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি-বেয়ে নেমে গেল। পিছন থেকে স্ত্রী চীৎকার কোরে বল্‌তে লাগল—"ওগো, তোমার বুকে ছুরি মারবে, তুমি যেয়ো না—যেয়ো না!"

ভামিনী সেই আর্ত্তনাদ লক্ষ্য কোরে সদর-দরজার পাশে যে-ঘর, তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হল, অনেকগুলো লোক সেখানে জটলা করছে। বিঁড়ি-পোড়ার একটা তীব্র গন্ধে সেখানটা আচ্ছন্ন। ভামিনী অধীর-ভাবে দরজায় ধাক্কা মেরে বল্লে—"দরজা খোলো!"

ভিতর থেকে প্রশ্ন এল—"কেও?"

ভামিনী বল্লে—"দরজা খোলো বল্‌ছি! নইলে এখনি ভেঙে ফেলব।"

দরজা খুলে গেল। ভামিনী সজোরে ভিতরে প্রবেশ করলে। একটু পরেই একটা বিকট হাসির রোল শোনা গেল।......

ভামিনীর স্ত্রী এদিকে চোখ-বুজে এক-মনে ভগবানকে ডাকছে—"হে হরি, আমার স্বামীকে বাঁচাও—তোমার পুজো দেব, ঠাকুর! তার কোনো অপরাধ তুমি নিয়ো না!" তার কেবলই এই ভয় হচ্ছিল যে স্বামীর হরিসংকীর্ত্তনে অশ্রদ্ধাতেই বুঝি এই বিপদ ঘটল!' সে মনে-মনে কেবলই মানৎ করতে লাগল—"তুমি তাকে বাঁচাও ঠাকুর, আমি এইখানে তোমার সংকীর্ত্তন বসাবো!"

এমন সময় ভামিনীভূষণ ঘরে প্রবেশ কোরে বল্লে—"সর্ব্বনাশ!"

স্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠে তার হাত ধরে বল্লে—"হোক্‌গে সর্ব্বনাশ! তুমি আমার ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসেছ—এই ঢের!"

ভামিনী বিছানার উপর হতাশ হয়ে বসে পড়ে ব —"আমার প্রাণ এবার গেল!"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি দরজায় খিল্‌-লাগিয়ে

শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন গো, কি হয়েছে ?"

ভামিনী বল্লে—"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু ! এখন পালাই কোথায় ভাবছি !"

গৃহিণীর মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সে বল্লে—"অ্যাঁ, শেষে তুমি কি একটা খুন-জখম করলে না কি ? পুলিশে তোমায় তাড়া কোরে আসছে না কি গো ?"

"ওগো, না গো না !"

"তবে পালাতে চাচ্চ কেন ?"

"পালাতে চাচ্চি কি সাধে ? প্রাণের দায়ে !"

"প্রাণের দায় কি গো ? বলনা সব খুলে,—আমি যে হাঁপিয়ে মলুম !"

"কি আর বলব ? ব্যাটারা এইখানে এক থিয়েটারের আখ্‌ড়া গেড়ে বসে আছে, তা কি জানতুম ?"

"তাহলে ঐ খুনটুন্ ?"

"সে সব কিছু নয় !—ও অ্যাক্টিং হচ্ছিল !"

গৃহিণী সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"বাঁচা গেল ! প্রাণে কি ধুকপুকুনিই হয়েছিল !"

ভামিনী বল্লে—"কিন্তু এ যে কাত্তনের বাড়া !"

গৃহিণী আৎকে উঠে বল্লে—"না, না, আর কীর্ত্তনের নিন্দে করো না।" একদিন সে যে এখানে কীর্ত্তন দেবে বোলে ঠাকুরের পায়ে মানৎ করেছে, সে-কথাটা তখনকার মতো চেপে গেল, বল্লে—"নাও, এখন শোও। রাত এখনো ঢের আছে, এই সবে দশটা !"

ভামিনী আবার শুয়ে পড়ল। সে শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল এই যে নাগাড়ে তার ঘুমের ব্যাঘাত চলেছে, এর কি আর শেষ হবে না ? মনের দুঃখে গৃহিণীকে করুণ সুরে সে বল্লে—"হ্যাঁগা, তোমার কথায় বাড়ি ত বদ্‌লালুম ; কিন্তু এখানে আমার ঘুম কি হবে—ব্যাটাদের ঐ অ্যাক্‌টিঙের চীৎকারে ?"

কথার সুরটা গৃহিণীর মনে কেমন বাজল। সে ভাবতে লাগল, তাই ত এর কি কোনোই উপায় নেই ? ভাবতে-ভাবতে বেচারারও ঘুম চড়ে গেল। তারপর হঠাৎ একটা কথা তার মনে এসে লাগল। সে স্বামীকে ডেকে বল্লে—"ওগো, শুনছ ?" ভামিনীর সেই সবে মাত্র তন্দ্রাটি এসেছে, গৃহিণীর ডাকে সেটিও ভেঙে গেল। সে হতাশ হয়ে মনে-মনে বল্লে—"জীবনের মধ্যে স্ত্রী হচ্চে ঘুমের একটি জীবন্ত ব্যাঘাত !" তারপর মুখ-ফুটে বল্লে—"কি বলছ ?"

গৃহিণী বল্লে—"এক কাজ করলে হয় না ?"

ভামিনী কাতর স্বরে বল্লে—"কি ?"

"হাসবে না বল ?"

"না ! পোড়া-মুখে হাসি কি আর আছে ?"

"তোমার ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে কানে তুলো গুঁজে শুলে হয় না ?"

ভামিনী লাফিয়ে উঠে বল্লে—"ঠিক বলেছ !"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

রাতের পাখী

পরিপাটি বেশে অভ্যাগতের দল সুড়সুড় করে' এসে এক-একখানি তুলো-ভরা আসনের উপর হাঁটু-গেড়ে বসলো—মৌনমুখে। মেঝের উপর পুরু কোমল মাদুরের আবরণ। তার উপর দিয়ে এল নগ্নপদ পরিচারিকার দল। তারা সকলের সম্মুখে সাজিয়ে রাখলে গালা-করা নানা ভোজন-পাত্র—নিঃশব্দে। ক্ষণকাল সব নিঝঝুম। কেবল একটুখানি হাল্কা হাসি ভেসে বেড়াতে লাগলো সবাইয়ের ঠোঁটের উপর দিয়ে—যেন স্বপ্নের সুষমা। বাড়ীর চারিদিকে বিস্তীর্ণ উদ্যানের অবকাশ, তাই ভিতরে কর্ম্মময় বৃহৎ জগতের কোনো সাড়া পৌঁছায় না—সেখানে বিরাজ করে পরিপূর্ণ অখণ্ড স্তব্ধতা।

অবশেষে মানুষের একটু সাড়া পাওয়া গেল। কর্ম্মকর্ত্তা বল্লেন—যেমন সর্ব্বত্র সব কর্ম্মকর্ত্তাই বলে' থাকেন—ও-সোমাংসুদে গোজারিমাস গা! দোজো ও হাশি! অমনি সবাই মাথা নত করে' নমস্কার জানালেন। তারপর খাওয়া সুরু হল। বেশ নিঃশব্দেই সকলে আহার করছেন। কাঠি দিয়ে আহারে সবাই অভ্যস্ত। পরিচারিকার দল ক্ষিপ্র-চরণে সকলের পাত্রে তপ্ত সুরা পরিবেষণ করে ফিরছে। যতক্ষণ না অনেকটা খাদ্য ও সুরা উদরস্থ হয়, ততক্ষণ কারো মুখ খুলবে না।

সহসা স্ত্রীকণ্ঠের মিহি হাসির ধ্বনি সবাইকে সচকিত করে' তুল্লে। ঘরের মধ্যে সার-বেঁধে যেন ভেসে এল একদল তরুণী—স্রোতের জলে ফুলের মালার মত। তারা হাঁটু গেড়ে বসে' মরালগ্রীবা বাঁকিয়ে সমবেত ভদ্রগণকে অভিবাদন করলে; তারপর ভোজনরত নিমন্ত্রিত-শ্রেণীর মাঝে চপল-চরণে ঘুরে-ফিরে ললিত ভঙ্গীতে সুরা পরি-বেষণ সুরু করে' দিলে। এ কাজে তাদের দক্ষতা অসাধারণ। চমৎকার সুন্দরী এই সব তরুণী। অঙ্গে তাদের বহুমূল্য রেশমী পোশাক। নীবিবন্ধ যেন রাজরাণীর মত। মাথায় মনোহরণ খোঁপা। খোঁপায় ঝুটো ফুল, রংবেরঙের;—মনে হয় যেন টাটকা তোলা। কত বিচিত্র চিরুণী, কত অদ্ভুত কাঁটা, অপরূপ কত সোনার অলঙ্কার! অভ্যাগতের সঙ্গে তারা কথা কইছে যেন কতদিনের চেনাশোনা, কতকালের আলাপ-পরিচয়। হাসি-ঠাট্টা চলছে আর মাঝে-মাঝে তীক্ষ্ণ মিহিসুরের চীৎকার। এরাই হল 'গেইশা' —নর্ত্তকী; ভোজনের আসরে আনন্দ-বিতরণের জন্যে এদের আগমন।

সামিসেনের তারে ঘা পড়লো—ক্ড়ড়ং ক্ড়ড়ং। দালানের সুদূর প্রান্তে নর্ত্তকীর দল দাঁড়ালো—সার দিয়ে। কয়েকজন ঐক্যতান বাজাতে বসলো—কয়েকটি সামি-সেন ও একটি ডম্বরু—সেটি বাজায় একটি সুকুমার শিশু। একজন তাদের নেত্রী, বয়স তার অনুমান করা কঠিন।

নাচ আরম্ভ হল—একে-একে বা যুগলে-যুগলে। নমনীয় অঙ্গের সঞ্চালন-ভঙ্গিমা অপরূপ সুন্দর। পদক্ষেপ ও অঙ্গ-ভঙ্গীর

এমন আশ্চর্য্য সমতা সুদীর্ঘকালের একাগ্র সাধনা ভিন্ন অসম্ভব। নৃত্য বলতে সাধারণত যা বোঝায়, অধিকাংশ স্থলে এ নৃত্য সেরূপ নয়, বরং একে অভিনয় বলাই উচিত ;—পাখা ও আস্তীনের অসাধারণ সঞ্চালন, মুখচোখের কোমল মধুর সংযত খেলা একেবারে প্রাচ্য। দর্শকের কামনা উদ্দীপিত হয় এমন অনেক নৃত্যও তারা জানে। তবে সাধারণত, ভদ্র শিক্ষিত সভায় তারা প্রাচীন জাপানের পুরাণ-কাহিনীই নৃত্যে অভিনয় করে' থাকে,—যেমন 'সমুদ্র-দেবকন্যার দয়িত জেলে উরাশিমার কাহিনী' ইত্যাদি। মাঝে-মাঝে তারা গায় পুরানো চীনা কবিতা ;—কয়েকটি বাছা-বাছা চমৎকার কথায় সরল সহজ ভাবের আবেগ কত সরস ও সুস্পষ্ট !

এধারে সুরা পরিবেষণের বিরাম নেই ;—সেই কুসম-কুসম গরম ফিকে-হলদে তন্দ্রা-আনা সুরা আমাদের শিরা-উপশিরা স্নিগ্ধ সন্তোষে নিষিক্ত করে' মনটাকে যেন আনন্দ-সায়রে নিমজ্জিত করে। সেই সুরার নেশায়, আফিমের নেশার মত, অতি-সাধারণও অনির্ব্বচনীয় হয়ে ওঠে। গেইশারা রূপান্তরিত হয় উর্ব্বশী-মেনকায়, আর প্রতিদিনের তুচ্ছ জগৎ বড় মধুর, বড় রমণীয় হয়ে ওঠে।

যে-ভোজ এত চুপিচুপি নিঃশব্দে আরম্ভ হয়েছিল তা ধীরে-ধীরে আনন্দ-কলরবে মুখর হয়ে উঠল। তখন অভ্যাগতের সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মাঝে ভাঙন ধরে ; জনকয়েকে এক-সঙ্গে মিলে এক-একটা ছোট-ছোট দল রচনা করে। চারিদিকে তরুণীর দল সরস বচন আর মধুর হাসি বিলিয়ে বেড়ায় ;—সুরা-পরিবেষণ চলতেই থাকে, তার আর বিরাম নেই। পুরুষেরা পুরানো যুদ্ধের গান ধরে, কেউ বা চীনে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে। আনন্দের আতিশয্যে, এমন কি দু-এক জন নাচতেও সুরু করে' দ্যায়। গেইশা তার ভূলুণ্ঠিত পোশাক জানু পর্য্যন্ত তুলে ফ্যালে, সামিসেনে দ্রুততালে বেজে ওঠে—"কোম্পিরা ফুনে ফুনে!" বাজনার তালে-তালে গেইশা হালকা-ঢঙে ত্বরিত-পায়ে বাংলা ৪ সংখ্যার বিসর্পিত গতি বর্ণনা করে, আর সুরা-পাত্র ও বোতল-হাতে এক যুবক তার পিছু-পিছু ধায়। যদি সমরেখায় দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে তো যার ভুলে এরূপ ঘটে তাকে একপাত্র সুরা পান করতে হয়। বাজনা ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে ওঠে, যুবক ও যুবতীর চরণও ক্ষিপ্রতর হয়ে ওঠে—নইলে যে তাল কাটে—অবশেষে···সুন্দরীরই জয় হয়।

আর-এক দিকে অভ্যাগত ও গেইশায় আর-এক খেলা চলেছে। মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে খেলতে-খেলতে তারা গান গাইছে, হাত-তালি দিচ্ছে, আর মাঝে-মাঝে মিহি-সুরে চেঁচিয়ে উঠে চাঁপার কুঁড়ির মত আঙুলগুলি ছুড়ে এগিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সুর রাখছে সামিসেন—

চোইতো,—দোন্-দোন্ !
ওতাগাইদানে ;
চোইতো,—দোন্-দোন্ !
ওইদেমাশিতানে ;
চোইতো,—দোন্-দোন্ !
শিমাইমাশিতানে।

এই খেলার নাম 'কেন্'। এটি সংকেতের খেলা। নানাপ্রকার হয়। গেইশার সঙ্গে এ

খেলা খেলতে হলে মাথা রাখা চাই ঠাণ্ডা, দৃষ্টি হওয়া চাই তীক্ষ্ণ, আর অভ্যাস থাকা চাই রীতিমত। শিশুকাল থেকে গেইশা সবরকম 'কেন্'ই খেলতে শিখেছে ;—তারা যখন হারে তখন বিনয়ের খাতিরেই হারে, অন্যথা বড়-একটা নয়। খুব সাধারণ 'কেন্'-এর সংকেত তিনটি—মানুষ, শেয়াল ও বন্দুক। গেইশা যদি বন্দুকের সংকেত আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে তো তখুনি বাজনার তালে তোমাকে সেই শেয়ালের সংকেত দেখাতে হবে —যে বন্দুক ব্যবহার করতে পারে না; তার পরিবর্তে যদি তুমি তখন মানুষের সংকেত দেখাও তাহলে গেইশা তখুনি উত্তর দেবে শেয়ালের সংকেত দিয়ে—মানুষকে যে ঠকাতে পারে। তাহলে তোমার হবে হার। যদি সে প্রথমে শেয়ালের সংকেত নির্দেশ করে তবে তোমায় তার জবাব দিতে হবে বন্দুকের সংকেত দিয়ে—যা দিয়ে শেয়ালকে বধ করা যায়। কিন্তু নিয়তই তোমাকে তার চপল চোখ আর কোমল করপল্লবের পানে দৃষ্টি রাখতে হবে। দুই-ই বড় সুন্দর! তা দেখে নিমেষের জন্যেও যদি তোমার মনে মোহের সঞ্চার হয় তো ব্যস! তোমার মাথা যাবে ঘুরে আর তুমি খেলায় যাবে হেরে।

এত মেলামেশা সত্ত্বেও জাপানী ভোজে অভ্যাগত আর গেইশার ব্যবহারে একটি শোভন-সংযম সদাই রক্ষিত হয়। সে সংযমের সীমা কেহই লঙ্ঘন করেনা। সুরা-পানের মাত্রা লঙ্ঘন করেও কখনো কোনো অভ্যাগত গেইশাকে আলিঙ্গন বা চুম্বন করে বেয়াদবী করতে উদ্যত হয়েছে, দেখা যায় না। অভ্যাগত স্মরণ রাখে গেইশা সভায় এসেছে সভার শোভা বর্দ্ধনের জন্যে ;—সে একটি ফুলের মত—তাকে দেখেই পরিতুষ্ট হওয়া চাই, স্পর্শ করে' নয়।

ক্রমে রাত বেড়ে যায়। রাত দুপুরের কাছাকাছি অভ্যাগতেরা একে-একে বিদায় হয়—নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে, যেমন করে' এসেছিল তেমনি করেই। কলরব ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে আসে, বাজনা নীরব হয়। অবশেষে শেষ-অভ্যাগতকে অলিন্দ পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মধুরকণ্ঠে স্মিতহাস্যে তাকে বিদায়-নমস্কার 'সায়োনারা' জ্ঞাপন করে' গেইশা ফিরে আসে সেই পরিত্যক্ত জনশূন্য স্তব্ধ কক্ষে—তার সুদীর্ঘ উপবাসক্লান্তি অপনোদনের আশায়।

এই হল গেইশার জীবন-ধারা। রাতের পর রাত এমনিই চলে। কিন্তু তার রহস্য, —কে তা জানে? কি তার চিন্তা? তার অন্তরের রূপটি কেমনধারা? তার মনের গভীর গোপনে কোন্ ভাবের খেলা চলছে? আলোকে-উজ্জ্বল ভোজের আসরের বাইরে তার সত্যকার জীবন, সে কেমন? কেমন সে, সুরার অস্পষ্ট মোহ-বেষ্টনার পরপারে? কণ্ঠে মধুর হাসির ফোয়ারা তুলে কতকালের পুরানো গান যখন সে গায়—

কিমিতো নেয়াকু কা, গোসেংগোকু তোরুকা?
নান্নো গোসেংগোকু? কিমি তো নেয়ো।

অর্থাৎ—

যারে ঘিরে ফেরে মন
তারে চাও অনুখণ?
কিবা ধন অগণন চাও হিয়া রে!
সারা প্রাণে যারে চিনি
তারে চাই নিশিদিনই
চাইনে হাজার গিনি, চাই প্রিয়ারে।

তখনকার সেই চটুলতা কি তার মজ্জাগত? না সেটা কৃত্রিম—শুধু ক্ষণেকের? আর যে অলৌকিক নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞায় সে আমাদের চিত্ত স্নিগ্ধ করে' তোলে সে-প্রতিজ্ঞা কি সে পালন করতে সক্ষম?

ওমায়ে শিন্দারা তেরা এওয়া য়্যারান্
য়্যায়েতে কোনিশিতে সাকে দে নোমু!

অর্থাৎ—

দারুময় গেহে রাখিবনা দেহ
তুমি হবে যবে অপ্রকাশ,
মদ্যে মিশায়ে শ্মশান-ভস্ম
পান করে' যাবো তব সকাশ!

গেইশার বাড়ীর কুলঙ্গিতে থাকে একটি অদ্ভুত মূর্ত্তি। সে-মূর্ত্তি কখনো মাটির, সাধারণত চীনামাটির, ক্বচিৎ সোনার হয়ে থাকে। মূর্ত্তিটির ভারি সম্মান—সম্মুখে পূজা-উপচার সাজানো। মিষ্টান্ন, চালের পিঠে ও সুরার ভোগ; প্রদীপের আলো ও ধূপের ধোঁয়া—সবই থাকে। মূর্ত্তিটি একটি বিড়াল-শাবকের;—পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে একটি থাবা প্রসারিত করে' রেখেছে, যেন আহ্বান করছে! সে আনে সৌভাগ্য, ধনীর প্রসাদ, ভোজ-সভার আমন্ত্রণ! গেইশার অন্তরের সংবাদ যারা রাখে, তারা বলে এ-মূর্ত্তি গেইশারই বিগ্রহ—symbol। চঞ্চল ও সুন্দর, নবীন ও সুকোমল, তন্বী ও সোহাগী; আর নিষ্ঠুর যেন আগুন!

এর চেয়েও কঠিন কথা তারা বলে:—দারিদ্র্যের কঙ্কাল তার ছায়া অনুসরণ করে; যুবাজনের মস্তক সে চর্ব্বন করে; সম্পত্তিতে আগুন ধরায়; পরিবার ছারখার করে। তার সৌন্দর্য্যও যেমন অসাধারণ, তার মিথ্যাচারও তেমনি গভীর!

কিন্তু পুরুষের উদ্দাম কামনা এবং ভোগ-লালসার ফলে যার উদ্ভব সে আর কেমন হবে? পুরুষ চেয়েছিল দায়িত্ব ও দুঃখের ভাগ এড়িয়ে কেবল রূপযৌবন ও প্রেমের মায়াজালে আপনাকে জড়াতে। তাইতো গেইশা শিখেছে হৃদয় নিয়ে খেলা করতে। আমাদের এই জগতে নির্ব্বিঘ্নে সব খেলাই খেলা যায়, যায় না কেবল তিনটি খেলা। তা হচ্ছে—জীবন, প্রেম ও মৃত্যু নিয়ে খেলা। ও-খেলা দেবতাদেরই সাজে, মানুষে পারবে কেন?

জীবনের প্রত্যূষে গেইশা ক্রীতদাসী। অসহনীয় দারিদ্র্যের পীড়নে নিরুপায় পিতা-মাতার ফুটফুটে মেয়েটিকে যে কেনে সে এই সর্ত্তে—মেয়েটি আঠারো কুড়ি কখনো বা পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তার সম্পত্তি, তারই কথায় ওঠা-বসা করবে। মেয়েটির আহার-বিহার শিক্ষা-সহবত সমস্তই হয় গেইশার আস্তানায়। তার শৈশব কাটে কঠোর নিয়মের নাগপাশ-বন্ধনে। শোভন ভদ্র বাক্য ও ব্যবহার তাকে শিখতে হয়। নৃত্যশিক্ষা প্রত্যহই চলে। উপরন্তু তাকে কণ্ঠস্থ করতে হয় ঝুড়ি-ঝুড়ি গানের কথা ও সুর। খেলা শিখতে হয় নানাপ্রকার; আর শিখতে হয় ধনীর ভোজে বা বিবাহ-সভায় সুরা ও খাদ্য পরিবেষণ। পরিপাটি সাজসজ্জা ও প্রসাধন সাহায্যে সুন্দর হবার কৌশল আয়ত্ব করতে হয়। শারীরিক সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায় নিয়তই সে বিব্রত। পরে আসে বাজনা-শিক্ষা। প্রথমে শেখে ৎ-সুজুমি—ছোট তবলা; তারপর শেখে

সামিসেন—তারের যন্ত্র; সেটি বাজাতে হয় হাতির দাঁত বা কচ্ছপের খোলার মেজরাপ দিয়ে। আট-ন' বৎসর বয়সে সে ভোজ-সভায় যাতায়াত আরম্ভ করে—তবলা বাদিকারূপে। তখনি সে বোতলটা একবার মাত্র হেলিয়েই সুরাপাত্র কানায়-কানায় পূর্ণ করতে শিখেছে—এক বিন্দু সুরাও অপচয় না করে'।

ক্রমে তার শিক্ষাপ্রণালী আরো কঠোর হয়ে ওঠে। তার গলা হয়তো খেলে ভালো, তবে জোর কম, তাই নিশীথ রাতের নিদারুণ শীতে সারাদেশ যখন স্তম্ভিত মৃতপ্রায়, সে তখন যন্ত্র নিয়ে মুক্ত ছাদের উপর গানবাজনা অভ্যাস করে—যতক্ষণ না তার আঙুলের শীর্ষভাগ রুধিরাক্ত হয়ে ওঠে আর কণ্ঠের সুর কণ্ঠেই মিলিয়ে যায়। এর ফল হাতে-হাতে পাওয়া যায়—ভয়ানক সর্দিকাশি। স্বরভঙ্গ হয়ে কণ্ঠ দিয়ে অস্পষ্ট ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া বড়-একটা-কিছু আর বার হয় না। কিছুকাল এই দুর্ভোগ চলে, তারপর কণ্ঠের সুর ও শক্তি, উভয়েরই উন্নতি ঘটে। সে নাচ-গানের আসরে অবতীর্ণ হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। সাধারণত তখন তার বয়স বারো-তেরো বৎসর। রূপ ও বিদ্যা থাকলে কাজের অভাব হয় না—ঘণ্টায় সে পাঁচ-ছয় আনা উপার্জ্জন করে। তার শিক্ষার জন্যে যে সময়, অর্থ ও চেষ্টা ব্যয় হয়েছে তার ফল ফলতে যখন সুরু হয়, তখন তার মালিক তা সুদসুদ্ধ আদায় করেন। বহুবৎসর পর্য্যন্ত গেইশার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই তার মালিক কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেন। গেইশার আপনার বলতে কিছুই থাকে না, এমনকি যে পোশাকটি সে পরে, সেটিও না।

বয়স যখন তার সতেরো-আঠারো বৎসর তখন তার খ্যাতি হয়েছে। এই কয় বৎসরে কত আসরে যে সে নেমেছে তার আর সংখ্যা নেই। যে-শহরে তার বাস, সেখানকার সকল খ্যাতনামা ব্যক্তির আকার-প্রকার ও জীবন-ইতিহাস তার নখদর্পণে। তার জীবন, রাতেরই জীবন। যখন থেকে নর্ত্তকী হয়েছে, তখন থেকে পূর্ব্বগগনে সূর্য্যোদয় সে দ্যাখেনি। আজকাল প্রচুর সুরাপানেও তার মত্ততা আসে না; সাত-আট ঘণ্টার অনশনক্লেশ সে অকাতরে সহ্য করে। কত লোকই যে তার কাছে প্রেম নিবেদন করেছে তা আর বলবার নয়। যাকে ভালো লাগে তার প্রতি কতকটা মমতা প্রকাশ সে করতে পারে—তবে রূপের মোহজাল বিস্তার করে' স্বার্থসিদ্ধি করাই যে তার প্রধান কর্ত্তব্য সে-সম্বন্ধে তাকে সচেতন রাখবার চেষ্টার ত্রুটি হয় না।

এইখানে গেইশার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া যাক। অল্পবয়সে যদি তার মৃত্যু হয় তবেই ভালো, নইলে...থাক সে দুঃখের কাহিনী শুনে কাজ নেই।

* * *

গভীর রাত। তথাগতের মন্দিরের সিংহ-দ্বার অতিক্রম করে' বাতাসে ভেসে আসছে সামিসেনের রিনিঠিনি আর স্ত্রীকণ্ঠে-গীত গানের ঈষৎ একটু আভাস। ভিতরে মন্দির-প্রাঙ্গণে জনতা—স্তব্ধ, উৎসুক। জনতার সম্মুখে মন্দিরের সোপানশ্রেণীর শীর্ষদেশে শুভ্র মাদুরের আস্তরণ। তার উপর দুজন গেইশা। একজন গাইছে, একজন বাজাচ্ছে। অদূরে একখানি নীচু ছোট টেবিল, তার উপর একখানি 'ইহাই'—লোকান্তরিতের স্মৃতি-

ফলক। ফলকের সম্মুখে প্রদীপের স্তিমিত আলো; কাংস্যপাত্রে ধূপের সুগন্ধি ধূম। ছোট্ট একখানি রেকাবীতে নৈবেদ্য—ফলমূল ও মিষ্টান্ন। টেবিলের পাশে একজন গেইশা—নৃত্যরতা।

স্মৃতি-ফলকটি একজন গেইশার—এদেরই সখী ও সঙ্গিনী। তার স্মরণে এই নৃত্য-গীতের আয়োজন—নিঝুম রাতে, দেবায়তনে; অবারিত যাঁর দ্বার এবং অসীম ও অব্যাহত যাঁর শান্তি।*

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিরসঙ্গী

দিবসে যখন শত কাজে থাকি,
শত চিন্তায় ভোর,
সংসার এসে ছেয়ে ফেলে মনে
সব ঠাঁইটুকু তোর!
তখনো সকল কাজের মাঝারে
তোর পরিচয় পাই বারে-বারে,
না পারি ছাড়িতে, ঘুরিয়া বেড়াস্
আমার হৃদয় ঘিরে,
পক্ষিণী যথা নীড়খানি বেড়
উড়িয়া-উড়িয়া ফিরে।
তোমারি পক্ষ-ঝাপটে আকুল
মাঝে-মাঝে কাজে হয়ে যায় ভুল,
তোর সে পাখার ছায়া এসে পড়ে
সব চিন্তায় কাজে!
রে মোর ব্যাকুল নীড়-হারা পাখী,
চকিতে চমকি শুনি থাকি-থাকি
বেদনা-বিভোর আহ্বান তোর
মধুর করুণ বাজে।

নিশীথে যখন রহি আমি একা
নাহি থাকে কাজ কিছু,
সংসার যবে সরি যায় দূরে
ভাবনা লইয়া পিছু;
তুই ছাড়া কিছু নাহি রহে আর,
তোরি সে পরশ লভি চারিধার,
তোরি সীমা-হারা শান্তির মাঝে
মগন হইয়া থাকি;—
পক্ষিণী যথা রাখে শাবকেরে
পক্ষের তলে ঢাকি।
তোমারি কোমল তপ্ত পরশে
মোহরস-ধারা সরসে বরষে,
সুধীর বক্ষ-স্পন্দন-তালে
ঘুম ঘনাইয়া আনে;
ঘুম সে তোমারি পক্ষের ছায়া,
তব স্নেহ রচে স্বপ্নের মায়া,
যেন নিজেরে বিছায়ে রেখেছ আমার
নিশীথের মাঝখানে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

---

* লাফকেডিয়ো হার্ণ হইতে।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪৪শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ [২য় সংখ্যা

এই হল জীবন সম্বল

এই হল জীবন সম্বল!
গুটিকত ছবি আর খান-কত চিঠি,
যে কথা ভুলিব বলে' মনে বাঁধি বল,
তুলির পরশে আঁকা প্রাণহীন দিঠি,
তাই মোরে ভুলায় কেবল!

ভাবিব না ভাবি যেই কথা,
এ কাজে, সে কাজে ফিরি, পড়ে শুধু চোখে,
অনিমেষ নয়নের বাঁধা আকুলতা,
যাহা নাই, তারি লাগি পলকে পলকে
একা আমি, চলে যাই কোথা!

চোখে মোর ভরে' আসে জল,
আলোক মিলায়ে যায় ছায়া আসে ঘিরে,
একেলা ঘরের কোণে বিছায়ে আঁচল
চিঠিগুলি কোলে তুলে, দেখি ফিরে ফিরে!
মূর্ত্তি ধরে অক্ষরের দল!

হেসে কেউ শুয়ে পড়ে কোলে,
কেউ আসে অভিমানে চক্ষু ছল-ছল,
কাঁপে ঠোঁট, চায় মুখে কথাটি না বলে'
ভুল করা, ভুল বোঝা, তারি প্রতিফল
দিয়ে যায় প্রতি পলে পলে!

কবে কার ভুলে-যাওয়া ব্যথা,
আবার নতুন হয়ে ভরে ওঠে বুকে,
কবেকার সোহাগের সুধার বারতা,
সহসা সম্বিৎ হারা করি দেয় সুখে!
ভুল হয় আজিকার কথা!

হায় ভুল, কি তার জীবন?
চমক ভাঙ্গিয়া যেতে লাগেনাত দেরী,
দিনের আলোক-জ্বালা জাগ্রত ভুবন,
কে পারে স্বপন দিয়ে রাখিবারে ঘেরি?
অতীত যে, আশাতীত ধন!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

অনন্ত বাসুদেব

আমরা ভুবনেশ্বরের মন্দির লিঙ্গরাজ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি শুনিয়া বন্ধুবর র—জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরেও গিয়াছিলে ?" কেবল দেশ বেড়াইতে যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র ; কিন্তু তীর্থ-কর্ত্তব্যাদি সম্পাদন করিতে হইলে পুরাণোক্ত নির্দ্দেশ-অনুসারে অগ্রেই এই বিষ্ণু-মন্দির দর্শন করা বিধেয়। (১) কপিল সংহিতার একাদশ অধ্যায়-পাঠে জানা যায় যে শিবের এই তীর্থে আগমনের পূর্ব্বে বাসুদেব ও অনন্ত তথায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।(২) কিম্বদন্তী-মতে বিষ্ণুই মহাদেবকে এই স্থানে তাঁহার গুপ্ত আবাস সংস্থাপিত করিতে অনুমতি প্রদান করেন। (৩) সেইজন্য লিঙ্গরাজের পূজার পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরের এই একমাত্র বিষ্ণুমন্দিরে অনন্ত ও বাসুদেবের অনুমতি-গ্রহণ-উদ্দেশ্যে পূজার্চ্চনা করিতে হয়। বিন্দুসাগরে স্নান ও পিতৃতর্পণাদি না করিয়া এবং যথারীতি মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক অর্দ্ধ-পাপহরা দেবীর পূজা সমাপন না করিয়া কোনও পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীই লিঙ্গরাজ দেবকে দর্শন করার অধিকার লাভ করেন না। সম্ভবতঃ এই প্রচলিত বিধি ও পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতি হইতে সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ভট্ট ভবদেবের এই মন্দির লিঙ্গরাজ দেউল অপেক্ষাও প্রাচীন।

পৌরাণিক বৃত্তান্ত হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্কাশন বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ব্রহ্মপুরাণে অনন্ত বাসুদেবের যে 'গুহ্য বৃত্তান্ত' বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কলিযুগের কোনও মন্দির-নির্ম্মাতার উল্লেখ দেখা যায় না এবং উহা যে একাম্রক্ষেত্রে অবস্থিত এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও কোথাও নাই। (৪) ভৌগোলিক অবস্থান-প্রসঙ্গে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের (৫) উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরটির বিষয়ই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরীতীর্থে জগন্নাথদেবের মন্দিরের অন্তর্গত অনন্ত বাসুদেবের ক্ষুদ্র মন্দিরটি সাধারণের নিকট সেরূপ পরিচিত নহে, পক্ষান্তরে কপিল সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে একাম্রক্ষেত্রের এই জনার্দ্দন মূর্ত্তির বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে, দেখিতে পাই।

---

(১) "তস্মাদ্বিন্দুহ্রদে স্নাত্বা দ্রষ্টব্য পুরুষোত্তমঃ। দেবী পাপহরা চৈব দ্রষ্টব্য সাবধানতঃ"। শিবপুরাণ ৫ম অধ্যায় quoted in J. A. S. B. Vol. VIII. 1972. p. 343.

(২) ১১শ অধ্যায় ২২ পৃঃ কপিলসংহিতা, এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি।

(৩) Ant. Orissa Vol. II. p. 62.

(৪) ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ ১৬৭ অধ্যায় পৃঃ ৬৯০—৬৯৩।

(৫) ঐ পৃঃ ৬৯১।

'একাম্রে পরমং ব্রহ্ম বাসুদেবেতি সংজ্ঞকঃ।
ভাতি পাষাণ-বপুষা মুক্তি দোমুরনাশনঃ॥
কৃত্বা কার্য্যমকার্য্যং বা দৃষ্টৈ্বকাম্রে জনার্দ্দনং।
নরো বৈকুণ্ঠমাপ্নোতি নান্যথামুনিসত্তমাঃ॥ (৬)
সুতরাং মনে হয়, যে এই অনন্তবাসুদেব ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব হওয়াই সম্ভব।

অনন্ত বাসুদেবের মন্দির।

ব্রহ্মপুরাণোক্ত বৃত্তান্তে বিশ্বকর্ম্মা বিগ্রহ মূর্ত্তির নির্ম্মাতা, এবং প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং দেবরাজ। মেঘনাদ ইন্দ্রপুরী অধিকার করিলে পর অনন্ত-বাসুদেব মূর্ত্তি লঙ্কায় আনীত হয় এবং বিভীষণ উহা ভ্রাতার নিকট হইতে চাহিয়া লন। রামচন্দ্র লঙ্কা-বিজয়ের পর অযোধ্যা-পুরীতে এই মূর্ত্তি আনয়ন করেন এবং 'দুর্লভ বৈষ্ণব পদে' প্রবেশ-কালে সমুদ্ররাজকে উহা প্রদান করেন। পরে কংশাদি দুষ্ট রাজগণকে বধার্থ সঙ্কর্ষণসহায় ভগবান কৃষ্ণ বসুদেবকুলে অবতীর্ণ হইলে সরিৎপতি সমুদ্র কোনও কারণান্তর জল হইতে এই প্রতিমা উদ্ধার করেন। দ্বাপরযুগের এই ঘটনায় (৭) উল্লেখ করিয়াই পুরাণ-কার অনন্ত বাসুদেব-মাহাত্ম্য সমাপ্ত করিয়াছেন। মন্দিরটি লিঙ্গরাজ মন্দিরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াই হয়তো কপিল-সংহিতা রচয়িতা পাছে উহার গৌরব ক্ষুন্ন হয়, এই ভয়ে লিখিয়াছেন যে যদি কেহ 'আমি একাম্রক্ষেত্রে গিয়া পুরুষোত্তম-দেবকে দর্শন করিব' এই কথাকয়টি মাত্র উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি বিষ্ণুপুর গমন করে। (৮)

র—বলিলেন, "তীর্থযাত্রী হিসাবে না হইলেও আর এক কারণে এই মন্দিরটী বাঙ্গালীর অবশ্য-দ্রষ্টব্য। মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ভট্ট ভবদেব রাঢ়ীয় শ্রেণীর সাবর্ণ গোত্রীয়

(৬) কপিল সংহিতা, এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি, পৃঃ ৩০।

(৭) একাম্রকং গমিষ্যামি দ্রক্ষ্যামি পুরুষোত্তমং। ইত্যুচ্চরতি বক্তাস্তে সোঽপি বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ। কপিলসংহিতা (A. S. B. Ms.) পৃঃ ২৯।

(৮) J. A. S. B. Vol. VIII. 1612. p. 340.

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বঙ্গদেশে সাবর্ণ চৌধুরীদিগের বংশধরগণ এখনও বিদ্যমান।"(৯)

র—ভায়ার এ কথা শুনিয়া আমাদেরও বিশেষ আগ্রহ জন্মিল; বলিলাম, "আজ বৈকালেই তুমি আমাদিগকে সেখানে সঙ্গে লইয়া চল।"

মন্দিরে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া মন্দির-দর্শনের জন্য জনৈক পাণ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিলাম। সে ব্যক্তি একটি আলো লইয়া আমাদিগকে মন্দির প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিল। প্রাঙ্গণটি আগাগোড়া বালিয়া ও মুগনি পাথরের টালি দিয়া বাঁধান। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে বহুসংখ্যক খণ্ডালাইট (Khondalite) জাতীয় প্রস্তরের খণ্ডও এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের চারিদিকে ৯ ফিট্ উচ্চ ল্যাটেরাইট্ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর। এই চৌহদ্দিভুক্ত সমগ্র ভূ-খণ্ডের পরিমাণ ·১০৩ একর্—সোজা হিসাবে প্রায় এক বিঘা আন্দাজ হইবে। আসল মন্দিরটি যে-জমির উপর অবস্থিত তাহার পরিমাপও ·০৮২ একরের কম নহে। এ মন্দিরের নির্ম্মাণ-প্রণালী ঠিক লিঙ্গরাজ মন্দিরেরই অনুরূপ। খোদাই কাজ ও নক্সা প্রভৃতিতে পদে পদে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, যেন বড় দেউলের ইহা একটী ছোট-খাট সংস্করণ মাত্র। তবে একটু তফাৎ এই যে অন্যান্য দেবমন্দিরগুলি পূর্ব্বদ্বারী; কেবল এই দেউলটীরই তোরণ পশ্চিম মুখে অবস্থিত। ভারতবর্ষে মন্দিরাদি হউক বা আবাস-গৃহই হউক বায়ু ও আলোকের অবাধ চলাচলের জন্য এবং সম্ভবতঃ স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-কল্পেও পূর্ব্বদ্বারী করিয়াই নির্ম্মিত হইত; শিল্পশাস্ত্র মতে নরসিংহ অবতার ব্যতীত বিষ্ণুর অন্যান্য অবতার মন্দিরগুলি পূর্ব্বদ্বারী করিয়া নির্ম্মিত হইত। (১০) ডাক্তার লে বঁ (Le Bon) এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে মণিকোটায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ উদীয়মান সূর্য্যের সম্মুখীন থাকেন। এই উদ্দেশ্যেই প্রধান দ্বার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত হইত। সাধারণ রীতির এই ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রে যে কি কারণে ঘটিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

দেখিলাম, প্রবেশদ্বারের অনতিদূরে পশ্চিম প্রাচীরের ভিতরের দিকে দুইখানি শিলালিপি সংলগ্ন রহিয়াছে। একখানি ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি ও অপরখানি স্বপ্নেশ্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মেঘেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক অরপ লিপিদ্বয়ে ব্যবহৃত বর্ণমালা, বিশেষজ্ঞের মতে বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর সমূহের সহিত সাদৃশ্য-

(৯) 'মানসার' শিল্পশাস্ত্রে এইরূপই বর্ণিত আছে—"পূর্ব্বকে শ্রীকরং প্রোক্তং নারায়ণমথাপি বা। গ্রামস্যাভিমুখং বিষ্ণুং নারসিংহং পরাঙ্মুখম্॥" (M. A. Ananthalwars Indian Architecture. pp. 147.—148. Book I, Chap IX.) কিন্তু শিবালয়গুলি যে পশ্চিম দ্বারীও হইতে পারিত 'মানসার' গ্রন্থে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

(১০) M. Ganguly's Orissa p. 370.

বুক্ত বলিয়া বিবেচিত। প্রধান মন্দিরের চারিটি কোণে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত; তাহার মধ্যে দুইটী ভগ্নদশাপন্ন। আমরা মন্দির দর্শন-কালে কোনও পাণ্ডাকে পশ্চিমদিকস্থ ক্ষুদ্র মন্দিরটীতে পাক করিতে দেখিয়াছিলাম। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে স্বতন্ত্র পাকশালা নির্দ্দিষ্ট থাকায় র-ভায়া প্রাচীন মন্দিরের এরূপ অপব্যবহার অন্যায় বলিয়া বিশেষ অনুযোগ করিলেন। পাণ্ডা মহাশয়ও লজ্জিতভাবে প্রতিশ্রুত হইলেন যে তিনি আর কখনও সে মন্দির এরূপভাবে ব্যবহৃত হইতে দিবেন না। বস্তুতঃ মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে মধ্যযুগের এই সকল প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তিস্তম্ভগুলি এখনও অনেকাংশে অল্লায়াসেই রক্ষা পাইতে পারে। মন্দিরের চারিটি অংশ ১—শিখর ২—জগমোহন ৩—নাটমন্দির ৪—ভোগ-মন্দির। জগমোহনের দ্বারদেশে নবগ্রহ প্রস্তর সংলগ্ন থাকায় অনুমান হয় যে মন্দিরটী পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল; যে হেতু মন্দিরের পুরোভাগে অবস্থিত মণ্ডপাদির দ্বারদেশেই সাধারণতঃ এ প্রস্তর সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। নাটমন্দিরের অবস্থান হেতু মন্দিরের অন্তর্দ্দেশ বড়ই অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার গঠনও নিতান্ত সাদা-সিধা ধরণের; সেজন্য উহা পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত বলিয়াই ধারণা জন্মে। ভোগমণ্ডপে অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতির ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহাই মহাপ্রসাদ বলিয়া পরিগণিত। জগন্নাথ ও লিঙ্গরাজের প্রসাদের ন্যায় অনন্ত বাসুদেবের প্রসাদও জাতিভেদজনিত স্পর্শদোষে কলুষিত হয় না। বিশেষজ্ঞগণ এই প্রসাদ-মাহাত্ম্য মন্দিরের প্রাচীনত্বের একটী সুস্পষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করেন। রাজা-রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভোগমণ্ডপটীও পর-বর্ত্তীকালে নির্ম্মিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া-ছিলেন। ইহাতে কোন রূপ কারুকার্য্য নাই; কেবল দেওয়ালে পঙ্কের প্রলেপেই যাহা-কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়। শিখর ও জগমোহনের গাত্রের খাঁজ ও কুলঙ্গিতে বহুসংখ্যক মূর্ত্তি আছে, কিন্তু নাটমণ্ডপে এরূপ একটীও মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। রাজা রাজেন্দ্র-লাল কলস পর্য্যন্ত শিখরাংশের মাপ ৬০ ফুট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর মহাশয়ের মতে বিমানের উচ্চতা ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হওয়াই সম্ভব। শিখরের সহিত সংলগ্ন ছোট ছোট তিনটী মন্দির আছে। এগুলি জগমোহনের ন্যায় প্রবেশ-প্রকোষ্ঠরূপেই (Vestibule) ব্যবহৃত হইত। শিখরের ও জগমোহনের চারি ধারে দুই সারি করিয়া কুলঙ্গী। শিখরদেশের উর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত মধ্য-ভাগের দুই পার্শ্বে পোস্তাবন্দী (buttress) সদৃশ তিনটী করিয়া উদ্গত অংশ রহিয়াছে। খাঁজগুলি আমলক হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তবে উর্দ্ধভাগে কুলঙ্গীর পরিবর্ত্তে উহাতে একসারি করিয়া বিমানের ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিরূপ গঠিত হইয়াছে।

জগমোহন, নাটমণ্ডপ ও ভোগমণ্ডপ "পীড়" শ্রেণীর দেউল। সবগুলিরই ছাদ পিরামিডাকৃতি। এই ছাদগুলি অটুটভাবে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এক দেওয়াল হইতে অপর দেওয়াল পর্য্যন্ত লম্বমান লোহার স্থূল কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছে। উড়িষ্যার মন্দিরগুলি
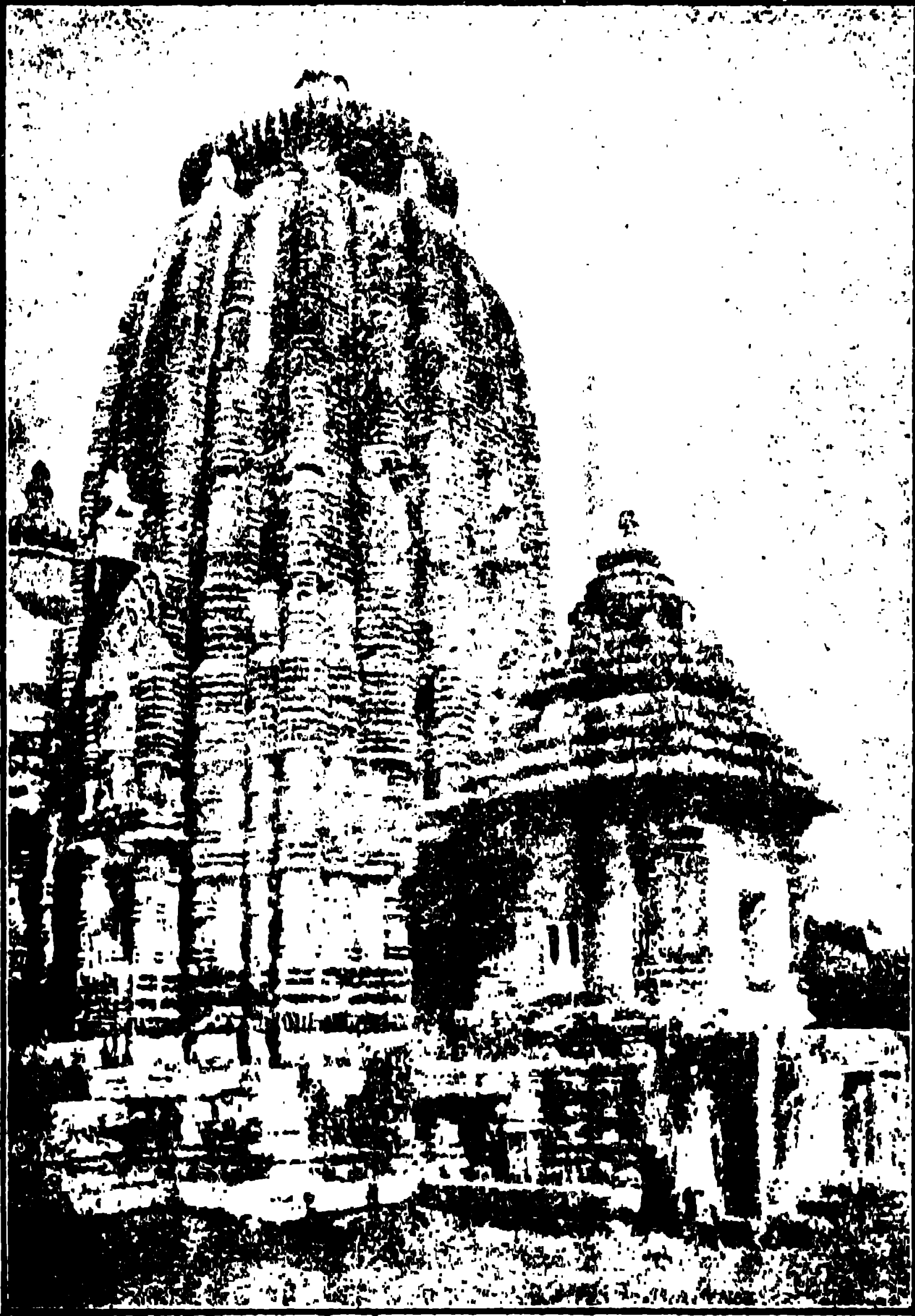
অনন্ত বাসুদেবের বিমান ও পার্শ্বস্থ মন্দির।

অনেক স্থলেই একবারে ভিত্তিভূমি হইতে উঠিয়াছে, দেখা যায়। বাহির হইতে মেজে থামাল করিয়া গাঁথিবার নিয়ম সকল ক্ষেত্রে রক্ষিত হয় নাই। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে 'রেখা' (বিমান) ও জগমোহন অংশে পোতা পর্য্যন্ত গাঁথনির দুইটী বিভিন্ন স্তর দেখা যায়। তাহার মধ্যে একটির বহিঃসীমা অপরটি হইতে প্রায় একফুট আন্দাজ ভিতরের দিকে সরিয়া গিয়াছে। এই দুইটী স্তর যথাক্রমে 'তলপৃষ্ঠ' ও 'খুর পৃষ্ঠ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (১১) বৈষ্ণব মন্দির বলিয়া তুরপৃষ্ঠাংশে পদ্মদল খোদিত হইয়াছে। মন্দিরের জগমোহন সম-চতুষ্কোণ। বাহিরের ধারের মাপ ৬৩ ফিট ও ভিতর দিকের মাপ ১৯ ফিট করিয়া।

(১১) M. Ganguly's Orissa p. 371.

জগমোহনের দুইপার্শ্বে দুইটী দুয়ার। তৃতীয় দুয়ারটী দিয়া নাটমণ্ডপে যাওয়া যায়। গর্ভগৃহ ও জগমোহনের মধ্য-দেশে কিন্তু একাধিক দ্বার নাই। নাটমণ্ডপের দুইধারে তিনটী করিয়া দরওয়াজা আছে। সপ্তম দুয়ারটি দিয়া ভোগমণ্ডপে যাওয়া যায়। এই দুয়ার ব্যতীত ভোগমণ্ডপেরও উভয় পার্শ্বে তিনটী-তিনটী করিয়া ছয়টী দুয়ার আছে; সুতরাং বাহিরে না আসিয়া মন্দিরের একাংশ হইতে অন্যাংশে যাওয়ায় বিশেষ কোনই অসুবিধা ঘটে না। নাটমণ্ডপের বাহিরের অংশের পরিমাপ ২৯×২৪ ফিট্ এবং ভিতরের মাপ দৈর্ঘ্যে ২১ ফিট্ ৪ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৬ ফিট ৯ ইঞ্চি। ভোগমণ্ডপের বহির্দ্দেশ ও অন্তর্দ্দেশ যথাক্রমে ২২×১৯ ফিট ও ১৯×১২-৬" ফিট। বিমানের উত্তরদিকের খাঁজে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি আছে, কিন্তু মস্তক, পদদ্বয় ও চারিটী হস্তের দুইটী হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে একটী পদ উপর দিকেই উত্তোলিত ছিল।(১২) দক্ষিণ দিকের দুইটী হস্তের মধ্যে উপরটিতে চক্র ও নিম্নেরটিতে শঙ্খ এখনও অক্ষুন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটি অনুচর,—একটীর হস্তে পদ্ম পুষ্প ও অপরটী বাদ্যযন্ত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকের কুলঙ্গিতে বরাহ-মূর্ত্তি অনন্তের পৃষ্ঠে সমাসীন। বরাহদেবের মস্তকাবরণে একটু বিশেষত্ব আছে। এ খাঁজটিতে উড়িষ্যার সুপরিচিত প্রথানুযায়ী ত্রিপত্র খিলান ও উপরে একটি কীর্ত্তিমুখ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে স্বাভাবিক ভাবে খোদিত দুইটী রাজহংসের চিত্রও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিমানাংশে দিক্‌পতি বা দিক্‌পাল-দিগের মূর্ত্তিসমূহ যে সকল খাঁজে অবস্থিত, তাহার ঠিক উপরিভাগের কুলঙ্গীগুলিতে তাহাদিগের স্ব স্ব শক্তিগণের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; আকৃতিগত সাদৃশ্য ও বিশেষ বিশেষ বাহনাদি হইতে ইহাদিগকে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। (১৩) জগমোহনের ছাদের সম্মুখ-ভাগে স্তম্ভোপরি সন্নিবিষ্ট ত্রিকোণাচার গাঁথুনি অংশ (pediment) বহু স্থাপত্য অলঙ্কারে সমাচ্ছন্ন। উহার উত্তরাংশে অবস্থিত খোদিত চিত্রসমূহের মধ্যে পঞ্চফণাযুক্ত নাগ ও নাগিনী মূর্ত্তি, স্ত্রী ও পুরুষ মূর্ত্তিসমূহ, হস্তীশ্রেণী, ঘোড়ার মিছিল, পাল্কী ও বেহারার চিত্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভোগ-মণ্ডপের পূর্ব্বদ্বারের দুই পার্শ্বের কুড্যস্তম্ভের (pilaster) গাত্রে উঁচু করিয়া খোদা দুইটী বিভিন্ন প্রকারের পদ্মাসনোপরি দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্ত্তি রহিয়াছে। বামদিকের মূর্ত্তিটী গুম্ফযুক্ত; এ মূর্ত্তির শিরো-ভূষণে যথেষ্ট কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং দেহেও অলঙ্কারের অভাব নাই। গলদেশে মধ্যমণিযুক্ত হার এবং বাহু প্রকোষ্ঠ ও পদদ্বয়ে বিভিন্ন অলঙ্কার নৈপুণ্যের সহিত খোদিত। চারিহস্তের মধ্যে দক্ষিণ দিকের হস্তদ্বয়ে চক্র ও মাল্য এবং বাম দিকের

(১২) Ibid p. 372.

(১৩) Ibid p. 377.

হস্তটীতে শঙ্খ ও গদা রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকের বিষ্ণুমূর্ত্তি গুম্ফযুক্ত নহে। ইহার ডাহিন্ পার্শ্বের নীচের হাতটি বামদিকের গদাধৃত হাতটীর উপর "আশীর্ব্বাদ মুদ্রায়" বিন্যস্ত। এই দুয়ারের ঠিক বাম পার্শ্বে সংলগ্ন একটী দণ্ডায়মান স্থূলোদর মূর্ত্তির শিরোদেশে কতকগুলি সর্পমুখ খোদিত দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তির অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; নিম্নাবস্থিত দক্ষিণ হস্তটীতে পদ্মপুষ্প দেখিয়া ইহা শৈব মূর্ত্তি কি বিষ্ণুমূর্ত্তিরই প্রকার-ভেদ, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। ভোগমণ্ডপের উত্তরের দ্বারে কোনও রূপ খোদিত চিত্র দেখা যায় না।

এ মন্দিরে জান্তব মূর্ত্তির অভাব নাই। খোদিত চিত্রের হস্তীগুলি কোনার্ক মন্দিরের আলম্বনস্থ হস্তীসমূহেরই ন্যায় স্বাভাবিক-ভাবে সন্নিবিষ্ট। 'হনুমন্ত লতা' নামে অভিহিত স্থাপত্য অলঙ্কারের (১৪) লতামধ্যস্থ বানর-মূর্ত্তিগুলিও বড়ই সুন্দর। পার্শ্বদেবতার খোদিত মূর্ত্তির দুইপার্শ্বে অবস্থিত রাজহংসের চিত্রের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর অন্য চিত্রের মধ্যে দক্ষিণদিকে জগমোহন-গাত্রস্থ মধ্যকার কুলঙ্গীর মৎস্য ও মকর অলঙ্কারগুলিতে (arabesques) যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাই। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ভাস্কর্য্য-বিষয়ক প্রসঙ্গে যে সকল লতামণ্ডনাদির চিত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই অন্তর্গত 'ফুললতা' নামক একপ্রকার নক্সার ব্যবহার এ মন্দিরের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ নক্সায় লতার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন জন্তুর চিত্র সুকৌশলে বসান রহিয়াছে। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরও জগমোহন-গাত্রস্থ লতাপাতা ও অন্যান্য কারুকার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে চিত্র-ব্যতিরেকে শুধু ভাষার সাহায্যে এ মন্দিরের প্রকৃত বর্ণনা সম্ভব নহে। এসিয়াটীক সোসাইটির পত্রিকায় স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের প্রকাশিত ভট্ট ভবদেব প্রবন্ধে উহার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

নাটমন্দিরের ভিতর স্তম্ভের উপর মুগ্‌নি পাথরের একটী গরুড় মূর্ত্তি আছে। মণি-কোঠা গর্ভগৃহটী বড়ই অন্ধকার, ভিতরে দিবারাত্রি টিম্ টিম্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। ইহাতে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যেন অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। মন্দিরস্থ দেবতার মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল অনন্ত (বলরাম) এবং বাসুদেব (কৃষ্ণ) মাত্র এই দুইটী বিগ্রহেরই উল্লেখ করিয়াছেন। (১৫) শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও তৃতীয় কোন মূর্ত্তির উল্লেখ করেন নাই; (১৬) কিন্তু ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তিতে অনন্ত, বাসুদেব ও নৃসিংহ এই তিনটি মূর্ত্তি সংস্থাপনের কথা উল্লিখিত আছে। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও এই তিনটি মূর্ত্তিই লক্ষ্য করিয়া এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সাক্ষ্য দিয়া

(১৪) Ant. Orissa. Vol. II p. 62.

(১৫) Ganguly's Orissa p. 369.

(১৬) J. A. S. B. 1912 Vol VIII. p. 338

গিয়াছেন। (১৭) মূর্ত্তিগুলির গঠন সেরূপ সুন্দর নহে। উচ্চতায় পাঁচ ফিট পরিমাণ হইবে। অনন্ত নামধেয় বাসুদেবের শিরোপরি বহুসংখ্যক সর্পফণা চন্দ্রাতপের ন্যায় বিন্যস্ত। তিন দেবতার মন্দির হইলেও সাধারণতঃ ইহা বিষ্ণুমন্দির বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ উহা বন্ধুবর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কথিত ব্যূহবদ্ধ পূজা-প্রণালীর অন্যতম দৃষ্টান্ত (শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভব বিষয়ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। (১৮) অনন্ত ও বাসুদেবের প্রতিষ্ঠাকালে সম্মুখে একটী বাপী (জলাশয়) খনিত হইয়াছিল এবং দেবত্রয়ের পরিচর্য্যার জন্য মন্দিরের সেবিকা স্বরূপ একশত অঙ্গনা নিয়োজিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে বিন্দুসরোবর ব্যতীত অপর কোনও জলাশয় নাই। তাই লিপি-বর্ণিত 'বাপী' বিন্দু সরোবরেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান বিন্দুসাগর যে মন্দির-প্রতিষ্ঠার পরে রচিত, এইরূপই অনুমিত হয়। জলাশয়টী এখন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত; দেবদাসীরা আর নাই বটে—কিন্তু বাঙ্গালা ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব-মন্দির এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দুইজন বিখ্যাত বিদেশী লেখক উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যে অশ্লীলতার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, বলিয়াছেন যে বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই এ দোষ বিশেষভাবে বিদ্যমান। (১৯) কঠোর শৈব আরাধনার প্রণালীতে বৈষ্ণবদিগের মধুর রসের স্থান নাই। (২০) রাজা রাজেন্দ্রলাল ইহার প্রতিবাদ-কল্পে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এই সুবৃহৎ ও বহু কারুকার্য্য-সমন্বিত মন্দিরে একটীও সেরূপ আপত্তিকর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। সুধী রাজেন্দ্রলাল যথার্থই বলিয়াছেন যে শিল্পীর আপনার রুচি এবং মন্দিরে অল্প বা অধিক পরিমাণ ভাস্কর্য্য অলঙ্কার ও চিত্রাদি ব্যবহারের আবশ্যকতা এই শ্রেণীর মিথুন মূর্ত্তি-সমূহের অল্প বা অধিক প্রাদুর্ভাবের নিয়ামক ছিল (২১)। বৈষ্ণব মন্দিরের মধ্যে জগন্নাথ মন্দিরে এবং কোন কোন বঙ্গদেশীয় প্রাচীন মন্দিরেও প্রণয়লীলা-জ্ঞাপক চিত্ররাজি দেখিতে পাওয়া যায় বটে (২২) কিন্তু এরূপ দুই-একটী উদাহরণে নির্ভর করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে।

(১৭) 'পাঞ্চরাত্র' মতানুযায়ী ব্যূহবদ্ধ উপাসনা প্রণালী ভারতের পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশেই অধিক পরিচিত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ Dr. Otto F. Schrader প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। (Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhnya Samhita pp. 35-36. 144-145).

(১৮) Hunter's Orissa. Vol. I. p. 111—112.

(১৯) Fergusson's Tree and Serpent Worship p. 71

(২০) Ant. Orissa. Vol. II p. 12.

(২১) "Above them appears square or rectangular panels depicting in Vaisnava temples Radha-Krisna in various attitudes (often amtory) &c" J. A. S. B. 1909 Vol. I. p. 142.

(২২) J. A. S. B. Vol. VIII, 1912-p. 340.
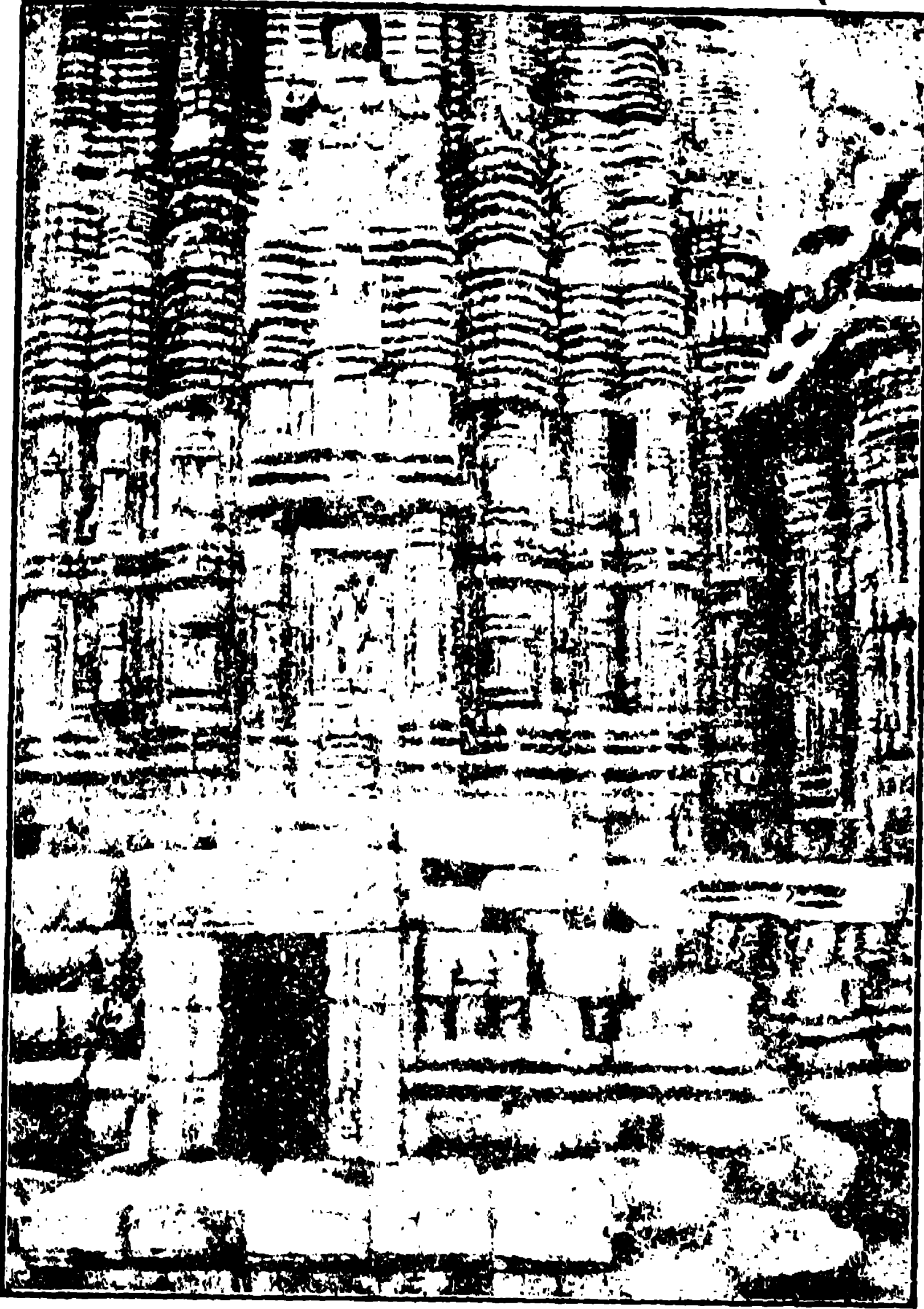
অনন্ত বাসুদেব মন্দির গাত্রস্থ ভাস্কর্য্যের চিত্র।

মন্দিরের বিবরণের পর মন্দির-নির্ম্মাতার কথা কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে বিষয়টী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্র রচিত প্রশস্তি হইতে অবগত হওয়া যায় ভট্ট ভবদেব মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং এক নব 'হোরা' শাস্ত্রের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া দ্বিতীয় বরাহরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কুম্ভসম্ভব অগস্ত্যমুনি যেরূপ সমগ্র সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ 'বৌদ্ধসাগর' উদরস্থ করিয়া ও ভ্রান্ত-মতবাদীদিগের কুতর্ক-নিরসনে কৃতিত্ব দেখাইয়া সর্ব্বজ্ঞরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। ভবদেব ভট্ট'বাল বলভী ভুজঙ্গ' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নিবাস রাঢ় দেশের সিদ্ধল গ্রামে। তাঁহার প্রপিতামহের প্রপিতামহ ভবদেব হস্তিনীভিট্ট 'শাসন' নামক গ্রাম গৌড়রাজের নিকট দান-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন

চক্রবর্ত্তী বাহাদুর প্রশস্তি-অবলম্বনে ভবদেব ভট্টের যে বংশ-লতা প্রস্তুত করিয়াছেন নিম্নে তাহা যথাযথভাবে প্রদত্ত হইল। (২৩)

রাঢ়দেশীয় সিদ্ধল গ্রামবাসী সাবর্ণ মুনির বংশ

ভবদেব, নৃপতি হরিবর্ম্মদেব ও তাঁহার পুত্রের রাজত্বকালে সান্ধি-বিগ্রহিক বা বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি "কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি" ও "প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্" নামক দুইখানি পুস্তক, রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কয়েকখানি পুঁথি সংস্কৃত কলেজের পুঁথিশালা, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত আছে। মীমাংসাসূত্র বিষয়ক "তৌতাতিত মততিলকম্' নামধেয় কুমারিল ভট্টের "তন্ত্রবার্ত্তিকের" টীকা-খণ্ডও ভবদেব ভট্ট কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া বিবেচিত। ইহা ব্যতীত "সম্বন্ধ বিবেক" নামক দ্বাদশপৃষ্ঠাব্যাপী এক ক্ষুদ্র পুঁথির-পুষ্পিকায় 'ইতি ভবদেব ভট্ট কৃত সম্বন্ধ বিবেক সমাপ্তঃ' এইরূপ লিখিত আছে; কিন্তু ইহাতে ভবদেবের 'বাল বলভী ভুজঙ্গ' এ পদবীটির উল্লেখ না থাকায় ইহা অপর কোনও ভবদেবের রচিত কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই পদবীটির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইংরেজীতে ইহার অর্থ করিয়াছিলেন (young serpent of the turret) বলভী শব্দে বুরুজ বা বারান্দা ধরিয়া লইয়া বালশব্দ ভুজঙ্গের বিশেষণ রূপে গ্রহণ করিলে তবে এ অর্থ প্রতিপন্ন হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত 'রামচরিত' গ্রন্থে বাল-বলভীর উল্লেখ দেখা যায়। ইহা দেব-গ্রামের সন্নিকটস্থ স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বালবলভী—"বাগড়ী" অর্থদ্যোতক। কেহ কেহ ইহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ মতের সমর্থন করিতে পারেন নাই। (২৪) সে যাহা হউক বালবলভী যে কোনও স্থানের নাম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিবর্ম্মদেব যে বঙ্গের রাজা ছিলেন, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালের তাম্রশাসন ও হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতি তাঁহার অস্তিত্বের নিঃসন্দেহ প্রমাণ-স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। (২৫) সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(২৩) বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬০।

(২৪) ঐ, পৃষ্ঠা ২৭৩;

(২৫) J. A, S. B. 1912 Vol, VIII. p. 341.

মহাশয় তাঁহার 'বেনের মেয়ে' নামক কথা-গ্রন্থে এ যুগের যে মনোমদ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে ভট্ট ভবদেব ও হরি-বর্ম্মদেব উভয়েই জীবন্তবৎ প্রতিভাত হইতেছেন। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলস্থ রাঢ়দেশে যে যথেষ্ট বিদ্যাচর্চ্চা হইত এবং তৎকালে দর্শন, জ্যোতিষ, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিদ্যার্থীগণের পঠন-পাঠনের যে সুব্যবস্থা ছিল, তাহা ভবদেবের প্রশস্তি হইতেই অবগত হওয়া যায়। শ্রীধরাচার্য্য রচিত ন্যায়কন্দলী গ্রন্থও এ অনুমানের সমর্থন করিতেছে (২৬) ন্যায়কন্দলী বৈশেষিক দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ; ইহা ৯১৩ শকাব্দে (খৃঃ ৯৯১—২) অব্দে রচিত হয়। গ্রন্থের শেষভাগে শ্রীধরাচার্য্য আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি ভূরিসৃষ্টি, বর্ত্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত দামোদর নদ তীরবর্ত্তী ভুরসুট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চা পূর্ব্ব হইতে সমগ্র রাঢ়ময় বিস্তৃত না থাকিলে ভবদেব ভট্ট বা শ্রীধরাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অতর্কিত আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল না। ঘটকদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ-মতে ব্রাহ্মণগণ যে একাদশ শতাব্দীর ন্যায় পরবর্ত্তী যুগে আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত হওয়া সম্ভব নহে, অনন্ত বাসুদেবের শিলালিপি আধুনিক ঐতিহাসিকদের এ ধারণাও বিশেষ-ভাবে সমর্থন করিতেছে।

উড়িষ্যার অনেক মন্দিরেই নির্ম্মাণকাল-জ্ঞাপক কোনও শিলালেখ পাওয়া যায় না। অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে শিলালিপি আছে বটে কিন্তু তাহার সাল ও তারিখের অংশ পাঠযোগ্য নহে। পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক কীলহর্ণ (২৭) হরপগুলির আকৃতি প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া লিপিত্বের দিক হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে এই প্রশস্তিখানি খৃঃ ১২০০ অব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বন্ধুবর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এ প্রশস্তি খৃঃ দশম শতাব্দীতে রচিত। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে এই লিপি হইতে তাৎকালিক বিদ্যালোচনা ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ অবগত হওয়া যায়। (২৮) প্রশস্তিলেখক বাচস্পতি মিশ্র তখন তরুণ বয়স্ক পণ্ডিত। পরবর্ত্তীকালে ইনি ষড়দর্শনের টীকাকাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলালও শিলালেখোক্ত বাচস্পতিকে প্রসিদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রবিৎ বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া ধরিয়া লইয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে লিপিখানি একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে বাচস্পতি দশম শতাব্দীর লোক। একাদশ শতাব্দীতে তাঁহার বিদ্যমান থাকা সম্ভব ছিল না। তাঁহার "ন্যায় সূচী নিবন্ধ" নামক মীমাংসা দর্শন বিষয়ক টীকাগ্রন্থ ৮৯৮ শকাব্দে (খৃঃ ৯৭৬ অব্দে) লিখিত

(২৬) Ep. Indic. Vol. VI. p. 205.

(২৭) J. B. O. R. S. Vol. V. pt. II, 1919 p. 176.

(২৮) Literary History of the Pala period, p. 175. J. B. O. R. S. Vol. V. 1919.

হইয়াছিল। (২৯) বঙ্গদেশে বাচস্পতি নাম অল্প প্রচলিত নহে, তাই তিনি এই প্রশস্তিকার বাচস্পতি ও দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র যে অভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও স্বর্গীয় রায় বাহাদুর চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজা রাজেন্দ্র লালের অনুমানই মোটের উপর বজায় রাখিয়া ভট্ট ভবদেব খৃঃ ১০২৫ হইতে খৃঃ ১১৫০ অব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন এইরূপই প্রমাণ করিয়াছেন। উপস্থিত এই মত গ্রহণ করাই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে শিলালিপি দুইখানি এক্ষণে যে স্থানে অবস্থিত পূর্ব্বে তথায় ছিল না। জেনারেল ষ্টুয়ার্ট ভবদেবের প্রশস্তি খানি মন্দির হইতে বিচ্যুত করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগ্রহ-শালায় আনিয়া রাখেন। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে মেজর কিটো (Kittoe (ইনি তখন লেপ্টেনাণ্ট পদাভিষিক্ত ছিলেন) ভুবনেশ্বর গমন করিলে স্থানীয় লোকেরা লিপিখানি কাড়িয়া লওয়ার জন্য মন্দিরের ধর্ম্মহানি ঘটিয়াছে ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন এবং লিপিখানি প্রত্যর্পণ করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের প্রার্থনা-মত কিটো মহোদয় ভট্ট ভবদেবের লিপি ও ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের লিপি এই উভয় লেখ আনয়ন করিয়া অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে পশ্চিমদিকস্থ দেওয়ালের ভিতরকার দিকে লাগাইয়া দেন। এই উভয় লিপির পাঠই স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের বিরাট গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মেশ্বর মন্দির স্বতন্ত্র বিদ্যমান থাকিতেও কিটো সাহেব কি জন্য সেই মন্দিরের শিলালিপি এই স্থানে সংলগ্ন করাইয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্পূর্ণ অবিদিত। এখন ব্রহ্মেশ্বর লিপিটি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উহা যে কাল্পনিক নহে তাহা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে অনুসন্ধান করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছিলেন। মেঘেশ্বর মন্দিরের লিপি কে কবে উঠাইয়া আনিয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছে, তাহাও অদ্যাপি রহস্যে সমাচ্ছন্ন। রাজা রাজেন্দ্রলাল অনন্তবাসুদেব প্রসঙ্গে মেঘেশ্বর লিপির কোনই উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার ভুবনেশ্বর পরিদর্শন কালে উহা যে তথায় ছিল না, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। মেঘেশ্বর মন্দির ভাস্করেশ্বর মন্দিরের কয়েক শত ফিট্ দূরেই অবস্থিত। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মেঘেশ্বর মন্দিরের লিপিখানি এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যথাস্থানে সংলগ্ন করিলেই সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

মন্দির দেখিতে আমাদের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া গেল। 'র'—ভায়া প্রদীপ-সহযোগে শিলালিপিদ্বয়ের কিয়দংশ পাঠ করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিলেন।

(২৯) M. Ganguly's Orissa pp. 326—329.

খোলা গরুর গাড়ী করিয়া খণ্ডগিরিতে ফিরিয়া যাইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল; কিন্তু এই স্থানের নূতন দৃশ্যসমূহের বর্ণনা ও জ্ঞানানুশীলনের এই সকল নূতন পন্থা সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায় আমরা পথের ক্লেশ মোটেই অনুভব করিতে পারি নাই।

র—এর ক্যাম্প—আমরা নাম দিয়াছিলাম "বিজয় স্কন্ধাবার"; দূর হইতে দেখিতেই এতটা পথ। এই পথ এত শীঘ্র যে কি করিয়া অতিক্রম করা গেল, তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এ অঞ্চলে চিতাবাঘের ভয় আছে, তাই আর অধিক রাত্রি না করিয়া আহারাদি সমাধা করিয়া সেদিনকার মত স্ব স্ব তল্পে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। আমার ছুটীর আর একটী মাত্র দিন অবশিষ্ট ছিল; তাই আর ধৌলি বা ধবলগিরির অশোক লিপিদর্শন অদৃষ্টে ঘটিল না। পরদিন সন্ধ্যায় আহারাদি করিয়া কলিকাতা-অভিমুখে রওনা হইলাম। ফিরিবার পথে দেখিলাম, কাসাই নদীতে 'বান' ডাকিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র গ্রাম জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। নদীমাতৃক দেশের এ বিপদ চিরদিন। কলিকাতায় পঁহুছিতেই আলনস্করের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। কিন্তু কর্ম্মভূমির দৈনিক কর্ত্তব্যচিন্তা মন্দিরের কথার প্রাচীন কাহিনীকে এখনও বিস্মৃতি-যবনিকার অন্তরালে সরাইয়া দিতে সক্ষম হয় নাই।

ভট্ট ভবদেব প্রশস্তি

(মর্ম্মানুবাদ)

এই প্রশস্তিটি পঁচিশ লাইনে সমাপ্ত। ইহা "বালবলভীভুজঙ্গ" সুবিখ্যাত ভট্ট ভবদেবের প্রশংসা-বাদে পূর্ণ। ভবদেবের বন্ধু বাচস্পতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ইহার রচয়িতা। প্রশস্তির প্রারম্ভে—

ওঁ ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় এই স্বস্তি-বচন লিখিত আছে। তিন হইতে চতুর্দ্দশ শ্লোক পর্য্যন্ত ভবদেবের বংশ-পরিচয়; পনেরো হইতে ছাব্বিশ শ্লোক পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যাবত্তা প্রভৃতির বর্ণনা, এবং ২৭ হইতে ৩২ শ্লোকে ভট্ট ভবদেবের নানারূপ সৎকার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার যে-সকল গুণ-গ্রামের প্রশংসা করা উদ্দেশ্যে এই প্রশস্তি লিখিত হইয়াছে তাহারই যথাবিহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সমগ্র লেখাটির সারমর্ম্ম এইরূপ—সাবর্ণ গোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে সকল গ্রাম দান-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা সংখ্যায় প্রায় শতাধিক হইবে। তাহার মধ্যে রাঢ় দেশীয় সিদ্ধালগ্রাম খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই গ্রামে এক সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে ভবদেব নামে এক ব্যক্তি সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মহাদেব ও কনিষ্ঠের নাম অট্টহাস। গৌড়রাজ তাঁহাকে হস্তিনীভিট্ট নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহার আটটী পুত্র ছিল; সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম রথাঙ্গ, রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, অত্যঙ্গের পুত্র বুধ "স্ফুরিত" নামে অভিহিত হইতেন। বুধের পুত্র আদিদেব বঙ্গরাজের সান্ধিবিগ্রহিক—পাদীয় অমাত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধন সভা ও বীর-স্থালী উভয় স্থানেই কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব
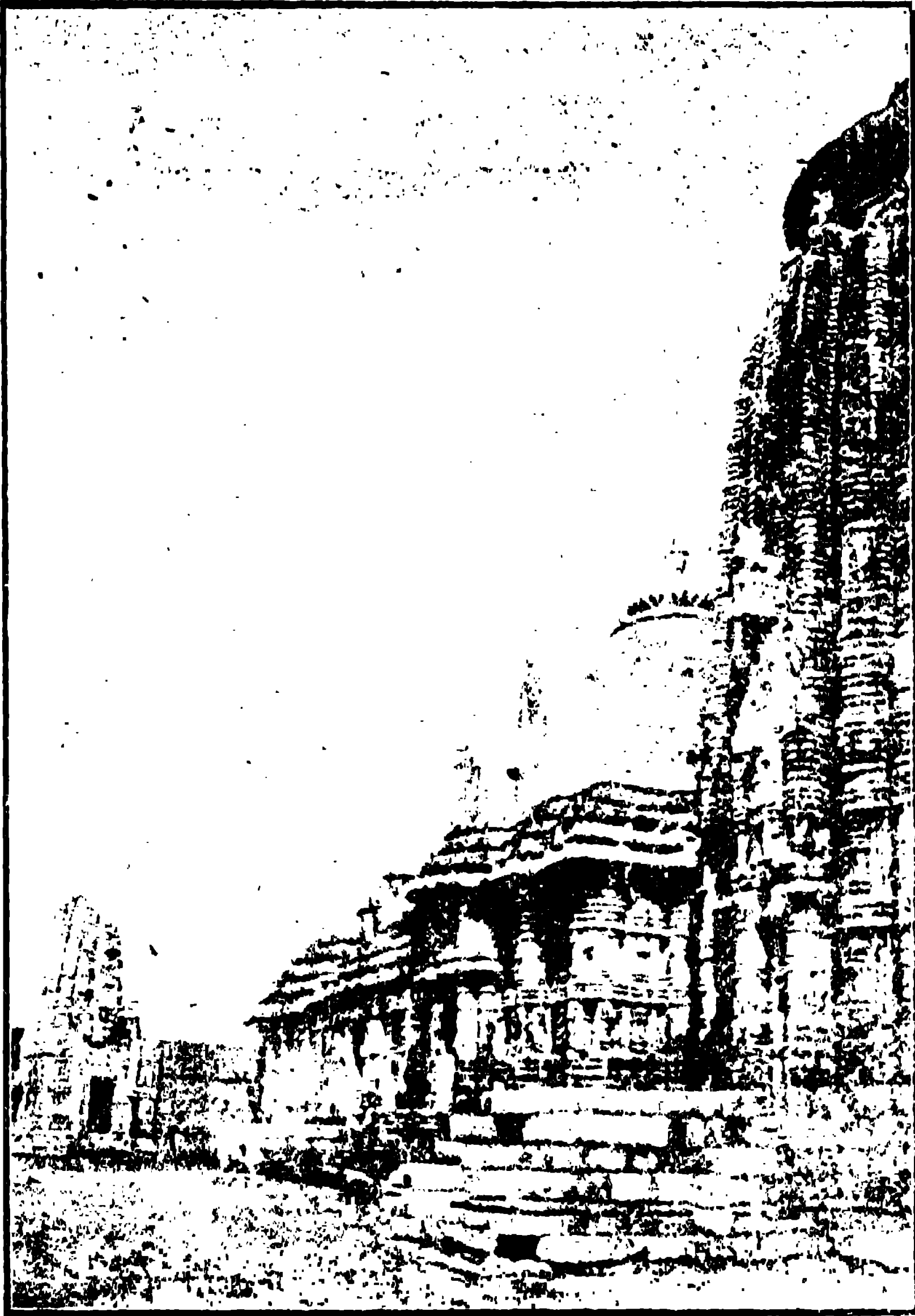
অনন্ত বাসুদেবের মন্দির ও পার্শ্বস্থ 'নিসা' দেউল।

সাঙ্গোকা নামক অঙ্গনা-রত্নকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারই গর্ভে যাঁহার সম্মানার্থ এই প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল, সেই ভবদেব জন্মগ্রহণ করেন।

কবি "জিহ্বাগ্রে চ সরস্বতীম্" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া ভবদেবকে দেব-গণের অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এবং তাঁহার পদগৌরব জানাইবার জন্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্বধর্ম্ম-বিজয়ী হরিবর্ম্ম দেব সুদীর্ঘকাল তাঁহার মন্ত্রণা-শক্তিতে চালিত হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার "দণ্ডনীতি বর্ত্তমানুগা"—উপদেশাবলী হরিবর্ম্মের পুত্রের রাজত্বকালেও দেশের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল।

ব্রহ্মাদ্বৈত বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের বিস্ময়-উৎপাদনকারী মীমাংসা 'তন্ত্রবার্ত্তিক' রচয়িতা ভট্টের (কুমারিল ভট্টের) রচনাবলীর গভীর অর্থ-সমাধানে সমর্থ, বৌদ্ধসমুদ্রের অগস্ত্য-

মুনি পাষণ্ড বৈদান্তিকদিগের প্রজ্ঞা-খণ্ডনে পণ্ডিত, ভট্ট ভবদেব সর্বজ্ঞরূপে বিরাজমান ছিলেন, এবং সংহিতা, তন্ত্র ও গণিতে পর-পারদর্শী এবং নবীন 'হোরা' শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া জনসমাজে অপর বরাহরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্পর্কীয় স্ব-রচিত টীকা ও বিবৃত্তি-বিষয়ক গ্রন্থাদির সাহায্যে তিনি পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মতবাদ নিষ্প্রভ করিয়াছিলেন এবং স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপাদি সম্বন্ধে সকল সন্দেহ নিরসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মীমাংসা শাস্ত্রে তিনি (কুমারিল ভট্টের) নীতি-অবলম্বন করিয়া যে সকল বাক্যাবলী (maxims) রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সহস্রকর রবির কিরণ-মালার ন্যায় অজ্ঞান-তিমির নাশ করিত! আগম, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, অস্ত্রবেদ এবং সকল কবি-কলায় কৃতবিদ্য ভবদেব বাস্তবিকই জগতীতলে অতুলনীয় ছিলেন। মীমাংসা শাস্ত্রেও যে তাঁহার অপর নাম 'বালবলভী ভুজঙ্গ' সপুলকে উদ্গীত হইয়াছে, সে কথা কোন্ ব্যক্তিই বা অবগত নহে? দুষ্ট ভুজঙ্গ-দষ্ট (দংষ্ট্রান দুষ্ট ভুজঙ্গ ব্রণ মোহরাত্রি) অপহৃত-জ্ঞান ব্যক্তিগণকে প্রত্যূষে তূর্য্যধ্বনির ন্যায় তাঁহার মন্ত্রোচ্চারণ-গুণে সত্বর নবজীবন দান করিয়া—"গরল-কেলীতে" নীলকণ্ঠের ন্যায় অপূর্ব্ব মৃত্যুঞ্জয়-রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।* তিনি রাঢ়দেশে জঙ্গলপথ ও গ্রামের উপকণ্ঠ-সীমায় শ্রমময় পান্থ পরিষদের প্রীত্যর্থে একটি সুপরিসর জলাশয় খনন করেন এবং যে স্থলে এ লিপিটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারই সান্নিধ্যে নারায়ণের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি রক্ষা করেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গর্ভ-গৃহে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ এই ত্রি-মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন। তিনি হরিমেধসের (বিষ্ণুর) সেবা উদ্দেশ্যে মন্দির-সেবাদির জন্য কিয়ৎসংখ্যক বিদ্যাধরী-তুল্যা দেবদাসী উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

স্বপ্নেশ্বর প্রতিষ্ঠিত মেঘেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি (মর্ম্মানুবাদ)।

ওঁ ওঁ নমঃ শিবায়ঃ

অক্ষপাদ গৌতম মুনির বংশে দ্বারদেব নামক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র মূলদেব। মূলদেবের অহিরাম নামে এক পুত্র জন্মে। সেই অহিরামের অন্যান্য সন্তানাদির মধ্যে স্বপ্নেশ্বর নামে এক পুত্র ও সুরমাদেবী নামে এক কন্যা ছিলেন। চন্দ্রবংশসম্ভূত চোড়গঙ্গ মহীপতির মৃত্যু হইলে রাজরাজ, বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করিয়া পৃথিবী শাসন করেন; তিনি সুরমা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনিয়ঙ্ক (অনঙ্গ) ভীমদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

(মনুজরাজঃ নতাঙ্ঘ্রি যুগ্মং রাজ্যে অভিষিক্তম্ অকরোৎ।)

* এই 'গরল-কেলী' শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না বলা যায় না। প্রাচীনকালের চারি শ্রেণীর চিকিৎসকগণের মধ্যে জাঙ্গলিবিদঃ বা বিষ-বৈদ্যের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কবি ময়ূরও এইরূপ জাঙ্গুলিক নামে পরিচিত ছিলেন। জাতকগ্রন্থে ব্রাহ্মণেরাও যে সর্পবশ-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন তাহা অবগত হওয়া যায়। Dr. Radhakamal Mukerjee's Local Government in Ancient India p. 60.

"সাম্রাজ্য—লক্ষ্মীপতি প্রত্যর্থী ক্ষিতিপাল মৌলি তিলক" অনিয়ঙ্ক ভীম "ত্রিকলিঙ্গনাথ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। রাজশ্যালক স্বপ্নেশ্বরের প্রতি "গঙ্গাবংশীয়গণের দিব্যাস্ত্র" এবং চতুরঙ্গ সেনাপেক্ষা অধিক বলবিশিষ্ট ("চতুরঙ্গতা অধিকতরঃ) প্রভৃতি বিশেষণ প্রযুক্ত হওয়ায় অনুমিত হয়, তিনি 'মহাবলাধিকৃত' বা প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্বকথিত এই স্বপ্নেশ্বরই মেঘেশ্বর দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং মন্দিরে সেবার জন্য কিয়ৎ-সংখ্যক পরিচারিকা প্রদান করিয়াছিলেন। মন্দিরের সন্নিকটে উদ্যান প্রতিষ্ঠা ('উপবনম্ অথ চক্রে') এবং দেবালয়সংশ্লিষ্ট একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া তিনি পথিপার্শ্বে ও 'পুরে পুরে' তড়াগাদি খনন এবং সুরগৃহ বা দেবালয়ে প্রদীপাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (অপাং শালা মালাঃ পথি পথি, তড়াগাঃ প্রতিপুরম্, প্রদীপাঃ সম্পূর্ণাঃ প্রতি সুরগৃহম্ যস্য বিমলাঃ)।

ইহা ব্যতীত বেদাধ্যায়ী ও শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণদিগের জন্য মঠ ও ব্রহ্মপুর (cloesters) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদীয় গুরু শৈব-মতাবলম্বী আচার্য্য-রাজ বিষ্ণু কর্ত্তৃক মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং বিষ্ণুর আদেশক্রমে উদয়ন কবি এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। মেঘেশ্বর মন্দিরে দিশিধবলের পুত্র চন্দ্রধবল কর্ত্তৃক উহা শিলাপৃষ্ঠে সরলাক্ষর-মালায় লিখিত হইয়াছিল। আর সূত্রধর শিবকর প্রস্তর ফলকে মুক্তাফলনিভ এই অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ করিয়াছিল।

অনিয়ঙ্ক ভীমদেব দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ খৃঃ ১১৯২ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন; ইহা হইতে আচার্য্য কীলহর্ণ অনুমান করেন যে লিপিখানি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই রচিত হইয়াছিল।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

নোয়ার কিস্তি

[স্থান—আরারুট-পর্ব্বতে বাঁধা হজরত্ নূহ বা ভগবান মনু বা পীর নপিস্‌তিম্ বা রেভারেণ্ড নোয়ার কিস্তির একটা কামরা, কতকটা বাজারের পশুপাখীর দোকানের ধরণে তরো-বেতরো খাঁচা ও নানা শাক-শবজী ফলি-ফুলুরীর ঝুড়িতে বোঝাই করা।

কাল—কলির শেষ। ঘোর দুর্দ্দিন, কালরাত্রি, দ্বাদশ সূর্য্য, উনপকাশ বায়ু, মেঘ-বিদ্যুৎ সব একসঙ্গে দেখা দিয়েছে।

পাত্র—মনুবাবু ওরফে নকল নোয়া; একজন মোল্লা; এক পাদ্রী; এক পণ্ডিত; এক রাব্বি, এবং শয়তান বা ডেবিল্ বা কলি বা ইব্‌লিস্।]

মনু। (সংহিতার পুঁথি লিখিতে) সে হিসেবে তাহলে হল—ছয় মন্বন্তরে ১,৮৪,০৩,২০,০০০ বৎসর এবং বর্ত্তমান মন্বন্তরের সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ—৪৩,২০,০০৭ × ২৭ = ১১,৬৬,

৪০,০০০ বৎসর। এতে যোগ দাও অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অতীত কাল—৩৮,৯৩,০১০ বৎসর। তাহলেই দেখা যাচ্ছে সর্ব্বসাকুল্যে ১৯৬ কোটী ৮ লক্ষ, ৫৬ হাজার বৎসর হয়ে গেছে; কিন্তু এখনো একটি ব্রহ্মদিন শেষ হয় নি। ইন্তি ভেরেণ্ডা-সংহিতায় ছিষ্টি তত্ত্ব প্রথম শ্লোকঃ।

মোল্লা। হজরত নুহ, আলায়হেস্-সালাম!

মনু। নুহ কাকে বলছ? দেখছ না আমি এখন মনু হয়ে ভেরেণ্ডা-সংহিতায় সৃষ্টিতত্ত্ব লিখছি! গোল কোরে আমার হিসেব ভুলিয়ে দিও না—যাও!

পাদ্রী। মাই লর্ড নোয়া! ফাদার অফ্ সাম্, হ্যাম্ এণ্ড—

মনু। রেভারেণ্ড ফাদার! একটু চুপ করনা,—প্লিজ ডু নট্ ইন্‌টারাপ্‌ট্!

রাব্বি। পীর নাপিস্তিম্ ফেরেস্তা অল্ বেহেস্ত—

মনু। আঃ কি বক্‌বক্ করছ! বুঝছনা, আমি এখন ভগবান মনু হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র লিখছি—ভবিষ্যৎ আর্য্যবংশের জন্যে। আমাকে একটু স্থির হয়ে ধ্যান করতে দাও না।

পণ্ডিত। পেন্নাম হই ঠাকুর!

মনু। বেশ। ধনে-পুত্রে লক্ষীলাভ কর! এখন সকলে বাইরে যাও, আমি একটু মনঃসমাধান কোরে আসনে সমাসীন থেকে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুগণের জন্যে আমার ভেরেণ্ডা-সংহিতা-খানা রচনা করি—যাও।

মোল্লা। হরজত নুহ, আলায়হেস-সালাম! গরীবের একটি আরজি আছে, আপনাকে শুনতেই হবে!

মনু। রেখে দাও তোমার আরজি! ঋষি হয়ে আমি তোমাদের আরজি শুনতে বাধ্য নই। একি মাইনে-করা আদালতের কাজি পেয়েছ যে যখন যা আর্জ্জি পেশ করবে শুনতে হবে? যাও, আমি শুনব না!

পাদ্রী। রেভারেণ্ড ফাদার! আপনি অত্যন্ত রাগান্বিত হতেছ কেন?

রাব্বি। বেল্ মেরোডাচ্ এল্ থামুস্ হেম্মুরাব্বি নেবুকাড্‌নেজার!

পণ্ডিত। ঠাকুর, আপনি ওঁয়াদের কথায় কর্ণপাত করবেন না—ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের অম্বষ্ঠকরণ, ক্ষত্রিয়প্রভৃতি অনুলোম-প্রতিলোম-জাত সঙ্করজাতির পৃথক-পৃথক রূপে ধর্ম্মসকল আমাদিগকে বলুন।

মনু। এই ঠিক বলেছ। মানুষের মতো কথা! আগে ব্রাহ্মণের জন্যে ধর্ম্মশাস্ত্র লেখা চাই, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; তারপর হিব্রু, তারপর মুসলমান; সব-শেষে খ্রীষ্টান;—বিধাতার সঙ্গে এইরকমই আমার কথা হয়ে আছে! ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশাস্ত্রটা আগেই আমাকে লিখতে হবে আর সেইজন্যেই আমি মনু হয়ে আজ এইখানে স্থির হয়ে বসতে চাচ্চি, তোমরা কেবল মিছে গোলমাল কোরে অনর্থক আমাকে ব্যতিব্যস্ত করছ। ব্রাহ্মণের মান আমাকে প্রথমেই বজায় রাখতে হবে; কেননা বিধাতার কৃপায়—'ব্রাহ্মণোজায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে!' জন্মাবামাত্রেই ব্রাহ্মণ পৃথিবীর মধ্যে সবার শ্রেষ্ঠ হয়েন।

মোল্লা। হজরত! এ কেমন কথা বল্লেন? আল্লাহ-তালা পৃথিমিতে পয়লা পানি আর হাবা, দরখ্‌ত আর কীড়া, চিড়িয়া আর জানোয়ারদিগের পয়দা করেন। তারপরে—

মনু। বলে যাও।

মোল্লা। বাদ ছিষ্টি করেন মোসলমান-ফেরেস্তাগণকে ও জিন-সমুদায়কে—

পণ্ডিত। তার পরে?

মোল্লা। তারপরে আদম আর হাবা, তারপরে হজরত শীশ, হজরত মৌশাইল, হজরত ইদ্রিস্, তারপর আসলেন হুজুর হজরত নুহ্ আলায়হেস-সালাম!

মনু। ভুল, ভুল, সম্পূর্ণ ভুল! প্রথমেই জলের সঙ্গে হাবা সৃষ্টি হল, শেষে আবার আদমের সঙ্গে হাবা এল? এ হতেই পারে না। এক জিনিষ কখনো দুবার সৃষ্টি হতে পারে না। তোমার আরজি নামঞ্জুর,—যাও।

মোল্লা। আলায়হেস-সালাম হজরত নুহ্! গরীবের কথায়—

মনু। আমি যখন নুহ্ হয়ে তোমাদের কানুন লিখতে বসবো, তখন যা জানাবার জানিও, এখন বেরোও।

পাদ্রী। গড হইতে আসিল আদম আর হাবা; তাঁহারা জন্মাইল সেথ্‌কে; সেথের পুত্র ইনোস্, ইনোসের সন্তান কেনান্, কেনান আটশত বৎসর জীবিত রহিল ও পুত্র-কন্যা প্রসব করিল।

মনু। ভুল, ভুল, একেবারে অসম্ভব রকম ভুল!

পাদ্রী। রেভারেণ্ড ফাদার নোয়া! আপনি কি বলিতেছে? ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল কখনো ভুল হইতে পারেন না!

মনু। আমি যখন নোয়া-অবতারে তোমাদের ধর্ম্মের জাহাজ নিয়ে পার করতে আসবে, সে সময় তোমার আপিল শুনবে। প্লিজ টু গো আউট্ নাউ।

রাব্বি। আহরা মাজদা—নেবুকাড্-নেজর।

মনু। ওহে, আমি তোমার মেজদা নয়, আমি মনু, সবার বড়দাদা;—তপস্তপ্তা-সৃজদ্ যন্তু স স্বয়ং পুরুষোবিরাট তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং।

পণ্ডিত। অর্থটা কি হল ঠাকুর? অর্থটা কন্!

মনু। অন্বার্থঃ—হে দ্বিজসত্তম! বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া যাঁহাকে সৃষ্টি করিলেন আমি সেই মনু, আমাকে ছিষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া অবগত হও।

মোল্লা। হজরত! কেতাবে এ-সব কাফেরদের কথা না থাকলেই ভালো, তোবা তোবা!

পাদ্রী। গস্‌পেলে যা নাই, তা কথাই নয়!

রাব্বি। থামুস্!

পণ্ডিত। আহা, তোমরা গোল কর কেন? ঠাকুরকে সংহিতাখানা শেষ করতে দাওনা; ক্রমে তোমাদেরও কেতাব লেখা হবে।

মোল্লা। আর হবে কবে? এই প্রলয়-কাণ্ডর পরেই মোসলমান-জাত আবার পয়দা হবে, তখন সঙ্গে-সঙ্গে তাদের জন্যে ধর্ম্মপুস্তক না হলে চলে কেমন করে?

পাদ্রী। এই ark থেকে ডাঙায় নেমেই আমাকে tract বিলি করতে হবে; এখন থেকে রেডি না হলে চলে?

মনু। কিন্তু মনু-সংহিতা না শেষ কোরে তো আমি অন্য কাজে হাত দিতে পারিনে!

পাদ্রী। তবে রেভারেণ্ড ফাদার, আমায় নোট্ দিন।

মনু। নোট্? আমি কি নোটের তাড়া বেঁধে এনেছি? না, আমার ব্যাঙ্কে তোমার কিছু জমা ছিল? যাও—এখনি বেরোও বলছি।

পাদ্রী। মহাশয়, আপনি বুঝিতে পারিতেছে না কাহার সহিত কথা কহিতেছে, আমি রেভারেণ্ড ফাদার আর্ক—

মনু। গো টু হেল ইওর রেভারেণ্ড ফাদার!

[শয়তান প্রবেশ করিয়া]

আর তার সঙ্গে তোমার আর্কও যাক্ আমার ওখানে, কি বল হে মনু?

মনু। ঠিক বলেছ দাদা! চুলোয় যাক্ আর্ক, আমি এখন ভবিষ্যৎ-মানুষদের জন্যে আমার সংহিতাখানা ভালোয়-ভালোয় লিখে যেতে পারলে বাঁচি! এস দাদা, বোসো। তোমার নামটি—

শয়তান। আমাকে কেউ বলে ইবলিস, কেউ ডেবিল্, আর কেউ বলে শয়তান।

মনু। এ্যাঃ সহতান? কই শাস্ত্রে তো এ নাম পাইনি। এক সহদেব ছিলেন।

শয়তান। দেবতার সহ আমার ঝগড়া তাই বোধ হয় ওই নামেই আমায় ডাকা হয়। আমাকে কেউ-কেউ কলিও বলে।

পণ্ডিত। এ্যাঃ, হা-রাম! কলি স্বশরীরে উপস্থিত! আর পড়বি তো পড় আমারি চোখে সকাল বেলা! কোথায় কলির শেষ হবে, না স্বয়ং কলি স্বশরীরে হাজির! এইবারেই কিস্তিকাৎ ঠাকুর হে!

মোল্লা। ইয়া আল্লা!

রাব্বি। থামুস্!

পাদ্রী। By jove ফাদার সন্ হোলি গোস্ত্!

সকলে। আর এখানে থাকা নয়, চল প্রস্থান করি। চলেন, চলেন। থামুস্, থামুস্! ফাদার সন্ হোলি গোরোস্ত! আঃ কি গেরো! (প্রস্থান।)

শয়তান। ওহে মনু, তুমিও যাও কোথা? কি লিখছিলে দেখি না!

মনু। (পুঁথি সাম্‌লে) আরে না, না, ও কিছু নয়। ওটা ছুঁওনা, ধর্ম্মশাস্ত্র।

শয়তান। পৃথিবীতো উল্টে গেল, এখন আর শাস্ত্র লিখছ কার জন্যে?

মনু। কেন, যে-সব মানব আসছে তাদের জন্যে আমাকে ধর্ম্মশাস্ত্র লিখে যেতে হবে, এমনি কথাই তো আছে বিধেতার সঙ্গে!

শয়তান। সত্যি নাকি?

মনু। সত্যি নয় তো কি মিছে? আমি তো শয়তানও নই, কলির ব্রাহ্মণও নই যে মিছে বলবো।

শয়তান। মিছে-কথা বলার কি ফল তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখলে?

মনু। এখনো লিখিনি; কিন্তু লিখবো মনে করছি। একটি তুলসী-পাতা ছিঁড়লে যে পাপ, মিথ্যা কইলে সেই পাপ।

শয়তান। বাহবা, এ তো বেশ কথা! মিছে-কথা বলার শাস্তি?

মনু। চান্দ্রায়ণ!

শয়তান। চুরি?

মনু। গোরুর গায়ে পা-ধোয়া জল এক বিন্দু দিলে যে পাপ, চুরিতে সেই পাপ।

শয়তান। প্রায়শ্চিত্ত?

মনু। চান্দ্রায়ণ! এই ভাবে গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা সব পাপের কথা আর তার প্রায়শ্চিত্ত লিখতে হবে।

শয়তান। চান্দ্রায়ণ-ব্রতটা কি ব্যাপার?

মনু। ওটা একটা ব্রত; সেটা ব্রতকাণ্ড লেখবার সময় লিখে দেবো।

শয়তান। খুব শক্ত কিম্বা expensive হলে তো চান্দ্রায়ণ সবাই করতে পারবে না।

মনু। যাতে সবাই করতে পারে সহজে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শয়তান। তা হলেই হলো। তোমার সংহিতার কথা শুনে বইখানা আমার আগাগোড়া দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।

মনু। রোসো, আগে লেখা শেষ হোক, তখন একদিন পড়ে শোনাবো।

শয়তান। ধর্ম্মকথা শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগেনা।

মনু। শুধু ধর্ম্মকথা কেন? অনেক কথাই আমি লিখবো, শুনে মজা পাবে।

শয়তান। আরো কি থাকবে তোমার পুঁথিতে?

মনু। জুয়ো-খেলা, বিয়েতে যৌতুক-খেলা, রাজনীতি, অনুলোম-প্রতিলোম, ক্ষেত্র-তত্ত্ব, জল-চলাচলের হিসেব, সৃষ্টিতত্ত্ব, বর্ণাশ্রম—এম্‌নি সব।

শয়তান। সৃষ্টিতত্ত্ব তুমি কি লিখবে? তোমার তো ঢের আগে সৃষ্টি হয়ে গেছে; তুমি তাঁর কি জানো?

মনু। সেইজন্যেই তো ধ্যান কোরে সবটা পরিস্কার দেখবার চেষ্টায় ছিলেম। কিন্তু এরা পাঁচজনে হতে দিলে কই? চোখ বন্ধ কোরে দেখবার চেষ্টাটি করছি কি কানের কাছে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলে, আর সমস্ত গোলমাল হ'য়ে গেল! আবার কত বচ্ছর ধ্যান করলে যে ছিষ্টির রহস্য জানতে পারবো তার ঠিক কি?

শয়তান। মনে করলেই এখনি তুমি ছিষ্টি কবে হলো, কেমন করে হলো, সব জানতে পারো।

মনু। সত্যি নাকি?

শয়তান। আমি কি মিছে বলে তুলসী-পাতা ছেঁড়ার পাপে লিপ্ত হব?

মনু। তা হলে কেমন কোরে কার কাছে ছিষ্টির খবরটা পাওয়া যাবে?

শয়তান। এই আমারি কাছে।

মনু। তোমার কাছে? হঃ হঃ! সেকি হে, তোমার যে এখনো চুল পাকেনি, দাড়ি-গোঁপ গজায়নি!

শয়তান। সত্য গেল, ত্রেতা গেল, দ্বাপর গেল, কলিও এল-গেল, আবার সত্য আসবার জোগাড়, কিন্তু আমার চুল কালোই রইল, দাড়ি-গোঁফও দেখা দিলেনা।

মনু। তাই তো হে, তোমার চুল যে কালো কুচ্‌-কুচ্‌ করছে! কলপ দাও নি তো?

শয়তান। কলপও দিইনি, কলমে কোরে কালিও ছেটাইনি; কলুষ লাগিয়ে বসে আছি।

মনু। তাই বলো। কলপ দিলে তো এমন জলুস হয় না! আমার এই তো সবে উনপঞ্চাশ-লক্ষ বছর, এরি মধ্যেই দাড়ি-গোঁপ সব দেখনা একেবারে সাদা ধপ্‌ধপ্‌ করছে যেন ধোপ-দেওয়া পৈতের গোছা।

শয়তান। ইচ্ছে কোরে ধর্ম্মের ধোঁয়া লাগালে চুল কটা হবে না তো কালো থাকবে নাকি ?

মনু। সব বিধাতার ইচ্ছে! যাক্ সে কথা! যে-রকম চট্‌পট্ বুড়িয়ে যাচ্ছি তাতে ভয় হয় বুঝিবা আমার ভেরেণ্ডা-সংহিতাখানা শেষ কোরে যেতে পারলেম না। এক ছিষ্টিতত্ব নিয়ে সারা দিনটা গেল, অথচ এখনো একছত্র লেখা হল না ; ভেবেই ঠিক হচ্ছে না ছিষ্টি কেমন করে হ'ল!

শয়তান। তুমিই লিখবে আবার তুমিই ভাববে ছিষ্টি কেমন কোরে হল,—এ হলে ছিষ্টিতত্ব তোমার কোনো দিন লেখা হবেনা।

মনু। আমার হয়ে আবার কে ভাবতে আসবে ?

শয়তান। কেন আমি! আমি ভাবি আর তুমি লিখে চল ;—হুহু কাজ এগিয়ে যাবে।

মনু। হ'লে তো হয় ভালো ; কিন্তু তা হ'তে পারে না।

শয়তান। কেন হবে না ? মহাভারতটা হ'ল কেমন করে ? ব্যাস ভাবলেন, গণেশ লিখলেন—হুহু কোরে চারহাতে অষ্টাদশ পর্ব্ব।

মনু। সে ব্যাসও নেই, সে গণেশও নেই ; সব যে এখন উল্‌টে গেছে!

শয়তান। কিন্তু তুমি-আমি আছি তো! দুজনে মিলে একখানা বই আর লিখে উঠতে পারবো না ? বোসো কলম ধোরে।

মনু। আচ্ছা বেশ! পণ্ডিত-মশায়, আমার দোয়াত-কলমটা চট্‌-কোরে আনেন তো!

(নেপথ্যে পণ্ডিত)

আমি ওখানে যেতে পারবো না, কলি রয়েছেন!

মনু। আরে, কি বাজে বকো ?

পণ্ডিত। আজ্ঞে ঠাকুর, আমি হরিনাম করছি—আপনি এসে লয়ে যান।

মনু। আরে রেখে দাও হরিনাম! আমি ব্যাসাসন কোরে বসেছি, উঠি কেমন কোরে ?

পণ্ডিত। আজ্ঞে আমি যোগাসনে বসে আছি, যাই কেমন কোরে ?

মনু। এ তো বড় বিপদ হ'ল!

শয়তান। কেন, মোল্লা কি পাদ্রী ওদের কাউকে বল না ?

মনু। সে তো হ'তে পারেনা! সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র ওঁদের ছোঁয়া জিনিষে—তুমি যদি একবার গিয়ে দোয়াত-কলমটা—

শয়তান। একে কালি, তাতে ব্রহ্মার হাঁসের পালক,—ও দুটোর দিকেই আমার যাবার জো নেই, তুমি তো জানো।

মনু। তবে উপায় ?

শয়তান। উপায় আমি বলি,—তুমি মুখস্থ কোরে যাও, সময়-মতো লিখো।

মনু। তা হ'লে তো শ্রুতি এবং স্মৃতি হল, সংহিতা হ'ল না।

শয়তান। সেই তো ঠিক! আগে শ্রুতি, তারপর স্মৃতি, শেষে সংহিতা—এই নিয়মই তো বরাবর চলে আসছে।

মনু। তাও তো বটে!

শয়তান। তবে শোনো। (কানে-কানে) শুনলে ? মনে থাকবে তো ?

মনু। রোসো! সুবর্ণ-নির্ম্মিত সূর্য্য-প্রভাযুক্ত একটি অণ্ড—

শয়তান। আরে যাও, তোমার কিছুই মনে নেই! ছিষ্টির আগে কিছুই ছিল না, ছিল কেবল একটি অণ্ড, তার একভাগ আলো আর একভাগ কালো। আলোর ভাগে হলেন ব্রহ্মা, আর কালোর ভাগে পড়লেন শয়তান। তারপর দুজনে সতরঞ্চ-খেলা আরম্ভ হল। ব্রহ্মা ছিষ্টি করলেন হাতি, ঘোড়া আর পারাপারের নৌকো; আর শয়তান গড়লেন রাজা, মন্ত্রী, আর বড়ে! এক অণ্ড—এইভাবে কালো-আলো পাপ-পুণ্য দুই ভাগ হয়ে সেই যে খেলা সুরু করলে সেই খেলা এখনো চলছে, চিরকাল চলবে;—একজন চাল্‌বে চাল, অন্যে চাল্‌বে বেচাল!

পণ্ডিত (পা-টিপিয়া প্রবেশ করিয়া) ঠাকুর চুপিচুপি কি করছেন, জানতে হ'ল! হুঁহুঁ আমাকে ভাঁড়িয়ে ছিষ্টিতত্ত্ব জেনে নেওয়া হচ্ছে! (প্রকাশ্যে) ঠাকুর, পায়ের ধুলো দেন, জপ আমার শেষ হয়েছে।

মনু। তুমি এখানে কেন? যাও, যাও, এ সব অতি গোপনীয় কথা, তোমার শুন্‌তে নেই।

পণ্ডিত। আমি শুনে ফেলেছি, এখন বাকিটুকু শুনতে চাই।

মনু। আমি আদেশ করছি, গুরুর আদেশ অমান্য করতে নেই, তুমি বেরোও—

পণ্ডিত। আর আপনি একা-একা কথা শুনুন? এমন অনাছিষ্টি তো হতে পারে না!

শয়তান। তুমি এ-সব শুনে করবে কি? তুমিতো-আর বই লিখবে না!

পণ্ডিত। উনি যদি শুনে লিখতে পারেন তো আমি পারিনে?

মনু। সেইজন্যেই তোমাকে বাইরে যেতে বলা হচ্ছে। তুমি সংহিতাটা লিখে যাবে আর আমি বুঝি কেবল ভেরেণ্ডা ভাজবো এই—কতকালের পুরোনো নৌকোটারখোলের মধ্যে বসে? সে হচ্ছে না বাবাজী! বেরোও এখনি, না হলে—

পণ্ডিত। না হলে কি? বলেন, কি বলতেছিলেন—না হলে কি?

মনু। দেখছ ইনি স্বয়ং কলি!

পণ্ডিত। তাতে হয়েছে কি?

মনু। এঁর দৃষ্টিমাত্রে তুমি ভস্ম হয়ে যাবে!

পণ্ডিত। সে ভয় নেই, তার ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।

শয়তান। কি করেছ শুনি!

পণ্ডিত। একঘটি গঙ্গাজল খেয়ে এসেছি।

মনু। গঙ্গাজল! এখানে তুমি গঙ্গাজল পেলে কোথায় বাপু?

শয়তান। গঙ্গা, টেম্‌স, জর্দ্দন সব জল যে এখন এক হয়ে গেছে; গঙ্গাকে খুঁজে পেলে কোথায়?

পণ্ডিত। এই আমার ট্যাঁকে রয়েছেন গঙ্গা

শয়তান! ট্যাঁকে গঙ্গা?

মনু। এমন তো শুনিনি!

পণ্ডিত। ব্রহ্মার কমণ্ডলে, শিবের জটায় গঙ্গা থাকতে পারেন, আর ব্রাহ্মণের ট্যাঁকে রইতে পারেন না?

মনু। ভাখ্, মিথ্যা বোলে তুলসী-ছেদন করিসনে, ভালো হবেনা!

শয়তান। গঙ্গাকে তুমি ট্যাঁকে বাঁধলে কি প্রকারে শুনি!

পণ্ডিত। কেন, পৃথিবীর অবস্থা

খারাপ দেখে ঠাকুর যখন দেবতার কাছে মানত কোরে জোড়া-জোড়া পাঁটা-মোষ-কাক-বলি, কুঁকড়ো-বলি, লাউ-বলি, কুমড়ো-বলি—এমনি নানা সামিগ্রির পোঁটলা বেঁধে বিপদ-সাগর পার হতে এই কতকালের ভাঙা নৌকোখানায় এসে চড়লেন, তখন আমি ভাবলেম—সর্ব্বনাশ! এই প্রলয়-ঝড়ে এত বোঝা নিয়ে নৌকো তো ভরা-ডুবি হবেই! বিদেশে বিভুঁয়ে কোথায় গিয়ে মরি তার ঠিক নেই, মরণকালে গঙ্গা পাই কিনা, কাজেই আসবার সময় তাড়াতাড়ি দুটো গঙ্গা-মৃত্তিকের তিলকমাটি ট্যাঁকে জড়িয়ে আনলেম—

মনু। ওতো মাটি, গঙ্গা কোথায় রে হতভাগা?

পণ্ডিত। এই মাটি জলে গুলে দিলেই গঙ্গা,—একঘটি, ঽ, দশ ঘড়া, বিশ ঘড়া—যত চান্।

মনু। রইলো এই ভেরেণ্ডা-সংহিতা!

শয়তান। কেন? কেন? এমন জিনিষটা লেখা হচ্ছিল—অসমাপ্ত থাকবে?

মনু। সমাপ্ত করে লাভ? আমি মাথা-ঘামিয়ে লিখবো, কেউ আর পড়বে কি?

পণ্ডিত। কেন ঠাকুর, আমি পড়বো।

মনু। তুমিই খালি পড়বে, আর-কেউ পড়বে না।

পণ্ডিত। কেন ঠাকুর, আমি পড়ে সকলকে পড়াব,—পাখী-পড়ানো কোরে পড়াব।

মনু। তা হলে সংহিতাটা তুমিই লিখে নাও না কেন। আমার পুঁথি তোমায় দিচ্ছি, ওই তোমার ট্যাঁকের মাটিটুকু আমায় দাও।

পণ্ডিত। বাস্‌রে, তাও কি হয়! গঙ্গাদান করবো? এই গঙ্গাজল এক একবিন্দু খাইয়ে লক্ষকোটি পাপী আমি উদ্ধার করবো ভেবেছি।

মনু। তবে আমার ধর্ম্মশাস্ত্র লেখার প্রয়োজন?

পণ্ডিত। প্রয়োজন আছে। শাস্ত্রে এই গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য লিখতে হবে, তবে তো আমার কথায় লোকে বিশ্বাস করবে।

মনু। তুমি কিনবে নাম, কুড়বে পয়সা, আর আমি-ব্যাটা তার বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বিলি করবো!—রইলো তোমার ভেরেণ্ডা-সংহিতাতাকে তোলা! দেখি তুমি কেমন পাপী উদ্ধার কর!

(প্রস্থান।)

পণ্ডিত। ঠাকুরকে চটিয়ে তো বিষম বিপদ হ'ল দেখছি! মানুষ জন্মাবে, পাপও করবে; কিন্তু সংহিতাও থাকবে না, গঙ্গাজলের মাহাত্ম্যও কেউ বুঝবে না!

শয়তান। তুমি তো বুঝবে?

পণ্ডিত। শুধু আমার বোঝায় তো ফল হবে না। আমি কি শুধু দুবেলা গঙ্গাজল খেয়ে প্রাণধারণ করবো?

শয়তান। ভগীরথ তো তাই করে-ছিলেন।

পণ্ডিত। তাঁর কথা ছেড়ে দাও। গঙ্গা-জলের জন্যে যদি আমার-ওখানে যাত্রীর ভিড় না লাগলো তো আমার এর-পরে যে সংসার হবে তা চলে কিসে?

শয়তান। ওহো, তাওতো বটে! তা তুমি নিজেই কেন দু-ছত্তর পুঁথি লিখে ফেলনা!

পণ্ডিত। আরে তাই যদি পারবো তবে

ঐ মনু-বাবাজার পায়ে তেল দিচ্ছি কেন? চিরকালটা ওঁর জন্যে পুঁথির মালা গেঁথে আর তল্পি বয়ে বেড়িয়েছি, এ বয়সে কি এখন আর পুঁথি লেখা চলে? পুঁথি-গাঁথবারই দিষ্টি নেই, পুঁথি তৈরি করা ত দূরের কথা!

শয়তান। এতকাল যে ওর তল্পি বইলে, ওর কাছে কিছু আদায় করতে পারলে না? যোগে-যাগে কিছু-একটা বিদ্যে, কি বুজরূগি, কি magic, কি সোনা-দানা কিছু?

পণ্ডিত। থাকলে কিছু তো আদায় হ'ত! আমাকে সিদ্ধি দেবেন বলেছেন, সেই থেকে ওঁর সঙ্গে ঘুরছি।

শয়তান। এককালে তো কিছু ছিল?

পণ্ডিত। রামঃ কোনো কালে কিছুই ছিল না।

শয়তান। তবে এত-বড় নৌকোখানা, এই এত খাঁচা পশু-পক্ষী, এত ঝুড়ি, এত ধামা, এত হাতি-ঘোড়া এগুলো সব এল কোথা থেকে, যদি কিছু না থাকবে?

পণ্ডিত। আমিওতো তাই ভাবি, ওঁর তো এক-পয়সার পুঁজি ছিল না, কেবল ছিল একটা ছেঁড়া পাঁজী, তার থেকে এত হ'ল কেমন কোরে?

শয়তান। ঠিক জান তো? এ-সব যা দেখছি সবই তোমার গুরুর, আর কারু নয় তো?

পণ্ডিত। গুরু নিজমুখে বলেছেন সব ওঁর কাণ্ডকারখানা; না হলে কি বিশ্বাস করি?

(মোল্লা সঙ্গে নবি-বেশে মনুবাবুর প্রবেশ।)

নূহ। ফিল্ হকিকৎ, বিল্ ইত্তেফাক্, বেয়ান্দাজ লওজান!

শয়তান। এর মানে কি হ'ল? হঠাৎ আরবী ধরলেন যে?

নূহ। এর মানে যারা ফকীরদের কথায় অবিশ্বাস করে তারাই কাফের, তাদের ফিল-খানায় মেথর কোরে রাখ।

পণ্ডিত। গুরুজী, আমি কোন্ দিন আপনাকে অবিশ্বাস করেছি যে অভিসম্পাৎ দিচ্ছেন?

নূহ। চোপরও কাফের, বদমাস! আমি আর তোমার গুরু নই, আমি এখন—

মোল্লা। হজরত নূহ আলায়হেস সালাম!

পণ্ডিত। যাক্, সংহিতার দফা রফা হ'ল, আমিও গেলেম এবারে!

শয়তান। তাইতো, আবার যে ধর্ম্মপুস্তক লেখা সুরু হ'ল, একটা মস্ত দল তো হাত-ছাড়া হয়, এখন উপায়?

মোল্লা। হজরত, তাহলে এইখানটায় কুর্সি নিয়ে কেতাব লিখতে বসেন, আমি খানিক জমজমের জল দিয়ে স্থানটা পরিস্কার করে দিই।

শয়তান। তোমার সঙ্গে জম্‌জম্ আছে নাকি? তবে তো ভালো।

মোল্লা। আজ্ঞে উটের চামড়ার একটা কার্ব্বা জল সঙ্গে এনেছি।

নূহ। জম্‌জম্ কিহে?

শয়তান; (চুপি-চুপি) ওদের গঙ্গাজল! দুয়েরই ঠিক এক কাজ।

নূহ। বল কি? তাহ'লে তো কেতাব লেখা হয় না। পাদ্রী, রেভারেণ্ড ফাদার! চট্ কোরে আমার সোলারটুপি আর অল্‌স্টার আনো, আমি গস্‌পেল লিখতে চাই।

মোল্লা। হজরৎ-

নোয়া। গো টু দি—

পাদ্রী। ফাদার সন্ হোলি গোস্ত! রেভারেণ্ড ফাদার নোয়া ইওর মোষ্ট—

শয়তান। এ এক ফ্যাসাদ্ উপস্থিত! রেভারেণ্ড ফাদার, গস্‌পেল লেখবার আগে—

পাদ্রী। সকলকে জর্ডনের জলে বাপটাইজ করে নিই।

(বোতল বাহির করণ।)

নোয়া। ও আবার কি বেরোলো?

শয়তান। জর্ডন! জম্‌জমের ছোট ভাই!

নোয়া। গো আউট, গো আউট! নাঃ, আর কারু জন্যে কিছু লেখা নয়!

(আগুনের আংটা ঢুলিয়ে রাব্বির প্রবেশ।)

রাব্বি। পীর নপিসতিম্ নেবুকাড্‌নেজর—

মনু। চাইনে তোমার নেবু। সা অব্বাগি দামুস ঢমুস্!

রাব্বি। থামুস!

সকলে। ক্ষেপে গেলেন নাকি? ওরে পলায়ন কর! ক্যা আফত্! Very strange! থামুস্!

পণ্ডিত। আমার যে ডাক-ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে, আহা এমন গুরু আর পাবনা রে—

সকলে। আহা, হাহা, হুহু! Lord তোবা তোবা! হতোস্মি! থামুস্!

(দলে-দলে স্ত্রীগণ)

কি হলো, কি হলো, ঠাকুরের কি হলো?

পণ্ডিত। আর হবে কি? নাম শোনাও, নাম শোনাও!

পাদ্রী। হিম্! হিম্! শীঘ্র হিম্!

মোল্লা। যোকুছ করনা হোয় করে ভাই, এ ক্যা আফত্!

রাব্বি। থামুস্!

(গান)

আরে নামে-নামে গঙ্গাপানি!
জম্‌জম্-পানি, জরদন্-পানি!
হরদম্ পানি, ঝম্ ঝম্ পানি—
নামে নামে নামে পানি!

পণ্ডিত। বোল্ বোল্ বোল্ বোল্
বোল্ বোল্ বোল্ বোল্!

পাদ্রী। বাইজোব্ বাইজোব্ বাইজোব্
বাইজোব্!

মোল্লা। তোবা তালা তোবা তালা
তোবা তালা।

রাব্বি। থামুস্ থামুস্ থামুস্ থামে!

মনু। নাঃ, এরা আমায় ক্ষেপিয়ে তুল্লে! ওরে থাম্ তোরা! ওহে সহতান্, ও ভাই সহদেব, কোথায় পালালে হে? এই অন্তিমকালে দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।

শয়তান। (নেপথ্যে) এই যে আমি এইখানে;—এই মস্ত খাঁচাটার এপারে বসে পিঞ্জরাবদ্ধ জীবদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করছি।

মনু। কই হে দেখা দাওনা, অন্ধকারে রইলে কেন?

শয়তান। দেখা দিলে সবাই ভয়ে আঁৎকে উঠবে; বরং তুমি এই খাঁচার মধ্যে এস, ওরা তোমার কাছে ঘেঁসতে পারবেনা।

মনু। সেই ভালো, পিঁজরাপোলেই দিনকতক আরামে কাটানো যাক গে।

সকলে। অমন কাজ করবেন না ঠাকুর, খাঁচায় বাঘ আছে—রেভারেণ্ড! হজরৎ থামুস্! নপিস্‌তিম্!—নাম কর! নাম কর

(গান)

আরে নামে নামে ঝম্ ঝম্ নামে!

মনু। বাঘের মুখে নামতে হয় তাও স্বীকার, তোদের উৎপাত আর সহ্য হয় না—চল্লেম।

শয়তান। এসো।

[ঘোর অন্ধকারে বিকট মূর্ত্তিতে শয়তানের আবির্ভাব। সকলে চীৎকার ক'রে উঠলো। পশুপাখীগুলো পর্য্যন্ত খাঁচার মধ্যে ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি সুরু ক'রে মূর্চ্ছিত হ'ল।]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

য়ুরোপের প্রভাবে ভারতের ভাবী অবস্থা

(ফরাসী হইতে)

এখন আলোচনা করা যাক্ য়ুরোপের প্রভাব-বশে ভারতীয় জন-সমাজের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে।

দুইটি প্রবণতা এখন হইতেই প্রকাশ পাইতেছে।

প্রথম, ভারতীয় সমাজ যে সকল বিভিন্ন উপাদানে গঠিত সেই সব উপাদানের সংমিশ্রণ।

ভারতের ধর্ম্মসমূহ।—এখনও বহুকাল ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম পরস্পরের সহিত যুঝাযুঝি করিবে। কিন্তু বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হয়, সেই জ্ঞান-শিক্ষা এবং য়ুরোপের ভৌতিক সভ্যতার সমুন্নতি—এই দুইটি জিনিস অল্প অল্প করিয়া হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতাকে ক্ষীণ করিবে। পক্ষান্তরে, সমস্ত মুসলমান রাজ্যের অবনতি বশতঃ ভারতীয় মুসলমানদিগের মেজাজটা আর ততটা দুর্দ্দমনীয় থাকিবে না।

ভারতের অধিবাসী।—ভারত একটি সুনির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক ভূখণ্ড হওয়ায়, উহার সমস্ত অধিবাসীগণেরই সমান স্বার্থ। বৃহত্ত্ব প্রযুক্তই উহা কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত। টেলিগ্রাফ্, ষ্টীমার, রেল-গাড়ী, ভারতকে ক্রমশঃ এক-রাষ্ট্রে পরিণত করিবে। বিভিন্ন ভাষায় কথা কহা বরাবর চলিলেও একটি সাধারণ ভাষা উহাদের মধ্যে প্রচলিত হইবে—সে ভাষা ইংরেজী। এই ইংরেজী ভাষার সাহায্যে উহারা য়ুরোপের সমস্ত বিজ্ঞানের অনুশীলনে সমর্থ হইবে।

বর্ণভেদ প্রথা উঠিয়া গেলে তাহারই ফলে আর একটি গুরুতর ঐক্য সংসাধিত হইবে।

ভারতের ইতিহাসে বর্ণভেদপ্রথা, অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থার স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ণভেদ প্রথার প্রতি হিন্দুর অপরিসীম আসক্তি থাকায়, যে-সকল আন্তরিকভাব (sentiment) অন্যান্য দেশে স্বতন্ত্র, এমন কি বিরোধী—তাহাও ভারতে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে;

যথা,—ধর্ম্ম, জন্মসম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস, অদৃষ্টের প্রতি অধিক আস্থা স্থাপন, স্থানীয় দেশানুরাগ, পৌরাণিক ইতিহাস ও প্রাদেশিক কিংবদন্তীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি, স্থানীয় ভাষা ও উপভাষার প্রতি অনুরাগ, দল-গণ্ডির প্রতি, কৌলিক কর্ত্তব্যের প্রতি আসক্তি। বস্তুতঃ, যদি কোন রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়া সহসা জাতিভেদের উচ্ছেদ হয় তাহা হইলে হিন্দুরা সামাজিক গঠনপ্রণালী হইতে, ধর্ম্ম হইতে, ধর্ম্মনীতি হইতে বঞ্চিত হইবে।

কিন্তু যে ঐক্যসাধনের কাজ কোন আইনের দ্বারা সংস্থাপিত হইতে পারে না, সভ্যতার ক্রমবিকাশই,—মূল-বর্ণগুলাকে খণ্ডাংশে বিভক্ত করিয়া, সেই কাজ সমাধা করিবে। এই প্রকারে সেকালের সমাজ আস্তে আস্তে লয় প্রাপ্ত হইবে,—পক্ষান্তরে য়ুরোপের প্রভাবে ক্রমশঃ একটি নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে।

* * *

তাহারপর, পাশ্চাত্য মতামতের (ideas) সহিত প্রাচ্য মতামতের, ইংরেজী রাগ-বিরাগের (sentiment) সহিত ভারতীয় রাগ-বিরাগের মিলন সাধন।

একপক্ষে ইংরেজদের কেজো বুদ্ধি, ও কল্পনাবর্জ্জিত তথ্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ; অপর পক্ষে, হিন্দুদিগের উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম কল্পনা এবং শ্রেণীবন্ধনের প্রতি অনুরক্তি।

রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিতে, ঐ উভয় মানসিক বৃত্তিই একত্র সম্মিলিত হইতে পারে। হিন্দুদিগের পদ্ধতিরচনাবিষয়িনী বুদ্ধির প্রভাবে ভারত একটি কেন্দ্রবর্ত্তী শাসনপ্রণালী প্রাপ্ত হইবে। এবং ইংরেজদিগের কেজো বুদ্ধির প্রভাবে, ভারতীয় প্রদেশগুলির স্বায়ত্ততন্ত্র সংরক্ষিত হইবে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে, ইংরেজেরা ভারতবাসীদিগকে স্বকীয় উদ্যমারম্ভ ও স্বাধীনতাস্পৃহা প্রদান করিবে। কিন্তু বর্ণভেদপ্রথা কতকটা হ্রাস ও রূপান্তরিত হইলেও উহা আরো বহুদিন স্থায়ী হইয়া দরিদ্র ও অল্পশিক্ষিত ত্রিশ কোটি কৃষী ও কারুকরকে কার্য্যের একটা গঠন শৃঙ্খলা প্রদান করিবে। যেদিন য়ুরোপীয় বণিকেরা ভারতে মজুরীর বাজার সস্তা দেখিয়া অনেকগুলি কারখানা খুলিবার জন্য ভারতীয় শ্রমজীবিদিগকে নিযুক্ত করিবে সেইদিন একমাত্র বর্ণভেদ প্রথাই শ্রমজীবীকে রক্ষা করিবে।

ইংরেজদের সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, অভিজ্ঞতাবাদ, উহাদের যাথাযথতা, উহাদের গভীর আন্তরিকতা—হয়তো ভারতবাসীর খেয়ালী কল্পনার উপর আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তখন আর ভারতবাসীরা গুণবাচক ও দ্রব্যবাচককে, অথবা বুদ্ধির ধারণা ও কল্পনার ছবিকে মিলাইয়া মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিবে না। তাহারা বুঝিবে যে, তথ্যের নিকট অতীব সূক্ষ্ম যুক্তিও পরাভূত হয় এবং তথ্য-ভিত্তি-বিরহিত শুধু মনগড়া সাধারণ সিদ্ধান্তগুলা সময় কাটাইবার উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রও একটু পরিবর্ত্তিত হইবে। সম্ভবত য়ুরোপের প্রভাবে ভারতবাসীগণের কর্ম্মে অভিরুচি হইবে, ব্যবহারিক জীবনের কাজ সম্বন্ধে একটা সহজ বুদ্ধি

উৎপন্ন হইবে। পঞ্জাবী, মারাঠী, তামুল প্রভৃতি যে সকল জাতি কর্ম্মিষ্ঠ তাহারা আরও কর্ম্মিষ্ঠ হইবে। গুজরাটীরা এখনই ত বাণিজ্য-কুশলতার পরিচয় দিয়াছে। বাঙ্গালীদের এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যামূলক ব্যবসায় ভিন্ন আর কোন ব্যবসায়ের প্রতি বড় একটা অনুরাগ দেখা যায় নাই। বহুকাল হইতে সুসভ্য হিন্দুস্থানীরা স্বকীয় বলবীর্য্য ও প্রখর বুদ্ধি হারাইয়াছে।

বর্ত্তমানে সমস্ত জনসমাজের যেটি পরিচায়ক লক্ষণ, সেই লক্ষণটি নব্যভারত-সমাজেও বর্ত্তাইবে:—সেই লক্ষণটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। এই সম্বন্ধে ভারতবাসীর আর কিছুই করিতে হইবে না, উহাদের বর্ত্তমান প্রভুদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেই হইবে। ভারতবাসীরা এই কথাটা মনে মনে একবার ভাবিয়া দেখুক, কি করিয়া এক লক্ষ লোক,—ত্রিশ কোটি লোককে, বাঙ্গালীর ন্যায় বুদ্ধিমান জাতিকে, রাজপুত পঞ্জাবী প্রভৃতির ন্যায় লড়াক্কা জাতিকে অনায়াসে শাসন করিতেছে! তাহারা তখন বুঝিতে পারিবে,—প্রথানিষ্ঠ পুরাতন সমাজ বা মণ্ডলী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট নবীন সমাজকে, কখনই প্রতিরোধ করিতে পারে না। তবে, এই নবীন সমাজের অনুকরণ করিলে আপাতত উহারা মানসিক ও নৈতিক নিজত্ব হারাইবে এবং আর্থনৈতিক হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু ইহাও উহারা বুঝিতে পারিবে যে, জ্ঞানশিক্ষা ব্যতীত শুধু সিদ্ধান্ত-মূলক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কোন কাজেরই নহে। আসলে জ্ঞানশিক্ষার দ্বারাই চারিত্র গঠিত হয়। প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকৃত আত্ম-সংযমের শিক্ষা দেয়, আইনকে সম্মান করিতে, স্বনির্ব্বাচিত অধিনেতাদিগকে সম্মান করিতে শিক্ষা দেয়, এবং প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রকৃত ঐক্যবন্ধনের শিক্ষা দেয়; উদারনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সভাসমিতির একান্ত অনুগত হইতে, স্বাধীনভাবে-অঙ্গীকৃত বাক্য পালন করিতে, আপনার প্রতি সম্মান করিতে এবং আত্মসম্মানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যকে সম্মান করিতে শিক্ষা দেয়।

সমাপ্ত *

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাল-বৈশাখী

চোদ্দ

স্ত্রীর কথা

জানিনে বাপু, মনটা কেন এমনধারা ধুক্‌ফুক্ করছে! ওঁর সঙ্গে ভালো করে' কথা কইতে কেমন-যেন বাধো-বাধো ঠেকছে, থেকে-থেকে কথা কইতে কইতে পালিয়ে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে, প্রাণের ভিতরটা মাঝে-মাঝে অকারণে কেঁদে-কেঁদে উঠছে!—কেন এমন হচ্ছে?

---

* Dela Mazeliere প্রণীত "ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ" নামক এই ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদ ১৩১৮ সন বৈশাখ মাসের "প্রবাসী" পত্রে প্রথম আরম্ভ হয়।

সত্যি-সত্যি, এত লুকোচুরি আমার ভালো লাগ্‌ছে না! স্বামীকে চিরদিন আমি দেবতার মত দেখি, আমার মনের একটা কথাও তাঁর অজানা নেই, আর আজ আমি তাঁকেই বশ করবার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরের লোকের কাছে হাত পেতে ওষুধ মেগে নিয়েছি! নিশ্চয় এতে আমার পাপ হয়েছে, আর সেইজন্যেই মনটা খারাপ হয়ে আছে!

বাস্তবিক, ঠাকুরপো আমার কোথাকার কে? দুদিন আগে তাঁকে জানতুম না চিনতুম না, আমার বিয়ের দিন শত্রুর মত তিনি আমাদের গলায় ছুরি বসাতে চেয়েছিলেন,—তাঁর সঙ্গে পরিচয় ত এইটুকু! আর আজ তিনি আমার এমন কী আপনার লোক হয়ে পড়লেন যে, স্বামীকে লুকিয়ে তাঁর কাছে সব প্রাণের কথা খুলে বল্‌ছি?

আমারি-বা হ'ল কি? স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষের সঙ্গে মরে গেলেও কথা কইতে পারতুম না, উনি এজন্যে কত কথা বলেছেন, কত রাগ করেছেন, তবু আমি কোনদিন ওঁর কথা ভুলেও কাণে তুলি নি! অথচ আজ আমিই কিনা লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে এই নতুন লোকটির সঙ্গে মেলামেশা করছি, এর কথায় কলের পুতুলের মত উঠ্‌ছি-বস্‌ছি! এটা কি ঠিক হচ্ছে?

ঠাকুরপো নিশ্চয় গুণ-টুন কিছু জানে! আমি ত কোন্ ছার, বনের পশুকেও বোধহয় ও বশ কর্‌তে পারে! নৈলে এমন করে' আমাকে ভুলিয়ে দেয়!

কিন্তু এক-একদিন কেন জানিনা, ঠাকুর-পোকে আমার যেন কেমন-কেমন মনে হয়! সময়ে সময়ে—আমি যখন পিছন ফিরে থাকি—ঠাকুরপো কি-একরকম চোখ করে' আমার দিকে তাকিয়ে থাকে; হঠাৎ সাম্‌নে ফিরে আমি সেটা দেখ্‌তে পাই, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরপোর চোখের ভাবও অম্‌নি আবার সহজ হয়ে আসে! সে সময়ে আমার বুকটা যেন শিউরে ওঠে, পুরুষের চোখে ও-রকম ভাব দেখলে আমার বড় ভয় হয়!......কেন, ঠাকুরপোর চোখ অমন হয় কেন? সাম্‌না-সাম্‌নি এক রকম, পিছনে আর-একরকম, এর কারণ কি?

কারণ যাই হোক্, ঠাকুরপোর সঙ্গে আর এত-বেশী মেলা-মেশায় দরকার নেই বাপু, মেয়ে-মানুষের সুনাম কয়লার লেখার মত,—জলের এক ঝাপ্‌টায় তা মুছে যায়, কিসে কি হয় বলা ত যায় না!......এখনি ত আমি শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছি,—স্বামীকে সন্দেহ করে' লুকিয়ে ঠাকুরপোর কাছ থেকে ওষুধ নিয়েছি,—এ-কথা জানাজানি হয়ে গেলে ওঁর সাম্‌নে আমি মুখ দেখাব কেমন করে'?—বাঁধন যাতে আরো-বেশী শক্ত না হয়ে ওঠে, এখন থেকে সেই চেষ্টাই কর্‌তে হবে।

আচ্ছা, এ-সব ওষুধ-বিষুধ কি সত্যি, না কেবল কথার কথা? ঠাকুরপো যদি এতই জানে, পরের স্বামীকে অনায়াসে বশ করিয়ে দিতে পারে, তাহলে সে নিজের বউকে বাগ মানাতে পারছে না কেন? তার বউটির মন ফেরালেই ত আমি-বেচারী রেহাই পাই, আমার স্বামীরও মন ভালো হয়, ওষুধের জন্যে আমাকেও আর ভেবে মর্‌তে হয় না! হ্যাঁ, আজ ঠাকুরপো এলে বল্‌ব, আগে তোমার নিজের ঘর সাম্‌লাও, তাহলেই আমার স্বামীর মন ফিরবে!... ... ...

ওকি, ওকে! ও আমাদের বাড়ীতে কেন? অ্যাঁ, ওর ত বুকের পাটা কম নয়, বাড়ী বয়ে ও এসেছে কিনা—

আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলুম! সে আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমার মুখের পানে অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে, একটুখানি হেসে বল্‌লে, "আপনি ত পুরন্দর বাবুর স্ত্রী?"

আমি আড়ষ্টভাবে ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ।

—"আপনার সঙ্গে আমার কখনো আলাপ করবার সুবিধে হয় নি, আপনি আমাকে চেনেন ত?"

আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। মনে মনে বল্‌লুম, 'তোমাকে আবার চিনি না—খুব চিনি! এত-বেশী চিনি যে জীবনে কখনো ভুল্‌ব না!'

সে আবার হেসে বল্‌লে, "আপনার মুখ দেখে মনে হচ্চে, আমাকে দেখে আপনি ভারি ভয় পেয়েচেন! কেন বলুন দেখি? আমি কি মানুষ নই? বিশ্বাস যদি না হয়, আমার গায়ে বরং হাত দিয়ে দেখুন, আমার দেহের কোনখানটা মোটেই রাক্ষসীর মত নয়—আমি ঠিক আপনার মতই জলজ্যান্ত মানুষ!"—এই বলে সে আমার হাত ধরলে!

আমি কি করব—কি বল্‌ব ভেবে না পেয়ে যেমন ছিলুম, তেম্‌নি চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপর সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে, ধীরে ধীরে বল্‌লে, "বোন, আমাকে দেখে তুমি যে কেন এমন জড়সড় হচ্চ তা আমি বুঝেচি। কিন্তু ভাই, এত-বড় দুনিয়ায় এত-রকমের লোক অবস্থার ফেরে পড়ে' সবাই কিছু নির্ভুল কাজ করতে পারে না। ভুল-ভ্রান্তি অনেক হয়! পড়তে পড়তে মানুষ যেমন চল্‌তে শেখে, আমরাও অনেকে তেম্‌নি আগে ভ্রম না করে' ভ্রম সংশোধন করতে পারি না! এটা আমাদের দুর্ব্বলতা, কিন্তু যারা দুর্ব্বল, তারা কি তোমাদের কাছ থেকে এককোঁটাও দয়ার আশা করবে না?"

এমন দুঃখিত ভাবে সে এই কথাগুলি বল্‌লে, যে আমিও দুঃখিত না হয়ে থাক্‌তে পারলুম না। সে যে কত-বড় অন্যায় কাজ করেছে, এটা সে বুঝতে পেরেছে দেখে তার উপর থেকে আমার রাগ অনেকটা কমে এল।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পুরন্দর বাবুর অসুখ হয়েচে, না?"

—"হ্যাঁ।"

—"এখন কেমন আছেন?"

—"জ্বরটা নেমে এসেচে।"

—"তিনি কোথায়?"

—"ঐ ঘরে।"

—"আমি তাঁর সঙ্গে একটিবার দেখা করব। তোমার কি আপত্তি আছে ভাই?"

এই দেখা-করার কথাটা আমার কিন্তু ভালো লাগল না। এত কথার পর আবার দেখা-করার কথা কেন? একবার যখন ভুল হয়েছে, আবার ভুল হ'তে কতক্ষণ!

সে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি ভাবছি দেখে সে একটু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "ভেবনা ভাই, ভেব না! আমি বাড়ী বয়ে তোমার স্বামী চুরি ক'র্‌তে

আসি-নি! নেহাৎ যদি বিশ্বাস না কর, এই-খানেই না-হয় তুমি ঘাটি আগলে পাহারা দাও, সন্দেহ হ'লেই আমাকে গ্রেপ্তার কর্‌তে পার্‌বে।"

আমি লজ্জা পেয়ে বল্‌লুম, "ঐ পথ দিয়ে গেলেই ওঁর ঘরে যেতে পারবেন।"

কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা কাগজ বের করে' সে বল্‌লে, "দেখ বোন, ততক্ষণে তুমি এই চিঠিখানা বসে বসে পড়ে ফেল। সব কথা মুখে বল্‌বার সুবিধে হবে না ভেবে এই চিঠিখানা আমি লিখে রেখেচি। জেন, এর প্রত্যেক কথাটি সত্য। অবিশ্বাস কর্‌লে তোমারি অমঙ্গল হবে। তোমার মুখ চেয়ে, এই চিঠির কোন কথা আমি তোমার স্বামীকে জানাব না—সেজন্যেও কিছু ভেব না। এই নাও।"

আমি হাত পেতে চিঠিখানা নিলুম, সে আমার স্বামীর ঘরের দিকে চলে গেল।

হঠাৎ এ কিসের চিঠি? আর আমাকেই বা লেখবার উদ্দেশ্য কি? ভারি আশ্চর্য্য হয়ে পত্রখানা খুলে পড়লুম :—

"প্রিয় ভগ্নী!

আমার সঙ্গে তোমার কোন পরিচয় নেই, অথচ গায়ে পড়ে আমি তোমাকে চিঠি লিখছি দেখে তুমি বোধহয় বিস্মিত হবে। কিন্তু তোমার মাথার উপর যে বিষম বিপদ ঝুলছে, সেটা তোমাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যেই এই পত্র লেখার দরকার হয়েছে।

ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারি-নি; তবে কতক কতক আন্দাজ করে' যেটুকু মনে হয়েছে, কোনরকম আড়ম্বর না করে সেটুকু তোমাকে আমি বলছি, শোন। যা বল্‌ব, সংক্ষেপেই বল্‌ব, কারণ গুছিয়ে-গাছিয়ে সমস্ত খুলে বল্‌বার সময় বা মনের অবস্থা এখন আমার নেই।

আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসেন না। কিন্তু তিনি বোধ হয় তোমাকে... ... ...। তবে, তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে তোমার স্বামী বাধার মত দাঁড়িয়ে আছেন বলে', খুব-সম্ভব তিনি সেই বাধা দূর কর্‌তে চান। আমার এতটা আন্দাজ কর্‌বার কারণ, আজ সকালে তিনি তোমাদের বাড়ীতে পাঠাবার জন্যে যে অ্যারারুট তৈরি করেছিলেন, তাতে বিষ মেশানো ছিল! সেই অ্যারারুট আমি একটা ইঁদুরকে খাইয়ে দেখেছি,—ইঁদুরটা মরে গেছে!

অ্যারারুট তৈরি করে'ই আমার স্বামী নিশ্চয়ই সেটা তোমাদের বাড়ীতে তখনি পাঠিয়ে দিতেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ কোন রোগীর বাড়ী থেকে কে তাঁকে ডাক্‌তে এল, তিনি তার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে নীচে নেমে গেলেন। সেই ফাঁকে ঘরে ঢুকে বিষাক্ত অ্যারারুটটা আমি সরিয়ে ফেল্‌লুম। ষ্টোভের উপরে তখনো খানিকটা ভালো অ্যারারুট ছিল। খালি বাটিটা ধুয়ে বাকি অ্যারারুটটা আমি তার ভিতরে ঢেলে রেখে চলে আসি। আমার স্বামী কিছুমাত্র সন্দেহ না করে' সেই অ্যারারুটটাই তোমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যাঁর জন্যে বিষ তৈরি করা হয়েছিল, দৈবগতিকে তিনি এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।

কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা সাবধান হও। কারণ এবারে দৈব তোমাদের বিরুদ্ধে হ'তে পারে। আমিও আর এখানে থাক্‌ব না—আজই আমার বিদায় হওয়ার কথা।

আর এক কথা। কথাটা আমার লজ্জার কথা, ভ্রমের কথা। কিন্তু আমার সামান্য লজ্জা বা ক্ষণিক ভ্রমের জন্যে যে তুমি তোমার স্বামীর প্রতি চিরকাল একটা অন্যায় সন্দেহ ও অবিশ্বাস পোষণ করবে, স্বামীভক্তি হারিয়ে আপনার সারাজীবন ভারবহ করে' তুলবে, এ ত কখনি হ'তে পারে না! নিজের মুখ পুড়িয়েছি, এখন তোমাদের সুখেও বাধা দিলে আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না!

বোন, কাল রাতে আমার স্বামীর সঙ্গে তোমাকেও আমি তোমাদের ছাদের উপরে দেখতে পেয়েছিলুম। ঠিক জানিনা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমার স্বামীই তোমাকে ছাদের উপরে নিয়ে গিয়েছিলেন! আমাদের বাড়ীর ছাদের উপরকার দৃশ্য দেখে, তুমি যাতে তোমার স্বামীর উপরে ভক্তি-ভালোবাসা হারাও, এইটেই বোধহয় আমার স্বামীর মনের ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু তুমি যা দেখেছ, যা ভেবেছ, যা বিশ্বাস করেছ—সব ভুল, সব ভুল! 'শুধু চোখে দেখে, কাণে কিছু না শুনে সব সময়ে সব কথা বিশ্বাস কোরো না! ভীরু মানুষ স্বচক্ষে ছায়া দেখেও ভূত মনে করে, তোমার সন্দিগ্ধ চোখও তেম্‌নি তোমার স্বামীর বাইরের ভাবভঙ্গি স্বচক্ষে দেখেও যথার্থ সত্যের প্রতি অন্ধ হয়ে আছে।

স্পষ্ট করে' আমি আর কিছু বলতে পারছি না—আমার লজ্জা করছে! পাপ করতে আমার লজ্জা হ'ল না—সে পাপ স্বীকার করতে আমার এত লজ্জা কেন? এই কি পাপীর লক্ষণ?

তবু বলতে হবে!... ... ...তোমার স্বামী নিষ্পাপ দেবতা, তিনি আমাকে কখনো কু-দৃষ্টিতে দেখেন-নি—কালও না। আমিই আগে তাঁকে... ..

কিন্তু তিনি আমার ভ্রম ভেঙে দিয়েছেন। তিনি আমাকে পাপী বলে' ত্যাগ করেন-নি, তিনি আমাকে গ্রহণ করেছেন—কিন্তু মা বলে ডেকে!

সেই এক মাতৃসম্বোধনে আমার পাপী প্রাণ আজ অনুতাপে হাহাকার করে' কাঁদছে। উপন্যাসে-নাটকে চরিত্র পরিবর্ত্তন অনেক পড়েছি, কিন্তু বাস্তব জীবনেও এক মুহূর্ত্তে এমন পরিবর্ত্তন যে সত্যই সম্ভব, আগে তা জানতুম না। ভগ্নী, তোমার স্বামী কাল আমার নারীত্বকে কলঙ্ক-সাগর থেকে উদ্ধার করেছেন।

বিশ্বাস কর না-কর—এই আমার শেষ-কথা। আর আমার কিছু বলবার নেই। আজীবন স্বামীর পায়ে তোমার সেবার পূজার অধিকার থাক্—সর্ব্বশেষে এই কামনা করে' তোমাদের কাছ থেকে আমি চিরবিদায় গ্রহণ করছি। তোমাদের পথে আর-কখনো আমি পায়ের দাগ ফেল্‌ব না। ইতি

অভাগী প্রভা

পুঃ। হ্যাঁ, এখনো একটু বাকি আছে—মনের ঝোঁকে এ কথাটা বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলুম। আমার স্বামীকে স্পষ্ট জানিও যে, তুমি সব জেনেছ, কিন্তু তোমার স্বামীকে কিছুই জানিও না। এ নিয়ে আর গোলমাল করে' ফল নেই—অতীতের গেল-দিন ক'টা দুঃস্বপ্নের মত ভুলে যেও।"

... ...

চিঠিখানা আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে

আগাগোড়া পড়লুম! একবার পড়া সাঙ্গ হয়ে গেল, আবার পড়লুম—আবার পড়লুম—আবার পড়্লুম!......এখনো মনে হচ্ছে, আমি জেগে নেই!

জোর করে' আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম—কিন্তু তখনি আবার ঘুরে মেঝের উপরে পড়ে গেলুম! একি সত্যি—একি সত্যি? হে ঠাকুর, হে মা দুর্গা, এতদিন কি মিছেই আমি তোমাদের পূজা করেছি?

বুকের মাঝে যেন দাউ-দাউ করে' আগুন জ্বলে উঠ্‌ল—মনে হ'তে লাগল, আমি যেন নরকের ভিতরে পড়ে আছি—চোখের সাম্‌নে খালি অন্ধকার, সেই অন্ধকার থেকে কারা যেন তীরের মত ছুটে আস্‌ছে—তাদের রং যেন অন্ধকারের চেয়ে আরো কালো, তাদের চোখ যেন উল্কাপিণ্ডের মত জ্বলন্ত, তাদের লম্বা লম্বা হাত যেন চারিদিক থেকে আমাকেই খুঁজছে! ওগো মা, ওগো মা, আমার একি হ'ল! কে আমাকে বাঁচাবে—কে আমাকে নরক থেকে উদ্ধার করবে—মাগো, ওমা!

হঠাৎ কে আমার গায়ে হাত দিলে! ভয়ে আমার আগাপাশতলা ছম্‌ছমিয়ে উঠল, চমকে দু-হাতে ভর্ দিয়ে ফিরে দেখি,—আবার তিনি!

তাঁর কোলের ভিতরে মুখ গুঁজে পড়ে ডুকরে কেঁদে বলে' উঠলুম, "হ্যাগা, বল—সত্যি করে' বল, স্বামীকে আমি কি নিজের হাতেই বিষ খাইয়েচি?"

কোমল সুরে তিনি বল্‌লেন, "না ভাই, ভগবান তোমাকে সে মহাপাপ থেকে রক্ষা করেচেন—তোমাকে ত আগেই আমি বলেচি, অ্যারারুটে বিষ ছিল না!"

—"কিন্তু তোমার স্বামী ত বিষ মনে করেই সে বাটিটা আমাকে দিয়েছিলেন। আর আমিও সেই—"

—"অতটা ভেবে নিয়ে মিছে মন খারাপ কোরো না! তার চেয়ে এখন নিজেকে সাম্‌লাবার চেষ্টা কর, তুমি এখন শক্ত না হ'লে সবদিক নষ্ট হয়ে যাবে। ওঠ বোন, ওঠ, এমন করে' পড়ে থাক্‌তে নেই—ছিঃ!" এই বলে' তিনি আমাকে ধরে আস্তে-আস্তে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

কিন্তু আমার শক্তি কে যেন একেবারে হরে' নিয়েছিল, দাঁড়াতে আমি পারলুম না, একখানা চৌকির উপরে অবশ হয়ে আবার বসে পড়লুম।

খানিকক্ষণ নীরবে আমার দিকে চেয়ে থেকে, ধীরে ধীরে তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হলেন—কিন্তু হঠাৎ তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে অস্ফুট স্বরে বলে' উঠলেন, "ঐ আমার স্বামী আসচেন!... ... সাবধান!"

আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠল! ও রাক্ষস যদি আবার আমাকে একলা পায়, তাহ'লে আমি আর বাঁচব না! ছুটে গিয়ে প্রভার দু-হাত চেপে ধরে কাতরভাবে আমি বল্‌লুম, "ও দিদি, তুমি যেও না—ও দিদি তুমি যেও না!"

তিনি আমার দিকে তাঁর ম্লান মুখখানি ফিরিয়ে বল্‌লেন, "কিন্তু আমি আর থেকে কি করব ভাই?"

—"তোমার স্বামীকে চলে যেতে বল, আমি আর ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই না!"

বল্‌তে বল্‌তে বিনোদ এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই সাম্‌নে প্রভাকে দেখে

সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "একি ? তুমি ! এখানে তুমি ?"

স্বামীকে দেখেই প্রভার ধরণ-ধারণ সব বদ্‌লে গেল ! আমাকে আড়াল করে' দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে সে বল্‌লে, "হ্যাঁ আমি। আমায় দেখে এত আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন ?"

—"তুমি যে এখানে আস্‌বে তা আমি মনেও করি-নি। বৌদিদির সঙ্গে তোমার আবার কবে আলাপ হ'ল ?"

—"আজ।"

—"আজ ! হঠাৎ এতদিন পরে তোমার এ সাধ হ'ল কেন ?"

—"কেন তা শুন্‌লে তুমি চম্‌কে যাবে !"

—"বটে ! কিন্তু এত অল্পে ত চম্‌কানো আমার স্বভাব নয়, তা তুমি জানো ত ?"

—"তাই নাকি ? তোমার হাতের ঐ বাটিতে, ঐ অ্যারারুটে কি মেশানো আছে, সে কথা বল্‌লেও তুমি চম্‌কে যাবে না ?"

আমার বুক শিউরে উঠল ! কি ভয়ানক, এতক্ষণ আমি দেখ্‌তে পাই-নি—বিনোদের হাতে সত্যি-সত্যিই যে একবাটি অ্যারারুট ! সেদিকে চেয়েই আমি চেঁচিয়ে কেঁদে ফেল্‌লুম —ভয়ে আমার প্রাণ যেন উড়ে গেল !

বিনোদ একবার আমার দিকে, আর-একবার তার স্ত্রীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে। তারপর বল্‌লে, "কি বলচ প্রভা ?"

—"বল্‌চি তোমার ঐ অ্যারারুটে বিষ মেশানো আছে !"

বিনোদের হাত থেকে খসে, ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে অ্যারারুটের বাটিটা মেঝের উপরে পড়ে গেল ! পিছনে হটে গিয়ে, দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়িয়ে সে, স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল !

উঃ ! সে ত চোখ নয়—যেন দু-টুক্‌রো জলন্ত কয়লা ! তাড়াতাড়ি আমি প্রভার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে দাঁড়ালুম !

খানিক এম্‌নি চুপচাপ থাকার পর বিনোদ বল্‌লে, "প্রভা, তুমি কি পাগল হয়েচ ? এ-সব কি কথা ?"

—"পাগল আমি হই-নি, পাগল হয়েচ তুমি। নইলে সহজ মানুষ কখনো এমন কাজ কর্‌তে পারে ?"

—"কাজ ! কি কাজ ? তুমি যা বল্‌চ সব মিছে কথা !"

—"মিছে কথা ! বটে ! তাহলে মিছে কথা শুনে তোমার হাত থেকে ভয়ে ও-বাটিটা পড়ে গেল কেন ?"

বিনোদ হা হা করে' হেসে উঠল ! বল্‌লে, "ভয় কর্‌ব কাকে প্রভা ? তোমাকে ?"

—"আমাকে নয়—ভয় কর তুমি সত্যি কথাকে !"

বিনোদ হঠাৎ গলাটা খুব গম্ভীর করে' বল্‌লে, "প্রভা, তোমার এ-সব হাসি-ঠাট্টা আমার ভালো লাগ্‌চে না,—যাও, বাড়ী যাও !"

—"বাড়ী কোথায় আমার ? তুমি ত সেখান থেকে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছ !"

—"আঃ ! কী যে বাজে বক্‌চ—তুমি কি ঠাট্টা বোঝ না ? বাড়ী থেকে তোমায় আমি তাড়িয়ে দিতে যাব কেন ? যা নয় তাই বল্‌লেই হ'ল ! যাও, বাড়ী যাও !"

—"না। এ-জীবনে তোমার বাড়ীতে আর আমি ঢুক্‌ব না !"

চোখ কুঁচকে ঠোঁট কাম্‌ড়ে বিনোদ বল্‌লে, "তবে তুমি চুলোয় যাও! তোমার মত স্ত্রীকে বাড়ীতে যেতে বলচি এই ঢের! তুমি যে বাড়ীতে থাকবার যোগ্য নও, বৌদিও তা জানেন। ছাতের ওপরে তোমাদের অভিনয় বৌদি কাল স্বচক্ষে দেখেছেন। নিজের পাপ ঢাক্‌বার জন্যে তুমি এসেচ উল্‌টে আমাদের চোখ রাঙাতে? তোমার মত পাপিষ্ঠার কথায় বিশ্বাস করে কে? আমি ত করিইনা, বৌদিও করবেন না! না বৌদি?"

আমি শুক্‌নো গলা টেনে টেনে স্পষ্টাস্পষ্টি বল্‌লুম, "আপনার স্ত্রীর কথায় আমি বিশ্বাস করি

বিনোদ থতমত খেয়ে অবাক হয়ে রইল।

প্রভা বল্‌লেন, "এখন শুন্‌লে ত? আর মিছে চেষ্টা, ভগবানের রাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারে না। বাড়ীতে পুরন্দর বাবু আছেন, এখনি তিনি সব শুন্‌তে পাবেন, —তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে। তার চেয়ে কেউ কিছু জানবার আগে এইবেলা তুমি সাবধান হও, এখান থেকে চলে যাও, আর এখানে এস না।"

প্রভার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বিনোদ বল্‌লে, "আবার তুমি আমাকে মিছে ভয় দেখাচ্চ! আমি কি করেচি যে, এখান থেকে চোরের মত চলে যাব?"

—"না, তুমি চোরের মত যাবে না— এখান থেকে তুমি খুনীর মত যেতে চাও, নয়? এখনো তুমি লুকোচুরি কর্‌চ, এখনো আমার কথা মান্‌তে চাইচ না! অথচ আজ সকালে তোমাকে আমি স্বচক্ষে অ্যারারুটে বিষ মেশাতে দেখেচি!"

—"তাই যদি হবে, তবে সে অ্যারারুট খেয়ে পুরন্দরের কোন অনিষ্ট হয়-নি কেন? এইখানেই ত প্রমাণ হচ্চে, তুমি মিথ্যে কথা বল্‌চ!"

—"সে বিষাক্ত অ্যারারুট ফেলে দিয়ে বাটিতে আমি ভালো অ্যারারুট ঢেলে দিয়েছিলুম, তাইতেই তোমার—"

প্রভার কথা শেষ না হ'তেই বিনোদ ঠিক বিদ্যুতের মত আচম্‌কা, তাঁর গায়ের উপরে লাফিয়ে পড়্‌ল! ভয়ে আমি খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম—সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে ক্রুদ্ধস্বর শুন্‌লুম, "বিনোদ! বিনোদ! একি ভয়ানক কাণ্ড!"

এ আমার স্বামীর গলা!

পনেরো

পুরন্দরের কথা

ভগবান, আমার এ ওষ্ঠাধর এখনো যেন কি-এক অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে! মানুষকে তুমি শ্রেষ্ঠজীব করে' সৃষ্টি করেছ—অথচ তার মনের মধ্যে দুরন্ত পশুর মত অশান্ত, এমন-এক জ্বলন্ত লালসাকে পুরে রেখেছ কেন? তোমার এই সুন্দর সৃষ্টিতে, এই উদার আকাশের ছায়ায়, এই স্বাধীন বাতাসের পবিত্র স্পর্শে, এই উদয়-অস্তের চিরন্তন খেলায় চন্দ্র-সূর্য্যের লীলায় আলোক-আঁধারের অবিরত আবর্ত্তনে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যের বিচিত্র প্রকাশে মানুষ কেন আপনার দীনতা-হীনতা ভুল্‌তে পারে না— কেন সে শ্রেয় হ'তে গিয়ে হেয় হয়ে পড়ে— কেন সে উচ্চ আদর্শকে ব্যর্থ করে' দেয়? এই যে পদে পদে অন্ধকারের ঝড় উঠে পথের উপর থেকে ধ্রুবতারার আলো একটি

ফুৎকারে নিবিয়ে দিচ্ছে, এর-মধ্যে তোমার কোন্ মঙ্গল-ইচ্ছা গোপন হয়ে আছে? আপনাকে সংবরণ করতে না-পেরে বিশ্বের শত-সহস্র আত্মা এই-যে দিবা-রাত্র হাহাকারে ফেটে মরছে, এ গভীর হাহাকার কি তোমার শান্তিকে বিক্ষুব্ধ করে' তুলছে না?... ...হে রহস্যময় মহাদেব, তোমার এই বিরাট গুপ্ত কথা কি কোনদিনই আমরা বুঝতে পারব না?

বাস্তবিক, প্রভার সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করেছি, তার চরিত্রের কত দিকই আমার চোখে পড়েছে, কিন্তু তবু ত তার মনের তলে গিয়ে কোনদিনই পৌছতে পারি-নি! বাইরে তার চোখের কোণে সামান্য-একটু ইঙ্গিতও যদি কোনদিন পেতুম, তাহ'লেও আমি যে আগে-থাকৃতে সাবধান হ'তে পারতুম! কোন-রকম পূর্ব্বাভাস না-দিয়ে মানুষের মন যে এত সহসা আত্মপ্রকাশ করতে পারে, এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!

কিন্তু প্রভার এই আচরণের জন্যে বোধ হয় বিনোদই বেশী দায়ী। প্রভার মুখেই যতদূর শুনলুম তাতে বেশ বুঝলুম, বিনোদ তাকে ভালোবাসে না, তার উপরে অত্যাচার করে, তাইতেই তার মন ক্ষুধিত হয়ে উঠেছে, বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে! যৌবন আশ্রয় চায়, কোমলতা চায়, প্রেমের পূর্ণতা চায়—প্রভার যৌবন যে এর কিছুই পায়-নি! যৌবন হচ্ছে অধীর ও অদূরদর্শী;—তার ধৈর্য্য নেই, সহ্য করতে সে জানে না! প্রভার কালকের ব্যবহারে যৌবনের এই দুর্নিবার ধর্ম্মই বোধহয় প্রকাশ পেয়েছে, সে যা করেছে, বোধহয় তা আকস্মিক ভাবের আবেগে অভিভূত হয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই করে' ফেলেছে। একটা কিছু করে' ফেলে পরে অনুতপ্ত হওয়া—যৌবনের এও একটা মস্ত লক্ষণ! হয়ত প্রভা এতক্ষণে নিজের ভ্রম বুঝে অনুতপ্ত হয়ে পড়েছে!......

দরজার কাছে একটা শব্দ হ'ল। মুখ তুলে দেখি, প্রভা!

তার মুখ কি ম্লান, চোখ কি করুণ! মাটির দিকে দৃষ্টি নামিয়ে, জড়সড় হয়ে সে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল—যেন একখানি সলজ্জ বিষাদ-প্রতিমা!... ...কাল রাত্রে সেই অশুভ মুহূর্ত্তে তার চোখে-মুখে যে উদ্দাম ভাব, যে প্রচণ্ড তৃষা ফুটে উঠেছিল, তার সঙ্গে আজকের এ মূর্ত্তিতে কী তফাৎ, কী তফাৎ!

আশ্চর্য্য! মানুষের এই নিত্য-দৃষ্ট সাধারণ মুখ ক্ষণিক ভাবের পরিবর্ত্তনে কতটা অসাধারণ হয়ে ওঠে!

শুয়ে ছিলুম, তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম। প্রভা আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখেই ঘাড় হেঁট করলে। আমি হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরলুম—তার হাত কাঁপতে লাগল! ধীরে ধীরে বললুম, "এস প্রভা, বোসো। কালকের জন্যে আজ যে তুমি কষ্ট পাচ্ছ, তোমার মুখ দেখেই আমি তা বুঝেচি। আজ তোমার হাসিমুখ দেখলে আমি দুঃখিত হতুম, কিন্তু তোমার মলিন মুখ আজ আমাকে আনন্দিত করেচে। তোমার ভ্রমের কথা ভুলে যাও, এস, আমরা ফের আগেকার মতই প্রাণ খুলে আবার কথাবার্ত্তা কই।"

প্রভা কেঁদে ফেললে!

আমি হাত ধরে' তাকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে বললুম, "প্রভা, চোখের জল মোছ। এখনি শ্রী এসে পড়তে পারে।"

প্রভা আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে বল্‌লে, "আপনি এখন কেমন আছেন?"

—"বেশ ভালোই আছি প্রভা! কাল রাতে হঠাৎ একটু জ্বর এসেছিল, এখনি কমে গেছে—দুদিনেই সব সেরে যাবে।"

প্রভা অল্পক্ষণ চুপ করে' বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বল্‌লে, "পুরন্দরবাবু, আমি যা জান্‌তে এসেছিলুম তা জান্‌লুম। আপনি যে আমাকে ক্ষমা করেচেন, আপনি যে চিরকাল আমাকে ঘৃণা কর্‌বেন না—এটুকু জেনেও আমি এখন অনেকটা শান্তি পেলুম। আমার আর কিছু বল্‌বার নেই।" এই বলে' প্রভা উঠে দাঁড়াল।

—"প্রভা, ঘৃণা আমি কারুকে কর্‌তে পারি না—অতি-বড় শত্রুকেও না। এ পৃথিবী হচ্চে মানুষেরই স্বদেশ, মানুষের প্রতি ঘৃণা থাকলে এখানে বাস কর্‌ব কেমন করে' বল দেখি?"

—"কিন্তু আমার মত পাপীকে ঘৃণা না কর্‌লে পাপকে যে প্রশ্রয় দেওয়া হবে,—পাপী যে ঘৃণার পাত্র!"

—"না, পাপীও মানুষ, মানুষ কখনো ঘৃণিত নয়—ঘৃণিত তার পাপ। সকল মানুষেরই মনের ভিতরে পাশাপাশি ভগবানের আর সয়তানের বাস আছে। সেই সয়তানকে ত্যাগ কর্‌ব বলে আমরা যদি গোটা মানুষটাকেই ত্যাগ করি, তাহলে সেইসঙ্গে ভগবানকেও যে ত্যাগ করতে হবে! না প্রভা, এ ঠিক নয়,—যে পাপ করে, তাকে একেবারে ছেড়ো না! তাকে গ্রহণ কর্‌বে, পাপের প্রতি তার নিজেরও যাতে ঘৃণা জন্মে, সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করবে। দৈবগতিকে একবার পাপ করে' চিরকাল ঘৃণিত হয়ে থাকে বলে'ই পাপী আর ইচ্ছে থাক্‌লেও ভয়ে সমাজে ফির্‌তে পারে না! এতে পাপীরও ক্ষতি, মানুষেরও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি! এটা আমরা বুঝি না বলে'ই সমাজে পাপের সংখ্যা নিত্যই বেড়ে চলেচে!"

—"আপনার এই উদার মন আমাকে পতন থেকে রক্ষা করেচে, এর-জন্যে চিরকালই আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব—আপনার শিক্ষা জীবনে কখনো ভুল্‌ব না। পুরন্দরবাবু, আপনাকে নমস্কার করে' এখন আমি বিদায় হই—হয়ত এ-জীবনে আপনার সঙ্গে এই আমার শেষ-সাক্ষাৎ।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম! শেষ-সাক্ষাৎ? এর অর্থ কি? প্রভা যখন দরজার কাছ-বরাবর গেছে, আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "শেষ-সাক্ষাৎ কেন প্রভা? তুমি কি অন্য কোথাও যাবে?"

—"হ্যাঁ। স্বামী আমাকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়েচেন।"—আর একটি কথাও না-বলে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল!

বিনোদ, বিনোদ!… …না, এ অসহ্য, স্ত্রীর প্রতি এত অবিচার, এত অত্যাচার! কেন সে একটা জীবনকে এমনভাবে নষ্ট করে দিতে চাইছে? এতবড় নিষ্ঠুরতা ত মানুষের শোভা পায় না! সে ত চোখ মুদে বিবাহ করে নি, নিজে দেখে-শুনে যাকে বিবাহ করেছে, যার ভালো-মন্দের জন্যে সে দায়ী, সে ছাড়া যার ভিন্নগতি নেই, তাকেই কিনা সে এখন তাড়িয়ে দিতে চায়!

দুর্ভাগী প্রভার মুখ চেয়ে মনটা আমার দয়ায় ব্যথায় ভরে' উঠল। বিনোদ তাড়িয়ে

দিলে তার কি অবস্থা হবে?' তাইত, কি করে' এ অন্যায়কে দমন করা যায়? বসে বসে অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে শেষটা স্থির করলুম, এখনি আমার বিনোদের কাছে যাওয়া উচিত। কারুর পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আমার স্বভাব নয় বটে; কিন্তু চোখের উপরে এমন দৃশ্য অটল হয়ে দেখবই বা কেমন করে'? বেচারী প্রভা! তাকে বাঁচাতেই হবে!

শরীরটা দুর্ব্বল ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমি শয্যাত্যাগ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম!......

সিঁড়ির কাছে গিয়ে নীচে নামতে যাব, হঠাৎ পাশের ঘরে বিনোদের গলা শুনলুম। তারপরেই পেলুম প্রভার গলা! আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে এমন উত্তেজিত স্বরে প্রভা কি বলছে বিনোদকে? অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সেইখানে দাঁড়ালুম। ভাবলুম আর যাই হোক্, ওদের দুজনকেই যখন একসঙ্গে এখানে পাওয়া গেল তখন একরকম ভালোই হ'ল। ... কিন্তু না, একি, এ-সব কী কথা হচ্ছে! বিষ!... ...অ্যারারুটে বিষ মেশানো হয়েছে? এ কথার মানে কি? ও আবার কি? কার হাত থেকে বাটি না কি-একটা খসে ঝন্‌ঝন্ করে' মাটির উপরে পড়ে গেল যে!

সেইখানেই দাঁড়িয়ে গেলুম!... ... ... ক্রমে ক্রমে একে একে যে-সব কথা আমার কাণে আসতে লাগল, তাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ ধীরে ধীরে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল! এও কি হ'তে পারে? আমি ভুল শুনছি না ত? জ্বরের ঘোরে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়-নি ত?

আমার অ্যারারুটে বিনোদ বিষ মিশিয়ে দিয়েছে, আর......আর সেই বিষের পাত্র শ্রী আমার মুখের সাম্‌নে নিজের হাতে তুলে ধরেছে! বিনোদ আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, আর শ্রী আমার প্রিয়তমা স্ত্রী!... ... ... উঃ!

বুকে যেন কে শেল মারলে! দু-হাতে বুক চেপে ভুঁয়ে বসে পড়লুম।

না, না,—আঃ! বাঁচলুম! এই যে, শ্রীও এখানে রয়েছে! শ্রীর কথা শুনে মনে হচ্ছে, নিষ্পাপ মনে সে আমাকে অ্যারারুট খেতে দিয়েছিল, বিষের কথা জানত না!—নিশ্চয়, নিশ্চয়, তা নয় ত কি! শ্রীকে আমি কি চিনি না? নির্ম্মল প্রাণ তার যূথিকার মত শুভ্র, শিশুর মত অকপট, বৃষ্টিধারার মত স্বচ্ছ, এর মধ্যে কলঙ্কের আশ্রয় হবে কেমন করে?

কিন্তু বিনোদ,—তুমি কি? তুমি কি সত্যিই মানুষ? তাহলে মানুষের গুণ তোমাতে কোথায়? তুমি বন্ধুত্ব মান না, দয়া-ধর্ম্ম জান না, আত্মপর ভেদ রাখ না, আপন স্ত্রীকে তাড়িয়ে দাও, হাসিমুখে পরের প্রাণ নিতে চাও—এ-সব কি মানুষের লক্ষণ? ভগবানের সৃষ্টি কি এমন ভয়ানক? এত জ্ঞান-বিজ্ঞান, এত-বড় সমাজ, এতদিনের সভ্যতা, এত উচ্চ আদর্শ, এ সমস্তই কি তবে ব্যর্থ?

আচম্বিতে আমার আচ্ছন্নতা ছুটে গেল—ঘরের মধ্যে ও কার আর্ত্তনাদ! সঙ্গে সঙ্গে শ্রীর চীৎকার! কী ভয়ানক দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছে ওখানে?

প্রাণপণে ছুটে তখনি ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম!... ...দেখলুম বিনোদের কবলে পড়ে প্রভা ছটফট করছে!

তীরের মতন বেগে তাদের উপরে গিয়ে পড়লুম। দুহাতে বিনোদের হাত-দুখানা চেপে ধরলুম—বাল্যকাল থেকে বলবান বলে' আমার খ্যাতি আছে,—আমার হাতের চাপে বিনোদের হাত অবশ হয়ে এল, তার সে সাংঘাতিক বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে, ব্যাঘ্রমুখচ্যুত হরিণীর মত প্রভার দেহ এলিয়ে মাটির উপরে পড়ে গেল!

বিনোদকে ছেড়ে দিতেই আবার সে প্রভাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ল, আমি আবার তাকে বাধা দিয়ে বললুম, "বিনোদ, শান্ত হও—নইলে আমি দারোয়ানদের ডাকতে বাধ্য হব!"

সে পাগলের মত চেঁচিয়ে দৃপ্তস্বরে বললে, "দরোয়ান! কে তোমার দরোয়ানদের ভয় করে! ছেড়ে দাও আমাকে, ওকে আমি খুন করব—ওকে আমি খুন করব!"

—"স্ত্রীলোককে তুমি খুন করবে? বলতে লজ্জা হচ্চে না তোমার?"

বিনোদ আমার মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বললে, "লজ্জা! কিসের লজ্জা? স্ত্রী হোক্ পুরুষ হোক্,—যে আমার পথে এসে দাঁড়াবে তাকেই আমি খুন করব!"

—"কেন বিনোদ, প্রভা তোমার কাছে কি এমন অপরাধ করেচে?"

—"কী অপরাধ করেছে! ওর অপরাধের সীমা নেই! ও আমার সর্ব্বনাশ করেচে, আমার এতদিনের সাধনা, যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম ব্যর্থ করে' দিয়েচে, আমার প্রাণের সব আশা ওর জন্যে নির্ম্মূল হয়ে গিয়েচে, আমার প্রতিহিংসার মহাযজ্ঞ ও পণ্ড করে দিয়েচে! ওকে আমি ছেড়ে দেব? কখনো না, কখনো না!"

—"প্রতিহিংসা! বিনোদ, প্রতিহিংসা কিসের?"

ভীষণ এক মুখভঙ্গি করে' তীব্র স্বরে বিনোদ বলে' উঠল, "বটে! তুমি কি জান না? আমার বুক থেকে স্ত্রীকে কে ছিনিয়ে নিয়েছিল? একসভা লোকের মাঝে কে আমার মাথা হেঁট করে' দিয়েছিল? সমাজে কার জন্যে আমাদের একঘরে হয়ে থাকতে হয়েছিল? আমার সে হতাশা, সে পরাজয়, সে অপমান লাঞ্ছনা মনস্তাপ কি ভোলবার? না, আমি তা ভুলি-নি! সেদিনের দৃশ্য এখনো আমার চোখের ওপরে দুঃস্বপ্নের ছবির মত জেগে আছে! আজ কত বৎসর প্রতিদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, সে অপমানের প্রতিশোধ না-নিয়ে আমি মরব না! প্রতিশোধ আমি নিতুমও ঠিক, কিন্তু ঐ সর্ব্বনাশী প্রভার জন্যে ঠিক শেষ-মুহূর্ত্তে আজ আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েচে!"

এতক্ষণে আমি সব বুঝলুম। সেই—সেই দিনের কথা!... ...স্তব্ধ হয়ে আমি তার রুদ্ধ আক্রোশ-ভরা, ক্ষুব্ধ, বিকৃত, পাণ্ডুর মুখের দিকে নিষ্পলক চক্ষে চেয়ে রইলুম! নিশ্চয় সে পাগল! সহজ মানুষের মুখ এমন হয় না!

—"আমার মুখের দিকে কী দেখ্‌চ তাকিয়ে? এতক্ষণে আজ তুমি কোথায় থাকতে জানো পুরন্দর? আমার এই পায়ের তলায়, অন্তিম নিশ্বাসের অপেক্ষায়! কাল তোমার স্ত্রীকে আবার আমার নিজের করে' নিতুম!"

পিছন হ'তে শ্রী আর্ত্তনাদ করে' বলে' উঠ্‌ল, "চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে! ওগো, ওকে তাড়িয়ে দাও, দূর করে তাড়িয়ে দাও!"

আমি ফিরে বল্‌লুম, "শ্রী, প্রভাকে নিয়ে তুমি বাড়ীর ভেতরে যাও। প্রভার বড় লেগেচে, ওর মুখে-চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিও।"

প্রভাকে নিয়ে শ্রী তাড়াতাড়ি চলে গেল। আমি বিনোদের হাতে ছেড়ে দিলুম।

বিনোদ হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, "আমাকে নিয়ে এখন তুমি কি করতে চাও? যা করবার, শীগ্‌গির করে ফেল! তোমার চোখের সাম্‌নে এমন অসহায় খেলার পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আমার প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্চে!"

"তোমাকে নিয়ে আমি কিছুই করতে চাই না।"

—"কী! আমি তোমার শত্রু তা জানো?

—"না, তুমি আমার বন্ধু। তুমি রাগের মাথায় এ-কথা এখন ভুলে যাচ্চ, কিন্তু আমি ত তা ভুলি-নি! বাল্যকালে একসঙ্গে তোমাতে-আমাতে কত খেলাই খেলেচি, যৌবনেও তোমাকে আমি সত্যিই ভালো-বেসেচি, সে-সব স্মৃতি কি হঠাৎ একদিনে ভুলে যাওয়া যায় ভাই? দোষ করেচ বলে তোমাকে আমি ত্যাগ করব না—নিজের ভ্রম তুমি দুদিন পরে নিজেই বুঝতে পারবে!"

বিনোদ আমার সাম্‌নে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধ, তীব্র স্বরে বল্‌লে, "আমাকে ক্ষমা করে' তুমি কি আমার পরাজয়ের যাতনা আরো বাড়িয়ে তুল্‌তে চাও? না, সে হবে না—হ'তে পারে না! তোমার ক্ষমার ওপরে আমি পদাঘাত করি! আমি তোমার শত্রু, আমি তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলুম! আমাকে তুমি পুলিসে দাও, আমাকে তুমি মারো ধর যা-খুসি কর—কিন্তু আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো না! সে অপমান আমি সইতে পার্‌ব না!"

—"তুমি আমার বন্ধু, আমার ব্যবহারকে তুমি ক্ষমা বলে' নিচ্চ কেন? বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে আলাদা।"

—"পুরন্দর, আমি তোমার শত্রু! আমাকে মুক্তি দিলেও আমি তোমার শত্রুই থাক্‌ব। ভেবনা তোমার দয়ায় ক্ষমায় ভুলে গিয়ে আমি তোমার গোলাম বনে যাব! না, তোমাদের ও-সব দুর্ব্বলতাকে আমি ঘৃণা করি—আমার ধাতু আলাদা। আমি আবার তোমাকে খুন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।"

আমি হেসে বল্‌লুম, "সে চেষ্টা ত একবার করে' দেখ্‌লে, কিন্তু সফল হ'লে কি? ভাই, মাথার ওপরে ভগবান যে নিত্যই সজাগ হয়ে আছেন—জন্ম-মৃত্যু যে তাঁর হাতেই!"

—"তুমি পুরুষের ছদ্মবেশে স্ত্রীলোক মাত্র,—নইলে ভগবান মান্‌তে লজ্জা হয় না তোমার! ধিক্‌, তোমাকে ধিক্‌! ছি ছি, তোমার মত এক অপদার্থের কাছে আমাকে কিনা হার মান্‌তে হোলো, তোমারি কাছে আমাকে কিনা ক্ষমা গ্রহণ কর্‌তে হোলো! এর-চেয়ে মৃত্যুই আমার ভালো ছিল!" এই বলে আমার দিকে আর-একবার ঘৃণাভরা দীপ্ত চোখে তাকিয়ে, বিনোদ চকিতে দ্রুতপদে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল!

জান্‌লার কাছে আমি দাঁড়িয়েছিলুম; বাইরে চেয়ে দেখি,—আকাশের তিমিরকৃষ্ণ মেঘের অরণ্য দুলিয়ে, কাল-বৈশাখীর উন্মত্ত ঝড় পৃথিবীতে হুহু করে' নেমে আসছে!

বজ্রের মুহুর্মুহু অট্টহাস্যে, ভীত জীবজন্তুর ব্যাকুল চীৎকারে, ঝড়ের বিচিত্র আর্ত্তনাদে অকস্মাৎ ধরিত্রীর অন্তরাত্মা যেন ধড়্‌ফড়্‌ করে' উঠল! চক্ষু অন্ধ করে,' চক্রে চক্রে ঘূর্ণিপাক্ খেয়ে নিবিড় ধূলার রাশি উঠ্‌ছে-নাম্‌ছে-ছুট্‌ছে—নিরেট বৃষ্টিধারার মত চারিধারে সশব্দে ঝরে যাচ্ছে,—মুহূর্ত্তমধ্যে পথিকশূন্য দীর্ঘ রাজপথ বিক্ষুব্ধ ঝটিকার বিজন নৃত্য-সভায় পরিণত হয়ে গেল।... ... ...

সেই প্রলয়-অভিনয়কে অগ্রাহ্য করে' বিনোদ পথের উপরে গিয়ে দাঁড়াল, একবার উর্দ্ধমুখে জলন্ত চক্ষে ঘনঘন বিদ্যুৎবিদীর্ণ উচ্ছৃঙ্খল আকাশের এধার-থেকে-ওধার পর্য্যন্ত চেয়ে দেখ্‌লে,—তারপর মাথা নামিয়ে, আর-কোনদিকে না-তাকিয়ে, সুমুখের রাস্তা ধরে হন্‌হন্ করে' সমান চল্‌তে লাগল অটল পদে, অনায়াসে,—ঝঞ্ঝার শরীরী মূর্ত্তির মত!

... ...অনেকদিনের অদর্শনের পরে, ঐ কাল-বৈশাখীর মত আমাদের জীবনের মাঝখানে বিনোদ হঠাৎ এসে উদয় হয়েছিল; আবার ঠিক ঐ কাল-বৈশাখীর মতই হঠাৎ আজ সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল;—জানিনা, তার সঙ্গে' আমার এই দেখাই শেষ-দেখা কিনা!

... ...

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছি, এমনসময়ে পিছনে শ্রীর সাড়া পেলুম—

—"হ্যাগা, সে চলে গেচে?"

—"হ্যাঁ।"

—"আঃ! বাঁচলুম!"

শ্রী ছুটে এসে প্রাণপণে আমার গলা জড়িয়ে ধর্‌লে। তারপর আমার বুকের ভিতরে মুখ গুঁজে অস্ফুট কণ্ঠে সে কাঁদতে লাগ্‌ল!

—"একি শ্রী! অকারণে কাঁদ্‌চ কেন?"

—"এবার আমায় মাপ কর গো! আর-কখনো তোমায় সন্দেহ কর্‌ব না!"

ইতি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আলোচনা

বাল্য-বিবাহে পূর্ব্বরাগ

বৈশাখের "ভারতী"তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় আমার "পূর্ব্বরাগ" প্রবন্ধের উপর লক্ষ্য করিয়া শরবর্ষণ করিয়াছেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে তাঁহার লক্ষ্যটা তেমন ঠিক হয় নাই। তাঁহার মত প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে এরূপ যুক্তিহীন ভাসা-ভাসা রকমের কতকগুলা ভাবোচ্ছ্বাসমাত্র আমরা আশা করি নাই।

দীনেশবাবু প্রবন্ধের প্রথমেই ভূমিকা করিয়াছেন যে আমরা "প্রাচীনের দলের টিকি" ধরিয়া অনর্থক টানাটানি করিয়া তাঁহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছি। আমরা হলফ্ করিয়া বলিতে পারি যে "নবীন" হইলেও "প্রাচীনে"র উপর আমাদের কিছুমাত্র বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা নাই। 'নবীন' চিরকালই প্রাণের বেগে চঞ্চল—আর 'প্রাচীন' কিছু দ্বিধাগ্রস্ত, ভীত। তাই নবীনের

কাছে প্রাচীনের দ্বিধা জড়তা বলিয়া মনে হয়;—আর প্রাচীনের কাছে 'নবীনের' উৎসাহ হঠকারিতা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। কিন্তু কি নবীন কি প্রাচীন উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—সামাজিক কল্যাণের জন্য সত্যানুসন্ধান। তাহার আলোচনায় তীব্র ভাষার প্রয়োগ থাকিলেও গাত্রদাহের কোন কারণ নাই।

দীনেশ বাবুর প্রবন্ধে কথার-মত-কথা একটী মাত্র দেখিলাম। তিনি বলিতে চান যে বাল্য-বিবাহে পূর্ব্বরাগের অবসর নাই—এ কথা মনে করা ভুল। বরং যৌথ পরিবারের মধ্যে পূর্ব্বরাগটা আরো ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠে। যথা"—স্ত্রী তো একটা মোড়কের মধ্যে পুলিন্দা হোয়ে বাল্যজীবন কাটিয়ে দিতেন। তিনি শাশুড়ীর কোলে কাঁখে, ননদের সঙ্গে হেঁসেলে দিন কাটিয়ে রাত্রে কোন গুরুজনের বিছানায় শুয়ে পড়্তেন।......এইভাবে পারিবারিক জীবনের দীক্ষা গ্রহণ ক'রে হঠাৎ একদিন স্বামীর কাছে অভিনবভাবে ধরা দিতেন।......যৌবন তাঁকে নূতন ক'রে সাজিয়ে এনে স্বামীর ঘরে উপঢৌকন দিয়ে যেত......" ইত্যাদি। বর্ণনাটা কবিত্বময় বটে। দীনেশবাবু চিরকাল প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া বুড়াবয়সে হঠাৎ যে এতটা কবিত্ব সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছেন এটা আমাদের জানা ছিল না। ঠিক যেন উপকথার রাজকন্যার গল্প। ঠাকুরমার মুখে শুনিয়াছিলাম যে এক ছোট্ট রাজকন্যা কেমন করিয়া সমুদ্রের এক ঝিনুকের মধ্যে বন্দিনী হইয়া ছিলেন। এক জেলে জাল ফেলিয়া ঝিনুকটী পায় ও রাজপুত্রকে উপঢৌকন দেয়। রাজপুত্র রাত্রিকালে ঝিনুকটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে হঠাৎ তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল—পরমাসুন্দরী দেবকন্যার মত রাজকুমারী বাহির হইয়া ঘর আলো করিয়া ফেলিলেন। তারপর? তারপর আর কি—রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার ভয়ঙ্কর প্রেম,—বিবাহ—সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস ইত্যাদি।

দীনেশ বাবুর যুক্তি অনেকটা এই ঠাকুরমার গল্পের মত। বাল্য বিবাহে নানারূপ বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দম্পতীর মনে মধুর পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইত, অতএব বাল্যবিবাহে দোষ নাই। বরঞ্চ চারিদিকে এরূপ বাধাবিঘ্নের বেড়া থাকিত বলিয়াই দীনেশবাবুর মতে পূর্ব্বরাগটা আরও গাঢ় হইত বোধ হয়। আমার এক সরল-প্রকৃতি ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধু বলেন যে ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়া তাহার পক্ষে ভালই হইয়াছে। ভারতবাসী ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। দেশ স্বাধীন থাকিলে নানারূপ যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্ট্রবিপ্লবাদির গোলমালে সকলের ধর্ম্মচর্চ্চার ব্যাঘাত হইত। তাই ভগবান দয়া করিয়া ভারতবাসীকে অন্যের রক্ষণাধীনে রাখিয়াছেন। ফলে তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া পরকালের চর্চ্চায় মন দিতে পারিতেছে। বোধ হয় আমার এই ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধুর যুক্তি ও দীনেশ বাবুর যুক্তি চিন্তার ধারা-হিসাবে একই শ্রেণীর।

কিন্তু দীনেশ বাবু বাল্যবিবাহের যে মনোরম চিত্রটী আঁকিয়াছেন—তাহার অনেকখানিই তাঁহার মন-গড়া। বাস্তব চিত্রটা অন্যরূপেও বর্ণনা করা যায়। অষ্টমবর্ষীয়া নববধূ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ননদেরা তাহার পিছনে লাগিয়া গেলেন। তাহাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া ননদেরা বুঝাইতে ছাড়িলেন না যে সে তাহাদের ক্রীতদাসী মাত্র। শাশুড়ী স্নেহের মাত্রাতিশয্যে তাড়না-ভৎর্সনা এমন কি প্রয়োজনমত দেহে গরম হাতা বেড়ির ছেঁকা দিতেও কসুর করিলেন না। এইরূপ ভৎর্সনা ও অশ্রুজলের মধ্য দিয়া তাহার ঘোমটা-ঘেরা দৃষ্টি বাহিরের সুন্দর জগৎকে একটা কারাগার বলিয়াই মনে করিতে লাগিল। হঠাৎ কবে তাহার যৌবনের মালঞ্চে ফুল ফুটিয়া উঠিল, কোকিলের কুহুধ্বনি শোনা গেল,—তাহা সে জানিতেই পারিল না। স্বামীকে এতদিন সে দিন-রাত্রির মধ্যে একবার চোখের দেখাও দেখিতে পায় নাই,—সে যে কিম্ভূত-কিমাকার বস্তু, তাহা তাহার ধারণাতেও আসে নাই। ক্রমে গাঢ় অন্ধকার রজনীতে সকলের চোখ এড়াইয়া ভয়-চকিত দৃষ্টিতে চোরের মত তাহাকে অভিসার-যাত্রা অভ্যাস করিতে হইল। কখন ভোর হয়, এই দুর্ভাবনায় রাত্রিটা কাটাইয়া অন্ধকারের আবরণে পলায়নের চতুরতাও কসরৎ

করিতে হইল। এদিকে স্বামী বেচারাও এইরূপ মূক-অভিনয়ে তৃপ্ত থাকিতে না পারিয়া সন্ধ্যাকালে "সহবত" শিক্ষার জন্য স্থানান্তরে গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। আমার অবশ্য দীনেশ বাবুর মত ভাষার জোর ও কবিত্ব-শক্তি কিছুই নাই। কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে তাঁহার কাল্পনিক মধুর চিত্র হইতে আমার এই করুণ চিত্র কোন অংশেই অবাস্তব নহে।

কিন্তু এ সব বাজে তর্ক করিয়া লাভ নাই। আসল কথা এই যে যে-বাঙলা দেশ শক্তিপূজার পীঠস্থান—সেই দেশে আমরা কৃত্রিম প্রথার বন্ধনে নারীত্বকে ক্রমেই হীন করিয়া ফেলিতেছি। নারীর মধ্যে হৃদয় ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশের অবসর না দিয়াই তাহাকে আমরা জোর করিয়া নিজেদের "ছাঁচে" ফেলিয়া গড়িয়া তুলিতেছি। বড় বড় শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করিয়া হিন্দু নারীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছি। কিন্তু গোড়ায় গলদ দেখাইয়া দিলেই নানারূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া সত্যকে চাপা দিবার চেষ্টা চলিতেছে। এইরূপ মনের ভাব ঘোরতর স্বার্থপরতা হইতেই জন্মিয়া থাকে। নারীরা আমাদের খেলার পুতুল হইয়া আমাদের কথাতেই বাঁচুক আর মরুক, এইরূপ মনোভাবই ইহার মূল। তাই নানারূপ শাস্ত্র-বচন ও আধ্যাত্মিকতার দুর্গ রচনা করিয়া আমাদের অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় আমরা অষ্টপ্রহর লাগিয়া আছি। ফলে ভারতের নারী-জীবন সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারিতেছে না;—সমস্ত জাতীয় চেষ্টা তাহার অভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

আমি বিবাহের আগে পূর্ব্বরাগের কল্পনা করিয়াছি বলিয়া দীনেশ বাবু ইঙ্গিত করিয়াছেন যে আমি দুর্নীতির প্রচার করিতেছি। রাবণের দশটা মাথা কাটা যাওয়ার কথাও তিনি ক্রোধের আবেগে বলিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু কোন রাবণকেই আমি সীতাহরণের পরামর্শ দিই নাই—অথবা আধুনিক রসিক যুবকদিগকে পরের মেয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টি ফিরাইবার কথাও বলি নাই। এ-সব দীনেশ বাবুর গায়ে-পড়া তর্ক। একটু বেশী বয়সে বিবাহ হইলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইতে পারে আর সে জিনিষটা ভালই, ইহাই বলা আমার উদ্দেশ্য। ব্যাপারটা যে মনে মনে সকলেরই ভাল লাগে, আধুনিক উপন্যাস ও গল্পের দিকে তাকাইলেই তাহা বুঝা যায়। বরকন্যার মধ্যে বিয়ের আগে কোনরূপে প্রণয় সঞ্চার করিতে পারিলে গল্প-লেখকেরাও ভারী খুসী হন, আর পাঠকেরাও তাহা খুব পছন্দ করেন। যাঁহাদের গল্পের মধ্যে এই ব্যাপারটির অবতারণার কৌশল লক্ষিত হয়, তাঁহারাই পাঠকদের প্রিয়তম লেখক। লোকপ্রিয় গল্প-লেখক সুপ্রসিদ্ধ প্রভাত বাবুর কৃতিত্বের প্রধান কারণই এই। স্বয়ং দীনেশ বাবুও ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলিতে পূর্ব্বরাগের অবতারণা করিতে তিনি ছাড়েন নাই।

প্রবন্ধের শেষভাগে দীনেশ বাবু আমাকে মর্ম্মান্তিকরূপে অন্যায় আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে আমি বৈষ্ণব কাব্যের পরকীয়া প্রেমের কথা পাড়িয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাধনার নিন্দা করিয়াছি। তাঁহার মত বুদ্ধিমান প্রবীণ লোকের পক্ষে এরূপ কথা বলা ভাল হয় নাই। আমি তুলনা-মূলক আলোচনা করিবার সময় বৈষ্ণব সাহিত্যকে কাব্য-হিসাবেই দেখিয়াছি। তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাধনার কথা মোটেই জড়াই নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যকে যে বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিক হইতেও দেখা যাইতে পারে, এ কথা বোধ হয় দীনেশ বাবু মনে মনে ভালই জানেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাধনার উপর তাঁর চেয়ে আমার শ্রদ্ধা কম নয়। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রেমের অবতারকে তিনি মাত্র মানুষীভাবে বুঝিয়াছেন, আমার কাছে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

বারোয়ারি উপন্যাস

৩

উমাসুন্দরী তখন সবেমাত্র স্নান সেরে পূজায় বসেছেন; একধারে বামা ঝী বাজারের প্রকাণ্ড ফর্দ্দ পেড়ে বসেছিল, কটা পয়সার হিসেব তার আর কিছুতেই মিল্‌ছিল না। উমাসুন্দরী সেদিকে ততটা কাণ দেন্‌নি, তিনি তখন আসনে বসে জপ করছিলেন। খুব নিবিষ্ট চিত্তে হিসেব করতে করতে বামা হঠাৎ চম্‌কে মাথায় আঁচল টেনে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে,—ওমা, কত্তাবাবু যে গো! বলেই বামা বাজারের ফেরত বাকী পয়সা কটা আঁচলের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে সেদিক থেকে সরে পড়ল। যোগেন মিত্তির ঠাকুর-ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

এমন সময়ে কর্ত্তা এখানে! উমাসুন্দরী আশ্চর্য্য হলেন; ব্যাপার কি? শশব্যস্তে তিনি স্বামীর মুখের পানে চাইলেন। যোগেন মিত্তিরের সর্ব্বাঙ্গ তখন রাগে থর্‌ থর্‌ করে কাঁপ্‌ছিল। সে মূর্ত্তি দেখে উমাসুন্দরী জপ ভুলে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হয়েছে গা?

যোগেন মিত্তির বললেন,—শুনেছো, তোমার হতভাগা ছেলের কীর্ত্তির কথা?

উমাসুন্দরী যেন আকাশ থেকে পড়লেন, দুই চোখ কপালে তুলে বললেন—কার কীর্ত্তি? কে ছেলে?

—তোমার হরেন। যাকে কলকাতায় পাঠিয়েছ,—ভারী বিদ্যে শেখাবে বলে!

উমাসুন্দরী এ ইঙ্গিতের অর্থ স্পষ্টই বুঝতে পারলেন; কিন্তু এ কথা কর্ত্তার কাণে তুললে কে?

তাঁর আশঙ্কা হল, কথাটা কর্ত্তার কাণে যখন উঠেছে, তখন খুবই একটা অঘটন ঘটে যাবে! কথাটা তিনি নিজে মোটেই বিশ্বাস করেন্‌ নি! ছেলের সম্বন্ধে কোন্‌ মা-ই বা এমন কথা বিশ্বাস করেন? শুধু এই কারণেই যে তিনি বিশ্বাস করেন নি, তা নয়—তাঁর ছেলেকে তিনি ত চেনেন্‌! সেই অত আব্দার, বড় হলেও ছেলেমানুষের মত এখনো তার খামখেয়ালী এলোমেলো ভাব,—এগুলো যে অত-বড় বিশ্রী ব্যাপারের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না!—লোকে বলে, কমলার সঙ্গে আগে থেকেই না কি তার প্রণয় ছিল—! পাগলের কথা! থাকুক প্রণয়! প্রণয়ের অর্থ কি ঐ অত-বড় একটা সর্ব্বনাশের ব্যাপার! তাঁর মন জোর করে কেবলি বল্‌ছিল—না, না, এ মিছে কথা! একেবারে মিছে!

যেন-কিছু-জানেন-না এমনি ভাব দেখিয়ে উমাসুন্দরী বল্‌লেন,—কার কথা বলছ তুমি? হরেন? কি কীর্ত্তি করেছে সে?

যোগেন মিত্তির বললেন,—আমাদের মৈত্র মশায়ের মেয়ে কমলিকে নিয়ে ওরা সব কলকাতায় গঙ্গাস্নান করতে গেছল না কি, তা সেখান থেকে সবাই ফিরেছে, কমলি শুধু দেশে ফেরেনি। সেখানে হরেন নাকি তাকে ফুস্‌লে নিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে!

এ কথায় উমাসুন্দরীর সমস্ত মনটায় যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ল; তিনি বললেন—হরেন নিয়ে গেছে তাকে?

—হ্যাঁ গো, তোমার হরেন

উমাসুন্দরী আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে একেবারে গর্জ্জনের সুর তুলে বললেন,—মিথ্যে কথা! কে এ কথা বলেছে, শুনি?

যোগেন মিত্তির একটু থম্‌কে চুপ করে রইলেন। উমাসুন্দরীর এমন মূর্ত্তি তিনি আগে কখনো দেখেন্‌নি ত! তখনই সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তিনি বললেন,—শশীর কে আপনার লোক আছে, ট্রেণে সে কোথায় যাচ্ছিল—সেই ট্রেণেই সে হরেন আর কম্‌লিকে এক সঙ্গে কোথায় যেতে দেখেছে।

—শশী বলেছে! একটা বদমায়েস, মাতাল!

—কিন্তু তার এ মিছে কথা বলায় কোন স্বার্থ নেই ত।

সে কথা ঠিক! উমাসুন্দরী ভাবলেন, সত্যিই ত! শশী তাঁরই ভৃত্য। তাঁর ছেলের নামে মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে বেড়ানোয় তার লোকসান বৈ লাভ নেই! তবে—? তাছাড়া এ কথাটা আরো পাঁচমুখে এমন করে রটে বেড়াবে কেন? দেশে আরো ত লোক ছিল, কলকাতাতেও লোকের অভাব নেই—কিন্তু এদের সকলকে ছেড়ে তাঁর ছেলে হরেনকেই বা কেন্দ্র করে এই কুৎসার চক্রটা এমন করে লোকে ঘুরিয়ে দেবে কেন? এ কেন'র অর্থ মেলে না যে!

উমাসুন্দরী বললেন,—তুমি কি করবে এখন?

যোগেন মিত্তির বললেন,—কি করব তাও ঠিক করেছি। হরেনকে এখনি আমি চিঠি লিখব,—সে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়াক্‌, দাঁড়িয়ে জবাব দিক্‌, এত লোক থাকতে তার নামে এ অপবাদ উঠল কেন! তার পর আমি এর বিহিত করব।

উমাসুন্দরী বললেন,—কিন্তু শোনো, শুধু লোকের মুখে উড়ো কথা শুনে আগে থাকতেই যেন ছেলের সঙ্গে একটা হাঙ্গাম-ফৈজত্‌ করে বসো না—হাজার হোক্‌ ছেলে এখন বড় হয়েছে। স্থাখো, কখনো তোমাকে কোন কথা বলবার আস্পর্দ্ধা রাখিনি—আজ অনেক দুঃখে এইটুকু মিনতি জানাচ্ছি—আগে সঠিক খপর নাও, তারপর যদি দোষী বলে বোঝো, তোমার যে-সাজা দিতে মন চায় দিয়ো।

যোগেন মিত্তির বললেন,—এর আর কোন খপরাখপর নেবার দরকার দেখি না। কলকাতার মত জায়গায় ছেলেকে যখন একলা ছেড়ে দিয়েছ, তখন এইরকমই যে একদিন ঘটবে, এ আর আশ্চর্য্য কি! যাক্‌, তোমায় আগে থাকতেই জানিয়ে রাখ্‌ছি—এর পর আমার কাছে কান্নাকাটি করলে চলবে না, আমি তা শুন্‌বো না। হরেনের কাছ থেকে আমি সাফ জবাব চাই! তারপর যা করবার, করবো।

কথাটা বলে যোগেন মিত্তির আর মুহূর্ত্তকালও সেখানে দাঁড়ালেন না—সটান্‌ দপ্তরখানার দিকে ফিরে চললেন,—হরেনকে এবার চিঠি লিখতে হবে।

কর্ত্তা চলে যাবার পর উমাসুন্দরী কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে সেই পূজার আসনের উপরই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ঠাকুরের

সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললেন, —হে ঠাকুর, এ দায়ে রক্ষা কর! মার মুখ, মার মান, মার এত-বড় আশা, তুমি আজ রাখো ঠাকুর। মার মুখ এমন করে সত্যিই পুড়িয়ে দিয়ো না যেন!

তাঁর দুই চোখের কোণে অশ্রুর সাগর একেবারে উথলে উঠল।

৪

ক্ষিতীশ চৌধুরী কপিলডাঙ্গার জমিদারের বংশধর,—কলকাতায় লেখাপড়া করতে এসেছিল। পটলডাঙ্গার একটা গলিতে মাঝারি রকমের একটা ফিট্‌ফাট্‌ বাড়ী ভাড়া নিয়ে দস্তুরমত ইংরিজী কায়দায় তাকে সাজিয়ে ক্ষিতীশ সেখানে বাস করছিল আর প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এর লেকচারে হাজ্‌রে দিচ্ছিল। বাসায় সরকার বামুন চাকর—এরাই শুধু থাক্‌ত—তা ছাড়া উপরি লোকের আনাগোনা এত বেশী আর তাদের কলরবে বাড়ীটা সর্ব্বক্ষণই এমনি সরগরম থাকত যে বাইরে থেকে কোন অজানা লোক তা শুনে ভাবত, বাড়ীতে বুঝি কি একটা সমারোহ ব্যাপার চলেছে।

ক্ষিতীশের বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর। বেশ সৌখীন ছোকরা। চেহারাখানি চমৎকার, গোঁফ-দাড়ি কামানো, চোখের কোণে প্রিঁস্‌নে চশমা। ক্ষিতীশ হার্ম্মোনিয়ম বাজাতে জানে, গান গাইতে পারে, ছবি আঁকাও তার একটু-আধটু আসে। মস্ত-বড় জমিদার-বংশের দুলাল হলেও সে নেহাৎ একটা ঢাস্‌কা গোবর-গণেশের মত ছিল না। তবে দুর্ব্বলতা যে তার না ছিল, এমন নয়। পাঁচজন সমবয়সীর মুখের তারিফ্‌ শুন্‌তে ক্ষিতীশ ভালোবাসত—এবং সাদা কথায় যাকে মোসাহেবি বলে, জেনে হোক আর না-জেনেই হোক্‌, সেটাকে সে মোটেই ঠেলে চলতে পারত না।

অর্থাৎ বন্ধু আর সমবয়সীদের দলে সে মস্ত একজন আর্টিষ্ট বলে পরিচিত হয়েছিল। বন্ধুরা বলত, তার চুল ছাঁটা কি চাদর নেবার ভঙ্গী থেকে চলা-ফেরার মত তুচ্ছ ব্যাপারে অবধি কেমন একটা কায়দা আছে। ক্যাটালগ দেখে ক্ষিতীশ বোম্বাই থেকে ইবসেন, বার্ণার্ডশ'র বইগুলো যেবার আনিয়ে ফেললে, সেবার ইবসেনের একখানা বইয়ের পাতা খুলে বন্ধু জগদীশ চেঁচিয়ে বলে উঠলো —এই ত আর্টিষ্টের লক্ষণ!

অগাধ প্রাচুর্য্যের মধ্যে বসে সমস্ত বিশ্ব-জগৎটা প্রথম যৌবনে তার চোখে এমনি সুলভ হয়ে ধরা দিয়েছিল যে সুলভকে আয়ত্ত করবার ইচ্ছা তার মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে ত যাচ্ছিলই, তাছাড়া সুলভ বস্তুমাত্রকেই সে বর্জ্জন করতে চাইত।

দেশের বাড়ীতে বিধবা মা আর বয়সে-অনেক-ছোট এক ভাই ছিল। বিয়ে তার এখনো হয়নি। বিধবা মা যেদিন দেখে-শুনে সুন্দরী এক পাত্রী ঠিক করলেন, ক্ষিতীশ সেদিন প্রকাণ্ড একখানা ভারী নভেল শেষ করে একটা নিশ্বাস ফেলে ভাবলে, সত্যিই ত, এ কি বিয়ে! জানা নেই, শোনা নেই, বেনারসী কাপড়ের পুঁটুলিতে বেঁধে একটি মেয়েকে কোথা থেকে আনা হল, আর তাকে এমনি ভাবেই পিঠে বেঁধে সারা জীবন-পথটা চলে যেতে হবে! আমার সঙ্গে তার মিল থাবে কি না থাবে, সেটাতে ঘোর সন্দেহ আছে! হয়ত আমি যখন টেনিসন নিয়ে ঐ অসীম

নীল আকাশে উধাও হয়ে যাব, তিনি তখন দুই চোখে জল এনে বাপের বাড়ীর পুসী বেরালটির জন্যে কাঁদতে বস্‌বেন! ধেৎ!

মাকে গিয়ে সে বললে,—বিয়ের এখন কোন দরকার দেখচিনে মা। যেদিন দরকার বোধ করব তোমায় বলব। এখন আমি কলকাতা চললুম। কাল আমার কলেজ খুলবে।

কথা শুনে মা অবাক! যাই হোক্, তিনি আর কোনরকম উচ্চবাচ্য করলেন না। আকাশের পানে একবার চোখ তুলে চেয়ে শুধু একটা নিশ্বাস ফেললেন। ছেলে একেবারেই বিয়ে করবে না, এমন কথা বলেনি ত!

কলকাতায় এসে ক্ষিতীশ বন্ধুমহলে এই মতটা রাষ্ট্র করে দিলে যে—আগে থাকতে লভ্ না হলে বিয়ে করা চলেই না!

বন্ধু গবেশ ছিল ক্ষিতীশের সব-চেয়ে গোঁড়া সমজদার। তার কারণ, তার আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না, সেদিকটায় ক্ষিতীশের কাছ থেকে সে দায়ে-অদায়ে বিস্তর সাহায্যও পেত। বেড়াতে বেরিয়েছে হঠাৎ গবেশের জুতো-জোড়াটা ছিঁড়ে গেল অমনি ক্ষিতীশের এক জোড়া দামী জুতোয় পা ঢুকিয়ে সটান্ সেটাকে কায়েমী-ভাবে সে নিজস্ব করে ফেল্লে,—মাঝে মাঝে বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ হলে ক্ষিতীশের কাছে ছুটে এসে ডাক্তারের ফী, ওষুধের দাম চেয়ে নিয়ে যাওয়া —এগুলোয় কোনদিন কোন ব্যাঘাত ঘটেনি বা ক্ষিতীশ কোন কৈফিয়তও তলব করেনি। নিঃশব্দে সে এ-সবে প্রশ্রয় দিয়েই এসেছে। কাজেই সে বেচারীর তারিফের মাত্রাটা যে সবার চেয়ে বেশী হবে, এ আর বিচিত্র কি।

ক্ষিতীশের কথা শুনে গবেশ বল্লে,—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

গবেশের কিন্তু বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আর সে বিয়ের আগে লভের কোন চিহ্নও দেখা যায় নি। কারণ গবেশের স্ত্রীটি এসেছিল একেবারে সেই মগের মুল্লুক থেকে,—যেদিকে গবেশ স্বপ্নেও কোনদিন পদার্পণ করেনি।

গজু বলে উঠল,—তুমি ও কথা বলোনা হে গবেশ, তোমার মুখে ও কথা সাজেনা। তোমার আগে স্ত্রী, পরে লভ্—স্ত্রী-লাভের আগে স্ত্রীর সঙ্গে লভ নয়।

হেসে ক্ষিতীশ বললে,—একটু সবুর সইল না হে? গবেশ ভারী করুণ রকমের একটু হাসি ঠোঁটের আগায় এনে বললে,—অন্যায় হয়ে গেছে, ভাই!

এমনি মজলিসের মধ্যে থেকে ক্ষিতীশের চিত্ত দুর্লভের পানেই ছুটে চলেছিল—এমন সময় এক নূতন উপসর্গ জুটল। সে উপসর্গ,—এক মোটর-গাড়ী।

পটলডাঙ্গার যে গলিটায় ক্ষিতীশের বাসা ছিল, সেই গলির মোড়েই একজন বাবু একখানা মোটর-গাড়ী কিনে সেটা নিয়ে অষ্টপ্রহর ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্ করে বেড়াতে লাগল দেখে ক্ষিতীশের এক বন্ধু একদিন বলে উঠল—অসহ্য করে তুলেছে ভাই ক্ষিতীশ। তুমি একখানা মোটর না কিনলে আর ভালো দেখাচ্ছে না।

ক্ষিতীশ বললে,—আচ্ছা!

তারপর যে কথা সেই কাজ! এক

হপ্তার ষ্টুয়ার্টের দোকান থেকে প্রচণ্ড দামে এক প্রকাণ্ড গাড়ী এল।

তারপর মোটরের নেশা ক্ষিতীশকে এমনি পেয়ে বসল যে গান-বাজনা ইবসেন-শ' সব কোথায় পড়ে রইল! যে-জিনিষটা হাতে পাবে সেটার দিকে অসম্ভব ঝোঁক দেওয়া ক্ষিতীশের স্বভাবে রোগের মতই দাঁড়িয়েছিল। মোটর পেয়ে সে এই মোটরকে চালাতে শিখে লাইসেন্‌স নিয়ে নিজেকে একেবারে মোটরে এক্সপার্ট বানিয়ে ফেললে। যখন-তখন ধাঁ করে মোটর নিয়ে বেরিয়ে কলকাতার এদিকে-ওদিকে চক্র দিয়ে আসা বাতিকের মত দাঁড়িয়ে গেল। কলেজের লেকচারের দিকে আর মন রইল না। শেষে এই মোটর চালানোর ব্যাপারে একদিন এক মস্ত ঘটনা ঘটে গেল।

সে দিন কি একটা যোগ ছিল! দেশ-বিদেশ থেকে যাত্রী এসে কলকাতায় ভারী ভিড় জমিয়ে তুলেছিল। বন্ধুরা সকলেই ভলন্টিয়ারের দলে নাম লিখিয়েছিল,—কাজেই সকলে কাজে বেরিয়েছে। গবেশ চালাক ছোকরা,—সে দলে নাম লেখায় নি। কথায় কথায় নাকি ক্ষিতীশ একদিন বলেছিল,—তোমরা সবাই মিলে দল বেঁধে চল্‌লে হে, আমি একা ঘরে বসে কি করব? আমিও তোমাদের দলে যাই, চল।

বন্ধুরা ভিড় করে সকলে মোটরে চড়ায় আরামের একটু ব্যাঘাত হয়—তাই গবেশ ঠাউরে রেখেছিল, ঐ যোগের দিনটাতে ক্ষিতীশকে নিয়ে সে সাইট-সীইং-এ বেরিয়ে পড়বে। ক্ষিতীশের মুখ থেকে ভলন্টিয়ারের দলে ভেড়বার কথাটা বেরুতেই গবেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—নতুন নাম এখন আর নেবে না ত। আমি গিয়েছিলুম,—তা হল না।

কথাটা নিয়ে কেউ যদি তখনি তর্ক তুলত, তাহলে গবেশকে হেরে মুখ চুণ করতে হত! কিন্তু সবাই তখন নিজেদের ডিউটীর সময়-ক্ষণ নিয়েই ব্যস্ত, তর্ক তোলবার মত মনের অবস্থা কারো ছিল না। কাজেই গবেশের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল, অর্থাৎ ক্ষিতীশের ভলন্টিয়ারের দলে নাম লেখানো ঘটল না।

৫

সারা দুপুর এধার-ওধার লোকের ভিড়ে আর পথে গাড়ী চালানোর ব্যাপারে পুলিশের কড়া বন্দোবস্তর ঠেলায় আহিরীটোলার একটা গলির মধ্যে ক্ষিতীশকে হঠাৎ তার মোটর চালিয়ে দিতে হল। সে-পথে খানিকটা আসতেই সে দেখে, এক দোকানের সামনে লোকের ভারী ভিড়। এটা ত গঙ্গার তীরে যাবার পথ নয়, অথচ এ পথে এত ভিড় কেন? ক্ষিতীশ মোটর গাড়ীটা আস্তে চালিয়ে এগুতে লাগল। গাড়ীতে সঙ্গী ছিল শুধু গবেশ! সে ভাবলে, কোন এ্যাকসিডেণ্ট নয় ত?

এগিয়ে গিয়ে ক্ষিতীশ দেখে, দোকানের রোয়াকে গোলাপ-ফুলের মত রূপে-ঢলঢল একটি মেয়ে—কিশোরী, কোঁকড়া কালো চুলের রাশ গোলাপের তোড়ার পিছনে বাহারে ফার্ণ-পাতার মত এলানো! রূপে চারিধার আলো হয়ে রয়েছে। কিশোরীর মুখে-চোখে জল দেওয়া হচ্ছে। তার মূর্চ্ছা হয়েছে।

ক্ষিতীশ মোটর থেকে নামতেই দু-এক জন বলে উঠল, এই যে, এই একটা মোটর গাড়ী

আসছে,—মোটর। এইতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ত হয়! কেউ বললে, ত্থাখো, হয়ত এঁদেরই বাড়ীর মেয়ে। কিন্তু ক্ষিতীশের ভাব-ভঙ্গী দেখে যখন ভিড়ের লোকগুলো বুঝলে যে, না, মেয়েটি এদের ঘরের নয়, তখন চারিধার থেকে মিনতির ধারা ঝরে পড়ল, ও মশায়,—ওগো বাবু—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও সুরু হল,—কে? যাত্রী বোধ হয়, না? কোথায় বাড়ী, মশায়?—সে-সব গোলমালে এতটুকু চঞ্চল না হয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে ক্ষিতীশ চোখে যা দেখলে, তাতে তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এত রূপ মানুষের দেহেও সম্ভব হতে পারে! ক্ষিতীশ তখনি কিশোরীর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বললে,—পল্‌স্ আছে। ভিড়ের মধ্য থেকে সকলে বলে উঠল,—ডাক্তার,—ডাক্তার! বেশ হয়েছে। ভিড়ের দিকে চেয়ে ক্ষিতীশ বললে,—এঁর বাড়ী কোথায়?

—তা ত জানিনা, মশায়।

—আপনার লোকজন এঁর কে আছেন, এখানে?

—কৈ, কেউ নেই।

—কতক্ষণ এমনিভাবে আছেন?

—তা ত জানিনা,—পথের উপর পড়েছিলেন—তুলে রোয়াকে আনা হয়েছে। পুলিশে একটা খপর দেব, ভাবছিলুম সকলে, এমন সময়—

একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনও সেই সঙ্গে ক্ষিতীশের কাণে গেল—কি জাত, কি রীতের মানুষ কে জানে! একধার থেকে একটা অভদ্র ইঙ্গিতও ছুটে বেরিয়ে পড়ল। ক্ষিতীশ কিশোরীর মুখের পানে চেয়ে দেখলে! সুন্দর মুখ,—নির্ম্মল—তার মন অমনি বলে উঠল, অসম্ভব। সে ডাকলে,—গবেশ।

গবেশ এগিয়ে এল, এসে বললে,—কি?

—গাড়ী করে হাসপাতালে নিয়ে যাই, চল। না হলে মারা যাবে।

হাঁ কি না কোন কথাই গবেশের মুখ থেকে চট্ করে বেরুল না। সে এতক্ষণ অবাক হয়ে সেই জমাট রূপের প্রতিমার পানেই চেয়ে ছিল। হঠাৎ ক্ষিতীশের কথায় চমক ভাঙ্গতেই বলে উঠল,—হ্যাঁ।

তারপর সেই বিস্মিত স্তম্ভিত লুব্ধ জনতার মাঝখান থেকে পদ্মবনের পদ্ম ফুলটির মতই সেই রূপসী কিশোরীকে বন্ধুতে দুই ধরাধরি করে মোটরে তুলে মোটর হাঁকিয়ে দিলে।

সেখানে তখন একটা হৈ-হৈ রব উঠল। সারা পথটা ক্ষিতীশের মনের মধ্যে কিসের একটা ঢেউ ছুটেছিল। কি করা যায়? কি—? হ্যারিসন রোডের মোড় পার হয়ে তার গাড়ী ডান দিকে না বেঁকে যখন সোজা শেয়ালদার দিকে চলল, তখন গবেশ বলে উঠল,—এ কি, ক্যাম্বেলে চললে না কি! মেডিকেল কলেজে যাবে না? ক্ষিতীশের একটু লজ্জা বোধ হল। তার মুখে প্রথমটা কোন কথা জোগাল না। কোন মতে সঙ্কোচটা কাটিয়ে সে বললে,—ভদ্দর লোকের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে—হাসপাতালে চট্ করে নিয়ে যাব? তার চেয়ে বাসায় নিয়ে যাই। ডাক্তার এনে নার্শ রেখে, সেবার বন্দোবস্ত করে দেব'খন—তারপর একটু সেরে উঠলে ঠিকানা নিয়ে ওঁর বাড়ীতে খপর দেব।

বাসায় এসে ক্ষিতীশ বন্দোবস্তর কোন ত্রুটি রাখলে না। ডাক্তার ডাকা হল, নার্শ, ঝী সবই এল। বাড়ীর দোতলাটা রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হল। বন্ধুদেরও কাজেই উপরে ওঠা বন্ধ হল।

ডাক্তার এসে বলে গেলেন,—কোন রকম mental shock-এর জন্যে এই রকম হয়েছে। একেবারে অজ্ঞান নয় ত—জ্ঞান একবার-একবার হচ্ছে আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। কাজেই ভয় তেমন আছে বলে মনে হয় না!

নার্শের সঙ্গে ক্ষিতীশ কিশোরীর শিয়রে বসে সারা রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিলে। গবেশের থাকা সম্ভব ছিল না; কারণ লন্ডের পূর্ব্বে বিয়ে হলেও তার স্ত্রীটি জীবন্ত ছিল, তা-ছাড়া নবোঢ়াও বটে! কাজেই,—যাক্ সে কথা!

কিশোরীর শিয়রে বসে বসে ক্ষিতীশ কত কথাই যে ভাবছিল,—মনটাকে কল্পনার ফানুসে চড়িয়ে সে কোন্ অসীম আকাশে ছেড়ে দিয়েছিল! ঐ দুটি মুদিত নয়ন-পল্লবের তলে কি অসীম রহস্য লুকানো আছে। কখন্, ওগো কখন্ সেটুকু তার তৃষিত চোখে ধরা পড়বে!

সারারাত কল্পনা কত ছবিই দেখাতে লাগল! সেকালে রাজা-রাজড়ারা বনে মৃগয়া করতে গিয়ে সুন্দরীর দেখা পেতেন আর তাকে নিজের বাড়ীতে এনে বিয়ে করে একেবারে রাজ্যেশ্বরী করে পাশে বসাতেন! এও যেন সেই রকমেরই ব্যাপার!

ক্ষিতীশ বারবার শয্যায়-শায়িতা মূর্চ্ছিতার পানে চোখের আকুল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল।

বেলা তখন দশটা। মেয়েটি চোখ খুলে চাইলে। নার্শ এসে চামচেয় করে খানিকটা বেদানার রস তার মুখে ঢেলে দিলে। মেয়েটি তার ডাগর দুই চোখে অত্যন্ত কুণ্ঠিত কাতর দৃষ্টি তুলে নার্শের মুখের পানে চেয়ে রইল। এমন কতক্ষণই সে চেয়ে রইল; তারপর জিজ্ঞাসা করলে—আমি কোথায় আছি?

নার্শ তাকে বেশী কথা বলতে মানা করলে, বললে,—আপনি ভালো জায়গাতেই আছেন, কোন ভাবনা নেই।

মেয়েটি বললে,—আমার বাবা মা কোথায় আছেন? নার্শ এ কথার জবাব দিলে না। মেয়েটির সম্বন্ধে সে বিশেষ-কিছু জান্‌ত না। তাকে যে কুড়িয়ে আনা হয়েছে, সে যে এ বাড়ীর কেউ নয়, এ খপর সে শোনেও নি ত। ক্ষিতীশ অদূরে একটা ইজি চেয়ারে বসে একখানা বই নিয়ে পড়ছিল। নার্শ ক্ষিতীশের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার চাইলে। ক্ষিতীশ কাছে এসে দাঁড়াল।

মেয়েটি বললে,—এটা আপনাদের বাড়ী?

ক্ষিতীশ বললে,—হ্যাঁ।

মেয়েটি বললে,—আমার বাবা মা কোথায় গেলেন?

ক্ষিতীশ বললে,—জানি না ত। খোঁজ করে বলব'খন। আপনি এখন ব্যস্ত হবেন না। এখানে আপনার কোন ভয় নেই।

মেয়েটি চুপ করে বিছানাতেই পড়ে রইল। সামনে খড়খড়ি খোলা ছিল। তারি মধ্য দিয়ে আপনার অলস দৃষ্টিটাকে বহুদূর বাহিরে সে ছড়িয়ে দিলে। অসীম আকাশ ছেয়ে রৌদ্র ছড়িয়ে পড়েছে। সেই রৌদ্র,

গায়ে মেখে মাঝে মাঝে দু-একটা পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে! আকশের পানে চেয়ে সে কি ভাবতে লাগল। ভালো করে কিছুই মনে পড়ছিল না। সবটাই যেন আবছায়া। এক তুমুল কলরব তুলে কি মস্ত ভিড় এল—যেন পাহাড়ের মত এক তুমুল ঢেউ—সেই ঢেউয়ে ছিট্‌কে সে যে কোথায় গিয়ে পড়ল! ভিড়টা সরে গেলে সে চোখ তুলে চেয়ে দেখে,—চেনা মুখ একটিও পাশে নেই! সমস্ত গা অমনি ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল—মাথা ঘুরে গেল—তারপর সামলে নেবার পূর্ব্বেই সব ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে গেল! মন তার কূল না পেয়ে অকূলে ঘুরে ঘুরে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ল—ক্লান্ত চোখ-দুটীও আপনা-আপনি বুজে এল।

... ...

সাত-আটদিন পরে মেয়েটীর শরীরের অবস্থা সহজ হয়ে উঠল। সে একটু চলে ফিরে বেড়াতে লাগল। ক্ষিতীশ এতদিন বন্ধুদের সংসর্গ ছেড়েই দিয়েছিল। দিবারাত্রি এই দোতলাতেই পাশের একটা ঘরে পড়ে থাকত; মাঝে-মাঝে এঘরে এসেও বসত। ফুলের গন্ধে লুব্ধ ভ্রমর যেমন গাছের আশে-পাশে গুঞ্জন তুলে ফিরতে থাকে, ঠিক তেমনি করেই তার রূপ-লুব্ধ মন এই ঘরটার চারিপাশে ঘুরে বেড়াত; মুহূর্ত্তের জন্য সে দোতলা ছেড়ে নড়তে পারত না!

দুপুর বেলা মেয়েটি বিছানাতে শুয়ে ছিল, ক্ষিতীশ ঘরে ঢুকে বললে,—আপনি ভালো আছেন?

মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে উঠে বসে বললে,—হ্যাঁ!

ক্ষিতীশ বললে,—শরীরে একটু জোর পেয়েছেন?

—পেয়েছি।

ক্ষিতীশ বললে,—আপনার বাড়ী কোথায় আর আত্মীয়-স্বজনই বা কে আছেন, কোথায় আছেন? তা ছাড়া রাস্তায়—

মেয়েটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চারিদিকে পাঁচিল ওগো, চারিদিকে পাঁচিল তোলা রয়েছে! পথ কৈ? পথ কৈ—তার ঘরে যাবার পথ? এ অজানার রাজ্যে এতটুকু গণ্ডীর মধ্যে তার মন অস্থির হয়ে উঠছিল। তারপর ভবিষ্যৎ—? এখনই বা সেখানে কি হচ্ছে—? কে কোথায় কেমন আছে? কি করছে? তার চোখ দিয়ে হু-হু করে জল পড়তে লাগল।

ক্ষিতীশ বললে,—কাঁদবেন না আপনি। আপনার পরিচয় খুলে বল্লে আমি খপর দি।

মেয়েটি তখন সব কথা খুলে বললে—কলকাতার বেশী দূরে নয়, এক পাড়াগাঁয়ে তাদের বাড়ী। বাপের সঙ্গে মার সঙ্গে এখানে যোগে গঙ্গাস্নান করতে সে এসেছিল। একটা রাস্তায় খুব ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ সে ছিট্‌কে দল থেকে কেমন বেরিয়ে পড়ে। প্রথমটা তার কোন হুঁসও ছিল না। অনেক দূরে এসে ভিড় সরতে সে চেয়ে দেখে, কোথায় বাবা, কোথায়ই বা তার মা! ভিড়ের চাপে-চাপে সে একেবারে এ কত দূরে এসে পড়েছে! অজানা মুখ, আশে-পাশে কেবলি অজানা মুখ—তাদের সে কত রকমেরই বা ভঙ্গী! ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। হয়ত সকলে পিছিয়ে পড়েছে, এই পথেই আসবে,—এই ভেবে মা-বাপের দেখা পাবার আশায়

একটা রোয়াকের উপর সে বসে পড়ল। তারপর সমস্ত পৃথিবীটা যেমন অল্পে-অল্পে ঘোর অন্ধকারে ভরে গেল। তারপর যখন সে চোখ চাইলে, তখন দেখে, একেবারে এই বাড়ীর মধ্যে এসে পড়েছে। কি করে এল, সে তার কিছুই জানে না!

ক্ষিতীশ বললে,—আপনার বাবার নাম কি?

—শ্রীযুক্ত হরনাথ মৈত্র।

—বাড়ী কোথায়?

মেয়েটি দেশের নাম বললে .

।—বলে ক্ষিতীশ সে ঘর থেকে উঠে গেল। টেবিলের উপরে কাগজের প্যাড্ ছিল, তা থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে সে লিখতে বসল। লিখলে,—

মান্যবরেষু

মহাশয়—

এইটুকু লিখেই সে চুপ করে বসল, এ কি করছে সে? এ চিঠি লেখার মানে? তার নিজের চোখের সাম্‌নে থেকে বিশ্বের সমস্ত রূপ রস গন্ধ স্পর্শের সব অনুভূতি দু হাতে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে যে! নিজের চোখের দীপটিকে নিভিয়ে ফেল্‌তে বসেছে। এ কথা মনে হতেই সমস্ত প্রাণটা তার বাণে-বেঁধা হরিণের মত ছটফট করে উঠল! ওগো না, না—এ চিঠি লেখা যায় না! লেখা হতে পারে না। এ যে নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই হাতে করে সে পরের হাতে তুলে দিতে চলেছে!

আকাশ-পাতাল কত-কি সে ভাবতে বসল! মেয়েটি তার কেউ নয়! কোনদিন প্রাণের কাছে তাকে পাওয়া যাবে কি না, তাও তার জানা নেই! তার সঙ্গে আলাপ নেই, পরিচয় নেই—প্রাণের] একটা কথাও কোনদিন কওয়া হয় নি—তবে—? তবু,—এ বড় সুখ! একই ছাদের নীচে দু'জনে আছি ত! এই যে কাছে-কাছে আছি—হাতে না পাই, হাতের নাগালে আছে, এই চিন্তাটুকুতেও যে মস্ত সুখ! এ সুখ কি ছাড়া যায়! তবুও—চিঠি না লিখেই বা সে করবে কি! কোন্ অজানা ভদ্র ঘরের কিশোরী মেয়েকে জোর করে সে আপনার বাড়ীতে বন্দী করে রাখতে পারে না ত!

মেয়েটিকে বিয়ে করলে কি হয়? ঠিক কথা! কৈ, মেয়েটির বিয়ে হয়েছে কি না, সে কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নি ত! বোধ হয়, বিয়ে হয় নি। বিয়ে হলে সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন দেখা যেত! মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্নও ত কৈ, নেই! ক্ষিতীশের আশা তবে দুরাশা না হতেও পারে! আহা, এমন কি হবে! কেন হবেনা? কোথায় সে এই বাসার এককোণে পড়েছিল—আর কোথায় সেই আহিরীটোলার কোণে এক অজানা গলি! সে গলির কথা সে জানতও না। তার অদৃষ্ট যখন তাকে সেদিন সেই গলির মধ্যে নিয়ে গেল, তখন সেটার মধ্যে কি কোন উদ্দেশ্য ছিল না! ছিল বৈ কি! একেই বলে, নিয়তি—! নিয়তির গতি রোধ করার সাধ্য কারো নেই! নিয়তি, অদৃষ্ট—এ সব সে আগে মানত না। আজ এক মুহূর্ত্তে দৈবে তার অসীম বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল। নিয়তির যদি শক্তি না থাকবে, তাহলে ঘটনাগুলো এমন দাঁড়াবে কেন?

আশার উল্লাসে মেতে ক্ষিতীশ আবার মেয়েটির কাছে এল। বললে,—দেখুন, একটা

কথা আমি ভাবছিলুম—আপনার বিয়ে হয়েছে ত। তা শ্বশুর-বাড়ী কি কাছে-পিঠে নয়—? আপনার স্বামীকে তা হলে,—

কথাটা সে খুব ভয়ে-ভয়েই বললে। তার মনে এ বিশ্বাস খুবই ছিল যে জবাব পাবে, বিয়ে আমার হয়নি! হঠাৎ এত-বড় একটি মেয়েকে তার বিয়ে হয়েছে কি না, এ প্রশ্ন করাটা ঠিক ভদ্রোচিত হবে না ভেবেই সে একটু ঘুরিয়ে ঐ প্রশ্নটাই নিক্ষেপ করেছিল; কিন্তু তার জবাবে যখন শুনলে যে, হ্যাঁ, মেয়েটির বিবাহ হয়ে গেছে এবং স্বামী জীবিত, তখন মনটা নিমেষে আকাশের উপর থেকে তার রঙীন ফানুস ছিঁড়ে একেবারে কোন্ কঠিন পাহাড়ের গায়ে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। হায়রে হায়, আশার ছোট দীপটি ঝড়ের এক দাপটে নিভে গেল!

খানিক পরে একটা ঢোক গিলে ক্ষিতীশ বললে,—দেখুন, এতদিন ধরে আমার বাসায় আপনি আছেন, আর আপনি বাড়ী না ফেরায় চারধারে একটা গোল পড়ে গেছে, নিশ্চয়। কারণ যখন সেটা পাড়া-গাঁ। তা এমন অবস্থায় আপনার বাবাকে চিঠি লিখলে সোর-গোল পড়ে যেতে পারে না কি? তা-ছাড়া অর্থাৎ বুঝলেন কি না, নিজে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা চুপিচুপি তাঁদের বুঝিয়ে বললে ভালো হয় না কি? নইলে নানান্ কথা—

এইটুকু বলে সে চুপ করলে; তারপর দু'বার কেশে ক্ষিতীশ আবার বললে,—অর্থাৎ বুঝলেন কিনা—এতে আমারও একটা দায়িত্ব আছে কি না। এতদিন কোন খপর দেওয়া হয় নি, হঠাৎ আজ—! তা কলকাতায় আপনার এমন কোন আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, যিনি—

মেয়েটি ভাবতে বসল। অনেকক্ষণ ধরেই সে ভাবলে—আর ক্ষিতীশ তার চোখের শেষ দৃষ্টি দিয়ে তাকে ঘিরে রইল। এ দেখা আর কতক্ষণের জন্যই বা! তার জীবনের পথ থেকে মেয়েটি এখনি চিরদিনের মতই সরে যাবে! তার সঙ্গে কোন কালেও আর দেখা হবার সম্ভাবনা থাকবে না—

হঠাৎ মেয়েটি কথা কইলে। আস্তে-আস্তে বললে,—দেখুন, কলকাতায় আমার এক দাদা থাকেন, কলেজে পড়েন। খোঁজ করে তাঁকে যদি আনাতে পারেন, তাহলে বোধ হয়—

স্পন্দিত বক্ষে ক্ষিতীশ বললে,—তাঁর নাম কি, বলুন।

—হরেন্দ্রনাথ মিত্তির!

—মিত্তির! আপনার দাদা!

—তিনি আমাদের গাঁয়ের জমিদারের ছেলে কি না! আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই থাকেন। কায়স্থ হলেও তাঁরা একেবারে ঘরের লোকের মত।

—কোন্ কলেজে তিনি পড়েন? কোথায় থাকেন?

—তা ত আমি জানি না।

ক্ষিতীশ বললে,—বেশ, আমি এখনি খোঁজ করতে যাচ্ছি। জমিদারের ছেলে বললেন না? কলেজে পড়েন? বেশ, কলেজ থেকেই খোঁজ পাব'খন। দেখি। ভালো কথা, তাঁকে পেলে কি বলব? হরনাথ বাবুর মেয়ে—আপনার নামটি—?—

—আমার নাম কমলা!

ক্ষিতীশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কমলা তার উদাস দৃষ্টি আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল, এই ক্ষিতীশের কথা! বাড়ীতে মেয়েরা কেউ নেই—অথচ চারিধারে কেমন শৃঙ্খলা! লোকটিকে কেমন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মতই তার মনে হতে লাগল।

ক্রমশঃ *

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আব্দারের আধঘণ্টা

বেল-ফুল চাইনা,
জুঁই-ফুল দাও!
ও গানটা গেওনা,
এই গান গাও!
কেন ভালোবাসলে
বল—বল না;
হাসলে কেন তুমি?
—কথা ক'ব না!
কাল্‌কের গল্প
আজ কর শেষ;
আজকের রাতটা
লাগচে না বেশ?
সারাটা বেলা ধরে
বাঁধলুম চুল,
দেখলে না চেয়ে তা
এম্‌নিই ভুল!
জুঁই-ফুল চাই না
বেল-ফুল দাও;
এ গানটা গেওনা,
ঐ গান গাও!

জুঁই-ফুল নেবোনা,
দাও বেল-ফুল।
পার্শীরা গোলাপকে
বলে না কি গুল্?
ও দিকেতে চেওনা,
চাও এই দিক;
আলোটা নিভে আসে
দাও ক'রে ঠিক:
লাগচে চোখে আলো
ক'রে দাও কম;
ঐ যা, বাতি গেল
নিভে একদম!
হবেনাক জাল্‌তে
খুব বাহাদুর,
জানা গেছে বুদ্ধি
যায় কতদূর!
বেল-ফুল চাইনা,
দাও জুঁই-ফুল;
পার্শীরা গোলাপকে
বলে নাকি গুল!

* আগামী সংখ্যার লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেব।

জুঁই-বেল চাই না,
চাঁপা এনে দাও ;
আমি কি তা জানি তুমি
পাও কি না পাও !
কাকাতুয়া কিনে দেবে—
কিনে দিলে খুব !
কথা কেন নেই মুখে
হয়ে গেলে চুপ ?
ভালোবাস কি না বাস—
ঠিক বলো না !
চাঁদ ঐ উঠছে,
ছাদে চলো না।
মুখে চুণ লাগলো,
ফিরে নাও পান ;
মাথা-ঘুরে পড়লো—
গেওনাকো গান ;
চাই না জুঁই-বেল,
চাঁপা এনে দাও ;
আমি কি তা জানি, তুমি
পাও কি না পাও !

চাঁপা-ফুল চাইনা,
চাই চামেলি ;
সব-তাতে হবে-হবে
খালি গাফেলি !
আজ রাতে দুজনাতে
জেগে থাকবো,
কে হারে কে জেতে
আমি তাই দেখবো !
ছোট বলে করবে
তুই-তোকারি ?
তাতে ক'রে অপমান
হয় আমারি !
না বলে না কয়ে তুমি
কেন চুমা খাও ?
বলিনা যত-কিছু
আশ্‌কারা পাও !
চামেলি চাই না,
দাও চাঁপা-ফুল ;—
মিঠে তার গন্ধ,
গা তুল্‌তুল্।
চাঁপা-ফুল চাই না,
দাও বেল-ফুল ;
খোঁপা থেকে ঝরে পড়ে'
গেল বেল্‌ফুল্ !
কুড়িয়ে সব ক'টা
পরিয়ে দাও ;
আবার না ব'লে তুমি
গালে চুমা খাও !
আমি মরে গেলে তুমি
খুব কাঁদবে ?
তখন এ বাহু-ডোরে
কাকে বাঁধবে ?
ওকি, ওকি, চোখ থেকে
পড়ে কেন জল ?
মরে কেন যাব আমি—
মিছে করি ছল !
জুঁই, বেল, চামেলি—
যা খুসি তা দাও,
ও-গালেতে চুমা খেলে
এ-গালেতে খাও !

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

চয়ন

বিজ্ঞানের জন্য রূপসীর চক্ষু-দান

বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস ক্লারা কিম্বাল ইয়ংএর কালো-চোখের খেলা নাট্য-জগতে অনেক নতুন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। সেই চোখদুটিকে তিনি বিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য উৎসর্গ ক'রে রেখেছেন।

তাঁর মতে, চোখ হচ্ছে আসলে অন্তরের বাতায়ন। তিনি তাই বলেছেন যে, মৃত্যুর একটু আগে তাঁর চোখদুটি কোটর থেকে তুলে নিয়ে,তৎক্ষণাৎ অন্ধকার ঘরে গিয়ে ফটোগ্রাফে 'নেগেটিভ'কে যেমন ক'রে 'ডেভেলাপ্' করে, তেমনি ক'রে যেন ডেভেলাপ্ করা হয়। তারপর সেই 'নেগেটিভ' থেকে 'পজেটিভ্' ছবি তুললে তাতে তাঁর জীবনের গোপন সৌন্দর্য্যভরা সমস্ত চিত্র প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। এই ধারণা তাঁকে এমন ক'রে পেয়ে বসেছে যে, তিনি এখন বিজ্ঞানের বিস্তারের জন্যে একান্তভাবে আপনাকে নিযুক্ত রেখেছেন।

তাঁর বিশ্বাস যে, আয়নার মত চোখের উপরে প্রাণের সমস্ত ছবি প্রতিফলিত হয়। মানুষের চোখ-মুখ এবং হাবভাব দেখে যাঁরা তাদের প্রকৃতি বলতে পারেন, তাঁরা বলেন যে, চোখ, দেখলেই টের পাওয়া যায়, কোন লোক মিথ্যাকথা বলছে কি না। এটা যদি ঠিক হয় তবে এটাও সঠিক যে, শুধু সামনের ঘটনাগুলির ছবি চোখের উপরে ছাপ দিয়ে যায় না, অন্তরের সমস্ত ছবিও তাতে ধরা পড়ে।

প্রাণের স্বপ্ন ও অসীমের চিন্তা কোনদিন যদি সংস্কার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে কেন চোখের পরদার গায়ে গায়ে সেই সমস্ত ছবি ফুটে উঠবেনা—এমন-কি মৃত্যুর পরেও। স্নেহ,প্রেম কিম্বা ঘৃণা ইত্যাদির যে-কোন ভাব যে-চোখে ফুটে উঠতে পারে, সেই চোখে বিচিত্র বিস্ময়ে ভরা জীবনের কাল্পনিক আদর্শের ছবিও কেন ফুটে উঠবে না? দেহের উপরে মৃত্যুর যে দাবী, সে দাবী ছবির উপরে চলে না।

প্রাণের চিন্তার সমস্ত ছবিই চোখের মধ্যে ধরা পড়ে, নৈলে চোখদুটো প্রাণীমাত্রেরই এমন একান্ত সঙ্গী হতো না।

এড্গার অ্যালেন পো এবং রাডিয়ার্ড কিপ্লিং তাঁদের উপন্যাসে এই ধরনের দু-একটা কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, যা চাক্ষুষ দেখা যায় তার ছবি চোখের মধ্যে থাকা সম্ভব, কিন্তু মিস ইয়ংএর চিন্তার ধারা তাঁদের চিন্তাকেও অতিক্রম করেছে।

কবি কোল্‌রীজ এক জায়গায় বলেছেন, চোখ বুজেও অনেক ছবি দেখতে পাওয়া যায়। অভিনেত্রীও বলেন যে, এই সমস্ত ছবি হচ্ছে আত্মা ও মনের প্রতিবিম্বিত ছবি। সেক্সপীয়ারের রিচার্ড দি থার্ডের এক জায়গায়

রিচার্ড বলছেন, "মৃত্যুর আগেই আমার চোখের মধ্যে মৃত্যুর সমস্ত ছবি ভেসে উঠছে।" রূপসী অভিনেত্রীর বিশ্বাস, সেক্সপীয়ার নিজেও এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন।

মিস ইয়ংএর এই তত্ত্বকে এইজন্য একেবারে উপেক্ষা করা চলে না যে, তিনি নিজে ক্ষতি-স্বীকার ক'রে নিজের চোখদুটোকে বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষাগারে দান করতেও প্রস্তুত আছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র রায়

জাপানী আর্ট

সব জাপানী জিনিসই স্নিগ্ধ সুকুমার, চমৎকার, অপরূপ—ছোট একটি কাগজের থলি, তার ওপর ছোট একটি ছবি, তার মধ্যে একজোড়া সাধারণ কাঠের আহারের কাঠি; চেরি কাঠের এক গুচ্ছ থড়কে কাগজের মোড়কের অন্তরালে, মোড়কের ওপর ছাপা তিন-রঙা আশ্চর্য্য অক্ষর; আসমানি রঙের ছোট্ট তোয়ালে তার ওপর উড়ন্ত চড়াইয়ের পরিকল্পনা—রিক্স-ওয়ালা তা দিয়ে মুখ মোছে। ব্যাঙ্কের বিল, অতি সাধারণ তাম্রমুদ্রা—এ সমস্তই সুন্দর। এমন কি ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে সওদা করেছেন সেটি দোকানী যে-রঙিন সুতোয় বেঁধে দিয়েছে সেটি কত পরিপাটি—সেটি একটি দেখবার জিনিস। এখানে এসে সুকুমার পরিপাটি দ্রব্যের ভিড়ে দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়।......

মনে পড়ে, জাপানের একটা বড় অগ্নিকাণ্ডর কথা শুনে এক মার্কিন ভদ্রলোক—তিনি একজন কাজের লোক—বলেছিলেন: "ওঃ ওদের অমন আগুনলাগা পোষায়; ওদের বাড়ী করতে আর খরচ কি!" সাধারণ লোকের ভঙ্গুর কাঠের বাড়ী অবিলম্বে অল্প খরচে আবার তোলা যায় বটে কিন্তু বাড়ীর অভ্যন্তরে যা থেকে বাড়ীখানিকে সুন্দর ও রমণীয় করেছিল তা গড়া যায় না—প্রত্যেক অগ্নিকাণ্ড এক একটি আর্ট-ট্রাজিডি, কারণ এ দেশ হাত-গড়া জিনিসের অসংখ্য বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ... ...আর শিল্পীর হাতে গড়া জিনিস কোনোটিই এক ছাঁচের হয় না—এমন কি একই লোকের গড়া জিনিসও নয়। বারে বারে নব নব রূপে তা প্রকাশ হয়, আর প্রতিবার যখন অগ্নিকাণ্ডে সুন্দর কিছু ধ্বংস হয়, জানবেন, একটি বিশিষ্ট আইডিয়ার বিগ্রহ নষ্ট হয়ে গেল।

সুখের বিষয়, এই অগ্নিকাণ্ডর দেশে আর্টের প্রেরণা প্রাণবন্ত, অমর। আর্টিষ্ট-সম্প্রদায়ের তিরোধানের সঙ্গে এ আর্টের নির্ব্বাণ লাভ ঘটে না; যে-আগুন আর্টিষ্টের সুকঠোর পরিশ্রম-ফলকে নিমেষে ভস্মসাৎ করে বা গলিয়ে নিরাকার পিণ্ডে পরিণত করে, সে-আগুনকেও এ আর্ট তুচ্ছ করে। যে-আইডিয়ার বিগ্রহ ধ্বংস হল আবার নব নব রচনায় তা পুনঃপ্রকাশিত হবে,—হয়তো শতাব্দীর পরে,—হয়তো হুবহু তেমনটি হবে না, তবে সেগুলি সেই পুরানো চিন্তাধারারই অনুবর্ত্তী হবে নিঃসন্দেহ। আর প্রত্যেক

আর্টিষ্ট যেন লোকলোকান্তরের কর্ম্মী। বহুবর্ষব্যাপী সাধনা ও ত্যাগের দ্বারাও সে আপনার পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না; অতীতের সকল ত্যাগের মহিমা তার অন্তরে পুঞ্জীভূত; তার আর্ট বংশপরম্পরাগত। যখন সে আঁকে বিস্তারিতপক্ষ বিহঙ্গ; মহীধর-শীর্ষে কুহেলির আস্তরণ; সকাল-সন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণসুষমা; বনস্পতির জটিল শাখার বঙ্কিম ভঙ্গিমা কিম্বা নব বসন্তের অদ্ভুত পুষ্পবিকাশ; তখন তার অঙ্গুলিকে চালনা করে যারা লোকান্তরিত, যারা তার পূর্ব্বগামী। তার শিল্পকলা যুগযুগান্তের কুশলী শিল্পীর সাধনার ফল—যারা তার অঙ্কনের সার্থকতায় অহরহ নবজীবন লাভ করছে। আদিতে যা ছিল গোচর প্রয়াস পরবর্ত্তী শতাব্দীতে তা আর গোচর রইল না—তা জীবন্ত মানুষের প্রকৃতিগত হয়ে উঠ্‌ল—আর্ট-অনুভূতিতে তা পরিণত হল।

সেহেতু হোকুসাই বা হিরোশিঙের ছবির রঙিন প্রতিলিপির মধ্যে প্রকৃত আর্ট, পাশ্চাত্য দেশের অনেক চিত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকা বিচিত্র নয়। অথচ প্রথমোক্ত ছবির মূল্য গোড়ায় ছিল পয়সা-পয়সা এবং শেষোক্ত ছবির মূল্য একটা গোটা জাপানী রাস্তার চেয়েও বেশী।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বগগনের প্রথম প্রভাত

পূর্ব্বজগতের একদা-সমৃদ্ধিশালী বহু নগর-নগরীর অধিকাংশই অধুনা বিলুপ্ত-প্রায়। কেবল কয়েকটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মেসো-পোটেমিয়ায় তুর্ক ও জার্ম্মেনীর মিলিত শক্তির সহিত মিত্রশক্তির যখন প্রবল সংঘর্ষ চলিতেছিল, সেই সময় সংবাদপত্রে প্রতিদিন 'বোগ্দাদ্', 'আলেপ্পো', 'দামাস্কাস্', 'মক্কা', 'মেদিনা' ও জেরুশালেম' প্রভৃতি পৃথিবীর অতি-প্রাচীন নগরসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত। ঐ-সকল পুরাতন নগরের নামের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত অতীত গৌরবের কত রহস্যময় স্মৃতি এখনও এদেশের মানুষের মনটীকে একান্ত আলোড়িত করিয়া তুলে এবং ঐতিহাসিকের অন্তরে একটা অপরিসীম বেদনার কাতরতা আনিয়া দেয়। শিল্পীর হৃদয়ে জগতের সেই বিগত শ্রীসম্পদের জন্য আক্ষেপের একটা করুণ আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠে!

সভ্যতা-দৃপ্ত য়ুরোপ আজ এশিয়ার দিকে মুরুব্বীর মত কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন! তাঁহারা আজ বিস্মৃত হইয়াছেন যে, সে কোন্ নীলাকাশের সমুদিত প্রভাতারুণ সভ্যতার হিরণ কিরণে অন্ধকার য়ুরোপকে প্রথম আলোকোজ্জ্বল করিয়াছিল। চার-হাজার বৎসর পূর্ব্বে খরস্রোতা য়ুফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর ব্যবধান-ক্ষেত্রে একদিন যে বিরাট সভ্যতা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত য়ুরোপ আজ তাহারই ছায়া-স্পর্শে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। বাবিলন, আসুরীয়া,

পামীরা প্রভৃতি যখন শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, বিদ্যায়, কলায়, শিল্পে, সঙ্গীতে ও বিলাস-বিভ্রমে অমরাবতীরও ঈর্ষা উৎপাদন করিতেছিল, তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকার অবস্থা কি ছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। 'মিশর' ও 'কিরীট' (Crete) ব্যতীত পৃথিবীর অবশিষ্ট ভাগ তখনও অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া ছিল।

প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর অনেক লুপ্তরহস্য কালের অতলগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আসুরীয়া যে একদিন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল, লণ্ডন, প্যারি ও নিউইয়র্কের মত অসংখ্য সমৃদ্ধিশালী নগর-নগরীতে যে সেই দেশ পরিশোভিত ছিল, 'নাইনিভের' খননোদ্ধৃত বিবরণ হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাবিলন-সাম্রাজ্যের ভিত্তিই যে পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম, ঐতিহাসিকগণ ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ অব্দে বাবিলনবাসী আরবজাতীয় সেমাইতগণ লোক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হইয়া যখন য়ুফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর ব্যবধানভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন সেখানে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সুসভ্য সুমেরীয়গণের সাক্ষাৎ পান এবং তাহাদের নিকট হইতেই বাবিলনের সভ্যতা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। সুমেরীয় ও সেমাইতগণের মধ্যে সভ্যতার প্রবল প্রতিযোগীতার ফলে, সেইসময় যে সকল সহর গড়িয়া উঠিয়াছিল 'উর', 'আসাদ' ও 'মুষেরাব' প্রভৃতি অধুনা-বিলুপ্ত নগরগুলি তাহাদের অন্যতম। আসাদের অধিপতি শার্গনরাজ একজন দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। তাঁহার অপরাজেয় তরবারীর সাহায্যে বাবিলনীয় সভ্যতাকে তিনি আসুরীয়া ও সাইপ্রাস্ পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। অতীতের ইতিহাসের মধ্যে ইঁহারই সাম্রাজ্যের কথা সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। (খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ] ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত একখানি প্রাচীন মৃত্তিকা-ফলকে ইঁহার কীর্ত্তিকাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় উৎকীর্ণ আছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নৃপতিশ্রেষ্ঠ 'হামুরাবী'র রাজত্ব-কালেই বাবিলন পৃথিবীতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল (খৃঃ পূঃ ১৯৫৮-১৯১৬)। নৃপতি হামুরাবীর যশোভাতি ও সুনাম তদানীন্তন জগতের কোন দেশেই অবিদিত ছিল না। রাজার সিংহাসন, রাজমুকুট ও রাজদণ্ড তিনিই প্রথম জগতে প্রচলিত করিয়া যান। তারপর আজ প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, এখনও পৃথিবীর সকল দেশের সকল রাজাই হামুরাবীর প্রতিষ্ঠিত উক্ত রাজ-মর্য্যাদা-জ্ঞাপক ব্যবস্থাগুলিই শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছেন। হামুরাবীর রাজ্যশাসন-প্রণালী ও বিবিধ বিধি-নিয়মের বিষয় অবগত হইয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ বর্ত্তমান জগৎ আজ বলাবলি করিতেছে যে, চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে এমন সুব্যবস্থিত রাজ্য পৃথিবীতে কি প্রকারে সম্ভব হইয়াছিল?

খৃঃ পূঃ ১২৫০ অব্দ পর্য্যন্ত বাবিলনের প্রতাপ অক্ষুন্ন ছিল, কিন্তু খৃঃ পূঃ ১৯১৭ অব্দ হইতেই বাবিলন রাজ্যের উত্তর প্রদেশে আসুরীয়গণ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া

উঠিতেছিল, এবং খৃঃ পূঃ ১২৫০ অব্দে তাহারা বাবিলনও জয় করিয়া লইল। তারপর প্রায় ছয়শত বৎসর ধরিয়া—রণকুশল পার্ব্বত্য আসুরীয়গণই বাবিলন অধিকার করিয়া ছিল! খৃঃ পূঃ ৬৯০ অব্দে প্রবলপ্রতাপান্বিত আসুরীয় সম্রাট সেন্নাচেরীব 'নাইনিভে' নগরে তাঁহার অদ্বিতীয় রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু খৃঃ পূঃ ৫০৬ অব্দে—বাবিরুষেরা মেহ্দী ও চাল্দী-গনের সাহায্যে বাবিলন পুনরধিকার করিয়া, আসুরীয়-গণের অশেষ গৌরবমণ্ডিত রাজধানী 'নাইনীভে' ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল।

এই সময় হইতে বাবিলনে চাল্দীগণের প্রভুত্বই প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। ক্রমে এই চাল্দীগণের ভিতর হইতেই নৃপতি নির্ব্বাচিত হইয়া বাবিলনের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। চাল্দী নৃপতি-গণের মধ্যে 'নেবুকাদনেজার'ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই 'নেবুকাদ্-নেজার' সম্বন্ধে যে সকল হাস্যস্কর কাহিনী আজও প্রচলিত রহিয়াছে, উহার অধিকাংশই সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে নেবুকাদ্নেজারের মত একজন সর্ব্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠতম নৃপতি আজ পর্য্যন্ত জগতের আর কোন দেশেরই সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন নাই।

পৃথিবীর অতীত গৌরবস্থল বাবিলন সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। অসংখ্য প্রাচীন লেখক ও বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্গণ ইহার সম্বন্ধে যে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন, আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব মাত্র।

চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বাবিলন সহর আকারে চতুষ্কোণ, এবং ইহার পরিধি পরিমাপে প্রায় চল্লিশ মাইল বিস্তৃত ছিল। চারিপার্শ্বের প্রাচীর-গাত্রের প্রত্যেক দিকে পঁচিশটী করিয়া, মোট একশত সুবৃহৎ তোরণ-দ্বার ছিল। এই প্রাচীর ইষ্টক ও শিলাজতু নির্ম্মিত, ও ভিত্তিগাত্রে মধ্যে মধ্যে জল-নিকাশের জন্য ফাঁপা নল সংযুক্ত ছিল। কত দীর্ঘ শতাব্দীর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় মাথায় করিয়া ও বারবার শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিয়াও,বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক বীর সেকেন্দার সাহের দিগ্বিজয়ের সময় বাবিলনের চারিপার্শ্বের প্রাচীর প্রায় পঞ্চাশ হাত উচ্চ ছিল এবং এত প্রশস্ত ছিল যে, ইহার শীর্ষদেশে চারিখানি চতুরশ্ব যান পাশাপাশি ছুটিয়া যাইতে পারিত। প্রাচীরের উপরিভাগে সহর-রক্ষীগণের জন্য প্রায় আড়াইশত চূড়াবিশিষ্ট কক্ষ ছিল। প্রাচীরের বাহিরে চারিপার্শ্বেই প্রসর ও গভীর পরিখা বেষ্টিত ছিল।

একশত তোরণ-দ্বার হইতে সহরে প্রবেশ করিবার একশত প্রশস্ত পথ ছিল। সহরের ভিতর পথের দুইপাশে বড় বড় চতুষ্কোণ অট্টালিকা ছিল। প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগে চারিদিকের অনেকখানি জমি ছাড়িয়া রাখিয়া সহরের পত্তন করা হইয়াছিল। এই জমি নগরবাসিগণের বিহারের জন্য সাধারণ উদ্যান-রূপে ব্যবহৃত হইত এবং নগর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে এই জমিতে শাক-সব্জী ও শষ্য প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া সহরবাসীরা আত্মরক্ষা করিত। য়ুফ্রেটিস্ নদীটিকে এই সহরের ঠিক মাঝামাঝি রাখা হইয়াছিল। নদীর দুইপারে সহরটি ঠিক দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সহরের ভিতর নদীর দুই তীর প্রস্তর-

বৃতি বেষ্টিত ছিল। সহরের দুই দিক হইতে যে পঁচিশটি পথ নদীর ধার পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছিল, সেই পঁচিশটি পথের শেষেই পঁচিশটি খেয়াঘাট বাঁধান ছিল। এই সকল খেয়াঘাটে পথিকদের পারাপারের সুবন্দোবস্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন একটী ভাসমান সেতু ও নদীগর্ভে একটী সুড়ঙ্গপথও নির্ম্মিত ছিল। সহরের অট্টালিকাগুলি অধিকাংশই ত্রিতল ও চারিতল বিশিষ্ট ছিল। খিলানের কাজ অপেক্ষা কড়ি-বরগার ব্যবহারই সে সময়ে সমধিক প্রচলিত ছিল।

সহরের মধ্যে স্থাপত্য-শিল্পের হিসাবে রাজপ্রাসাদই সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য ছিল, তারপরই তাহাদের জাতীয় দেবতা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু 'বেলশে'র মন্দির। সপ্তচূড়াবিশিষ্ট পৃথিবীর এই প্রাচীনতম সুবৃহৎ দেবমন্দির সম্বন্ধে গ্রীক পর্য্যটক হেরোডোটাস (Herodotus) ও দায়োদোরাস্ (Diodorus) অতি চমৎকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরাভ্যন্তরে সুবর্ণ-নির্ম্মিত তিনটী প্রকাণ্ড বিগ্রহমূর্ত্তি ছিল। একটী 'বেলশের', একটী 'বেল্‌তীশের' ও একটী 'ড়ীয়া' বা 'ইশতার' মূর্ত্তি। বেল্‌তীশের মূর্ত্তির সম্মুখে দুইটী স্বর্ণ-সিংহ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দুই অজগর স্থাপিত ছিল। প্রত্যেকটী ওজনে প্রায় ত্রিশ সের। এই মূর্ত্তিত্রয়ের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড সুবর্ণ-বেদী ছিল। বেদিটী আকারে প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা এবং পনেরো ফুট প্রশস্ত ছিল। এই বেদীর উপর দুইটি বৃহদাকারের রজত-পানপাত্র স্থাপিত ছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে দুইটী প্রকাণ্ড ধূপদান ও বিগ্রহত্রয়ের পূজার জন্য তিনটী সুবর্ণের পঞ্চপাত্র ছিল।

য়ুফ্রেটিস নদীর উভয় তীরেই পরস্পরের সম্মুখীন দুইটী রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উভয় প্রাসাদই ইষ্টক, প্রস্তর ও সিমেণ্ট দিয়া গঠিত। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে তাম্রপাতে আবৃত সুদীর্ঘ দেবদারু কাণ্ডের স্তম্ভ পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাসাদের শিখরদেশ 'ব্রঞ্জে'র চূড়াবিশিষ্ট ও খিলান-সংযুক্ত ছিল। তোরণ-দ্বার স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত এবং অসংখ্য বহুমূল্য হীরকাদি রত্নখচিত ছিল। নৃপতি নেবুকাদ্‌নেজারের আদেশে ও তত্ত্বাবধানে এই দুই রাজপ্রাসাদ গঠিত হইয়াছিল। পৃথিবীর আর কোন দেশেই এমন বিরাট রাজপ্রাসাদ ছিল না। সহরের প্রায় সাত মাইল স্থান অধিকার করিয়া এই রাজ-প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। 'কাসার' স্তূপ খনন করিবার সময় নেবুকাদ্‌নেজারের নামাঙ্কিত ইষ্টক ও শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে।

এই রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরেই অবনীর সপ্তম আশ্চর্য্যের একতম বস্তু সেই বিশ্ববিশ্রুত "দোদুল বাগান" (Hanging Garden) দোলায়মান ছিল। কথিত আছে যে, নৃপতি নেবুকাদ্‌নেজার তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তমা আসুরীয় মহিষী 'অমাইতীশের' মনোরঞ্জনের জন্য বহুযত্নে ও অগাধ অর্থ-ব্যয়ে এই উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। আসুরীয় সুন্দরী গিরি-নন্দিনী—রাণী অমাইতীশের বাবিলনের সমতলক্ষেত্র নাকি পছন্দ হয় নাই—তাই মহারাজ প্রেয়সীর প্রীতির উদ্দেশ্যে, আসুরীয়ার পার্ব্বত্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যটুকুও বাবিলনের সমভূমির ভিতর সৃষ্টি করিয়া, এক অসাধ্য-সাধন করিয়াছিলেন।

নাইনিভে, বাবিলন অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র

সহর। ইহার পরিধির পরিমাপ তিন মাইলের অধিক ছিল না এবং প্রস্থে মাত্র দেড়মাইল বিস্তৃত ছিল। বাবিলনের সহিত ইহার তুলনাই হয় না, তথাপি এই নাইনিভেই ছয়-শত বৎসর ধরিয়া বাবিলন শাসন করিয়াছিল। বাবিলন-সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এই আসুরীয় রাজধানী নাইনিভে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছিল। দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য-জাতি আসুরীয়েরা সুসভ্য বাবিলনের নিকট অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া পরিগণিত ছিল। ছয় শত বৎসর আসুরীয়গণের অধীনে থাকিয়াও বাবিলন তাহাদের নিকট হইতে নূতন কিছুই পায় নাই ; অপরপক্ষে এই বিজিত জাতির নিকটই আসুরীয়গণ তাহাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সামাজিক প্রথার জন্য সম্পূর্ণ ঋণী। কোন কিছু গঠন করা বা সৃষ্টি করার ক্ষমতা ইহাদের কোনদিনই ছিল না। ইতিহাস ইহাদিগকে নিষ্ঠুর, রণপিপাসু, ধ্বংসপ্রিয় ও দুর্দ্দান্ত পার্ব্বত্যজাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। বাবিলনের সম্পর্কে আসিয়া ইহারা ক্রমে ভদ্র হইয়া উঠে।

নাইনিভের প্রধান বিস্ময়ের সামগ্রী ছিল, সম্রাট সেন্নাচরীবের রাজপ্রাসাদ। নৃপতি 'ইসারহাদ্দন' ও 'আসুর-বাণীপালে'র প্রাসাদ-দ্বয়ও স্থাপত্য ও শিল্প-সৌন্দর্য্যে উহার সমকক্ষ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই রাজপ্রাসাদগুলির সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব ছিল, উহাদের বিরাট আকৃতি এবং ভিত্তিগাত্রের অদ্ভুত ভাস্কর্য্য। আসুরীয়ার এই আশ্চর্য্য ভাস্কর্য্য শিল্প, উহার সেই দৃঢ়, সতেজ ও বাস্তব ভঙ্গী জগতের প্রাচীন কলা-সম্পদের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। নাইনিভের প্রকাণ্ড পক্ষীরাজ বৃষভ ও অর্দ্ধনারী মূর্ত্তি (Sphinxes) মিশরীয় কল্পনার অনুকৃতি হইলেও, ইহার উপর আসুরীয় কলার একটা নিজস্ব বিশেষত্বের যে স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছিল, তাহা হইতে ঐ ভীম-ভৈরব ভাস্করগণের স্বজাতিবৃন্দের একটা দুর্দ্দান্ত চরিত্রের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়।

নাইনিভে ব্যতীত আরও তিনটী প্রাচীন আসুরীয় সহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নাইনিভের ষাট মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান কাল্‌হে-শোরিয়াৎ নামক স্থানে আসুরীয়ার আদি রাজধানী 'আসুর'। দশ মাইল উত্তরে বর্ত্তমান খোর্শাবাদের নিকট নৃপতি শার্গনের প্রতিষ্ঠিত "দ্বারশার্গীনা", এবং ত্রিশ মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান নীমরূদ্‌ প্রদেশে 'কালাহ' নগরের অস্তিত্বের প্রচুর নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কালাহ যখন আসুরীয় রাজধানী ছিল, নাইনীভে তখন একটী প্রাদেশিক সহরের মধ্যে পরিগণিত ছিল। খৃঃ পূঃ ৮৮৩ হইতে ৮৫৮ অব্দের মধ্যে, প্রবলপ্রতাপান্বিত আসুরীয়রাজ বীরশ্রেষ্ঠ 'অসুর-আইজীরপালে'র রাজত্ব-কালে 'কালাহ' সর্ব্বগৌরবে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। নৃপতি অসুর-আইজীর-পাল শুধুই যে একজন নিষ্ঠুর রণোন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তাহা নহে, সুচারু কারুকলা ও শিল্প-সৌন্দর্য্যেরও তিনি একান্ত মুগ্ধ উপাসক ছিলেন। কালাহ নগরে তিনি যে অপরূপ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার অতুল শিল্প-শোভার যশোগান অনেক প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রিটীশ মিউজিয়মে এই অতি-নিষ্ঠুর অথচ শিল্প-সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত পক্ষপাতি নৃপতি অসুর-আইজীরপালের একটী গম্ভীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই প্রতিমূর্ত্তি তদানীন্তন ভাস্কর্য্য-শিল্পের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। মূর্ত্তিটী দেখিবামাত্র দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে দুইসহস্র বৎসর পূর্ব্বের এই অসাধারণ মানুষটীর অদ্ভুত চরিত্র যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে! প্রতিমূর্ত্তির প্রত্যেক অংশে পরিস্ফুট একটা নির্দ্দয় দুর্দ্ধর্ষতার ভৈরব ভাব দর্শকের অন্তরে প্রথমে ভীতির সঞ্চার করে, অথচ সেইসঙ্গে অতি আশ্চর্য্য কৌশলে গঠিত এই মূর্ত্তিটি, রাজার অপরিসীম সৌন্দর্য্য-পিপাসার পরিচয়টুকুও সুপ্রকাশ করিয়া দেয়!

অসীম আসুরীয় শক্তি ও সুকুমার শিল্পের সম্মিলিত বিচিত্র লীলাক্ষেত্র কালাহ কালের অতল গর্ভে আজ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

বাবিরুষেরা যে মেদিশজাতির সাহায্যে আসুরীয় অধীনতা-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া স্বদেশের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিল, সেই মেদীশ নৃপতি সায়াক্সারীস্ বাবিলনের সহিত মিত্রতা-সূচক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বহুদিন পশ্চিম এশিয়ার রাজত্বের অর্দ্ধাংশ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু মেদিশগণের প্রতিবেশী সামন্ত নৃপতি পারস্যরাজ সাইরাশ খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে সায়াক্সারীস্‌কে পরাজিত করিয়া, মেদিশ অধিকার করেন এবং ক্রমশঃ উহা পারস্য-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। খৃঃ পূঃ ৫৩৯ অব্দে পারস্যরাজ সাইরাশ বাবিলনও জয় করিয়াছিলেন। বেলশাজার ভোজের রাত্রে (Belshazzar's Feast) বাবিলনে মহা উৎসব চলিতেছিল; সমস্ত নগর উদ্দাম আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত, সহর-রক্ষী সৈনিকেরা এবং নদীপথে ঘাটের প্রহরীরাও উৎসব উপলক্ষে ছুটি পাইয়া সেদিন আনন্দে গা ঢালিয়া দিয়াছে, সেই সুযোগে সাইরাশ অসংখ্য সৈন্য লইয়া ঝড়ের মত বেগে বাবিলনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নিমেষের মধ্যে বাবিলনের চারিদিকে সাইরাশ-বাহিনীর শত শত মশালের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রলয়ের ধূম উদ্গীরণ করিয়া একত্রে জ্বলিয়া উঠিল; সহস্র অসির ভীম ঝনৎকার উৎসবের গীতবাদ্যকে দেখিতে দেখিতে রোদনের হাহাকারে পরিণত করিয়া দিল। চাল্‌দী নৃপতি বেলশাজার সাইরাশের অতর্কিত আক্রমণে আহত হইয়া সেইরাত্রে চিরনিদ্রায় শয়ন করিলেন। দানিয়েলের বর্ণিত 'বেলশাজার ভোজ' (Daniel's "Belshazar's Feast.") বাল্যকালে বোধ হয় অনেকেই পড়িয়াছেন।

মেদিশদের একমাত্র গর্ব্বের ধন ছিল, তাহাদের রাজধানী 'এচাতনা'। পারস্যের অধীনে আসিবার পর এচাতনার রাজপ্রাসাদ পারস্য নৃপতিগণের নিদাঘ-আবাসে পরিণত হইয়াছিল, কারণ এচাতনা উত্তর প্রদেশের পর্ব্বতের উপর স্থাপিত বলিয়া গ্রীষ্মের সময়ও সেখানে বেশ শীতানুভব হইত। পারস্যের আদি ও প্রাচীনতম রাজধানী ছিল 'পাশার-গার্দ্দে' নগর, যেখানে এক্ষণ বর্ত্তমান 'মুরঘাব' সহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুরঘাবের সন্নিকটে পাশারগার্দ্দের বিচূর্ণ ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানেই মহারাজ সাইরাশের মৃতদেহ কবরশায়ী হইয়াছিল। সাই-রাশের সমাধি-মন্দির এখনও অটুট আছে বটে,

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার সুবর্ণ-নির্ম্মিত ও অশেষ কারুকার্য্যখচিত শবাধারটী অনেক দিন হইল অন্তর্হিত হইয়াছে। তারপর পারস্যের রাজধানী হইয়াছিল 'শুসা' নগর, এখন যাহা শুস্তার নামে অভিহিত হইতেছে। এইখানে প্রসিদ্ধ পারস্য নৃপতি দারিয়ুশ তাঁহার প্রথম রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সেই প্রাসাদের মধ্যে তাঁহার প্রধান ধনাগার রক্ষিত ছিল। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার সাহ (Alexander the Great) যখন পারস্য জয় করেন, তখন তিনি এই ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর অর্থ সম্পদ হস্তগত করিয়াছিলেন। পারস্যের রাজধানীগুলির মধ্যে শেষে সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে 'পার্শিপলিশ'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত ছিল। দারিয়ুশ, জারাক্সেস্ এবং আর্ত্তাজারাক্সেসের নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদগুলির ভগ্নাবশেষ হইতে, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

জারাক্সেসের মনোহর বিচিত্র রাজপ্রাসাদ সেকেন্দারসাহ স্বহস্তে ধ্বংস করিয়াছিলেন। পার্শিপলিশ অধিকার করিয়া গ্রীক বাহিনী যেদিন বিজয়োৎসবে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, সেদিনের আনন্দ-বাসরে, গ্রীকরাজসভার সুপ্রসিদ্ধা নর্ত্তকী, আথেন্সের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী থেয়াস্ প্রস্তাব করিলেন যে, জারাক্সেস্ যেমন গ্রীসের দেবমন্দিরগুলি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ জারাক্সেস্-নির্ম্মিত এই রাজপ্রাসাদ আজ অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করা হউক! সুরাপানোন্মত্ত সেকেন্দার সাহ'র পার্শ্বচরগণ তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মত হইল এবং

আসুরিয়ার ভাস্কর্য্য

সম্রাটকে স্বহস্তে প্রথম অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। সেকেন্দার সাহ বিজয়ীবীরগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, গীতবাদ্য ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে মহা সমারোহে তিনি জারাক্সেসের অতুল রাজপ্রাসাদে প্রথম অগ্নি সংকার করিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তিনি এজন্য অনুতপ্ত হইয়া সত্বর অগ্নি নির্ব্বাপনের আদেশ দিয়াছিলেন এবং প্রজ্বলিত

ব্যাবিলনের স্থাপত্য

করিয়া শেষে খৃঃ পূঃ ৭৩২ অব্দে আসুরীয়ার অধীন হইয়া পড়ে। এখনও দামাস্কাস সিরিয়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর বলিয়া পরিগণিত।

দামাস্কাসের পূর্ব্বপ্রান্তে, সিরিয়ার মরুভূমির পরপারে, পামিরীন প্রদেশ খরস্রোত য়ুফ্রেটিসের সুপ্রচুর স্নেহধারায় সিক্ত হইয়া ফল-জল-শস্য-শ্যামল-সুন্দর শ্রীধারণ করিয়াছিল। এই খানেই ইতিহাস-বিশ্রুত মহিমময়ী মহারাণী 'জেনোবিয়ার' সুরম্য রাজধানী 'পামীরা' অবস্থিত ছিল। পামীরার প্রাচীন গৌরবের প্রচুর ধ্বংসাবশেষ এখনও স্তূপাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। পামীরার প্রতাপশালিনী অধীশ্বরী রাণী জেনোবিয়া ২৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিরিয়া, মিশর ও এশিয়ার পশ্চিমাংশের অনেকখানি পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন, পরে রোমের অধীনতা স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায়,— বিজয়ী 'অরেলিয়ান' তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া লইয়া যন। রাণী জেনোবিয়ার সঙ্গে সঙ্গে পামীরার রাজলক্ষ্মীও চিরদিনের মত নির্ব্বাসিতা হইলেন।

পূর্ব্ব জগতের এই সব প্রাচীনতম রাজধানীই বিশ্বমানবের জ্ঞান ও আধ্যাত্মশক্তির আদিম জন্মভূমি। এইখানেই মানুষ আজ মানুষ বলিয়া যাহা-কিছুর জন্য গর্ব্ব করিতে পারে, তাহার প্রথম বিকাশ দেখা গিয়াছিল।

রাজপ্রাসাদের কতকটা গৌরব-সম্পদ রক্ষা করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেকেন্দার সাহ'র প্রধান সেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ সেল্যুকাস্ সিরীয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল 'অ্যান্টিয়োক্'। ইনি বাবিলনও জয় করিয়াছিলেন এবং ইঁহার বংশধরেরা খ্রীঃ পূঃ ৩১২ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত সিরিয়া শাসন করিয়াছিলেন। পরে সিরিয়া 'পম্পের' অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রাচীন সিরিয়ার আদি রাজধানী ছিল দামাস্কাস্। দামাস্কাস বহুবার আসুরীয়গণের আক্রমণ ব্যর্থ

অসংখ্য দেবদেবীর পূজা, আবার একমেবাদ্বিতী-য়ের উপাসনা এইখানেই প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল। মানুষের বুদ্ধি, মানুষের বিবেক এইখানেই প্রথম আপনার আত্মা ও অস্তিত্ব লইয়া দর্শনের সেই সূক্ষ্মতম তত্ত্বের চিন্তা ও আলোচনা করিতে সুরু করিয়াছিল। এইখানেই মানুষ প্রথম সৃষ্টি ও বিশ্বরহস্যের যবনিকা উদ্ঘাটন মানসে জড়বিজ্ঞানের প্রথম সোপান নির্ম্মাণ করিয়া, তত্ত্বানুসন্ধানের একটা ধারাবাহিক পথ দেখাইয়া দিয়াছে। এইখানেই সুকুমার কারুকলার প্রথম বিকাশে সর্ব্বাগ্রে মানুষের অন্তর্নিহিত একটা সৌন্দর্য্য-পিপাসার গোপন বার্ত্তা বিশ্বের নিকট প্রথম ব্যক্ত হইয়াছে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনীয় যে নব নব শিল্প-সম্ভার নিত্যই সৃষ্টি হইতেছে, এইখানেই তাহার সর্ব্বপ্রথম সূচনা হইয়াছিল। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, ব্যবহার, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, অক্ষরলিপি ও হস্তলিখন, কবিতা, গল্প ও কল্পনার নানা বিচিত্র বিকাশ এই সকল দেশকেই প্রথম উদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাই বোধ হয় আজও এই সকল দেশের নাম শুনিলেই জ্যোৎস্নাস্নাত পূর্ণিমারাত্রে প্রিয়তমের পার্শ্বে বসিয়া প্রেমের কবিতা শোনার মত, একটা অপার্থিব আনন্দ-ধারায় দেহমন অভিষিক্ত হইয়া দেয়।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

কুস্তি, যুযুৎসু ও মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি ব্যায়াম এক-একটা জাতির জীবনের পরিচয় দেয়। পৃথিবীর যে-সব জাতি এখনো দেহে-মনে জ্যান্ত আছে, তাহাদের সকলের ভিতরেই এই-সব ব্যায়ামের রীতিমত উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়—কারণ এগুলি হইতেছে, জীবনের চাঞ্চল্য। কেবল মনের চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া, জ্ঞান-বুদ্ধির চাষ করিয়া কোন জাতিই এই বীরভোগ্যা ধরণীতে বেশীদিন বাঁচিতে পারে না। দেহকে অবহেলা করিয়া মন বা মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখা অসম্ভব।

অথচ বাঙালী জাতির আজকাল সেই দুর্দ্দশাই হইয়াছে। য়ুরোপ-আমেরিকায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবক বা কলাবিদ যতটা আদর পান, কোন বড় পালোয়ানের সম্মান তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু বাঙলাদেশে পালোয়ানদের সম্মান একরকম নাই বলিলেও চলে,—কেননা, বিদ্বান বাঙালী পালোয়ানীকে মূর্খের কাজ বলিয়া উপেক্ষা প্রকাশ করে!

ভারতের যে-সব জাতি আমাদের মত এতটা নির্জ্জীব নয়, তাহাদের মধ্যে এখনো দৈহিক বল-বীর্য্যের চর্চ্চা ও আদর যথেষ্টই আছে। বাঙলাদেশে এক যতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবরবাবু) ছাড়া উল্লেখযোগ্য পালোয়ান আর আছেন কিনা, জানিনা। কিন্তু অন্যান্য দেশে পালোয়ানের নাম অগুন্তি। বেণীওয়ালা,

জনসনের হাতে বার্ণস্ মার খাইতেছে

ও 'নির্ব্বোধ' পাঞ্জাবী বা কাবুলী-ওয়ালাকে কোন সাহেব কি অপমান করিতে সাহস পায়? বাঙালী যেখানে ঘুসি-জুতা তেঁত ওষুধের মত হজম করিয়া আসিয়া খবরের কাগজের কলমের উপর কলম বাগাইয়া বসে, অন্যান্য সবল জাতি সে-ক্ষেত্রে হাতে হাতে সুদে-আসলে ঘুসি-জুতা চট্‌পট্ ফিরাইয়া দেয়!

আসল কথা, আত্মরক্ষার জন্যও বাঙালীর পক্ষে এখন উপযোগী ব্যায়াম-কৌশল শিক্ষা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের মাসিক পত্রাদিতে এ-সব বিষয়ে কোন আলোচনাই প্রায় দেখা যায় না। সকলকার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরা
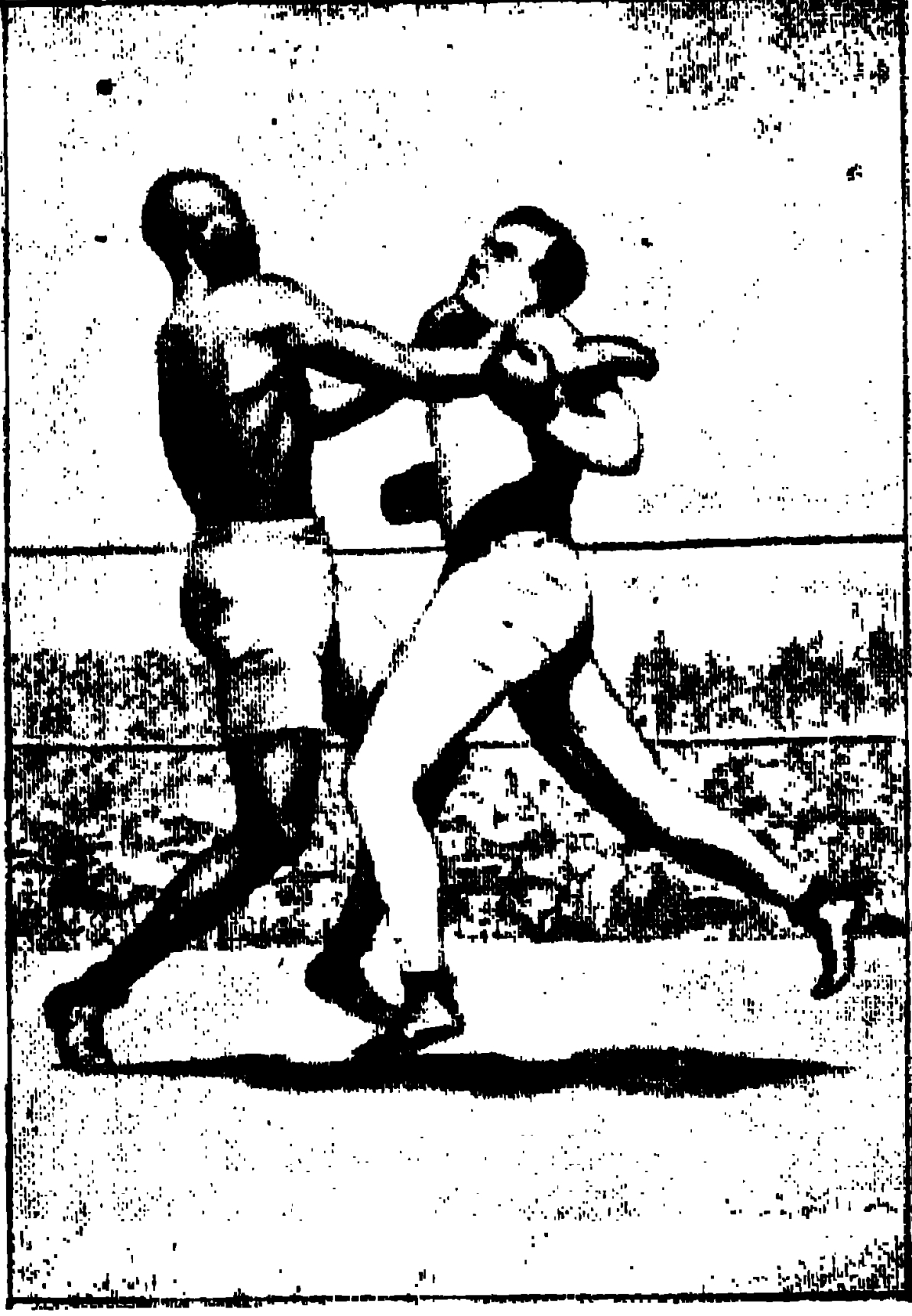
গোলাম, কিক্কর সিং, সুচেৎ সিং, কাল্লু, গামা, ইমামবক্স, হোসেনবক্স ও গুট্টা সিং প্রভৃতি অধিকাংশ দিগ্বিজয়ী পালোয়ানকে আমরা ভারতবাসী বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি বটে, কিন্তু বাঙালী বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারি না।

দেহে দুর্ব্বল বলিয়া বিদেশীরাও আমাদিগকে মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করে না। ঘরের বাহিরে রাজপথে বা রেলপথে সাহেবদের ঘুসি ও জুতা ত আমাদের প্রতিদিনের সুলভ 'আহার্য্য',—বিদ্বান, প্রতিভাবান বা ধনবান বলিয়া আমরা কেহই রেহাই পাই না। কিন্তু একজন গরীব, 'মূর্খ'

এবারে মুষ্টিযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিব। বারান্তরে ভারতের পালোয়ান-দের সম্বন্ধেও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আত্মরক্ষার পক্ষে মুষ্টিযুদ্ধের মত উপকারী ব্যাপার আর খুব কমই আছে। একজন মাঝারি দরের মুষ্টিযোদ্ধা বেশ উঁচুদরের একজন কুস্তিগীর পালোয়ানকেও রীতিমত কাহিল করিয়া দিতে পারে। যিনি বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে মুষ্টি ব্যবহার করিতে জানেন, পথে-বিপথে হঠাৎ আক্রান্ত হইলে, চার-পাঁচজন মহা-বলবান লোককেও অনায়াসে ভূতলশায়ী করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত

জনসন, জেফ্রিসের ঘুসি এড়াইয়া সরিয়া যাইতেছেন

শিখিতে হয়। মানুষের দেহে প্রধানত চারটি জায়গার উপরে মুষ্টিযোদ্ধাদের লক্ষ্য থাকে, সে-সব জায়গায় ঘুসি লাগিলে লোকে হয় অজ্ঞান, নয় অত্যন্ত কাবু হইয়া যায়। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের প্যাঁচ বা প্রণালী লইয়া এই সংক্ষিপ্ত স্থানে উপযুক্ত আলোচনা করা সম্ভবপর নয়—বিশেষ, সে বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতাও অসম্পূর্ণ, সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা খালি মুষ্টিযুদ্ধের একটি মোটামুটি ইতিহাস দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

ভারতবর্ষেও পূর্ব্বে যে মুষ্টি-যুদ্ধের প্রচলন ছিল, প্রাচীন পুরাণ ও কাব্যাদিতে তাহার কিছু-কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।
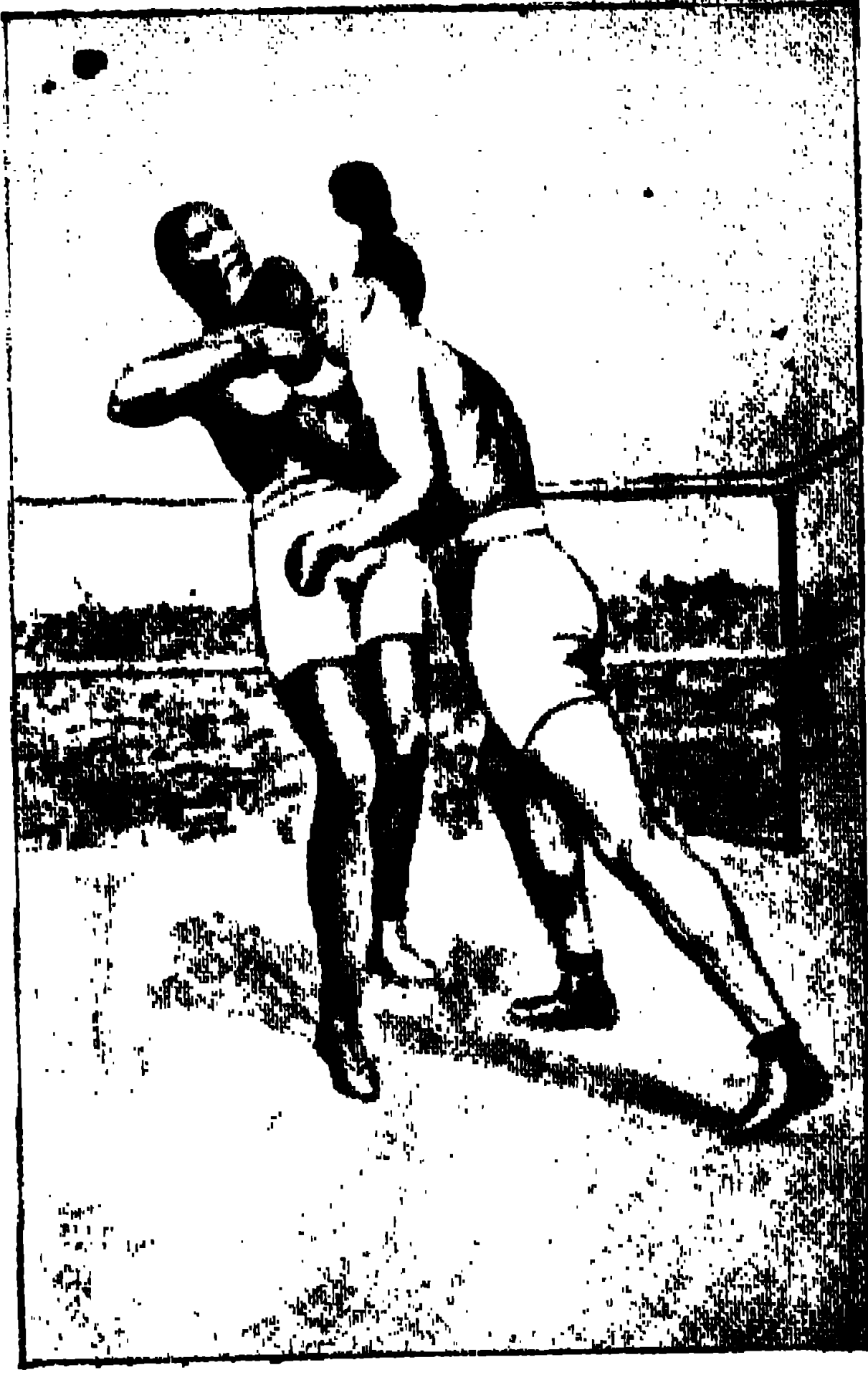
কঠিন কার্য্য নয়। সাধারণত আনাড়ীরা যে ভাবে ঘুসি লড়ে, তাহাতে শক্তির অপচয় হয় মাত্র,—তাহাতে বাতাসে হাত-নাড়া হয় যথেষ্ট, কিন্তু প্রতিপক্ষকে ঘুসি-মারা আর হইয়া ওঠে না, বা মারিতে পারিলেও ঘুসিটা ঠিক জায়গায় উচিতমত জোরের সঙ্গে গিয়া পড়ে না। মুষ্টিযুদ্ধে যাঁহারা ওস্তাদ, তাঁহারা চোখের নিমেষে একটি-মাত্র ঘুসিতে প্রতিপক্ষকে একেবারে অজ্ঞান করিয়া দিতে পারেন। কুস্তির মত মুষ্টি-যুদ্ধেও, দাঁড়াইবার কায়দা, পাঁয়তারা ও অসংখ্য বিখ্যাত প্যাঁচ আছে, সে-সব নিয়মিতভাবে দস্তুরমত অভ্যাস করিয়া

কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের আর্ট বিশেষভাবে বিকসিত হইয়াছে পাশ্চাত্যদেশে। এদিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকাই প্রধান, আজকাল ফ্রান্স ও বেলজিয়মেও মুষ্টিযুদ্ধের আদর ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।

সেকালে বিলাতের লোকেরা ঘুসির লড়াই অত্যন্ত ভালোবাসিত। এমন-কি বাইরণ, কীট্‌স্ ও ল্যাণ্ডর প্রভৃতি বাণীর বরপুত্ররাও তখন মুষ্টিযুদ্ধ লইয়া মাতিয়া থাকিতেন, তাঁহাদের ঘুসির লড়ায়ের অনেক গল্প এখনো বিখ্যাত হইয়া আছে।

তখনকার পেশাদার ওস্তাদরা খালি হাতে ঘুসি লড়িতেন। এখন হাতে মোটা,
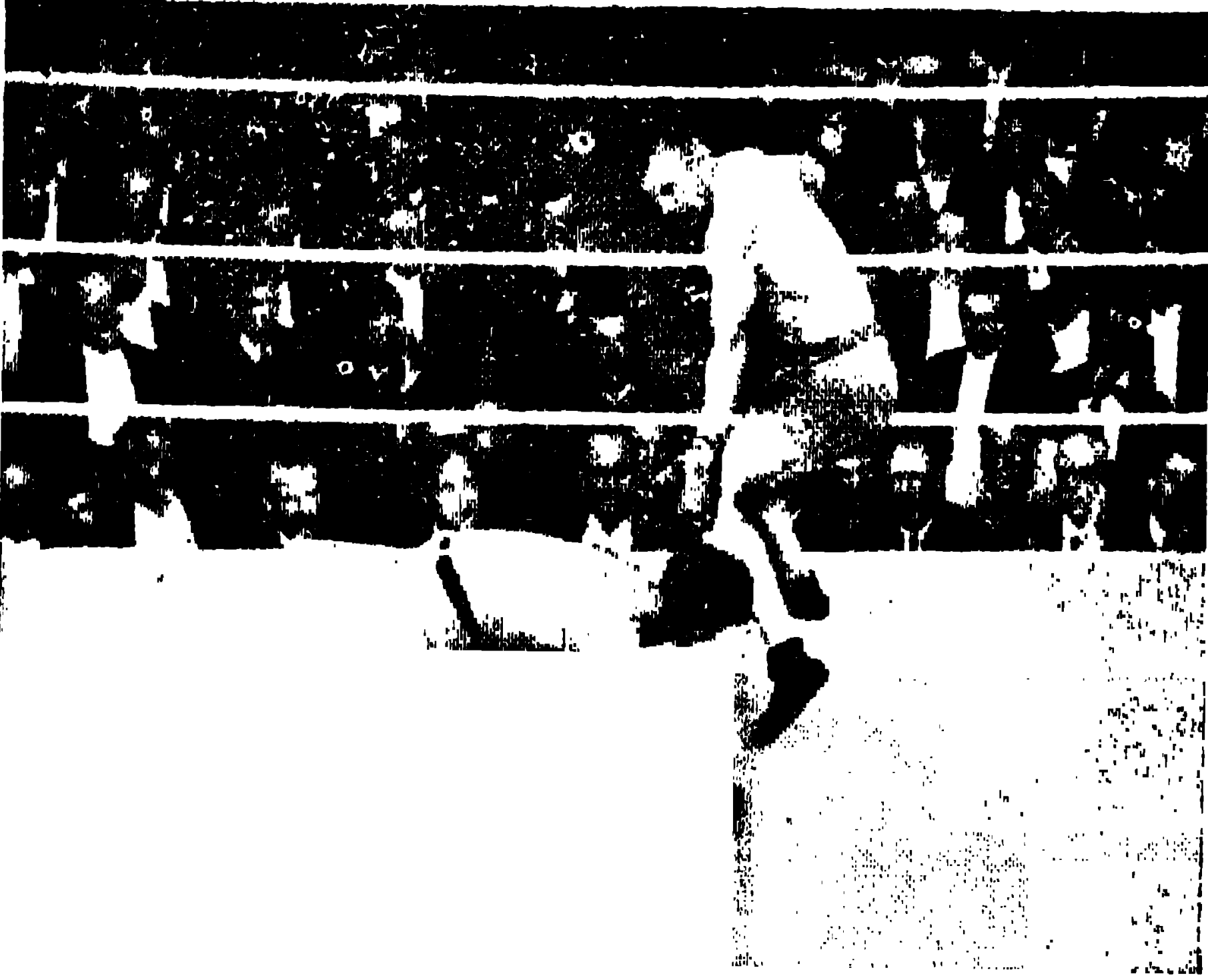
কার্পেনটিয়ার ও স্মিথের মুষ্টিযুদ্ধ

দস্তানা পরিয়া ঘুসি-লড়া হয় বলিয়া, যোদ্ধাদের হাত-গা-মুখ ফাটিয়া তত বেশী রক্তারক্তি হয় না। তারপর সেকালে লড়ায়ের সময়ও নির্দ্দিষ্ট থাকিত না। ক্রমাগত ঘুসাঘুসির পর যতক্ষণ-না একজন যোদ্ধা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও বেদম হইয়া পড়িত, প্রায়ই ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুরা জোরে লড়াই চলিত। কিন্তু আজকাল লড়ায়ের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে। তাহার উপরে এখন ঘুসি খাইয়া ভূতলশায়ী হইয়া কোন যোদ্ধা যদি দশ সেকেণ্ডের মধ্যে গাত্রোত্থান করিতে না পারে, তবে তাহার হার সাব্যস্ত হইয়া যায়। এই শ্রেণীর ঘুসিকে "knock-out blow" বলা হয়। যে লড়ায়ে knock-out blow মারা হয় না, সেখানে যে যোদ্ধা বেশীবার তাহার প্রতিপক্ষকে ঘুসি মারিতে ও প্রতিপক্ষের ঘুসি এড়াইয়া সরিয়া আসিতে পারে (অবশ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে), তাহাকেই জেতা বলিয়া স্বীকার করা হয়। ইহা "Points"এর দ্বারা জয়লাভ বলিয়া বিখ্যাত। তাহার উপরে সেকালের লড়ায়ে আরো ঢের শক্ত নিয়ম ছিল—একালে যাহা নাই।

কিন্তু সেকালের লড়াই শক্ত ছিল বলিয়া যোদ্ধাগণকেও যথেষ্ট কৌশলী হইতে হইত। বিশেষজ্ঞদের মতে, সেকালের যোদ্ধাদের তুলনায় একালের যোদ্ধারা অনেকটা নীচুদরের হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অতঃপর কয়েকটি বিখ্যাত মুষ্টিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বলিব। সকলেই স্মরণ রাখিবেন, "ভারি ওজনের" (Heavy-Weight) পালোয়ানদের কথাই আমাদের আলোচ্য।

জেম বেল্‌চারের সঙ্গে টম ক্রিবের লড়াই হয় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে। বেল্‌চার "মুষ্টিযুদ্ধের নেপোলিয়ন" নামে বিখ্যাত। তাঁহার ঘুসির

কার্পেনটিয়ার

সকলদিকেই বারংবার ভূতলশায়ী ও আহত করিয়া অবশেষে দেব-গতিকে হাতের কব্জি মচকাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় এক-চল্লিশ মণ্ডল পর্য্যন্ত সমান-ভাবে যুঝিয়া, ক্রিবের হাতে শেষতঃ তাঁহাকে হার মানিতে হইল।

তাহার পরের বিখ্যাত মুষ্টিযুদ্ধ হয় বিলাতের টম সেয়ার্সের সঙ্গে আমেরিকার জন হিনানের (১৮২৬ খৃষ্টাব্দে)। সাঁইত্রিশ মণ্ডল পর্য্যন্ত এই লড়াই চলিয়াছিল। প্রায় তিনঘণ্টা-ব্যাপী অশ্রান্ত ঘুসাঘুসি করিতে করিতে সেয়ার্সের ডান হাতখানি ভাঙিয়া গেল এবং হিনান প্রায় অন্ধ হইয়া পড়িলেন,—তবু কিন্তু সেই বিষম লড়াই থামিল না। বিলাতে তখন মুষ্টিযুদ্ধ বে-আইনী ছিল! শেষটা হার-জিৎ হইবার আগেই তাই পুলিশ আসিয়া এই লড়াই থামাইয়া দেয়। এই প্রতিযোগিতায় অদ্ভুত সাহস ও সহ্যক্ষমতার পরিচয় দিয়া সেয়ার্স পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বখশিস পাইয়াছিলেন।

মুখে কেহই টিঁকিতে পারিত না। কিন্তু উদীয়মান মুষ্টিযোদ্ধা ক্রিবের সঙ্গে প্রতি-যোগিতার সময়ে তাঁহার একটি চোখ কাণা হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার যুঝিবার ক্ষমতাও কমিয়া আসিয়াছিল। এই চিত্তাকর্ষক প্রতি-যোগিতায় ডিউক অফ ক্লারেন্স (পরে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ম) প্রমুখ সমাজের উচ্চস্তরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এবং সেরিডান, বাইরণ ও মুর প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যসেবীরা দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। আঠারো মণ্ডল (round) পর্য্যন্ত বেলচার তাঁহার প্রতিযোগীকে

১৮'২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডজয়ী জেম মেসের সঙ্গে টম কিংএর মুষ্টিযুদ্ধ হয়। প্রথমবারে মেস তেতাল্লিশ মণ্ডলে কিংকে সম্পূর্ণরূপে

বেবেট

পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় সর্ব্বত্রই ঘুসি লড়িয়া দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং কিংএর পরে আর কেহই তাঁহাকে হারাইতে পারেন নাই। সাধারণত প্রথম শ্রেণীর মুষ্টিযোদ্ধারা ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই অনেকটা অকেজো হইয়া পড়েন, কিন্তু মেসের বয়স যখন চৌষট্টি বৎসর, তখনো উচ্চশ্রেণীর যুবক মুষ্টিযোদ্ধারা তাঁহার এক-একটা ঘুসি খাইয়া চোখের সাম্‌নে সর্ষেফুল দেখিত।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্বেতাঙ্গে-কৃষ্ণাঙ্গে প্রথম বিখ্যাত মুষ্টিযুদ্ধ হয়। পিটার জ্যাকসন জাতিতে কাফ্রি এবং ফ্রাঙ্ক স্লাভিন জাতিতে ইংরেজ—তাঁহার জন্মস্থান অষ্ট্রেলিয়া। পূর্ব্বোক্ত জেম মেসের বিখ্যাত ছাত্র ল্যারি ফলির কাছে হারাইয়া দেন। দ্বিতীয় বারেও প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত মেস আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন,—এমন-কি, কিং-এর জিতিবার আশা আর তিলমাত্র ছিল না। কিন্তু লড়িতে লড়িতে হঠাৎ দুর্ভাগ্য-ক্রমে মেসের পা একবার পিছলাইয়া যায় এবং সেই ফাঁকে কিং তাঁহার মুখের উপরে এমন এক ঘুসি বসাইয়া দেন যে, তাহার অল্পক্ষণ পরেই শক্তিহীন মেস পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। মেসের মত মুষ্টিযোদ্ধা পৃথিবীতে আর জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ! তিনি প্রায়
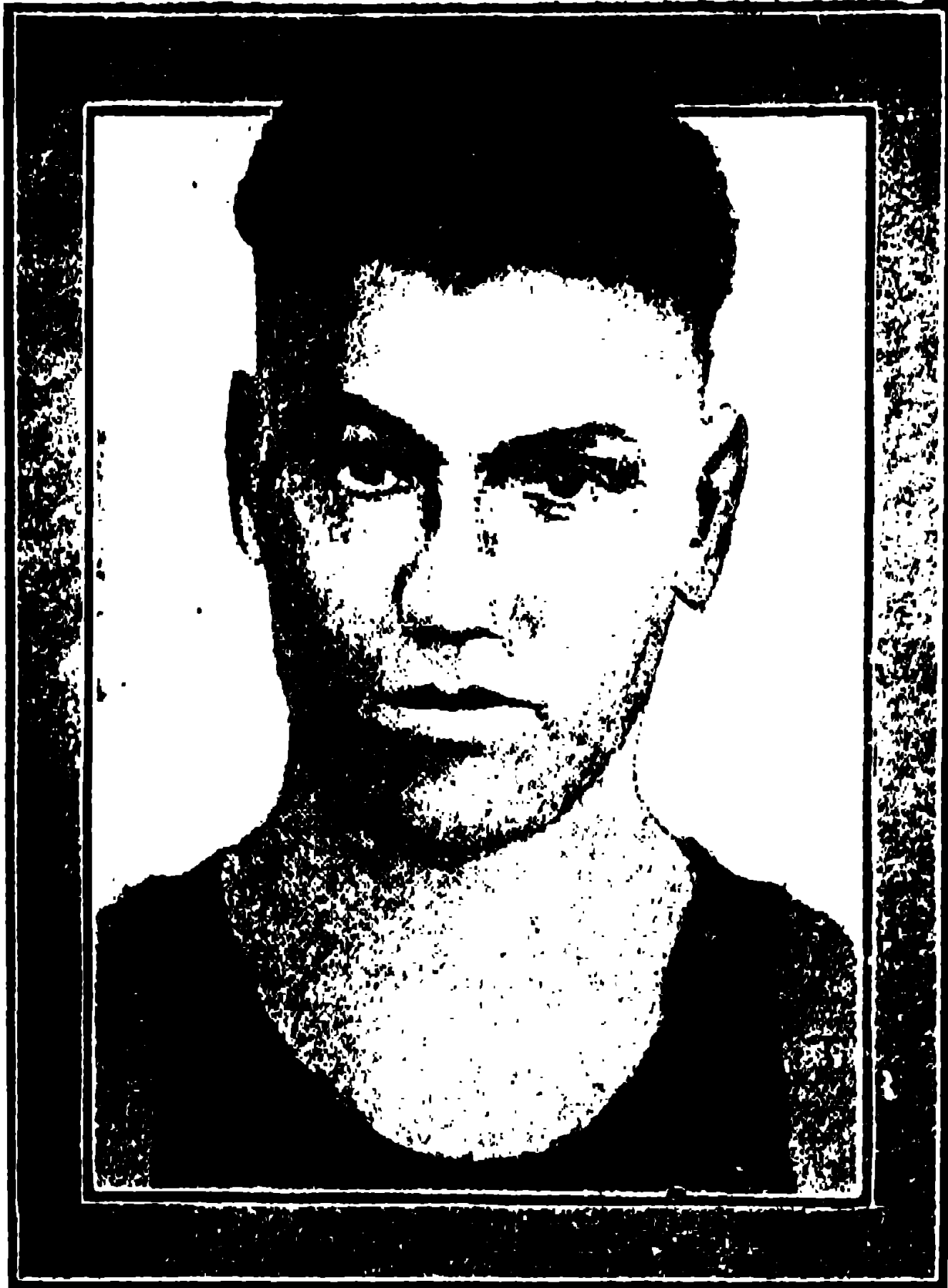
জ্যাক ডেম্প্‌সী

জ্যাকসন মুষ্টিযুদ্ধ শিখিয়াছিলেন। একবার ছাড়া জ্যাকসন জীবনে আর-কখনো পরাজিত হন নাই। স্ল্যাভিনও মুষ্টিযুদ্ধে পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন,তাঁহার বিষম ঘুসির মুখে কোন প্রতিপক্ষই বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিত না। ইংরেজরা তাঁহাকে অজেয় জানিয়া জ্যাকসনের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধের বন্দোবস্ত করেন।

যুদ্ধের দিন রঙ্গক্ষেত্র একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস, একজন কৃষ্ণাঙ্গ কখনো উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিযুদ্ধে শ্বেতাঙ্গকে পরাজিত করিতে পারিবে না! কিন্তু সকলকার বিশ্বাসই ভ্রান্ত হইল; কারণ নয় মণ্ডলের মধ্যেই জ্যাকসন অপূর্ব্ব নিপুণতা ও তৎপরতা দেখাইয়া স্ল্যাভিনকে কাবু করিয়া আনিলেন। তারপর দশম মণ্ডলের প্রথমেই জ্যাকসন তাঁহার প্রতিযোগীর চোয়ালে এমন এক ঘুসি মারিলেন যে, স্ল্যাভিন পড়িয়া না গেলেও অত্যন্ত অসহায় ও হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিলেন। জ্যাকসন ইচ্ছা করিলে তখন তাঁহার শ্বেতাঙ্গ প্রতিযোগীকে যত-খুসি মারিয়া হাড় ভাঙিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তা না করিয়া তিনি মধ্যস্থের (referee) দিকে ফিরিয়া সদয় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি এখনো লড়ব?" মধ্যস্থ নিয়মের বাহিরে যাইতে পারেন না, কাজেই তিনি বলিলেন,"লড়ো।"—"তা হলে বেচারীকে শেষ না ক'রে আমার আর রেহাই নেই? বেশ, তবে তাই হোক্!" এই বলিয়া জ্যাকসন ফিরিয়া, তাঁহার সেই স্তম্ভিত প্রতিযোগীকে খুব জোরে ঘুসি না মারিয়া, আস্তে আস্তে দু-চারিটা হাল্কা ঘুসিতে ধীরে ধীরে মাটিতে পাড়িয়া ফেলিলেন। কাফ্রিবীর জ্যাকসনের মহত্ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ দর্শকরা তাঁহার নামে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। বাস্তবিক, জ্যাকসনের মত করুণাভরা বীরত্ব আজ-পর্য্যন্ত আর-কোন মুষ্টিযোদ্ধাই দেখাইতে পারেন নাই।

ইহার পরে আর তিনটি প্রথম শ্রেণীর মুষ্টিযুদ্ধ হয়। কর্বেটের সঙ্গে সলিভ্যানের (১৮৯১), ফিজসিমন্সের সঙ্গে কর্বেটের (১৮৯৬) এবং জেফ্রিসের সঙ্গে ফিজসিমন্সের (১৮৯৯)। এই তিনটি যুদ্ধেই প্রথমোক্ত যোদ্ধারা জয়লাভ করেন।

তারপরেই মুষ্টিযুদ্ধে মহাবীর জ্যাক জনসনের আত্মপ্রকাশ। জনসনের সঙ্গে প্রথমে টমি বার্ণসের মুষ্টিযুদ্ধ হয়। জেফ্রিস তখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধা। বার্ণসের সঙ্গে জনসনের ঘুসির লড়াই হইবার কিছুদিন আগে, জেফ্রিস্ পৃথিবীর সমস্ত যোদ্ধাকে হারাইয়া এই বলিয়া রঙ্গক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, "যদি কোন কৃষ্ণাঙ্গ মুষ্টিযুদ্ধে প্রধান হয়ে ওঠে, তবেই আবার আমি ঘুসি লড়ব—নইলে এই পর্য্যন্ত।" তারপর গোলন্দাজ ময়েরকে হারাইয়া টমি বার্ণস্ "পৃথিবীজয়ী বীর" (Champion of the World) নামে সম্মানের উপাধি পান। এই সময়ে কাফ্রি-বীর জনসন মুষ্টিযুদ্ধে বিখ্যাত তিনজন কাফ্রি—স্যাম ম্যাক্ভিয়া, স্যাম ল্যাংফোর্ড ও জো জেনেটকে এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব "পৃথিবী-জয়ী বীর" ফিজসিমন্সকে মাত্র দুই মণ্ডলে হারাইয়া দিয়া বার্ণস্কে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বার্ণস্ প্রথম কিছুদিন তা-না-নানা করিয়া শেষটা নব্বই হাজার টাকা পুরস্কারের লোভে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জনসনের সঙ্গে রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু জনসনের লড়িবার কায়দা ছিল এমন আশ্চর্য্য

কে; বিড়াল যেমন ইঁদুরের সঙ্গে খেলা করে, তেমনি অবলীলায় তিনি বার্ণস্‌কে লইয়া যা-খুসি-তাই করিতে লাগিলেন। লড়িতে লড়িতে সহাস্যে তিনি বার্ণস্‌কে বলিলেন, "এস হে টমি, আমি তোমাকে নতুন-কিছু শিখিয়ে দেব!'—ক্রুদ্ধ টমি বার্ণস্ "ওরে পীত কুকুর!" বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া, এক ঘুসি খাইয়া মাটির উপরে ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। মারের চোটে বার্ণসের সর্ব্বাঙ্গে যখন রক্তের স্রোত,—তাঁহার প্রাণ যখন যায়-যায়, তখন পুলিস আসিয়া লড়াই থামাইয়া দিল। জনসন লড়াই জিতিয়া "পৃথিবী-জয়ী বীর" উপাধি লাভ করিলেন। শ্বেতাঙ্গরা যে কৃষ্ণাঙ্গদের একঘরে করিয়া আপনাদের মধ্যেই সম্মান ভাগ করিয়া নেয় এবং সুযোগ পাইলে কৃষ্ণাঙ্গরা যে শ্বেতাঙ্গদের অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারে, জনসন তাহা প্রমাণিত করিয়া দিলেন।

কিন্তু জনসনের জয়ে শ্বেতাঙ্গদের গাত্র-জ্বালার আর অবধি রহিল না। কালোর হাতে সাদার হার! ছি ছি—কি অপমান! অতএব 'স্বাধীনতা ও উদারতার ভক্ত' আমেরিকান তথা য়ুরোপীয়গণের প্রাণ আর কি ধৈর্য্য ধরিতে পারে? অবিলম্বে চারিদিকে দূত ছুটিল এবং সারা পৃথিবীতে জনসনকে হারাইতে পারে, এমন একজন শ্বেতাঙ্গকে খোঁজা হইতে লাগিল। পর বৎসরেই ষ্ট্যানলি কেচেল নামে একজন বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধাকে আনিয়া জনসনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। জনসন কিন্তু বারো মণ্ডলের মধ্যেই ঘুসি মারিয়া কেচেলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া, শ্বেতাঙ্গদের বড় আশার বাতি নিবাইয়া দিলেন। সকলে তখন জেফ্রিসের কাছে গিয়া এই বলিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িলেন—'এস জেফ্রিস্! এখন তুমি না লড়ায়ে নামলে, এই বেয়াদপ কালা আদমীর হাতে সাদার মান-মর্য্যাদা একেবারে লোপ পেয়ে যাবে!' প্রথমটা নানা ওজরে লড়িতে আপত্তি করিয়া, শেষটা শ্বেতাঙ্গদের মুখরক্ষার জন্য অপরাজিত মহাবীর জেফ্রিস্ আসিয়া রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। জেফ্রিস্ যেমন মত্তহস্তীর মত বিপুলবপু এবং ভয়ানক বলবান ছিলেন, তাঁহার ঘুসির প্রবলতা ও যুদ্ধপ্রণালীও তেমনি বিচিত্র ও নিখুঁত ছিল। শ্বেতাঙ্গরা বুঝিলেন, 'কালা আদমীটার আর বাঁচোয়া নাই, এইবার যাদু মজাটা টের পাবেন, জেফ্রিসের সঙ্গে কোন চালাকিই চলবে না!'

জেফ্রিসের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে জয়ী হওয়াই ছিল জনসনের জীবনের একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা। লড়ায়ের আগে জনসন বলিয়াছিলেন, "হাজার অর্থলোভ দেখালেও জেফ্রিসের সঙ্গে আমি 'সাজানো লড়াই' (fake fight) লড়ব না। কেন আমি জেফ্রিস্‌কে হারাতে উৎসুক? সাদা আদমীরা যাতে আমাকে মানতে বাধ্য হয়, যাতে তারা আমাদের চেয়ে খাটো হয়, আমি তাই করতে চাই! আমি তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাই যে, জ্যাক জনসন হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে সেরা যোদ্ধা—যদিও তার গায়ের চামড়া মিশ্‌মিশে কালো!"

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই জেফ্রিসের সঙ্গে জনসনের এই স্মরণীয় যুদ্ধ হয়। প্রথম ছয় মণ্ডল পর্য্যন্ত দুই যোদ্ধাই প্রায় সমান সমান গেলেন। জনসনের সঙ্গে আর কেহই এতক্ষণ ধরিয়া এমন কৌশলে লড়িতে পারে

নাই। দর্শকরা জেফ্রিসের নামে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু সপ্তম মণ্ডলে জনসন সজোরে ঘুসি মারিয়া জেফ্রিস্‌কে অনেকটা কাহিল করিয়া ফেলিলেন। তারপরের দুই মণ্ডলে জন্‌সনের মুষ্ট্যাঘাত ক্রমে এমন প্রচণ্ড হইয়া উঠিল যে, জেফ্রিসের সমস্ত মুখটা রক্তারক্ত, ছিন্নভিন্ন ও থ্যাৎলাইয়া গেল—যেন তাঁহার নাক-চোখ-ঠোঁট সব মাংসের মধ্যে চাপিয়া বসিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! সে এক অসহ দৃশ্য! যতই সময় যায়, জনসনের আক্রমণ ততই ভয়ানক হইয়া ওঠে। তাঁহার আত্মরক্ষার কায়দা এমন দুরন্ত ছিল যে, জেফ্রিসের ঘুসি তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিল না। জনসন কখনো জেফ্রিসের ক্ষতবিক্ষত মুখে দুইহাতে ঘুসির পর ঘুসি বৃষ্টি করেন, কখনো তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে চাপিয়া ধরেন, কখনো তাঁহার প্রায়-নির্জ্জীব দেহটাকে রঙ্গক্ষেত্রের এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যান,—জেফ্রিসের মত অমন মহাবলিষ্ঠ লোকের যে এমন শোচনীয় দুর্দ্দশা হইতে পারে, এতটা আগে কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই! জনসন একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ঘুসি তোমার কেমন মিষ্টি লাগচে জেফ্রিস্‌?" রক্তোচ্ছ্বাসে প্রায়-বদ্ধ স্বরে তেজের সঙ্গে জেফ্রিস্‌ উত্তর দিলেন, "আরে ছোঃ! এ কি আবার ঘুসির মত ঘুসি!" জনসন অম্‌নি তাঁহার মুখে আর এক ঘুসি বসাইয়া দিলেন। জেফ্রিস্‌ আর সহিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"উঃ!" পনেরো মণ্ডল পর্য্যন্ত জেফ্রিস্‌ অটলভাবে—নিশ্চিত পরাজয় জানিয়াও—জনসনের ঘুসি সহিয়াও কোনক্রমে খাড়া হইয়া রহিলেন। কিন্তু তার পরেই আর এক ঘুসি খাইয়া তিনি ছিট্‌কাইয়া মাটির উপরে পড়িয়া গেলেন। বিপক্ষের মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী হওয়ার অপমান,—তাঁহার জীবনে এই প্রথম। তবু তিনি ফের উঠিয়া দাঁড়াইলেন—আবার জনসনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন—কিন্তু দর্শকরা আর সেই রক্তারক্তির বিষম দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না, শ্বেতাঙ্গের জয়ের আশায় হতাশ হইয়া, জেফ্রিসের প্রাণরক্ষার জন্য সকলে মিলিয়া রঙ্গক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিল,—পুলিসের লোকেরা লড়াই বন্ধ করিয়া দিল, এবং মধ্যস্থ জনসনের জয় স্বীকার করিলেন।

এই লড়াই জিতিয়া শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে জনসনের অর্থ-সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়—এমন-কি তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি পড়ে। শুনা যায় শেষটা তাঁহাকে বলা হয়, যদি তিনি অনেক টাকা পুরস্কার লইয়া তাহার বিনিময়ে কোন শ্বেতাঙ্গের কাছে হার স্বীকার না করেন, তবে তাঁহাকে মহা বিপদে পড়িতে হইবে। কাজেই বাধ্য হইয়া জনসন্‌ শেষটা কৃত্রিম যুদ্ধে জেস উইলার্ড নামে একজন মাঝারি দরের যোদ্ধার কাছে হার মানিয়া, দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। জনসন এখন স্পেনদেশে আসিয়া বায়োস্কোপের অভিনেতা হইয়াছেন। শ্বেতাঙ্গরা স্বীকার না করিলেও, জনসনের মত মুষ্টিযোদ্ধা একালে আর এক-জনও দেখা যায় নাই। পেশাদার যোদ্ধা হইয়াও কাফ্রি-বীর জনসন অশিক্ষিত নন। সাহিত্যে ও দর্শনে তিনি সুপণ্ডিত।

জনসনের পর একালের মধ্যে মাত্র এক-জনের নাম উল্লেখযোগ্য,—তিনি জর্জেস কার্পেনটিয়ার, জাতিতে ফরাসী। তাঁহার মত

অল্প বয়সে আর-কোন মুষ্টিযোদ্ধা এত-বেশী নাম করিতে পারেন নাই। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি ফ্রান্সের "দিগ্বিজয়ী বীর" নামে উপাধি লাভ করেন। (১৯০৮) তারপর তিনি নানা ওজনের অসংখ্য বিখ্যাত যোদ্ধাকে হারাইয়া দিয়া, অবশেষে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ যোদ্ধা বোম্বাডিয়ার ওয়েলসকে উপর-উপরি দুইবার পরাজিত করিয়া, সারা পৃথিবীতে নামজাদা হইয়া পড়েন। পর বৎসরেই তিনি উনিশ বৎসর বয়সে "গানবোট" স্মিথের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। স্মিথকে তিনি চতুর্থ মণ্ডলেই মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অচেতন অবস্থায় ধরাশায়ী রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যস্থের একটি সাংঘাতিক ভ্রমের জন্য তাঁহার সে জিৎ বাতিল হইয়া গেল। আবার লড়াই সুরু হইল। কিন্তু ষষ্ঠ মণ্ডলে কার্পেনটিয়ার হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। সেই ভূপতিত অবস্থায় স্মিথ অন্যায় করিয়া তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত করেন। কাজেই মধ্যস্থের হুকুমে স্মিথকে আর লড়াই করিতে দেওয়া হইল না, এবং কার্পেনটিয়ারকেই জেতা বলিয়া মানা হইল। ফলে উনিশ বৎসরের বালক কার্পেনটিয়ার "পৃথিবী-জেতা বীর" বলিয়া উপাধি লাভ করিলেন! ঠিক তার পরেই কার্পেনটিয়ার যুরোপের মহাসমরে সৈনিকরূপে যোগদান করেন এবং শান্তিস্থাপন না-হওয়া পর্য্যন্ত আর মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্পেনটিয়ার ইংরেজ যোদ্ধা ডিক স্মিথকে পরাজিত করেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা জো বেকেটের সঙ্গে কার্পেনটিয়ারের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। বেকেট বারংবার গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, "কার্পেনটিয়ারকে আমি গ্রাহ্যই করি না! কারণ, সে ভারি ওজনের যোদ্ধার মধ্যেই গণ্য নয়,—দেহের ভারে, গায়ের জোরে আর পায়তারা-কস্‌রতে আমার কাছে সে কিছুতেই টিঁকতে পারবে না—আমি তাকে অনায়াসেই হারিয়ে দেব,—সে একবার আসুক্ না দেখি!"

বিলাতসুদ্ধ সমস্ত লোকই বেকেটের কথায় সায় দিয়া বলিয়াছিল, 'বেকেটের গায়ে যে-রকম আশ্চর্য্য শক্তি এবং তাহার যুদ্ধকৌশল যে-রকম চমৎকার, তাহাতে কার্পেনটিয়ারের পক্ষে জয়লাভ অসম্ভব। বিশেষ, রণক্ষেত্রে গিয়া কার্পেনটিয়ারের আগেকার মত লড়িবার ক্ষমতাও আর নাই।' কিন্তু গত বৎসরের ডিসেম্বর মাসে বেকেটের দর্পচূর্ণ হইয়াছে! কার্পেনটিয়ার রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই, এক মিনিট ছয় সেকেণ্ডের মধ্যে প্রবল এক মুষ্ট্যাঘাতে বেকেটকে একেবারে অজ্ঞান ও ধরাশায়ী করিয়া দিয়াছেন। এত অল্প সময়ে আর কখনো কোন ভারি-ওজনের যোদ্ধা জয়লাভ করিতে পারেন নাই। এই লড়াই জিতিয়া কার্পেনটিয়ার "য়ুরোপজয়ী বীর" নামে উপাধি ও পঁচাত্তর হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। বর্ত্তমান কালের "পৃথিবীজয়ী বীর" জ্যাক ডেম্প্‌সী জাতিতে আমেরিকান। কার্পেনটিয়ার এখন তাঁহার সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

নাপ্পি-পীরিতি-কথা

বাক্যে অর্থে কারখৎ হেরি,
ফারখৎ রাধা-শ্যামে ;—
রাসের মঞ্চে নাচিছে আয়ান,
শিশু-রাই নাচে বামে।
যাস্ক স্মরিছে মুস্কিলাসান,
বররুচি কাঁপে প্রাণে ;
ইস্কুলে ঢোকে অমরসিংহ
শিখিতে কথার মানে !
ডিগ্‌বাজী খায় ছাপার হরফ,
ডিক্‌স্‌নারী গেল তল,
রসের কুঞ্জে চাষ দিতে আসে
পদ্মাপারের দল !
শব্দ ধুনিয়া ধাঁই ধাঁই, করে—
কারদানী বিস্তর ;
গৌড়-বঙ্গ হাঁ-করিয়া শোনে
'পূর্ব্ব' মানে যে 'পর' !
অর্থ শব্দ হয়েছে জব্দ
বেফাঁস বাক্য-জালে,
পূর্ব্বরাগের মানে সেই রাগ
ঘটে যাহা পরকালে।
নাপ্পি-খোরের পড়্‌শীরা নোনা-
মাছ গেঁথে বড়্‌শীতে,
করে বাহাদুরী গুম্ফ চুমরি'
নাপ্পি-নায়িকা-প্রীতে !
পূর্ব্বরাগের হাড়েতে দূর্ব্বা
গজাইয়া সারি-সারি,
বিশ্বে যা' সাঁচা, বঙ্গে তা' মিছে,
ভণিছে পদ্মাপারী !

বাজাইয়া ধামী রজকিনী রামী
কহিছে চণ্ডীদাসে,
"চল বড়ু রসতত্ত্ব শিখিব
পোষ্ট্‌-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে !
তুমি যে রামীর পূর্ব্বপুরুষ
সন্দেহ তার নাই,
পরপুরুষে ও পূর্ব্বপুরুষে
হয়ে গেছে একঠাই !
'পূর্ব্ব' মানে যে 'পিছন' হে বঁধু !
সেই কথা পাকা কথা,
ফক্কিকা-কৃত ব্যাখ্যান এযে
নাহি মিলে যথাতথা !
পদ্মা-পারের প্রতিভা-চেরাগে
নব-বাণী লহ প'ড়ে,
পূর্ব্ব-বঙ্গ মানে সে বঙ্গ
পিছিয়ে যে রয় পড়ে।
যাদের কথার টানে সাড়া দেয়,
ডিশিন-নিশিন-পাড়া,
তাদের সদনে তত্ত্ব শিখিব,
চল বড়ু, কর তাড়া !"
পূর্ব্বরাগেরে পান্তা করিয়া,
পান্‌সে করিয়া নাড়া,
নাপ্পি-পীরিতি সাধনার রীতি
বাখানে পদ্মাপারী ॥

শ্রীগোপীবল্লভ গোস্বামী।

সঙ্কলন

আমার কথা

আমার জান্‌লার সাম্‌নে রাঙামাটির রাস্তা।

ওখান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে, সাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় করে হাটে যায়, সন্ধ্যাবেলায় কলহাস্যে ঘরে ফেরে।

কিন্তু মানুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই।

জীবনের যে-ভাগটা অস্থির, নানা ভাবনায় উদ্বিগ্ন, নানা চেষ্টায় চঞ্চল, সেটা আজ ঢাকা পড়ে গেচে। শরীর আজ রুগ্ন, মন আজ নিরাসক্ত।

ঢেউয়ের সমুদ্র বাহিরতলের সমুদ্র; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভশয্যা, ঢেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে' ভুলিয়ে দেয়। ঢেউ যখন থামে তখন সমুদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করে।

তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ যখনি ছুটি পেল তখনি সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।

পথ-চলা পথিক যতদিন ছিলুম ততদিন পথের ধারের ঐ বটগাছটার দিকে তাকাবার সময় পাইনি; আজ পথ ছেড়ে জান্‌লায় এসেচি আজ ওর সঙ্গে মোকাবিলা সুরু হল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। যেন বলতে চায়, "বুঝতে পারচ না?"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, "বুঝেচি, সব বুঝেচি; তুমি অমন ব্যাকুল হোয়ো না।"

কিছুক্ষণের জন্যে আবার শান্ত হয়ে যায়। আবার দেখি, ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে; আবার সেই থর্‌থর্‌, ঝর্‌ঝর্‌, ঝল্‌মল্‌।

আবার ওকে ঠাণ্ডা করে বলি, "হাঁ হাঁ, ঐ কথাই বটে; আমি তোমারই খেলার সাথী, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডুষে গণ্ডুষে তোমারি মত সূর্য্যালোক পান করেচি, ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।"

তখন ওর ভিতর দিয়ে হঠাৎ হাওয়ার শব্দ শুনি, ও বল্‌তে থাকে হাঁ, হাঁ, হাঁ।

যে-ভাষা রক্তের মর্ম্মরে আমার হৃৎপিণ্ডে বাজে, যা আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ আবর্ত্তন-ধ্বনি, সেই ভাষা ওর পত্রমর্ম্মরে আমার কাছে এসে পৌঁছয়। সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারী ভাষা।

তার মূল বাণীটি হচ্চে, "আছি, আছি; আমি আছি, আমরা আছি।"

সে ভারি খুসির কথা। সেই খুসিতে বিশ্বের অণুপরমাণু থর্‌থর্‌ করে কাঁপচে।

ঐ বটগাছের সঙ্গে আমার আজ সেই এক-ভাষায় সেই এক-খুসির কথা চল্‌চে।

ও আমাকে বলচে, "আছ হে বটে?"

আমি সাড়া দিয়ে বল্‌চি, "আছি হে মিতা!"

এমনি করে "আছি"তে "আছি"তে একতালে করতালি বাজ্‌চে।

(২)

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যখন আমার আলাপ সুরু হল তখন বসন্তে ওর পাতাগুলো কচি ছিল; তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাতক আলো ঘাসের উপর এসে পৃথিবীর ছায়ার সঙ্গে গোপনে গলাগলি করত।

তারপরে আষাঢ়ের বর্ষা নামল; ওরও পাতার রং মেঘের মত গভীর হয়ে এসেচে। আজ সেই পাতার [illegible] প্রবীণের পাকা বুদ্ধির মত নিবিড়, তার কোন ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায়

না। তখন গাছটি ছিল গরীবের মেয়েটির মত; আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী; যেন পর্য্যাপ্ত পরিতৃপ্তির চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকতমণির বিশনলী হার ঝল্‌মলিয়ে আমাকে বল্‌লে, "মাথার উপর অমনতর ইঁটপাথর মুড়ি দিয়ে বসে আছ কেন? আমার মত একেবারে ভরপুর বাইরে এস না!"

আমি বল্‌লেম, "মানুষকে যে ভিতর-বাহির দুই বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়।"

গাছ নড়েচড়ে বলে উঠল, "বুঝ্‌তে পারলেম না।"

আমি বল্‌লেম, "আমাদের দুটো জগৎ, ভিতরের আর বাইরের।"

গাছ বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ! ভিতরেরটা আছে কোথায়?"

—"আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।"

—"সেখানে কর কি?"

—"সৃষ্টি করি।"

—"সৃষ্টি আবার ঘেরের মধ্যে! তোমার কথা বোঝবার জো নেই।"

আমি বল্‌লেম, "যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা পড়ে' হয় নদী, তেমনি ঘেরের মধ্যে ধরা পড়েই ত সৃষ্টি। একই জিনিষ ঘেরের মধ্যে আট্‌কা পড়ে কোথাও হীরের টুক্‌রো, কোথাও বটের গাছ।"

গাছ বল্‌লে, "তোমার ঘেরটা কি রকম শুনি!"

আমি বল্‌লেম, "সেইটি আমার মন। তার মধ্যে যা ধরা পড়চে তাই নানা সৃষ্টি হয়ে উঠচে।"

গাছ বল্‌লে, "তোমার সেই বেড়া-ঘেরা সৃষ্টিটা আমাদের চন্দ্র-সূর্য্যের পাশে কতটুকুই বা দেখায়?"

আমি বল্‌লেম, "চন্দ্রসূর্য্যকে দিয়ে তাকে ত মাপা যায় না, চন্দ্রসূর্য্য যে বাইরের জিনিষ।"

—"তাহলে মাপবে কি দিয়ে?"

—"সুখ দিয়ে—বিশেষত দুঃখ দিয়ে।"

গাছ বল্‌লে, "এই পুবে হাওয়া আমার কানে কানে কথা কয়, আমার প্রাণে প্রাণে তার সাড়া জাগে। কিন্তু তুমি যে কিসের কথা বল্‌লে আমি কিছুই বুঝলেম না।"

আমি বল্‌লেম, "বোঝাই কি করে? তোমার ঐ পুবে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধরে বীণার তারে যেম্‌নি বেঁধে ফেলেচি অমনি সেই হাওয়া এক সৃষ্টি থেকে একেবারে আরেক সৃষ্টিতে এসে পৌঁছয়। এই সৃষ্টি কোন্ আকাশে যে স্থান পায় তা আমিও ঠিক জানিনে। মনে হয় যেন বেদনার একটা আকাশ আছে। সে আকাশ মাপের আকাশ নয়।"

—"আর ওর কাল?"

—"ওর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল। তাই সে কাল সংখ্যার অতীত।"

—"দুই আকাশ দুই কালের জীব তুমি, তুমি অদ্ভুত। তোমার ভিতরের কথা কিছুই বুঝলেম না।"

—"নাই বা বুঝলে।"

—"আমার বাইরের কথা তুমিই কি ঠিক বোঝ?"

—"তোমার বাইরের কথা আমার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে তাকে যদি বোঝা বল ত সে বোঝা, যদি গান বল ত গান, কল্পনা বল ত কল্পনা।"

(৩)

গাছ তার সমস্ত ডালগুলো তুলে আমাকে বল্‌লে, "একটু থামো। তুমি বড় বেশি ভাবো, আর বড় বেশি বকো।"

শুনে আমার মনে হল, "এ-কথা সত্যি।" আমি বল্‌লেম, "চুপ করবার জন্যেই তোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাস-দোষে চুপ করে করেও বকি; কেউ কেউ যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।"

কাগজটা পেন্সিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে। ওর চিকন পাতাগুলো ওস্তাদের আঙুলের মত আলোকবীণায় দ্রুততালে ঘা দিতে লাগল।

হঠাৎ আমার মন বলে উঠ্‌ল, "এই তুমি যা দেখ্‌চ আর এই আমি যা ভাব্‌চি এর মাঝখানের যোগটা কোথায়?"

আমি তাকে ধমক দিয়ে বল্‌লেম, "আবার তোমার প্রশ্ন? চুপ কর।"

চুপ করে রইলুম, একদৃষ্টে চেয়ে দেখ্‌লেম। বেলা কেটে গেল।

গাছ বল্‌লে, "কেমন, সব বুঝেচ ?"

আমি বল্‌লেম, "বুঝেচি।"

(৪)

সেদিন ত চুপ করেই কাট্‌ল।

পরদিনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে "কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলে 'বুঝেচি', কি বুঝেচ বল ত ?'

আমি বল্‌লেম, "নিজের মধ্যে মানুষের প্রাণটা নানা ভাবনায় ঘোলা হয়ে গেচে। তাই প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে, ঐ গাছের দিকে।"

—"কি রকম দেখলে ?"

—"দেখলেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কি আনন্দ! নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছাঁটই ছেঁটেচে, কত রঙই লাগিয়েচে, কত গন্ধ, কত রস। তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বল্‌ছিলেম, "ওগো বনস্পতি, জন্মমাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে-আনন্দধ্বনি করে' উঠেছিল সেই ধ্বনি তোমার শাখায় শাখায়। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চঞ্চল হল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে বন্দী হয়ে বসে ছিল, তুমি তাকে ডাক দিয়ে বলেচ, "ওরে আয়না রে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে; আর আমারি মত নিয়ে আয় তোর রূপের তুলি, রঙের বাটি, রসের পেয়ালা!"

মন আমার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে কিছু বিমর্ষ হয়ে বল্‌লে, "তুমি ঐ প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করে থাক, আমি যে-সব উপকরণ জড় করচি তার কথা এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বলনা কেন ?"

—"তার কথা আর কইব কি। সে নিজেই নিজের টঙ্কারে ঝঙ্কারে হুঙ্কারে ক্রেঙ্কারে আকাশ কাঁপিয়ে রেখেচে। তার ভারে, তার জটিলতায়, তার জঞ্জালে পৃথিবীর বক্ষ ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। ভেবে পাই নে এর অন্ত কোথায়। থাকের উপর আর কত থাক্ উঠ্‌বে, গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে? এই প্রশ্নেরই জবাব ছিল ঐ গাছের পাতায়।"

—"বটে? কি জবাব, শুনি।"

—"সে বল্‌চে, প্রাণ যতক্ষণ নেই ততক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবামাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপনি মিলে গিয়ে অখণ্ড সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সুন্দরকেই দেখ এই বনবিহারী। তার বাঁশি ত বাজচে বটের ছায়ায়।"

(৫)

তখন কবেকার কোন্ ভোর রাত্রি।

প্রাণ আপন সুপ্তিশয্যা ছাড়ল; সেই প্রথম পথে বাহির হল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মাঠে।

তখনো তার দেহে ক্লান্তি নেই, মনে চিন্তা নেই; তার রাজপুত্তুরের সাজে না লেগেচে ধূলো, না দেখা দিয়েচে ছিদ্র।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অম্লান প্রাণটিকে দেখলেম এই আষাঢ়ের সকালে, ঐ বটগাছটিতে। সে তার শাখা নেড়ে আমাকে বল্‌লে, "নমস্কার।"

আমি বল্‌লেম, "রাজপুত্তুর, মরুদৈত্যটার সঙ্গে লড়াই চল্‌চে কেমন, বল ত ?"

সে বল্‌লে, "বেশ চল্‌চে, একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখ না।"

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পূবের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের সার; পশ্চিমে শালে তালে মহুয়ায়, আমে জামে খেজুরে, এম্‌নি জটলা করেচে যে দিগন্ত দেখা যায় না।

আমি বল্‌লেম, "রাজপুত্তুর, ধন্য তুমি। তুমি কোমল তুমি কিশোর, আর দৈত্যটা হল যেমন প্রবীণ তেমনি কঠোর; তুমি ছোট, তোমার তূণ ছোট, তোমার তীর ছোট, আর ও হল বিপুল, ওর বর্ম্ম মোটা, ওর গদা মস্ত। তবু ত দেখি দিকে দিকে তোমার ধ্বজা উড়ল; দৈত্যটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেছ, পাথর মান্‌চে হার, ধূলো দাসখৎ লিখে দিচ্ছে।"

বট বল্‌লে, "তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখলে ?"

আমি বল্লেম, "তোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রূপে, তোমার কর্ম্মকে দেখি বিশ্রামের বেশে, তোমার জয়কে দেখি নম্রতার মূর্ত্তিতে। সেইজন্যেই ত তোমার ছায়ায় সাধক এসে বসেচে ঐ সহজ যুদ্ধজয়ের মন্ত্র আর ঐ সহজ অধিকারের সম্বিটি শেখবার জন্যে। প্রাণ যে কেমন করে' কাজ করে, অরণ্যে অরণ্যে তারি পাঠশালা খুলেচ। তাই যারা ক্লান্ত তারা তোমার ছায়ায় আসে, যারা আর্ত্ত তারা তোমার বাণী খোঁজে।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র, ফাল্গুন, ১৩২৬।

অন্তর-বাহির

পৃথিবীর সমস্ত পশুপাখী বাহিরের দিকে যেমন চোখ মেলে দেখ্লে মানুষও তেমনি দেখ্লে, সমস্ত জগৎ তার ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের সমস্ত মনকে দখল করে নিলে।

সুখকর দুঃখকর নানা ঘটনায় আন্দোলিত এই বহির্জগৎটা যখন আমাদের কাছে খুব একান্ত হয়ে ওঠে তখন অন্য অসংখ্য প্রাণী এই জগতের যেমন অন্তর্গত হয়ে অঙ্গ হয়ে থাকে আমরাও তেমনি থাকি। যা কিছু ঘটচে চল্চে সেই বাহিরের ধারারই অংশ হয়ে আমরা বয়ে চলি।

কিন্তু একেবারে সুরু থেকেই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। বরাবর মানুষ অনুভব করে আস্চে, সে যা দেখ্চে তার ভিতরে ভিতরে একটা রহস্য রয়ে গেচে। চোখের সামনে যা আছে কেবল মাত্র তাই আছে একথা মেনে নিলে কোনো আর ভাবনা থাকে না। কিন্তু মানুষ একথা মান্তে পারলেই না।

এই রহস্যের বোধটাকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষ কত রকমের শব্দ আওড়ালে যার কোনো মানেই নেই, কত রকমের কাণ্ড করলে যাকে পাগ্লামি বল্লেই চলে। এম্নি করে নিজেকে সহজের স্বাভাবিকের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে এই কথাটা কোনমতে বলবার চেষ্টা করেচে যে, যেটা প্রত্যক্ষ জানচি তার চেয়েও জানবার একটা কিছু আছে। যা বাইরে আছে সেটাই শেষ কথা নয়। সে যে-অনুষ্ঠানগুলো করলে সেগুলো ভয়ঙ্কর; পশুবলি দিলে, নরবলি দিলে, নিজেকে অসহ্য কষ্ট দিলে, অঙ্গকেও দিলে, বেশভূষা যা করলে তা উৎকট। তার মনে হয়েচে একটা দুঃসহ এবং ভয়ঙ্কর আঘাত করা চাই, নইলে স্বভাবের আবরণকে বিদীর্ণ করে তার গুপ্তধন পাওয়া যাবে না।

তার পরে ক্রমে ক্রমে মানুষের সাধনার প্রণালী বদ্লাতে লাগ্ল। বাইরের স্বভাবের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে এতদিন বাইরের দিকে সে সৈন্য লাগিয়েছিল অস্ত্র মেরেছিল, ক্রমে সেই লড়াইটার গতি ভিতরের দিকে চল্ল। সে বল্লে হৃদয়ের স্বাভাবিক যে সব ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে সেইটেকে চরম বলে মান্ব না; সেটাকে যদি ভেঙে ফেলতে পারি তা হলেই তার ভিতর থেকে আসল রহস্যময় শক্তিকে আবিষ্কার করতে পারব। এই বলে মানুষ নিজেকে দুঃখ দিতে লাগ্ল। সমস্ত ত্যাগ করে করে দেখ্তে চাইলে সব ত্যাগের শেষে কি বাকি থাকে।

একটা জিনিষ মানুষ দেখচে বাহিরের সুরের একেবারে উল্টো সুর সেই ভিতরের দিকে। বাইরের ক্ষেত্রে ক্রোধ, ভিতরের ক্ষেত্রে ক্ষমা; বাইরে ধনের মাহাত্ম্য, ভিতরে ত্যাগের; বাইরে গতি, ভিতরে শান্তি।

ফুলে দেখা যায় তার পাপড়ির বিস্তার, তার বর্ণের ছটা; ফলে দেখতে পাই তার বাইরের সঙ্কোচ, তার পাপ্ড়ির খসে পড়া, অন্তরের মধ্যে তার বীজের বিকাশ। এই বীজের মধ্যেই ভাবী জীবন নিস্তব্ধ কেন্দ্রীভূত।

তেমনি মানুষ প্রবৃত্তির রাজ্যে বাইরে আপন রঙ্, ফলিয়েছে, বাইরে যতদূর পারে আপনাকে সমারোহে বিস্তীর্ণ করচে। অন্তরে তার সমস্ত উল্টে গেল। বাহিরের যে আয়োজন সব চেয়ে বেশি করে চোখে পড়েছিল সে সবই পাপ্ড়ির মত খসে পড়ল। সেইখানে সমস্ত

বিক্ষিপ্ত শক্তি সংক্ষিপ্ত হল ভাবী জীবনের একটি বীজের উপর। যেমনি তাই হল অমনি অন্তর রসে ভরে উঠল।

একদিক থেকে একদল মানুষ বল্‌লে, এই ফুলের জীবন, এই পাপ্‌ড়ির বিস্তারই চরম,—তার ঊর্দ্ধে আর কিছুই নেই। তারা কোমর বেঁধে লেগ্‌ল লড়াই করতে, ঝোঝাই করতে। দেহ-মনকে ভোগের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে দেওয়াকেই তারা সকলের চেয়ে বড় করে দেখ্‌লে।

আর একদিক থেকে আর একদল মানুষ বল্‌লে, অন্তরের নিভৃতে বাইরের শাসন থেকে নিষ্কৃতি আছে; সেখানে বসে আমি বাইরের বস্তুকে ত্যাগ করতে পারি বাইরের আঘাতকে প্রতিহত করতে পারি, সেখানে আপনার মধ্যেই আমার আপনার রাজসিংহাসন আছে। সেই সিংহাসনেই আমি একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হব—বাইরের দিকে তাকাবই না।

তারা বলে, বাইরের দিকে যে শক্তির টানে সমস্ত জীব পাক খেয়ে বেড়াচ্চে, যে শক্তি কেবলই এক জিনিষ ভেঙে আরেক জিনিষ গড়চে, যার বিস্তারের আর অন্ত নেই সেই হল প্রকৃতি। সেই ত একদিকে বাসনা আর একদিকে ভোগের সামগ্রী সাজিয়ে সংসার নাট্যমঞ্চে হাসিকান্নার অবসান হীন পালা জমিয়েচে। আর অন্তরের মধ্যে এই নাট্যের বাতি নিবিয়ে দিয়ে সমস্ত সামগ্রীকে ত্যাগ করে ভোগকে নিবৃত্ত করে যে সত্তা আপনাকে মুক্তভাবে উপলব্ধি করে, আনন্দ পায় সেই হল আত্মা। এই আত্মাকেই মানব,প্রকৃতিকে মানবই না।

এ কথা যে বলেচে তাকে প্রাণপণ জোর করেই বল্‌তে হয়েচে। কেননা মানব-জীবনের সবচেয়ে আদিমতম অভ্যাস হচ্চে বাহিরেই ছড়িয়ে যাওয়া, বাহিরকেই একান্ত করে জানা। ইন্দ্রিয়-বোধই তার প্রথম আলো জ্বেলেচে, প্রবৃত্তিই তাকে প্রথম চালনা করেচে। এইজন্যে তার মন এই বাহিরের জগতে অনেক দূরে শিকড় চালিয়ে দিয়েচে—তার বিশ্বাস একেই খুঁব শক্ত করে আঁকড়ে রয়েচে। এই জন্যে তত্ত্বজ্ঞানী আর ধর্ম্ম-উপদেষ্টা যিনি যাই বলুন, আর মানুষও মুখের কথায় যাই প্রচার করুক, বুদ্ধির দ্বারা যা'ই চিন্তা করে থাকুক, আচারে ব্যবহারে আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করে এমন মানুষ লক্ষের মধ্যে একটি পাওয়াও কঠিন। বাহিরটাই তার ইন্দ্রিয়কে মনকে বিশ্বাসকে বুদ্ধিকে এমন প্রবল শক্তিতে এবং অতিমাত্রায় অধিকার করে বসেচে বলেই তার একান্ত প্রভাবকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই মানুষ এমন বিপুল শক্তি প্রয়োগ করে এমন একনিষ্ঠ বৈরাগ্যের সঙ্গে বাহিরকে একেবারে অস্বীকার করবার প্রস্তাব করেচে।

সত্য এমনি করে দুইভাগ হয়ে গেল। নদীর দুই তীর যে একই নদীর, জলের ধারায় মধ্যে উভয়েরই ঐক্য চিরকাল প্রবাহমান একথা মানুষ ভুলে গেল।

উপনিষদ্ বলেচেন, "যশ্চায়মস্মিন্ পুরুষঃ আকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ," তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বাইরে এই আকাশে সমস্তকে অনুভব করে আছেন। পরক্ষণেই বল্‌চেন, "যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ," এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আত্মাতে সমস্ত অনুভব করে আছেন। অর্থাৎ অসীম সত্য অন্তরকে বাহিরকে এক করে বিরাজ করেন।

সত্যের এই যে অন্তর বাহির দুই দিক আছে, এদের সামঞ্জস্য তখনি নষ্ট হয় অন্তর যখন বাহিরের উপর আপন কর্ত্তৃত্ব হারায়, বাহির যখন অন্তরকে অভিভূত আচ্ছন্ন করে। আবার বাহিরকে যদি নির্ব্বাসিত করা যায় তবে আপন কর্ত্তৃত্বের অধিকার হারায়।

রাজা আছে তার রাজত্ব নেই একথা বলা ত চলে না। আত্মাকে যদি বলি রাজা, তবে এই সংসারের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে বসিয়ে তারই প্রভুত্বকে প্রচার করতে হবে। তার প্রভুত্বের ক্ষেত্রকে দূর করলে তাকে রাজ্যচ্যুত করা হয়।

আসল কথা আমাদের ইচ্ছা-অনুসারে সত্যের কোনো একটা অংশকে ছাঁটতে চেষ্টা করলে সে ছাঁটা পড়ে না, সে উপদ্রব হয়ে ওঠে। যে বাড়িতে আমি, তার মধ্যেই থেকে আঘাত করে, তাকে যদি

দূর করতে চেষ্টা করি তাহলে সে দূর হয় ভেঙে পড়ে আমাকেই চেপে মারে।

ভারতবর্ষ আপন সাধনায় আত্মার দিকে একান্ত ঝোঁক দিয়েছিল। তার ফলে স্থূল ও জড় প্রকৃতির প্রভাব ত মরল না। বরঞ্চ ভারতবর্ষ আপন ধর্ম্মে আচারে এই স্থূলকে যত বেশি মেনেছে এমন অন্য কোনো সভ্য দেশ মানে নি।

য়ুরোপে মধ্যযুগের সাধক কৌমার্য্য ব্রত নিলে, একান্ত দারিদ্র্যব্রত নিলে, দেহকে চাবুক মারলে, কাঁটার শয্যায় শুয়ে রইল,—এ যেমন সমাজের এক অংশে প্রকৃতির প্রতি চূড়ান্ত অত্যাচার, তেমনি আরেক অংশে খুনোখুনি কাড়াকাড়ি; উন্মত্ত ভোগলালসা পৃথিবীকে নিংড়ে নিংড়ে খেয়েও আপন তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। সত্যকে একদিক দিয়ে যখন মারি সে আরেক দিক্ দিয়ে আমাদের সাত গুণ মারে। দেহের দিকে যাকে বিনাশ করি ভূত হয়ে সে আমাদের বেশি করে পেয়ে বসে।

তবে একথা মানি, বাহির যখন অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়ে উদ্দাম হয়েচে, তখন তাকে দমনের জন্যে আঘাত করতে হবে। সেটা কেবল একটা ক্ষণিক চিকিৎসা। বাহির আত্মার রাজ্য, অতএব আত্মা তাকে পালন করবে—কিন্তু রাজ্য যদি বিদ্রোহী হয় তবে শত্রুর মত করেই তাকে মারতে হবে, তাকে পীড়া দিতে হবে। বাইরের প্রবৃত্তি যখন আত্মার শাসনকে লঙ্ঘন করে তখন তাকে মেরে, তার দুর্গ ভেঙে, তার সর্ব্বস্ব লুঠ করে তাকে হয়রান করতেই হবে। কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পরে রাজায় প্রজায় সত্যকার মিলনের দিন। তখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দ্বারা শুচি হবে, ভোগে সংযমের শান্তি আসবে; তখন আত্মা তার বাইরের অধিকারে আপনার ইচ্ছার বাধাহীন বিস্তার দেখে আনন্দিত হবে। তখন বাইরে চারিদিকে দেখবে সব সুন্দর সব মঙ্গল। •

এই যে দ্বন্দ্বকে সামঞ্জস্যে নিয়ে আসা, এ দল বেঁধে কোনো বিশেষ নামধারী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করে হবে না। এর ভার প্রত্যেক মানুষের উপর ব্যক্তিগত ভাবেই আছে। তুমি যদি পার তবে তোমার ভিতর দিয়েই সংসার সফলতা লাভ করবে। একটি সংসারেও যদি আত্মার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আত্মার কর্ত্তৃত্ব সেইখান থেকেই সমস্ত মানবজগৎকে ধন্য করবে।

আমাদের দুর্ব্বলতার মস্ত একটা কারণ এই যে, চারিদিকে আমরা দুর্ব্বলতার নানারূপ সর্ব্বদা দেখি। তাতে করে আত্মার স্বরূপ দেখতে পাইনে, আত্মার স্বরূপের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে না, তখন শক্তিহীনতার জন্যে লজ্জা চলে যায়। সত্যকে যদি বিশ্বাস করতে পারি তবে সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে পারি। চারদিকের দুর্ব্বলতায় সত্যের প্রতি সেই বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়, তখন মনে হয় তার জন্যে ত্যাগস্বীকার করা নিতান্ত যেন ঠকা, সে যেন মূঢ়তা।

এইজন্যেই তোমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য স্মরণ করে নিজেকে নিরত এই কথা বলতে হবে, অন্তরে সত্য হও বাহিরে সুন্দর হও। সকল মানুষ তোমার মধ্যে আপনারই পূর্ণতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখুক, সে জানুক, সে কি। তুমি যে সত্য হবে সে কেবল নিজের জন্য নয়, তোমার মধ্য দিয়ে সত্য সকলেরই অধিগম্য হবে বলে। তোমার আত্মার সঙ্গে সকল আত্মার যোগ আছে বলেই আত্মার পরম দায়িত্ব একান্ত যত্নে বহন করতে হবে। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩২৭।

রথযাত্রা

রথযাত্রার দিন কাছে।

তাই রাণী রাজাকে বল্‌লে, "চল, রথ দেখতে যাই।"

রাজা বল্‌লে, "আচ্ছা।"

ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বেরুল, হাতিশাল থেকে হাতি। দাস দাসী দলে দলে পিছে পিছে যায়।

কেবল বাকি রইল এক জনা। রাজ বাড়ীর ঝাঁটার কাটি কুড়িয়ে আনা তার কাজ।

সর্দ্দার এসে দয়া করে তাকে বল্‌লে, "ওরে তুই যাবি ত আয়।"

সে হাত জোড় করে বল্‌লে, "আমার যাওয়া ঘটবে না।"

রাজার কানে কথা উঠ্‌ল, সবাই সঙ্গে যায়, কেবল সেই দুঃখীটা যায় না।

রাজা দয়া করে মন্ত্রীকে বল্‌লে, "ওকেও ডেকে নিয়ো।"

রাস্তার ধারে তার বাড়ী। হাতী যখন সেখানে পৌঁছল মন্ত্রী তাকে ডেকে বল্‌লে, "ওরে দুঃখী, ঠাকুর দেখ্‌বি চল্‌।"

সে হাত জোড় করে বল্‌লে, "কত চলব? ঠাকুরের দুয়োর পর্য্যন্ত পৌঁছই এমন সাধ্য কি আমার আছে!"

মন্ত্রী বল্‌লে, "ভয় কি রে তোর, রাজার সঙ্গে চল্‌বি।"

সে বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ! রাজার পথ কি আমার পথ?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "তবে তোর উপায়? তোর ভাগ্যে কি রথযাত্রা দেখা হবে না?"

সে বল্‌লে, "হবে বই কি। ঠাকুর রথে করেই ত আমার দুয়ারে আসেন।"

মন্ত্রী হেসে উঠ্‌ল, বল্‌লে, "কোথাকার পাগল! তোর দুয়ারে রথের চিহ্ন কই রে!"

দুঃখী বল্‌লে, 'তাঁর রথের ত চিহ্ন পড়ে না।"

মন্ত্রী বল্‌লে "কেন বল্‌ ত?"

দুঃখী বল্‌লে, "তিনি আসেন পুষ্পক রথে।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "কই রে সেই রথ?"

দুঃখী হাত বাড়িয়ে দিলে, বল্‌লে "এই যে!"

তার দুয়ারের দুই পাশে দুটি সূর্য্যমুখী ফুটে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগুর, বৈশাখ ১৩২১।

এসেছে

এসেছে!
বনে বনে কলধ্বনি ভেসেছে।
উদয়-গিরির হৃদয় ব্যেপে, স্পর্শ-শিহর উঠ্‌ছে কেঁপে,
হাওয়ার শিরায় হর্ষ বহে মহোৎসবের ইঙ্গিতে।
এসেছে সে! শঙ্খ জাগে স্পর্শ-সুখের সঙ্গীতে।

কাঁদিস্‌ নে!
দৃষ্টি-সুখের শবকে বুকে বাঁধিস্‌নে।
নীল আকাশের তলায় তলায়, পাহাড় ঢেকে গলায় গলায়,
থাকত যেথায় নিবিড় কানন সবুজপাতার পিছনে,
সেথান থেকেই আস্‌ছে বাতাস; দাঁড়ারে তুই বিজনে।

চিনে নে।
প্রেমের ছোঁয়ায় বুঝে, কাছে ছিনে নে!
মায়ার গন্ধ গায়ে লাগে, বিশ্বখানি উল্‌সে জাগে।
জলে স্থলে ফুলের খেলা, পদ্মমুখীর গৌরবে।
এসেছে সে! কাঁদিস্‌নে তুই! চিনে নে তায় সৌরভে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চিঠি

পাড়াগাঁয়ের অনেকদিনের পুরোনো ভাঙ্গা-চোরা একখানা বাড়ী। তারি শাণ-বাঁধানো দাওয়া,—মাঝে-মাঝে চটা উঠে গেছে। সেই দাওয়ার একধারে বারো বছরের একটি ছেলে, পাশে কড়ির দোয়াত আর শরের কলম; কাছে বসে এক বৃদ্ধা নারী। তাকে লক্ষ্য করে ছেলেটি বললে,—কি লিখতে হবে, বল পিশিমা। আমি আবার এখনি ও-পাড়ায় যাত্রা শুনতে যাব।

ছেলেটি যাকে পিশিমা বললে, ছেলের দল গ্রাম-সম্পর্কে তাকে পিশি বলে ডাকে। তা-ছাড়া তার সঙ্গে কারো কোন সম্পর্কই নেই।

বৃদ্ধা বললে,—আমার ফেলিকে চিঠি লিখতে হবে, বাবা। আজ চার বচ্ছর তার কোন খপর পাইনি।

ফেলি তার ভাইঝী; আঁতুড়ে মা মারা গেলে এই পিশিই তাকে কোলে তুলে নেয়, মানুষ করে। এই পিশিমাকেই সে মা বলে জানে।

বৃদ্ধার দুই চোখ ছল ছল করে এল। মনের মধ্যে চার বৎসর পূর্ব্বেকার এক করুণ বিদায়-দৃশ্য জেগে উঠল। বাড়ীর সামনে তার-নারকেলের ছায়ায়-ঘেরা খানিকটা খোলা জায়গা—সেইখানে পাল্কী নামানো ছিল। ফেলি শ্বশুর-বাড়ী যাবে। জামাই রোজগেরে হয়েছে,—ফেলিকে এবার নিজের কাছে নিয়ে যাবে। জামাই গরদের কোটের উপর সোনার ঘড়ি-চেন ঝুলিয়ে আশে-পাশে গম্ভীর মুখে পায়চারি করে ফিরছিল। আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে পিশি এসে ফেলিকে পাল্কীতে তুলে দিলে—মেয়েরও দুই চোখে সাগর বয়ে চলেছিল। পাল্কী উঠিয়ে বেহারারা যখন শ্যাওলা-পড়া পুকুরটাকে বাঁয়ে রেখে মেটে রাস্তা ধরে জাম গাছের ওধারে মোড় বেঁকল, মেয়ে ফেলি তখন পাল্কীর দুই দরজা সরিয়ে ঝাপসা-চোখে দূর থেকে পিশির পানেই চেয়ে ছিল। সকালের উঠন্ত সূর্য্যের স্নিগ্ধ রৌদ্রটুকু তালগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তার মুখের উপর ঝরে-ঝরে পড়ছিল -পিশিমা নিজের চোখের জলে-অস্পষ্ট দৃষ্টি দিয়েও তা বেশ স্পষ্টই দেখেছিল। সে চোখের সে দৃষ্টি এখনো তার মনে গাঁথা রয়েছে,—সে কি ভোলবার গো!......তারপর এই চার বছর ফেলির কাছ থেকে একখানি চিঠিও আসেনি। পিশি নিজে লিখতে জানে না; পাড়ার একে-তাকে ধরে মাঝে-মাঝে অমন কত চিঠি লিখিয়েছে—তার একখানার জবাবও কি দিতে নেই?...সে কি সব ভুলে গেল! পিশির আর কে আছে? কেউ না! সেই পিশিকে খপর দিতে সময় পায় না! সে রইল কি গেল, তারও কি কোন উদ্দেশ নিতে নেই!......পিশির বুকটা ছাঁৎ করে উঠল—কে জানে, তার ফেলিই যদি না থাকে—! থাক্‌লে সত্যিই কি আর সে পিশির খোঁজ নিত না!...পিশির নিজের যাবার উপায় নেই—সে যে জামাই-বাড়ী! নাহলে সে অমন এতদিনে দশবার ছুটে যেত!

পাড়াগাঁয়ে ডাকওলা হপ্তায় দু'দিন এসে চিঠি বিলি করে যায়। যে-যেদিন তার আসবার পালা, পিশি তার আশা-পথ চেয়ে বসে থাকে। দূর থেকে তাকে আস্‌তে দেখে প্রাণটা কি আশায় ভরে ওঠে! উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রশ্ন করে—আমার চিঠি এনেছ, বাবা?

ডাক-ওলা তার থলি না দেখেই বলে,—না গো।

বেচারীর সমস্ত মন অমনি নির্জ্জীব অচেতন হয়ে পড়ে। শরীরের সমস্ত বাঁধন যেন আল্‌গা হয়ে আসে; মাথা ঘুরে যায়! সে ভাবে, আমি গরিব, আমার কেউ নেই,—তাই কোম্পানির লোক ডাকওলা আমাকে গ্রাহ্যিও করে না! চিঠি নিয়ে আসে না!

পাড়ার পাঁচজনকে তখন সে ধরে। তারা বলে,—এখনো চিঠির জবাব আসবার সময় আছে!

এখনো সময় আছে, সময় আছে তাহলে! আঃ!

আশায় আশায় দিনের পর দিন গিয়ে একটা মাসও যখন যায়-যায় হয়, তখন বেচারীর আর সোয়াস্তি থাকে না! আবার-একজনকে ধরে বসে,—ওগো ঠিকানাটা ভালো করে পষ্ট করে এবার একখানা চিঠি বেশ গুছিয়ে লিখে দাও না গা!

এমনি আশা-নিরাশার মধ্যে দিয়েই বুড়ীর দিন কেটে যায়!

আজ যে ছেলেটির কাছে সে চিঠি লেখাতে এসেছিল, সে ছেলেটির লেখা-পড়ায় বেশ নাম-ডাক বেরিয়েছে। তাই শুনে চিঠি লেখাবার পক্ষে সে খুব পাকা লোক হবে ভেবেই বুড়ী, তার বাড়ী এসেছিল, তাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে! ছেলেটির নাম, বিপিন।

বিপিন প্রথমেই 'কল্যাণবরেষু' পাঠ লিখে বুড়ীর মুখের পানে চেয়ে বললে,—কি লিখব, পিশিমা, বল?

বুড়ী বললে,—লেখো, তুমি কেমন আছ? জামাই কেমন আছেন! বাড়ীর সকলে কেমন আছে? অনেকদিন কোন খপর পাইনি বলে আমার মন বড় অস্থির হয়েছে। এবার যেন চিঠির জবাব দেয়। তারপর লেখো,আমি ভাল আছি। দুজনকে আশীর্ব্বাদ জানাও,—এই আর কি সব কথা।

বৃদ্ধা একটি-একটি করে কথা বলে যেতে লাগল—আর বিপিন তার ছাত্র-বৃত্তি-পাশ-করা বিদ্যার বহরে সেই কথাগুলোকেই বাড়িয়ে তার উপর দু-পোঁছ রঙ্ দিয়ে লিখে চল্‌ল। পিশিমার যা লেখবার ছিল, সে সব কথা শেষ করে বিপিন বললে,—ঠিকানা কি লিখব?

—এই যে বাবা, ঠিকানা—বলে বৃদ্ধা আঁচলের খুঁট খুলে ভাঁজ-করা ময়লা একটা চিরকুট বার করলে। বিপিন সেটা দেখে ঠিকানা লিখলে।

বৃদ্ধা বললে,—মুড়ে ফেলছ যে! আর কিছু লিখবে না?

—আর ত জায়গা নেই।

বৃদ্ধার বুকটা কেঁপে উঠল। জায়গা নেই! আর জায়গা নেই!

কিন্তু লেখবার যে অনেক কথা ছিল—এরি মধ্যে জায়গা ফুরিয়ে গেল! কাল সারারাত যখন চোখে ঘুম আস্‌ছিল না,

তখন ফেলিকে কি লিখবে, সে সব কথা ভেবে ঠিক করে ফেলেছিল যে। সে যে অনেক কথা! চার বছরে খপর দেবার মত কত ঘটনাই যে গাঁয়ে ঘটে গেছে। নদীটায় চড়া পড়েছে, বোসেদের অত-বড় পুকুর ঝাঁজি হয়ে একেবারে সরবার অযুগ্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেজন্যে ভারী জলের কষ্ট হচ্ছে! তবে' গে গাঁয়ের টেঁপি, পুঁটি, ভুতো, সারদা—এদের বিয়ে হয়ে গেছে। দাশুর ঠাকুমা মারা গেছে—ওদের নন্দর একটি ছেলে হয়েছে—এই সেদিন খুব শিল পড়ে দত্ত-পুকুরের অত মাছ, সব মরে গেছে—এম্নি কত কি ব্যাপার যে ঘটে গেছে। প্রত্যেক খপরটিরই যে দাম আছে! চার পাতা চিঠি লেখা হয়ে গেল, অথচ এতগুলো খপর,—সব একেবারেই বাকি রইল!

একটা নিশ্বাস ফেলে বুড়ী খামে-মোড়া চিঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বিপিনকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করে বেচারী সেই চিঠি হাতে করে চল্‌ল, চার ক্রোশ দূরে, সদরের ডাক-ঘরে, সে চিঠি ডাকে দিতে!

২

সহরের মধ্যে ছোট্ট ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার বাড়ী। খাটের উপরে শুয়ে এক সুন্দরী কিশোরী একখানা উপন্যাস পড়ছিল—পাশে অয়েলক্লথ-পাতা ছোট বিছানায় একটি কচি ছেলে ঘুমুচ্ছিল। কিশোরী উপন্যাস পড়ছিল আর মাঝে মাঝে বুকে সে কি-এক অসহ্য আবেগ নিয়ে চোখ তুলে কচি ছেলেটির পানে ফিরে-ফিরে-চেয়ে-চেয়ে দেখছিল।

হঠাৎ এক তরুণ যুবা ঘরে এসে বললে,—তোমার একটা চিঠি গো। বোধ হয় তোমার পিশিমা লিখেছেন।

কিশোরী উঠে চিঠি পড়তে লাগল। অক্ষরগুলো কার হাতের, জানা নেই—কিন্তু কথাগুলো পিশিমারই বটে! স্নেহের সেই শত কাকুতিতে ভরা, আবেগে অধীর—এ পিশিমারই চিঠি বটে!

কিন্তু এ অনুযোগ ত ঠিক নয়। চিঠি কি সে লেখেনি?...না, লেখা হয় নি। আজ লেখা হলনা, কাল লিখব'খন এই বলে ফেলে-ফেলেই রেখেছিল, লেখা আর হয়ে ওঠে নি। তাইত!...একটু দেরী হয়ে গেছে বটে! কিন্তু সে দেরী ত খালি সময়ের অভাবের জন্যেই! সংসারে কাজ-কর্ম্ম আছে, চারধার দেখাশোনা, তার পর ঐ কচি ছেলের ঝক্কি,—ঝঞ্ঝাট কি কম!

স্বামীকে সে বললে,—হ্যাঁগা, একদিন পিশিমার কাছে বেড়িয়ে এলে হয় না!

স্বামী বললে,—কি করে হয়? এই ছোট্ট ছেলে নিয়ে পাড়াগাঁ যাওয়া—!

কিশোরীর মনে একটু ঘা লাগল। এই পাড়াগাঁয়েই ত তার জীবন কেটে গেছে! ভালোই কেটেছে! এই পাড়াগাঁয়েরই মেটে পথ, শ্যাওলা-পড়া পুকুর, শিউলি-তলা, ভাঙা মন্দির তার কত আনন্দের জিনিষ ছিল! আর আজ এই পাড়াগাঁয়ে তার ছেলের যাবার উপায় নেই! পঞ্চাশ রকমের নিষেধ মস্ত বেড়া তুলে দাঁড়িয়ে আছে!

আর পিশিমা! আহা, বেচারী! সংসারে সে-ছাড়া তার যে আর কেউ নেই! তাকে কোলে-পিঠে করে, তারই মুখ চেয়ে পিশিমা এই বাঁধন-হারা সংসারে একটা মস্ত বাঁধন পেয়েছিল যে! সংসার আবার তার সামনে সহস্র প্রলোভন বিস্তার করেছিল!

আর পিশির আর কি আছে, কে আছে? কেউ না,—কিছু না!

সে ভাবলে, আজ দুপুর বেলায় সে পিশিমাকে চিঠি লিখবে—মস্ত চিঠি। খোকার কথা, নিজেদের কথা সব লিখবে। তা-ছাড়া পিশিমাকে একবার আসবার কথাও লিখবে! কেন পিশিমা আসবে না? জামাই-বাড়ী! ওঃ,—ভারী ত বয়ে গেল তাতে!

দুপুর বেলায় সে চিঠির কাগজ নিয়ে বস্‌ল, পিশিমাকে চিঠি লিখতে। আকাশের পানে চেয়ে-চেয়ে সে অনেক কথা ভাবতে লাগল। কি লিখবে, মোলায়েম করে কি-কি কথা লিখলে পিশিমার এই এত দিনের দীর্ঘ ব্যথা জুড়িয়ে দিতে পারবে,—ভেবে তার একটা নিশানা করে সে লিখলে,—

শ্রীচরণেষু—

স্বামী এসে সামনে দাঁড়াল, বললে,—কি করছ গা?

—চিঠি লিখচি।

—এখন চিঠি-লেখা থাক্‌। এসো, একটু বেড়িয়ে আসিগে। বরানগরে একটা বাগান ঠিক করা হয়েছে। আরো দু-তিন জন বন্ধু তাদের স্ত্রীদের নিয়ে যাবে, সেখানে চড়ি-ভাতি করা হবে। নৌকো অবধি ঠিক—নাও, উঠে পড়।

—চিঠিখানা লিখে নি গো,—একটু দাঁড়াও।

—না, না, ও ফিরে এসে পরে লিখো'খন।

চিঠি আর লেখা হল না। ব্রাহ্ম ধরণে ঘুরিয়ে ভালো শাড়ী পরে তাতে ব্রুচ এঁটে কিশোরী স্বামীর হাত ধরে গিয়ে গাড়ীতে উঠল। গাড়ী করে ঘাটে এসে নৌকোয়—নৌকোয় করে বরানগরে বাগানের ঘাটে আসা হল। আনন্দ সেখানে যেন উছলে পড়ছিল।

সেই আনন্দের মধ্যে কিশোরী এসে আপনার মনটাকে ছেড়ে দিলে! এ আনন্দে কোথায় ভেসে গেল, পাড়াগাঁয়ের সেই অনাড়ম্বর ভাঙ্গা-চোরা বাড়ী-ঘরের ছোট্ট স্মৃতিটুকু! কোথায় ভেসে গেল, স্নেহময়ী পিশিমার ভাবনায়-আকুল চোখের সে ছল-ছল দৃষ্টিই বা!

সন্ধ্যার সময় সকলে যখন বাড়ী ফিরছিল, তখন অত আনন্দ-হাসি-গল্পের মধ্যে থেকে থেকে একটা বেদনা কিশোরীর প্রাণে ভয়ানক বাজছিল!

বাড়ী ফিরে দেখে, ছেলের গা গরম, পুড়ে যাচ্ছে! খুব জ্বর! কাজেই চিঠি আর সে-রাত্রে লেখা হল না!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

খেলা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত।

CASTORINE

PREPARED FROM THE PUREST & FINEST CASTOR OIL.

H. Bose
MANUFACTURING PERFUMER
CALCUTTA

কেশের জন্য

বিজ্ঞান-সম্মত বিশুদ্ধ সুগন্ধি ক্যাষ্টর-অয়েল।

তৈলের শোধন, দুর্গন্ধ বিমোচন ও কেশপোষক দ্রব্যাদির দোষগুণ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষার পর এই মনোহর 'ক্যাস্টরিন' প্রস্তুত। স্বাভাবিক তৈলকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে পারিলে তাহা কত তরল এবং সুদৃশ্য হয় 'ক্যাষ্টরিন' তাহার পরিচায়ক, অথচ তৈল সুদৃশ্য করিবার জন্য ইহাতে কোনরূপ কিছুমাত্র কৃত্রিম রং সংযোগ করা হয় নাই। ইহাতে কেশ চট্‌চটে হয় না। ইহা সাধারণের বিশেষতঃ ছাত্রগণের অবশ্য ব্যবহার্য্য। মূল্য—প্রতি শিশি—বার আনা মাত্র।

সুন্দরীর রূপের কথা

উঠিলেই সর্ব্বাগ্রে তাহার বর্ণের কথা মনে পড়ে। রূপসী অথচ কালো রং—'সোনার পাথর-বাটীর' মত অর্থহীন বলিয়াই মনে হয়। রং ফরসা না হইলে সকলে তাহাকে সুন্দরী বলিতে রাজী হয় না। এখন প্রশ্ন এই যে, আপনার ত্বকের বর্ণ ঠিক স্বাভাবিক আছে কি? যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রস্তুত

মিল্ক অফ্ রোজ

ব্যবহার করুন। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে মুখত্বকের জড়তা, কর্কশতা, শ্রীহীনতা ও শিথিলতা বিদূরিত হইয়া বদনমণ্ডলের যে কোমলতা, স্বচ্ছলতা ও লাবণ্য আপনার বাঞ্ছনীয় তাহাই প্রদান করিবে। বিশেষতঃ ইহার গন্ধটী এমন কোমল ও মধুর যে প্রসাধনকার্য্যে উহা অপরিহার্য্য মনে হইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। মূল্য—প্রতি শিশি বার আনা।

ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার,

৬৬ নং বৌবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন—১০৮১। টেলিগ্রাম—দেলখোস। B.B.
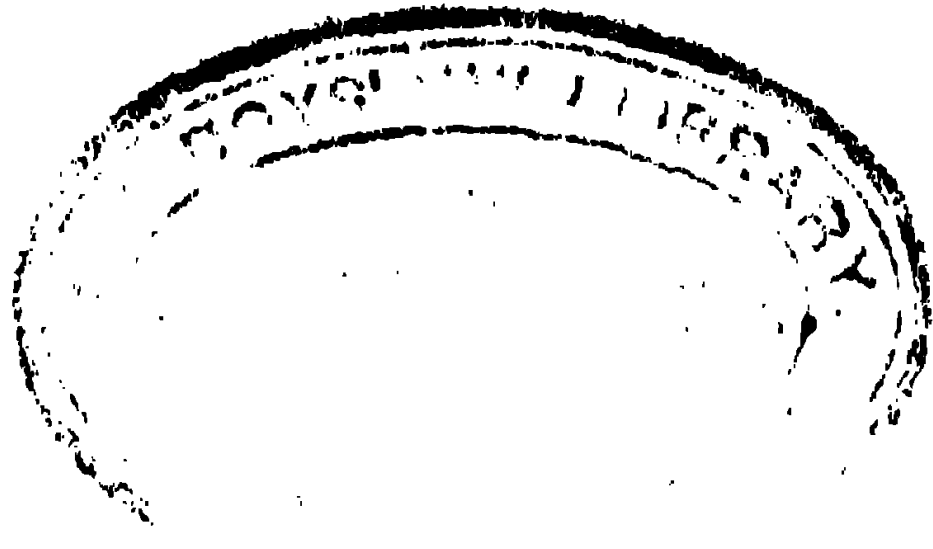
ভারতী

৪৪শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২৭ [৩য় সংখ্যা

নোয়ার কিস্তি

(২)

[একহাতে তেলবলের গদা, একহাতে লণ্ঠন, ভেড়ার লোমের সাজ-পরা, বাঘের নখ, কুমিরের দাঁত ইত্যাদির মালা গলায়, বনমানুষের মতো ভীষণ মূর্ত্তি আদিম মানুষ—আসল নোয়ার প্রবেশ।]

নোয়া। ইস্‌বিস্ ইব্‌লিস্!

মনু। ওহে শয়তান! বলে কি? ইনি কে?

শয়তান। কিছু তো বুঝতে পারছিনে।

নোয়া। (মনুকে দেখিয়ে) ইস্‌বিস্ ইব্‌লিস্।

মনু। আরে নারে বাপু, আমি মনু; ইব্‌লিস্ এরি নাম।

(নোয়া গদা উঠাইয়া শয়তানের দিকে অগ্রসর)

শয়তান। কি বিপদ, মারবে না কি!

নোয়া। (গদা আস্ফালন কোরে) ঈস্-বীস্ ঈব্‌লিস্-স্-স্—

শয়তান। কি বলে, কিছুই বুঝিনে! কেবল সাপের মতো ফোঁস্-ফোঁস্ করছে ও কোন্ জানোয়ার?

মনু। আমার বোধ হচ্ছে আদিম মানুষ। ইস্কুলে পড়বার সময় ডারুউইনের বই-খানায় ঠিক অমনি একটা ছবি দেখে-ছিলুম।

শয়তান। তাহলে তো আমাদের কথা বুঝবে না—উপায়!

মনু। সব ভাষার গোড়া দেব-ভাষায় বল্লে হয় তো বুঝবে।

শয়তান। দেব-ভাষা তো আমার মুখে বেরোবেনা।

মনু। আমারো ও-ভাষায় সম্পূর্ণ দখল নেই। দেখি সব ভাষার খিচুড়ি কোরে যদি ওকে গেলাতে পারি;—কি বল?

নোয়া। ইস্‌বিস্—

শয়তান। আরে যা করবার চট্‌পট্ কর, ওই এগিয়ে আসছে!

মনু। ওঃ ক্রু এ ভোঃ!

নোয়া। (মাটিতে গদা ঠুকিয়া) নুহঃ।

শয়তান। বুঝেছে! বুঝেছে!

মনু। কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝলেম না! নুহ মানে কি? দূর কর, সাধু ভাষা চল্লো না। চল্‌তি ভাষায় চেষ্টা দেখা যাক্। কি কও কর্ত্তা?

নোয়া। কে হও বাছা?

মনু। আজ্ঞে, আমি হনু মনু!

নোয়া। ওহে, তুমি হনুমান!

মনু। আজ্ঞে না, আমি হনু নই;—ম্যান্।

নোয়া। ম্যান্—ম্যান্—মানসপুত্র—মানুষ

মনু। আজ্ঞে হাঁ, আমি মানুষ, গরীব ব্রাহ্মণ।

নোয়া। ব্রাহ্ম—ব্রাহ্মণঃ!

মনু। আজ্ঞে না, আমি ব্রাহ্ম নই—হিন্দু।

নোয়া। হিন্দু? তব্ হিন্দি বোলো!

মনু। সারলে! হিন্দি বাৎ তো আমার সম্‌জাতে পারবে না সাহেব! বাংলা চল্‌বেনা?

নোয়া হাম্ সব ভাষা থোড়া থোড়া পড়া; চালাও বাংলা। (গদা আস্ফালন।)

মনু। মশায়, ওই মুগুরটা রাখেন, নাহলে মাতৃভাষা পর্য্যন্ত ভুলে যাব।

নোয়া। বহুৎ আচ্ছা, গদা রইলো। কিন্তু সাফ জবাব না যদি দাও, গদা উঠবে।

মনু। আপনি কি জানতে চান্ চট্ কোরে বলুন, আমি ফস্ কোরে জবাব দিই।

নোয়া। আমি জান্‌তে চাই এ মানুষগুলো পড়ে-পড়ে কি করছে?

মনু। মরছে; পড়ছে আর মরছে!

নোয়া। এরা পড়তেই বা যায় কেন, মরতেই বা যায় কেন? এই সন্দিগ্ধ্যে পূর্ণ কর; নাহলে গদা উঠলো বলে।

মনু। তা আমি কি জানি! আমি ওদের পড়তেও বলিনি, মরতেও বলিনি।

নোয়া। তবে এরা পড়েই বা কেন, মরেই বা কেন? কে বল্লে এদের পড়তে, আর কেই বা বল্লে মরতে?

মনু। (শয়তানকে দেখিয়ে) ইনি!

শয়তান। আমি কি রকম!

মনু। তোমার ভয়েই তো এরা পড়লো আর মরলো।

শয়তান। মিছে কথা বলো না, তুলসী-পাতা ছিঁড়োনা। তুমি এদের পড়াও নি?

মনু। না।

নোয়া। মিছে কথা বলছো? এখনো তোমার হাতে পুঁথি রয়েছে দেখ্‌ছি! গলায় পর্য্যন্ত পুঁথির মালা ঝুলিয়ে রেখেছ, আর বল্‌তে চাও পড়াওনি তুমি! এই নোয়ার জাহাজে বসে মিছে কথা বলার শাস্তি কি জানো?

মনু। তা আর জানিনে, চান্দ্রায়ণ!

নোয়া। এই নোয়ার মুগুরে তার মাথার চাঁদি ফাটিয়ে চন্দ্রলোকে—পিতৃগণের কাছে চট্ করে পাঠিয়ে দেওয়া। (গদা উত্তোলন।)

শয়তান। কর কি! থামো, থামো! অবিচার কোরো না।

নোয়া। থাম্‌লেই অবিচার করা হবে।

শয়তান। না। থামলে ঠিক বিচারই হবে;—বিচার হয়ে বসে আছে।

নোয়া। (রাগিয়া) শয়তান! ইব্‌লিস্‌! আশিবিস্‌! তুমি আমাকে ঠকিয়ে উল্টো বিচার করাবে ভেবেছ? তা হবেনা। তুমি আদম আর হাবাকে স্বর্গ থেকে পড়িয়েছিলে, আমাকে আবার তেমনি পড়াবে নাকি!

শয়তান। তোমাকে আমার পড়াতে হবে না, তুমি নিজের কর্ম্মদোষে নিজেই পড়বে, যদি না আমার কথাটা শোন।

নোয়া। আচ্ছা বল শুনছি, কিন্তু—

মনু। আগে শোন না ওর কথা, তার পর কিন্তু কোরো,—আমার মাথার চান্দ্রায়ণ কোরো! ভাই সহদেব, এবারে রক্ষে কর ভাই।

শয়তান। আমাকে আর বনমানুষ লেলিয়ে দেবে?

মনু। বনমানুষ কি, কোনো মানুষ আর তোমার দিকে যদি যায় তো সে দায় আমার!

শয়তান। মনে থাকবে তো?

নোয়া। কই শয়তান, কি বলবে বল।

শয়তান। তুমি বিচার করতে, চাচ্ছ কোন্‌ দলিলের জোরে আগে শুনি, তার-পরে বলছি।

নোয়া। আমার দলিল এই গদা।

শয়তান। ওতো অবিচারের অত্যাচারের দলিল! অমন দলিল তুমি দেখাচ্ছ তো একটা; আমি শয়তান, আমার মাথার উপরে দুটো আছে—ধারালো, ছুঁচালো, মোষের শিং-এর মতো বাঁকা,—"পড়িলে যাহার পরে ভাঙে হীরার ধার!" বিচার তুমি যে করতে পার, তার দলিল আমি দেখতে চাই, তবে তো তোমার আদালতে ওকালতি করবো।

নোয়া। তুমি কি বকৃছ! জাহাজে কোনো দিন পারাপার করেছ কি?

শয়তান। না, পারে যেতে তো আমার ইচ্ছেই হয় না। তবে অপারে—অকূলে জাহাজ ভরা-ডুবি করতে আমাকে যাওয়া আসা করতে হয়—শূন্যভরে বাদুড়ের মতো পাখা মেলে।

নোয়া। তাহলে শোনো। জাহাজের আইন হচ্ছে কাপ্তেনের ইচ্ছে। যে পারাপার করে তার যা হুকুম তাই হ'ল হাকিম, তাই হ'ল বিচার, তাই শাস্তর, তাই শাস্তি।

শয়তান। আচ্ছা, ডাক তাঁকে!

নোয়া। ডাকবো আবার কাকে?

শয়তান। তোমার কাপ্তেনকে!

নোয়া। কাপ্তেন আবার কে! আমি নোয়া, আমি এ জাহাজের কাপ্তেন, খালাসী, সারেং সমস্তই।

মনু। ও বাবা, ইনি একাই একশো দেখছি! আমাকে হারিয়েছে!

শয়তান। তুমি নোয়া নও।

নোয়া। এ সন্দেহ তোমার হবার কারণ?

শয়তান। কারণ আমি পেয়েছি। সে যাই হোক, ধরে নিলেম তুমিই—

নোয়া। নোয়া।

শয়তান। তা যদি হল, তবে বল তো আদম আর হাবাকে পড়িয়েছিল কে?

নোয়া। কেন শয়তান?

শয়তান। হলনা। আদম আর হাবাকে পড়িয়েছিল যে, ওই দুটো মানুষকে পড়া-

বার আগে তার নাম শয়তান ছিল না, পড়ায়ার পরে হ'ল শয়তান !

নোয়া। বুঝলেম না পরিষ্কার কোরে বল —সহজ ভাষায়।

শয়তান। এর চেয়ে সহজ ভাষা আর কি হবে ?

মনু। আমি বলছি শোনো—পুরাকালে পরমপুরুষ--

শয়তান। আরে থামো তুমি ! সে সব কথা তুমি কি জানবে ? মানুষ তখন পৃথিবীতেই আসেনি, নিষিদ্ধ ফল তখন—

নোয়া। আরে বাজে কথা রাখ। পড়ার ফলটা কি দাঁড়ালো ?

শয়তান। ফল দাঁড়ালো—যাঁর দোষে ফল পড়লো আর যিনি আদিমানুষের জুড়ীকে পড়ালেন বিচারে তাঁর হ'ল একটু-খানি বদনাম—শয়তান বোলে। আর নির্দ্দোষ বেচারা—যারা পাকেচক্রে পড়ে পড়লো, তাদের হলো নির্ব্বাসন—নন্দনকানন থেকে !

নোয়া। বিচার তো ঠিকই হয়েছিল।

শয়তান। তাই যদি বল্লে তবে এই বেচারা মনুবাবুর জন্মে উল্টো বিচার তো হ'তে পারে না ! ইনি এই লোকগুলিকে পড়িয়েছেন ; এঁকে তুমি শয়তান বলতে পার ; কিন্তু যারা পড়েছে তাদেরই দাও কঠিন শাস্তি।

মনু। মার মুগুর ওদের মাথায় ! করাও চান্দ্রায়ণ !

নোয়া। মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা মেরে কি লাভ ?

মনু। তবে দাও কটাকে জলে ফেলে।

নোয়া। এই জল-ঝড়ে মরা শেয়াল-কুকুরকেও কেউ বাইরে টেনে ফেলে না, আর আমি মানুষ হয়ে—

মনু। তবে দাও ওই সিংহি-বাঘের মুখে ফেলে !—ওরা আধ-পেটা রয়েছে খেয়ে বাঁচুক।

পণ্ডিত। (আনাস্তিকে) ওহে, ও মোল্লা, ও পাদ্রী, ও ওর নাম কি—থামুস্, আর দেরী নয়, মূর্চ্ছা ভঙ্গ কোরে পৃষ্ঠভঙ্গ দাও !

পাদ্রী। রেডি, ষ্টেডি,অফ্—যঃ পলায়তি স জীবতি

(দুদ্দাড় শব্দে প্রস্থান।)

নোয়া। আরে, আরে, একি !

মনু। ধর, ধর, পালায়, পালায় !

(নোয়ার মুগুরটা নিয়ে তাড়াতাড়ি প্রস্থান।)

নোয়া। (বসিয়া পড়িয়া) এতো ভারি অন্যায় হ'ল,—বিচারের পূর্ব্বেই আসামী পালালো !

শয়তান। ওদের পা আছে পালিয়েছে ; তুমিও যাওনা ওদের পিছনে-পিছনে তাড়া কোরে,—দাও গিয়ে মাথায় মুগুর বসিয়ে !

নোয়া। তুমি তো বল্লে তাড়া কোরে যাও !—এ নৌকোখানা কি যেমন-তেমন ঠাওরালে যে ছুটে গিয়ে ওদের ধরবো ? এ যে একটা বিরাট ব্যাপার ; ভবসিন্ধু পারে যাবার তরণী ;—পৃথিবীর জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গ এতে এসে বাসা করেছে, তার মধ্যে ওই ক'টা মানুষকে কোথায় খুঁজে পাব ?

শয়তান। মানুষ মানুষের কাছেই তো থাকবে। যে খোপে মানুষগুলো তোমার রাখবার কথা, সেই খোপটায় সন্ধান করগে না !

নোয়া। আরে খোপে খোপে থাকে-

থাকে যেখানকার যা গুছিয়ে নিয়ে আসবার কি সময় পেয়েছি? হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, যে যেখানে পারলে উঠে পড়ল! দমদাম্ জিনিষ-পত্তর পোঁটলা-পুটলি খোলের মধ্যে ফেলে ভেসে পড়েছি,—সেই থেকে দুর্য্যোগ চলেছে, সব ওলট-পালট, কিছু গুছিয়ে উঠতে পারছিনে। এমন জানলে কি জাহাজের কাপ্তেনি নিই?

শয়তান। তাই তো, ধর্ম্মের ঘুণ-ধরা ঐ মানুষগুলো যেখানে যাবে সেইখানেই ঘুণ ধরাবে! এমন কি তোমার এই প্রকাণ্ড জাহাজ-খানাকেও ঘুণ-ধরিয়ে ফুটো কোরে দিতে পারে!

নোয়া। সেজন্যে ভাবিনে; গোবরা-কাঠে জাহাজ বানিয়েছি—নোয়ার মত শক্ত সে কাঠ; ছৈ বেঁধেছি পাকা বাঁশের—একটিও কাঁচা বাঁশ নেই; তার উপরে দিয়েছি এঁটেল মাটির সাতপুরু প্রলেপ।

শয়তান। ধর্ম্মের ঘুণ বড় ভয়ানক! চেনোনা তাই ও-কথা বলছ। গোবরমাটি কাঁচাপাকা এমন কি জলে পর্য্যন্ত সে গিয়ে ধরে। কোন্ দিন দেখবে ঐ মানুষগুলো তোমার হাতের ন্যায়দণ্ড মুগুরে পর্য্যন্ত ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে!

নোয়া। তাই নাকি? তবে এখনি তো মানুষের মাথায় আমার আঁ্যা—আমার মুগুর কে নিলে?

শয়তান। ঘুণ! এইবার নোয়ার মর্ম্মে ধরলো! ধরলো—ধরলো—ধরলো—ও-হো হোঃ-হোঃ! (বিকট হাস্য।)

নোয়া। হাস্‌ছিস্? আমার দুঃখে হাস্‌ছিস্? পাজি, হতভাগা, শয়তান, বদমাস, লক্ষীছাড়া, ভূত!

শয়তান। হোঃ হোঃ!

নোয়া। গালাগালি দিলে হাসে এমন তো বেহায়া দেখিনি!

শয়তান। ওগুলো কি গালাগালি হ'ল? ও'তো আমার নাম-কীর্ত্তন করা হ'ল। ও যদি গালাগালি হয় তবে আমিও তোমায় গালাগালি দিই—ওরে ও নোয়া, বুড়ো, কালো, বানরমুখো বনমানুষ!

নোয়া। গালাগালি তবে কাকে বলে?

শয়তান। বটে, আমি তোমায় গালাগালি শেখাই আর তুমি আমায় গাল দাও আর কি!

নোয়া। আঃ! আমার এমন রাগ হচ্ছে! এ সময় মুগুরটা হাতের কাছে নেই।

শয়তান। মুগুরটা তোমার হাতের কাছ থেকে চলে আমার কাছে না এসে যে বাইরে চলে গেছে—সেটা ভালোই হয়েছে!

নোয়া। ভালো হ'ল কেমন কোরে?

শয়তান। তাহলে তুমি যে নোয়া সেটা কেউ আর বলতে পারতো না।

নোয়া। তবে কি বলতো?—নোয়া ছাড়া কি বলতো শুনি?

শয়তান। নোয়া-চুরই বলতো; আর বলবে কি?

নোয়া। চুরি? মুগুরটা কি চুরি বলতে চাও? যে নিষিদ্ধ গাছের ফলের জন্যে আদমের শাস্তি, মুগুরটা সেই গাছের ডালে তৈরি। স্বর্গ থেকে আসবার সময় ওটা আদম প্রথম আনেন পৃথিবীতে; সেই থেকে এপর্য্যন্ত ঐ মুগুর আমার বংশে ব্যাভার হচ্ছে। আমি ঐ মুগুরে পিটিয়ে নতুন পৃথিবীর মাটি সমান

কোরে সত্যযুগের বীজ রুইবো বোলে, সঙ্গে এনেছি। তুমি বলতে চাও ওটা চুরি করা সামিগ্রি? পাজি, হতভাগা, বদমাস্, শয়তান, আশিবিষ, ইব্লিস্!

শয়তান। হোঃ হোঃ হোঃ! (বিকট হাস্য।)

(লম্বা একটা আঁকৃশি-হাতে নোয়ানীর প্রবেশ।)

নোয়ানী। বলি, পাগলের মতো অত চীৎকার করছ কেন?

নোয়া। হ-ত-ভাগা!

নোয়ানী। হতভাগা বলছ কাকে? আমাকে নাকি?

(আঁকৃশি উঁচাইয়া অগ্রসর।)

নোয়া। আরে না, না! ঐ শয়তানটাকে বলছি হতভাগা।

শয়তান। দেখুন দেখি, অমন কাজের মুগুরটা চুরি গেল ওঁর, আর আমি হলেম কিনা হতভাগা! মুগুরটা কি আমার?

নোয়ানী। সত্যিই তো তুমিই হতভাগা। না হলে অমন মুগুরটা হারাও? ও বেচারার কি দোষ যে ওকে বলছ হতভাগা!

নোয়া। তুমি চেনোনা ওকে, ওটা শয়তান।

নোয়ানী। শয়তানের কি অমন চেহারা হয়? আহা দেখতে যেন রাজপুত্তুর! কেমন কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলগুলি, রং যেন ফেটে পড়ছে—কেমন সভ্য-ভব্য—বাস্তবিক বাপু—

নোয়া। আমি তো দেখছি ওর মাথায় পাকানো দুটো শিং, পায়ে দুখানা খুর!

নোয়ানী। বুড়ো হয়ে তোমার চোখে ছানি পড়েছে।

নোয়া। আমি কানা? আমি বুড়ো? মুগুরটা গেল কোথা! আমি মরছি মুগুরের শোকে, উনি এলেন আমাকে উপদেশ দিতে এই সময়!

শয়তান। আর একটু আগে এলে তো ভালো হ'ত না।

নোয়ানী। মুগুর গেছে না বেঁচেছি! কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, কেবল মুগুর ভাঁজছেন আর কাপ্তেনি করছেন! মুগুরটা গিয়ে তবু যেন চেহারাটা একটু মানুষের মতো দেখাচ্ছে।

নোয়া। মুগুর না হ'লে খাবে কি?

নোয়ানী। কেন, মুগুর না হ'লে খাওয়া চলবেনা কেন?

নোয়া। নতুন পৃথিবীর মাটি মুগুর পিটে নরম কোরে তবে তাতে বীজ বপণ করতে হবে, তবে তো কিছু গজাবে।

শয়তান। হাঃ হাঃ!

নোয়া। হাসলে যে?

নোয়ানী। কারণ আছে তাই হাসছেন; —তোমার বুদ্ধি দেখে হাসছেন।

নোয়া। আচ্ছা, তোমার মাথায় মুগুর ছাড়া কিছু গজাবার আর কি উপায় আছে শুনি?

নোয়ানী। যখন এই সাতসমুদ্র তেরো নদীর জলে-ভেজা নরম মাটিতে গিয়ে নোয়ার জাহাজ ঠেকবে, তখন বুঝিয়ে দেবো কিছু গজাতে হ'লে মুগুর কোথায় কাজে লাগে।

নোয়া। তোমার কথা আমি কিছু বুঝলেম না! কেবল তামাসাই করছ; ভবিষ্যতের ভাবনা মোটেই ভাবছ না।

নোয়ানী। কেন ভাবব? তুমি বা ভাব কেন? প্রিয়তম নোয়া, ভাবনা কি? সাত

সমুদ্র তেরো নদীর জলে ভেজানো মাটিতে বীজ ছড়িয়ে গাছ হয়ে, গাছে ফল ধরতে যত দিন যাবে, সে ক'দিন এই আঁকৃশি দিয়ে এই জাহাজের মাস্তলে ঝোলানো মুরগী, হাঁস, তিতির, বটের; আর জাহাজের নীচের তলাকার চৌবাচ্চায় জিয়োনো কৈ, মাগুর, ইলসে মাছের ডিম পেড়ে-পেড়ে তোমাকে সিদ্ধডিম খাওয়াবো, নিজেও খাবো।

নোয়া। তার পর? এ-সবের পর?

নোয়ানী। নতুন পৃথিবীতে নতুন গাছে প্রথম-ফলটি পাকবে আর অমনি এই আঁকৃশি—

নোয়া। আঁকশি কি?

নোয়ানী। বুঝলে না প্রিয়তম—এখনো বুঝলে না?

শয়তান। মুগুর না হলে উনি তো বুঝবেন না।

নোয়ানী। এই সহজ কথাটা—

শয়তান। আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওহে ও, তোমার নাম কি?

নোয়া। নোয়া।

শয়তান। চেয়ে দেখ দেখি ওদিকটায়। কি দেখছ?

(প্রকাণ্ড একটা গোল দাঁড়ে শুক-শারীর আবির্ভাব।)

নোয়া। শুক-শারী দাঁড়ে বসে আছে।

শয়তান। বলে যাও—তার পর?

নোয়া। শুক ঘুমোচ্ছে, শারী চুপিচুপি ছিকে থেকে একটা ফল পেড়ে খাচ্ছে।

শয়তান। বল, বল, তার পর।

নোয়া। তারপর আর কি? দিব্যি কোরে ফলটি খেয়ে ঠোঁটদু'খানি পুঁছে শারীটা শুকের মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে।

নোয়ানী। এতক্ষণে বুঝলে? ওই নতুন পৃথিবীতে প্রথম-ফলটি পেড়ে নিজে বেশ কোরে খেয়ে এই আঁকৃশিটা দিয়ে এমনি কোরে তোমার মাথা চুলকে দেবো।

নোয়া। উঃ, মরেছি, মরেছি!

শয়তান। আমিও তবে সরেছি।

নোয়া। আরে যেওনা, যেওনা! আমার মুগুর—

শয়তান। ওই যে আসছে।

(প্রস্থান।)

(নেপথ্যে—সরো সরো গদাধর আসছেন।)

শুক-শারী। গোপীজী ভজো!

[কাঁশর, ঘণ্টা, শিঙে, ব্যাণ্ড, জগঝম্প সব একসঙ্গে বেজে উঠলো। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সব জাতি দলে-দলে নিজের নিজের পতাকা নিয়ে প্রকাণ্ড একটা Salvation Armyর মতো বিচিত্র বেশে প্রবেশ করলে। মধ্যে ছাতা মাথায়, একহাতে চামর, একহাতে গদা, চণ্ডীর গানের অধিকারীর সাজে মনুবাবু—অলকা-তিলকায় সাজানো—আবির্ভূত হলেন।]

নোয়া। তুমি কে আবার?

পণ্ডিত। গদা-ধর—দেখতে পাচ্ছনা।

মোল্লা। হজরত মুষল্—

রাব্বি। আল্ পটাস্—

পাদ্রী। গ্রেট্ পিট-রি-আর্ক।

নোয়া। আর আমি?

মনু। তুমি কেউ নয়; কেবলমাত্র নোঃ—আঃ!

(উপবেশন।)

নোয়ানী। আর এই নোয়ানী—আঁকৃশি-হাতে?

শয়তান। আঁকড়ি-বুড়ি তুমি আমার!

নোয়ানী। বটে! আমাকে এখন গদাধরের পাশে নম্মি হয়ে বসতে হবে।

শয়তান। কেন, গদাধরের চেয়ে রূপে-গুণে আমি কমটা কিসে?

নোয়ানী। রূপে-গুণে তুমি বরং ভালোই। কিন্তু তোমার নামটা যে থারাপ! লোকে আমায় বলবে শয়তাননী! আঃ তোমার নামটা যদি—

শয়তান। নামটা যদি আমার গদাধর হতো তোমায় লোকে বলতো গদাধরী।

নোয়ানী। তাহলে আমি ওকে চাইনে।

শয়তান। বস্, গদাধরের কিস্তি মাৎ! এসো তবে আমারি কাছে এইবার।

মনু। কিস্তি মাৎ কিহে? হজরত মুষল্ রয়েছেন কি করতে?

নোয়ানী। বটে, আর লোকে বলুক আমায় মোচলনী!

মনু। আল্ পটাস্—

নোয়ানী। মাগো, লোকে ডাকবে পটাসী বোলে! নামের ছিরি দেখে বাঁচিনে!

মনু। (অগ্রসর হয়ে) তবে পিট-রি আরকের—

নোয়ানী। পেত্নি হতে আমি চাইনে!

শয়তান। তার চেয়ে শয়তাননী যে ঢের ভালো।

নোয়ানী। না, আমি তাও হব না।

মনু। কিহে শয়তান, এবারে কার কিস্তি মাৎ হল? কথা নেই যে?

শয়তান। এবারে তাহলে নোয়ার—

নোয়ানী। বেঁচে থাক আমার নোয়া।

মনু। আশীর্ব্বাদ করি তোমার নোয়া জয় যাক্।

নোয়া। বিচারে তাহলে এই আঁকড়ি-বুড়ি—

মনু। তোমারি ভাগ্যে পড়লো।

নোয়া। তাহলে গদাটা আমায় দাও; নাহলে—

নোয়ানী। আর গদায় কাজ কি, এই আঁকৃশি থাকলেই হলো। (আঁকৃশির খোঁচা। নোয়ার পতন ও মূর্চ্ছা।)

মনু। আরে, আরে, কর কি!

শয়তান। নোয়ার কিস্তিও মাৎ!

পণ্ডিত। ওহে নাম শোনাও, নাম শোনাও!

(গান)

"আরে নামে নামে গঙ্গাপানি!" ইত্যাদি।

শুক-শারী। গোপী-জী ভজো!

[দাঁড়ে শুক-শারীর অন্তর্দ্ধান। আলোর চক্রের মাঝে প্রকাণ্ড একটা নোয়ার চাবি হাতে জীব্রিলের আবির্ভাব।]

জীব্রিল। নোয়া, ওঠো!

নোয়া। উঠে করবো কি? আবার তো পড়তে হবে, তার চেয়ে পড়েই থাকি না!

জীব্রিল। নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে গেছে; খাঁচা খুলে সবাইকে একে-একে বার কর।

(নোয়াকে চাবি দিয়ে জীব্রিলের অন্তর্দ্ধান।)

মনু। ইনি কে এলেন এবং গেলেন?

পণ্ডিত। চাবি দিয়ে গেলেন এ কোন্ দেবতা,—তেত্রিশকোটির কোন্‌টি?

মোল্লা। বোধ হচ্ছে হজরত—

পাদ্রী। রেভারেণ্ড—

রাব্বি। আল্—

শয়তান। জীব্রিল!

মনু। নৌকোর ঘরে বসে তো বেশ

কিস্তিমাৎ হচ্ছিল ; চতুরং-খেলায় হঠাৎ ওঁর এসে পড়ার কারণ ?

শয়তান। কারণটা বোধ হয় চাবি দেওয়া।

মনু। অর্থাৎ—

শয়তান। নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে সবাইকে নিয়ে নতুন যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, পশুশালা, পিঁজরাপোল ইত্যাদিতে বন্ধ করা হবে, শুনলে না ?

নোয়া। জীব্রিল হলেন বান্ধব ;—সৃষ্ট জীব মাত্রেরই বন্ধু।

পণ্ডিত। আর কৃষ্টের জীব খৃষ্টের জীব —এদের কি হন উনি ?

শয়তান। হবেন আবার কি ! (জিভ বার কোরে) নাম শুনে বুঝলে না,—জীব্রিল।

নোয়া। তোমায় আর সাপের মতো জিভ নাড়তে হবে না ! এস তোমাদের সবাইকে খাঁচা খুলে বার কোরে দিই, মনের সুখে নতুন পৃথিবীতে বিচরণ করগে।

মনু। চল, চল। (অগ্রসর।)

শয়তান। এবারেও ছিষ্টিতে মানুষের আগে মনুই চল্লেন।

মনু। মনুই তো প্রজাপতির প্রথম—

শয়তান। কিন্তু দেখো মনুবাবু,প্রজাপতির মতো তোমার ডানা নেই, হঠাৎ খাঁচা থেকে বেরিয়ে যেন জলে পড়ো না. দেখে-শুনে নতুন পৃথিবীতে পা—

মনু। বুঝেছি আর বল্‌তে হবে না।

নোয়া। চলনা ; দাঁড়ালে কেন ?

মনু। আরে রও, আগে ভক্তরা যাবেন পৃথিবীতে,তবে তো ভগবান মনু অবতীর্ণ হবেন সেখানে ! ওহে ও পণ্ডিত, চল তুমিই এগিয়ে চল, পথ দেখাও।

পণ্ডিত। আজ্ঞে আমার পায়ের বাতটা কদিন ধরে বড়ই বেড়েছে, এ সময় সোঁতা মাটির উপরে হঠাৎ গিয়ে পড়লে—

মনু। মোল্লা, তুমি তবে এগিয়ে দেখ। চুপ রইলে যে ? রেভারেণ্ড ফাদার, তুমি তবে—

পাদ্রি। ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেণ্ট আগে যাবেন একি হতে পারে প্রভু ! এই থামুস্‌কে পাঠান।

মনু। তাহলে তুমিই—

রাব্বি। থামুস্ !

মনু। ওকি ? থামুস্ বলেই চুপ করলে যে ! ভাই সহদেব, ওহে শয়তান, তাহলে তুমি একবার দেখনা—সত্যিই এখনো চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে, না শুক্‌নো মাটি কিছু বেরিয়েছে।

শয়তান। আলোতে তো আমার যাবার যো নেই, গেলেই চোখ উঠবে।

মনু। পণ্ডিত-মশায়, দেখুন না—খুব দূরে একটা দরজার ফাটল দিয়ে আলো আসছে ! নিশ্চয়ই বাইরে সূর্য্য উঠেছে। দিব্বি খট্ খট্ করছে দিন। আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই, দেখছেন ওই আলোটা।

পণ্ডিত। ও আলেয়ার আলো ! আমি জানি এখন বাইরে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি হচ্ছে, জলে চারিদিক থৈ থৈ করছে, একতিল মাটি নেই।

নোয়া। আচ্ছা, রোসো, আমি দেখছি। ওহে সব পরিষ্কার—একটুও মেঘ নেই, বেরিয়ে পড় এইবেলা।

শয়তান। মেঘ নেই থাকলো, জল আছে কিনা ?

নোয়া। সে তো এখান থেকে দেখা যাবে না, আমরা যে আরারুটের চূড়োয় রয়েছি; অনেক নীচে পৃথিবী! কিন্তু পাহাড়ের চূড়োটা বেশ শুক্‌নো দেখা যাচ্ছে। নেমে পড় সবাই।

মনু। পাহাড়ের চুড়ো শুক্‌নো থাকলো তাতে কি?

শয়তান। তার চেয়ে আরো শুক্‌নো তো এই পাহাড়ের উপর নৌকোর কাম্‌রাটা।

নোয়া। তাহলে তোমরা নামতে চাও না? আমি কাপ্তান, আমার কথা অমান্ত করছ?

নোয়ানী। তোমার আর কাপ্তানি ফলাতে হবে না! দাও দেখি চাবির গোছাটা আমার হাতে!

নোয়া। কেন চাবি নিয়ে আবার তুমি করবে কি? গদাটা গেছে, আবার চাবি আমি ছাড়ি! রইলো এই গলায় ঝোলানো।

নোয়ানী। চাবি না হয় নাই দিলে, এখন আমি যা বলি কর। ওরা যদি কেউ না যেতে চায়, তবে ঐ খাঁচাগুলোর চাবি খুলে দাও, বাঘ-ভালুকগুলো একটু মাঠে ছুটোছুটি ক'রে বাঁচুক্। এস, এই খাঁচাটা আগে খোলো—ওরে বাস্‌রে মস্ত একটা বাঘ!

(বাঘের গর্জ্জন।)

মনু। আরে বাপরে, খুলোনা, থামো, রোসো!

সকলে। পালা রে পালা! (গর্জ্জন ও সকলের হুদ্দাড় পলায়ন, পতন, উত্থান ইত্যাদি।)

মনু। ধর ধর আমাকে চট্ কোরে! (দর্শকদের প্রতি) ওহে তামাসা দেখছ কি, ধরনা আমি মোটা মানুষ।

(সকলের পলায়ন।)

নোয়া। এই যে আমার গদাটা ওরা ফেলে গেল! (গদা ঘুরাইয়া) বেরও বেরও চট্ কোরে আলোতে; চল অন্ধকার থেকে নতুন পৃথিবীতে নেমে পড়।

নোয়ানী। তুমি ওই গদার ঘায়ে মানুষ-গুলোর আলোতে বার হবার পথটা পরিষ্কার করে দাওগে, চাবির গোছাটা আমায় দাও, আমি হাঁস-মুরগীর ঝুড়িগুলো খাঁচা-ঘরের মধ্যে থেকে বার কোরে গোরু মোষ ভেড়া আর কাগ-বগগুলোকে ছেড়ে দিই নতুন পৃথিবীতে।

নোয়া। আর বাঘভালুকগুলোকে?

নোয়ানী। এখন ছাড়া নয়; তাহলে সব খেয়ে ফেলবে। আগে ঘর-দুয়োর গোয়াল গোঠ গুছিয়ে নিই, তারপর বুনো জন্তুদের ছাড়বো। আমার সেই কুকুরটাকেও নিতে হবে।

নোয়া। আর শয়তানটাকে? সে কোথা গেল? তাকে নেবে না?

নোয়ানী। তার বদলে এই বনমানুষটাকে সঙ্গে নিলেই চলবে।

(নোয়ার গলা ধরিয়া প্রস্থান।)

সমাপ্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবতার

(Theophile Gautier-এর ফরাসী হইতে)

অক্টেভের দেহ কোন্ রোগে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হইতেছে তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অক্টেভ শয্যাশায়ী হয় নাই; সে দৈনিক জীবনের কাজ সমান ভাবে করিয়া যাইতেছিল; কখন একটি হা-হুতাশ তার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই; তথাপি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, তার শরীর ক্রমশই ধ্বংসের দিকে যাইতেছে। তার আত্মীয়-স্বজন উৎকণ্ঠিত হইয়া ডাক্তার ডাকাইলেন; ডাক্তার বলিলেন, বিশেষ কোন রোগ কিংবা ভয় পাইবার মতো কোন রোগের লক্ষণ তাহার শরীরে কিছুই প্রকাশ পায় না; বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ভাল আওয়াজই হইতেছে; হৃৎপিণ্ডের উপর কাণ রাখিয়া শুনিলেন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন খুব দ্রুতও হইতেছে না, খুব আস্তেও হইতেছে না। কাসি নাই; জ্বর নাই; কিন্তু তবু তার জীবনী-শক্তি যেন কোন অদৃশ্য ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। ধন্বন্তরী বলেন, মানুষের জীবন এইরূপ গুপ্ত ছিদ্রে পূর্ণ।

কখন কখন তার মূর্চ্ছা হইত; তাহাতে মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ পাথরের মতো শক্ত হইয়া উঠিত। দুই এক মিনিট কাল মনে হইত যেন প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে; কিন্তু একটু পরেই, যে হৃৎ-স্পন্দন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা যেন কোন রহস্যময় অদৃশ্য হস্তের দ্বারা আবার চালিত হইত। অক্টেভের মনে হইত যেন সে কোন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

ব্যাধিনাশক উৎস-জল-সেবনের জন্য উৎস-দেশে তাকে পাঠান হইল। কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইল না। সমুদ্র পথে নেপল্‌স্ নগরে পাঠান হইল, তাহাতেও কোন ফল হইল না। যে সুন্দর সূর্য্যের এত খ্যাতি ও গৌরব, তাহার নিকট সেই সূর্য্য অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাধি-স্থান বলিয়া মনে হইল। যে বাদুড়ের কালো পাখার উপর "বিষণ্ণতা" যেন স্পষ্ট লেখা থাকে, সেই বাদুড়ের ধূলিময় পাখা এই উজ্জ্বল-নীল আকাশের উপর যেন চাবুক হানিতেছে এবং বাদুড়েরাও মাথার উপর ঘোরপাক দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। যেখানে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা নগ্নগাত্রে সূর্য্যকর সেবন করিয়া তাম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে সেই মের্জেলিনের জাহাজ-ঘাটে আসিয়া তাহার রক্ত যেন জমিয়া গেল।

কাজেই অক্টেভ আবার তাহার বাসা-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল; আবার সাবেক অভ্যাস অনুসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ছেলে-ছোকরার ঘর যতটা সজ্জিত হইতে পারে, সেই হিসাবে ঘরগুলা আসবাব-পত্রে মন্দ সজ্জিত নহে। কিন্তু

ঘরে যে বাস করে, তার চেহারা ও চিন্তা-প্রবাহ ক্রমশ যেন সেই ঘরেতেও সংক্রামিত হয়। অক্টেভের বাসা-বাড়ী অক্টেভেরই মতো একটু বিষন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পর্দ্দার বুটিদার গোলাপী রঙের কাপড়ের রং জ্বলিয়া গিয়া ফ্যাকাসে হইয়া পড়িয়াছে; তাহার মধ্য দিয়া এখন একটু সাদাটে রঙের আলো আসে মাত্র। বড় বড় ফুলের তোড়া শুকাইয়া গিয়াছে। ওস্তাদের হাতের ভাল ভাল ছবি ফ্রেমে আবদ্ধ—সেই ফ্রেমের সোনালি ধার ধূলায় ক্রমশ লাল হইয়া গিয়াছে; অগ্নি-কুণ্ডের আগুন অবহেলাবশতঃ নিভিয়া গিয়াছে, ছাইয়ের গাদা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। ঝিনুকখচিত ও তাম্রমণ্ডিত দেয়াল-ঘড়ীর শোভা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে; আছে মাত্র সেই টিক্ টিক্ শব্দ, যে শব্দ রোগীর কামরায় রোগীর দুর্যাপ্য সময় মৃদুস্বরে জানাইয়া দেয়। দরজাগুলার কপাটগুলা নিঃশব্দে বন্ধ হয়; দরজার পা-পোষের উপর কচিৎকখন কোন আগন্তুক অতিধীরে পাদক্ষেপ করে। এই ঠাণ্ডা ও অন্ধকেরে ঘরগুলায় ঢুকিবামাত্র আনন্দের হাসি যেন আপনা-আপনি আটকিয়া যায়; ঠাণ্ডা ও অন্ধকেরে হইলেও ঘরগুলায় আধুনিক ধরণের আস্‌বাবের অপ্রতুল নাই। অক্টেভের ভৃত্য, একটা পালোকের ঝাড় বগলে করিয়া হাতে একটা বার্‌কোষ লইয়া ঘরের মধ্যে ছায়ার মতো ঘুরিয়া বেড়ায়; স্থানটির স্বাভাবিক বিষন্নতা প্রযুক্ত পরিশেষে অজ্ঞাতসারে সেই ভৃত্যও তাহার বাচালতা হারাইয়াছে। দেয়ালে মুষ্টি-যুদ্ধের সরঞ্জাম সকল টাঙ্গানো রহিয়াছে, কিন্তু দেখিলেই বুঝা যায়, বহুদিন যাবৎ তাহাতে হস্ত স্পর্শ হয় নাই। বই-গুলা হস্তে লইয়া আবার ইতস্তত ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছে—এই সকল নিক্ষিপ্ত কেতাব আস্‌বাবের উপরেই গড়াগড়ি যাই-তেছে। একটা পত্র-লেখা আরম্ভ হইয়াছে, কত মাসে যে তার শেষ হইবে, বলা যায় না; চিঠির কাগজ-খানায় হল্‌দে রং ধরিয়াছে—উহা আফিস্-ডেক্‌সের উপর নীরব ভর্ৎসনার মতো বিরাজ করিতেছে। ঘরে লোক থাকিলেও ঘরগুলা মরুভূমির মত মনে হইতেছে। উহার মধ্যে যেন জীবন নাই কবরের মুখ খুলিয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ কেহ ঘরে প্রবেশ করিলে তাহার মুখের উপর একটা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা আসিয়া লাগে।

এই বিষাদময় আবাসগৃহে কোন রমণী এ পর্য্যন্ত পদনিক্ষেপ করে নাই। অক্টেভ এইখানেই বেশ আরামে বাস করিতেছে; এমন আরাম সে আর কোথাও পায় না; এই নিস্তব্ধতা, এই বিষন্নতা, এই এলো-মেলো ভাব—ইহাই তাহার ভাল লাগে। জীবনের তুমুল আমোদ-কোলাহলে যোগ দিতে অক্টেভ ভয় করে;—যদিও কখন কখন এইরূপ আমোদ-আহ্লাদের মজ্‌লীসে মিশিতে সে চেষ্টা করিয়াছে! তার বন্ধুরা কখন কখন নিমন্ত্রণ-সভায়, আমোদ-প্রমোদের সভায় তাকে জোর করিয়া লইয়া যাইত—কিন্তু সে সেই-সব স্থান হইতে আরও বিষন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিত। তাই সে এই রহস্যময় বিষাদের সহিত আর এখন যুঝাযুঝি করে না। কাল কি হইবে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ঔদাসীন্যের সহিত দিনগুলা কাটাইয়া দেয়।

সে কোনপ্রকার মৎলব আঁটিত না,— ভবিষ্যতের প্রতি তাহার বিশ্বাস ছিল না। সে মৌনভাবে ভগবানের নিকট তার জীবনের ইস্তফা পাঠাইয়াছিল, আশা করিয়াছিল, এই ইস্তফা গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু তুমি যদি কল্পনা কর,—তার মুখ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, রং মলিন হইয়া গিয়াছে, হাত-পা সরু হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বড়ই ভুল করিবে। চোখের পাতার নীচে অল্প-বিস্তর যেন থেঁত্‌লিয়া গিয়াছে, চোখের চারিধার একটু হলদে হইয়াছে; কপালের রগে নীল শিরা বাহির হইয়াছে,—লক্ষ্য করিলে এইমাত্রই পাইবে। কেবলমাত্র, চোখে আত্মার জ্যোতি নাই, ইচ্ছা, আশা, বাসনা সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। এরূপ তরুণ মুখে এরূপ মৃতবৎ দৃষ্টি বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়; জ্বর-প্রভৃতি সাধারণ রোগের লক্ষণ দেখিয়া যত-না কষ্ট হয়, উহার মুখ দেখিলে তাহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট হয়।

এইরূপ বিষাদ-অবসাদে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে যাকে বলে "দিব্য সুশ্রী ছেলে," অক্টেভ তাহাই ছিল। বরং আরো কিছু বেশী। কোঁকড়া কোঁকড়া ঘন কালো চুল,—রেশমের মত নরম ও চিক্‌চিকে—কপালের দুই পাশে আসিয়া জমিয়াছে। টানা-টানা চোখ, মখমল-পেলব নেত্রপল্লব নীলাভ পক্ষ্মরাজি ঈষৎ বক্র; নেত্রদ্বয় কখন কখন একপ্রকার আর্দ্র জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত; বিশ্রামের সময় এবং কোন আবেগে উত্তেজিত না হইলে মনে হইত যেন উহা প্রাচ্যদেশীয় লোকের নেত্র। তার হস্ত অতি সুকুমার ও পদতল পাতলা ধনুবৎ বক্র ছিল। সে বেশ ভালো বেশ-বিন্যাস করিত;—তাহার স্বাভাবিক রূপ-লাবণ্যের যাহাতে খোল্‌তাই হয় সেইরূপ পরিচ্ছদ সে পরিত; কিন্তু "ফিটবাবু" হইবার দিকে তার কোন ঝোঁক্ ছিল না।

এমন তরুণবয়স্ক, এমন সুশ্রী, এমন ধনবান,—তার সুখী হইবার সব কারণই ছিল—তবে কেন সে এমন করিয়া আপনাকে দগ্ধ করিতেছে? তুমি হয়ত বলিতে, আমোদ-প্রমোদের আতিশয্যে তাহার আমোদে অরুচি হইয়াছে কিংবা অস্বাভাবিক উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সে কিছুই বিশ্বাস করে না; কিংবা নানাপ্রকার বদ্‌খেয়ালি করিয়া সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছে;—কিন্তু ইহার একটাও সত্য নহে। আমোদ-প্রমোদে সে বড় একটা যোগ দিত না, সুতরাং তাহাতে অরুচি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সে নীরস প্রকৃতিও ছিল না, কল্পনাপ্রবণও ছিল না; নাস্তিকও ছিল না, লম্পটও ছিল না, উড়ন-চণ্ডীও ছিল না। এতদিন পর্য্যন্ত অন্য যুবকদিগেরই মতো সে পড়াশুনা ও ক্রীড়া-আমোদ লইয়াই থাকিত। কবে কেন যে তার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইল, তার কারণ কেহই বলিতে পারে না—চিকিৎসা-বিজ্ঞানও এই বিষয়ে হার মানিয়াছে। ইহার কারণ কি, স্বয়ং আমাদের নায়কই বলিতে পারে।

সাধারণ ডাক্তাররা এরূপ রোগের কথা কখন শুনে নাই। কেননা, এখনও পর্য্যন্ত চিকিৎসার কালেজে আত্মার 'শবচ্ছেদ' বা

ব্যবচ্ছেদ ত কেহ করে নাই। সুতরাং আর কোন উপায় না দেখিয়া একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হইতে হইল। অনেক দিন ভারতবর্ষে বাস করিয়া, তিনি সম্প্রতি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি নাকি নানা উৎকট রোগ আশ্চর্য্যরকমে আরাম করেন।

অক্টেভ ভাবিল, অসাধারণ সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রভাবে হয়ত এই ডাক্তার তাহার মনের গোপনীয় কথাটা ধরিয়া ফেলিবে, তাই এই ডাক্তারকে ডাকিতে সে ভয় করিতেছিল; অবশেষে তাহার জননীর কাতর অনুনয়ে ও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ডাক্তার বালথাজার-শেরবোনোকে সে ডাকিতে সম্মত হইল।

যখন ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন অক্‌টেভ একটা পালঙ্কের উপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় ছিল। মাথার নীচে একটা বালিস, একটা বালিসের উপর কুনুইয়ের ভর, আর একটা বালিসে তার পা ঢাকা; সে একটা বই পড়িতেছিল কিংবা তার হাতে একটা বই ছিল মাত্র; কেননা, তার চোখের দৃষ্টি বইয়ের একটা পাতার উপর বদ্ধ থাকিলেও সে তাহা দেখিতেছিল না। তার মুখ ফ্যাকাসে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কোন বিশেষ অসুখের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু উপর-উপর নজর করিলে, যুবকটির কোন গুরুতর পীড়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না—কেননা গোল টেবিলের উপর ঔষধের শিশি, বড়ি, আরক, ঔষধের মাপ-গেলাস ইত্যাদি ঔষধালয়ের সরঞ্জামের বদলে এক বাক্‌স সিগারেট্ মাত্র রহিয়াছে। মুখে একটু ক্লান্তির ভাব থাকিলেও, নির্দ্দোষ মুখশ্রীর পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—কেবল গভীর দুর্ব্বলতা এবং চোখের হতাশ-ভাব ছাড়া স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের আর সব লক্ষণই রহিয়াছে।"

অক্‌টেভ আর সব বিষয়ে যতই উদাসীন হোক্ না কেন, ডাক্তারের অদ্ভুত চেহারা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ডাক্তারের রং 'রোদে-পোড়া' কপিল-বর্ণ। তাঁহার মাথার প্রকাণ্ড খুলিটা মুখকে যেন গ্রাস করিয়া রহিয়াছে—মাথায় চুল নাই, তাহাতে মাথাটা আরও প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হয়। এই নগ্ন করোটী হস্তিদন্তের মতো মসৃণ,—উহার সাদা রংটা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; কিন্তু উপরকার চর্ম্মাবরণ, সৌরকরস্পর্শে রৌদ্র-দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। করোটী-অস্থির উঁচু-নীচু অংশগুলি খুব স্পষ্ট ও পরিস্ফুট। কেশ-বিরল মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে দুই তিন গুচ্ছ কেশ এখনো রহিয়াছে। কাণের উপর দুই গুচ্ছ এবং ঘাড়ের উপর এক গুচ্ছ। কিন্তু সব-চেয়ে ডাক্তারের চোখ্ দুটিই বেশি দৃষ্টি-আকর্ষক।

মুখমণ্ডল বয়ঃপ্রভাবে একটু তাম্রবর্ণ, সৌরকরস্পর্শে রৌদ্রদগ্ধ, এবং বিজ্ঞানানুশীলনে উহার উপর গভীর রেখাপাত হইয়াছে; কেতাবের পাতার মত ভাঁজ পড়িয়া গিয়াছে; এই মুখের মধ্যে, চোখের দুটি নীলাভ স্বচ্ছ তারা জল্‌জল্ করিতেছে; তাহাতে কেমন একটা তাজাভাব ও তারুণ্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মনে হয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে শিক্ষিত কোন যাদু-মন্ত্রে, যেন শবের মুখের উপর তরুণ বালকের চোখ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই ডাক্তারের পোষাক সেকেলে ডাক্তারি পোষাকের মতো। কাল কাপড়ের কোর্ত্তা ও পাজামা; কালো রংয়ের ফতুই; কামিজের উপর একখণ্ড বড় হিরা;—এই হিরক-খণ্ডটি বোধ হয় পুরস্কারস্বরূপ কোন রাজা বা নবাবের নিকট পাইয়া থাকিবেন। পরিচ্ছদ গায়ে 'ফিট্' হইয়া বসে নাই—কাপড়-ঝুলাইবার কাষ্ঠদণ্ডের উপর যেন ঝুলিতেছে। দেহের এই অসাধারণ শীর্ণতা যে শুধু ভারতের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে ঘটিয়াছে তাহা নহে। গুপ্ত বিদ্যায় দীক্ষিত হইবার উদ্দেশে বালখাজার শেরবোনো, সন্ন্যাসীদের ন্যায় দীর্ঘকালব্যাপী উপবাস করিতেন, যোগীদিগের নিকট, চারিটা প্রজ্জ্বলিত অনলশিখার মধ্যে, মৃগচর্ম্মের উপর বসিয়া থাকিতেন।

কিন্তু এইরূপ মেদমাংসক্ষয়ে তাঁর শরীর দুর্ব্বল হয় নাই। তাঁর হাতের পেশীবন্ধন-গুলি বেহালার তাঁতের মতো বেশ দৃঢ়বদ্ধ ও সটান ভাবে প্রসারিত

অক্‌টেভের অঙ্গুলীনির্দ্দেশে ডাক্তার, পালঙ্কের একপাশে একটা নির্দ্দিষ্ট কেদারায় হাঁটু দুমড়াইয়া বসিলেন—মনে হয়, এই ভাবে মাদুরের উপর বসাই তাঁর চির-কেলে অভ্যাস। এইরূপ উপবিষ্ট হইয়া ডাক্তার শেরবোনো আলোর দিকে পিঠ ফিরাইলেন; এই আলো পুরাপুরী রোগীর মুখের উপর পড়িয়াছে। এই সংস্থানটি পরীক্ষার অনুকূল। বিশেষতঃ যে ব্যক্তির অপরকে দেখিবার কৌতুহল আছে অথচ নিজেকে দেখা দিতে চাহে না তাঁর পক্ষে এইভাবে বসাই সুবিধা। যদিও ডাক্তারের মুখ ছায়াচ্ছন্ন ছিল এবং তাঁর সাম্‌রোথের ডিমের মতো গোলাকার চক্‌চকে মাথার খুলির উপর একটিমাত্র সূর্য্যরশ্মি পড়িয়াছিল, তথাপি অক্টেভ দেখিতে পাইল তাঁর নীল চোখের দুটি তারা হইতে যেন ফস্‌ফরস্‌-ময় পদার্থের মত স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতেছে।

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার রোগীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন; তারপর বলিলেন;—দেখুন মহাশয়, আমি দেখ্‌ছি আপনার এ রোগ আমাদের চলিত নিদান-শাস্ত্রের রোগ নয়; যে সব রোগের স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে,—যা দেখে চিকিৎসকেরা রোগ আরাম করে কিংবা আরও খারাপ করে, সেই তালিকা-ভুক্ত রোগ এ নয়। আমি আপনার নিকট একটুকরা কাগজ চেয়ে তাতে সাংকেতিক হিজিবিজি অক্ষর লিখে আপনাকে দেব, আর আপনার চাকর ঝাঁ-করে পাশের দাওয়াইখানা থেকে কতকগুল মার্কামারা শিশি নিয়ে আস্‌বে—এস্থলে সে-সব চল্‌বে না।" অনাবশ্যক ঔষধপত্র হইতে রেহাই পাওয়ার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনচ্ছলে অক্টেভ মৃদু মৃদু হাসিল।

আবার ডাক্তার বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"আপনি অত শীঘ্র খুসি হবেন না; কেন না, আপনার যে রোগ তা হৃৎপিণ্ডের অতিবৃদ্ধিও নয়, ফুস্‌ফুসের দুষ্ট স্ফোটকও নয়, পৃষ্ঠদণ্ডস্থ মজ্জার কোমলতাও নয়। হাতটা দেখি।" ডাক্তার ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিবেন মনে করিয়া অক্টেভ স্বকায় আলখাল্লার আস্তিনটা সরাইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। হাতের কব্জিতে কিরূপ স্পন্দন হইতেছে তাহা না দেখিয়া ডাক্তার কাঁক্‌ড়ার দাঁড়ার মতো অঙ্গুলীবিশিষ্ট তাঁর

খাবার মধ্যে, অক্টেভের সরু, নীলশিরা-বিশিষ্ট, আর্দ্র হস্তটি জাপটিয়া ধরিয়া উহা টিপিতে লাগিলেন, দলিতে লাগিলেন, মলিতে লাগিলেন, পরীক্ষা-পাত্রের সহিত চুম্বক-আকর্ষণের যোগ স্থাপনের জন্য যেন ঐ-সব প্রক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ঔষধপত্রে বিশ্বাস না করিলেও, এই-সব প্রক্রিয়ায় অক্টেভের একপ্রকার উৎকট অনুভূতি হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন ডাক্তার এইরূপে তার আত্মাকে নিংড়াইয়া বাহির করিতেছেন, তার গণ্ডস্থল হইতে রক্ত একেবারে অন্তর্হিত হইল

যুবকের হাত ছাড়িয়া দিয়া, ডাক্তার বলিলেন :—"আপনি ততটা মনে করচেন না, কিন্তু আসলে আপনার অবস্থা খুবই গুরুতর; বিজ্ঞান,—অন্ততঃ এখনকার প্রচলিত চিকিৎসা-শাস্ত্র এর কোনই প্রতীকার করতে পারবে না; আপনার আর বাঁচ্‌বার ইচ্ছা নাই; আপনার আত্মা অলক্ষিতে আপনার শরীর থেকে বিমুক্ত হচ্ছে। এ আপনার 'হিপকণ্ড্রিয়াও' নয়, 'লিপমেনিয়া'ও নয়, আত্মহত্যা-প্রবণতাও নয়—না, এ-সব কিছুই না। এ রকম রোগ অতি বিরল ও বড়ই কৌতুকাবহ। আমি যদি এর প্রতিবিধান না করি, তাহলে আপনি বেমালুম মারা যাবেন—অভ্যন্তরে কি বাহিরে, কোন বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাবে না। আমাকে ডাকবার এই ঠিক সময়; কেননা এখন আপনার আত্মা আপনার শরীরের মধ্যে একটি সূত্র অবলম্বন করে রয়েছে; আমরা এখন এই সূত্রে একটি দৃঢ় গ্রন্থি বেঁধে দেব।" এই কথা বলিয়া ডাক্তার আনন্দে হাতে হাত ঘষিতে লাগিলেন, মৃদু হাসির মুখভঙ্গি করিতে লাগিলেন—এইরূপ চেষ্টায় তাঁর মুখের বলি-রেখাগুলা অসংখ্য ভাঁজের আবর্ত্ত রচনা করিয়া তুলিল।

অক্টেভ বলিল :—"ডাক্তার-মশায়, আমি জানিনে আপনি আমাকে সারাতে পারবেন কি না, সেরে উঠতে আমার ইচ্ছাও নাই—কিন্তু এ কথা আমি কবুল করচি যে, আপনি এক আঁচড়েই রহস্যটা ভেদ করেছেন। আমার শরীরটা যেন ঝাঁঝরি হয়ে পড়েছে; ঝাঁঝরির ছিদ্র দিয়ে যেমন জল বেরিয়ে যায়, সেইরকম আমার আমিটা আমার শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে—আমি যেন একটা অসীম বিরাটের মধ্যে মিশিয়ে যাচ্ছি,—কোন্ রসাতলের গর্ভে তলিয়ে যাচ্চি তা বুঝ্‌তে পারচি নে। মূক-অভিনয়ের মত যতটা পারি দৈনিক জীবনের কাজ সবই করে যাচ্ছি, পাছে আমার পিতামাতার মনে কষ্ট হয়। কিন্তু এই জীবনটা যেন আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে—কোন কোন মুহূর্ত্তে মনে হয় যেন আমি মনুষ্যলোক থেকে বেরিয়ে গিয়েছি। আগেকার মতই আমি যাওয়া-আসা করচি, যে-মনের আবেগে পূর্ব্বে যাওয়া-আসা করতাম, সেই যন্ত্রবৎ আবেগটা এখনো রয়ে গেছে, কিন্তু যাই করি না কেন, আমার কোন কাজেই আমি নিজে যেন যোগ দিই না। আমি সময়মতো খেতে বসি, লোকে দেখ্‌লে মনে করবে আমি সচরাচর লোকের মতোই পান-আহার করচি; কিন্তু যতই কেন মুখরোচক খাদ্য আমাকে দেওয়া হোক্ না—আমার তাতে আদপে রুচি হয় না, সূর্য্যের আলো আমার

কাছে চাঁদের আলোর মত ফ্যাঁকাসে বলে মনে হয়; আর বাতির আলোর শিখা আমার চোখে কালো দেখায়। গ্রীষ্মকালের খুব গরম দিনে আমার শীত করে, কখন কখন আমার ভিতরে যেন একটা মহা নিস্তব্ধতা আসে, মনে হয় যেন আমার হৃৎপিণ্ডটা আর স্পন্দন করচে না; এবং যেন কোন অজ্ঞাত কারণে আমার শরীরের ভিতরকার যন্ত্রগুলা রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থাটা মরণ থেকে যে বিশেষ তফাৎ তা আমার মনে হয় না—যদি কিছু তফাৎ থাকে, তা সে মৃতেরাই হয়তো বল্‌তে পারে।"

ডাক্তার আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—"আপনার এই রোগ সম্পূর্ণ নৈতিক, এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। চিন্তা এমন-একটা শক্তি যা প্রুসিক অ্যাসিডের মতো,—লাইড্‌-বোতল-নিঃসৃত স্ফুলিঙ্গের মতোই মারাত্মক;—যদিও চিন্তাজনিত ক্ষতিগুলা সচরাচর বিজ্ঞান-ব্যবহৃত বিশ্লেষণের দ্বারা ধরা যায় না। আমাকে বলুন দিকি, কোন্ দুঃখের শেলে আপনার যকৃৎ বিদ্ধ হয়েছে? কোন্ গুপ্ত উচ্চাভিলাষের কোন্ উচ্চশিখর হতে আপনার এই দারুণ পতন হয়েছে? কোন্ নৈরাশ্যের তিক্ত তৃণ আপনি অবিরাম রোমন্থন করচেন? প্রভুত্বের তৃষায় আপনি কি কষ্ট পাচ্চেন? মানুষের যা সাধ্যাতীত এরূপ কোন সংকল্প আপনি কি স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করেছেন?—তবে ত্যাগের বয়স আপনার এখনো তো আসে নি। কোনও রমণী কি আপনাকে প্রবঞ্চনা করেছে?"

অক্টেভ উত্তর করিলেন:—"না, ডাক্তার সে সৌভাগ্যও আমার ঘটে নাই।"

ডাক্তার বলিলেন:—"যাই বলুন না কেন, আপনার ঐ নিষ্প্রভ চোখের মধ্যে, আপনার শরীরের নিরুৎসাহ গতিভঙ্গির মধ্যে, আপনার কণ্ঠস্বরের চাপা আওয়াজের মধ্যে,—সেক্‌সপিয়ারের একটা নাটকের নাম এমন স্পষ্টরূপে পড়তে পারচি, যেন ঐ নামটি মরক্কো-চর্ম্মে বাঁধানো নাট্য-গ্রন্থের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।"

—"নাটকটির নাম কি? সেক্‌স্‌পিয়ারের কোন্ নাটকটি না-জানি আমি অজ্ঞাতসারে অনুবাদ করেছি?"—এইবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অক্টেভের কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তার উত্তর করিলেন—"সেই নাটকের নাম Love's Labour's Lost"—এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণের সহিত এই ইংরাজি নামটি বলিলেন যে মনে হয় যেন উনি বহুকাল ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন।

অক্টেভ বলিল:—"উহার ভাবার্থ বুঝি "নিরাশ প্রেমের যন্ত্রণা"?

ডাক্তার:—"ঠিক্ ঐ অর্থ।"

অক্টেভ আর কোন উত্তর করিল না; তার কপাল ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল—মুখের সহজভাব রক্ষা করিবার চেষ্টায় তার আলখাল্লা-লম্বমান বন্ধন-রজ্জু লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। ডাক্তার আসন-পিঁড়ী হইয়া, হাতে পা ধরিয়া, প্রাচ্যদেশীয় প্রথা অনুসারে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর নীলবর্ণ চক্ষুর দৃষ্টি অক্টেভের চক্ষুর উপর নিবদ্ধ হইল। তার পর, সগর্ব্ব অথচ মধুর দৃষ্টিতে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন:—"এসো, এইবার আমার কাছে তোমার মনোদ্বার খুলে দেও—আমি তোমার ডাক্তার, তুমি আমার চিকিৎ-

সাধীন। আর যেমন ক্যাথলিক পাদ্রি, অনুতাপী ব্যক্তিকে বলে, তেমনি আমি তোমাকে বল্‌চি—সব কথা আমার কাছে খুলে বল। কিছুই লুকিও না। তবে, আমার কাছে তোমাকে নতজানু হয়ে বস্‌তে হবে না।"

—"ওতে কি লাভ? ধরে নেওয়া যাক্ আপনি আমার অবস্থাটা ঠিক্ বুঝেছেন, কিন্তু আমার কষ্টের কথা সমস্ত আপনার কাছে খুলে বল্লে আমার ত কোন সান্ত্বনা হবে না। আমার যে কষ্ট তা বাক্যের অতীত—কোনও মানব-শক্তিই—এমন-কি আপনিও তার প্রতিকার করতে পারবেন না।" আরও খানিকক্ষণ ধরিয়া গোপনীয় কথাগুলা শুনিতে হইবে মনে করিয়া ডাক্তার আপনার আসনে আরো গট্ হইয়া বসিলেন এবং উত্তরে এইমাত্র বলিলেন—"সম্ভব"।

অক্টেভ আবার বলিতে আরম্ভ করিল :—"আমি চাই না, আপনি আমাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ ও একগুঁয়ে মনে করেন। আমি মৌন থাকলে এই কথা বল্‌বার আপনি অবসর পাবেন যে, "সব কথা খুলে বল্লে আমি লোকটাকে বাঁচাতে পারতাম", সে অবসর আমি আপনাকে দিতে চাই নে। আপনার এই বিশ্বাস যে, আপনি আমাকে সারাতে পারবেন, আচ্ছা তাহলে আমার আত্মকাহিনী আপনাকে বল্‌চি, শুনুন। আপনি যখন মোদ্দা কথাটা ঠিক্ অনুমান করেছেন, তখন খুঁটিনাটি নিয়ে আপনার সঙ্গে আর ঝগড়া করব না। আমার এই বিবরণে কোন অদ্ভুত ব্যাপার কিংবা রোম্যাণ্টিক ব্যাপার প্রত্যাশা করবেন না। আমার জীবনের যে ঘটনা তা খুব সাদাসিধা, খুব সাধারণ, খুব সচরাচর। কিন্তু, কবি হেন্‌রি-হৈনে-র একটা গানে আছে যে,

যার তা' ঘটে, তার কাছে তা নিতুই নূতন,
সেই আঘাতে চুর হয় তার হৃদি, তনু, মন।

আসল কথা, যে ব্যক্তি গল্পের দেশে, কল্পনার দেশে এতদিন কাটিয়েছেন তাঁর কাছে একটা নিতান্ত গ্রাম্য ধরণের কাহিনী বল্‌তে আমার লজ্জা বোধ হয়।

ডাক্তার একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন :—"ওহে, যা খুব সাধারণ তাই আমার কাছে অসাধারণ"—

—"সত্যি ডাক্তার, আমি প্রেমের যন্ত্রণাতেই মারা যাচ্ছি।" (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

চয়ন

স্বপ্ন-তথ্য

স্বপ্ন অনেক বিচিত্র ইঙ্গিত দেয়। যাঁহারা বলেন, স্বপ্নের জন্ম বদহজমে, তাঁহারা যে বিলকুল ভুল করেন, একালের বৈজ্ঞানিকরা তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

যখন আমরা অসাড় ঘুমে বিভোর থাকি, তখন স্বপন দেখি না। স্বপ্নের জন্ম হয় মানুষের অর্দ্ধজাগরণের সময়ে বা জাগ্রৎ-সুষুপ্তিতে। কারণ দেহে তখন ঘুমের লক্ষণ

থাকিলেও আমাদের মন থাকে গোপনে জাগিয়া।

অবশ্য দেহের কোন কোন বিশেষ অবস্থায় বা অনুভূতির সময়ে মানুষের স্বপ্নও এক-একটা বিশেষ আকার লাভ করে। যেমন, কোন ঘুমন্ত লোকের মুখের উপরে জল ছিটাইয়া দিলে সে স্বপ্ন দেখিবে, যেন চারিদিকে বৃষ্টি পড়িতেছে!

এ-রকম স্বপ্নের কারণ একরকম বোঝা যায়, কিন্তু অন্যান্য অনেক স্বপ্নের এমন কোন স্পষ্ট হদিস পাওয়া যায় না।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, একমাত্র স্মৃতিই স্বপ্নের সমস্ত ছবি আঁকে। জাগ্রৎ অবস্থায় যে-সব দৃশ্য বা কথা বা ভাব আমরা মস্তিষ্কের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখি, ঘুমের সময়ে সেইগুলিই স্বপ্নের মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারে। তখন আমরা তাহাদের অনুভব করি, কিন্তু তাহাদের প্রকাশে বাধা দিতে পারি না।

সাধারণত পুরুষের চেয়ে রমণীর নিদ্রা হয় বেশী-লঘু। (যদিও অনেক শিশুসন্তানের পিতা এ সত্য স্বীকার করিবেন না!) সেই-জন্য পুরুষের চেয়ে রমণী স্বপ্নও দেখে বেশী এবং জাগিয়া স্বপ্নকে অখণ্ডভাবে মনে রাখিবার ক্ষমতাও তাহার অধিক।

চারমাসের শিশুও যে স্বপ্ন দেখে সে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাঁহাদের কুকুর আছে তাঁহারা হয়ত লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, কুকুরও স্বপ্ন দেখে। আদিমকালে অসভ্য মানুষের যে-সব ভয়-ভাবনা ছিল, আজ এতকাল পরেও এবং সভ্য হইয়াও আমরা তাহাদের প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারি নাই। অসভ্য অবস্থার ভয়-ভাবনা এখনো মাঝে মাঝে আমাদের স্বপ্ন-চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে!

কুস্বপ্ন উপভোগ্য নয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞানমতে সুস্বপ্ন নাকি মানুষের স্বাস্থ্যে পক্ষে উপকারী।

একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলেন, স্বপ্ন হচ্ছে মানুষের চরিত্রের সূচিপত্র। তাহারা অনেক সময়ে আমাদের মনের দুর্ব্বলতাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। রাতের স্বপন লইয়া আপনি যদি দিনের বেলায় নাড়াচাড়া করেন, তবে নিজের চরিত্রের অনেক নূতন রহস্য জানিতে পারিবেন।

স্বপ্ন অনেক সময়ে গুপ্ত ব্যাধিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। "Sleeping for Health" নামক পুস্তকের লেখক মিঃ বাওয়ার্স বলেন, "মিঃ ক্রুস নামে এক ব্যক্তি ছয়মাসের মধ্যে প্রায় কুড়িবার স্বপ্নে দেখেন, যেন একটা বিড়াল ক্রমাগত থাবা মারিয়া তাঁহার গলা আঁচড়াইয়া দিতেছে! শেষটা জানা গেল, তাঁহার গলার ভিতরে ঘা হইয়াছে। ডাক্তারের চিকিৎসায় আরোগ্য-লাভের পর মিঃ ক্রুস আর-কখনো সেই উদ্ভট স্বপ্নটা দেখেন নাই। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, মিঃ ক্রুসের অর্দ্ধ-জাগ্রৎ মন এই লুকানো অসুখটা টের পাইয়া, স্বপ্নে তাহার ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

শুধু এই ব্যাপারটি বলিয়া নয়,—যক্ষা, ক্যানসার, হৃদ্‌পীড়া ও পেটের ভিতরের ক্ষত প্রভৃতি অনেক অসুখ, যেগুলো প্রথমে আস্তে আস্তে গোপনে বাড়িয়া ওঠে, স্বপ্ন যে তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম ইঙ্গিত দিয়াছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।"

এইজন্য মিঃ বাওয়ার্স মত প্রকাশ করিয়াছেন, স্বপ্নে বারংবার কোন বিশেষ রোগের ইঙ্গিত পাইলেই মানুষের ডাক্তারের বাড়ীতে যাওয়া উচিত।

যমক-রহস্য

আপনারা সকলেই কখনো না কখনো যমজ লোক নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। যমজ সন্তানদের চেহারা প্রায়ই দেখিতে একরকম হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, সেখানে তাহাদের চেহারা এতটা পরস্পর-বিরোধী হইয়া পড়ে যে, এক পিতার ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে যে পারিবারিক সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক, তাহারও আভাস পর্য্যন্ত থাকে না। সুধু মুখে নয়, তাহাদের দেহেও এই বৈসাদৃশ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন-কি তাহাদের মতি-গতি রুচি-অরুচি সমস্তই আলাদা-রকম হয়। এ ক্ষেত্রে যমকদের মধ্যে যদি একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে হয়, তবে ছেলেটি হইবে ঢেঙা, সদা-সতর্ক, উৎসাহী এবং অল্পেই ক্রুদ্ধ; আর মেয়েটি হইবে মাথায় খাটো, মোটাসোটা, কুঁড়ে এবং দিল-দরিয়া। তাহারা দুজনে একরকম খাবার পর্য্যন্ত খাইতে রাজি হইবে না।

সম্প্রতি একজন নামজাদা বৈজ্ঞানিক মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, সাধারণত যমজ সন্তান দেখিতে দুইজন হইলেও, আসলে তাহারা অভেদ-আত্মা। তাহাদের দুইটি দেহে একই প্রাণের ধারা বহিয়া যায়। যেখানে তাহাদের আকৃতি অভিন্ন, সেখানে তাহাদের প্রকৃতিও এক-রকম। তখন তাহারা একই প্রকৃতির দুই-দেহ-ধারী মূর্ত্তি। যেখানে তাহাদের আকৃতি ভিন্ন, সেখানেও তাহারা একই প্রকৃতির দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সীমাকে প্রকাশ করে মাত্র।

যমকদের যে পীড়া "sympathetic sickness" নামে বিখ্যাত, তাহার আলোচনা করিলে উক্ত বৈজ্ঞানিকের কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়। যমকদের মধ্যে যে আশ্চর্য্য এক সহানুভূতির যোগ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, তাহাদের একটির রোগ হইলে প্রায়ই অন্যটিও সেই রোগে মারা পড়ে,—এমন-কি রোগ যেখানে সংক্রামক নয় সেখানেও!

লণ্ডনে একবার দুইটি যমজ ছেলের মধ্যে একটি দুষ্পাচ্য পিঠা খাইয়া পেটের অসুখে পড়ে। অল্পক্ষণ পরেই অন্য ছেলেটিও পিঠা না-খাইয়াও ঠিক সেই অসুখের দ্বারাই আক্রান্ত হয়।

প্রসিদ্ধ ফরাসী ডাক্তার Trousseau বলেন, "আমার কাছে একবার একটি অদ্ভুত রোগী আসিয়াছিল। সে চোখের বাতে ভুগিতেছিল। সে আমাকে বলিল, "আমার এক যমজ ভাই আছে, সে এখন ভিয়েনায়। আমার যখন অসুখ হয়েচে তখন তাকেও শীঘ্রই এই অসুখে ধরবে!" আমি তাহার এই অদ্ভুত ধারণাকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিলাম বটে, কিন্তু দিন-কতক পরেই ভিয়েনা হইতে রোগীর ভ্রাতার পত্র আসিল, "আমার চোখে

বাত হয়েচে। আশা করি তুমিও ঐ রোগে ভুগচ।"

এটাও প্রায় দেখা যায়, যমজদের একজন মারা পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে আর-একজনও মারা পড়ে। অনেকসময়ে একটি যদি রোগে মারা যায় এবং দ্বিতীয়টিকেও যদি সেই রোগে না ধরে, তাহা হইলেও সে বাঁচে না—হঠাৎ বুকের স্পন্দন বন্ধ হইয়া গিয়া সেও মৃত্যুমুখে পড়ে।

সুতরাং যমজরা যে পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই একটা আশ্চর্য্য মানসিক বার্ত্তার আদান প্রদান্ করিতে পারে, তাহা একরকম প্রমাণিত সত্য বলিয়া স্বীকার করা চলে।

পৃথিবীতে যমজ সন্তান হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন যদি যমকের ভাই বা বোন বা সন্তান হয়, তবে তাহাদেরও যমজ সন্তান হইবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

ভবিষ্যতের সপ্তম আশ্চর্য্য

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের নাম আপনাদের নিশ্চয়ই মুখস্থ আছে। কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে যে ব্যাপারগুলি সপ্তম আশ্চর্য্যের কোঠায় পড়িবে, এখনকার বিখ্যাত সপ্তম আশ্চর্য্যের মহিমা তাহাদের কাছে বোধহয় পরিম্লান হইয়া যাইবে।

প্রথমত, পরমাণুকে মানুষের কাজে লাগানো। বৈজ্ঞানিকদের মতে শীঘ্রই ইহা সম্ভব হইবে। পরমাণুর মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি সংগৃহীত আছে, তাহার সাম্‌নে পৃথিবীর অন্যান্য জ্ঞাত শক্তির সমস্তই তুচ্ছ! এই মহা শক্তিকে ব্যবহারে আনা বড় যে-সে কথা নয়।

লণ্ডন কলিসিয়ামে কাপ্তেন রবার্টস্ সংপ্রতি দেখাইয়াছেন, কিরূপে আলোক ও ধ্বনির কম্পনকে কাজে খাটানো যায়! এই নব উদ্ভাবনার ফলে ইংরেজরা আলোক ও ধ্বনিকে ইচ্ছামত দিকে নিক্ষেপ করিয়া, যুদ্ধের সময়ে বিপক্ষদের অনেক ডুবো-জাহাজ গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি শীঘ্রই আরো উন্নত হইবে, তখন ইহাকে দ্বিতীয় আশ্চর্য্যের কোঠায় ফেলা চলিবে। কারণ তখন ইহার সাহায্যে লণ্ডনে বসিয়া একটি কল টিপিয়া, কন্‌স্তান্তিনোপলের রণ-ক্ষেত্রে অবস্থিত কামান-শ্রেণী ছোঁড়া বা ভূমধ্যস্থ বিস্ফোরক পদার্থে অগ্নিসংযোগ করা কিছুমাত্র কঠিন কার্য্য হইবে না।

তৃতীয় আশ্চর্য্য হইবে, আমেরিকার "উড়ন্ত টর্পেডো"। মনে করুন, একখানি একরত্তি উড়ো-জাহাজ তৈরি করিয়া, কল টিপিয়া সেখানা উড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহাতে চালক বা কোন মানুষ রহিল না। শূন্যপথে যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিবামাত্র আপনি তাহার পাখ্‌না খসিয়া গেল এবং সে একটি বোমায় পরিণত হইয়া শত্রুর উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সম্প্রতি যে "উড়ন্ত টর্পেডো" লইয়া

পরীক্ষা চলিতেছে, তাহা তিনহাজার ফুট উঁচুতে উঠিতে এবং চারশো মাইল দূরে যাইতে পারে। তাহার গতি ঘণ্টায় দুশো মাইল পর্য্যন্ত।

চতুর্থ আশ্চর্য্য কি? আলোক-চিত্র-যুক্ত টেলিফোন। তাহার সাহায্যে আপনি যে লোকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করিবেন, তাহাকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।

পঞ্চম আশ্চর্য্য হইবে, রেডিয়াম। এখনো ইহার পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই, এ-অবস্থায় ইহার সম্বন্ধে এখনি জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

ষষ্ঠ আশ্চর্য্য, ঝুলন্ত বাগান নয়,—ঝুলন্ত সহর! এখনি তাহার আকার লইয়া অনেক কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। যে দেশে মাটিতে স্থানাভাব, সেখানে শূন্যে সহর বসিবে।

কিন্তু সপ্তম আশ্চর্য্যের কোঠায় কাহার নাম করিব? ঢেউকে শাসন করা বা ধ্বনির আলোক-চিত্র তোলা বা কল টিপিয়া ঘর-বাড়ীকে স্বেচ্ছামত এখানে-ওখানে লইয়া যাওয়া বা জীবন্ত মানুষের কাজে যন্ত্র-মানবকে লাগাইয়া দেওয়া?—এ সব ব্যাপার য়ুরোপে আমেরিকায় ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব?

আসল কথা, ভবিষ্যতে সপ্তম আশ্চর্য্যেও কুলাইবে না।

"হাতকড়ির রাজা"

আমেরিকায় রেলপথে যে ধনী হয়, সে উপাধি পায় "রেলপথের রাজা", যে লোহার ব্যবসায়ে টাকা করে তার নাম হয় "লোহা-রাজা", তুলার ব্যবসায়ে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেয় তার উপাধি হয় "তুলা-রাজা"! আমেরিকা সাধারণ-তন্ত্রের দেশ, সরকারি উপাধির বালাই সে দেশে নাই। তবু কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা এতটা প্রবল যে, মনের ভিতর হইতে সে উপাধি-প্রীতির শিকড় কিছুতেই উপড়াইয়া ফেলিতে পারে না।

হাতকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে মিঃ হ্যারি হুডিনি আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া, আমেরিকায় তিনি উপাধি পাইয়াছেন "হাতকড়ির রাজা।"

আজ-পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত রকমের এবং যত শক্ত হাতকড়ি তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার কোনটিই হুডিনিকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। তিনি অনায়াসেই তাহা খুলিয়া ফেলেন।

শুধু হাতকড়ি নয়, হুডিনির আরো অনেক ক্ষমতা আছে। সরকারি কারাগারের মধ্যে তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া, হাতে হাত কড়ি ও গায়ে strait-jacket (এর নাগপাশে বাঁধা পড়িলে কয়েদীর আর নড়িবার শক্তি থাকে না) পরাইয়া রাখিয়া, কয়েদখানার দরজায় বাহির হইতে তিন-তিনটা চাবি লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে সামান্য কোন যন্ত্র পর্য্যন্ত ছিল না। হুডিনি কিন্তু সেই অবস্থাতেও অন্যের সাহায্য না লইয়া নিজেই নিজের হাতকড়ি, strait-jacket

এবং আশ্চর্য্য কৌশলে ভিতর হইতে সেই তিন চাবি লাগানো দরজা খুলিয়া, বাহিরের হতভম্ব পুলিস-কর্ম্মচারীদের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন!

হউডিনিকে আপনি যদি প্রকাণ্ড একটি জলপূর্ণ জলাধারের মধ্যে মাথা-নীচু ও পা-উঁচু করিয়া পুরিয়া, তাঁহার দুইপায়ে তালা-চাবি-লাগানো শিকল পরাইয়া, সেই শিকলটা আবার ডালার সঙ্গে বাঁধিয়া, জলাধারের ডালা বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলেও তিনি আপনার চোখে ধূলা দিয়া সকলের অগোচরে বাহির হইয়া আসিতে পারেন। জলাধারে সত্যই যদি কোন গুপ্তদ্বার থাকিত, তবে সেটা খুলিয়া বাহির হইবার সময়ে জলাধারের জলও বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু হউডিনি বাহির হইবার পর দেখা যায়, জলাধারের জল একটুও কমে নাই!

হউডিনি যে কিরূপে এই-সব অসাধ্য সাধন করেন, আজ-পর্য্যন্ত কেউ তার কোন হদিস পান নাই। আসল গুপ্তকথাটা খুলিয়া না বলিলেও, এ কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, শরীরের নানা স্থানের গাঁইট সন্ধিচ্যুত ও দেহের মাংসপেশী সঙ্কুচিত করিয়া এবং দৈহিক শক্তি ও কৌশলের দ্বারা তিনি এ-সব কঠিন কাজ সহজ করিয়া ফেলেন। মাংসপেশী ফুলাইয়া ও সঙ্কুচিত করিয়া তিনি নিজের দেহকে এত-বেশী বড় ও এত-বেশী ছোট করিতে পারেন যে, তাহা এক-রকম অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। চাবি-লাগানো দরজা বা হাতকড়ি তিনি হাতের কায়দায় খুলিতে পারেন। তিনি আরো অনেক অপূর্ব্ব সাহস ও শক্তির কার্য্য করিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিপুল শূন্যে উঠিয়া একখানি উড়ো জাহাজ হইতে অন্য একখানি উড়ো জাহাজে লাফাইয়া পড়াটাই প্রধান। বলা বাহুল্য লাফাইবার সময়ে দুইখানি উড়োজাহাজই বেগে উড়িতে থাকে। ভাগ্যে হউডিনি অসাধু নন! তিনি চোর বা ডাকাত হইলে কোন পুলিস বা কয়েদখানাই তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে পারিত না।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

লেখাপড়া জানা কুকুর

ম্যান্‌হিমের উকিল ডাক্তার মোকেলের স্ত্রী একদিন রাস্তায় একটা কুকুরছানা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেটাকে তিনি বাড়ী নিয়ে এসে খুব যত্ন ক'রে পুষতে লাগলেন। তার নাম রাখলেন "রল্‌ফ্"। অল্পদিনের ভিতরই তিনি দেখ্‌লেন যে, রল্‌ফ্ মানুষের কথাবার্ত্তা বেশ বুঝ্‌তে পারে। তার যে নাম রাখা হয়েছে—"রল্‌ফ্," এটা সে দুদিনেই টের পেয়েছিল। ডাকলেই কাছে ছুটে আসতো। চেঁচামেচি করলে যদি বকা হ'ত, অম্‌নি সে চুপ করতো। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললে সুড়সুড় ক'রে বেরিয়ে যেতো। তাছাড়া শুতে বসতে দাঁড়াতে বললে, টেবিল-চেয়ারের উপর থেকে নেমে যেতে বললে,

কোন-একটা জিনিস নিয়ে আসতে বললে, সার্কাসের অনেক শেখানো কুকুরের মতো সে তখনি তাই করতো। অথচ তাকে একদিনের জন্যেও এ-সব শেখাতে হয় নি! ডাক্তার মোকেলের স্ত্রী কুকুরটার এই আশ্চর্য্য বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যেতেন।

একদিন তিনি ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন। রল্‌ফ্‌ কাছে বসে আছে। একশ'-বাইশে দুই যোগ করলে কত হয়, এ আর কিছুতেই একটি ছেলে বলতে পারছিল না। তিনি বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "এই সামান্য আঁকটাও কষে দিতে পারছ না? এ তো সব ছেলেই জানে, এমন-কি আমার বোধ হয় রল্‌ফ্‌ও তোমায় বলে দিতে পারে! কি বল রল্‌ফ্‌? এটা তো তুমিও জানো?—" রল্‌ফ্‌ এ কথার উত্তরে এমনভাবে ঘাড় নেড়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো যে, তিনি অনায়াসে বুঝতে পারলেন, রল্‌ফ্‌ বল্‌ছে সে জানে। তিনি আশ্চর্য্য হ'য়ে রল্‌ফ্‌কে বললেন, "আচ্ছা বলতো, দুই আর দু'য়ে কত হয়?" রল্‌ফ্‌ অমনি তার সামনের পায়ের একটি থাবা দিয়ে বার বার তাঁর হাতটা চাপড়ে দেখিয়ে দিলে যে, দুই আর দু'য়ে চার হয়! মোকেলের স্ত্রী তো একেবারে অবাক! এটা সত্যিই সে হিসেব করে বলেছে, না হঠাৎ আন্দাজে লেগে গেছে, সেটা ভাল করে জানবার জন্যে তিনি রল্‌ফ্‌কে আরও অনেক রকম পরীক্ষা করে দেখলেন যে,—না, ব্যাপারটা নেহাৎ মিছে নয়। রল্‌ফ্‌ সত্যিই গুন্‌তে জানে আর আঁকও কষ্‌তে পারে। ১,২,৩,৪ ইত্যাদি সংখ্যা সে বেশ পড়তে পারে! বর্ণ-পরিচয় তার নেই বটে, কিন্তু অঙ্ক-পরিচয় আশ্চর্য্য-রকম।

তিনি কুকুরের এই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পেয়ে তাকে লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। মা যেমন ক'রে তাঁর হাবা ছেলেটিকে কথা শেখাবার জন্যে দিনরাত প্রাণপণে যত্ন করেন, ডাক্তার মোকেলের স্ত্রীও রল্‌ফ্‌কে নিয়ে তেম্‌নি চব্বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁর অসীম অধ্যবসায় ও ক্রমাগত চেষ্টার ফলে রল্‌ফ্‌ একটু একটু ক'রে ক্রমে বেশ লিখ্‌তে-পড়তে শিখলে। শক্ত শক্ত আঁক সে রীতিমত অঙ্ক-শাস্ত্রের পদ্ধতি-অনুসারে নির্ভুল করে ক'স্‌তে পারতো। যে-কোন লেখা সে জলের মতো পড়তে পারতো। যে-রকম ছবিই হোক্‌না কেন, রল্‌ফ্‌কে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই সে বলে দিতে পারতো,—সেটা কিসের ছবি?—টাকা-পয়সাও সে বেশ চিনেছিল। কোনটা 'সিকি', কোন্‌টা দুয়ানি, আর কোনটাই বা 'আধুলি'—এ-সব অনায়াসে সে বলে দিতে পারতো!

রল্‌ফের কথার ভাষা যে মানুষের বর্ণ-পরিচয়ের সঙ্গে মেলেনা এটা বোধ হয় বলে রাখাই বাহুল্য। রল্‌ফ্‌ কথা কইতো তার সেই সাম্‌নের পায়ের একটি থাবা দিয়ে চাপড় মেরে। মোকেল্‌-পত্নী প্রথমে তাকে কতকগুলি খুব দরকারি শব্দ, প্রত্যেক বার তার থাবার চাপড়ের সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে তাকে শেখাতে লাগলেন, যেমন:—সাম্‌নের পায়ের থাবা দিয়ে দুবার চাপড়ালে "হাঁ" বোঝাবে, তিনবার চাপড়ালে "না" বোঝাবে, পাঁচবার চাপড়ালে "বাইরে

যাবো" বোঝাবে ইত্যাদি। ক্রমে তিনি এই উপায়ে তার অক্ষর-পরিচয়ও করিয়ে দিলেন। প্রত্যেক হরফের এক-একটা নম্বর ঠিক ক'রে তিনি তাকে A. B. C. D প্রভৃতি সমস্ত বর্ণগুলি শিখিয়ে দিলেন ;—যেমন "A" হ'ল ৪ B হ'ল ৭ ইত্যাদি। রল্‌ফের স্মরণ-শক্তিও খুব অসাধারণ ছিল,একবার যা শিখ্‌তো তা আর কখনো ভুলতোনা। শিখতেও পারতো সে খুব শীগ্‌গির। তাকে যখন A, B, C. D. শেখানো আরম্ভ হ'ল, তখন সে রোজ পাঁচটা ক'রে হরফ্ শিখে ফেল্‌তে লাগল।

বর্ণ-পরিচয়ের পর রল্‌ফ্‌কে বানান শেখানো হ'ল। এই বানান শেখবার সময় দেখা গেল যে, রল্‌ফ মানুষের মতো ব্যাকরণ-শুদ্ধ বানানের মোটেই পক্ষপাতী নয়। সে নিজের ইচ্ছে-মতো অনেক কথার বানান খুব সোজা ক'রে নিলে। মোকেল-পত্নী তার এই চালাকি দেখে বেশ খুসি হ'য়ে রল্‌ফকে বললেন "I see,you are too wise !" রল্‌ফ্ অমনি সেই কথার প্রতিধ্বনি করে বললে, "I C U R Y Y"। সেখানে একটী ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার নাম Karla, রল্‌ফ্‌কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল এই মেয়েটির নাম কি বানান ক'রে বল— রলফ্ তখনি বানান ক'রে বললে, K. R. L. A !

তারপর রল্‌ফ কাপড়-চোপড়ের নাম শিখলে,—কোন্‌টা মোজা, কোন্‌টা গেঞ্জী, কোন্‌টা রুমাল, কোন্‌টা দস্তানা,তা সে দেখেই ব'লে দিতে পারতো। ক্রমে সে রং চিন্‌তে শিখলে,—কোন্‌টা লাল,কোন্‌টা নীল, কোন্‌টা সবুজ, কোন্‌টা হল্‌দে, কোন্‌টা কালো, তাও সে বেশ অনায়াসে বুঝতে পারতো! তারপর তার আকৃতি জ্ঞান হ'ল। চৌকোণা, গোল, বাদামি, তিনকোণা, লম্বা, বেঁটে, মোটা, সরু,—এ-সমস্ত তফাৎও সে চমৎকার আয়ত্ত ক'রে ফেললে। তারপর ক্রমে জীব-জন্তু, গাছপালা, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, আকাশ চাঁদ, সূর্য্যি, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, রেল, ষ্টীমার, বাইসিকেল্, ঘুড়ী, লাঠিম, ছাতি, ছড়ি, চা, চুরুট, চিনি, রুটি, বিস্কুট, আর মাংস প্রভৃতি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কোন জিনিষই তার জান্‌তে বাকি রইল না। দেশ-বিদেশ থেকে লোকে কুকুরটার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা' দেখ্‌তে আসতো। একটা পশুর ভেতর এতটা শক্তি দেখে তারা অবাক হ'য়ে যেতো!

রল্‌ফ্ খুব রসিক ছিল। ভারি চমৎকার চিঠি লিখতে পারতো। তার দু' একখানা চিঠির নমুনা দিয়ে আমরা রল্‌ফের কথা শেষ কর্ব্ব। জেনোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনস্তত্ত্ব-বিশারদ ডাক্তার ম্যাকেঞ্জী, রল্‌ফ্‌কে দেখতে এসে দিনকতক মোকেলের বাড়ীতে ছিলেন। রল্‌ফের সঙ্গে তাঁর খুব আলাপ হয়েছিল। ম্যাকেঞ্জী চলে যাবার পর রল্‌ফ তার মনিবের বড় মেয়েকে ধ'রে ম্যাকেঞ্জীকে এই চিঠিখানা লিখিয়াছিল

"প্রিয় ডাক্তার ম্যাকেঞ্জী, শীগ্‌গির এসো, আর চলে যেয়োনা। ছবি এনো। তোমারই স্নেহের রল্‌ফ্।"

একবার পাড়ার একটি ছোট মেয়ে, কিছুতেই একটা আঁক কস্‌তে না পেরে, রল্‌ফের সাহায্য চেয়ে তাকে আসবার জন্যে একখানা চিঠি দিয়েছিল, রল্‌ফ্ তার উত্তরে

লিখলে—"চিঠি পেলুম, ভালবাসা জানবে। আঁক কসে দিতে চুমু নাও। ইতি রল্ক্ এখনি যাবে তোমার কাছে,—তোমার রল্ক্।"

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

কাব্য ও বিজ্ঞান

কবিতা বিজ্ঞানবিশেষ। অর্থাৎ কবিতা একটি উঁচুদরের বিদ্যা, জীবনব্যাপী সাধনার সামগ্রী;—তুচ্ছ ব্যাপার নয়। হেসে খেলে কাব্যরচনা হবার নয়। কবিতার সঙ্গে তরুণ বয়স এবং ঐ বয়সের ভাবাবেগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—এইটে প্রচলিত ধারণা। কাব্যচিন্তাপ্রসঙ্গে, একাগ্র সাধনা এবং অব্যাহত কঠোর পরিশ্রমের কল্পনা, কারো মনে বড় একটা ওঠে না। কবিতাকে ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালমাত্র বলে' উড়িয়ে না দিলে দেখবেন, যে-শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তায় বৈজ্ঞানিক গড়ে' ওঠে, কবিরও সেই শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। তাদের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মানুরাগের মধ্যেও সমতা দেখতে পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং ক্রমপরিণতি বৈজ্ঞানিকের জানা যেমন প্রয়োজন তেমনি কবিরও পূর্ব্বগামীদের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা আবশ্যক। মনের মধ্যে ভাবাবেগ যখন প্রবল ও অশান্ত হয়ে ওঠে, যখন তা প্রকাশের জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি করতে থাকে, তখনি কবির লেখনী থেকে কবিতার জন্ম হয়। কবি যখন প্রথম রচনা করেন তখন কাব্যরচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান থাকে না, তাঁর মনও বৈজ্ঞানিকের ন্যায় সংহত স্বাস্থ্য ও সংস্কারমুক্ত নয়। ঝড়ের মত সহসা যে ভাবাবেগ কবিতার আকারে জন্ম নিলে, তার প্রভাব তিনি বাস্তব জীবনে কখনো অনুভব করতে পারেন বা তার বিপরীতও ঘটতে পারে। কিন্তু তাঁর মনে সবচেয়ে কঠিন আঘাত লাগে তখন, যখন তিনি দেখেন, যে-ভাব তাঁর মনে হয়েছিল, তা একেবারে নতুন আন্‌কোরা অভূতপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য, তার একেবারেই কোনো মূল্য নেই; কারণ তা আর কেউ ইতিপূর্ব্বে আরো নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন। গোড়ায় তিনি নিজের রচনাটি নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে ছিলেন, আর কারো রচনার মাপকাঠিতে যাচাই করে' মাপেন নি। ক্রমশ তিনি আবিষ্কার করেন, তাঁর কবিতা যে-কথা তাঁকে বলে, অন্যের নিকট তা নাও বলতে পারে। তিনি বুঝতে পারেন, যে-সম্পদ ও বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হলে রচনা 'কবিতা' আখ্যা লাভ করে, সেইখানেই তাঁর রচনার পূর্ব্বগামীদের রচনার অনুরূপ হওয়া চাই; আর পৃথক হওয়া চাই সেই-সব বিষয়ে, যা পরিবর্ত্তনশীল। তাই কবির হাত যত পাকে ততই তাঁর রচনা উত্তরোত্তর কতক বিষয়ে পূর্ব্বগামীদের অনুরূপ এবং কতক বিষয়ে পৃথক হতে থাকে। এক কথায়

তিনি তাঁদের সম্বন্ধে স-চেতন হয়ে ওঠেন। এবং পূর্ব্বগামীদের রচনার সঙ্গে পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হয় ততই তিনি দেখতে পান, আর্টেও, বিজ্ঞানেরই মত, প্রত্যেক যুগ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কর্ম্মধারাকে সম্প্রসারণ ও পরিপূরণ করে' চলেছে। পূর্ব্বগামীরা যদি তাঁদের কর্ম্ম না করতেন তাহলে অনুবর্ত্তীদের কর্ম্মও অসম্ভব হোত।

জীবনের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ

জনসাধারণের জন্যে কোনো বিদ্যাপীঠ যে সমস্ত বিশেষ বক্তৃতার (extension lectures) আয়োজন করেন, সেই সব বক্তৃতার সঙ্গে শ্রোতার যে-সম্বন্ধ, জীবনের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ অনেকটা সেইরূপ। জীবন বলতে এই দ্বীপপুঞ্জের (Great Britaioin) জীবন যে চার-কোটি শ্রমজর্জ্জর মানুষ বোঝায় তাদের বিচার করতে বলা হয় 'কাব্যের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ কি?' তাহলে না জানি কত অদ্ভুত গোলমেলে উত্তরই শোনা যাবে। একটা যুগে ভালো কবি জন্মায় বড়-জোর আধ ডজন; আর, এরা যে ভালো কবি সে তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম বিশ ত্রিশ জনমাত্র রসিক জন্মায়; আর জন্মায় শতেক-খানেক লোক যারা এই কবিমগুলীর খবর পায় আর-কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দ্যাখাবার পর; এ ছাড়া জন্মায় হাজার খানেক লোক, যারা বাহবা দ্যায় পরের মতের উপর আশ্চর্য্য শ্রদ্ধাবশত; অবশিষ্ট যারা থাকে তারা যা শোনে তা-ই বিশ্বাস করে—অর্থাৎ এরাই তারা, কাকে কাণ নিয়ে গেছে শুনে যারা কাকের পিছু ধায়, কাণে হাত দিয়ে দ্যাখা প্রয়োজন মনে করে না। তবুও আজকাল কবির কাছে অহরহ নালিশ আসে—কেন তাঁর কবিতা দেশের আপামর সাধারণের মর্ম্ম স্পর্শ করে না? কেন তিনি তাঁর পাঠকের কাছে সূক্ষ্ম ভাবুকতা এবং মার্জ্জিত রসবোধ দাবী করেন? হায় কবি!

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারোয়ারি উপন্যাস

৬

কমলার স্বামী সতীশচন্দ্র কলকাতার এক সওদাগরী আপিসের কেরাণী। অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, আয়ও অল্প, এইজন্যে বেচারি বিয়ে করতে বরাবরই একটু নারাজ ছিল। কিন্তু সতীশের মা দুর্গামণি জিদ্ ধরে বসলেন যে বিয়ে তাকে করতেই হবে। ছেলে বিয়ে করবে না, এ আবার কি কথা! সবার ছেলেই যখন বিয়ে করছে, তখন সতীশই বা না করবে কেন? কৈ, তার

পিতৃকুলে কিম্বা মাতুল-গোষ্ঠীতে আজ পর্য্যন্ত কেউ ত কখনো অবিবাহিত থাকেনি! যার বাপ-দাদারা চিরকাল বিনা-আপত্তিতে বিয়ে করে এসেছে, এমন কি যাদের অনেকে একাধিক পরিণয়েও পশ্চাৎপদ হয় নি, তাদের বংশধর হয়ে সতীশের এমন দুর্ব্বুদ্ধি হল কেন? সতীশ যদি বিয়ে না করে, তাহলে দুর্গামণির দেহান্তের পর শ্বশুরের ভিটেয় সন্ধ্যে জাল্‌বে কে? জগদীশপুরের এত দিনের প্রাচীন রায়-বংশটা কি সে লোপ করে দিয়ে কুলাঙ্গার হতে চায়?

সতীশ হেসে বল্‌তো,—দেখ মা, অত-বড় কুরু-পাণ্ডবের বংশ, তাও আজ লোপ পেয়ে গেছে! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেও যদুবংশ রক্ষে করতে পারেন নি! সুতরাং রায়-বংশ যদিই লোপ পেয়ে যায়, তাহলে এমন বেশী কি হবে?

দুর্গামণি ধমক দিয়ে বলতেন,—থাম্ বাপু, তোর ও-সব জ্যাঠামি আমি শুনতে চাইনি। আমি তোর বিয়ে দেবই। তুই বড় বেহায়া, তাই নিজের বিয়ের কথায় কথা কইতে এসেছিস্! আজ যদি কর্ত্তা বেঁচে থাকতেন, তাহলে কি তুই তাঁর মুখের ওপর এ-সব কথা কিছু বলতে পারতিস্?

সতীশ ঘাড় হেঁট করে বলতো,—না মা, তা বোধ হয় পারতুম না, কিন্তু পারা উচিত। যে বিয়ে করবে, সকল দায়িত্ব তারই যে। সে দায় সে নিজে বুঝে না নিলে চল্‌বে কেন?

দুর্গামণি বলতেন,—তোর যেমন কথা! বিয়ে করতে আবার দায় কিসের! তুই থাম্! বিয়ে করে বুঝি আবার কেউ অসুখী হয়! দেখিস্ দিকি তোর আমি এমন বৌ করবো যে অনেক রাজা-রাজড়ার ঘরেও তেমনটি মেলেনা!

—তোমার এ মূর্খ গরীব ছেলেকে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর এক রাজকন্যে কেউ দেবে না, মা! এই বলে সতীশ হাস্‌তে হাস্‌তে ন'টার ট্রেন ধরবার জন্যে ষ্টেশনের দিকে ছুট দিত, নাহলে দশটার সময় আপিসে হাজরে দিতে পারবে না।

এমনি করে ছেলের সঙ্গে অনেকদিন ধরে অনেক তর্কবিতর্ক করে দুর্গামণি যেদিন পাশের গাঁয়ের মৈত্র-মহাশয়ের মেয়ে কমলার সঙ্গে সতীশের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে ফেললেন, সতীশ তখন আর সে বিবাহে অমত করতে পারলে না। যোগেন মিত্রের কাছারী-বাড়ীতে খাজনা জমা দিয়ে বাড়ী ফেরবার পথে সতীশ একদিন জমীদার-বাবুদের বাঁধানো ঘাটে সদ্যস্নাতা কমলাকে দেখে এসেছিল। যৌবনোন্মুখী সুন্দরী কিশোরীর সেই তরুণ লাবণ্য-শ্রী এই বিবাহ-বিমুখ যুবকের অন্তরে অন্তরে সেদিন কী যে মায়াদণ্ডের যাদুস্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছিল তা শুধু সতীশই জানে। বিধবা মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পারার অজুহাতে সতীশ এক কথায় কমলাকে বিবাহ করতে রাজি হয়ে গেল। গাঁ-শুদ্ধ লোক সতীশের এই অদ্ভুত মাতৃভক্তির প্রশংসা করতে লাগল বটে, কিন্তু সতীশ কমলাকে পেয়ে, বাঞ্ছিত মিলনের সার্থকতায় আপনার দুর্ভাগ্য-পীড়িত জীবনটাকেই একান্ত ধন্য বলে মনে করতে লাগল।

বিবাহের পর দুটো বছর সতীশের জীবন কে যেন স্বপ্ন-লোকের বিচিত্র আনন্দে ভরে দিয়েছিল। কমলার কমল-

চরণ-স্পর্শে জগদীশপুরের চির-পরিচিত পুরাতন বাড়ীখানি সতীশের চোখে এক নূতন আনন্দ-রাগে যেন নন্দনের শোভা ধারণ করেছিল! সতীশের মা দুর্গামণি এই সুলক্ষণা মেয়েটিকে পুত্রবধূ করে যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছিলেন। তার উপর, কমলা তাঁর সাতরাজার ধন এক মানিক ছেলেটিকে সুখী করতে পেরেছে দেখে বধূর প্রতি তাঁর স্নেহানুরাগ আরো দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল! শাশুড়ী হয়ে যদি কখনো বৌয়ের আদর, বৌয়ের যত্ন করতে হয়—তবে সে কেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ জগদীশপুরের শ্বশ্রূ-নির্য্যাতিতা তরুণী বধূরা সকলেই সতীশের মা দুর্গামণির উল্লেখ করতে সুরু করেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে দুর্গামণি তাঁর এই সুযশ বেশীদিন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। দু-বছর পরেও কমলা যখন তাঁর কোলে একটী সোনার-চাঁদ নাতি এনে দিতে পারলে না, তখন দুর্গামণি বধূর সন্তান-সম্ভাবনায় ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। কত রকমের ওষুধ-বিষুদ, কবচ-মাদুলি ধারণ করিয়ে, নানা ঠাকুরের দোর ধরেও যখন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হল না, তখন দুর্গামণি রায়-বংশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর জন্যে অধীর হয়ে ছেলের আবার বিবাহ দেবার সঙ্কল্প করচেন, এমন সময় সতীশ পশ্চিম অঞ্চলে একটা মোটা মাইনের চাক্‌রী পেয়ে বিদেশে চলে গেল।

সেখানে পৌছোবার দিন দশ-পনেরো পরেই সতীশ হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লো। ছেলের অসুখের খবর পেয়ে দুর্গামণি এমন অস্থির হ'য়ে পড়লেন যে, তাড়াতাড়ি বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, গ্রামের একজন দূর-সম্পর্কের আত্মীয়কে সঙ্গে করে তিনি ছেলের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। সতীশ তখন কতকটা সাম্‌লেছে; আপিস থেকেই সে সপরিবারে থাকবার উপযুক্ত একটা বাসা পেয়েছিল, দুর্গামণির এই ছোটখাটো ঝর্‌ঝরে, তক্‌তকে নতুন বাংলো বাড়ীখানি আর পশ্চিমের সেই পাহাড়ে-ঢাকা নদীঘেরা জায়গাটি এত পছন্দ হল যে, সতীশ সেরে ওঠ্‌বার পর তিনি আর দেশে ফিরে যেতে চাইলেন না। আত্মীয়টিকে বিদায় করে দিয়ে সেইখানেই তিনি রয়ে গেলেন, আর বৌমাকে নিয়ে আসবার জন্যে সতীশকে মহা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সতীশ বড়দিনের ছুটিতে গিয়ে বৌকে নিয়ে আসবে প্রতিশ্রুত হয়ে দুর্গামণিকে নিশ্চিন্ত করলে।

সতীশেরও এই বিদেশে একলা কিছুতেই মন বসছিল না। কমলার কাছ থেকে দূরে এসে থাকায় যে অপরিসীম কষ্ট, সেইটে এখানে তাকে সদাসর্ব্বদা অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে। সুদূর প্রবাসে প্রাণের একান্ত প্রিয়জনটিকে আজ অনেক দিন কাছে না দেখতে পেয়ে সতীশ বড় কাতর হয়ে উঠেছে। কমলার অদর্শন-বেদনা তার অভাবের অসহনীয় দুঃখ একেই সতীশকে ক্রমশঃ এখানে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তার উপর প্রতিদিন দিনান্তে পাওয়া কমলার লেখা একখানি করে চিঠি—যা তার এই সঙ্গীহীন বান্ধবহীন দূর-দেশে জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা আর অবলম্বন ছিল, তাও আজ প্রায় দুসপ্তাহ হল সে একখানিও দেখতে পায়নি। কমলা তার শেষ চিঠি-

থানায় লিখেছিল যে, তারা চূড়ামণিযোগে গঙ্গাস্নান করবার জন্যে সকলে মিলে কলকাতায় যাচ্ছে, এখন চার-পাঁচদিন সতীশ যেন তাকে আর কোনও চিঠিপত্র না লেখে। কলকাতা থেকে ফিরে এসে কমলা সতীশকে চিঠি দিলে,—তবে যেন সে জবাব দেয়। সতীশ সেই চিঠিখানির জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। চার পাঁচ দিনের জায়গায় দু হপ্তা কেটে গেল, তবুও কোন খপর না পেয়ে সতীশ বড় উতলা হয়ে উঠলো। প্রথমে কমলার উপর তার দুর্জ্জয় অভিমান হয়েছিল, কেন সে চিঠি দিচ্ছে না! দিনান্তে একখানা চিঠি দিতেও কি সে অপারগ? দেশে নাই যদি ফিরে থাকে এখনও, কলকাতা থেকে কি আর একখানা চিঠি লেখা চলে না?—জানে তো তার চিঠি পেতে দেরী হলে আমি কতটা উদ্বিগ্ন হই। তবুও কি আমায় একখানা চিঠি দেওয়া দরকার, এ কথাটা তার একবারও মনে পড়ছে না? আচ্ছা বেশ, দেখা যাক্, সে কতদিন আর এমন চুপ করে থাক্‌তে পারে, আমিও আর তাকে চিঠি লিখ্‌ছিনে। কিন্তু সতীশ তার পণরক্ষা করতে পারলে না, আরও দু-সপ্তাহ যখন দেখতে দেখতে কেটে গেল, সতীশ তখন কমলার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠলো। এমন তো কখনও হতে পারে না! যে লোক প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তাকে পত্র লিখ্‌তো, আজ একমাস সে এমন চুপ করে আছে কেন? নিশ্চয় কমলার অসুখ-বিসুখ করেছে। সতীশ আর অভিমান করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারলে না, সেইদিনই কমলাকে সে একখানা চিঠি লিখে দিলে।

পত্রের উত্তর আসবার নির্দ্দিষ্ট দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেল; কমলার জবাব নিয়ে কোন চিঠিই যখন সতীশের কাছে এসে পৌছল না, সতীশ তখন ভীত হয়ে উঠলো; তাইত, হোল কি ওদের? আজ যে প্রায় একমাস হতে চললো, কোন খবর তাদের পাওয়া যায় নি! সতীশ সেদিন মৈত্র মশায়কে একখানা পত্র দেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় সেদিনের ডাকে সতীশের নামে একখানা পত্র এল। হাতের লেখাটা অপরিচিত কিন্তু পোষ্ট অফিসের ছাপ রয়েছে তার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের। সতীশ ব্যস্ত হয়ে চিঠিখানার খাম ছিঁড়ে পড়তে বসলো।

প্রিয় মহাশয়,

বড়ই দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে আপনার স্ত্রী শ্রীমতী কমলা দেবী আমাদের গ্রামের জমীদার-পুত্র শ্রীমান হরেন্দ্র বাবাজীউর সহিত গত চূড়ামণি-যোগে কুলত্যাগিনী হইয়াছেন। আপনার শ্বশুর মহাশয় সম্ভবতঃ এ দুঃসংবাদ আপনাদের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছেন, কিন্তু যেহেতু শ্রীমতী কমলা দেবী ন্যায়ত ধর্ম্মতঃ আপনার বিবাহিতা পত্নী, সুতরাং দুঃসংবাদ হইলেও সর্ব্বাগ্রে এ ব্যাপার আপনার কর্ণগোচর হওয়া বিধেয় বিবেচনায় মহাশয়কে পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপিত করিলাম। যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবেন। ইতি।

চিঠিখানা পড়ে সতীশের মাথা ঘুরে গেল, বুকের ভিতর হঠাৎ কে যেন সজোরে একটা লোহার শাবল বসিয়ে দিলে। দু' হাতে নিজের মাথাটাকে চেপে ধরে টেবিলের

উপর দুই কনুইয়ের ভর রেখে, খোলা চিঠিখানার দিকে সতীশ অনেকক্ষণ পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল।

দুর্গামণি রোজ সতীশের কাছে বৈবাহিকদের খবর পেতেন, সম্প্রতি অনেকদিন হল বৌমাদের কোন খবর না পেয়ে তিনিও একটু উতলা হ'য়ে উঠেছিলেন। ডাকগাড়ীখানি ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালেই তিনি সতীশকে এসে বলতেন,—ওরে স্থাখ্‌না একবার সতু, উঠে গিয়ে, বৌমাদের খবরটা আজ হয় ত এসেছে। সতীশও উঠে যেত, কিন্তু পোষ্ট আপিস থেকে শুক্‌নো মুখটি নিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসতো! আজ সে একখানা চিঠি হাতে করে ফিরে এসেছে দেখে দুর্গামণি একেবারে নিশ্চিত অনুমান করে নিলেন যে এবার বৌমাদের খবর না হয়ে আর যায় না। সবিশেষ জানবার জন্যে তিনি যখন সতীশের ঘরে এসে ঢুকলেন সতীশ তখন চেয়ারে বসেও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। তার মুখখানা মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে! ছেলের রকম-সকম দেখে দুর্গামণি মনে মনে শিউরে উঠলেন। খবরটা যে খুবই খারাপ এসেছে, এটা তাঁর বুঝতে একটুও বিলম্ব হল না, কিন্তু সেটা কি? বৌমার কি তবে ভাল-মন্দ কিছু হয়েছে? দুর্গামণি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে ও সতু, অমন কচ্ছিস্ কেন বাবা? তোর শরীরটা কি ভাল নেই? ও কার চিঠি এসেছে? বৌমাদের কি কিছু মন্দ খবর পেয়েছিস্?

সতীশের মুখে কোন কথা নেই, কেমন এক রকম শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তার মায়ের মুখের দিকে সে চেয়ে রইল। সমস্ত শরীর তার ঘেমে নেয়ে উঠেছে! দুর্গামণি তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে আঁচল দিয়ে ছেলের মুখখানি মুছিয়ে হাতপাখার বাতাস করতে করতে বললেন,—ওরে, তোর কি হয়েছে, আমায় বল্‌না, অমন করে মুখটী বুজে আমার দিকে চেয়ে রইলি কেন সতু? আমার যে বড় ভাবনা হচ্ছে বাবা!

সতীশ আস্তে আস্তে টেবিলের উপর থেকে চিঠিখানা তুলে নিয়ে তার মায়ের হাতে দিলে। দুর্গামণি বারকতক চিঠিখানা নেড়ে চেড়ে সতীশকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, হায় রে আমার পোড়াকপাল! ওরে, তোর এ অভাগী মা কি লিখ্‌তে পড়তে জানেরে সতু? আমার যে অক্ষর-পরিচয়ও কখনো হয়নি বাবা! তুই একবার পড়ে শোনা, লক্ষ্মী ধন আমার! খবরটা কি, জানবার জন্যে আমার প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠছে বাছা!

সতীশ একটা অব্যক্ত যাতনায় অবরুদ্ধ কণ্ঠ নিয়ে তার মাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে। দুর্গামণি খানিকটা ভেবে বললেন; —দেখ সতু! আমার বোধ হয় এ কোন শত্রুর কারসাজি, বাবা! আমার এমন লক্ষ্মী প্রতিমের মত বউ, সে কি কখনো এমন কাজ করতে পারে? তুই মৈত্রী মশাইকে একখানা চিঠি লিখে একবার ভাল করে সন্ধান নে, ও বেনামী চিঠি পড়ে মন খারাপ করে থাকিস্ নে বাবা!

জননীর উপদেশ সতীশের সমীচীন বলে মনে হল। সে তখনি উঠে গিয়ে শ্বশুরকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিলে।

৭

ক্ষিতীশ সেই যে হরেনের সন্ধানে

বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। কমলা উতলা হয়ে তার ফিরে আসার অপেক্ষা করছে। সহস্র দুশ্চিন্তা আজ তার দুর্ব্বল দেহ-মনকে যেন অস্থির করে তুলেছে। যদি এ বাবুটি হরেনদার সন্ধান না পান, তাহলে উপায়! কেমন করে সে বাড়ী ফিরে যাবে? কে তাকে নিয়ে যাবে? বাবা মা সবাই না জানি তার জন্যে কতই ভাবছেন! চারিদিকে কত বোধ হয় খোঁজ হচ্ছে!

কমলা মনে মনে হিসেব করতে বসল, আজ ক'দিন সে বাড়ী-ছাড়া হয়ে আছে। হিসেব করে বেচারী চম্‌কে উঠ্‌লো! উঃ! আজ যে প্রায় আটদিন হয়ে গেল সে এই অজানা অচেনা একজন পরের আশ্রয়ে পড়ে রয়েছে! ছি ছি! কি লজ্জার কথা! কি ঘেন্না! গ্রামের লোক শুন্‌লে বলবে কি? ভদ্রঘরের মেয়ে সে, গৃহস্থের বউ, এতদিন ধরে কলকাতার এক অপরিচিত লোকের বাড়ীতে বাস করছে, যে তার আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, কুটুম্ব নয়, কেউ নয়! যার বাড়ীতে একটা মেয়ে-ছেলে পর্য্যন্ত নেই! কমলা তার এই অসহায় অবস্থার কদর্য্যতাটা যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেয়ে নিজেই শিউরে উঠ্‌লো! একটা কলঙ্ক, একটা বদনাম, যে মুহূর্ত্তে রটে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় সে একান্ত ভীত হয়ে পড়ল। কত দ্বিধা দুর্ভাবনা সঙ্কোচ যেন সজারুর কাঁটার মত তার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় ধিক্কারে বিঁধতে লাগল। না, না, আর একদিনও সে এখানে থাকবে না। হরেন-দার সন্ধান পাওয়া গেলে আজই রাত্রে সে তার সঙ্গে দেশে ফিরে যাবে।··· কিন্তু, যদি হরেন-দাকে না পাওয়া যায়! তাহলে?—তাহলে কি হবে?—সহসা সাঁতার-না-জানা লোকের অতল জলে তলিয়ে যাওয়ার মতো কমলার সমস্ত প্রাণটা যেন একেবারে হাঁক্‌পাঁক্ করে উঠলো। কিছুতেই সে যখন একটা-কিছু কূল-কিনারা ঠাওরাতে পাচ্ছে না, ঠিক সেই সময় ক্ষিতীশ ফিরে এসে ঘরে ঢুক্‌লো। কমলাকে ডেকে বললে,—দেখুন, হরেনবাবুর কোন সন্ধানই আজ পাওয়া গেল না, তবে আশা হয় যে কাল-পরশুর মধ্যে তাঁকে খুঁজে বার করতে পারবো। গজুকে, গবেশকে, আর আমার অন্য সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে আজ খবর দিয়ে এসেছি, কাল তারা যেমন করে হোক্ হরেনবাবুর সন্ধান করবেই করবে। আপনি একটুও ভাববেন না। তিনি কোন্ কলেজে পড়েন, সেটা যদি আপনি একটু বলতে পারতেন তাহলে আজই তাঁকে ধরে আনতে পারতুম।

কমলা হতাশ হয়ে বললে,—তা তো আমি ঠিক জানিনি, তবে হরেন-দার কাছে শুনেছিলুম, কলকাতার কোন এক সরকারি কলেজে তিনি পড়েন—সেটা নাকি সহরের ভেতর সব-চেয়ে সেরা ইস্কুল।

ক্ষিতীশ হেসে বললে,—ওঃ! বুঝতে পেরেছি এইবার। এটা যদি আপনি আমায় আগে বলতেন, তাহলে আর আমাকে আজ কলকাতার অর্দ্ধেক মেশ্‌ খুঁজে বেড়াতে হোত না। তিনি যে কলেজের কথা বলেছেন, আমিও যে সেই কলেজে পড়ি! কাল কলেজে গিয়েই তাঁকে বার করবো এখন। হ্যাঁ, তিনি কি পড়েন, জানেন—?

কমলা তার ছোট মাথাটি নেড়ে বললে,

না,—তাতো জানিনি। কেবল দু'টো পাশ করে তিনটে পাশের পড়া পড়ছেন, শুনেছি!

—ওঃ, তাহলে বি-এ পড়ছেন বুঝি।

কমলা সাগ্রহে বলে উঠলো,—হাঁ হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, হরেনদা এখন বি-এ পড়ছেন।

ক্ষিতীশ বললে,—ব্যস্, তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—আমি কালই আপনার হরেন-দাকে নিয়ে এসে হাজির করবো, নিশ্চয়।

কমলা মাথাটা নীচু করে আঁচলের একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললে,—আমার জন্যে আপনি অনেক কষ্ট পাচ্ছেন, আপনার ঋণ আমি জীবনে কখনো শুধ্‌তে পারবো না।

কমলার এই কটি কথা ক্ষিতীশের অন্তরে যেন একটা পরম সার্থকতার তৃপ্তি ঢেলে দিলে। তার এই তরুণ জীবন আজ যেন ধন্য ও পূর্ণ হয়ে উঠল। সে বেশ প্রীত প্রফুল্ল কণ্ঠে বললে, —না, না, এ আর কষ্ট কি।—এ রকম অবস্থায় সকলেই আপনাকে সাহায্য করতো। বরং এ আমারই খুব সৌভাগ্য বলতে হবে যে, আমিই প্রথম আপনার উপকারে লাগতে পেরেছি। সে যাহোক্ এখন ভালোয় ভালোয় আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে পারলে বাঁচি। আপনার না-জানি এখানে কতই কষ্ট হচ্ছে! আমার এখানে মেয়ে-ছেলেরা কেউ নেই, সমস্তই ঝী-চাকরদের উপর নির্ভর। মোটেই তেমন যত্ন হচ্ছে না।

কমলা ধীরে ধীরে বললে,—এর চেয়ে আদর-যত্ন আমি জীবনে কারুর কাছে পাইনি।

ক্ষিতীশের প্রাণের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুতের মতো আচম্‌কা একটা সুধার ধারা প্রবাহিত হয়ে গেল। কি একটা আবেগের প্রবল বাতাস তরঙ্গ-হিল্লোলের মতো তার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করে তাকে রোমাঞ্চিত করে তুললে। মুহূর্ত্তের জন্য ক্ষিতীশ ভুলে গেল যে কমলা বিবাহিত, আর তার স্বামীও জীবিত। এই অসামান্য সুন্দরী মেয়েটিকে পথের পাশ থেকে কুড়িয়ে এনে পর্য্যন্ত, ক্ষিতীশ তার যৌবনের মোহন তূলিকায় প্রতিদিন কল্পনার যে-সব রঙীন ছবি জীবনের অভিনব চিত্রপটে বিচিত্র ভাবের নানা মাধুরী মাখিয়ে আঁকতে সুরু করেছিল, হঠাৎ সেগুলো যেন তখনি সজীব উজ্জ্বল হয়ে উঠে তার চোখের সামনে বায়োস্কোপের চিত্রের মতো ঘুরে যেতে লাগলো!

কমলা এই সময় আবার অশ্রুজড়িত অস্ফুট কণ্ঠে বললে,—আপনার এ উপকার আমি বেঁচে থাক্‌তে কখনো ভুলতে পারবো না।

ক্ষিতীশের তরুণ তনু ঘিরে উচ্ছ্বসিত যৌবনের তরল রক্তস্রোত সহসা যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো; সে ফস্ করে বলে ফেললে, আপনাকেও বোধ হয় এ জীবনে আমি আর কখনো ভুলতে পারবো না! কথাটা বলে ফেলেই কিন্তু এক দারুণ লজ্জায় তার কাণদুটো পর্য্যন্ত রাঙা হয়ে উঠ্‌লো! কমলার কৃতজ্ঞতার উত্তরে তার এ কথাগুলো যে নিতান্ত খাপছাড়া আর বেসুরো রকমের হয়ে গেল, এটা তার নিজের কাছেও বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তাই সে আর কিছু বলতে পারলে না, দোষীর মতোই অপ্রতিভ হয়ে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।

দেওয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং ক'রে রাত্রি দশটা বেজে গেল। কমলা বললে,—কথা কইতে কইতে অনেক রাত হয়ে গেল। আপনার এখনো খাওয়া হয় নি। যান, কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করে নিন্।

ক্ষিতীশ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে সে নীচের নেমে গেল। কমলা উপরের ঘর থেকে শুনতে পেলে, নীচের গিয়ে ক্ষিতীশ তার ঝী চাকর বামুন সবাইকে ডেকে কড়া-হুকুম জারি করছে,—খবর্দ্দার, যেন মাই-জীর খাওয়া-দাওয়া-শোওয়ার এতটুকু ত্রুটি না হয়, সবাই হুঁসিয়ার থাকবে, উনি যা হুকুম করবেন তখনি তা তামিল করবে। ওঁর শরীর খারাপ এটা যেন সকলের মনে থাকে। ইত্যাদি—

৮

ক্ষিতীশ আজ সকাল-সকাল খেয়ে দশটার মধ্যেই কলেজে চলে গেল। যাবার সময় ঝীকে দিয়ে কমলার কাছে বলে পাঠালে যে, কলেজের ফেরৎ একেবারে হরেনকে সঙ্গে করে সে বাড়ী ফিরবে। কমলা তাদের অপেক্ষায় সমস্ত দুপুর-বেলাটা রাস্তার দিকের জানলাটার কাছে বসে কাটিয়ে দিলে। একটা, দুটো করে ক্রমে যখন চারটে বেজে গেল, কমলা তখন বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো। আজ এঁর এত দেরী হচ্ছে কেন?—অন্যদিন ত দুটো-তিনটের ভিতরই ফিরে আসেন! তবে কি হরেন-দার ইনি দেখা পান-নি? হরেনদা কি আজ কলেজে আসেননি?—নাও আসতে পারেন। হয়ত কোন কাজে হঠাৎ দেশে চলে গেছেন। তা যদি হয়, তাহলে কি হবে? হরেনদা যদি সত্যিই কলকাতায় না থাকে? কমলা খড়খড়ির পাখিটা তুলে একদৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল; প্রাণটা তার ঠিক যেন তখন বাসা থেকে পড়ে-যাওয়া পাখীর ছানার মতোই ছট্‌ফট্ করছিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে এলো, রাস্তার দুধারে সারি সারি গ্যাসের আলোগুলো একটা একটা করে সব জ্বলে উঠলো। ঝী এসে জিজ্ঞাসা করলে,—হ্যাঁ মা, আজ কি গা-হাত-পা ধোবেন না, কাপড়-চোপড় কাচবেন না? সন্ধ্যে উত্‌রে গেল যে!

কমলা একটু উদাসভাবে বললে,—না ঝী, আজ আর জল ঘাঁটবো না, শরীরটা ভাল নেই।

ঝী বললে,—তবে আসুন, আপনার চুলগুলো বেঁধে দি। অমন কালো মেঘের মতো একরাশ চুল আজ ক'দিন চিরুণী না ছুঁইয়ে যে জট্ পাড়িয়ে ফেললে মা!

কমলা তেমনিই অন্যমনস্কভাবে বললে,—আচ্ছা, দাও।

ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম করে ঝী যখন সেই চুলের গোছাকে গুছিয়ে তুলে খোঁপা বেঁধে আয়নাখানা কমলার সাম্‌নে ধরলে, কমলা তখন চম্‌কে উঠে বললে,—ও ঝী, সিঁদুর?

ঝী হাস্‌তে হাস্‌তে বললে,—এই যে মা, সব গুছিয়ে এনেছি তোমার জন্যে।

সে তার আঁচলের গেরো খুলে ছোট্ট একটি সিঁদুর-কৌটো বার করে দিলে, কমলা চিরুণীর ধারে খানিকটা সিঁদুর তুলে নিয়ে যখন তার সেই চারু সিঁথির উপর রেখাটুকু টেনে দিলে, তার সমস্ত অন্তরখানি ঘিরে তখন

আর একজনের ভাবনা তাকে কাতর করে তুলেছিল!

ঝী চলে গেল, কমলা বসে-বসে ভাবতে লাগল। এ ভাবনাটি তার মনের গোপন ভাবনা—অষ্টপ্রহর অন্তরের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরছিল; কিন্তু লজ্জায় কারো কাছে মুখ ফুটে বলতে পারেনি। এই অচেনা পুরীতে এমন একজনও সঙ্গিনী নেই, যাকে সে প্রাণের কথা খুলে বলতে পাবে। আজ শুধু মনে-হওয়া নয়, মন তার ব্যগ্র হয়ে উঠল স্বামীকে একখানা চিঠি লেখবার জন্যে। কতদিন তাঁকে লেখা হয় নি! এ-কথা আগেও মনে হয়েছে, কিন্তু কার কাছ থেকে ঠিকানা লিখিয়ে নেবে? বাড়ীতে ঠিকানা লিখে দিত তার ছোট ভাই, এখানে ক্ষিতীশের কাছে তাঁর ঠিকানা লেখাতে তার ভারি লজ্জা বোধ হতে লাগল। যদি সে জিজ্ঞাসা করে বসে কাকে চিঠি লিখেছে? আর স্বামীর নামটাই বা কি করে তার সাম্‌নে বার করা যায়! কিন্তু আর ত লজ্জা করা চলে না।

কমলা ব্যগ্র হয়ে ঘরের চারিদিকে একটা চিঠি লেখবার সরঞ্জাম খুঁজতে লাগলো, কিন্তু ঘরের ভিতর কোথাও সে একটা দোয়াত কি কলম কিম্বা একটুকরো কাগজ পেন্সিল কিছুই দেখতে পেলে না। ক্ষিতীশের টেবিল, চেয়ার, খাতাপত্র, বইয়ের শেল্‌ফ্ সমস্তই 'নার্‌স্‌রা' এসে সে ঘর থেকে কমলার অসুখের সময় বার করে দিয়েছিল।

কমলার মনে পড়লো, ক্ষিতীশবাবু দিন-রাত পাশের ঘরটায় বসেই তো লেখাপড়া করেন, নিশ্চয় ওখানে কাগজ-কলম পাওয়া যেতে পারে। পাশের ঘরে ঢুকে কমলা দেখলে, সামনেই ক্ষিতীশের প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার উপর বেলওয়ারী কাঁচের দোয়াত-কলম সাজানো; একধারে মস্ত-একটা 'রাইটিং-কেস্' রয়েছে। কমলা তার ভিতর থেকে একখানা চিঠির কাগজ বার করে স্বামীকে চিঠি লিখ্‌তে বসলো। চিঠি লিখ্‌তে গিয়ে কমলা দেখ্‌লে, টেবিলে পাতা ব্লটিং, প্যাডের উপর নীল পেন্সিলে কমলার পিতা মৈত্র-মহাশয়ের নাম-ঠিকানাটা লেখা আছে, আর তার চার ধারে তার নিজের নামটাও অসংখ্যবার নানা রকম করে লেখা রয়েছে।

সতীশকে চিঠি লিখ্‌তে বসে কমলা ভাবলে, তাইতো, তাঁকে খবর দিয়ে অতদূর থেকে না টেনে এনে বাবাকে কেন একখানা চিঠি দিই না! সেইতো বেশ ভাল হবে। আমাদের গ্রাম শুনেছি কলকাতার খুব কাছে; বাবা চিঠি পেলেই দু'একদিনের মধ্যে এসে আমাকে নিয়ে যেতে পার্‌বেন, কিন্তু পশ্চিমে ওঁর কাছে চিঠি যেতে আর তিনি আসতে আরও একহপ্তা দেরী হয়ে যাবে, অত দিনতো সে কিছুতেই এখানে থাকতে পার্‌বে না! কমলা তখন মৈত্র-মশায়কেই চিঠি লিখতে বস্‌লো। প্রায় অর্দ্ধেকটা যখন লেখা হয়েছে, —কেমন করে ক্ষিতীশবাবু বলে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তা থেকে নিজের মোটর গাড়ীতে করে তুলে এনে, আপনার বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করিয়েছেন, এই সব বর্ণনা শেষ করেছে,—এমন সময় ক্ষিতীশের সেদিনকার কথাগুলো তার মনে পড়ে গেল! ক্ষিতীশ বলেছিল,

—কমলা এতদিন বাড়ী ফেরেনি বলে নিশ্চয় তাদের দেশে একটা সোরগোল পড়ে গেছে,—এমন অবস্থায় তার বাবাকে চিঠি লিখ্‌লে একটা উল্টো বিপত্তি হতে পারে, তার চেয়ে কমলার একেবারে নিজে গিয়ে সমস্ত কথা সেখানে তাঁদের বুঝিয়ে বলাই ভাল, নইলে—যে সম্ভাবনার তিনি ইঙ্গিত মাত্র করেছেন তা মনে হতেই কমলার হাতের কলম বন্ধ হয়ে গেল। বেচারী তখন গালে হাত দিয়ে আবার ভাবতে বস্‌লো—তাইতো! সে তবে কি করবে? এমন সময় পিছন থেকে চুপি চুপি কে এসে হাত বাড়িয়ে খপ্‌ করে তার আধখানা লেখা চিঠিটা তুলে নিলে! কমলা চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখে—হরেনদা! সেই তার ছেলেবেলার দুরন্ত সঙ্গীটি! চোখে-মুখে সেই চির-পরিচিত দুষ্ট হাসিটুকু আজও তেম্‌নি ফুটে রয়েছে।

কমলা একমুখ হেসে বললে,—আঃ, বাঁচলুম হরেনদা! তুমি এসেছো দেখে এতক্ষণে আমার মনে একটু ভরসা হচ্ছে! কী বিপদেই যে পড়েছিলুম আমি, সব শুনেছ ত?

হরেন যেন কমলার কোন কথা শুনতেই পেলে না! সে তখন কমলার লেখা সেই অসমাপ্ত চিঠিখানা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে ব্যস্ত! কমলা বললে,—দেখ, তোমাকে ইনি কলেজ থেকেই ধরে আনবেন বলে গেছ্‌লেন, কিন্তু তোমারই আসতে এত দেরী হল কেন? আমি সমস্ত দিন কি কষ্টই যে পেয়েছি! ইনি কোথায় গেলেন? তোমার সন্ধান পেলেন কি করে?—তুমি বুঝি আজ কলেজে পড়তে আসোনি, হরেনদা? দাঁড়াও, দেশে গিয়ে মাসীমাকে বলে দিচ্ছি!

হরেনের তবুও কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না, তেমনি নির্ব্বিকারভাবেই সে কমলার চিঠিখানা পড়তে অথবা মুখস্ত করতে লাগলো। কমলা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে, হরেনের হাত থেকে চিঠিখানা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে, —আচ্ছা হরেনদা, পরের চিঠি পড়া রোগটা কি তোমার এখনও গেল না? চিরকালটাই কি এম্‌নি ছেলেমানষী করবে?

হরেন একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বেশ সহজভাবেই বললে,—তোর কি আর বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে নারে কম্‌লি? এ বুঝি পরের চিঠি হল? এতো তুই লিখেছিস্‌ আমাদের মৈত্র-মশাইকে!

ক্রমশঃ *

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

---

* শ্রাবণ সংখ্যার লেখক—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মনের মিল

আড্ডাধারী মহাশয় এবং বন্ধুগণকে গুলি-খোর নয়ন-চাঁদ বলিয়াছিল,—"মনের মিল থাকে, তবে বলি, ইয়ার। তোমরা হিন্দু হও, আমিও তাই। মুসলমান হও, আমিও তাই। তোমরা যে ঠাকুরগুলি মানিবে, আমিও সে-গুলিকে মানিব। আমি যে ঠাকুরগুলিকে মানিব, তোমাদেরও সে-গুলিকে মানিতে হইবে। তা না হইলে, মনের মিল রহিল কোথায়?"

নয়ন গুলিখোর হইলেও তাহার কথায় অনেকটা সারবত্তা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আকার-অবয়বে, প্রকৃতি-স্বভাবে, বিশ্বাস-বিবেচনায়, হাজার পার্থক্য থাকিলেও এমন একটা কিছুর মিল থাকা চাই, যাহাতে কোন দুইজনের মধ্যে মনের মিল হয় এবং অন্যান্য পার্থক্য যতই বেশী হউক না কেন, সেই মিলটীর জোর এত অধিক যে, কিছুতেই উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটে না।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। একজনের হয়ত শাসন-প্রবৃত্তি, কর্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা প্রবল, তাহার সহিত ঐরূপ প্রকৃতির আর একটী লোকের মনের মিল হওয়া দূরের কথা, সর্ব্বদাই বিবাদ ও মনান্তর হওয়াই সম্ভব। আবার কোথাও বা দুইজনেই পরদুঃখকাতর, হয়ত ইহাতেই তাহাদের সহজে মনের মিল হইতে পারে। আবার যেমন, যাহার শাসন-প্রবৃত্তি প্রবল তাহার সহিত নম্র ও বশ্যস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরই সহজে প্রীতি হইতে পারে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। পরস্পর-বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হাজার বিবাদ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও উভয়ের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না। সে ভালবাসা—সে মিল কোথা হইতে কিরূপে আসে, তাহা বলা ও বুঝা কঠিন। অনেক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মনের মিল কেবল প্রবৃত্তি-সমূহের সমতার উপর নির্ভর করে না—বরং কতকটা উহাদের আকর্ষণ ও পূরণের উপর প্রীতি ও বৈরতা নির্ভর করিতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ এমন কিছু-একটা অজ্ঞাত আকর্ষণী শক্তি দেখা যায়, যাহাতে বিনা কারণে, পরস্পরের প্রকৃতির নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ আনুরক্তির সঞ্চার হয়। আবার এমনও হয়, একজন হয়ত অন্যজনের বিশেষ অনুরক্ত, সে কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চায় না। অনেকের জীবনেই এমন বহু ঘটনা হইয়াছে যে, প্রথম সাক্ষাতেই কেমন একজনের উপর মন বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছে;—মনে হইয়াছে, এ যেন কতদিনের পরিচিত, যেন কত আপনার জন! আবার অকারণে প্রথম সাক্ষাতেই অন্যজনের প্রতি বিদ্বেষ ভাব আসিয়াছে। সুতরাং এ সমস্ত যে এক অপূর্ব্ব অজ্ঞাত আকর্ষণী-শক্তি দ্বারা সাধিত হয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এই আকর্ষণ-শক্তির উদ্ভব বিষয়ে বহুকাল হইতেই আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু তাহার

স্থির মীমাংসা কেহই করিতে সমর্থ হন নাই। তন্মধ্যে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ—যাঁহারা মানবদেহে ও ভাগ্যে গ্রহগণের প্রভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এ বিষয়ে নানা মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতের সত্যতা উপলব্ধি করাও বিশেষ কঠিন নহে। তাঁহারা বলেন; গ্রহগণের মধ্যে যেরূপ পরস্পরের আকর্ষণ-শক্তি আছে, তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি একটা আকর্ষণ-শক্তি আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম সময়ে আকাশে অবস্থিত গ্রহগণ তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ও গুণবিকাশের নির্দ্দেশক। সুতরাং এক-জনের জন্মসময়ে সংস্থিত গ্রহগণ অন্যের জন্ম-সময়ে সংস্থিত গ্রহগণের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধে সম্পর্কিত হইলে উভয়ের মধ্যে একটা আকর্ষণ-শক্তির বিকাশ হইবে।

পূর্ব্বে কি বিবাহ-ব্যাপারে, কি ভৃত্য-নির্ব্বাচনে, কি গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ-স্থাপনে, এই নিয়মগুলি প্রতিপালিত হইত। লোকে তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিত; তাহাতে দম্পতীর প্রণয়, ভৃত্যের বশ্যতা, শিষ্যের আনুগত্য সম্বন্ধে কোন প্রত্যয় হইত না। এখনকার মত পতির অত্যাচারে কুলবধূর আত্মহত্যা প্রভুর যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ভৃত্যের পলায়ন ইত্যাদি বড় একটা সাধারণ ছিল না। এই নিয়মগুলি কেবল কল্পনা প্রসূত কিম্বা তাহাদের মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা পরীক্ষায় যখন সহজে তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে, তখন বিনা পরীক্ষায় সেগুলিকে কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, যদি নিয়মগুলি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা সকলের বিশেষ উপকারে আসিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চন্দ্র ও সূর্য্য লইয়াই ফল জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব প্রকার ফলাফল বলা হয়। রাশি, বর্ণ, গণ প্রভৃতি যোটকগণনা কেবল চন্দ্রের অবস্থান হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই যোটক গণনায় একজনের জন্মসময়ে চন্দ্রের অবস্থান হইতে অন্যের জন্ম-সময়ের চন্দ্রের অবস্থিতি স্থানের কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধের উপর উভয়ের মিলনের শুভাশুভ বিচারিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন য়ুরেনস্ ও নেপচুনের আবিষ্কার হয় নাই, তখন তাহাদের প্রদত্ত ফলাফলের কোন কারণ মীমাংসা করা যাইত না। কিন্তু আবিষ্কৃত না হইলেও তাহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ফলও যথাসময়ে প্রকাশ পাইত; কিন্তু লোকে উক্ত ফলসমূহের যথার্থ হেতু নিরূপণ করিতে সমর্থ না হইয়া নানারূপ কাল্পনিক যুক্তি দ্বারা ঘটনাগুলিকে নিয়ম-সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইত। এই জন্যই যোটক-বিচারে অনেক সময়ে ফল মিলিত না। কেবল তাহা নহে, নানারূপ দুর্ব্বোধ্য ও বিরুদ্ধ নিয়মসমষ্টি প্রবেশ করাইয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মূল নিয়মগুলির অন্তরায় করিয়া তুলিয়াছিল। যে শাস্ত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তাহার সত্যতা নিরূপণ করা কঠিন নহে; এবং একবার পরীক্ষায় সত্যতা উপলব্ধি হইলে, অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকিবে না।

এক্ষণে আমরা মূল সূত্রগুলির উল্লেখ করিয়া তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা পাইব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফল-জ্যোতিষে

চন্দ্র ও সূর্য্যকে লইয়া সমস্ত বিচার হইয়া থাকে। একজনের জন্মসময়ের চন্দ্র বা সূর্য্যের সহিত অন্যের জন্মসময়ের সূর্য্য বা চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণের বিশিষ্ট সম্বন্ধের উপর পরস্পরের আকর্ষণ নির্ভর করে। এই বিশিষ্ট সম্বন্ধটী গ্রহগণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যবধান মাত্র। যখন গ্রহগণের মধ্যে ৬০ ও ১২০ অংশ ব্যবধান থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে স্নেহদৃষ্টি আছে জানিতে হইবে এবং যখন তাহাদের মধ্যে ৪৫, ৯০ ও ১৮০ অংশ ব্যবধান থাকিবে তখন তাহাদের মধ্যে বৈরদৃষ্টি আছে জানিতে হইবে। আবার গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি, শুক্র ও চন্দ্র শুভফল-দাতা, তদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রহগণ অশুভ-নির্দ্দেশক। যখন একজনের জন্ম-সময়ের শুভগ্রহের সহিত অন্যের জন্ম-সময়ের শুভগ্রহের বা একের সহিত অন্যের জন্ম-সময়ের রবি বা চন্দ্রের একত্র সংযোগ হয় বা অন্যের গ্রহগণের সহিত স্নেহদৃষ্টি-যুক্ত হয় তখন তাহাদের মিলনে শুভ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের মধ্যে বৈরদৃষ্টি থাকে তখন অশুভ ফল হয়। উক্ত বিশিষ্ট সম্বন্ধ হইলেই পরস্পরের সাক্ষাতে উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, কিন্তু তাহার শুভাশুভ নির্দ্দেশ করিতে হইলে যে পার্থক্যের কথা বলা হইল তাহা দ্বারা সহজে নিরূপিত হইবে। যদি উভয়ের জন্মসময়ের গ্রহগণের মধ্যে উক্তরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধ না দেখা যায়, তবে তাহাদের মিলন বা সংযোগে বিশেষ কোন আকর্ষণ পাওয়া যায় না।

এই নিয়মগুলি বুঝা বিশেষ কঠিন নহে। রাশি-চক্রে গ্রহগণের স্থিত অংশাদি জানিতে হইলে পঞ্জিকা হইতে উভয়ের জন্মদিবসের গ্রহ স্পষ্ট গ্রহণ করিলেই হইবে। তখন তাহাদের পরস্পরের ব্যবধান স্থির করা সহজ। যেমন, একজনের জন্মসময়ে মেষ রাশিতে ৫ অংশে চন্দ্র রহিয়াছে, অন্যের জন্ম-দিবসে রবি সিংহ রাশির ৬ অংশে এবং শনি মকর রাশির ৭ অংশে অবস্থিত। এরূপ স্থলে পরস্পরের মিলনে উভয়েরই উভয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইবে; কারণ, এক-জনের চন্দ্র হইতে রবি প্রায় ১২০ অংশ ব্যবধান এবং শনি প্রায় ৯০ অংশ ব্যবধান। তবে রবির স্নেহদৃষ্টি ও শনির বৈরদৃষ্টি থাকায় ফলও শুভাশুভ উভয়ই হইবে। নিম্নের কয়েকটী উদাহরণ হইতে আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

প্রথম সাক্ষাতেই ভূদেব বাবু মধুসূদনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। নিম্নের গ্রহসংস্থানের তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে ভূদেব বাবুর বুধ মকর রাশির ১৫ অংশে এবং মধুসূদনের রবি মকর রাশির ১৫ অংশে অবস্থিত; ভূদেব বাবুর রবি মেষ রাশির ২ অংশে থাকিয়া মধুসূদনের ধনুরাশির ১ অংশে স্থিত শুক্রগ্রহের সহিত স্নেহদৃষ্টিতে সম্বদ্ধ। যাঁহারা ভূদেব বাবুর জীবনী-পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়ের আকর্ষণের বিষয় সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

ভূদেব বাবু—	মধুসূদন—
চন্দ্র—মেষ ২ অংশ	শনি—মেষ—২৭ অংশ
শনি—বৃষ ২৫ „	বৃহঃ—মিথুন—১৩০ „
বৃহঃ—সিংহ ২২ „	মঙ্গল—কন্যা—২১০ „
মঙ্গল—তুলা ২২ „	চন্দ্র—বৃশ্চিক—১৩০ „
নেপচুন—ধনু ২৩ „	শুক্র—ধনু— ১ „

য়ুরেনস—মকর ২০„		নেপচুন „—	১৮„
বুধ—	„ ১৫„	য়ুরেনস „—	২৩„
শুক্র—	„ ২৭„	রবি মকর—	২৫„
রবি—	কুম্ভ ৪ „	বুধ „—	১৯„

বিবেকানন্দ ও পরমহংসদেবের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরস্পরকে এক অপূর্ব্ব আকর্ষণে আবদ্ধ করিয়াছিল। বিবেকানন্দের রবি পরমহংসদেবের শুক্রের সহিত স্নেহদৃষ্টিযুক্ত ছিল এবং পরমহংসদেবের রবি বিবেকানন্দের বৃহস্পতির সহিত স্নেহদৃষ্টিযুক্ত ছিল।

এইরূপ যত ব্যক্তিগত আকর্ষণ ও তাহার শুভাশুভ ফলের আলোচনা করা যাইবে তাহাতেই উক্ত নিয়মের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। যখন উক্ত নিয়মগুলি সহজে পরীক্ষা করা যাইতে পারে তখন অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

বিবাহ-ব্যাপারেও মনের মিল না হইলে সাংসারিক জীবন দুঃসহ হইয়া উঠে। বিবাহ সাংসারিক জীবনের একটী প্রধান ঘটনা;—ইহারই উপর সংসারের সুখ-দুঃখ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই যখন মিলন,—তখন কুমার-কুমারীর জন্মসময়ে গ্রহাদির অবস্থান প্রভৃতির বিচার করিয়া উভয়ের মিলন হইবার কতদূর সম্ভাবনা তাহা বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া দেখা উচিত। কি হইলে পতি-পত্নীর অন্তরে-বাহিরে পূর্ণভাবে মিলন হইবে, সম্বন্ধ-নির্ণয়কলে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া দুইটী স্বতন্ত্র জীব কেমন করিয়া একই জীবরূপ ধারণ করিবে; বাহিরে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইলেও, কেমন করিয়া উভয়ে মিলিয়া অন্তরে অন্তরে এক হইয়া যাইবে, সম্বন্ধ-নির্ণয়ে এই সকলের সুগম পন্থা বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যঋষিদিগের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এই জন্যই সম্বন্ধ-নির্ণয় বিবাহ-ব্যাপারে একটী গুরুতর বিষয়। এই সম্বন্ধ বিচার অনেক সময় স্থির হয় না বলিয়া বিশেষভাবে মিলন ব্যাপারে গ্রহসম্বন্ধ বিচার হয় না বলিয়া অনেক স্থলে বিবাহ ব্যর্থ হইয়া যায়—বিবাহের যে মূল উদ্দেশ্য, বিবাহ হইলেও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

বিবাহের মিলন সম্বন্ধে অন্যান্য আরও কয়েকটী নিয়ম আছে, কিন্তু এ প্রবন্ধে সে-সব কথার আলোচনা করা উদ্দেশ্য নহে। সে সহজ নিয়ম কয়টী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বসাধারণে প্রযুজ্য এবং সহজেই তাহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। প্রণয়ের ও মিলনের বৈচিত্র্য কিরূপে গ্রহসংস্থান হইতে সহজে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে তাহা ফ্রান্সের প্রসিদ্ধা লেখিকা জর্জ্জ স্যাণ্ডের জীবনীর একটু আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

জর্জ্জ স্যাণ্ডের প্রণয়-কাহিনী অতীব বিচিত্র। বিশেষতঃ তাঁহার শেষ প্রেমিকের পরিচয় অতীব কৌতূহলপ্রদ। কবি বলিয়াছেন যে চোখে না দেখিয়া কেবল বাঁশী শুনিয়াই লোক মজিয়াছে কিন্তু কেবল কাশি শুনিয়া মজিতে কখন শুনিয়াছ কি? ফ্রেডরিক চপিন নামক একজন গায়ক স্যাণ্ডের বাটীর নিকট বাস করিতেন। একদিন স্যাণ্ডের পিয়ানো বেসুরো হওয়ায়, চপিনকে ডাকিয়া তিনি পিয়ানো ঠিক সুরে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। জর্জ্জ স্যাণ্ড লিখিয়াছেন,—"আমি চপিনের কাশি শুনিয়া চপিনের প্রেমে পড়িয়া-

ছিলাম। এমন সুন্দর কাশিতে আর কেহ পারে না। চপিনের আর কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই। সৌন্দর্য্যের মধ্যে আছে তাহার কেবল ঐ কাশি। ইহার পূর্ব্বে দুই বৎসর হইতে আমি চপিনকে চিনিতাম; কিন্তু তাহার প্রেমে পড়ি নাই। আজ তাহার কাশি শুনিয়া তাহার প্রেমে পড়িলাম।” চপিন পিয়ানো বাজাইতেছেন, আর জর্জ্জ স্যাণ্ড প্রেমভরে তাহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। চপিন যেমন পিয়ানো হইতে মুখ তুলিয়া জর্জ্জ স্যাণ্ডের দিকে চাহিলেন, অমনি চারি চক্ষুর মিলন হইয়া গেল। স্যাণ্ড আর থাকিতে পারিলেন না, একেবারে ছুটিয়া গিয়া চপিনকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। চপিনও তাহার প্রতিদান দিলেন। উভয়ের মিলন হইয়া গেল। তাহার পর হইতে উভয়ে স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

নিম্নে স্যাণ্ড ও চপিনের জন্ম-দিবসের গ্রহ-সংস্থান প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, কেন ইহাদের মধ্যে এরূপ বিচিত্র আকর্ষণের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলও কিরূপ হইয়াছিল।

জর্জ্জ স্যাণ্ডের জন্মদিনের গ্রহসংস্থান—	চপিনের জন্মদিনের গ্রহসংস্থান—
রবি—কর্কট ১০ অংশ	রবি—মীন ৩ অংশ
চন্দ্র—মেষ ২৭ ”	চন্দ্র—তুলা ১১ ”
বুধ—মিথুন ১৮ ”	বুধ—কুম্ভ ২১ ”
শুক্র—সিংহ ১৭ ”	শুক্র—” ২৮ ”
মঙ্গল—বৃষ ২৩ ”	মঙ্গল—মেষ ২ ”
বৃহঃ—তুলা ২৬ ”	বৃহঃ—” ২৩ ”
শনি—কন্যা ২৮ ”	শনি—ধনু ১৪ ”
য়ুরেনস—তুলা ১২ ”	য়ুরেনস—বৃশ্চিক ১৪ ”
নেপচুন—বৃশ্চিক ২৩ ”	নেপচুন—ধনু ৯ ”

উপরের গ্রহসংস্থান হইতে দেখা যাইবে যে স্যাণ্ডের রবি চপিনের চন্দ্রের সহিত বৈরদৃষ্টিযুক্ত এবং য়ুরেনসের সহিত মিত্র-দৃষ্টিযুক্ত। স্যাণ্ডের চন্দ্র চপিনের বৃহস্পতির সহিত সংযুক্ত এবং শুক্রের সহিত শুভদৃষ্টি-যুক্ত। আবার চপিনের সূর্য্য স্যাণ্ডের শনির ১৮০ অংশ ব্যবধানে অবস্থিত অর্থাৎ বৈর-দৃষ্টিযুক্ত এবং চন্দ্র স্যাণ্ডের য়ুরেনসের সহিত একত্র অবস্থিত। এই সমস্ত দৃষ্টি ও যোগ হইতে দেখা যায় যে, উভয়ের পরস্পরকে আকর্ষণ করিবার শক্তি অত্যন্ত প্রবল। স্যাণ্ডের চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত চপিনের গ্রহগণ অধিক স্নেহ বা মিত্রদৃষ্টিযুক্ত, সুতরাং স্যাণ্ডেরই প্রীতিভাব অধিক প্রবল ছিল। কিন্তু চপিনের চন্দ্র ও সূর্য্য সমস্তই স্যাণ্ডের গ্রহগণ কর্ত্তৃক পীড়িত বা বৈরদৃষ্টিযুক্ত। এরূপ স্থলে চপিন কেবল স্যাণ্ডের আকর্ষণ-বশে বশীভূত হইয়াছিলেন। ফলে বহুদিবস একত্র মনের মিল থাকিতে পারিল না। ফলেও তাই ঘটিয়াছিল। ইহাঁদের মিলনের আট বৎসরের মধ্যে স্যাণ্ডের একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়। ইহার পরই চপিন পীড়িত হইয়া পড়িলেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের গৃহ-বিবাদের সূত্রপাত হইল। একদিন চপিন সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং সেই বিচ্ছেদেই তাঁহাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটে।

যতদূর সম্ভব মিলন-বিষয়ে গ্রহদিগের মানবজীবনের উপর প্রভাব সহজ ভাবে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং আশা করা যায় ইহার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আরও অনেক গোপন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে।

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত।

বোঝা

(গল্প)

নেশার ঝোঁক কাটিলে জ্ঞানাঙ্কুর যখন দেখিল, ব্যাপারটা বহুদূর গড়াইয়াছে, খেলা তার গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখন সে মালতীকে ডাকিয়া কহিল, "মালতী, এই পাঁচশ টাকা নে—আরো চাস্ ত দিচ্ছি,আমায় বাঁচা! কাশী-টাশী যেখানে হয়, চলে যা।"

মালতী গরীব নিরাশ্রয়, বিধবা দাসী বৈ ত নয়! অর্থের লোভে জ্ঞানাঙ্কুরকে সে আজ রেহাই দিবে নাই-বা কেন! এই ভাবিয়াই জ্ঞানাঙ্কুর কথাটা বলিল। কিন্তু সে কথা শুনিয়া মালতীর চোখদুটো যেন জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল, "কেন, পৃথিবী থেকেই চলে যাই না?"

জ্ঞানাঙ্কুর শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "না না, তা করিসনে—অন্ততঃ এখানে নয়... আমার হাতে দড়ি দিস্‌নে.. আরো কিছু চাস্ ত বল্?"

মালতীর দুইখানা শুষ্ক ঠোঁটে একটা ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "না, না, ভয় নেই...আপনায় কলঙ্কও পেতে হবে না, আর আপনার হাতে দড়িও দেওয়াব না! কিছু কর্ত্তে হয়, আপনার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে করব!"

"আত্মহত্যা নাই-ই করলি।"

"কেন, সে তো আপনার পক্ষে ভালই, একেবারে সব মুছে যেত!"

জ্ঞানাঙ্কুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মালতী হাসিল। জ্ঞানাঙ্কুর জিজ্ঞাসা করিল, "হাসলি যে?"

"আপনার দীর্ঘনিশ্বাস পড়া দেখে।"

খানিকক্ষণ নীরব রহিয়া জ্ঞানাঙ্কুর বলিল, "আর কিছু টাকা দেব?"

"না, এতেই হবে। আর দরকার নেই।"

পরদিন মালতী তাহার কাপড়-চোপড় লইয়া কখন্ যে চলিয়া গেল, কেহ তাহার সন্ধানও পাইল না। তিনমাসের মাহিনা ফেলিয়া হঠাৎ না বলিয়া চলিয়া যাইবার কারণ কি ভাবিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল। তখন বাড়ীর কোন মূল্যবান জিনিস-পত্র খোয়া গিয়াছে কি না তাহার খোঁজ পড়িল। কর্ত্তা তাঁর ক্যাশ্‌বাক্স খুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওগো, সর্ব্বনাশ করে গেছে! কাল পাঁচশ' টাকার একতাড়া নোট বের করেছিলুম—তা নেই!"

জ্যোৎস্না একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তার অত সাহস হবে! সে তোমার বাক্স খুল্‌বে?"

জ্ঞানাঙ্কুর বিরক্ত হইয়া বলিল—"তবে গেল কোথায়...? তারই কর্ম্ম!"

তখন আরো কি চুরি গিয়াছে তার খোঁজ করিতে করিতে দেখা গেল...ঝীর ঘরে একতাড়া নোট এককোণে লুকানো রহিয়াছে।

জ্ঞানাঙ্কুর পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল,

"মাগী হয় শেষে ভয় পেয়ে ফেলে গেছে, নয় তাড়াতাড়িতে ভুলে গেছে!"

জ্যোৎস্না বলিল, "ভোলেনি, ভয় পেয়েই ফেলে রেখে গেছে, আর তাই পালিয়েওছে! বাপ দিখিন—কি দুর্ম্মতি...এদিকে কখনো একটা পয়সাও ছোঁয়নি—শেষে কি কুক্ষণে এই মতি হল তার?"

জ্ঞানাঙ্কুর বলিল, "লোক চেনা ভার!"

২

পাচিকা একদিন জ্যোৎস্নাকে বলিল, "যাই বল মা, মালতী টাকা চুরি করার ভয়ে পালায়নি..."

জ্যোৎস্না আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তা নয়ত আর কি-জন্যে পালাবে?"

তখন পাচিকা নানান যুক্তি-তর্কে জ্যোৎস্নাকে বুঝাইল যে, ইদানীং মালতীর পতন হইয়াছিল, তাই সে নিজের কলঙ্ক ঢাকিতে চাকরি ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছে।

জ্যোৎস্না বলিল, "সে কেমন করে হবে? সে তো একদণ্ড বাড়ীর বার হত না!"

পাচিকা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"দোহাই মা, বাবুর কাণে যেন এ কথা না ওঠে!"

হঠাৎ জ্যোৎস্নার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পাচিকাকে বলিল, "তোমার সমস্ত মাইনে চুকিয়ে দিচ্ছি, তুমি কাল চলে যেয়ো!"

"আমার কি অপরাধ হল মা?...আমি তো বাবুর নামে কিছু বলিনি আর তা বলতেও বা—"

জ্যোৎস্না ধমক দিয়া উঠিল—"চুপ কর বামুন-ঠাকুরুণ! আমি কাল তোমার যাবার কথা বলছিলুম, তা নয়—তুমি আজই—এখনি চলে যাও।"

জ্যোৎস্না মাহিনার টাকা আনিতে উঠিয়া গেল।

পাচিকাকে হঠাৎ বরখাস্ত করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোৎস্না স্বামীকে কহিল,

"ও মাগীর বড় আস্পর্দ্ধা, তাই দূর করে দিয়েচি!"

"কি করেছিল---?"

"তা সে তোমার শুনে কাজ নেই, আর আমিও তা বলতে পারব না।"

"এমন কি কথা...যে, আমাকেও বলতে পারবে না?"

"বলবার হলে আর তোমায় বলতুম না? তোমার পায়ে পড়ি, আর বেশী জেদ্ করো না!"

অগত্যা জ্ঞানাঙ্কুর নিরস্ত হইল। এদিকে পাচিকা যাইবার সময় পাড়ায় রাষ্ট্র করিয়া গেল যে, সে সত্য কথা বলায় গিন্নীমা তাহাকে কাজে জবাব দিয়াছেন। ফলে মালতীর কথা লইয়া পাড়ার মেয়ে-মহলে বেশ আন্দোলন হইতে লাগিল। কাহারো কাহারো সত্যানুরক্তি এতটা উগ্র হইয়া উঠিল যে, জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করা হইয়া গেল—"হ্যাঁ ভাই, সত্যি?"

"কি সত্যি?"

"এই মালতী আর—"

"সেই বামনী মাগী বুঝি বলে বেড়িয়েছে?"

"তা নয়ত আর আমরা তোমাদের ঘরের খপর জানতে যাব কেমন করে?"

"তা তোমরাও তাই বিশ্বাস করলে না কি ?"

দো-টানা সুরে উত্তর হইল—"এ্যাঁ... বিশ্বাস...? তা নয়, তবে কি জানো ভাই—কথাটা বড় খারাপ !"

ম্লান হাসি হাসিয়া জ্যোৎস্না বলিল, "তার আর কি করব...সেই জন্যেই ত দূর করে দিয়েচি !"

সকলে চলিয়া গেলে জ্যোৎস্নার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল, স্বামীকে সব কথা জানায়, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল—মাগো, ছি ! কি ভাববেন !

সেই রাত্রে জ্যোৎস্নার মুখের ভাব দেখিয়া জ্ঞানাঙ্কুর জিজ্ঞাসা করিল, "মুখ অত শুক্‌নো কেন জ্যোৎস্না ?"

জ্যোৎস্নার চোখের পাতা সহসা চক্‌চক্ করিয়া উঠিল, সে বলিল—"চল, আমরা এ পাড়া থেকে উঠে যাই—"

"হঠাৎ ! কেন ?"

"এমন পাড়ায় আবার মানুষ বাড়ী করে...রাতদিন পরের নামে মিথ্যে কুৎসা নিয়ে থাকে যে পাড়ার লোকেরা—"

"কে কার কুৎসা করলে—শুনি ?"

"তা আমি বল্‌তে পারব না !"

"কার ?...আমার ?"

জ্যোৎস্না সজল চক্ষে স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

"তা করুক্ গে ! তুমি কি বিশ্বাস কর ?"

জ্ঞানাঙ্কুরের কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল।

স্বামীর বুক হইতে অশ্রুলিপ্ত মুখখানি তুলিয়া জ্যোৎস্না বলিল, "বিশ্বাস করি না বটে, কিন্তু শুন্‌লে কষ্ট হয় না ?"

"বিশ্বাস কর না ত কষ্ট হবে কেন ?"

"কিন্তু আমি ত সত্যই বিশ্বাস করি না, তবে কষ্ট হয় কেন ?"

"তবে বিশ্বাস কর, বোধ হয় !"

"না—না, আমি বিশ্বাস করি না—সত্যিই বল্‌ছি !"

জ্ঞানাঙ্কুর আর কিছু বলিল না। জ্যোৎস্না নিজের মনে মনে বলিল—সত্যিই ত, আমি বিশ্বাস করি না, তবে কেন কষ্ট হয় ? তবে কি—

বাকীটা ভাবিতেই জ্যোৎস্নার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল !

৩

মালতী নদীয়ার মাতৃমন্দিরের সংবাদ যে কেমন করিয়া পাইল, তাহা জানিয়া বা জানাইয়া বিশেষ কোন লাভ নাই। ক্ষণিকের ভুলে নারীর ললাটে যখন চিরদিনের কলঙ্ক-রেখা অঙ্কিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়, তখন এই মাতৃমন্দিরের আশ্রয়ে আসিলে সে তাহার সেই কলঙ্ক-রেখা মুছিয়া নারীকে তাহার ভুলভ্রান্তি বুঝাইয়া, আবার নূতন জীবন-পথে চলিবার অবকাশ করিয়া দেয়। অভাগী মায়েদের বুকের ধনগুলিকে মাতৃমন্দির নিজের বুকে তুলিয়া লয়। ক্ষুব্ধ তপ্ত মাতৃহৃদয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর ছয়মাস-কালমাত্র স্নেহের ক্ষুধা মিটাইবার অবসর পায়, তারপর স্নেহের পুত্তলিকে মাতৃমন্দিরের বক্ষে বিসর্জ্জন দিয়া, হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে তপ্ত বেদনার মৌন জ্বালা

লইয়া অভাগীকে সংসারের হাসি-খেলায় আবার যোগ দিতে হয়!

দেখিতে দেখিতে মালতীর সেই ছয়মাস ফুরাইয়া আসিল। কাল তার বিদায়ের দিন। মালতীর মনে হইতে লাগিল, আজিকার সূর্য্য যেন বড় শীঘ্র অস্তাচলের পারে ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যা আসিল—সম্মুখে রাত্রিটুকু মাত্র সম্বল। এই রাত্রিটুকুকে যদি আজ মালতী বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া রাখিতে পারিত! এই রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনে যে আঁধার-ভার চাপিয়া আসিবে, তাহা কি সমাজের লাঞ্ছনার চেয়ে কম ভীষণ? হৃদয়ের পরতে পরতে রুদ্ধবাক্ বেদনা লইয়া সমাজে একটু ঠাঁই পাওয়ার চেয়ে, বুকের ধন বুকে লইয়া সমাজ হইতে বহুদূরে একপাশে পড়িয়া থাকা কি ভালো নয়? হৃদয়কে বুভুক্ষু রাখিয়া কাজ কি আমার সম্ভ্রমের সজ্জায়?

মালতী অধ্যক্ষকে জানাইল—সে তাহার সন্তান সঙ্গে লইয়া যাইতে চায়।

আচম্কা মালতীর মুখে এই আবেদন শুনিয়া অধ্যক্ষ আশ্চর্য্য হইয়া খানিকক্ষণ মালতীর পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমাদের এখানে এলে কেন?"

মালতী হেঁটমুখে বলিল, "তখন বুঝতে পারিনি যে ছেলে—"

অধ্যক্ষ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমরা আটকে রাখব? না, না, তা আমরা আটকাব না। তবে কি না, কথা হচ্চে একে সঙ্গে নিয়ে গেলে তোমাকে সমাজের কাছে অনেক লাঞ্ছনা-অপমান সইতে হবে।"

মালতী নতদৃষ্টিতে নিজের হাতের নখ পরীক্ষা করিতে করিতে বলিল—"তা বরং সইব।"

"একে লালন-পালন করবে কি করে?"

মালতী এবার একটু মৃদু হাসিল। অধ্যক্ষ বুঝিলেন, বড় বেকুবের মত প্রশ্নটা করিয়াছেন। তিনি নিজেকে সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বলিলেন—"না, না, আমি বল্‌চি, তোমার চলবে কি করে?"

"খেটে খুটে চালাব।"

"যদি সমাজে কেউ তোমার জল স্পর্শ না করে?"

"সমাজ আমার জলস্পর্শ না করতে পারে, কিন্তু সমাজের আবর্জ্জনা স্পর্শ করবার অধিকারও কি আমার থাকবে না? আমি না হয় মেথরের কাজ করব!"

"পারবে তা?"

"এই ছেলের জন্যে আমি এখন সব পারি…" সন্তান-স্নেহে মালতীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় হইয়া উঠিল!

৪

বছর পাঁচ-ছয়কার পরের কথা। জ্যোৎস্না বিধবা হইয়া বিয়োগ-বিধুর অবস্থায় ভারতের তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে উল্কার মত ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। দেশে বিপুল সম্পত্তি—পড়ে থাকিতেছে। আক্ষেপ নাই। জ্যোৎস্না চায় শান্তি। স্বামীর স্মৃতি জাগাইয়া রাখার মত একটা-কিছু—না হোক্ ছেলে ··মেয়েও যদি থাকিত! হৃদয়ের ক্ষুধা ঐশ্বর্য্যের

ভোগে নিবৃত্ত হয় না! তার পিপাসাও তীর্থের সলিলে মিটে না!

হৃদয়ে এইরূপ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা আর মরুভূমির তৃষ্ণা লইয়া জ্যোৎস্না একদিন পুরীর পথে দেবদর্শনে যাইতেছিল। হঠাৎ রাস্তার চৌমাথায় কাতরকণ্ঠে শিশুর করুণ প্রার্থনা ধ্বনিয়া উঠিল,—একটি পয়সা মা। জ্যোৎস্নার উৎকর্ণ হৃদয় ক্ষণকালের জন্য মুহূর্ত্তে অকারণ পুলকে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যেন কোন হারানো ছেলে তার মায়ের দেখা পাইয়া ব্যাকুল আগ্রহে ডাকিতেছে।

জ্যোৎস্না চকিত হইয়া শিশুর পানে চাহিতেই বিস্ময়ে পুলকে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। জ্যোৎস্নার দাদা বলিল, "কিরে, দাঁড়িয়ে কি দেখচিস্?"

"দাদা, ঐ ছেলেটিকে দেখচ?"

জ্যোৎস্নার দাদা এতক্ষণ সেদিকে ভালো করিয়া লক্ষ্য করে নাই, ভগ্নীর কথায় শিশুর পানে চাহিয়া ভগ্নীর মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, "সত্যি—ভারি আশ্চর্য্য তো!—ওরে ছেলে, শোন্ তো এদিকে!"

শিশুর বয়স বছর পাঁচ-ছয় হইবে। পরণের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে একাংশে ভিক্ষার চাল আধসের আন্দাজ। মাথায় কোঁকড়া চুল আঙুরের গুচ্ছের মত মুখের সম্মুখভাগে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—যেন শিশুর বেদনা-ভরা কাণের কাছে সান্ত্বনা দিতে যাইতেছে। চোখ দুটি টানা টানা কিন্তু বড় ম্লান। দারিদ্র্য তাহার কচি মুখ হইতে শিশুর সহজ সরস ভাবটুকুর অনেকখানি কাড়িয়া লইয়াছে। বোধ হয়, এখনও তার আহার হয় নাই—মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে।

শিশু নিকটে আসিলে জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি, বাবা?"

এই স্নেহ-সম্ভাষণে শিশুর চোখের পাতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "বোঝা!"

বিস্মিত কৌতুকে ভ্রাতাভগ্নী পরস্পরের দিকে একবার তাকাইল। জ্যোৎস্নার দাদা জিজ্ঞাসা করিল, "এ নাম কে দিলে?"

শিশু একবার দুইজনের মুখের পানে তাকাইয়া মাটির দিকে মাথা নীচু করিয়া বলিল, "মা—মার অসুখ করেছে।" শিশুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভারী হইয়া উঠিল।

জ্যোৎস্না বলিল, "তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

শিশু উত্তর করিল, "ঐ—ঐ দিকে।"

জ্যোৎস্না ভাইকে বলিল, "চল না দাদা, যাই।"

"যাবি—বলচিস, কিন্তু—"

"হ্যাঁ দাদা—চল—!"

শিশুর পানে চাহিয়া জ্যোৎস্নার দাদা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কে আছে?"

শিশু প্রশ্নকর্ত্তার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "আর? আর? আর পাণ্ডাঠাকুর আছেন, আই আছেন, নীলমণি আছে, শ্রীহরি আছে। পাণ্ডাঠাকুরের ঝি মহামায়া আছে—"

জ্যোৎস্নার দাদা বাধা দিয়া বলিল, "তারা তোমাদের কে হয়?"

বালক ক্ষণকাল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "না, তাঁরা গোয়ালে থাকৃতে দেছেন— কেউ হয় না!"

জ্যোৎস্না বলিল, "চল বোঝা, তোমার মাকে আমরা দেখে আসি।"

বোঝা এ কথা শুনিয়া অবাক হইয়া তাহাদের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার মাকে দেখিতে যাইবে,—কেন? কই, কেউত এমন কথা কখনো বলে নাই! পাণ্ডাঠাকুরও তো একদিনও গোয়াল-ঘরে উঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই—তার মা কেমন আছে? তার মাকে যে অপরে আবার দেখিতে চাহিবার প্রস্তাব করিবে, ইহা তাহার ভারি আশ্চর্য্য অসম্ভব ঠেকিতে লাগিল। শেষে তার কেমন একটা ভয় হইল। ভয়ে মুখ শুকাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গো, তোমরা দেখতে যাবে?"

জ্যোৎস্না বলিল, "তোমার মার অসুখ করেচে না—তাই দেখতে যাব।"

জ্যোৎস্নার মুখের ভাবে বোঝার মন হইতে অনেকখানি ভয় দূর হইল। সে বলিল, "তোমরা আমার মাকে সারিয়ে দেবে?"

জ্যোৎস্নার দাদা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মার কি হয়েচে?

"অসুখ—অনেক দিন থেকে—একদিনও সারে না, উঠ্‌তে পারে না—কেবল কাশে, আর—"

জ্যোৎস্নার দাদা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভগ্নীর পানে তাকাইল।

জ্যোৎস্না বলিল, "ও রোগ কি একেবারেই—"

"হ্যাঁ, কখনো কখনো সেরেও যায়।"

বোঝা হঠাৎ জ্যোৎস্নার দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ডাক্তার বাবু?"

জ্যোৎস্না বলিল, "হ্যাঁ—ইনি ডাক্তার বাবু, তোমার মাকে সারিয়ে দেবেন।"

বোঝা এখন বড় খুসি হইয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। খানিকটা পথ গিয়া বোঝা ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "মা খাবে কি—ভিক্ষে তো বেশী হয়নি!"

জ্যোৎস্না বলিল, "আমাদের কাছে সব আছে, দেব এখন।"

বোঝার আজ কেমন সব ভাবনা কাটিয়া গেল—তার মা সারিয়া উঠিবে।

সে গোয়াল-ঘরের কাছে আসিতে না আসিতে আহ্লাদে আটখানা হইয়া ডাকিল, "মা—মা, ডাক্তার বাবু এসেছেন, আর কে এসেছেন, দেখ। এবার তোমার অসুখ সেরে যাবে। একটু বেরিয়ে আসতে পারবে মা?"

জ্যোৎস্না বোঝার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেরিয়ে এসে কাজ কি? আমরাই যাচ্ছি। উঃ, কি অন্ধকার! দাদা তোমার পকেটে বাতি ছিল না?" জ্যোৎস্নার কণ্ঠস্বরে বোঝার মা চমকিয়া উঠিল...তাহার বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুততালে নাচিতে লাগিল। বাতি লইয়া জ্যোৎস্নার গোয়ালে ঢুকিয়া দেখিল, রোগিণী ছিন্নশয্যায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে! আর তাহার কপালে বিন্‌ বিন্‌ করিয়া ঘাম হইতেছে।

জ্যোৎস্নার দাদা রোগিণীকে দেখিয়া বলিল, "আছে ত?"

দেখিয়া শুনিয়া দাদা বলিলেন, "আছে—তবে বড় খারাপ দেখ্‌চি।"

* * * *

অনেক কষ্টে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। জ্যোৎস্না

রোগিণীর পানে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিল,—জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় চিনতে পার?" রোগিণী জ্যোৎস্নার নিরাভরণ বেশ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া অতিকষ্টে বলিল, "মা তোমার এই দশা হয়েছে?" তাহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল। সে আবার চক্ষু মুদিল।

জ্যোৎস্না দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "একে আমাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া যায় না দাদা?"

দাদা বলিলেন, "এখন ত নয়।"

দাদা বাহিরে সরিয়া গেলেন।

জ্যোৎস্না তখন পাগলের মত হইয়া রোগিণীর শীর্ণ হাতখানা ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "মালতী একটা কথার জবাব দিবি, বোন? বল, তোর বোঝার উপর আমারও একটুও অধিকার আছে কি? তোর পক্ষে বোঝা হতে পারে—ও, কিন্তু আমার কাছে আজ যে ওর দাম নেই—অমূল্য ও।"

মালতী তাহার দুই শীর্ণ হাতে জ্যোৎস্নার হাতখানা ধরিয়া নিজের কপালে ঠেকাইল; তারপর তার দুই চক্ষু দুইটী ক্ষীণ ধারা ঢালিয়া ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল।

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

মৃত্যু-বিভীষিকা

মৃত্যুরে কভু চোখোচোখি দেখিয়াছ
চমকি' সভয়ে সহসা কাঁধের কাছে?
দুইটি আঙুলে পরশি' তোমার দেহ
দুটি কথা বলি'—শোনেনি সে আর কেহ—
কি যেন সে ভাষা, অর্থ কিছু না আছে,
ধ্বনি নয় যেন প্রতিধ্বনির মত,
নিমেষের মাঝে করিয়া মূর্চ্ছাহত,—
আঁখি না মেলিতে আঁধারে সে মিশিয়াছে?
অথবা যেন সে পথের প্রান্তে আসি',
এতখন চলি' অচেনা সাথীর প্রায়,
সহসা আপন পরিচয় পরকাশি'
চেয়েছে কভু কি উপহাসি' ইসারায়?
চতুর চাহনি কুটিল হাসিতে ভরা,
যেন সে তোমারি কুশল প্রশ্ন-করা,
ভীষণ নীরবে বারেক বাঁকায়ে গ্রীবা
সমুখে ঝুঁকিয়া চোখ দিয়ে চোখ ধরা—
জিজ্ঞাসে যেন—মধুর ভঙ্গী কিবা!—
'চিনিলে না মোরে, কেমনে ভুলিয়া আছ!'
মৃত্যুরে হেন মুখোমুখি দেখিয়াছ?

কবির কাব্যে 'বঁধু' বলে' তারে ডাকা,
ধর্ম্মের নামে পরিচয় করে থাকা—
সে কথা বলি না, দেখেছ কভু কি তারে
বাহির-দুয়ারে সমুখে একেবারে?
রক্তনয়ন, বিকটবদন, হাসিতে রক্ত ঝরে,
নিশ্বাসে বাক্ হরে!
কণ্ঠে রজ্জু, জিহ্বা বিগলিত, ভীষণ দশনমালা,
শ্মশানের ধূম, চিতা-বহ্নির জ্বালা—

এ সব দেখেছ, আহ্বান শুনেছ ?
ডেকেছে কি নাম ধরে'
সুখ-রজনীর ভোরে ?
আঁধারে তাহার দীপ্ত নয়ন বাঁকায়ে
দেখেছে তোরে ?

জীবনের আশা কিছু পূরে নাই,
মেটে নি প্রাণের কোনো কামনাই,
স্বজন-সখারা দূরে,
নির্ব্বান্ধব পুরে
হঠাৎ ধরিয়া কেশেতে তোমার
টানিয়াছে বার বার ?
জীবন-চক্র হয় নাই ঘোরা,
খোলা হয় নাই একটিও ডোরা
মায়ার মদিরা-মোহে,
অতি চঞ্চল ছুটিতেছে স্রোত হৃদয়-ধমনী-লোহে ;
আদি ও অন্ত কিছু নাহি বুঝি,
চলিয়াছি পথে অতি সোজাসুজি,
শ্যেনসম হেন কালে,
পাখা-ঝটপট রক্ত-নখরে
তুলে' নিয়ে যাবে আপন বিবরে,
আঁধার গহ্বরে তার ;
আমি জেগে রব, সকল চেতনা
রহিবে, সহিব সকল বেদনা,
এত ভালবাসা, এত চেনা-শোনা,
সকলি স্বপনসার !

ঘাতকের অসি ঝলসিছে দিনরাতি,
আঁধার কারায় কঠিন শয়ন পাতি'
মরণের সাথে সন্ধি করিতে চায়,
গণিতেছে দিন ভীষণ প্রতীক্ষায়—
বন্দীজনের জীবন-শেষের মত
মরণ-লগ্ন নিকট হইছে যত,
জীবন-চেতনা ততই বাড়িছে হায়!

অথবা যক্ষ্মা-রোগীর মতন
যেজন পেয়েছে মরণ-নিমন্ত্রণ !
বিষকটু সেই মরণ-পাত্র
লয়ে বসে' আছে দিবস-রাত্র,
সারাপ্রাণ শিহরায়,
চমকিতে চমকায় !
দর-দর-ধারা নয়নের জল
মিশিছে তাহাতে শুধু অবিরল
নিদারুণ বেদনায় !
জীবনের আলো কত মধুময়
নিবিবে এখনি নাহি সংশয়,—
পাণ্ডুর মুখ, শুষ্ক অধর,
দিন দিন ক্ষীণ কণ্ঠের স্বর,
মৃদু উত্তাপে তনু জর-জর
নিশ্বাসে ব্যথা লাগে ;
আকুল নয়নে সবারে সে চায়,
এতলোক সব হাসিয়া বেড়ায়,
কাতর কণ্ঠে সব দেবতায়
জীবন-ভিক্ষা মাগে।
নাহি কোনো পথ, নাহিক উপায়,
মরণ টানিছে ধরিয়া দু'পায়,
জীবন তাহারে করেছে বিদায়
বহু বহু দিন আগে।
ক্রমে দেহ হয় অস্থি'র মালা,
স্ফীত নাসিকায় অগ্নির জ্বালা,
ওষ্ঠ কালিমাময় !
ললাটে শিশির ঘর্ম্ম-বিন্দু,
চক্ষুর জ্যোতিঃ প্রভাত-ইন্দু,
যেন পৃথিবীর নয় !

যেন সে ঢুকেছে সমাধি-গহ্বরে,
অতিদূর কোন পাতাল-বিবরে
স্তব্ধ বিজনালয়!
সেথা হ'তে দুই গবাক্ষ খুলে',
চাহিয়া দেখিছে গেছে কিনা ভুলে'
মানবের মেলা মানবের খেলা,
—কি যেন সে বিস্ময়!

দেখেছ কি হেন মৃত্যুর বিভীষিকা
ক্ষণেক টুটিয়া জীবনের মরীচিকা—
নিবিয়াছে দীপশিখা
হঠাৎ প্রমোদরাতে?
বল দেখি সে কি ভীষণ আঁধার!
রুদ্ধ নিশাসে সে কি হাহাকার!
আছে কি তাহার কোনো প্রতিকার—
আছে মানবের হাতে?
ধর্ম্মের ধ্বজা রেখে দাও দূরে,
মন্ত্রে তন্ত্রে প্রাণ নাহি পূরে,
আমি চাই এই জীবনেরে জুড়ে'
বুকে করি ল'ব সব,
জীবনের হাসি জীবনের কলরব।
জীবনের শোক জীবনের দুখ
জীবনের আশা জীবনের সুখ
পরাণ আমার চির-উৎসুক
লইতে পাত্র ভরি';
উচ্ছল-ফেন-মদিরার মত
কাণায় কাণায় বুদ্বুদ শত
অধরে তুলিব ধরি'—
ধরণীর রস জীবনের রস যত।

শিরা-উপশিরা স্নায়ুতে স্নায়ুতে,
কীচকরন্ধ্র যেমন বায়ুতে—
ভরিয়া লইব জগতের শ্বাস
সুখ-দুঃখের বিলাস-বাঁশরী-তানে,
সুর দিব আমি হাস্য-অশ্রু-গানে,
ফুটাব ঝরাব ফুল-পল্লব বারমাস।
নিশীথ-আকাশে তারকার রাজি
ভরি' দিবে মোর স্বপনের সাজি
নীরব আঁধার রাতে;
ঈশানের কোণে মেঘ হবে জমা,
ধরণী হইবে অতি মনোরমা,
দিগঙ্গনারা পিঙ্গল হাসে,
শাখা তুলি' তরু নাচে উল্লাসে
বজ্র-বঞ্ঝাবাতে,
তাণ্ডবে মাতি' জাগিব বিপদ-রাতে।

তার পর যবে কবে—
দুখে দুখ নাহি রবে,
সুখ সেও আর নাহিক ছলিবে,
জীবন-ক্লান্ত চরণ টলিবে,
বাহুযুগ ক্ষীণ হবে,
ঝিরি-ঝিরি নিশাবায়
ফুল যথা মুরছায়,
তেমনি মুদিব আঁখি
ধরণীতে মাথা রাখি';
আমার 'আমি'টা একেবারে শেষ হোক্,
করিব না কোনো শোক,
মৃত্যুর পরে চাহিব না কোনো
সুন্দর পরলোক।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

ভারতবাসীর উপনিবেশ

ভারতের বাহিরে বর্ম্মা, চীন প্রভৃতি প্রদেশান্তর্গত, উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানের নামের সহিত উত্তর ভারতের প্রাচীন নামের ঐক্য আছে। এইরূপ ইহার দক্ষিণাঞ্চল ও মলয় উপদ্বীপের নামের সহিত দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন নামের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতান্তর্গত ও ভারত-বহির্ভূত স্থানের নামে এরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য কেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে দুইদল অধিবাসী উত্তর ও দক্ষিণ ভারত হইতে ভারতের বাহিরে চীন প্রদেশ পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। একদল ভারতের উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া স্থল-পথে মণিপুর ও বর্ম্মার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল; ইহারা উত্তরাঞ্চলে টন্‌কিন্ উপসাগর ও চৈনিক সীমাপর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। আর এক দল দক্ষিণদিক্ হইতে আসিয়া জলপথে সমুদ্র দিয়া ভারত বহিঃস্থ বর্ম্মা ও চীন প্রদেশে উপনীত হইয়াছিল। মলয় উপদ্বীপ, শ্যাম, কম্বোজ ও আসামের দক্ষিণাঞ্চল পর্য্যন্ত ইহাদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে, উত্তর-ভারতের অনুগ্রহেই ভারতের বহিঃস্থিত প্রদেশের উত্তরাংশে সভ্যতার আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার দক্ষিণাঞ্চলের এবং মলয় উপদ্বীপপুঞ্জের প্রথম সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধি করোমাণ্ডাল ও মালাবার উপকূল হইতে সমাগত ঔপনিবেশিকগণের সাহায্যেই সংসাধিত হইয়াছিল। এই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া ভারত-বহিঃস্থিত এই সমস্ত প্রদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে বহু অপরিজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য অনায়াসেই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে।

উল্লিখিত প্রদেশের উত্তরাঞ্চলেরই কথা ধরা যাউক। ভারতীয় অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ যে খৃষ্ট-জন্মের তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে উপনিবেশ করিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। উত্তর বর্ম্মা (Upper Burma), শ্যাম, লাওস (Laos) য়ুনান, টন্‌কিন্ এমন কি দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনের অধিকাংশ স্থানে ইহাদের রাজ্যস্থাপনের ও রাজ্যকালের শিলালিপি, প্রশস্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই রাজগণ যে—উত্তর ভারতের শক্তিশালী ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা তাঁহাদের ক্ষোদিত লিপি হইতেই প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মপুত্র ও মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া টন্‌কিন্ উপসাগর পর্য্যন্ত এই সমস্ত ক্ষত্রিয় ধুরন্ধর-শাসিত ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। এই ক্ষত্রিয়বীরগণ রাজকীয় প্রশস্তি, লিপি প্রভৃতিতে সংস্কৃত বা পালি ভাষা ব্যবহার করিতেন; ভারতীয় স্থাপত্য রীত্যনুসারে মন্দির ও স্তম্ভাদি নির্ম্মাণ করিতেন; অভিষেক, বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করিতেন।

ভারত হইতে, সমাগত রাজন্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এইরূপ রাজ্যের মধ্যে বর্ম্মার অন্তবর্ত্তী তগঙ্ রাজ্য, উত্তর পগান্ (Upper Pugan) প্রোম, সেনউই (Senwi Theinni)

রাজ্যের নাম করা যাইতে পারে। লাউ প্রদেশান্তর্গত রাজ্যের মধ্যে Muang Hang, C'hieng 'Rung, Mnang Khwan ও দশার্ণের (Luang P'hrah Bang) নাম উল্লেখযোগ্য। অগ্রনগর (Hanoi) ও চম্পা টন্ কিন্ ও আসামের অন্তর্গত রাজ্য চৈনিক ঐতিহাসিকগণ য়ুনান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মগধরাজ শ্রীধর্ম্মাশোকের পঞ্চম পুত্র শুক্র * ধাম্ররাজ-বংশীয় Jen-kwo খৃঃ পূঃ ১২২ অব্দে Tali হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব্ববর্ত্তী P'eh-ngai নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। ইনি অত্যল্পকাল পরে চীন সম্রাটের নিকট হইতে সমগ্র Tien (Yunan) প্রদেশ শাসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (E. H. Parker, in Chinese Rocorder, Vol XXV P 104)

'মহারাজবংশ নামক বর্ম্মার রাজবংশ-বিবরণে লিখিত আছে যে, শাক্যবংশীয় রাজা ধজরাজ (ধ্বজরাজ) অনূন ৫৫০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে মণিপুরে আসিয়া বাস করেন। তিনি পরে তগঙ্ (Tagaung = প্রাচীন বা Upper Pagn) জয় করেন। †

বর্ম্মা-বাসীদিগের ইতিকথানুসারে শেনবো দক্ষিণাঞ্চল হইতে কিয়দ্দূরে ইরাবতী নদীর তীরে তগঙ্ বা হস্তিনাপুর নামক প্রাচীন ক্ষত্রিয়-রাজ্য ৯২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ৫২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ভূকাম [Old Pagan, Bhukam বা Bukam] ‡ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া তগঙ্ বা হস্তিনাপুর রাজ্যের সমস্ত গৌরব নষ্ট হইয়া যায়। চীন ভূমির অন্তবর্ত্তী 'গন্ধার-রট্‌ঠ' অর্থাৎ য়ুনান নামক প্রাচ্য প্রদেশ হইতে সমাগত জাতির আক্রমণে তগঙ্ রাজ্য খৃষ্টপূর্ব্ব শতকের ৫৫০ অব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। § ভূকাম ও অরিমর্দ্দন-পুর এইরূপে পরে চীনরট্‌ঠবাসিগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তাহা না হইলে ৪৮৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে 'প্রোম' বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বর্ম্মার রাজধানী পরিবর্ত্তনের কোন কারণই দেখা যায় না। বর্ম্মাবাসীদিগের ইতিকথায় তগঙ্ বা হস্তিনাপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা নিতান্তই অতিরঞ্জিত, কেননা 'তগঙ্' ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হস্তিনা-পুর প্রতিষ্ঠার যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ৮২ গুপ্তাব্দ (৩০০ খৃষ্টাব্দ) অঙ্কিত

* অধিকন্তু China Review (vol xx. p. 394) একটী প্রাচীনতম প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"the oldest Kaditions connect the Ai-Lao State of Yung Ch'ang with Meng Chia ch'wo, Son of Asoka"

অশোকপুত্রের এই নামটী Cantonese রীত্যনুসারে Mung ka ts'uk রূপে উচ্চারিত হয়। Parker সাহেব এই সমুদায় অক্ষর আলোচনা করিয়া বলেন যে, এই অক্ষরগুলি, মগধ শব্দ এবং Ai Lao বংশীয় রাজগণের ভারতীয় ব্যুৎপত্তি সূচিত করিয়া দিতেছে। (জেরিনির লিখিত টীকা হইতে এই অংশটী এবং অন্যান্য কয়েকটী মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছি।)

† শেনবো সম্বন্ধে চীনমহাকোষ "তু-শু-চি-চেঙ্ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন"। Hervey's "Ma Tuan lin," part II, pp 230, 231 দেখ্‌টি দ্রষ্টব্য।

‡ ইহার প্রচীন নাম অরিমর্দ্দনপুর।

§ Burmese inscription of the Po U Daung pagoda, AD 1774.

আছে। তবে তাহাদিগের ইতিকথায় তগঙ্ সম্বন্ধীয় যে ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

যাহা হউক, উল্লিখিত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নূতন হস্তিনাপুর-প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রবংশাবতংস গোপালের বংশোদ্ভূত রাজা জয়পালের ১৮০ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৪২৬ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষে গঙ্গাতীরবর্ত্তী হস্তিনাপুরের গোপাল তাঁহার পূর্ব্বতন নিবাস-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশে আগমন করেন। তিনি ব্রহ্মদেশের অর্দ্ধসভ্য অধিবাসীদিগের সহিত বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া ইরাবতী নদীর তীরে নূতন 'হস্তিনাপুর' প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শিলালিপিতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, হস্তিনাপুর 'ব্রহ্মদেশে' এরাবতী নদীরতীরে অবস্থিত। *

এই শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ভারতবর্ষের হস্তিনাপুরস্থ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় 'গোপাল' ৩০০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে নূতন 'হস্তিনাপুর' প্রতিষ্ঠিত করেন। এক্ষণে এই ব্রহ্মদেশ কোথায় তাহাই বিচার করিতে হইবে।

বাঙ্গালী লেখকদিগের হাতে বর্ম্মাদেশ ব্রহ্মদেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'ব্রহ্মদেশ ও বর্ম্মা যে একদেশ নয় তাহা প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দেখিতে পাওয়া যায়, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত তগঙ্ প্রদেশ ও তৎপশ্চিমভাগ 'ব্রহ্মদেশ' নামে সমাখ্যাত হইত। সমগ্র বর্ম্মা রাজ্য বুঝাইতে কোনও সময়ে ব্রহ্মদেশ শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মদেশ ও চৈনিক বিবরণের পো-লো-মেন (Po-lo-men ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ) অভিন্ন। কারণ ৮০২ খৃষ্টাব্দের চৈনিক বিবরণেই লিখিত আছে যে, পিঔ (P'iau) বা নিম্ন বর্ম্মার সীমান্তে পো-লো-মেন বা ব্রহ্মদেশ অর্থাৎ তগঙ্ অবস্থিত।

পূর্ব্বে বর্ম্মার পশ্চিমে দুইটী পো-লো-মেন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। সেই দুইটীর একটীর নাম (১) ত-সিন পো-লো-মেন। এবং অপরটীর নাম (২) সি-আও পো-লো-মেন।

(১) চীন ভৌগোলিক কিয়তনের (Kia Ton) বিবরণ ৭৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮০৫ খৃঃ মধ্যে লিখিত হয়। ইহাতে লিখিত আছে যে, ত-সিন পো-লো মেন, মিনো নদী (মনকথে বা মণিপুর নদী) হইতে ১০০০ লি পশ্চিমে, এবং কামরূপ অর্থাৎ আসাম হইতে ৩০০ লি দূরে অবস্থিত। কামরূপ ও এই পো-লো-মেনের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণীর ব্যবধান। এই বিবরণ অনুসারে শ্রীহট্ট ও পো-লো-মেন অভিন্ন হইতেছে। † সি আও পোলোমেন—চীনাভাষায় সি আও শব্দের অর্থ—ছোট। 'মন-শু'র (৮৬০ খৃঃ) ‡ মতানুসারে এই রাজ্যের মধ্যে মি-নো (অর্থাৎ মণিপুর নদী) নদী উৎপন্ন হইয়াছে।

* 'Upper Burma Gazetteer" parti vol II, p 193.

† Bulletin Ecole France, tom IV. p 371.

‡ Ecole France, tom IV, pp 171, 172, 180.

এইস্থান হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া এই নদী 'তু-মি-চিঅ-সু'তে আসিয়া পড়িয়া দুইটী শাখাদ্বারা ইহাকে বেষ্টন করিয়াছে। সুতরাং ভৌগোলিক সংস্থান বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, ইহা মণিপুরকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

এখন আমরা দেখিতেছি পো-লো-মেন বা ব্রহ্মদেশ বলিলে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তগঙ্, মণিপুর ও শ্রীহট্ট এই তিন দেশেই বুঝাইত। প্রত্যুত: 'ব্রহ্মদেশের' সীমা পূর্ব্বকালে পশ্চিমে তগঙ্ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে মণিপুর ও শ্রীহট্ট ব্রহ্মদেশের বিশেষ অংশরূপে আখ্যাত হইত। গোপাল ব্রহ্মদেশে আসিয়া যখন হস্তিনাপুর সংস্থাপন করেন তখন তিনি ইরাবতী নদীর উপর তাহা স্থাপিত করেন—।

তগঙ্—ইরাবতী নদীর উপর, অধিকন্তু এখানে যখন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যখন হস্তিনাপুর-প্রতিষ্ঠার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তখন তগঙ্ ও হস্তিনাপুর অভিন্ন বলা অসঙ্গত নহে।

Dr Fuhrer ও বহু যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। *

৩০০ খৃষ্টাব্দে এইখানেই গোপালে রাজপাট স্থাপিত হয়। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে রাজপাট যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ অরিমর্দ্দনপুরের ৬১০ খৃষ্টাব্দে শিলালিপি। অতঃপর এই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতিগণ আসামে কপিলা নদীর তীরে রাজ্য স্থাপন করেন। তখনও রাজধানীর নাম হস্তিনাপুর ছিল। এখনও ঐ স্থানের নাম হস্তিনাপুর। বর্ত্তমান ত্রিপুরা-রাজগণের প্রাচীন তাম্রশাসন, কাগজপত্র প্রভৃতিতে 'রাজধানী হস্তিনাপুর' লিখিত দেখা যায়। ইহা হইতে স্থির করিতে পারা পারা যায় যে, এই রাজবংশ ও চন্দ্রবংশীয় গোপালের বংশ অভিন্ন। গোপালের প্রতিষ্ঠিত হস্তিনাপুর নষ্ট হইয়া গেলেও তাঁহার বংশের রাজধানী বরাবর 'হস্তিনাপুর' আখ্যায় অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। অধিকন্তু রাজমালার প্রাচীনতম প্রাপ্ত পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে জয়পাল নামক একজন ত্রিপুর-নরেশ ছিলেন। রাজমালা অনুসারে ইনি ত্রিপুর হইতে ৭ম নরপতি। এই জয়পাল ও ১০৮ গুপ্তাব্দের জয়পাল অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। †

রাজমালা মতে, এই জয়পালের পুত্রের নাম 'সোমাঙ্গ'। সোমাঙ্গ ও জৈনিক বিবরণের "ইউ আই" যে অভিন্ন তাহা আমরা অন্যত্র সপ্রমাণ করিয়াছি। সোমাঙ্গ রাজনৈতিক কারণে বাধ্য হইয়া তগঙ্ বা হস্তিনাপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসামের অন্তর্গত বর্ত্তমান নওগঙ্ জিলার মধ্যবর্ত্তী কপিলি নদীর তীরে হস্তিনাপুরে

* Dr Fuhrer's Archæological Reports for the year 1894.

† পরবর্ত্তী পুথিতে লিপিকরের হস্তে ইনি রত্নাজয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহার পর হইতে "বিমারের" পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কতকগুলি নাম অধিকাংশ পুঁথিতেই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। Long সাহেব ও কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রভৃথ লেখকগণ ঐগুলিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

রাজধানী স্থাপন করেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন ব্রহ্মদেশের সীমা মণিপুর ও শ্রীহট্ট রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিতে হইলে শ্রীহট্টের সীমায় আসিয়া পড়িতে হয়। এই স্থানই রাজমালার উল্লিখিত কপিলি নদীর তীর-সমন্বিত "ত্রিবেগ"। ইহাকেই চৈনিক লেখক "Ka-pi-li" রাজ্য নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ৪২৬ খৃষ্টাব্দে যখন জয়পাল তগঙে অবস্থান করিয়া শিলালিপি প্রচার করেন এবং ইহার দুই বৎসর পরে ৪২৮ খৃষ্টাব্দে যখন রাজা "সোমাঙ্গ" কপিলি রাজ্য হইতে চীনদেশে দূত প্রেরণ করেন, তখন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তের স্থিরীকরণ আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি :—

জয়পাল সম্ভবতঃ ৪২৬ হইতে ৪২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দেহত্যাগ করেন; তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে রাজ্য লইয়া বিবাদ ঘটিয়া থাকিবে। কোন পুত্র তগঙেই বাস করিতে থাকেন। ৪২৬ হইতে ৪২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সোমাঙ্গ তগঙ্ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক কপিলি রাজ্য বা ত্রিবেগ নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। ১০ কপিলি নদীর তীরে রাজধানী হস্তিনাপুর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; কেননা, ত্রৈপুর রাজ বিবরণে সকল সময়েই রাজধানী হস্তিনাপুরের উল্লেখ আছে। কালে হস্তিনাপুরের নাম লোকে বিস্মৃত হইলেও, পরবর্ত্তী সকল রাজার অনুশাসনাদিতে রাজধানী হস্তিনাপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুর মহারাজ কল্যাণমাণিক্য ও গোবিন্দ মাণিক্যের তাম্রশাসনে রাজধানী হস্তিনাপুর ক্ষোদিত আছে। বর্ত্তমান কালে ত্রিপুর-নরেশদিগের সনদ প্রভৃতিতেও রাজধানী হস্তিনাপুরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। পরে আলোচিত হইবে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

মার্জ্জনা

[উপন্যাস]

১

ডাক্তার স্যর্ রেবতীমোহন ধর এম-এ, এম-ডি, পি-এইচ-ডি, এফ আর এস, ইত্যাদিকে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কে না চেনে? মানুষের ভাগ্যে বিদ্যা-বুদ্ধি, যশ-মান, খ্যাতি-গৌরব, যা-কিছু সম্ভব কি তার নেই? গরীবের ঘরে জন্মে মানুষ জীবনে কত উঁচুতে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্ত দিতে হলে বাংলা দেশের লোক আজ-কাল ডাক্তার ধরের কথাই বলে থাকে। পাঠশালার নিম্নতম শ্রেণীর ছাত্র থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বড় কর্ত্তা পর্য্যন্ত যার খ্যাতি সুবিস্তৃত, আমিই যে সেই ক্ষণজন্মা পুরুষ, এ কথা শুনলেই তোমাদের চোখগুলো যে বিস্ফারিত হয়ে

উঠবে, তা' আমি ভালো করেই জানি। তোমরা মনে করবে, এই যে আকাশ-বিহারী মহা-পুরুষটি, সে কোন্ প্রয়োজনে আজ সামান্য নরলোকে নেমে এসে আত্ম-পরিচয় দিতে বসে গেছে! সেই কথাই বল্‌ব।

আত্ম-পরিচয় জিনিষটার ভিতর দেখি অনেকখানি অহঙ্কার থাকে; কিন্তু কোন্ দেশের কোন্ বড় লোকটি এ থেকে নিজেকে সংযত রেখে গেছেন? তা' যে রাখা যায় না! আমি যে কি, কোন্ সত্য আমার ভিতর আজীবন লীলা করে' গেল, তা আমি যদি না বলি ত তার মোটে প্রকাশই যে হলো না! এই মস্ত জিনিষটা থেকে জগৎকে কেন বঞ্চিত করব

খুব কম হলেও দশ-বারোখানা বই আমার জীবন-চরিত-হিসাবে লেখা হয়ে গেছে; তার অনেক কথা আমি নিজে না লিখে দিলেও বলে দিয়েছি। সেটা কিন্তু নিজেকে বড় করে তোল্‌বার জন্যে নয়, ঐ লোকগুলোর হাত থেকে নিষ্কৃতি-লাভের জন্যে। আজ এই বুড়ো বয়সে যে কলম ধরেচি কেন, তা ঠিক করে হয় ত বুঝিয়ে উঠতে পারবো না। তবুও একটু চেষ্টা করি।

মানুষ এক জীবনে নিজে বেঁচে থেকেই সুখী; কিন্তু পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে যখন বংশ-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে সে অমর হতে চায়, তখন তার কাছে নিজের বাঁচার চেয়ে পরের বাঁচাটাই বড় হয়; সত্যও ঠিক এক থেকে অন্যে সম্প্রসারিত হয়ে যেতে চায়; তাকে যখন মানুষ নিজের জীবনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না, তখনই প্রচারের পালা সুরু হয়ে যায়। এই চেষ্টা যে কি শক্তি নিয়ে সময়ে সময়ে জাগে! আগ্নেয় গিরির উৎপাতের মত সে দিকে দিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়। তখন লাভ-ক্ষতি ভালো-মন্দর বিচার থাকে না। সে শক্তিকে কে রোধ করে দেবে?

জীবনে চিরদিন লেখাপড়া করেছি—আর ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিয়েছি;—আজও সে কাজের শেষ হয় নি! ঐ লেখা জিনিষটাই আমার আসে না।

আমার বইগুলো? সে ত সবই আমার বক্তৃতা ধরা, কোনটাই আমার লেখা নয়। তাই ভাব্‌ছি, আজ এই নতুন কাজে কেন মরতে হাত দিলুম। যা ভাবি তা বেশ বলে যেতে পারি কিন্তু লিখতে বসে দেখ্‌চি, আরম্ভের সঙ্গে শেষের মিল রাখা কম শক্ত নয়—তবুও লিখতেই হবে। মানুষকে ভূতেই পায় জানতুম;—আজকে দেখচি, লেখাতেও পেয়ে বসে!

ডাক্তার ধরকে তোমরা অযথা কৃপণ বল। কৃপণ কে? টাকা যার থেকেও নেই—অর্থাৎ টাকা খরচ করবার কলিজা যার নেই,—সেই কৃপণ। আমার টাকার অভাব কি! বইগুলোর আয়? ঠিক কথা। বছরে বে-ওজর ষাট-বাষট্টি হাজার হবে; কিন্তু ওতে ত আমার কোন দাবী নেই! বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠার মূলে যে ঐ টাকা! দেশের কাজে দেশের টাকা খরচ হচ্চে। আমার সাত'শ টাকা মাইনে—তার সাড়ে তিনশ যায় মাসান্তে বিলেতে। ছেলেটি এত বছর ধরে কি যে মাথা-মুণ্ডু কচ্চে সেখানে, সে-ই জানে। তার পর আজ এ আস্‌চে,—বই কেনবার টাকা চাই! কাল সে এসে বল্‌চে,

কলেজে ভর্ত্তি হবার টাকা নেই। তোমরা জান না, কত অভাব দেশের। আমার তালি-দেওয়া কোট দেখে তোমরা যে হাসো, তা কি আমি জানি না? সেদিন রায় বল্‌ছিলেন, "ধর, এই কোট পরেই কি তোমার অন্নপ্রাশন হয়েছিল?" আমি হাস্‌লুম, মনে মনে বল্‌লুম—আমার অন্নপ্রাশন হয়েছিল কি না সন্দেহ!

চল্লিশ বছরের কথা! মনে হচ্চে যেন ঠিক সেদিন! দেশের যা-কিছু লেখা-পড়া সেরে ফেলে কি করব, তাই ভাবচি। হঠাৎ দেখা হলো প্রিন্‌সিপ্যাল সাহেবের সঙ্গে ইডন্ গার্‌ডেনে। তিনি বল্লেন, "অনেক দূর থেকে তোমায় চিনেছি ধর, তোমায় লক্ষ লোকের মাঝে থেকে আমি চিনে নিতে পারি।" আমি অপ্রভিত হয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লুম। ক্লাসে প্রায়ই তিনি আমাকে ঐ কথা বল্‌তেন। চেহারাটা মোটেই সুবিধার নয়, বলে, হয় ত!

"কি করছ আজ-কাল?"

"বিশেষ কিছু না।"

"বিলেত চলে যাও।"

"পয়সা নেই, স্যর্!"

"আরে, তোমার মত ছেলের আবার পয়সার অভাব! একটা দাঁও বুঝে বিয়ে করে ফেল না কেন?"

মাথা হেঁট করে রইলুম।

"আচ্ছা, কাল আমার সঙ্গে আপিসে দেখা করো।"

"যে আজ্ঞে।"

"নিশ্চয়, কালই। দেরী করো না।"

তার পর দিন কলেজে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়াতেই চেয়ার দেখিয়ে তিনি বল্‌লেন, "বসো, একটু দেরী হবে।"

কয়েকটা ফর্ম্মে দস্তখত করে ঠিকানা রেখে মেসে ফিরে এলুম। দিন কুড়িকের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল, স্কলার্শিপ নিয়ে ধর বিলেত যাচ্ছে।

হলোও তাই।

বেশ দেশ বিলেত। কাজই দেশটার ধর্ম্ম-অর্থ মোক্ষ-কাম। শোভা-সম্পদ, সাজ-গোজ সব আছে; কিন্তু সেগুলো সব উপরের জিনিষ; সকলের নীচে খর-স্রোতে কর্ম্মের প্রবাহ বইচে। সেইটেই দেশের কষ্টিপাথর। বাস্তবিক মানুষকে যাচাই করে নেবার এমন সহজ রাস্তা আর নেই। সেখানকার বেড়া ডিঙ্গিয়ে গেলুম প্যারিতে। শুন্‌লুম, ফ্রান্স বিজ্ঞানের কর্ম্মভূমি না হলেও নর্ম্মস্থল। এটা একটা প্রকাণ্ড বাবুদেশ। এরা সব জিনিষের সৌখীন-তত্ত্বটুকু ছেঁকে বার করে। সেখান থেকে গেলুম জর্ম্মানিতে। বিজ্ঞানচর্চ্চা এ-দেশে কঠোর ভাবে হয়। জর্ম্মানির কাজ-কর্ম্ম খাওয়া-দাওয়া সব মোটা-মুটি, কিন্তু ভাবনা-চিন্তাগুলি ভারী উঁচু দরের।

বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি-পত্রে জান্‌তে পারলুম যে আমি বিদ্যাতে দিগ্‌গজ হচ্চি। একবার আমেরিকাটা ঘুরে আস্‌বারো ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ডাকের উপর এমন ডাক পড়তে লাগল যে দেশেই ফিরে আসতে হলো।

হাওড়া ষ্টেশনে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত। গলায় মালা দিলেন, কপালে চন্দন দিলেন, মাথায় ধান-দূর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন,—"যা শিখে এলি, তাই

দেশে প্রচার কর্। ভগবানের ইচ্ছায় তোর পরমায়ু দীর্ঘ হোক।"

পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে চোখের জলে তাঁর তালতলার চটি ভিজে গেল। তিনি বুকে করে আমায় তুলে নিয়ে মোটা খস্‌খসে চাদর দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলেন। সে স্পর্শ যেন আজও দেহে লেগে আছে!

মহাজনের দালালের মত স্কলার্শিপের ফাঁদ আমাকে আগে থেকেই চাক্‌রির বাঁধনে বেঁধে রেখেছিল। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে দাসত্বের মালা গলায় পরে নিলুম। চোখ-বাঁধা ঘানির বলদের মত সেই একই পথে ঘুরচি আর ঘুরচি!

শিক্ষকতার কাজ যেদিন আরম্ভ করে-ছিলুম, কি উৎসাহ জীবনে ছিল সেদিন। মনে আছে, জন-দশেকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে যখন আরম্ভ করলুম অধ্যাপনা, তখন মনে হলো, পদ্মফুলগুলি জ্ঞানালোকের একাগ্র আবেগে উন্মুখ হয়ে রয়েচে, ফুটে ওঠবার জন্য। আমি অজস্র বলে যেতে লাগ্‌লুম—তাদের শ্রান্তি নেই, বিরাম নেই, বিরক্তি নেই! দিনের পর দিন এম্নি করে লঘু প্রসন্ন গতিতে জীবনটা কেটে যেত যদি, আহা! আর আজ? সেই লেক্‌চার চলেচে! জীর্ণ দেহখানা আর বইতে চায় না, তবু ত তাকে ঠুকে-ঠেকে, জোড়া-তাড়া তালি-পচ্চড় মেরে খাড়া করে রেখেচি—নইলে চলে না। সকালে উঠে,—সকালও নেই, ওঠাও নেই, —ওটা অজ্ঞানে বলচি, সকালে উঠে—সন্ধ্যা হবার আগে একটু গরম দুধ খেয়ে নি—তারপর বই হাতড়াচ্ছি—দশটার সময় আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি—বারোটা বাজতে না বাজতে কি ভীষণ কাশি! জো কি আর শুয়ে থাকি?—আলো জ্বেলে ঘরের চারিদিকে পায়চারি—পায়চারি! এমনি করতে করতে রাত চারটে-আন্দাজ দেহ অবসন্ন হয়ে আসে—মনে হয়, মৃত্যু বুঝি তার করাল হাত-খানা সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতে চাচ্চে। ভয় হয় না, কি এক অসম্ভব ভাবনায় আকণ্ঠ যেন শুকিয়ে উঠতে থাকে—ছুটে গিয়ে জল খেয়ে একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়ি৺—পথের উপর ময়লার গাড়ীর শব্দে যেন সমস্ত দেহখানা ভাঙ্গা কাঁসরের মত ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে! এমন সময় সিঁড়িতে খস্‌খস্ শব্দ! বুঝতে পারি, স্ত্রী আস্‌চেন। গণৎকার নই, তবুও ঠিক জানি, কি কথা তিনি বলবেন। আড় চোখে দেখে নি, সেই বিপুল কলেবর, নড়তে-চড়তে কষ্ট হচ্চে। একখানা চেয়ারের উপর বসে তিনি সুরু করে দেন,—

"এখনো ঘুমিয়ে আছ?"

ভিতর থেকে একটা প্রচণ্ড রাগের হল্‌কা যেন বুকটা ফেঁড়ে বার হয়ে আস্‌তে চায়। কষ্টে চেপে, মনটাকে শান্ত করে বলি, "না, সেই বারোটা থেকে জেগেই আছি।"

"বাতিকের ধাত কি না!"

সজারুর গায়ের কাঁটাগুলোর মত মনটা খাড়া হয়ে ওঠে, একটা তীব্র আঘাত দেবার জন্যে! খানিকটা দম বন্ধ করে, দেহের পেশীগুলো শক্ত করে নিয়ে রাগটা সাঁমলাই। ভাবি, এই সেই মেয়েমানুষটি, যার রূপ আমাকে মুগ্ধ করতো, যাকে দেখে আনন্দ হতো—যার গায়ে হাত দিলে সর্ব্বাঙ্গ আমার স্নিগ্ধ হয়ে যেত!

পরিষ্কার মনে পড়ে, সে দিনের কথা!

বিদ্যাসাগর এসে বল্লেন, "বিধবা বিয়ে করতে রাজী আছিস্ রে ?"

"আপত্তি নেই।"

"মেয়েটিকে দেখবি ?"

"বলেন ত যাব।"

"তবে আজ সন্ধ্যার পর আমার ওখানে যাস্—তারপর দু'জনে গিয়ে দেখে আসব।"

সন্ধ্যার পর পারুলকে দেখতে গেলুম। কি সুন্দরই দেখেছিলুম সেদিন তাকে! ছিপ্-ছিপে দেহ, ধপ্‌ধপে রং। কালো চোখদুটো, হাতগুলো গোল-গাল—রূপের সাগরে যৌবন যেন ষোল কলায় পূর্ণ!

বাড়ী ফিরতে ফিরতে তিনি বল্লেন, "কেমন রে, পছন্দ হলো ?"

কি আর বলি!

তিনি বল্লেন, "আমি ও-সবের পক্ষপাতী নই। দেখো, শোনো, আলাপ-পরিচয় কর, তার পর যা-হয় একটা স্থির করো। ছোট্টটি নিয়ে গিয়ে তাকে ঘরের মত তৈরী করে নেওয়া যায়; কিন্তু এর স্বভাব-চরিত্র গড়ে পিটে ঠিক হয়ে গেছে—বিশেষ একটা বদল হবে না, তাই দেখে নেওয়া চাই। বনি-বনাও হবে কি না!"

পারুলের সঙ্গে তারপর কত সন্ধ্যে কাটিয়েচি। সে সেতার বাজাত, গান করত; কঠোর বৈজ্ঞানিকের মনটা কি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় না ভরে উঠত!

ক্রমে আমরা ঘনিষ্ঠ হলুম। বাইরের কি যেন একটা অমানুষী শক্তি আমাদের দু-জনকে ক্রমেই কাছা-কাছি করে দিতে লাগ্‌লো।

একদিন পরিষ্কার করে পারুলকে জিজ্ঞাসা করলুম, "পারুল, আমার চেহারা ত এই, এর জন্যে তোমার বিরাগ হয় না ?"

সে মৃদু হেসে বল্লে, "রূপটা মানুষের ভারী উপরকার জিনিষ, পরিচয়ের আগে কি আরম্ভে তার কিছু প্রভাব থাক্‌তে পারে! কিন্তু সে কেবল যতদিন ভিতরের মানুষটিকে চিন্‌তে পারা যায় না! তোমাকে আমার পৃথিবীর সব পুরুষের চেয়ে সুন্দর বলে মনে হয়।"

মনের বিজয়-ডঙ্কা বেজে উঠ্‌ল। দুজনে এক হয়ে জীবন-যাত্রা সুরু করে দিলুম। জানিনে, কবে কোন্ দিন সেই পারুলকে হারিয়ে ফেলেচি। তাকে আবার তেমনি করে ফিরে পাবার ইচ্ছা হয়। মাঝে মাঝে তার আব্‌ছায়া ছবিটা লীলার মধ্যে দেখ্‌তে পাই—সেদিন আনন্দরসে মন আপ্লুত হয়ে ওঠে;—আরো কিছুদিন বেঁচে থাকবার ইচ্ছা হয় যেন!

বাস্তবিক মেয়েমানুষের সৌন্দর্য্য আছে কি না, সে বিষয়ে আমি নিজেই গভীর সন্দিহান। পুরুষের চোখেই সে এত বেশী সুন্দর! ধর্ম্মের ষাঁড়টার রূপের কাছে কোন্ গরু সুন্দর! পুরুষ হাতী দাঁতাল, তার কাছে হস্তিনীর রূপ লাগে না; চড়ুই বাবুই টুনটুনি ময়ূর, কোকিল ফড়িং—এদের পুরুষ স্ত্রীর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর;—স্বীকার করতেই হবে; এখানে ত পক্ষপাতিত্বের কথা আসে না। যদি এতটা না স্বীকার কর, এ-টুকু নিশ্চয় করবে ত যে তাদের রূপটা ভারী ক্ষণভঙ্গুর? আমার এক কবি বন্ধু একদিন তাঁর লেখা পড়ে শুনোচ্ছিলেন—কাব্যের কথার বালাইগুলো আমার মনে থাকে না—তবে ভাবটা যদি মনে লাগে তাহলে আর কিছুতেই ভুলতে পারিনে। তাঁর ভাবটা এই—ফুলদের যখন কোট্‌বার

কাজ শেষ হয়ে যায়—অর্থাৎ যেউদ্দেশ্যে ফোটা, সেটা সিদ্ধ হয়ে যায়, তখন তাদের পাপ্‌ড়ি-মাপ্‌ড়ি খসে ঝরে গিয়ে ফলটা বেরিয়ে পড়ে। আজ কাল পারুলকে দেখলে আমি ঐ কথাই ভাবি। আচ্ছা সে রূপ চিরদিন কিছু থাকে না, কিন্তু সে প্রসাধনের চেষ্টা তোমার কোথায় গেল! আগে যে রূপের অনেকখানি ছাই-পাঁশ দিয়ে ঢেকে মরতে আর আজ এই কুরূপ যেটা এত প্রকটহয়েপড়েচে, তাকে কি ঢেকে ঢুকে একটু গোপন করতেও ইচ্ছা হয় না!

রূপ-যৌবন না হয় মানুষের চিরদিন থাকে না, তাই বলে যে নিজেকে অমনটা করে তুল্‌বে—তার কি মানে? আর বেহালার মোটা তাঁতটার মত নিত্য-নিয়ত যে একই একঘেয়ে সুরে বাজ্‌বে—তাই বা কেন্? রোজ সেই এক কথা!

"খোকার চিঠি পেলে!"

"না।"

"কাল নিশ্চয়ই আসবে।" এমন কাল কত হাজার বার যে চলে গেল! লজ্জাও করে না? আমি কি ছেলেমানুষটি!

কথার কোন জবাব না পেয়ে—"আর এই ত সেই সে-দিন লিখেচে—রোজ রোজ বাছা লিখবে কত, কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে সমস্ত দিনটা।"

তখন বুঝতে পারি পারু, পাহাড়ের মত বিশাল আর কঠিন হয়ে গেছ কেন তুমি! ফুলের উপর শিশিরের ভরটুকুও সয়না যে! আর এই স্নেহের প্রস্রবণ বইত কোথায়, যদি তুমি অত বিশাল পাহাড়ের মত না হতে!

বলবার আগেই যদি জানা যায় কি বলা হবে, তাহলে শোনবার ধৈর্য্য আর থাকে না! নেহাৎ পরীক্ষা পাশ করবার দায়ে না পড়লে লোকে পড়া-বই আবার ফিরে পড়ে না। বিছানা ছেড়ে বাথরুমে চলে যাই। ফিরে এসে দেখি, গিন্নী নীচে নেমে গেছেন।

দোতলায় হল-ঘর ড্রয়িন্ রুম। সেখেনে সকালের কাজের আগে বাড়ীর সকলে একত্র হয়ে ভগবচ্চিন্তা করি। ছোট্ট একটি অরগ্যান্ আছে। লীলা গান করে। তারপর চা। এ-সব সাহেবিয়ানা আমাদের পরিবারে মজ্জাগত হয়েছে। কার দোষে কি গুণে, তা জানিনে।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচেকার বাইরের ঘরে গিয়ে বসি। লোকজনের সঙ্গে দেখা এই সময়।

প্রকাণ্ড-দাড়ি, লম্বা পইতে, তসরের কাপড় পরা নধর দেহখানি। "কি চাই আপনার?"

"কন্যাদায়,—কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য।"

"কন্যার বিবাহ না দিলেই পারেন।"

"আজ্ঞে, ধর্ম্ম যায়।"

"যাক্ না—যাকে রাখ্‌বার ক্ষমতা নেই, সে যায় যদি সে ত মঙ্গল।"

"আজ্ঞে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই যে একমাত্র সম্বল!"

রাগে সর্ব্বাঙ্গ গিস্‌গিস্ করে ওঠে—"যান্, যান্, ও-সব শোনবার অবসর নেই—আমি অক্ষম, পারব না কিছু দিতে।"

"আজ্ঞে বাঁকুড়ো থেকে আপনার নাম শুনেই যে আস্‌চি। আপনি বড় দাতা।"

অপাত্রে দানের এই ফল। দাতার অর্থ-ভাণ্ডার নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায়; কিন্তু গ্রহণ করবার লোক যে ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌তে থাকে!

ব্রাহ্মণকে বিদায় করতে না করতে একজন যুবক এসে উপস্থিত!

"কি চাও?"

"স্যর আর-সব পেপারে পাশ করেচি—কেবল আপনার পেপারে আর কটা নম্বর পেলেই—"

"অসম্ভব, আমার হাতে যা একবার বার হয়, তার আর বদল হয় না, জানো ত?"

"অবস্থা বড় খারাপ,—আর পড়া চালাতে পারবো না।"

"রোল?"

"৩০৭।"

ড্রয়ার থেকে বার করে উল্টে উল্টে দেখ্‌লুম। "নাঃ—হতে পারে না। তুমি ডাক্তার হয়ে বার হলে কলেজের কলঙ্ক।"

টেবিলের উপর টপ্ টপ্ চোখের জল। কি শস্তা এই জিনিষটা এদের কাছে! সমস্ত বছরটা বাঁদ্‌রামি করে সিগারেট খেয়ে থিয়েটার শুনে কাটাবে ছোঁড়ারা—তারপর এখন এই কান্নাকাটি!

বিষন্ন মুখে ছোক্‌রা ফিরে গেল। বুকের মধ্যে আন্‌চান্ করতে লাগ্‌ল। কি করি? নম্বরটা বাড়িয়ে দিলুম।

"কি চান্ আপনি?"

লোকটি কালো, বেঁটে, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। জরাজীর্ণ কোট-প্যাণ্ট লাল টক্-টকে টাই।

"মিস্ ধরকে গত মাসে সাতদিন মিউজিক্‌ লেস্‌ন্‌স্ দিয়েছিলুম্—তার বিল্।"

দেখলুম, ৩৫ ৲ টাকা।

"খান্‌সামা, মিস্‌বাবাকো—"

"জো হুজুর।"

লীলার প্রবেশ। মিউজিক মাষ্টারকে দেখে তার আর আনন্দের সীমা রইল না।

"হাঁ বাবা, ওটা ওঁকে। মাকে বল্‌তে বলেছিলুম—মা নিশ্চয় বলেচেন, বোধ হয়—আপনার নিশ্চয়ই মনে নেই।"

টাকা দিয়ে তাকে বিদায় করে বল্‌লুম, "দেখ মা পটু যতদিন না ফিরচে, ততদিন আমাদের বুঝে চলতে হবে। দেনায় যে জড়িয়ে পড়্‌চি।"

"ছেলের এডুকেশনই সব? আমরা কি ভেসে এসেচি, বাবা?"

"কেন, তুমি কলেজ যাওয়া কি বন্ধ করেচ?"

"নাঃ—আমার মিউজিকের লেস্‌ন্‌স্ চাইই।"

লীলা ত এমন বেয়াড়া ভাবে আগে কথা কইত না। কেন এমন হলো?

ওদিকে টাওয়ারে ন'টা বাজতেই বাবুর্চ্চি লম্বা সেলাম দিয়ে গেল।

ঠিক দশটার সময় ছোট্ট ব্যাগটি হাতে করে পথের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম, ট্রামের প্রতীক্ষায়। এই এক জায়গায় এক সময়ে লোকে আমাকে চিরদিন দেখে আস্‌চে। বাড়ী থেকে আমার পা বেরুতে দেখ্‌লে লোকে নাকি ঘড়ি মিলিয়ে নেয়!

কলেজে ঢুকতে আমার আলাদা ফটক। দরওয়ান সেলাম করে খুলে দিলে—সটান্ চলে গেলাম ল্যাবোরেটরিতে। রামা আমাকে দেখে ভারী খুসী। হাত থেকে হ্যাট নিয়ে নিলে, কাঁধের ঝাড়ন দিয়ে জুতো ঝেড়ে দিলে।

এই রামা জীবটি অদ্ভুত। এখন বুড়ো হয়েচে। লেখা-পড়া জানে না, কিন্তু আশ্চর্য্য

"তার স্মৃতিশক্তি—আমার সব বইগুলি সে চেনে। মানুষের হাড়ের কিম্ভূত-কিমাকার নামগুলো তার মনে আছে। কবে কোন্ ছেলে স্কুলে ভর্ত্তি হয়েচে, কিসে কত নম্বর পেলে—কোন্ ব্যাচে কে-কে আছে, এ-সব রেজিষ্টারি দেখে করলে হয়ত কাজের ভুল হয়, কিন্তু রামাকে জিজ্ঞাসা করে করলে কোন ভুল হবে না। কোথায় কোন্ জিনিষটি যদি রামা না বল্‌তে পারলে, ত আর তা পাওয়া যাবে না।

এমন প্রভুভক্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ মানুষ জীবনে আমি অল্পই দেখেচি।

তারপর, আমার ডিমনষ্ট্রেটার চুনী বাবু। চুনী বাবুর দেহের এবং মনের কোন অংশ সূক্ষ্ম নয়। কাঁকড়ার মত দেহটি, বাঘের মত চোখ—ভ্রূ দুটো যেমন লোমশ, তেমনি মোটা, মাথাটা থ্যাবড়া। দুনিয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই—নিজের কাজে অসীম ধৈর্য্য আর অধ্যবসায়। আমার বিদ্যা-বুদ্ধির উপর অপরিসীম ভক্তি। যে আমার নিন্দা করে, চুনী তার বাঘ।

কোন্ কোন্ জিনিসের দরকার, চুনী কাগজে নোট করে—বাস, আর ভুল হবার ভয় নেই। এই লোকটির কল্পনার কোন উপদ্রব নেই; যা বলে দেবে, তা ঠিক কলের মত করে যেতে পারে—তাতে ভুল হবে না, ভ্রান্তি হবে না।

নিজের ঘরে গিয়ে বস্‌লুম। চারিদিকে রাশি রাশি বই, সাজানোই রয়েচে—কতদিন খুলিনি। আগে এই ঘরে আস্‌বার জন্যে প্রাণটা আকুলি-বিকুলি করত—আর আজকাল? কিছু না। মানুষ এমনি করেই আস্তে আস্তে পরলোকের পথে চলে যায়, বোধ হয়।

লেক্‌চারের নোটটা বার করলুম। এত জিনিষ বল্‌তে হবে আজ!—মাথার মধ্যে ত আর ধরে রাখ্‌তে পারিনে। কি বলব? বুকটা দু-চার সেকেণ্ড ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠ্‌লো—যেন মনে হলো, সব ভুলে গিয়েছি—একটি বর্ণও মনে নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—আর চাক্‌রি করা চলে না! এ যেন শুধু অর্থের জন্য মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে বসেচি; কিন্তু চাকরি না করলে চলে কি করে? এই বিরাট খরচ কে সাম্‌লাবে? মাসে মাসে বিলেতে টাকা না পাঠালে চলে কৈ?

দু-চারটে বই ওল্‌টালুম, তেষ্টায় ছাতি শুকিয়ে আস্‌চে। আর আধঘণ্টা পরে তিনশ' ছেলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা-খানেক বক্তৃতা করতে হবে; কি বলব তার এক বর্ণও মনে আস্‌চে না। চোখ দিয়ে জল আস্‌বার মত অবস্থা হয়ে পড়ল।

চুনী এসে বলে গেল, প্রিনসিপাল ডেকেচেন।—বলে দিলুম,—বলে দাও লেকচারের পর যাবো। জ্বালাতন করেচে—কি আবার একটা উল্টোপাল্টা ফরমাস করে বস্‌বে হয়ত। উদ্বেগ বেড়ে গেল। আর পোষায় না, দেখ্‌চি। সবই সহ্য করতে হবে সমস্ত জীবনটা এই করচি, আর ক'টা মাস বই ত নয়!

ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল—নোট বগলে করে গ্যালারিতে গিয়ে উপস্থিত হলুম, চুনী প্রায় রোল-কল শেষ করেচে। তিনশ ছেলে হুড়মুড় করে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। তাদের পানে চেয়ে হেসে একটু নড্ করলুম। একটা আনন্দের তরঙ্গ বয়ে গেল তাদের মধ্যে। বুড়োকে এখনো তারা ভালোবাসে। সে কেবল নবীন মনগুলি ভালবাসা-প্রবণ বলেই!

তারপর সুরু হয়ে গেল লেক্‌চার—ভাবনা নেই, চিন্তা নেই—গোমুখী থেকে গঙ্গার ধারা ছুটে চলেচে। ছেলেরা উৎকর্ণ হয়ে শুনে যাচ্চে। যা জীবনে কোনদিন শোনেনি—আজ যেন এই প্রথম তা শুনচে, এমনি আগ্রহের রেখা তাদের কচি মুখগুলিতে পরিষ্কার ফুটে রয়েচে!

মিনিট পনের পরে থেমে একটু জল খেয়ে চুনীর মুখের দিকে তাকাতেই সে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট সুরু করে দিলে। অদূরে সাজানো মানুষের হাড়গুলোর দিকে চেয়ে রইলুম—আর কত দেরী আমার, তোমাদের মত হতে?

হঠাৎ তালি পড়ল—চুনীর মুখে হাসি ফুটেচে; বুঝলুম, চুনী ভাবচে, আমি খুসী হয়েচি।

আবার লেক্‌চার সুরু করে দিলুম। মৌ-চাকের মত ভন্‌ভনানি নিমেষে চুপ হয়ে গেল! বুড়োর ভাঙ্গা ভরাট গলায় ভরে উঠ্‌ল ঘরটা। আমি যেন সে আমি নই—কোন্‌ মন্ত্রের বলে বলে যাচ্ছি—তাতে দ্বিধা নেই, ইতস্তত নেই!—এক অপূর্ব্ব গুঞ্জনে এতগুলি চিত্ত-শতদল বিকচ করার পূত মন্ত্র কোন্‌ ঋষি যেন ঐশ শক্তিতে উচ্চারণ করে চলেছেন! সমস্ত দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌চে—এ আমি নই, আমি নই—আমার ভিতর দিয়ে ভগবানের ইচ্ছা-শক্তি স্বতঃ প্রেরণায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌চে! আমি যন্ত্র,—বাঁশীটি মাত্র, অন্য কার ফুঁয়ের জোরে এ যে বাজচে!

লেক্‌চারের পর অবসন্ন হয়ে পড়লুম। ঠিক যেন মৃত্যুর অবসাদ সমস্ত দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে আস্‌চে। রামা এক পেয়ালা চা আর খানকয়েক বিস্কুট ঠিক করে রেখেচে। সে জানে, এ নইলে আমার কথা কইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত থাকবে না। আস্তে আস্তে চায়ের পেয়ালা শেষ করে বড় সাহেবের ঘরে গেলুম। সেখানে সেই সব মামুলি কথা। আমার যশ-মান, সম্ভ্রম মর্য্যাদা যার কথা তোমরা দেশশুদ্ধ লোক জান—এইখানে এসে সেগুলো নিমেষে ভূমিসাৎ হয়ে যায়! মন্দ নয় এটা! দেহের সমস্ত ক্লেদ যেমন ক্যাষ্টর অয়েলে দূর করে দিয়ে তার পর চিকিৎসক বুঝে নেন, রোগটা কি—এও ঠিক তেমনি। বড় সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এসে উপলব্ধি করা যায়—আমি কি? সাহেব না কি আমাকে বড় বিশ্বাস করেন—আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করেন না। যখন এই কথা শুনি, তখন মনে-মনে হাসি! কতখানি আস্থা আমাদের উপর তাঁদের আছে। কাজের বোঝা বইতে যে আমরা বেশ পারি, তা তাঁরা জানেন—তার অধিক কিছুর যোগ্য যে আমরা হতে পারি, তা' তাঁরা বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাসের সঙ্গে জোর চলে না!

দিনের কাজ শেষ করে প্রাণের মধ্যে একটা টান বুঝতে পারি—সেটা মিনির জন্যে। এই মিনির পরিচয় পরে দেব।

মিনির বাড়ী থেকে ফিরতে ছুটো হয়;—সে আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত প্রায়ই পৌঁছে দেয়। এক একদিন উপরের ঘরে গিয়ে তার জন্যে যে ইজি-চেয়ারটা রাখা আছে, তাতে বসে সে গল্প করে। সেদিন বাড়ীর সকলের মুখ ভার হয়ে যায়। কি দরকার এই অল্প-বয়সা মেয়েটির সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করবার—যে কোনদিন পৃথিবীর পথে সোজা করে পা ফেল্‌লে না? মানুষ

কি সব কাজ দরকারের তাড়াতেই করবে? যেটা বিনা-প্রয়োজনের দাবী, সেটা যে কত মধুর তা ক'জন বোঝে! মানুষের মনের প্রবৃত্তি গুলোকে অযথা বেঁধে ঠেঙ্গানোকে পাঠশালের গুরুমশায় সংযম বলতে পারেন; কিন্তু আমি তাকে সংযম বলতে কোনদিন প্রস্তুত নই। স্বভাবকে তার মনের মত পথে চলতে দাও—দেখ, সে কি চায়, না চায়। তাকে বেঁধে মেরে ফেলায় একটা নিষ্ঠা থাকতে পারে, কিন্তু সেটা খুব ছোট্ট জিনিষ। তাতে মুগ্ধ হয় যারা, তাদের আমি করুণার চক্ষেই দেখে থাকি!

বাড়ী ফিরে দেখি, লীলার বন্ধু-বান্ধবরা এসে আমোদ-প্রমোদ করচে। প্রায় সেগুলি পুরুষ-বন্ধু। তাদের মধ্যে একজন কনষ্টাণ্ট। ইনি নাকি মিস্ ধরের পাণি গ্রহণ করবার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। প্রায়ই রাত্রের আহার শেষ করে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। এঁদের হাসি গান কথাবার্ত্তার উচ্ছ্বাস তেতলা পর্য্যন্ত উৎকীর্ণ হয়ে বৃদ্ধের স্থবির শান্তিকে ক্ষুব্ধ করে তোলে!

টেবিলের একদিকে আমি বসি—কি খাই না খাই জানিনে, ঐ ছোক্‌রাটিকে দেখলে আমার আকণ্ঠ তিত রসে পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমার স্ত্রী আমাকে গঞ্জনা দেন,—"তুমি মোহিতের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কও না!"

"কে মোহিত?"

"খুকীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত ঐ যে ছেলেটি গো।"

"এত শীগগির বিয়ে কেন?"

তিনি রাগ করে চলে যান—আবার ফিরে এসে বলেন,—"ওরা জমিদার, একটা আলাপ-সালাপ করে ঠিক-ঠিকানা করে ফেল্‌লেই হয়।"

"আমায় রেহাই দাও, তুমি ত সব পার, তুমি যা করেচ—কি করবে, তাতে কোন দিন ত আমি অমত করি নি পারু।"

তাঁর মুখ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

দশটা বাজতেই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুম আসে কি না আসে জানিনে—যেমন বারোটা বাজে, মাথা গরম হয়ে ওঠে। দেহ থেকে প্রাণটা বার হয়ে পড়্‌বার যোগাড়—তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে বাইরে যেতে না যেতে সেই ভয়ঙ্কর কাশির ফিট্‌টা এসে পড়ে—জীর্ণ দেহটাকে ঝাঁকুনির উপর ঝাঁকুনি দিয়ে যেন পরখ করে নিতে থাকে,—আর ক'দিন?

আমি তখন মনে করতে থাকি, দিন নয়, ঘণ্টা। তার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুক্ত আকাশের দিকে চাই—সেই সব চির-পরিচিত নক্ষত্র-নিচয়; কেউ স্থির, কেউ বা কম্পিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে!

তার পর পায়চারি—পায়চারি—রোজই এক কাজ! কবে তুমি আস্‌বে হে একা-সখা, হে প্রিয়তম—কতদিন বসে থাক্‌ব তোমার প্রতীক্ষায় এমনি করে! এই জীর্ণ তরীতে আর যে পাড়ি দিয়ে উঠ্‌তে পারচিনে নাথ!

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আদর্শ সৌন্দর্য্য

আজ আমরা এমন গুটিকতক কথা বলিতে চাই,—যা অত্যন্ত হাল্‌কা এবং নিতান্ত পল্‌কা! আমরা হইতেছি প্রথম শ্রেণীর গম্ভীর জাতি, কাজেই "তাম্রশাসন" প্রভৃতির সাহায্য না লইলে, আমাদের পাঠকদের বিদ্রোহিতাকে শাসন করা যায় না। অতএব এই লেখাটিকে কেউ যে "ভারতীর প্রবন্ধগৌরব" বলিয়া মনে করিবেন, সে দুরাশা আমরা মোটেই রাখি না। তবে এই খোলাখুলি হাল্‌কা কথায় যদি কোন বাচালতা প্রকাশ পায়, আশা করি আপনাদের অতুল গাম্ভীর্য্যকে তাহা ভূমিসাৎ করিতে পারিবে না!

রূপ, রূপ, রূপ! দুনিয়াটা রূপ রূপ করিয়াই পাগল হইল! সমুদ্র-মন্থনের মোহিনী, বাল্মীকির সীতা, হোমারের হেলেন, মিসরের ক্লিওপেট্রা—এ-সব ত পুরানো যুগের জানাশোনা কথা। কিন্তু এই নূতন যুগেও, শত শত বৎসরের রূপচর্চ্চার পরেও, রূপের সাধনায় কাহারোই অরুচি ধরিয়া যায় নাই। রূপের পদতলে দাসখৎ লিখিয়া দিতে এখনো আমরা কেহই অপ্রস্তুত নই।

নিখুঁত রূপের কদর করে সবাই,—কিন্তু নিখুঁত রূপ কি পৃথিবীতে আছে? কবিদের কথায় বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, আছে। এবং প্রথম প্রেমিক বা প্রেমিকাও যে কবিদের কথায় সায় দিবেন, সে-বিষয়ে আমরা দৃঢ়নিশ্চিন্ত।

কবিদের অধিকাংশ বর্ণনা কাব্যেই শুনিতে মিষ্ট, কল্পনাতেই দেখিতে চমৎকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে কবির মতানুযায়ী রমণী-রূপের উপাদান-গুলির উল্লেখ করিব।
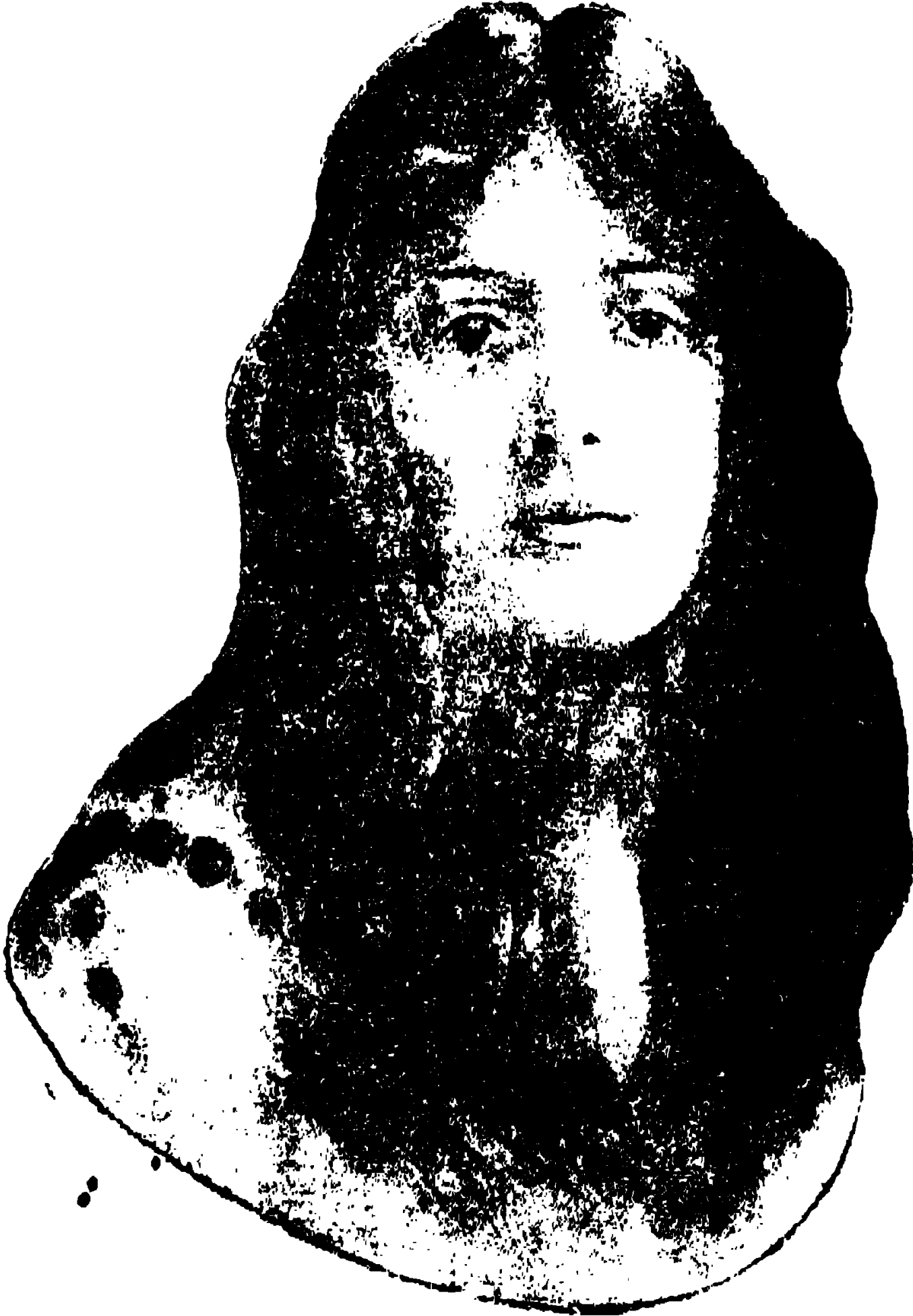
বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস গ্লাডিস কুপার   ইনি বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ সুন্দরী।

দুই সুন্দরীর দু-রকম হাসি।

পূর্ণচন্দ্রের বর্ত্তুলতা, সর্পের বক্রতা, লতার কৃশতা, গোলাপ-কোরকের পেলবতা, পালকের লঘুতা, মৃগ-নেত্রের মৃদুতা, নৃত্যচপল সূর্য্য-করের প্রতিবিম্ব, নবীন মেঘের অশ্রুবিন্দু, বাচাল সমীরের অসঙ্গতি, খরগোশের ভীরুতা, ময়ূরের জাঁকজমক, হীরকের কাঠিন্য, তুষারের শীতলতা এবং ঘুঘুর কোমল কূজন।

এই-সব ব্যাপার একসঙ্গে মিশাইয়া বিধাতা নাকি রমণীকে সৃষ্টি করিয়াছেন! কিন্তু এখানেও ক্ষান্ত না হইয়া, বিধাতার উপকরণের সঙ্গে কবি আরো অনেক জিনিষের ফর্দ্দ দিয়াছেন; যেমন তরুণ তৃণের থর-থর কম্পন, মধু'র মিষ্টতা, বাঘিনীর নির্ম্মমতা, এমন-কি বুভুক্ষু অগ্নির শিখা পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই! এককথায় বিধাতা রমণীকে গড়িয়াছেন "বিষামৃত একত্র করিয়া"! সে আমাদের ভালোও বাসে, ঘৃণাও করে; ভয়ও পায়, চোখও রাঙায়; ছায়ার মত পিছনেও আসে, আলেয়ার মত ছুটিয়াও পালায়; তৃপ্তও করে, দগ্ধও করে; বাঁচায়ও বটে, মারেও বটে! আমরা কখনো তার পূজার দেবতা, কখনো-বা খেলার পুতুল!

—এই হচ্ছে কাব্যে-উক্ত রমণীর দেহ-মনের ছবি। বলা বাহুল্য এ ছবিখানি কল্পনার বৈঠকখানা ছাড়া অন্য-কোথাও টাঙাইয়া রাখা চলে না। কেননা এই বাস্তব সংসারটা একেবারেই কবিতা বা প্রথম প্রেমিকের স্বপ্ন নয়। কাজেই কবির রূপ-বর্ণনার সঙ্গে বর বা বধূর দেহ হুবহু

গতি লাবণ্যের শরীরিণী মূর্ত্তি—
যেন একখানি হাল্‌কা মেঘ!

অবলম্বন করিয়াছেন। কোঁক-ড়ানো চুলের রাশি, ললাটে ও গ্রীবার পিছনে চূর্ণ অলক, ছোট কপাল, টানা ভুরু, পদ্মপলাশ-লোচন, টিকলো নাক, রাঙা গোলাপের মত কপোল, পাত্‌লা টুকটুকে ঠোঁট, ছোট্ট 'হাঁ', টোল্‌-খাওয়া গাল বা চিবুক, মরাল গ্রীবা, পীবর বক্ষ, সরু মাঝা, গুরু নিতম্ব, স্থূল উরু প্রভৃতি রমণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া ভারতের ও য়ুরোপের কবির মধ্যে কিছু তর্কাতর্কি হয় না। পুরুষ দেহ সম্বন্ধেও ঠিক তাই। এমন কি, এখানে কালো-ধলোর মধ্যে গায়ের রং লইয়াও কোন বিবাদ হয় না—সাদা কবির সঙ্গে কালো কবিও গলা মিলাইয়া গৌরবর্ণের তথা দুধে-আল্‌তা রঙের সুখ্যাতি করেন। অবশ্য snow-white-এর ঠিক প্রতিশব্দ প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্যে আছে কিনা, জানি না।

মুস্কিল বাধে সুধু এক জায়গায়। পাশ্চাত্য কবির রূপবর্ণনা যেমন তাঁহার স্বদেশের নর-নারীদের সঙ্গে অনেকটা খাপ খাইয়া যায়, ভারতীয় কবির বর্ণনা কিন্তু সমস্ত ভারতে ততটা খাটে না। গৌরবর্ণ শ্রেষ্ঠ বর্ণ বটে, কিন্তু সে শ্রেষ্ঠতা কয়জন ভারতবাসীর আছে? ভারতের দুই-তিনটি প্রদেশ ছাড়া, আর-কোথাও সাধারণত গৌরবর্ণ দুর্লভ বলিলেও চলে। বাঙ্‌লা ত তাহা কালোর দেশ। সামান্য কটা রঙের কথা ধরি না, আসল ফরসা রঙ এখানে শতকরা একজনের বেশী আছে কিনা সন্দেহ! রঙ হইতেছে সৌন্দর্য্যের প্রধান (এমন-কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)

মিলাইয়া কেউ যদি তিলোত্তমার দ্বিতীয় সংস্করণকে বিবাহ করিতে চায়, তবে তাহাকে মদনের বদনে ভস্মনিক্ষেপ করিয়া চিরকালটাই আইবুড়ো হইয়া থাকিতে হইবে। জীবন্ত কোন অতি-সুন্দর আহা-মরি চেহারাও কবির বর্ণনার সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায় না।

তবে একটা ব্যাপারে সকলকেই বিস্মিত হইতে হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমস্ত বা অধিকাংশই বিসদৃশ,—অথচ এই দুই-দেশী কবির রূপবর্ণনা কিন্তু অনেকটা এক-রকম। সৌন্দর্য্যের সাধারণ আদর্শ সম্বন্ধে ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় কবিরা প্রায় একমত

একটি উপাদান। বাঙলার মেয়েলী প্রবাদও তাই বলে—"শত দোষ হরে' গোরা।" রঙের অলুষে যে অনেক সাধারণ চেহারাও অসাধারণ হইয়া ওঠে, সে ত আমরা সকলেই আকচার স্বচক্ষে দেখতে পাইতেছি। অতএব বলিতে হইবে যে, বর্ণহিসাবে বাঙালীর জাতীয় সৌন্দর্য্য একরকম নগণ্য।

কিন্তু বাঙালীর রঙ ফরসা না হইলেও, তাহার সৌন্দর্য্যের আদর্শ যে পাশ্চাত্য আদর্শের অনেকটা কাছাকাছি, সেটা বেশ বুঝা গেল। চীনা বা জাপানী বা কাফ্রিরা এ-কথা বলিতে পারে না। তাহাদের সৌন্দর্য্যের মাপকাটি এমন সংকীর্ণ যে, আপন আপন দেশ ছাড়া আর-কোথাও কাজে লাগে না।

আদর্শ-সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে? আদর্শ সৌন্দর্য্যের প্রথম দ্রষ্টব্য, বর্ণ-মাধুর্য্য। (The Beauty of Colour) কিন্তু আগেই বলিয়াছি, এদিকে বাঙালীর ততটা সুখ্যাতি নাই।

মিস আনেট কেলারম্যান যাহার দেহের গঠন নিখুঁত বলিয়া বিখ্যাত।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য, গঠন-সৌন্দর্য্য (The Beauty of Form)। যাহার গড়ন ভালো নয়, তাহার রূপও উচ্চশ্রেণীর বলা যায় না। নাক-চোখ অনেকেরই ভালো থাকে, কিন্তু পুরন্ত দেহ অত্যন্ত দুর্লভ। যাহার গড়ন ভালো, তাহার অঙ্গলীলার ভঙ্গীতে নয়ন-মন সহজেই অভিভূত হইয়া যায়। আমরা সুধু মুখের গড়নই (অর্থাৎ নাক-চোখ-ঠোঁট) দেখিয়া তুষ্ট হই, কিন্তু যাঁহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, তাঁহারা মুখের সঙ্গে দেহের গড়ন দেখিয়াই তবে রূপের যাচাই করেন। তৃতীয় দ্রষ্টব্য, মানানসৈ অঙ্গসৌষ্ঠব (Balance and Symmetry)। খালি রঙ-গড়ন থাকিলেই চলিবে না, যাহার দেহের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সঙ্গে ঠিকমত খাপ খায় না, সে নিখুঁত সুন্দর নয়। দেহের তুলনায় কাহারও মাথা, কাহারও হাত বড়-ছোট হয়, কাহারও দেহের উপরদিকটা হয় ভারি আর নীচের দিকটা

অ্যাপলো

হাল্কা, আবার কাহারও দেহ—হয় ইহার বিপরীত,—এ-রকম বেখাপ্পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের সৌন্দর্য্যকে অনেকটা খেলো করিয়া দেয়।

কিন্তু রঙ, গড়ন ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব, এই তিনের সুন্দর মিলন বাঙলা দেশে কোথাও আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। কারণ এদেশে এ-সব বিষয় লইয়া কেহ আলোচনা করে না, তাই এমন নিখুঁত-সুন্দর পুরুষ বা নারীর ছবি বা বর্ণনা কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তবে সাদা চোখে পরিচিত ও অপরিচিত অন্তপুরে যে-সব রূপের নমুনা দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, নিখুঁত-সুন্দর কোন পুরুষ বা নারী আজ-পর্য্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই।

ভালো মুখ এদেশে প্রায়ই চোখে পড়ে, দু-একজন ফরসা লোকও দেখি। কিন্তু সেইসঙ্গে উপযোগী দেহের গঠন-সৌন্দর্য্য আমরা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না। গড়ন-হিসাবে সাহেবরা আমাদের চেয়ে কত উঁচুতে! সাহেবদের মধ্যে শতকরা আশীজনের দেহের গড়ন আমাদের চেয়ে অনেকগুণে ভালো, কিন্তু নির্দ্দোষ গঠন-

বঙ্কিম তনুলত পুরস্ত বাহুর ভঙ্গিমায় অপূর্ব্ব ছন্দ সৌন্দর্য্য আমাদের মধ্যে শতকরা দশজনেরও আছে কিনা সন্দেহ।

ইহার একমাত্র কারণ, ব্যায়ামের অভাব। ফুলগাছের চারা যেমন গজাইয়া উঠিলেও তাহার প্রতি যত্নের আবশ্যক, মানুষের দেহ-সম্বন্ধেও ঠিক তাই। উপযুক্ত যত্ন না হইলে এ দেহ-তরুও ক্রমেই শুকাইয়া যাইবে। প্রতিদিন পনেরো হইতে ত্রিশটি মিনিট ব্যায়ামের জন্ম খরচ করিলে সময়ের অপব্যয়ও হইবে না—দেহেরও উৎকর্ষ-সাধন হইবে। আমরা—বাঙালীরা বাল্যে বা প্রথম যৌবনে, যে-সময়ে দেহ গঠিত হয় তখন বাপ-মার কথায় লেখা-পড়ার মত ব্যায়াম করিতেও বাধ্য হই না, ফলে যৌবন যাইতে-না-যাইতেই বুড়া হইয়া পড়ি। কেহ কেহ পরে বেশী বয়সে ব্যায়ামের উপকারিতা বুঝিয়া ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হন। তখন স্বাস্থ্য বা বল লাভ হইলেও দেহের চক্ষুষ উন্নতি বড় বেশী হয় না। কেননা, একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের পরে মানুষের দেহের বাড় থামিয়া যায়।

সাহেব-মেমরা অনেকেই নিয়মিত ব্যায়াম করেন। তাহার ফলে তাঁহাদের দেহে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের যে অভাব থাকে, ব্যায়ামের দ্বারা তাহার অনেকটা পূরণ হইয়া যায়। কিন্তু বাঙালী যুবকরা শুধু মনের চর্চ্চাতেই প্রাণপণে নিযুক্ত থাকেন—দেহের চর্চ্চা বোধ হয় তাঁহাদের মতে একান্ত অনাবশ্যক। ফলে "য়ুনিভার্সিটি"র জাঁতাকলে তাঁহাদের দেহ দুইদিনেই ভাঙিয়া গুঁড়া হইয়া যায় এবং সে ভাঙা দেহে মনও বেশীদিন টেঁকে না।

ছেলেদের হাল এই—মেয়েদের অবস্থা আরো শোচনীয়। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা এবং

আর-একটি আপলোর মুখ

স্ত্রী-স্বাধীনতা দুয়েরই অভাব। মেয়েরা মনের চর্চ্চাও করেন না—দেহেরও না! ঘরকন্নার কাজ—অর্থাৎ রান্নাবান্না, বাটনাবাটা, বাসন-মাজা ও পান-সাজা প্রভৃতি শিখিলেই
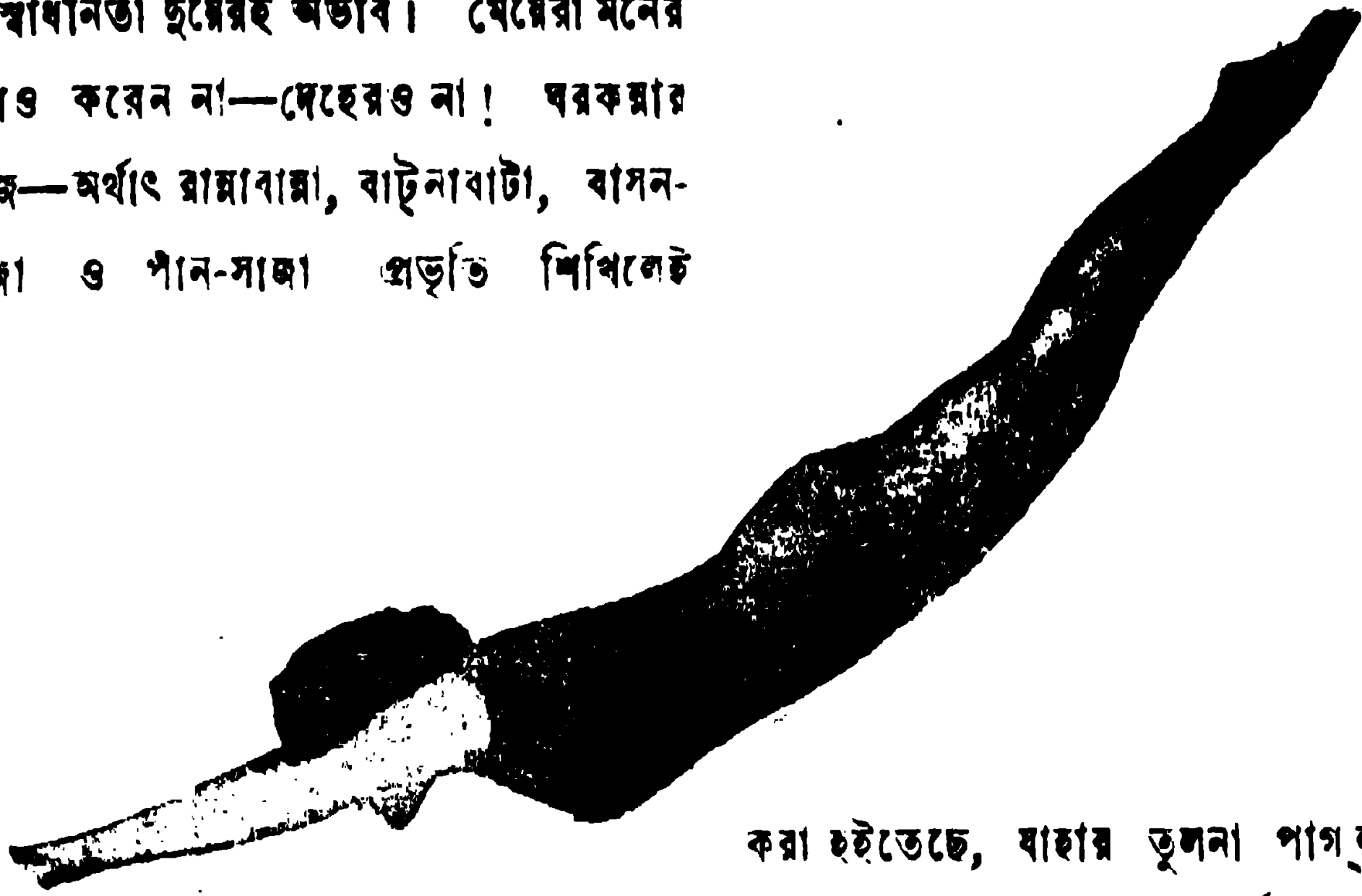
মিস্ কেলারম্যান জলে ঝাঁপ দিতেছেন

তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। রেওয়াজ নাই বলিয়া তাঁহারা অন্দরের বাহিরেও পা ফেলিতে পারেন না। কাজেই খোলা-হাওয়ায় ইচ্ছা-মত নিয়মিত চলা-ফেরাতেও যেটুকু ব্যায়ামের কাজ হয়, সেটুকু হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত। অন্তঃপুরেও তাঁহাদের জন্য যদি ব্যায়ামের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলেও কথা ছিল। কিন্তু এই হতভাগা দেশে এ কথাটাও এমন নূতন যে, শুনিলেই সমাজপতিরা বলিয়া উঠিবেন, "হিন্দুর ঘরের মেয়েরা ব্যায়াম করবে,—ডম্বল ভাঁজবে! অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মুখ যে তাহলে পুড়িয়ে দেওয়া হবে!—বাঙালীর প্রাণ যে নাভিশ্বাস ছাড়বে!" বাস্তবিক, যাহা-কিছু নূতন তাহারই সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে জড়াইয়া, এদেশে আজকাল এমন-সব যাচ্ছেতাই গোলমাল করা হইতেছে, যাহার তুলনা পাগ্‌লা-গারদ ছাড়া অন্য-কোথাও পাওয়া দুর্লভ!

বাঙ্‌লা দেশে একালে আর-একশ্রেণীর মেয়ে দেখা যায়, তাঁহারা শিক্ষিতও বটে, স্বাধীনও বটে। কিন্তু তাঁহারাও সুন্দরী হইতে চান মুখে রুজ-পাউডার মাখিয়া—অথচ ব্যায়ামের ধার দিয়াও যান না। তাঁহাদের অবস্থাও অনেকটা পূর্ব্বকথিত বাঙালী ছাত্রদের মত।

আমাদের মতে, ছোট ছোট মেয়েদের নাচ-শিখানো একসঙ্গে উপকারী ও দরকারী। অবশ্য, যৌবনে স্বামীর সংসারে গিয়া, শ্বশুর-শাশুড়ীর দৃষ্টিকে স্তম্ভিত ও হতভম্ব করিয়া বঙ্গললনাকে আমরা খেমটা-নাচ নাচিতে পরামর্শ দিই না,—কিন্তু বাল্য ও শিশু বয়সে দেহ যখন গড়িয়া ওঠে, নাচ যখন স্বাভাবিক নির্দ্দোষ আনন্দ, তখন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসারী হইয়া উপযোগী শিক্ষকের সাহায্যে তাহাদিগকে নাচ শিখাইতে আপত্তি কি? এখানে সমাজও বাধা দিবে না।

নাচের মত চমৎকার ব্যায়ামও খুব কম আছে। অন্যান্য ব্যায়ামের মত ইহা কষ্টকর

সুগঠন দেহ ও সুন্দর মুখ-চোখ নাক—
সমস্ত লইয়া যেন একটি স্থির-চপলার স্বপ্ন !

রূপরাণী ভেনাস

ও একঘেয়েও নয়, তাহার উপরে নৃত্যকলায় মানুষের দেহও নানাভাবে সঞ্চালিত হয়, গঠন নিখুঁত হইয়া ওঠে, ভাবভঙ্গীতে মাধুর্য্য এবং চলা-ফেরায় মধুর ছন্দের আভাস জাগে,—এককথায় যাহার জন্য রমণীর দেহ অপূর্ব্ব এবং বিশ্বকবির মহাকাব্য বলিয়া কীর্ত্তিত, নৃত্যের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। যে রমণী চলিতে জানে না, বাহু-লতাকে ব্যবহার করিতে জানে না, তনুকে লীলায়িত করিতে জানে না, তাহার সৌন্দর্য্যে কোনই মাধুর্য্য নাই। সে যদি স্বামীর দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতে না পারে, তবে আমরা আশ্চর্য্য হইব না। তাঁহাকেই বলি পরমা সুন্দরী রমণী—

যাঁহার দেহের ছন্দ ও ভার সমান, যাঁহার উত্তমাঙ্গের ভঙ্গী লঘু, যাঁহার চলাফেরা যেন ডানায় ভর দিয়া, যাঁহার চরণপাত নিঃশব্দ মেঘের মত, যাঁহার প্রত্যেক গতি ও ভাবের লীলা গীতি-কবিতার মত। তাঁহার দেহের কোন-একটি বিশেষ অঙ্গ বা বিশেষত্বের জন্য আমরা মোহিত হইব না,—তাঁহার মাথার তিমির-নির্ঝরের মত এলানো কুন্তল বা ভুরুর ধনুকের তলায় চপল ডাগর চোখে চাহনির বিদ্যুৎ-চমক, (যাহা তীরের চক্চকে ফলার মত বুকের ভিতরে আসিয়া বিঁধে), বা মোমের মত নরম-নধর দীর্ঘ গ্রীবার ভঙ্গিমা বা কাঁধের হাতের কি পায়ের নিটোল সুডৌল গড়ন বা গোলাপ-যূথিকার মিলিত রঙের মত বর্ণমাধুরী বা এম্নি কোন-কিছুর বিশেষ সৌন্দর্য্য নয়,—কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সমস্ত ভাবের ও রূপের রস দিয়া নিখুঁত সুন্দরীরা আমাদের চোখ-মনকে বিভোর করিয়া দেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য খণ্ড ভাবে নয়—সমগ্রভাবে দেখিবার জিনিষ।

প্রসিদ্ধ রুশ-নর্ত্তকী Mlle. Lydia Kyasht এর দেহ গতি-লাবণ্যের এম্নি শরীরিণী মূর্ত্তি।

রমণীর পক্ষে সাঁতার আর একটি ভালো ব্যায়াম। অবশ্য এ সুযোগ সুধু পল্লীবালাদেরই আছে এবং পল্লীগ্রামের অনেক বাঙালী মেয়ে সাঁতার দিতেও পারেন। কিন্তু ঠিক নিয়মিত উপায়ে সাঁতার না দিলে দেহের বিশেষ-কোন উপকার হয় না,—কাজেই এদেশে যে-সব মেয়ে সাঁতার জানেন, তাঁহারাও সাঁতারের যথার্থ উপকারটি পান না। বিখ্যাত মেয়ে-সাঁতারী মিস্ আনেট কেলারম্যান নিজের দেহের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, রমণীর পক্ষে সাঁতার কেমন উপকারী ব্যায়াম। মিস্ কেলারম্যানের দেহ এখন রমণীর আদর্শ-দেহরূপে প্রসিদ্ধ। গ্রীক ভাস্করের গড়া "ভেনাস ডি মিলো" বা রূপলক্ষ্মীর মূর্ত্তিটি এতদিন রমণীর নিখুঁত চেহারা বলিয়া নাম কিনিয়া আসিয়াছে। সেটি কিন্তু রমণীর কল্পিত মূর্ত্তি, বাস্তব জীবনে কেহই তাহাকে দেখিবার প্রত্যাশা করে নাই। মিস্ কেলারম্যান সে ভ্রম আজ ভাঙিয়া দিয়াছেন। তাঁহার দেহের মাপজোক প্রায় অবিকল ভেনাসের মত।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এদেশে যে-সকল বাঙালী পুরুষ ব্যায়ামের দ্বারা দেহকে গড়িয়া তুলেন, তাঁহারাও দেহের প্রকৃত আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখেন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ভারি-ওজনের মস্তবড় লম্বা-চওড়া দেহই আদর্শ দেহ নয়,—মধ্যম-ওজনের দেহই আদর্শ হইবার যোগ্য। সুধু বাঙলা নয়—সমস্ত ভারতবর্ষেই এই ভুল বিশ্বাস বদ্ধমূল। সেইজন্যই ভারতীয় পালোয়ানদের দেহ সাধারণত য়ুরোপীয় পালোয়ানদের মত সুন্দর-সুশ্রী হয় না,—হয় এক-একটি বিপুলবপু ভুঁড়িওয়ালা মত্তহস্তীর মত—তাহাতে না আছে সুগঠন, না আছে সৌন্দর্য্য। ইটালীর যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন ভাস্করের গড়া "আপলো"র মূর্ত্তিটিই আদর্শ পুরুষ-দেহ বলিয়া বিখ্যাত। আমরা এখানে আপলোর অন্য দুটি প্রতিমূর্ত্তি এখানে এখানে দিলাম।

এতক্ষণ আমরা দেহের বাহিরের রূপের কথাই বলিলাম। কিন্তু রূপ সুধু ত দেহের উপরেই থাকে না—তরল মেঘের আড়াল

হইতে সূর্য্যের কিরণধারা যেমন বাহিরে বহিয়া আসে, মানুষের অন্তর্গুপ্ত প্রাণের সৌন্দর্য্যের আভাসও তেমনি দেহের বাহিরে ফুটিয়া ওঠে। মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা জানেন, বাহিরের চেহারা-হিসাবে অ[illegible] অনেক রমণী বা পুরুষ, অসংখ্য মানুষ[illegible] গোলাম করিয়া ফেলিয়াছে। ইতিহ[illegible] ইহার অজস্র প্রমাণ আছে। কিন্তু ই[illegible] কারণ কি? কেন তাহারা আকর্ষণ ক[illegible]? —কেবলমাত্র প্রাণের সৌন্দর্য্যে! মানু[illegible] চোখ হইল তাহার প্রাণের জানালা। প্রাণের ভাব সেই চোখ দিয়া বাহিরে আসে, মুখের উপরে জাগিয়া ওঠে। প্রাণের সৌন্দর্য্য না থাকিলে যে-কোন সুশ্রী-সুন্দর পুরুষ বা রমনীকে পাথরের মরা মূর্ত্তির মত দেখায় তাহাকে ঘর-সাজানো পুতুলের মত ব্যবহা করা চলে, কিন্তু ভালোবাসা যায় ন প্রাণ দেওয়া যায় না, জীবনের সঙ্গী করা যায় না। প্রাণের প্রকাশই দেহের সৌন্দর্য্যকে জীবন্ত করে, এ-কথা ভুলিলে কিছুতেই চলিবে না। যতই রুজ-পাউডার মাখুন ব্যায়াম করুন, ভালো সাজ-পোষাক পরুন প্রাণের শ্রীকে অবহেলা করিলে সমস্ত ব্য[illegible] হইয়া যাইবে।

বিলাতে আদর্শ-দেহ লইয়া অনেব আলোচনা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞরা আদ[illegible] দেহের যে মাপ ও ওজন স্থির করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার কিছু-কিছু উদ্ধার করিয়া বিদায় লইবু।

প্রথমে তিনশ্রেণীর পুরুষ-দেহের আদর্শ।

যে পুরুষ মাথায় পাঁচফুট উঁচু, তাহার দেহ এইরূপ হওয়া উচিত:—দেহের ওজন —একমণ সাড়ে-ষোলসের। ঘাড়ের [illegible] তের ইঞ্চি। বুকের বেড় (সাধারণ অব[illegible] সাড়ে-চৌত্রিশ ইঞ্চি। কোমরের ছাব্বিশ ইঞ্চি। [illegible] উরুর বেড় সতেরো ও সিকি ই[illegible]। [illegible] ডিম তের ইঞ্চি।

যে পুরুষ মাথায় পাঁচফুট ছয় ইঞ্চি উ[illegible] তাঁহার দেহ এইরূপ হওয়া উচিত:—

ওজন—একমণ সাড়ে-উনত্রিশ সে[illegible] ঘাড় সাড়ে-চৌদ্দ ইঞ্চি। বুক সিকি-ই[illegible] কম আটত্রিশ ইঞ্চি। কোমর সাড়ে-আট[illegible] ইঞ্চি। বাহু সাড়ে-তের ইঞ্চি। উরু সি[illegible] ইঞ্চি-কম উনিশ ইঞ্চি। পায়ের ডিম সা[illegible] চৌদ্দ ইঞ্চি।

যে পুরুষ মাথায় ছয়ফুট উঁচু, তাঁহ[illegible] দেহ এইরূপ হওয়া উচিত।

ওজন দুইমণ-সাড়ে বারো সের। ঘ[illegible] ষোল ইঞ্চি। বুক পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি কোমর সাড়ে-চৌত্রিশ ইঞ্চি। বাহু যে[illegible] ইঞ্চি। উরু চব্বিশ ইঞ্চি। পায়ের [illegible] সতেরো ইঞ্চি।

নিখুঁত রমণী-দেহ উচ্চতায় পাঁচফু[illegible] তিন ইঞ্চি হইতে পাঁচফুট সাত ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইবে। তাঁহার দেহের ওজন হইবে এক মণ সাড়ে-বাইশ সের হইতে একমণ ত্রি[illegible] [illegible]র পর্য্যন্ত।

তাঁহার নাকের ডগায় একটি ওলন ধরিলে সেটি তাঁহার পায়ের বুড়ো-আঙুলের সামনে এক ইঞ্চি তফাতে আসিয়া পড়িবে। তাঁহার দুই কাঁধ হইতে নীচের দিকে দুটি সরল রেখা টানিলে, সেই রেখাদুটি তাঁহার পাছার ঠিক দুইপার্শ্ব স্পর্শ করিবে।

তাঁহার বুকের বেড় হইবে আটাশ ইঞ্চি হইতে ছত্রিশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। তাঁহার পাছার মাপ এর-চেয়ে ছয় হইতে দশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বেশী হইবে। তাঁহার কোমরের বেড় হইবে আকার-অনুসারে বাইশ হইতে আটাশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত।

তাঁহার বাহুর উপরার্দ্ধ ঠিক কটি-রেখার কাছে এবং নিম্নার্দ্ধ ঠিক উরুর মাঝখানে আসিয়া শেষ হইবে।

তাঁহার চিবুক হইতে হাতের আঙুলের ডগা যতখানি, তাঁহার পায়ের মাপ লম্বায় ঠিক ততখানি হইবে। (অর্থাৎ তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্দ্ধভাগের সমান) তাঁহার মাথা হইতে কোমরের মাপ যতখানি, তাঁহার কোমর হইতে পায়ের মাপ তার চেয়ে প্রায় একফুট বেশী হইবে।

দেহের অন্যান্য মাপ এই :—পাঁচফুট তিন ইঞ্চি উঁচু রমণীর ঘাড় বারো ও সিকি ইঞ্চি; পুরোবাহু সাড়ে-আট ইঞ্চি, কব্জি ছয় ইঞ্চি, উরু সাড়ে-একুশ ইঞ্চি এবং পায়ের ডিম তের ও সিকি ইঞ্চি হইবে।

পাঁচফুট সাতইঞ্চি উঁচু রমণীর ঘাড় তের ও সিকি ইঞ্চি; পুরোবাহু সিকি-ইঞ্চি কম দশ ইঞ্চি, কব্জি সাড়ে-ছয় ইঞ্চি, উরু পঁচিশ ইঞ্চি এবং পায়ের ডিম সাড়ে-পনেরো ইঞ্চি হইবে।

যদি এই মাপকাটি ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহাহইলে আমাদের দেশে সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত অধিকাংশ পুরুষ ও রমণীর রূপের দেমাক নিশ্চয়ই ভাঙিয়া যাইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সঙ্কলন

অরবিন্দের পত্র

* আমি যা অনেক দিন থেকে দেখছি তার দু একটী কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এ ধারণা হয় যে ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্ব্বত্রই দেখি inability বা unwillingness to think, চিন্তা করবার অক্ষমতা বা চিন্তা "ফোবিয়া"। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবটী ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, অন্বেষণ করে, পরিশ্রম করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটী জিনিস—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেই খানে; সেই শক্তির বলে জগৎকে সে গ্রাস করতে পারছে; আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা'

মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট—এ সব নবসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।

তার পর ভারত দেখ। কয়েকজন Solitary growth ছাড়া সর্ব্বত্রই * * * সোজা মানুষ, অর্থাৎ average man; যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা; য়ুরোপে চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য কুলী মজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনে সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে তবে য়ুরোপের শক্তি ও চিন্তার Fatal limitation আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, nebulous metaphysics, yogic hallucination; ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই limitation ও surmount করবার য়ুরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে; আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্য শক্তির (উপাসনা) দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই; সহজের উপাসক; সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন; বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, ধর্ম্ম বাহ্যের গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

বাঙ্গালা দেশেই এই দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা। বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের Capacity আছে, Intuition আছে; এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নহে। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা' হলে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না; সহজে সারতে চায়; চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ। তারপর অবসাদ তমোভাব। এ দিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি; জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে; শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে কি হয়েছে—খেতে পাচ্ছেনা, পরবার কাপড় পাচ্ছেনা, চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত, ব্যবসা বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্য্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ কচ্ছে। শক্তি সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই (সেখানে) প্রেমও থাকে না; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া মনোমালিন্য ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এ দেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে ও আর কোথাও তত নাই। আর্য্যজাতির উদার বীরযুগে এত হাঁক ডাক, নাচানাচি ছিল না, কিন্তু যে চেষ্টা আরম্ভ করত তা'রা, তা' বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙ্গালীর চেষ্টা দু'দিন স্থায়ী থাকে।

তুমি বলছ চাই ভাব উন্মাদনা, দেশকে মাতানো। রাজনীতিক্ষেত্রে ও সব করেছিলাম স্বদেশীর সময়ে; যা করেছিলাম সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি না যে কোনও ফল হয় নি। হয়েছে; যত movement হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে তা' অধিকাংশ possibilityর বৃদ্ধি; স্থিরভাবে actualise করবার এটি ঠিক রীতি নয়। সেই জন্য আমি আর emotional excitement, ভাব, মন মাতানকে base করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল, বীরসমতা; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি; শক্তিসমুদ্রে জ্ঞান সূর্য্যের রশ্মির বিস্তার; সেই আলোকময় বিস্তারে

অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstesy। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ' ক্ষুদ্র আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভাগবৎ জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

এই lecture পড়ে এ কথা ভাববে না যে, আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করছি। তবে other side of the shield কোথায় দোষ, ত্রুটি, ন্যূনতা তা দেখবার চেষ্টা করেছি। এগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবে না, স্থায়ীও হবে না।

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্য্য এই যে আমিও পুঁটলি বাঁধছি। তবে আমার বিশ্বাস যে সে পুঁটুলি St. Peterএর চাদরের মত; অনন্তের যত শিকার তার মধ্যে গিজগিজ করছে। এখন পুঁটলি খুলছি না, অসময়ে খুলতে গেলে শিকার পালাতে পারে। দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈয়ারী হয় নি বলে নয়, আমি তৈয়ারী হই নি বলে। অপক্ক অপক্কের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করতে পারে?

নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

গান

তীরে কি আর আসবেনা তোর তরী?
ঢেউ দেখে তুই মরিস্ ডরে
সেই লাজেতেই মরি।
চেয়ে ঝড়ের মেঘের পানে
শান্তি যে তোর নাইরে প্রাণে,
কাণ্ডারী তোর হাস্‌চে বসে'
ডান হাতে হাল ধরি।
মিথ্যা স্বপন তোর—
এমনি করে জড়িয়েছে রে, যুচ্‌লনা তার ঘোর,
প্রভাত আসে তোমার পানে
আলোর রথে আশার গানে,
সে খবর কি দেয়নি কানে
আঁধার বিভাবরী?

মোস্‌লেম ভারত, বৈশাখ ১৩২৭। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যে পতিত

আজকাল সাহিত্যে সমাজদ্রোহের চিত্র প্রায়ই অঙ্কিত হইতে দেখা যায়। বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণের চিত্র আমরা অনেকগুলি রচনায় পাইয়াছি। কিন্তু একটী রচনায় উপন্যাসের নায়িকা যেরূপ নির্ভীক ও নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে স্বামীর মৃত্যুর পর অন্যের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহাকেই স্বামী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে, বিধবা-বিবাহ-বর্জ্জিত দেশে তাহা বিরল। এই ধরণের রচনায় আর একটী বিশেষত্ব আছে,—সেটী হইতেছে ইহাদের অপরাধ বিস্মৃত করিয়া ইহাদের উপর পাঠকের শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবার চেষ্টা। এক জন লেখক তাঁহার নায়িকাকে 'মর্ত্তে কলঙ্কিনী' হইলেও স্বর্গের 'সতী-শিরোমণির' মত করিয়া চিত্রিত করিতে গিয়াছেন। কতদূর সফল হইয়াছেন তাহা বলিবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। কারণ কোন রচনা-বিশেষের সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

আমি ইহাই শুধু বলিতে চাহি যে, এই সকল রচনার দোষগুণ কেবলমাত্র ইহাদের সমাজ-বিগর্হিত চিত্রের দিক দিয়া বিচার্য্য নহে। অর্থাৎ বাল-বিধবার

পরপুরুষের প্রতি অনুরাগের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া কোন রচনা নিন্দনীয় নহে, বা কুলত্যাগিনীর চরিত্র আলোচিত হইয়াছে বলিয়া সেই সমস্ত রচনা সৌন্দর্য্যহীন নহে এবং ব্রাহ্মণগৃহের বিধবার স্পর্দ্ধিত অবৈধ প্রণয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সেই পুস্তকও কুৎসিত নহে। প্রত্যেক উপন্যাসের দুইটী দিক—একটী হইতেছে তাহার plot বা গল্পাংশ; আর একটি এই plotএর execution অথবা গল্পাংশের বিবৃতি-কৌশল। সমালোচকের প্রধান দ্রষ্টব্য হইতেছে execution; plot বা গল্পাংশে লেখক সামাজিক নীতি ও বিধানের লঙ্ঘন কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই তাহা দোষের নহে, অথবা যাহারা এই নীতি লঙ্ঘন করিয়া সমাজে পতিত হইয়াছেন তাহাদিগের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া তাহা বর্জ্জনীয় হইতে পারে না।

প্রশ্ন উঠিবে, তাহা হইলে art কি স্বেচ্ছাচারী হইবে? artist কি ইচ্ছামত অধঃপতন ও অধঃ-পতিতের চিত্র সমাজের সম্মুখে ধরিতে পারিবেন?

যাঁহারা Platoর Republic পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যে তিনি কবি ও নাটক-কারকে উচ্চ স্থান দেন নাই; কারণ তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের দ্বারা প্রবৃত্তির উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইয়া মানুষের সংযম নষ্ট হইতে পারে। Platoর মতানু-সারে সেই সাহিত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহা মানুষকে বস্তু-জগৎ হইতে আদর্শ-জগতে আকৃষ্ট করিতে সহায়তা করিবে। দার্শনিকের স্থান তাই তিনি সকলের উর্দ্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মধ্যযুগে আমরা artএর যে আদর্শ দেখিতে পাই তাহাও অনেকটা এইরূপ। মানুষের আদর্শ তখন ছিল পরলোকমুখী; বিচিত্র সৌন্দর্য্যময়ী এই পৃথিবী এবং অসীম বিস্ময়পূর্ণ অনন্ত সুখদুঃখে ভরা মানব জীবন তখন মানুষের চক্ষে সুন্দর ও গৌরবময় বলিয়া বোধ হয় নাই। তাই art তখন কেবলমাত্র দেবদেবী এবং সাধু-সন্ন্যাসীর কাহিনী লইয়াই ব্যস্ত ছিল। পার্থিব স্নেহ, প্রেম, জয়-পরাজয় বা দুঃখ সুখকে সাহিত্য আপনার মধ্যে স্থান দেয় নাই। তার পর Reniassanceএর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া লৌকিক আচার-ব্যবহার, লৌকিক সুখ-দুঃখ, লৌকিক জীবন-সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে আসিল। কিন্তু সাহিত্যের theocracyর স্থানে একেবারে democracy না আসিয়া এক প্রকার aristocacryর আবির্ভাব হইল। সাহিত্যে এই aristrociacy স্বদেশে ও বিদেশে এখনও অনেকটা প্রভাবশালী। সমাজে যাহারা তথা-কথিত উচ্চ শ্রেণীভুক্ত তাহাদের কাহিনীই প্রধানতঃ সাহিত্যে বর্ণিত হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে সাহিত্য এই গণ্ডী কাটাইয়া উঠিতেছে। Romanceএর প্রভাব হ্রাস ও Realismএর প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও ক্রমে demo-cratic আদর্শ-পন্থী হইতেছে। য়ুরোপে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রচারক ফরাসী জাতিই সাহিত্যে এই মন্ত্রেরও প্রধান প্রচারক। সমাজের সর্ব্বস্তরের চিত্র ও ইতিহাস প্রদান করাই ছিল Balzacএর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার Human comedyতে শ্রেণীবংশ নির্ব্বিশেষে ফরাসী সমাজের তাৎকালিক চিত্রের মধ্য দিয়া তিনি সমস্ত মানব জাতির এক বিরাট চিত্র প্রদান করিয়াছেন। Balzacএর প্রভাব সাক্ষাতে অথবা পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান শতাব্দীতে সর্ব্বদেশের সাহিত্যে ব্যাপ্ত হইয়া সাহিত্যকে উদার করিয়াছে। অবশ্য অন্যান্য অনেক কারণও সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেছে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সাহিত্যে যে Realismএর প্রভাবে জন-সাধারণ স্থানলাভ করিতেছেন এবং বংশ, পদ ও অর্থের কৃত্রিম বৈষম্যের নিম্নে মনুষ্যত্বের স্বভাব ও হৃদয়গত সাম্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে তাহারই অন্যতম ধনস্বরূপ যে সাহিত্যে জীবনের নিকৃষ্ট অংশের চিত্রও অঙ্কিত হইতেছে। সমাজে যাঁহারা সৎ ও বরেণ্য তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যাঁহারা পতিত ও ঘৃণিত বলিয়া পরিচিত উপন্যাসকার তাহাদিগকেও রচনায় স্থান দিতেছেন। ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ইহাই আমাদের বিবেচ্য।

একদল লোক আছেন তাঁহারা বলিবেন, যে

সকল চিত্র দর্শনে মানুষের নীতিমূল শিথিল হয়, সমাজবন্ধন অতিক্রম করিবার জন্য মানুষের ইচ্ছা হয় তাহা আর্টে অমার্জ্জনীয়। অধঃপতন অথবা অধঃপতিতের কাহিনী সাহিত্যে বর্ণনা করা অন্যায়। ইঁহাদের মতানুযায়ী হইলে সাহিত্য অনতিকাল মধ্যেই পঙ্গু ও অলীক হইয়া পড়ে, কারণ স্বাধীন বিকাশ ইহাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইহা ভিন্ন ইঁহাদের মতানুসারে সাহিত্য-সৃষ্টিও এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে; কারণ মানুষের নৈতিক চরিত্র কোন্ দৃশ্য দর্শনে দুর্ব্বল হয় সে বিষয়ে মতভেদ থাকিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাহার পর সাহিত্যে যাহা হইতে মানুষকে দূরে রাখিতে চান জীবনে কি তাহা করিতে সমর্থ হইবেন? মহারাজা শুদ্ধোধনের মত মানুষকে জীবনের কঠোর সত্য হইতে দূরে রাখিয়া শুধু আদর্শের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা একদিন আপনা হইতেই বিফল হইয়া যায়। সুখের বিষয় ইঁহাদের উপদেশ-অনুসারে কার্য্য করিবার সম্ভাবনা সাহিত্যের আর নাই।

আর একদল লোক আছেন তাঁহারা বলেন—জীবনের নিকৃষ্ট অংশের, সমাজের পতিত ও অন্ত্যজের চিত্র অঙ্কন করিতে পার কিন্তু সাবধান, তাহার প্রতি যেন ধ্বংসের বীজ লুক্কায়িত থাকে। Poetic Justice যেন লেখকের রচনার মধ্যে ব্যক্ত হয় অর্থাৎ যে নৈতিক বিধান ভঙ্গ করিয়াছি তাহার আপাত মাঙ্গল্য সুখের মধ্যেও যেন পরাজয়ের ও দুঃখের ইঙ্গিত থাকে এবং যে পুণ্যাত্মা, তাহার বিহ্বলতার মধ্যেও যেন একটি জয়ের আভাষ লক্ষিত হয়। আমার মনে হয় এই পন্থা অবলম্বন করিলেও সাহিত্য কৃত্রিম হইয়া পড়ে। ইঁহারা জীবনকে অত্যন্ত সংকীর্ণ ভাবে দেখেন; মানুষের হৃদয় যে অসীম রহস্যপূর্ণ তাহার মনোবৃত্তি যে অতীব জটিল, তাহার কর্ম্ম নিয়ামক উদ্দেশ্য যে অতীব বৈচিত্র্যময় ইহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়া মানুষকে অতি সহজভাবে সৎ ও অসৎ এই দুই পরিষ্কার (clear cut) বিভাগে বিভক্ত করেন, এবং পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সাহিত্যে তাহাই বর্ণনা করেন। কিন্তু মানুষকে আমরা যত শীঘ্র বিচার করিয়া তাহাকে তিরস্কার বা পুরস্কার করি—তাহাকে জয় বা পরাজয়ের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করি জীবনে ত সেরূপ বিচার হইতে দেখা যায় না। Job এর সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল দুষ্টের সম্পদ ও শিষ্টের বিপদ সংসারে তাহাই ত অনেক সময়ে আমাদের চক্ষে পড়ে। সুতরাং poetic justice দিয়া আমরা জীবনের যে সমস্যার সমাধান করিতে যাই তাহা বাস্তবিকই অতি সংকীর্ণ। এরূপ করিতে গেলে সাহিত্য অনেক সময়ই মিথ্যা ও অনুদার হইয়া পড়ে।

আমার মনে হয় সাহিত্যের কাজ বিচার করা নয়। শ্রেষ্ঠ artist যিনি, তিনি এক প্রকার ঋষিকল্প—জীবনে যাহা কিছু সত্য তাহা তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে ব্যক্ত করিবেন। মানব-হৃদয়ে যাহা চিরন্তন—দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যে আদিম প্রবৃত্তি, (elemental passions) মানুষকে সংসারে নানা কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছে তাহা লইয়াই সাহিত্যের কারবার। সুতরাং মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক—মানুষের জীবনে নিত্য যাহা ঘটে তাহাকে বর্জ্জন করিতে পারে না। এই জগতের দুইজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক Shakespeare ও Balzac এর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, ইঁহারা পতিতের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—পাপের ও পাপীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন—কিন্তু পাপ পুণ্য অথবা ন্যায় অন্যায়ের বিচার করিয়া তিরস্কার বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন নাই।

রক্ত মাংস ও আত্মা তিনটী লইয়া মানুষ; একদিকে সে ইতর জন্তুর সহিত জাতিত্বে সংশ্লিষ্ট; আর এক দিকে আবার সে অনন্ত আত্মার অংশ—ভগবানের বিশিষ্ট প্রকাশ। তাহার প্রবৃত্তিও তাই অতি জটিল—স্বর্গ ও নরক দুই দিকেই তাহার আকর্ষণ। যিনি শুধু মানুষের নারকীয় প্রবৃত্তির চিত্রই অঙ্কন করেন তিনিও যেমন একদেশদর্শী যিনি আবার তাহাকে দেবতা করিয়াই চিত্রিত করেন তিনিও সেইরূপ সঙ্কীর্ণদৃষ্টি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি মানবহৃদয়ের বিশ্লেষণ হয়, আর্টের লক্ষ্য যদি জীবনের চিত্র প্রদর্শন হয়, তবে তাহাকে জীবনের এই দুই দিক্‌কেই ব্যক্ত করিতে হইবে। ইহাতে যদি সমাজের কোন বিধানের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা

কমিয়া যায়, অথবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে পতিতের জীবনের প্রতি আকর্ষণ জাগিয়া উঠে তাহাতে উপায় নাই। তাই বলিয়া সংসারে যে ব্যক্তি পাপের পিচ্ছিল পথে নরকের দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাঁহাকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করা হইবে না অথবা করিলেই তাহাকে জীবনে পরাভূত করিয়াই বর্ণনা করিতে হইবে এমন কোন দুর্লঙ্ঘ্য বিধান সাহিত্য মানিতে পারে না। কারণ জীবনে প্রকৃতির রাজ্যে এমন কিছু কঠোর নিয়মের আমরা পরিচয় পাই না।

বোধ হয় পতিতার চিত্র যে সব পুস্তকে অঙ্কিত হইয়াছে সেই সব পুস্তক যাঁহারা অস্পৃশ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন তাঁহারা এই সকল কথা ভুলিয়া যান। তাঁহারা বলেন, ভ্রষ্টানারীর প্রতি লেখকের এত সহানুভূতি কেন? শৈবলিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র কত না শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক লেখকগণের রচনায় ভ্রষ্টানারীর সে শাস্তি কোথায়? তাহাদের অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত লেখক করাইলেন? ইঁহাদের মতে যাহারা পতিত—যাহারা সমাজের কোন নৈতিক বিধান ভঙ্গ করিয়াছে তাহারা সহানুভূতির একেবারে অযোগ্য—তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ঘৃণিত করিয়া বর্ণনা না করিলে সমাজের পবিত্রতা রক্ষা হইবে না। বড় হৃদয়হীন কঠোর এই সমস্ত সমালোচক!

কিন্তু আমার মনে হয় সাহিত্যে তাঁহাদের এই মত শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিবে না। যে democratic ideal সাহিত্যে আসিয়াছে তাহারই উত্তরোত্তর স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যাহারা পতিত ও পাপী তাহারাও প্রকৃত বিচারের দাবী করিবে। সমাজের কোন একটি বিধান, নৈতিক কোন একটি নিয়ম অবহেলা করিয়াছে বলিয়াই যে মানুষ একেবারে সর্ব্বপ্রকারে ঘৃণিত বলিয়া গণ্য হইবে, এই বিচারের বিপক্ষে পতিতের অভিযোগ একদিন সমাজকে শুনিতেই হইবে। মানুষের হৃদয়ে সহানুভূতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা বলবতী হইলে একজন আর একজনকে সহজে আর তিরস্কার বা পুরস্কার করিবে না।

জীবনে মানুষের অধঃপতন হয় অনেক প্রকারে—সকল প্রকার অধঃপতনই কি একই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া বিচারিত হইবে? নৈতিক অথবা সামাজিক আদর্শও মানুষ অনেক কারণে অনেক উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভাঙ্গিতে পারে। তাহাদের জীবনের সেই ইতিহাস সেই কৈফিয়ৎ (defence) সেই কাহিনী না শুনিয়াই কি তাহাদিগকে অন্ত্যজ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে? তারপর নীতি বা সমাজের একটি আদর্শ যে ভাঙ্গিয়াছে —আর একটী আদর্শ হয়তো সে নিজ জীবনে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাকে কি আমরা চিরদিন অবজ্ঞাই করিব? একটী বিষয়ে যে জীবনে অতীব অন্যায় করিয়া সমাজ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, আর একটী বিষয়ে যদি তাহার ত্যাগ অসাধারণ হয় তবে তাহাকে শ্রদ্ধা করা কি অন্যায়? সমাজ যাহাদিগকে পরিবর্জ্জন করিয়াছে সাহিত্য যদি তাহাদিগকে এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়া পাঠকের সহানুভূতির উদ্রেক করে তবে কি সে সাহিত্যকে সমাজদ্রোহী বলিয়া তিরস্কার করা উদারতার পরিচায়ক? যিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হইবেন তিনি সংস্কারবর্জ্জিত হইবেন, কোন বিশিষ্ট সমাজের পক্ষে কোন সত্য হিতকারী কি না ইহা বিবেচনা না করিয়া তাঁহার অন্তরতম অনুভূতির দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিবেন তাহাকেই তিনি ব্যক্ত করিবেন। কোন বিশিষ্ট সামাজিক আদর্শ দিয়া নরনারীর বিচার না করিয়া তাহাদের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা সনাতন, যাহা স্বাভাবিক, তাহাকেই গভীর সহানুভূতির সহিত তিনি সাহিত্যে আঁকিয়া দিবেন। অসীম রহস্যপূর্ণ এই জগৎ স্বর্গমর্ত্ত্যের অসংখ্য শক্তির ক্রীড়নক এই মানুষ—পিচ্ছিল ও দুর্গম এই জীবনের পথ—এই কথা মনে রাখিয়া যিনি শ্রেষ্ঠ artist তিনি অগাধ সহানুভূতি ও ক্ষমা লইয়াই মানুষের কার্য্যকলাপ দর্শন ও বর্ণনা করিবেন। পতিতের দুঃখ-সুখ, পতিতের জীবনের কাহিনী তাঁহার রচিত সাহিত্যের বহির্ভূত হইতে পারে না।

যমুনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১।

শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪৪বর্ষ]   শ্রাবণ, ১৩২৭   [৪র্থ সংখ্যা

বিষ্ণু-বাহন গরুড়

[রূপম্-পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-রচিত ইংরাজী প্রবন্ধ অবলম্বনে]

পুরাণোক্ত বিহঙ্গরাজ-রূপে,—নাগকুলের নির্দ্দয় সংহর্ত্তা-রূপে,—এবং বিষ্ণুর বাহন-রূপে, গরুড় (১) হিন্দুর প্রতিমা-তত্ত্বে প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ প্রতিমা-তত্ত্বেও গরুড় সুপর্ণ নামে সুপরিচিত। উভয় স্থলেই তাহার সমুচিত স্থান উপ-দেবতার ভিতর। কিন্তু বিষক্রিয়ার প্রতিষেধ-সাধনে তাহার দৈবশক্তি আছে, এই বিশ্বাসে সময়-বিশেষে মূল দেবতার ন্যায় তাহারও অর্চ্চনা হইয়া থাকে। তন্ত্রসারে গরুড়ের যে পূজাপদ্ধতি আছে, তাহার ধ্যানে (২) গরুড় "পদ্মনেত্রং সুবক্ত্রম্" বলিয়া বর্ণিত।

---

(১) সংস্কৃত সাহিত্যে গরুড় নানা নামে পরিচিত; এতৎ সম্বন্ধে তন্ত্রসারে গরুড়ের স্তব, এবং অমরসিংহ জটাধর, হলায়ুধ প্রভৃতির কোষগ্রন্থে গরুড়ের প্রতিশব্দ দ্রষ্টব্য। সর্ব্বত্রই গরুড় নাগ-নাশক অথবা নাগ-ভক্ষক রূপে অভিহিত। যথা—নাগান্তক, পন্নগাশন (অমরকোষ); উরগাশন (জটাধর); নাগাশন (হারাবলী) ভুজগান্তক (রাজনির্ঘণ্ট)। মধ্যযুগের শিল্পকলায় গরুড়ের প্রতিমা সাধারণতঃ নাগ-ভূষণে ভূষিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(২) বর্ম্মাস্তর-বহ্নি-যুগ্মাক্ষর কমলগতং পঞ্চভূতাদ্যবর্ণং।
ক্লিপ্তকল্পম্ ফণীন্দ্রৈ রভয়বরকরং পদ্মনেত্রং সুবক্ত্রং॥
দুষ্টাহিচ্ছেদিতুণ্ডং স্মরদখিলবিষপ্রোষণং প্রাণভূতং।
প্রাণ-শ্রেণ্যাং ত্রিবেদিতসুমমৃতময়ং পক্ষিরাজং ভজেঽহং॥

গরুড়ের মূলদেবতা রূপে পূজা এখন বড় প্রচলিত নাই; কিন্তু পুরীতে এখনও সময় সময় সর্পদংশন হইতে জীবনলাভের আশায়, সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আনিয়া মন্দিরের সভামণ্ডপের সম্মুখস্থ গরুড়স্তম্ভের সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

গ্রুণওয়েডেল বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষে গরুড়-পক্ষীর প্রতিকৃতি-রচনা অতি প্রাচীন, কিন্তু এই পুরাণবর্ণিত প্রাণীর ধারাবাহিক আলোচনা নিরতিশয় দুরূহ। (৩) গরুড়ের আকারে গঠিত বৈদিক বেদীর উল্লেখ করিতে গিয়া, তিনি সেই প্রাচীন যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে যে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য বুঝিবার পক্ষে যাহার মূল্য আছে বা যাহার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সুনিশ্চিত তিনি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

গরুৎ শব্দের অর্থ পক্ষ। এই গরুৎ-শব্দ হইতেই গরুড় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গরুড় বলিতে যে কোনও পক্ষবিশিষ্ট প্রাণীকে বুঝাইতে পারে। সুতরাং আমাদিগের বর্ত্তমান যুগেও ভারতবর্ষের কোনও কোনও প্রদেশে সর্পভুক ঈগল যে গরুড় নামে অভিহিত হইবে, তাহা বিস্ময়কর নহে। সর্পভুক ঈগল যে ঐরূপ গরুড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা গ্রুণওয়েডেল লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, প্রতিমাতত্ত্বে, বঙ্গদেশের ও যবদ্বীপের শিল্প-কলায় গরুড়ের মূর্ত্তিই আমাদিগের আলোচ্য বিষয়।—এ বিষয় এখনও পণ্ডিত-সমাজের যথাযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

মহাভারতের মতে, সূর্য্য-সারথি অরুণের অনুজরূপে বিহঙ্গের আকারে গরুড়ের জন্ম হয়। অরুণ খঞ্জরূপে জন্মগ্রহণ করায়, গরুড়ই বিহঙ্গকুলের রাজপদ লাভ করে। পরে বিষ্ণু তাহাকে অমর করিয়া দেন এবং আপন বাহন-পদে নিযুক্ত করেন। বিষ্ণু তাঁহার ধ্বজপতাকায় গরুড়ের প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট করিয়া গরুড়কে অধিকতর সম্মান দান করেন। উল্লিখিত পৌরাণিক জন্মকাহিনীতে গরুড়—ভীষণ ও বীভৎস-মূর্ত্তি, অসাধারণ শক্তিশালী বিরাট বিহঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে; এবং ঐশী শক্তিতে গরুড় যে কামরূপী তাহাও উক্ত হইয়াছে। এই পৌরাণিক বর্ণনা শিল্পীর মূর্ত্তিকল্পনার স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিয়াছে, এবং ভারতীয় শিল্পীগণও তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া প্রয়োজনোচিত মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, পরিশেষে তাহাই শিল্পকলার সূত্রাদেশে এক অপরিবর্ত্তনীয় আকারে সন্নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা পুরাণোক্ত বিহঙ্গাকারের বহু অর্থদ্যোতক পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করেন, এবং এইরূপে আকার ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে গরুড় এক চঞ্চুবৎ-নাসিকা-বিশিষ্ট বৃত্তনেত্র পক্ষযুক্ত মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল হিন্দু শিল্পের নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার ভিতর এমন কোনও গরুড় মূর্ত্তি পাই নাই যাহাকে সত্য সত্যই প্রাচীন বলা যাইতে পারে এবং পুরাণোল্লিখিত আকারের সহিত যাহার আকারের পার্থক্য নাই। সাঁচীর পূর্ব্ব দ্বারের দ্বিতীয় প্রস্তর-ফলকের ভিতর দিকে

(৩) Buddhist Art in India, Revised and enlarged by Burgess, পৃষ্ঠা ৭ শুল্বসূত্রে বেদিনির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সহায়তায় বেদিনির্ম্মাণ ও বেদীর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ভিত্তিগাত্রে বোধিদ্রুমকে পরিবেষ্টন করিয়া যে ভক্ত জীবজগৎ অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার ভিতর টিয়াপাখীর মত যে প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে গ্রুণওয়েডল গরুড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৪) হিন্দুর মূর্ত্তিশিল্পে কিন্তু টিয়াপাখীর আকারবিশিষ্ট গরুড় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, বা ঐরূপ কোন মূর্ত্তির পরিকল্পনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তথায় অবশ্য গরুড়ের পৌরাণিক জন্মকাহিনীর ও গরুৎমান্ দ্বিপদদিগের সহিত জন্ম-সম্পর্কের পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্ত পক্ষ দুইখানি শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আকার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া মানুষের রূপই পরিস্ফুট করিয়াছে, এবং পরিশেষে বাঙ্গালার মধ্যযুগের শেষাংশের শিল্পকলায়, পুরাণের বিহঙ্গ—গরুড়, শিল্পশাস্ত্রের আর্য্যার বর্ণিত অর্দ্ধমনুষ্যীভূত জীব—গরুড়, মহাপ্রভু বিষ্ণুর পরিচর্য্যানিরত আদর্শ ভক্তরূপে পরিকল্পিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরাণের বর্ণিত ও শিল্পশাস্ত্রের নিয়মিত আকার হইতে এই যে পরিণত বিকাশ-ঘটিত পার্থক্য, তাহাই শিল্পাদর্শের স্বতন্ত্রতা সূচিত করিতেছে, এবং এই বিকাশের লীলাক্ষেত্রের নামানুযায়ী ইহাকে গৌড়ীয় শিল্পাদর্শ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের লিপিবদ্ধ বিধানে আমরা গরুড়ের যে বর্ণনা প্রাপ্ত হই, তাহাতে গরুড় বৃত্তনেত্র ও বৃত্তমুখ, তাহার নাসিকা কৌশীকাকার, গৃধ্রের ন্যায় তাহার পদদ্বয়, চতুর্হস্তের দুইখানি ছত্রধারণরত ও অপর দুইখানি সানুনয়ে অঞ্জলীকৃত। (৫) আবার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে

(৪) তার্ক্ষ্যো মারকতপ্রখ্যঃ কৌশিকাকার-নাসিকঃ।
চতুর্ভুজস্তু কর্ত্তব্যো বৃত্তনেত্র-মুখস্তথাঃ॥
গৃধ্রোরুজানুচরণঃ পক্ষদ্বয় বিভূষণঃ।
প্রভাসংস্থানসৌবর্ণঃ কলাপেন বিবর্জ্জিতঃ॥
ছত্রঞ্চ পূর্ণকুম্ভঞ্চ করয়োস্তস্য কারয়েৎ।
করদ্বয়ন্তু কর্ত্তব্যং তথাস্য রচিতাঞ্জলিঃ॥

মুদ্রিত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর হইতে (৩য় ভাগ, ৪৪ অধ্যায়) এই বর্ণনা উদ্ধৃত হইল। গোপীনাথরাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography নামক গ্রন্থে (১মখণ্ড, ২য় ভাগ, মূল, ১৩ পৃষ্ঠা) এই বর্ণনা কিঞ্চিৎ পাঠান্তরিত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার পাঠে 'কলাপেন বিবর্জ্জিত' স্থলে 'কলাপেন বিরাজিত' দৃষ্ট হয়। কলাপশব্দ এস্থানে পুচ্ছার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শিল্পশাস্ত্রের বিধান,—পক্ষদ্বয় রাখিয়া, পুচ্ছকে লুপ্ত করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং গোপীনাথ রাও-র উদ্ধৃত পাঠ ভ্রমাত্মক, উহার সংশোধন কর্ত্তব্য।

(৫) যদাস্য ভগবান পৃষ্ঠে ছত্র-কুম্ভধরৌ করৌ।
ন কর্ত্তব্যৌ তু কর্ত্তব্যৌ দেবপাদধরাবুভৌ॥
কিঞ্চিল্লম্বোদরঃ কার্য্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।

এস্থলে গোপীনাথ রাও 'দেবপাদধরৌ শুভৌ' পাঠ ধরিয়াছেন। 'সর্পাভরণভূষিত' মুদ্রাঙ্কনপ্রমাদে "সর্ব্বাভরণভূষিত" হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ শ্রীতত্ত্বনিধি প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে 'ফণিমণ্ডিত' দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল গরুড়মূর্ত্তি বিষ্ণুর অনুচর রূপে বিরাজমান, তাহাদের সম্বন্ধেই সর্পাভরণ উল্লিখিত হইয়াছে,—কিন্তু যে

ইহাও আছে,—বিষ্ণু যখন গরুড়ের পৃষ্ঠারূঢ়, তখন তাহার দুইখানি মাত্র হস্ত থাকিবে ও তারা প্রভুর চরণসংলগ্ন রহিবে। অপর এক শাস্ত্রকারের মতে,—গরুড়কে বিষ্ণুর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, তাহার দক্ষিণ জানু ভূস্পৃষ্ট করিয়া আসীন করিতে হইবে, তাহার আকার মানুষের আকার হইবে,—কেবল থাকিবে পাখীর ন্যায় পক্ষ ও তুঙ্গনাসা। (৬)

এই সকল নির্ম্মাণ-ব্যবস্থা হইতে,—পৌরাণিক রূপ, ক্ষেত্র-বিশেষের প্রয়োজনানুযায়ী কিরূপ পরিবর্ত্তন লাভ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে শিল্পকলার নানা পরিকল্পনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গরুড় যখন মূল দেবতারূপে সম্পূজিত, তখন দেবত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত তাহার চারি হস্ত; তাহার পক্ষদ্বয়ের, গৃধ্রপদের এবং তুঙ্গ নাসিকার কোনও পরিবর্ত্তন নাই। গরুড় যেখানে প্রভুর সম্মুখভাগে অবস্থিত, অথবা সত্যসত্যই প্রভুর পরিচর্য্যায় নিয়োজিত, সেখানে তাহাকে আরও মানুষ গড়িয়া তুলা হইয়াছে, থাকিয়া গিয়াছে মাত্র পক্ষদ্বয় ও নাসিকার তুঙ্গত্ব। এই সকল রূপান্তর প্রয়োজনের দ্বারা অনুশাসিত হইয়াছে, এবং ভাবতান্ত্রিক শিল্পানুশীলন কাজে কাজেই বস্তুতান্ত্রিক শিল্পানুশীলন অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পুরাণে বিহঙ্গাকারের ব্যবস্থা থাকিলেও, পরবর্ত্তী হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের বিধান তাহা বিশেষ গ্রাহ্য করে নাই—শিল্পশাস্ত্রে কোনস্থলেই পৌরাণিক রূপ আমূল অনুকৃত হয় নাই। এই কারণেই, পৌরাণিক হিসাবে বিষ্ণুর স্থান গরুড়ের পৃষ্ঠে না হইয়া গরুড়ের স্কন্ধে হইয়াছে।

ভারতীয় প্রতিমা-শিল্পে গরুড়ের রূপান্তর লইয়া গ্রুণওয়েডল প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রসঙ্গান্তে তিনি সরাসরি ভাবে আপনার মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"এদেশের টিয়া ও পশ্চিম এসিয়ার গ্রিফিন—এতদুভয় হইতে আধুনিক প্রতিমা-শিল্পের গরুড়-মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছে।"

ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের গরুড়ের রূপের সহিত উহাদের কাহারও উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রিফিন কাল্পনিক জীব মাত্র,—সিংহ ও ঈগল হইতে তাহার জন্মলাভ ঘটিয়াছে বলিয়া উক্ত হয়। গ্রিফিনের প্রতিমূর্ত্তিতে পক্ষ, চঞ্চু ও চতুষ্পাদ

স্থলে গরুড় মূল দেবতারূপে সম্পূজিত তথায় তাহার সুবিদিত নাগান্তক প্রকৃতিই রক্ষিত হইয়াছে; এই অসামঞ্জস্য প্রণিধানযোগ্য।

(৬) উপেন্দ্রস্যাগতঃ পক্ষী গুড়াকেশঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
সব্যজানুগতো ভূমৌ মূর্দ্ধা চ ফণিমণ্ডিতঃ॥
স্থূলজঙ্ঘো নরগ্রীব স্তুঙ্গনাসো নরাঙ্গকঃ।
দ্বিবাহুঃ পক্ষযুক্তশ্চ কর্ত্তব্যো বিনতাসুতঃ॥

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহাগারে যে সকল শিলাময় গরুড় মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহারা আলীঢ় বা প্রত্যালীঢ় লীলায় আসীন,—সাধারণতঃ তাহাদিগের বামজানুই ভূমিস্পর্শ করিয়া আছে। সর্পাভরণের কথা শিল্প-সূত্রেই দৃষ্ট হইবে, উহা পৌরাণিক বর্ণনায় নাই; ইহা হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে, শিল্পই আপন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত উহার নব-প্রচলন করিয়াছে।

যবদ্বীপের গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তি
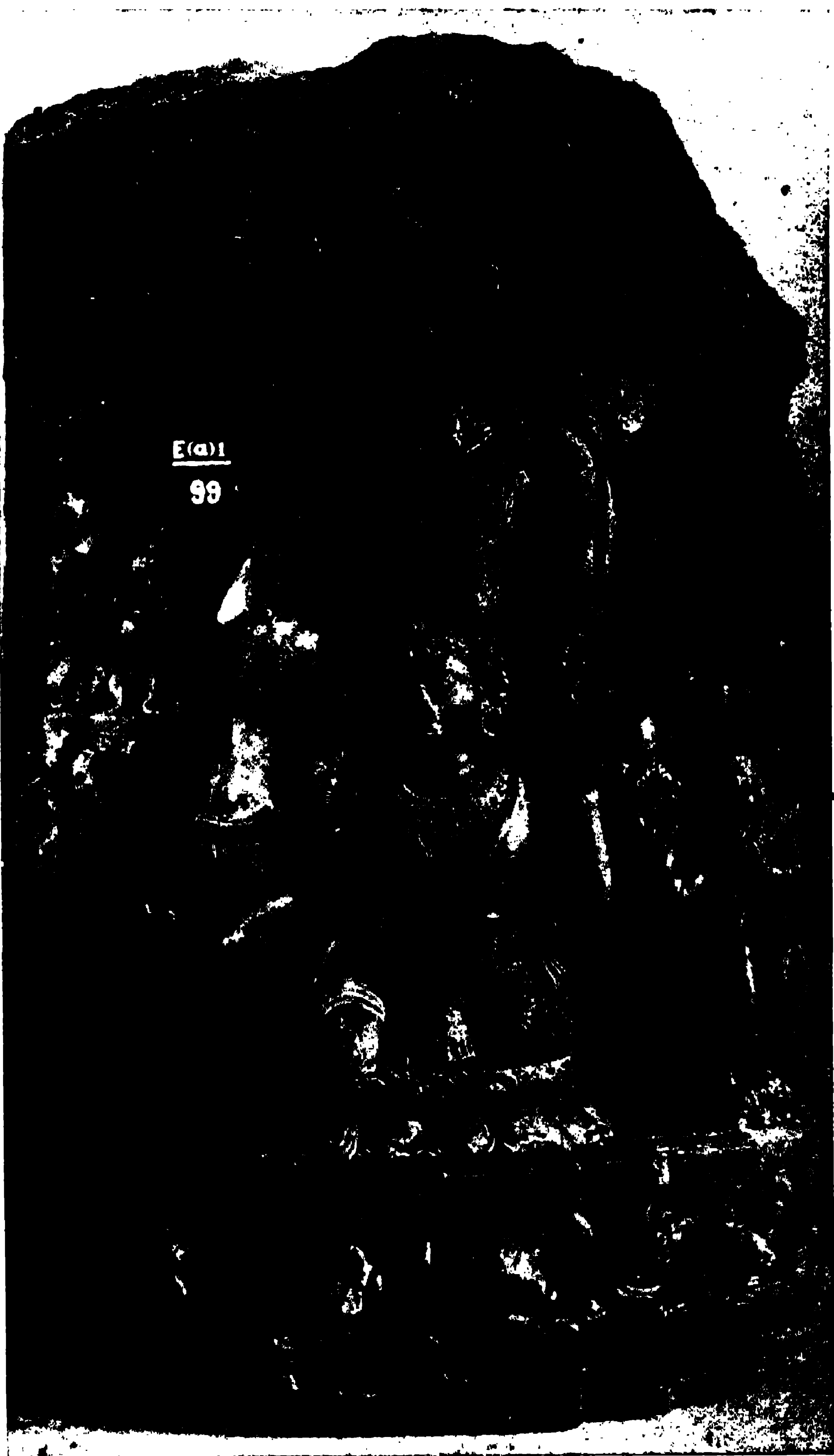
বরেন্দ্রের গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তি

দৃষ্ট হয়,—গ্রিফিনের উপরার্দ্ধ ঈগলের ন্যায়, নিম্নার্দ্ধ সিংহের ন্যায়। নিসর্গে সিংহের পক্ষ নাই; সিংহে পক্ষসংযোগই—গ্রিফিনের বিশেষত্ব। পক্ষবান্ দ্বিপদ ও সলাঙ্গুল চতুষ্পদ,—এতদুভয়ের সহযোগে গ্রিফিন-রূপে বরং এক জীবসঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত-বর্ষীয় গরুড়ের রূপান্তরের বিবরণ মূলতঃই অন্যরূপ—গরুড় তথায় ক্রমশঃ মানবীকৃত হইয়াছে, অযাচিত কল্পনার সাহায্যে কিম্ভূত-কিমাকার জীবে পরিণত হয় নাই। মূল কল্পনাতেই এইরূপ সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকায় রূপান্তরের আলোচিত মূল সূত্রটিকে প্রকৃত অপেক্ষা কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই অধিক মনে হইবে। যাহা হউক, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে উদ্ভব কাহিনী অপেক্ষা ক্রমবিকাশ কাহিনীর স্থানই অধিক; এবং এ বিষয়ে গরুড়ের ক্রমিক রূপান্তর বিশেষভাবে অনুশীলন-যোগ্য,—উহার আলোচনায় ইহাই দৃষ্ট হইবে যে, জন্মমুহূর্ত্তের বাহ্য-বিষয়গত বস্তুতন্ত্রতাকে জ্ঞানাঞ্জনদীপ্ত ভাবতন্ত্রতা ধীরে ধীরে হইলেও নিঃসংশয়রূপে পরাজিত করিয়াছে।

প্রাচীনতম বিবরণে, যথা—বৈদিক বেদিনির্ম্মাণ ব্যাপারে, শুল্বসূত্রের লিখিত মত "পক্ষ বাঁকাইয়া, পুচ্ছ বিস্তার করিয়া" গরুড় স্বর্গাভিমুখে উড্ডীয়মান হইয়াছে, এরূপ কল্পনা ও প্রতিকৃতিই সুসঙ্গত হইয়া থাকিবে। সে স্থলে মানবীকরণের কোনও প্রয়োজনই অনুভূত হইতে পারে না, কারণ সে স্থলের একমাত্র ক্ষেত্রানুকূল কল্পনাই স্বর্গারোহনের কল্পনা, এবং সে কল্পনার প্রভাবের পরিমাণও কম নহে; বিহঙ্গাকার বেদীতে যজ্ঞ করিলে যজ্ঞানুষ্ঠাতার স্বর্গারোহন ঘটিবে, এইরূপ বিশ্বাসই ঐরূপ বেদীনির্ম্মাণ ব্যবস্থার মূলীভূত হেতু।

বিষ্ণুর অধীনে গরুড়ের ভৃত্যত্ব—অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী পৌরাণিক কল্পনা; এবং এইরূপ কল্পনা-হেতুই গরুড়কে মানবাকারে গঠিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। গরুড় জন্মাবধিই ভৃত্য নহে। পক্ষিরূপে বহুবার সে আপনার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছে। চিরযৌবনের ও অমরত্বের বরলাভ করিয়া, অধিক বয়সে গরুড় বিষ্ণুর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। পক্ষীর আকারের ভিতর দিয়া এই কর্ম্মের অর্থাৎ পরিচর্য্যার' ভাবকে তেমন সুব্যক্ত করা যাইত না, ন্যূনাধিক মনুষ্যাকারই সে ভাব পরিস্ফুট করিবার পক্ষে অধিকতর সুসঙ্গত ও সমীচিন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং এই রূপান্তর-পদ্ধতি উদ্দেশ্যেরই অনুগমন করিয়া আসিয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয়; পাশ্চাত্য এসিয়ার শিল্পাদর্শের সহিত, অথবা উদ্দাম কল্পনার অবারিত প্রশ্রয়-পুষ্ট যে আদর্শ পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল—তাহার সহিত, উপরোক্ত ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির কোনই সাদৃশ্য নাই। প্রাণপণ পরিচর্য্যার ও অবিচলিত অনুরাগের যথোচিত ভাব-ব্যঞ্জনার নিমিত্ত গরুড়ের করদ্বয়কে যখন কৃতাঞ্জলিবদ্ধ করা হইল, তখনও বিহঙ্গের ন্যায় তাহার পক্ষ থাকিল, চরণদ্বয়েরও কোন পরিবর্ত্তন হইল না। ক্রমে যখন পদদ্বয়ের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহা করদ্বয়ের সহিত সামঞ্জস্য লাভ করিল, নয়ন ও নাসিকা তখনও তাহাদিগের আদিম মূর্ত্তি ধারণ করিতে থাকিল, সমুচিত সামঞ্জস্য

সাধিত হইতে সুতরাং দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইল। এ কারণে মধ্যযুগের শেষাংশের পূর্ব্বে গরুড় মনোমোহন মানব মূর্ত্তিতে আসিয়া উপনীত হয় নাই। গৌড়ীয় প্রদেশে ও সুচিরপ্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার পাল-সাম্রাজ্যের অধীনে যে সকল প্রদেশ উহার শিল্প-প্রভাবের অধীন ছিল তৎসমুদয় প্রদেশে, আমরা ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। বরেন্দ্রে (উত্তরবঙ্গে) প্রাপ্ত এবং রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহালয়ে রক্ষিত একটি নিদর্শনের ছবি উদাহরণ স্বরূপ প্রকাশিত হইল।

সাধারণ' শ্রেণীর বিষ্ণুমূর্ত্তিতে, গরুড়কে মূর্ত্তির পাদপীঠে আলীঢ় বা প্রত্যালীঢ় ছন্দে এক জানু উন্নত ও অপর জানু ভূস্পৃষ্ট করিয়া পরম ভক্তের ন্যায় কৃতাঞ্জলি করে আসীন দেখা যায়। বিষ্ণুমন্দিরের অভ্যন্তরে বা সম্মুখে স্তম্ভের উপর যে সকল গরুড়মূর্ত্তি বিষ্ণুমুখী হইয়া প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগেরও আসন এই প্রকারের, ইহা হইতেই মূল কল্পনা উদ্ভূত হইয়া খুটিনাটি বিষয়ের সুবিন্যাস ব্যবস্থাকে নিয়মিত করিয়াছে, কিন্তু এস্থলেও পুরাণ-সৃষ্ট নানা বিপদে শিল্প বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে আদর্শ ভক্ত, সর্ব্বজীবেই তাহার প্রেম সমভাবে উচ্ছ্বসিত হইবে, কাহারও প্রতি বৈরিতা থাকিবে না; গরুড় নাগকুলের পরম শত্রু, নাগকুলের নির্দ্দয় অন্তক, সুতরাং তাহার এই বৈরী-ভাবের সম্যক পরিবর্ত্তন প্রকাশোপযোগী সমুচিত শিল্পব্যবস্থার আবিষ্কার না হইলে, গরুড়কে আদর্শ ভক্তের আধ্যাত্মিক মণ্ডলে উন্নীত করা সম্ভব হইত না। গরুড়ের অহি-ভূষণের ব্যবস্থা করিয়া, ও একখানি নাগ-ফণাকে বিশিষ্টভাবে তাহার শিরশ্চূড়ারূপে স্থাপিত করিয়া, শিল্পসূত্র সৌভাগ্যক্রমে এই অসাধ্য-সাধন করিয়াছে। সত্যসত্যই ইহা শিল্পের জয়; কিন্তু যাঁহারা ইতিহাসের পাঠক, তাঁহারা ইহার ভিতর বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষার একটি প্রচ্ছন্ন প্রভাব আবিষ্কার করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারেন,—মনে করিতে পারেন, সেই শিক্ষাদীক্ষার পরিণাম-ফলেই গরুড় ও তাহার চিরশত্রুর ভিতর মৈত্রী পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, ভক্তের ভাব হইতেই এই আদর্শের উৎপত্তি, এবং এই আদর্শ মধ্যযুগের পরার্দ্ধে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর-দেশে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, কারণ গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে পুরুষ-পরম্পরাগত কিম্বদন্তী কল্পনারই প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভক্তজনের অবিচলিত ভক্তিই আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে,—ইহাই চিরাগত বিশ্বাস; পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্ম্মশাস্ত্রও সমভাবে ভক্ত ও তাহার ইষ্টদেবতার একত্ব প্রতিপাদক ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করিয়া, মানব-সাধারণের মুক্তি-মার্গ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। উল্লিখিত ধর্ম্মমতে ভক্ত কখনও কখনও তাহার ইষ্ট দেবতা-পেক্ষাও শক্তিশালী বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কারণ ভক্তের কামনা যতই অসঙ্গত হউক না কেন, ভক্ত তাহা অনায়াসে তাহার ইষ্ট দেবতার দ্বারা পূর্ণ করাইয়া লইতে পারে।

বরেন্দ্রের গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু-মূর্ত্তি আধ্যাত্মিক পরীক্ষার শিল্পচাতুর্য্যসমৃদ্ধ প্রতিমা ' বলিয়া গৃহীত হইতে পারে,—উহাতে শিল্পচাতুর্য্যের বিজয়বার্ত্তাই কীর্ত্তিত রহিয়াছে। গরুড়ের

এই মূর্ত্তি, পুরাণ-বর্ণিত মূর্ত্তি হইতে অন্যরূপ, এবং উহার বিশিষ্ট বৈসাদৃশ্য শিল্পীর সাহসিকতারই পরিচয় প্রদান করে; কারণ পুরাণের মতে, প্রভু যখন ভৃত্যের সহন-শক্তির পরীক্ষার নিমিত্ত তাহার পৃষ্ঠে আপন বাহু অর্পণ করিলেন, গরুড় তাহা ধারণ করিতে পারিল না। পুরাণের এ কাহিনী আদৌ গরুড়ের বিজয়ের কাহিনী নয়, ইহা সম্পূর্ণ পরাজয়ের কাহিনী। বরেন্দ্রের নিদর্শনে বিষ্ণুর বাম জানু গরুড়ের বামস্কন্ধে এরূপভাবে স্থাপিত হইয়াছে যে প্রভু যেন ভার-বেগ সেই স্কন্ধেই সংন্যস্ত করিয়াছেন; এবং গরুড় তাহাই আপন বাম করতলের সাহায্যে সুকৌশলে যোগ্যতার সহিত উর্দ্ধ-ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কষ্টের বা অসুবিধার অণুমাত্র চিহ্ন ব্যক্ত না করিয়া, আপন সামর্থ্যে আপনার বিশ্বাস হেতু যেন হাসিতে হাসিতে, আপনার অবিচলিত ভক্তির বিজয় সাফল্যের শুভমুহূর্ত্তে, প্রভুকে স্কন্ধে করিয়া গরুড় যেন উড্ডীয়মান্ হইবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে। এ চিত্র শক্তি ও কর্ম্ম-ব্যঞ্জক, এবং ঐরূপ ব্যঞ্জনাই ইহাকে সৌম্য ও মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। গরুড়ের স্ফীত বক্ষ তাহার অদম্য সহিষ্ণুতার শক্তি প্রকাশ করিতেছে; এবং তাহার পদদ্বয়ের ও চরণাঙ্গুলীর বিন্যাস-ব্যবস্থায় তাহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও এ প্রতিমায় বিষ্ণুকেই মূল দেবতা ও গরুড়কে তাহার বাহনমাত্ররূপে প্রদর্শন করিবার কথা, তথাপি শিল্পীর হৃদয়াবেগ মূল মূর্ত্তিকে কথঞ্চিৎ পশ্চাতে ফেলিয়া গরুড়কেই পদ্মাসনে বসাইয়া দিয়াছে এবং তাহাকেই লোক-লোচনের প্রথম বিষয় করিয়া আপনার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছে। শিল্পী যে মুহূর্ত্ত নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহার তক্ষণ-যন্ত্রের পক্ষে তদপেক্ষা শুভমুহূর্ত্ত আর হইতে পারিত না। এ মুহূর্ত্ত—উড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত, এ মুহূর্ত্তে আকস্মিক ভারবেগের প্রথম পরিণাম অতিক্রান্ত ও বিস্মৃত হইয়াছে, এ মুহূর্ত্তে আপন সাফল্যচিন্তায় বাহনের হৃদয় বিশ্বাসে ও আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বিষ্ণু গরুড়ের স্কন্ধে আত্মনিমগ্নরূপে সমাসীন, দক্ষিণ করতল সম্মুখে প্রসারিত—যেন তিনি ভৃত্যেরই জয় স্বীকার করিয়া আশীর্ব্বাদ-চ্ছলে গরুড়ের প্রশংসা করিয়াছেন ও তাহাকে উৎসাহদান করিতেছেন।

গোপীনাথ রাও তাঁহার গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের যে দুইটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, তদপেক্ষা বরেন্দ্রের নিদর্শন-খানিকেই অধিকতর সুব্যবস্থ বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণ ভারতের বিষ্ণু গরুড়ের স্কন্ধে চড়িয়া দুই দিকে দুই পা নামাইয়া দিয়া রেকাবদলের মত গরুড়ের হাতে তাহা রাখিয়াছেন। ইহা স্পষ্টতঃই শিল্পপ্রয়োজনা-পেক্ষী নহে, ইহা শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুগ মাত্র। শাস্ত্রের বিধান প্রতিপালন করিতে গিয়া, এই চিত্র উড্ডয়ন-কল্পনার সহিত অসামঞ্জস হইয়াছে; এবং ইহাতে বিষ্ণুর দেহ-ভঙ্গিমায় তেমন মহিমান্বিত ভাব পরিব্যক্ত হয় নাই। যবদ্বীপের যে গরুড়-বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকাশিত হইত, দক্ষিণ ভারতের নিদর্শন অপেক্ষা বরেন্দ্রের নিদর্শনের সহিত তাহার অধিকতর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যবদ্বীপে, ঔপনিবেশিক স্বাধীনতায়, শিল্পচাতুর্য্য

আকস্মিক ভাবাবেগের মুহূর্ত্তটি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া গরুড়কেই সমধিক মুখ্যস্থান প্রদান করিয়াছে। কষ্টানুভূতির প্রথম মুহূর্ত্তের ভাব-প্রকাশের পক্ষে, অমানুষিক মুখাবয়ব, ব্যাত্ত বদন, ও কতক মানুষের ও কতক গৃধ্রের মত—অদ্ভুত পদদ্বয়, সুসঙ্গত হইয়াছিল। গরুড়ের হস্তে বিষ্ণুর চরণ রক্ষিত হইবার চিরাগত বিধান লঙ্ঘিত হইয়া বিষ্ণুর যে মর্য্যাদান্বিত ভাব হইয়াছে, এবং আকস্মিক ভাব-বেগে দৃশ্যতঃ পরাজিত হইয়াও গরুড়ের দৃশ্যমান উড্ডয়ন চেষ্টায় বাহনের স্থান যে মুখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—যবদ্বীপের প্রতিমার উল্লেখযোগ্য লক্ষণ সমূহের মধ্যে এই দুইটি লক্ষণই যবদ্বীপের শিল্পাদর্শের সহিত বাঙ্গালার শিল্পাদর্শের সম্পর্ক বিজ্ঞাপিত করে। পরিচ্ছদের ও অলঙ্কারের গঠন-বিন্যাস-সাদৃশ্য ও উভয়ত্র বিষ্ণুর একই মধুর ভাব—ঐরূপ সম্পর্কের সমর্থন করে। এই উভয় দেশ মধ্যে সুদূর-বিস্তৃত সমুদ্র ব্যবধান থাকিলেও, আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে,—পুরাকালে বাঙ্গালার সহিত যবদ্বীপের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তখন বাঙ্গালার সমুদ্রতীরবাসী নির্ভীক নাবিকগণ অর্ণবযান লইয়া সুদূর চীন পর্য্যন্ত গমনাগমন করিত, এবং বাণিজ্যের ও ধর্ম্মপ্রচারের প্রচেষ্টার সহিত জন্মভূমির শিল্পাদর্শ ও শিক্ষাদীক্ষা দূরদূরান্তরেও নীত হইত। পৃথিবীর এইরূপ দুইটি সুদূরব্যবহিত দেশের শিল্পাদর্শ সদৃশ হইবার উহাই হেতু।

উল্লিখিত দুইটি নিদর্শনে গরুড়ের আকার একরূপ নহে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে বৈসাদৃশ্য মাত্র আকারগত, উহা পরিকল্পনার প্রাণেও ছন্দে প্রসারিত হয় নাই। শিল্পের আকাঙ্ক্ষা যে উভয়ত্রই এক মৌলিক সাদৃশ্য ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিবার নহে। উভয়ত্রই একটা দ্বন্দ্বকে আকারিত করিবার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান,—একত্র, কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ও সম্পাদন-সাফল্য, অন্যত্র, তাহারই কথঞ্চিৎ পূর্ব্বাবস্থা। একই ঘটনার কর্ম্মোদ্যমের ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্ত অবলম্বন করিয়া একই শিল্পাদর্শের দিকে ধাবিত হইতে গিয়া এইরূপ হইয়াছে। এই একই কারণে, প্রয়োজন-বশতঃই বাহ্যিক আকারে বৈসাদৃশ্য ঘটিয়াছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া আকারকেও সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল করিতে হইয়াছে। এ সঙ্গীত উভয়ত্রই এক—সুরে, রসে, ভাবে এক, যাহা-কিছু পার্থক্য কেবল কথায়। যবদ্বীপে ও বাঙ্গালায়, মূল বিষয় ভাবতন্ত্রানুগত। অতীতের পুরুষ-পরম্পরাগত বিধি নিষেধ নবীন আলোক-প্রবেশের পথ প্রায় রুদ্ধ করিয়া যে চিরাচরিত সংস্কারমূলক প্রাকার উত্তোলন করিতেছিল, তাহার বন্ধন হইতে মধ্যযুগের শেষাংশে ঐ মূল বিষয় আপনাকে কতকাংশে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল। অবশেষে সেই প্রাকার ভেদ করিয়া নূতন আলোক মধ্যযুগের শিল্পাদর্শের উপর আসিয়া পড়িল ও নবজীবনের প্রাচুর্য্যে তাহাকে মণ্ডিত করিয়া দিল; ভারতের মধ্যযুগের শিল্পসম্বন্ধে সুধী সমালোচকবৃন্দ ক্রমাবনতি ব্যতীত আর কিছু স্বীকার না করিয়া আপনাদিগের চূড়ান্ত মত প্রকাশ করিলেও, অদ্যাবধি আবিষ্কৃত বহু নিদর্শনে উপরোক্ত ব্যাপার

নিঃসংশয়রূপ লক্ষিত হইবে। মধ্যযুগের শিল্পে ক্রমাবনতি ব্যতীত যে আর কিছুই নাই,—এ মত প্রথম ফার্গুসন প্রচার করেন, কিন্তু নির্ভয়ে এমন মত প্রচারের উপযোগী প্রচুর উপকরণ তাঁহার ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না; ফার্গুসনের এই মত লইয়া যে মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, সহসা তাহার বিনাশ নাই। ইঁহাদের মতে,—ভারতের শিল্পের ইতিহাস—শিল্পের অবনতির যুগের ইতিহাস; এ অবনতি গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর আরব্ধ হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কোনও যুগ পুনর্জ্জীবনের পুনরাভিষেক করা দূরে থাকুক, ঐ অবনতির গতিরোধ করিতেও সমর্থ হয় নাই। তাহার পর বহু উপকরণ সংগৃহীত হইয়া এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত সন্দেহের অবতারণা করিয়াছে। বিজ্ঞানে 'চূড়ান্ত বাক্য' বলিয়া কিছু নাই; আমাদিগের পক্ষেও, নূতন নিদর্শন নিচয় যথাযোগ্যরূপে শ্রেণীবদ্ধ ও প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত মত-বিশেষে আত্মসমর্পণ না করিলেই ভাল হইত।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় জীবনের কার্য্যতঃ পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল, ইহা প্রমাণ-নিরপেক্ষ অনুমান মাত্র, এবং এবংবিধ অনুমানের উপর শিল্পের অবনতি সম্বন্ধীয় মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে ইহা একরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালার পালরাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা যে রাজনীতিক উন্নতির আবাহন ঘটিয়াছিল, তাহারই পশ্চাদনুসরণ করিয়া জাতীয় সমুত্থান ও পুনর্ব্বার সূচিত হইয়াছিল, ইহার ফলে শিল্পক্ষেত্রেও নবজীবনের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ এই যুগের শিল্পই তাহার আপন স্থায়ী প্রভাব সুদূর তিব্বত, চীন, জাপান ও প্রশান্তসাগরের দ্বীপাবলীতে বিকীর্ণ করিয়াছে। সুতরাং এই যুগের শিল্প-সম্বন্ধীয় আলোচনাই ভবিষ্যতে বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে, এবং কোনওরূপ সংস্কারান্ধ না হইয়া এতদ্বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। লামা তারানাথের গ্রন্থ নিবদ্ধ একটি কিম্বদন্তী হইতে এবং বরেন্দ্রের স্বদেশপ্রেমিক কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর একটি প্রস্তাবনা হইতে আমরা বাঙ্গালার শিল্পের পুনর্জ্জীবন বিষয়ক সাহিত্যিক প্রমাণ প্রাপ্ত হই, কিন্তু ঐ পুনর্জ্জীবনের নিঃসংশয় প্রমাণ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত পাষাণপ্রতিমা সমূহ। তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই নিমেষেই বুঝিতে পারা যাইবে,—প্রাচীন আকারকে নূতন টীকায় ও ভাষ্যে সমৃদ্ধ করিবার যে একটা চেষ্টা হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতৎসম্পর্কে যাহা-কিছু সাফল্যলাভ ঘটিয়াছিল, তাহা ভারতীয় শিল্পের অতীত কীর্ত্তিকে পরাজিত করিতে না পারিলেও, তাহাকে শিল্পের পুনর্জ্জীবন লাভের নবীন চেষ্টা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; এবং ইহার ভিতর দিয়াই বঙ্গদেশের ও যবদ্বীপের শিল্পাদর্শের মধ্যে এক মুখ্য সম্পর্ক-সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারিবে।

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়।
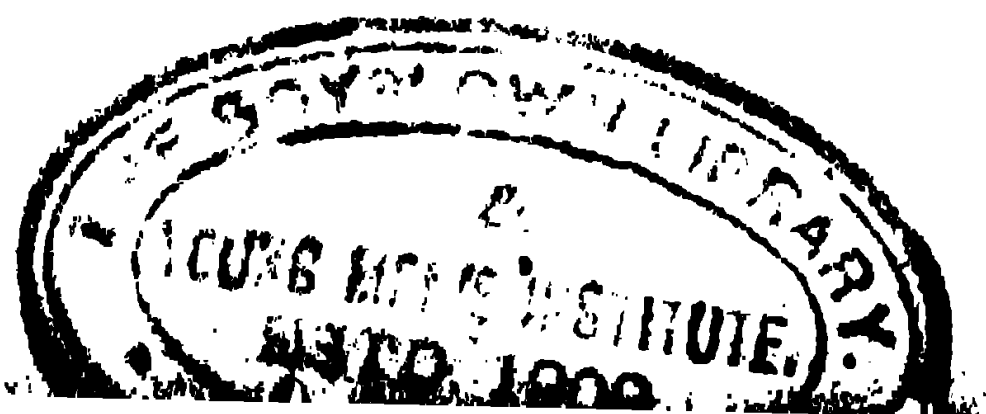
মার্জ্জনা

ডাঃ হারাধন দত্ত এম-এ, এল-এল-ডি কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন; জাতিতে সুবর্ণ-বণিক, ধনে কুবের। হারাধন আমার বড় অন্তরঙ্গ ছিল। অল্প বয়সে তার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে; মিনি তার একমাত্র সন্তান। হারাধন আর বিবাহ করে নি—বেচারা এই মেয়েটিকে তার জীবনের অবলম্বন করেছিল। মিনির সুশিক্ষার জন্যে দত্ত অকাতরে অর্থ ব্যয় করত। সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান পড়াবার জন্যে তিনজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন—তার উপর চিত্র-বিদ্যা আর সঙ্গীত শেখাবার জন্য একজন ফরাসী বিদুষী। লোকে দত্তকে এই নিয়ে কত ঠাট্টা-তামাসা করত। দত্ত কিন্তু কিছুতেই দমত না; সে বলত, আমার টাকা—আমার পাঁটা, যদি ল্যাজের দিকেই কাটি ত লোকের কি? লোকে ভাত হজম করবার জন্যে পর-চর্চ্চা করে। লোকের কথায় যদি মানুষের গায়ে ফোস্কা পড়ত ত' ভয় করবার কথা ছিল! বলতে দাও না ভাই! তুমি যা কর্ত্তব্য মনে করচ, করে চলে যাও—আত্মা যাতে তৃপ্তি পায়, জগৎ তাতেই তৃপ্ত হতে বাধ্য!

হারাধনের একটা ভীষণ বদ্ অভ্যাস ছিল যে সে অষ্টপ্রহর সিগারেট খেত—ডাক্তারেরা অনেক দিন অনেক মানা করেচেন; কিন্তু সে-সব কথায় সে কর্ণপাতও করত না। তার ফলে গলায় ক্যান্সার হলো। দিন কতক ভুগে সে সমস্ত রোগকে অতিক্রম করে পরম শান্তির দেশে চলে গেল। যাবার সময় মিনিকে আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে গেল। অতুল সম্পত্তি আর এই মেয়েটির ভার নিয়ে আমি তার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করেছিলুম। যখনি তার কথা মনে করি, তখন স্পষ্ট আমার চোখের সাম্‌নে ফুটে ওঠে তার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বড় বড় সেই চোখদুটি আর রোগক্লিষ্ট শুকনো দুই গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়চে—আহা!

তার পর মিনিকে আমার ঘরে নিয়ে এলুম। বেঁটে-খাটো মেয়েটি—বাপের চোখ দুটি হুবহু কে যেন বসিয়ে দিয়েচে। প্রতিভা তার কথা-বার্ত্তা চলা-ফেরা থেকে মিনিটে মিনিটে স্ফুরিত হচ্চে। শেলি বাইরন টেনিসন্ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কিছুই তার পড়তে বাকি নেই; ছবি দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে তার আঁকা। বেহালায় ভারি মিষ্টি হাত; অর্গান তার কাছে কথা কয়। দত্ত মিনিকে কোনদিন এমন শিক্ষা দেয় নি যে সে ছেলে নয়, মেয়ে। তার গতি ছেলেদের মতই অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ। এই দেখ মিনি তেতলায় আমার ঘরে চেয়ারে বসে বই পড়চে—ঐ শোন অর্গান বেজে উঠ্‌ল, আবার নীচের তলায় গিয়ে দেখ, ফেরিওয়ালার কাছ থেকে এক রাশ জিনিষ কিনে ছুটে আস্‌চে—"কাকা, এগুলো কিনেচি—

চারটে টাকা দিতে হবে।" আমি হাসি, —"কি হবে পাগ্‌লী, এই ছাই-পাঁশ জিনিষগুলো কিনে?"

"বাঃ, এ-সব যে আমার ভারি দরকারী।"

"কই দেখি, কি সব তোমার এত দরকারী জিনিষ?"

"না, আমি দেখাব না, আপনি হাস্‌বেন।"

"তোমাকে ঠকিয়েচে।"

"ইস্‌ আমাকে ঠকাবে—এত বোকা আমি নই।"

মিনির বিশ্বাস, কেউ তাকে ঠকাতে পারে না! আমি বসে বসে হাসি, আর ভাবি, কোত্থেকে এই ধারণা মানুষের হয়! সবাই নিজেকে ভারি চালাক মনে করে। এইটুকু পুঁজি দিতে কারুকে ভোলেন নি কি ভগবান! কিন্তু মানুষ কম বোকা নয়! যে নিজেকে যত বুদ্ধিমান মনে ভেবে পরকে বোকা মনে করে, সে তত বেশী নির্ব্বোধ!

অল্প বয়সে এই ভাবটা হতে দিতে নেই ছেলে-পুলেদের মধ্যে। তারাই জীবনে বড় বেশী কষ্ট পায়, যারা এই বিজ্ঞতার বোঝা অল্প বয়স থেকে বয়ে মনে করে, অপ্রতিহত তাদের গতি এই সংসারের পথে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় মিনি প্রথম স্থান অধিকার করলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। উত্তর-পত্রে সে যে রচনা লিখেছিল কাগজে তা ছাপিয়ে দেওয়া হলো। তেমন ইংরিজি নাকি একজন এম-এও লিখ্‌তে পারে না!

আমি কিন্তু তাকে নিয়ে মহা বিপদে পড়ে গেলুম। তার আর পছন্দ হয় না এ-দেশের পড়া—সে বিলেত যাবে। কচি বয়সে তাকে কেমন করে পাঠিয়ে দিই সেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। সে তো নাছোড়-বন্দা।

আমার স্ত্রী এসে বল্লেন, "দাও না বাপু ওকে পাঠিয়ে যেখেনে যেতে চাচ্চে—ওর বাপের অগাধ বিষয়-সম্পত্তি—যার অবস্থায় কুলোয়, সে কেন খরচ করবে না?"

আমাদের লীলা তখন ছোট্টটি—আমি বল্লুম, "পারবে তুমি লীলাকে এই বয়সে একলা বিদেশ বিভুঁইয়ে এমনি করে পাঠিয়ে দিতে?"

স্ত্রী রাগ করে বল্লেন, "সে তেরো মণ তেলও পুড়বে না আর রাধাও নাচবে না—এ আবার ধান ভান্‌তে শিবের গীত কেন?"

চুপ করে রইলুম, মেয়ে মানুষের চিত্তের দীনতা দেখে। হাজার শিক্ষা-দীক্ষা দাও—হাজার ধোও-পোঁছ—মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।

আমি কোন দিন কাউকে নিষেধের গণ্ডীতে বেঁধে রাখবার পক্ষে নেই। মনে হয়, নিষেধের বেড়া আমাদের দেশে উপকারের চেয়ে বেশী ক্ষতি করেচে। নিষেধের যা তাৎপর্য্য তা বেশ পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারি; কিন্তু তার মাত্রা-বোধ বড় কঠিন, একটা থেকে আর একটা, তার পর আর-একটা, এমনি করে সেটা এমন বেড়ে চলে যে শেষ পর্য্যন্ত তাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হয়ে পড়ে।

সেদিন রাত্রে খেতে যাবার আগে আমি কি একটা প্রকাণ্ড বই খুলে মানুষের অভিব্যক্তি-বাদ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলুম এমন সময় মিনি এসে পাশে বস্‌ল। আমি

বইটা বন্ধ করে—তার দিকে চেয়ে বল্লুম, "কি মিনু ?"

"কিছু না, কাকা।"

কোন কথা খুঁজে পেলুম না, তাই বল্লুম, "তোমাকে দেখ্‌লে আমার ভারি আনন্দ হয়, যেন আমার নিজের অতীত জীবনের আশা-আনন্দের উদ্দামতার স্বাদটা আবার আমি ফিরে পাই।"

সে হাস্‌তে লাগল। কি মিষ্টি সে হাসি! নিষ্কলুষ প্রাণের অকপট হাসি! শরৎচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মতই বিশুদ্ধ নির্ম্মল!

"তোমার সঙ্গে আমার আবার বিলেত যাবার ইচ্ছাটা যেন প্রবল হয়ে উঠচে।"

সে হাত-তালি দিয়ে নেচে উঠে বল্লে, "ওঃ তাহলে গ্রাণ্ড হয়, কাকা—আচ্ছা, বছর খানেকের ফার্লো নিয়ে চলুন না কেন, আপনি।"

"বেশ হয়, না ?"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়!" সে ছুটে এসে আমার হাতখানা ধরে ঝুলে পড়ে বল্লে—"কাকা তাহলে এই স্থির হয়ে গেল। আর আমি কোন কথা শুনব না।"

"ছুটি পাওয়া ত আমার হাত নয়, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করচে বড় সাহেবের মর্জ্জির ওপর।"

সে মুখটা কাঁচু-মাচু করে বল্লে, "কি হাত-পা বেঁধে রেখেচে আপনাদের এই চাক্‌রিগুলো! আমি বাবা নাকে-কাণে খৎ দিচ্চি, জীবনে চাকরী কখনো করব না।"

"যদি পরিবার ভরণ-পোষণ কর্‌তে হতো—আর আমার মত গরীবের সন্তান হতে ?"

"আমি কিছুতে বিয়েই কর্‌তুম না, কাকা।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লুম, "ঠিক বলেচ মিনু, কি ভুলটাই জীবনে করে বসেচি।"

সে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, "তা হতে যাবে কেন! ঠিকই করেছিলেন কাকা—মানুষের জীবনে কি ওটা একটা মস্ত দাবী নয়? যে বিয়ে করে না, সে কাপুরুষের মত জীবন-সংগ্রাম থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়! জীবনটা যে কি তারা কোন দিন তা উপলব্ধি করে উঠ্‌তে পারে না! জল না ছুঁয়ে মাছ ধরায় বাহাদুরি থাক্‌তে পারে—কিন্তু গায়ে জল-কাদা মাখবার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র আনন্দ আছে—সে কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না।"

"গায়ে জল-কাদা মাখায় যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে, এমন কথাই হয় ত অনেকে স্বীকার করতে চাইবে না।"

"তা হলে অবশ্য নাচার।"

মিনি চুপ করে বসে কি ভাবতে লাগল। তার দীপ্ত চোখদুটো উজ্জ্বল ল্যাম্পের উপর ফেলে নীচের ঠোঁটটা কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে এমনি করেই সে ভাবতে থাকে,—যখন-তখন।

তার চিন্তার স্রোতটা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে বল্লুম, "বিলেত গিয়ে সায়েন্স পড়বে, না আর্ট্‌স ?"

"আমি ভাষা পড়ব—ফ্রেঞ্চ শেখবার আমার বড় সখ।"

"তাহলে তোমায় পারিতে থাক্‌তে হবে ?"

"না, গোড়াতে ইংরিজিটা শেষ করে তার

পর ফ্রান্সে যাব। আমি মাইকেলের মত যতক্ষণ না সেই ভাষায় অনর্গল কবিতা লিখতে পারচি, ততক্ষণ তাকে ছাড়ব না।"

"তাহলে কবি হবার জন্যে বিদেশ যাচ্ছ?"

সে একটু হাস্‌লে,—কবি হওয়া যায় না, কবিরা কবি হয়েই জন্ম-গ্রহণ করেন।

"কেন, চেষ্টা করে কবি হওয়া যায় না নাকি?—আমার মনে হয়, মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই।"

"যাবে না কেন, মানুষ পোপের মত কবি হতে পারে চেষ্টার বলে; কিন্তু শেলি-বাইরন হওয়া চেষ্টায়, যায় না—ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা থাকা চাই।"

"আমার মনে হয় তোমার এমন কিছু একটা শেখা উচিত, যা পৃথিবীর কোন কাজে লাগে।"

"কবিরা কি দুনিয়ার কাজে লাগেন না? তাঁরা জগতের চিন্তার স্রোতে নতুন ভাবের জোগান দিয়ে—জগৎকে চিন্তার পথে আরো এগিয়ে নিয়ে যান্।—আমার মনে হয়, আর একটা কাজ আমার দ্বারা হতে পার্‌বে—আমি বোধ হয় ষ্টেজের খুব উন্নতি করব। আমার শক্তি ষ্টেজের উপযোগী বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"এক্‌ট্রেস!—"অতিমাত্র বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করেই আমি কথাটা বলে উঠলুম!

"কেন, আপনি কি তাদের ঘৃণা করেন?"

"ঘৃণা হয় ত ঠিক করিনে, কিন্তু খুব পছন্দও করিনে ও-জীবনটা।"

"এটা কি আপনার কুসংস্কার নয়?"

"হতে পারে। কিন্তু সংস্কার বদলানো বড় শক্ত, মিনু।"

"আপনাকে কেউ ঐ জীবন গ্রহণ করতে অনুরোধ করচে না, কিন্তু আমি জানি যে আমার পক্ষে একট্রেস হওয়া প্রায় স্থির।"

হাস্‌তে হাস্‌তে আমি বল্‌লুম, "কোন জিনিষের নিশ্চয়তা নেই এ জীবনে।"

"তবুও মানুষ ঠিক-ঠিকানা করতে এক মুহূর্ত্তের জন্য ত্রুটি করে না।—মানুষ যখন তার বিদ্যা-বুদ্ধির কথা ভাবে, তখন সে নিজেকে অমর বলে মনে করে—আমিও তাই মনে করি কাকা, নিজেকে।"

"আমি মৃত্যুর কথা বল্‌চিনে মিনু—আমি বলচি, আর একটা শক্তির কথা—মানুষের সমস্ত শক্তির বাইরে একটা অতি-মানুষিক ক্ষমতা তার ভাগ্যকে নিত্য-নিয়ত নিয়ন্ত্রিত করচে।'

মানুষের পুরুষকারের দরকার নেই? সে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে মড়ার মত জীবনের স্রোতে ভেসে যাবে?—তা যদি হয় ত' আপনাদের সায়েন্স যে এক পা'ও এগুতে পারে না।—নাঃ, ও আমি মানিনে—নিজেকে গড়ে তোলবার শক্তি বারো আনা মানুষের হাতেই আছে।"

আমরা দুজনেই হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেলুম। এই পনের-ষোল বছরের মেয়েটির তেজ দেখে আমি অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে রইলুম। মিনি হয়ত আমার বুদ্ধির স্থবিরতা দেখে মনে মনে খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল।

আমাদের আজন্ম অভ্যাস, মেয়েদের লজ্জাবনতা অবগুণ্ঠনবতী দেখা; তাই ধ্বক্

করে বুকের উপর যেন ধাক্কা লাগে এমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখে। মনে হয়, এ কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশের হাওয়া দেশ-টাকে! কি জানি, স্বাধীনতা দিতে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে না ত! মিনিকে যদি ছেলে বলে মনে করি ত' আর গোল থাকে না! কিন্তু সে যে মেয়ে—তাকে যে একদিন সংসারের মধ্যে দেবী-মূর্ত্তি ধরে একাধারে স্নেহ-মমতা অজস্র কৃপা-করুণা বিতরণ করতে হবে—তাকি এই শিক্ষার পরিণামে সম্ভবপর হবে? তা দেখ্‌বার সৌভাগ্য হয়ত আমাদের এ জীবনে ঘটবে না,—আমাদের বংশধরেরা ভাল করেই দেখ্‌তে পাবে। তারা শুধু দেখবে না—তারা ভুক্তভোগী হবে।

মিনিকে বিলেত পাঠানোই ঠিক হলো; তার সঙ্গে আমার যাওয়া ঘটে উঠলো না। আমারো কেমন যেন ভয় করছিল যেতে। সাহেব যখন ছুটি মঞ্জুর করলেন না, তখন বেঁচে গেলুম নিষ্কৃতির হাঁফ ছেড়ে।

মিনিকে ডেকে বল্লুম, "দেখ মা, একলা চলেচ তুমি সেই দূর দেশে—তোমার বয়েস কাঁচা—বুদ্ধিও একেবারে পাকেনি—খুব সাবধানে চলো, মা। চিন্তার স্বাধীনতায় বড় আসে যায় না; কিন্তু ব্যবহারের স্বাধীনতা অল্পেই উচ্ছৃঙ্খলতায় গিয়ে দাঁড়ায়। এক মিনিটের ভুলে এমন একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে যার জন্যে সমস্ত জীবন ধরে অনুতাপ করতে হয়।"

সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে; হয়ত বুঝে উঠ্‌তে পারলে না, আমি কি বলচি। আমি এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট করে আর বলতে পারলুম না—হয়ত বলা উচিত ছিল; কিন্তু ভিতরটা কে যেন হাত দিয়ে চেপে ধরলে।

একটি পরিচিত পরিবারে তার থাকার বন্দোবস্ত হলো। মিঃ ব্লাটউড্ অক্‌স্‌-ফোর্ডের একজন ছোট-খাট অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে আমার জানাশোনা হয় বিলেতে থাক্‌তেই। তিনি মিনির ভার যেচে নিতে স্বীকৃত হলেন। বোম্বাই অবধি আমি সঙ্গে গিয়েছিলুম। মিনিকে জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে আমার চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে এল—মনে হলো, হয়ত যেমনটি পাঠাচ্ছি, তেমনটি আর ফিরে পাব না। সে বেশী কথা কইতে পারলে না; কেবল বল্লে, "কাকা, আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন—এমন কোন কাজ আমি করব না, যাতে আপনাদের মাথা হেঁট হয়।"

মনে মনে বল্লুম, "তাই হোক মিনি, ভগবান তোমাকে সকল অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন!"

বছর তিনেক অক্‌স্‌ফোর্ডে থাকার পর মিনি আমাকে জানালে যে সে লণ্ডনে আস্‌তে চায়। পড়া-শুনো সে খুব ভালই করছিল, এমন কথা ব্লাটউড আমাকে অনেকবার জানিয়েছেন। এবারে থিয়েটার-গুলোর আরো কাছাকাছি হবে। কোন কথা গোপন করা তার স্বভাবই নয়। ক্রমেই তার বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছিল যে, ষ্টেজই তার জীবনের উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র। মাঝে মাঝে ছোট-খাট পার্ট নিয়ে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করে ঐ কথাই নাকি প্রমাণ

করচে। আমার কিন্তু কেমন-কেমন মনে হতো—যেন কিছুতেই পছন্দ করে উঠতে পারতুম না, তার ঐ ঝোঁকটাকে। কিন্তু স্পষ্ট করে কোন দিন মানাও করিনি। কে কোন্ দিকে জীবনে স্ফুর্ত্তি-লাভ করে, কে বলতে পারে!

লণ্ডনে এসে তার চিঠিপত্র দেওয়া অনেক কম হয়ে গেল। তার কারণ সে বল্‌ত যে এমন একটা আগ্রহ তার ঐ ষ্টেজের দিকে ফুটে উঠচে—যা তাকে বিশ্ব-সংসারকে ভুলিয়ে দেবার মতই করে তুলচে!

শেষ চিঠি সে লিখ্‌লে যে তারই নেতৃত্বে পারিতে একটা ষ্টেজ খোলা হচ্চে; সেখানে তারা দেখিয়ে দেবে মানুষ অভিনয়-মঞ্চ থেকে কতখানি সত্য জগতে দিতে পারে।

তার বছর খানেক পরে, পারি থেকে জানালে যে ষ্টেজের উন্নতির আশা তাকে ত্যাগ করতে হয়েচে। দুনিয়াটা জালিয়াৎ আর জোচ্চরে পরিপূর্ণ। তাকে ফ্রান্সের আরো দক্ষিণে নেমে যেতে হচ্চে—কারণ তার সন্তান-সম্ভাবনা হয়েচে—কিছু বেশী টাকা চাই।

এ কি কাণ্ড! এমনটি ত কোন দিন আশা করিনি। তাকে সব কথা খুলে লিখ্‌তে বল্লুম। তার চিঠির উত্তর পেতে খুবই দেরী হলো। চিঠিখানিতে আর উদ্দামতা নেই—ঠিক বুঝতে পারলুম—তাকে চূর্ণ করে দিয়ে গেছে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। বিবাহ সে করে নি—হয়ত বিবাহ করতে বাধ্য করাতে পারত সেই যুবকটিকে; কিন্তু তাও সে করেনি। তার কোলে ভগবান একটি কন্যা দান করেছিলেন—তাকেও হরণ করে নিয়েছেন, তিন মাসের মধ্যে। সে একটু সুস্থ হলেই আমার কাছে ফিরে আস্‌বে; কারণ আমি ভিন্ন জগতে আর তার কেউ বন্ধু নেই!

এ কি করলে, ভগবান!—কুন্দ ফুলটিকে অম্লান জ্যোতিতে ফুটিয়ে তুল্‌তে তুলতে এমন করে পোকায় খাইয়ে দিলে কেন?

পারুলকে ডেকে সব কথা বল্লুম। আশ্চর্য্য কথা—সে কিছুমাত্র দুঃখিত না হয়ে বল্লে, "আমি জানতুম ঐ হবে—যে গোল্লায়-যাওয়া ছুঁড়ি! মেয়ে মানুষের এতটা বাড় সইবে কেন? এখন মাথায় করে যেন এ বাড়ীতে এনে আর ঢলাঢলি করোনা। পরের বাছাকে দূরে রেখো।"

হায় ক্ষমা কোথায় নারী-চিত্তে! দোষই কি এত বড় মানুষের জীবনে, যে সমস্ত মানুষটাকে আড়াল করে ঢেকে দিতে পারে! তর্ক করতে আমার প্রবৃত্তি হলো না। আমি বল্লুম, "তার বাপের তিনখানা বাড়ী আছে চৌরঙ্গীতে—তার ভিতর যেটা তার পছন্দ হবে, সেইটেতে সে থাক্‌বে। তার অভাব কি?"

আমার স্ত্রী রাগ করে তখনি ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন। লীলার এ-সব বোঝবার ঠিক্ বয়স হয়নি তবুও যেন তাকে উচ্ছল দেখ্‌লুম। মানুষের মনের তলায় অন্ধকারে যে হিংসা গোপনে বাস করে, সেটা তাকে কতখানি অপদার্থ অমানুষ করে দেয়!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ খবর চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। কেউ আমাকে দোষ দিলে—কেউ মিনির ভাগ্যকে দোষ দিলে। চুপ করে সব সহ্য করলুম। স্ত্রী-স্বাধীনতার বেদীতে য়ুরোপে এমন কত শত বলি হয়েচে; কিন্তু য়ুরোপ ভুলে যেতে জানে মানুষের অপরাধ। আমাদের দেশের মত এমন সমস্ত জীবনের জন্যে পরিবর্জ্জন, বোধ হয় আর কোন দেশই করে না! আদর্শটা বড় বেশী উঁচু করতে গিয়ে এত বিধি-নিয়মের জঞ্জাল সমাজে এসে পড়েচে। মানুষকে এমন করে কেটে-ছেঁটে পুতুল তৈরী আর কোন দেশে করেছে কি? সমাজকে রক্ষা করতে গিয়ে মানুষকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে নির্দ্দয় শাস্ত্রকর্ত্তার কোন দুঃখ হয় নি! আশ্চর্য্য মহা-শক্তি আমাদের দেশের লোকের! অম্লানবদনে সব সহ্য করতে প্রস্তুত আছি। যুগের পর যুগ এই সুকঠোর নিয়ম প্রতিপালন করে করে আমরা ভুলে গিয়েছি যে ঐ নিয়মগুলো আমাদেরই করা—অনায়াসে আমরা ওটা বদলে দিতে পারি।

মিনির চিঠি পেলুম; সে আসচে। তার জন্যে একটা বাড়ী মেরামত, চুণকাম করিয়ে মোটামুটি আস্‌বাব-পত্র দিয়ে সাজিয়ে রাখ্‌লুম। এতে কারুর পরামর্শ চাইনি। সে যে আস্‌চে এ কথা কারুকে জানাতেও ইচ্ছা হলো না। একটা ভাল গাড়ী-ঘোড়া কিনলুম। আমার স্ত্রী আপত্তি করলেন। এত নবাবী করলে সংসার চল্‌বে না! খোকা বি-এ পাশ করে এম-এ পড়ছিল, তাকে আবার বিলেতে পাঠাতে হবে! কোন কথার উত্তর দিলুম না—বল্‌লুমও না যে ওটা মিনির গাড়ী।

একদিন শেষরাত্রে গাড়ী নিয়ে হাওড়া চলে গেলুম। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলুম, তখনো আধ ঘণ্টা দেরী, গাড়ী আস্‌তে। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করচে—সমুদ্রের তীরের কাছে বালির সঙ্গে জলটা যেমন ঘুলিয়ে ওঠে—তেমনি ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উঠতে লাগলো মনটা। পাথরের মেজের উপর পা ফেলে যেন নিজে-নিজেই চম্‌কে উঠ্‌চি!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে লোকজনের সমাগম হতে লাগ্‌ল। টুপিটা টেনে চোখ অবধি নামিয়ে দিলুম। লোকের সঙ্গে চোখো-চোখি করতেও ইচ্ছা হল না।

গাড়ীখানা সশব্দে প্ল্যাটফরমের ভিতর যখন ঢুকলো, তখন হঠাৎ বুঝতে পারলুম যে হাত-পা আমার ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌চে—মাথার মধ্যে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে এল!

দেখ্‌লুম, গাড়ীর মধ্যে মিনি বসে আছে শরৎ-রাতের শিশির-সিক্ত রজনী-গন্ধাটির মত! শুভ্র-নির্ম্মল মুখখানি—সমস্ত আতিশয্য-বর্জ্জিত—নিখুঁত সুন্দর! কালো চোখদুটি বিপদে যেন আরো নিবিড় হয়ে উঠেছে!

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—সে আস্তে আস্তে নেমে এসে আমাকে প্রণাম করে দাঁড়াল—আর বেঁটেটি নেই—মাথায় প্রায় আমার সমান। তার মুখের দিকে চাইলুম, ঠোঁট দুটি তার বিদ্যুৎ-ভরা মেঘের মত ঈষৎ কাঁপচে!

দু-জনেই নির্ব্বাক; ধীরে ধীরে গাড়ীর মধ্যে গিয়ে বস্‌লুম—তখনো ঠাণ্ডা হাওয়া

বইচে। সইস্ কাঁচগুলো তুলে দিয়ে বল্লে, "কাঁহা যানে হোগা হুজুর ?"

"চৌরঙ্গী চলো।"

পুলের উপর গাড়ীটা যেতেই মিনি ঝাঁপিয়ে আমার বুকের মধ্যে এসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমার চোখের কোলে দু-ফোঁটা জল যেন জমে আট্‌কে রইল—তারা শুকিয়ে যেতে জানে না—ঝরেও পড়ে না।

পাখী সমস্ত রাত ঝড়ে বাসা হারিয়ে সকালে ফিরে এসে তার বিপদটা যেন সবে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তার জীবনের সমস্ত কান্না যেন এক-নিমেষে কণ্ঠ পর্য্যন্ত উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে! আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লুম—ছোট্ট মাথাটি থেকে থেকে এক এক ঝোঁকে কেঁপে উঠ্‌ছিল। আমার গলায় কি যেন জড়িয়ে উঠেছিল—ডাক্‌তে গেলুম—শব্দ বার হল না!

এমনি করে কিছুক্ষণ কেটে গেল।

কান্নার বেগটা তার থেমে এলে সে বল্লে, "এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে, কাকা ?"

"তোমারি বাড়ীতে, মা।"

"আপনার কাছে আমাকে থাক্‌তে দেবেন না কাকা ?"

নির্ব্বাক বসে রইলুম। আমার মুখের দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ করে যেন আমার অন্তরের নিগূঢ় তল পর্য্যন্ত পড়ে নিয়ে সে বল্লে, "সেই ভাল, আমি একলাই থাক্‌ব।"

"আমি সব সময়ে যাওয়া-আসা করব, মিনু—আমার বাড়ীর দোর তেমনি অবারিত উন্মুক্ত আছে তোমার জন্যে—এ কেবল তোমার সুবিধার জন্যেই এই ব্যবস্থা। তোমার বাড়ীতে তুমি কর্ত্রী—কারো সাধ্য থাক্‌বে না, সেখানে তোমার কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করবার।"

মিনি চুপ করে বসে রইল। গাড়ীর গম্ গম্ শব্দকে যেন ঘোড়ার খুরের তীক্ষ্ণ শব্দটা কেটে খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে চলেচে। দু'চারটে মোড় নিয়ে গাড়ীটা এসে দাঁড়াল।

গাড়ী থেকে নেমে সে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "বাঃ, সুন্দর ঘোড়াটি। এ কার গাড়ী, কাকা ?"

"তোমার জন্যে কিনেছি—এ না হলে যখন-তখন তোমার কাছে আসার সুবিধা হবে না বলে—"

"বেশ করেচেন—আমি তাই ভাব-ছিলুম।"

উপরে উঠেই বসবার ঘর—অল্প দু-চার খানি আস্‌বাব্। সামনেই মিনুর মার-বাবার ছবি দুখানা। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে বল্‌লে, "আর একখানা ছবি দিতে হবে এই দেয়ালটায়।"

"কার ?"

"সে আমি পরে বল্‌ব, আপনাকে।"

তার লাইব্রেরী, শোবার ঘর,—সব ফিরে ফিরে দেখে এসে সে বল্‌লে, "শোবার ঘরের পাশের বড় ঘরে আর এক সেট্ খাট-বিছানা দিতে হবে, কাকা।"

আমি অবাক্ হয়ে বল্‌লুম, "সে কার জন্যে ?"

"আপনাকে আমি ছেড়ে দেব না। এ

বাড়ীতে আপনি থাকুন আর নাই থাকুন—আপনার থাকার পুরো-বন্দোবস্ত কিন্তু থাক্‌বে—নইলে আমি থাক্‌তে পারব না, এখেনে।"

আমি হাস্‌তে লাগ্‌লুম—"বেশ, তাই হবে—যেখানে যেমন চাও, করিয়ে নাও।"

"বেশ, আমি সব ঠিক-ঠাক করে নিচ্চি, আপনার দেরী হয়ে যাচ্চে—এখন তবে আসুন, কাকা। কিন্তু আবার কখন আস্‌বেন—কলেজের পর, তিনটের সময়?"

মিনির আসার খবর শুনে আমার স্ত্রী অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে রইলেন। তাকে দেখ্‌বার জন্যে কোন রকম আগ্রহ কি উদ্বেগ প্রকাশ করাটাকে হয়ত তাঁর চরিত্রের লঘুতা বলে মনে হলো।

বিকেলে মিনি যখন আমাদের বাড়ীতে এলো তখন লীলা প্রায় লুকিয়ে রইল—আমার স্ত্রী অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করলেন। সে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করে আমার ঘরে এসে চুপটি করে বসে রইল—তাকে রাত্রে খেতে বলে ছিলুম। আমার অনুতাপ হলো যে না বল্লেই হতো—তাকে এমন ভাবে যে অপমান করা হবে, সেটা আমি বুঝেই উঠ্‌তে পারিনি। আমার নিজেকে অতিরিক্ত প্রফুল্ল করে তুলতে হলো। বল্‌লুম, "মিনি তোমার বাজনা-গান শুনতে ইচ্ছা হচ্চে; কি সব নতুন শিখে এসেচ, শোনাবে, চল।" সে গিয়ে গোটা কয়েক জর্ম্মান টিউন বাজালে। গান-বাজনার রস-গ্রহণ আমার বড় ঘটে না—বড় কম বুঝি—তবুও মনে হলো, চিত্তের বেদনাটা মিনি সেই সুরগুলো দিয়ে পরিষ্কার প্রকাশ করলে। মানুষ কেঁদে নিলে যেমন মনটা একটু হাল্‌কা হয়—এই সুরগুলো বাজানোর পর মিনির স্ফূর্ত্তিও যেন একটু ফিরে এলো—সে বিলাতের দু-চারটে কথা বল্লে; কিন্তু নিজের কথাগুলো যেন বেছে বেছে সাবধানে বাদ দিয়ে গেল।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর আশা করছিলুম, স্ত্রী মিনিকে আমাদের বাড়ীতে রাত্রিবাস করতে বল্‌বেন; কিন্তু তিনি তাঁর গাম্ভীর্য্য কিছুতেই ত্যাগ করলেন না। অগত্যা তাকে বিদায় দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলুম। আমার পিছনে পিছনে স্ত্রী এসে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে বল্লেন, "এখনো অহংকার মট্‌-মট্‌ করচে। ছুঁড়িকে দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করছিল।"

আহা! বড় দুঃখ হয় মেয়েটার জন্যে—জীবনের সব স্ফূর্ত্তি যেন সে সাগর-পারে রেখে এসেচে।

"আমি ত দুঃখ-শোক তার কিছু দেখলুম না—যেন একটা ধিঙ্গি হয়ে এসেচে। কাপড়-চোপড়ের বাহারটা আজ না হয় নাই দেখাতিস্‌! তুই যে বড়-মানুষ তা'ত আমরা জানি। হাজার হোক জাতে ছোট কিনা!"

কথাগুলো আমার বুকের মধ্যে শাণিত ছুরির মত বিঁধ্‌লো। কি নির্দ্দয় এই মেয়ে-মানুষের জাতটা!

কথার উত্তর না দিয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়লুম। আমার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

সাপ যেমন মানুষকে কামড়ে বিষে নিজে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে, আমার স্ত্রীর বোধ হয় তেমনি একটা-কিছু হলো—তিনি বেশীক্ষণ

স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। ছট্-ফটিয়ে নীচে চলে গেলেন।

রাত্রে একটুও ঘুম হলো না। মাথা অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠে অদ্ভুত আর অসম্ভব রকমের কথা মনে হতে লাগ্‌ল। মনে হলো, বিশ্বের সমস্ত দীনতা, হীনতা, ক্ষুদ্রতা একটা জটিল চক্রান্ত করে জগতের সৎ এবং সত্যকে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছে। উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পান্‌সিটা ডোবে-ডোবে—কে তাকে রক্ষা করবে! ঘর ছেড়ে বাইরে ছাদের উপর এসে দাঁড়ালুম—মনে হলো, হয়ত মিনিও ঠিক এমনি বিনিদ্র ভাবে রাত কাটাচ্চে!—কত আশা করে সে ছুটে এসেছিল আমার বুকের মধ্যে, আশ্রয় পাবার জন্যে—সে আশ্রয় আমি পারলুম না ত দিতে!; যাদের জন্যে পারলুম না, তারা আমার কে? মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ ত ভালবাসা দিয়ে—সেই ভালো ত আমি মিনিকেই সব-চেয়ে বেশী বাসি—তবে কেন, এ অসত্য আচরণ কচ্ছি! সমাজ তার নিয়ম নিয়মে মানুষকে এমনি করেই অমানুষ করে দেয়! সমাজকে কি ভয় আমার?—আমি সত্যকেই আশ্রয় করব—যা থাকে কপালে! আমার নকল যা-কিছু এই দণ্ডেই শেষ হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে গেলুম। কাছেই গাড়ীর ষ্ট্যাণ্ড—একখানা গাড়ী ভাড়া করে চৌরঙ্গীর দিকে চল্‌লুম। পথের উন্মুক্ত হাওয়া মাথায় এসে লাগ্‌তে মাথাটা কতক ঠাণ্ডা হলো। কি করচি এই পাগলামি—কোথায় চলেচি এই গভীর নিশীথে! মিনি হয়ত ঘুমিয়ে আছে। কেন তার শান্তি ভঙ্গ করব! মনে হলো, ফিরে আসি—কিন্তু সে কথা গাড়োয়ানকে বল্‌তেও লজ্জা বোধ হলো। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলুম। গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দে যেন চম্‌কে চম্‌কে উঠছিলুম; যেন চারিদিক থেকে বিদ্রূপের হাসি প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগ্‌ল।

মিনির বাড়ীর সামনে এসে গাড়ীটাকে থাম্‌তে বলে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে বল্‌লুম, "দাঁড়া, আবার এখুনি আমি ফিরে যাব।—"

সে সেলাম করে বল্‌লে, "যো হুজুর।"

গাড়ী-বারাণ্ডার উপর থেকে মিনি ঝুঁকে বল্লে,"কে? কাকা এসেচেন? সব ভালো ত! এত রাত্রে?"

গলার ভিতর পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তখন, চেঁচিয়ে কথা বার হলো না—বল্‌লুম, "হুঁ।"

বাতি হাতে করে সে আমাকে দোর থেকে নিয়ে গেল। আমি মাতালের মত পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে তার পিছনে পিছনে চল্‌লুম। তার শোবার ঘরে একটা সোফায় গিয়ে বসে বল্‌লুম, "মিনি, একগ্লাস খাবার জল চাই যে।" সে একগ্লাস জল এনে দিলে। জল খেয়ে দুটো হাঁটুর উপর হাত রেখে তার মধ্যে মাথাটা গুঁজে চুপ করে বসে রইলুম! মিনি আমার কাছে চুপ্‌টি করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! তার যেন কোন কথা বল্‌তে সাহস হচ্ছিল না।

এমনি করে কতক্ষণ কেটেচে জানিনে, মাথা তুলে চেয়ে দেখলুম, মিনি তেমনি করেই দাঁড়িয়ে আছে।

বল্লুম, "দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ, মা? বসো না।" সে আস্তে আস্তে গিয়ে রেলিংএর ধারটিতে চুপ করে বস্‌ল। তার চোখ-মুখের প্রত্যেক রেখাটি যেন প্রশ্ন করচে—এ কি, কাকা?

আমি গম্ভীরভাবে বল্লুম, "মিনু—আমার অক্ষমতা ক্ষমা কর। আজ যে ব্যবহার তোমার উপর আমরা করেছি, তা মানুষের উচিত হয়নি। তোমাকে আমার ঘরেই আশ্রয় দেওয়া উচিত ছিল,—তা আমি করিনি—তাই সমস্ত হৃদয় আমার তীব্র ব্যথায় পীড়িত হয়ে উঠ্‌চে। তোমাকে এমন করে দূর করে দিয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য আমি স্বস্তিতে কাটাতে পারব না। হয় তুমি আমার বাড়ী চল, নয় আমাকে স্থান দাও তোমার ঘরের একটি কোণে!"

মিনির মুখের উপর ম্লান হাসি ফুটে উঠলো। সে বল্লে, "আজ সমস্ত দিন এই কথা নিয়েই তোলা-পাড়া করেচি, কাকা। যে ব্যবস্থা আপনি করেচেন, এই সব চেয়ে ভাল হয়েচে। মানুষ নিজের অপমানের ব্যথাটা মনের কোন্ নিভৃত কোণে লুকিয়ে রাখে, তাকে জন-সমাজের গোচর করা যায় না!—এই যে নিভৃত নীড়টি, এটিকে আমি আপনার স্নেহে রচিত বলে আজ পদে পদে উপলব্ধি করেছি। এই নির্জ্জনতার মধ্যে এক মিনিটের জন্যেও আপনাকে পাইনি, এমন আমার মনে হয়নি। ঐ যে খাট ঐ যে বিছানা পেতে রেখেচি, ওতে আপনি শুয়ে আছেন, এ বিশ্বাস থেকে এক-বারের জন্যেও মন আমার চ্যুত হয়নি। মনের একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে, কাকা, কারণ একনিমেষে কে পূর্ণ আর কে রিক্ত তা সে বুঝে নিতে পারে। আপনার বাড়ীতে গিয়ে আমি এক তিলের জন্য তিষ্ঠুতে পারব না। এও ত আপনার বাড়ী। আমি আপনারই স্নেহের আশ্রয়ে স্থান পেয়েছি—আমার কোন অভাব এখানে নেই, কাকা!"

পূবদিকে কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ উঠচে, সার্শির ভিতর দিয়ে তা দেখতে পেলুম। ধীরে ধীরে চাঁদের আলো মশারি ভেদ করে মিনির বিছানার উপর এসে পড়ল। দেখলুম, একটি ছোট মেয়ে তার ভিতর বালিশের উপর মাথা রেখে অকাতরে ঘুমুচ্চে। আমি জানি, মিনির মেয়েটি বেঁচে নেই, তবে এ কাকে এনে সে নিজের পাশে শুইয়ে রেখেচে!

কোন কথা না বলে উঠে গিয়ে মশারি তুলে দেখলুম—একটা বড় কাঁচের পুতুল—তার নাক-কান-মুখ-চোখ-চুল—সবই মানব-শিশুর মত! হায়, এই ক্ষুদ্র জননীর মাতৃত্বের সমস্ত অভাব কি পূরণ করতে পেরেচে, এই প্রাণহীন পুতুলটা? ভগবান, চাইনে জ্ঞানের গরিমা, যশের ব্যর্থ অভিমান, তুমি আমাকে আবার ছোটটি করে দাও,—আমি শিশু হয়ে সন্তান-হারা এই বালিকা-মাটির শূন্য ক্রোড় পূর্ণ করব!

চোখ থেকে আগুনের মত দু-ফোঁটা তপ্ত জল বার হয়ে বিছানাটা সিক্ত করলে! মানুষ ত এখেনে পুতুল-খেলাই করচে!

স্নিগ্ধ শান্তিতে সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয়ে উঠল; মনের সমস্ত ক্ষুধা নিমেষে দূর হয়ে গেল—মিনির দিকে ফিরে বল্লুম, "মা, আজ থেকে আমি তোমার ঐ পুতুলের জায়গা নিলুম—আমি তোমার ছেলে।"

সে আমার মাথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তার চোখের বিন্দু বিন্দু জল আমার মাথার উপর ঝরে-ঝরে পড়ছিল ;—আমার মনে হলো, স্বর্গ থেকে দেবতারা যেন আমার মাথায় অমৃতের শান্তি-জল বর্ষণ করচেন!

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ

(সমালোচন)

ভারতী-সম্পাদকযুগলেষু—

গত চৈত্র মাসের কাগজে শ্রীযুক্ত নবকুমার কবিরত্নের একটী লেখা পড়ে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ লজ্জা ও আশঙ্কার আন্দোলনে মনটা কিছু বিচলিত হয়ে উঠেছিল। বলে রাখা ভাল, হর্ষটা লেখার জন্য নয়, লেখকের জন্য। অনেক দিন কোনও খবর না পেয়ে ভয় হয়েছিল, নবকুমার ভায়া বুঝি লীলা সম্বরণ করেছেন! খোষ মেজাজে বাহাল তবিয়তে আছেন দেখে খুসী হলেম। হাজার হোক্, পুরাণো আলাপী। কিন্তু লেখাটা পড়ে মনে আশঙ্কাও জেগেছে, যথেষ্ট। কারণটা খুলে বলা দরকার। যাই হোক্, সাবধান করে দেওয়া হিতৈষী-জনের উচিত মনে হলো। কিন্তু নবকুমারের দেখা পাওয়াই যে দুর্লভ। শুনেছিলাম, কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে। কিন্তু তাঁর সে আত্মীয়তাও বড় কাজে লাগল না। সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "নবকুমারের চাল-চলন বিচিত্র। হাওয়ার মতো আসে, হাওয়ার মতই ভেসে যায়। তবে প্রয়োজন-কালে এসে জোটে বটে।" কাজেই আপনাদের কাগজের শরণাপন্ন হতে হলো। তিনি যেখানেই থাকুন, এ লেখাটা তাঁর নজরে পড়বে এই ভরসা।

এই তো গেল এ-পক্ষের কৈফিয়ৎ। আপনাদেরও একটা কৈফিয়ৎ পাওনা আছে। সত্যেন্দ্রনাথ যা বললেন, তার কবিত্বটুকু বাদ দিয়ে সোজা বাংলায় বলতে গেলে এই দাঁড়ায়, কবিরত্নের চাল ও চুলা দুটো জিনিষেরই একান্ত অভাব। অর্থাৎ যাকে বলে Vagabond, Bohemian বা ভবঘুরে। আপনাদের কাগজের মত এমন একটা ভদ্র অর্থাৎ Respectable কাগজে এমন লক্ষ্মী-ছাড়া লোকের লেখাকে কেন প্রশ্রয় দেওয়া হলো, বুঝতে পারলেম না। Respectabilityর প্রধান লক্ষণই হচ্ছে সংযম,—কিনা প্রকৃতিকে চেপে রাখা অর্থাৎ অসুবিধা-জনক সত্যকে কায়মনোবাক্যে পরিহার করা। আরও একটু খুলে বলতে গেলে বলতে হয় শক্তিমানের মন যুগিয়ে চলা, তা

সে শক্তিমান রাজাই হোন্, ব্রাহ্মণই হোন্, সমাজই হোন্ বা জন-সংঘই হোন্। কিন্তু ইতিহাসের পত্তন থেকে দেখা যায়, এই সব ভবঘুরেদের একমাত্র আনন্দই হচ্ছে এই সব শক্তিমানদের অপদস্থ করা। ফল বিপ্লব, বিদ্রোহ সংঘর্ষ অশান্তি হৈ-চৈ। এই সব লোকের উপদ্রব না হলে সংসারটার কেমন নিবাত-নিষ্কম্প দীপের মতো চেহারা হতো সেটা কল্পনা করে দেখুন দেখি। শাক্যসিংহের মতো দু'চারজন বিশিষ্ট চাল-চুলাবন্ত লোকেও অনেক সময় রীতিমত হাঙ্গামা বাধিয়েছেন বটে কিন্তু সেও নাম কাটিয়ে এদের দলে ভর্ত্তি হওয়ার পর। আর একটা কথাও ভেবে দেখার মতো। উষার স্বর্ণ-রাগ সত্যই কিছু সোনায় গড়া নয় আর আকাশ-কুসুমে যে ফল ফলে তাতে কোনও-দিন যে কারো খিদে বিন্দুমাত্র মিটিয়েছে ভব-ঘুরে-দলের বড় বড় চাঁইরাও সেরূপ সাক্ষ্য দেন না। সুতরাং আর কেন? বয়সটা একটু ভদ্র রকমের হলে দু-চারটা হাড়-লক্ষ্মীছাড়া ভিন্ন বুদ্ধিমান মাত্রেই যা করে থাকে তাই করুন—ভবকে ভাবের দিকে টেনে তোলার চেষ্টার পালোয়ানিটা ছেড়ে ভাবকেই ভবের দিকে নামিয়ে আসুন,—কোনও আয়াস পেতে হবেনা, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই আপনার হয়ে সব করে দেবে, দিব্য আরামে কাটাতে পারবেন। ভিতরের কথা জানি বলেই আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি। বুঝে চলতে শিখুন, কেন বুড়া বয়সে কাগজখানি খোয়াবেন? জানি, এতে আপনাদের আর্থিক সুবিধা বই অসুবিধা হবেনা,—কিন্তু এই রকমে এত দিনের নেশাটা হঠাৎ একদম ছাড়তে হলে ব্যাপারটা কি রকম হবে, ভেবে দেখবেন।

বাজে কথা ছেড়ে আসল বিষয়ের অব-তারণা করা যাক। প্রথমেই তারিফ করতে ইচ্ছা হয়, সেই জহুরীকে, যিনি নব-কুমারকে 'কবিরত্ন' বলে চিনে ফেলে-ছিলেন। এ কথা আমি অকুতোভয়ে বল্‌তে পারি যে এণ্টনী ফিরিঙ্গী ভোলা ময়রাদের সময় জন্মালে নবকুমার অতি অনায়াসেই কবিওয়ালাদের কোহিনুর হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। কাজেই বেচারাকে ফোয়ারার মুখে পাথর চাপা দিয়ে শান্ত সংযত হয়ে বস্‌তে হয়েছে। সে যাই হোক্, নবকুমারের জন্য আমি কেন যে এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি, সেই কথাটা খুলে বলা যাক্। নম্বর-ওয়ারি তাঁর বিদ্যার বহরটা দেখিয়ে দিলে আপনাদের বুঝতে কোনরূপ গোল হবে না।

১। নবকুমারের সূচীভেদ্য অজ্ঞতা—খাঁটি বাংলায় যাকে বলে, নিরেট মূর্খতা।

উদাহরণের জন্য বেশী দূর যেতে হবে না। প্রথম লাইনটাই দেখুন না কেন। "কে করেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তক্ত?" একেবারে যাকে বলে, বিশমোল্লার গলদ। কারা এই তক্তটা দিয়েছে সেদিকে একটু লক্ষ্য করলেই তো জলের মত বুঝতে পারতেন, এ ঠাট্টা হতে পারে না, হবার যো-ই নাই। আর কারা যে এই তক্তটা দিয়েছে সেটা অব-ধারণ করতে হলে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের শরণাপন্ন হওয়ারও আবশ্যক নাই। চোখ মেললেই দেখতে পাবেন।

ঘণ্টাকর্ণ মহাশয়ের (অবশ্য নবকুমারের ভাষায়) ঐ যে 'পণ্ডিত-রাজ' উপাধিটী জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে, ঐ ট্রেড মার্কাতেই ধরা পড়েছে এটা কোন্ কারখানার মাল। অপণ্ডিতে কখনো পণ্ডিতের কদর বোঝে না; সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে, পণ্ডিতেরা মিলেই তাঁকে নিজেদের রাজার পদে অভিষেক করেছেন। কিন্তু নিজের দেশ পণ্ডিত-রাজ্যের রাজা করেই তৃপ্ত হতে না পেরে অপর দেশ কবি-সাম্রাজ্যের সম্রাট-পদে বরণ করেছেন। যেমন George V King of Great Britain and Ireland and Emperor of India. যে সম্প্রদায়ের দ্বারা এই ডবল অভিষেক ব্যাপার সম্পন্ন হয়েছে, তাঁরা যে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ঠাট্টা করেন নি, তার অকাট্য প্রমাণ এই যে প্রায় দুহাজার বছর ধরে কেউ ঠাট্টা চালিয়ে আসেন না বা আসতে পারেনও না। এঁরা যে কালিদাসের কাব্যে কেবল উপমার বাহারই দেখেছেন, তিন গুণের মধ্যে দুই গুণে মাঘকে কালিদাসের চেয়ে বড় বলে প্রচার করে এসেছেন, রঘুর চেয়ে ভট্টকে শ্রেষ্ঠ ভেবেছেন, পদাঙ্কদূত হংসদূত কোকিল-দূত এবং আরও দূতকে মেঘদূতের মতই আদর করেছেন, নব্য ন্যায়ের শাণে ঘষে ঘষে মানব-বুদ্ধিকে অদৃশ্য-প্রায় করে তুলেছেন, তাহলে এ সবও কি ঠাট্টা? এঁদের যে কাব্যরস-বোধ বিন্দু-মাত্র আছে এ অপবাদ অতি-বড় শত্রুতেও তো দিতে পারে না। এঁরা যে কালিদাস ভবভূতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করেছেন, এঁদের রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ-অনুবন্ধ টীকা-ভাষ্য কোথাও তো তার কোনও পরিচয়ই দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য পাপিষ্ঠ যবনেরা যদি বেছে বেছে ঐ পরিচয়গুলি লোপ করে না থাকে। ভট্টপল্লী ছেড়ে একবার ঐ য়ুরোপের দিকে চেয়ে দেখুন, যেখানে শুনেছি, জড়বাদের অজস্র আবাদ হয়ে থাকে। তর্জ্জমায় শকুন্তলা পড়ে জর্ম্মণ কবির যে ভাবোচ্ছ্বাস হয়েছিল সমালোচনা-হিসাবে তার মূল্য যাই হোক্ না কেন, তার রসানুভূতি এমন তীব্র ও গভীর যে আজও মনের উপর দিয়ে দখিণ হাওয়া বইয়ে দেয়। ভট্টপল্লী ভুলক্রমে রবীন্দ্রনাথকে যদি ঐ তক্তে বসাতেন (মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম হয়ে থাকে কিনা) তা হলেও একটা কথা ছিল—ঠাট্টার কথাটা মনে উদয় হওয়াই স্বাভাবিক হতো। কিন্তু মুনিদের যখন মতিভ্রম হয় নি, তখন নবকুমারের এমন দারুণ মতিভ্রম হলো কেন? যোগ্য লোকে যোগ্য লোককে যোগ্য আসনে বসিয়েছেন, এর মধ্যে নবকুমার ঠাট্টার অবকাশটা দেখলেন কোথায়?

তাও বলি, বড়ই খুসি হয়েছি আমি নবকুমারের এই মতিভ্রমে কি না ভীমরতিতে।

ভীমরতি জিনিষটা নিছক ভুলে গড়া, তার সন্দেহ নাই। কিন্তু তার একটা গুণ আছে,—তা মানুষের স্বভাবটাকে জানিয়ে দেয়। ঠাট্টার কথাটা তোলায় নবকুমারের অজ্ঞতা যতই প্রকাশ হোক না কেন, তাঁর অন্তঃসলিলা সহৃদয়তারও পরিচয় বেশ ভাল রকমই পাওয়া গেছে। পুরোনো পণ্ডিতদের কাব্য-রসজ্ঞানের প্রতি তিনি যে এখনো যথেষ্ট শ্রদ্ধা বজায় রাখতে পেরেছেন, এ

কথাটা একেবারে ফাঁস হয়ে গেছে, এ কি কম আনন্দের বিষয়! আমি বরাবরই জানতেম যে যা-কিছু পুরাণো নবকুমার তারই কালাপাহাড়। এমন কি পুরাণো চাল পর্য্যন্ত তাঁর চু-চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছিল এবং বর্জ্জনের ব্যাপারে বিধিমত কোমর বেঁধে লেগেছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে (পুরাণো চালের তো বটেই—আমাদেরও বটে) ক্রমাগত নূতন চালের সেবায় তাঁর কঠিন উদরাময় হওয়াতে কবিরাজের পরামর্শে অবজ্ঞাত পুরাণো চালেরই আশ্রয় নিয়ে মতটাকে ছেড়ে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। এহেন নবকুমার যে পুরাণো পণ্ডিতদের রসজ্ঞানকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, এ ব্যাপারটা যে কত বড়, নবকুমারের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নাই তাঁরা সেটা ঠিক বুঝতে পারবেন না।

তারপর নবকুমারের প্রাণীবৃত্তান্তের বিদ্যেটার দৌড় দেখুন। উপমার টানে জগতের প্রায় সব শ্রেণীর প্রাণীকে টেনে এনে এই ছোট ক'র লাইনের কবিতাটীকে একটী রীতিমত চিড়িয়াখানা বানিয়েছেন। কিন্তু কোন্ অপরাধে এই সব ক্লক্ষের জীবকে এই সংকীর্ণ পাউণ্ডের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে, তার হেতু তো কিছুই দেখা যায় না। আগে প্রাণীর ফিরিস্তিটা দেখুন।

(১) পশু—ঘোড়া মোষ বলদ

(২) পক্ষী—হংস সারস বক গৃধ্র

(৩) কীট—কীট

(৪) পতঙ্গ—এটা যে কি করে বাদ পড়ে গেল বোঝা যায় না। রসজ্ঞ পাঠক একটা ফড়িং ধরে অভাবটা পূরণ করে নেবেন। এ ছাড়া আবার ব্যাধি আছে—যেমন বিস্ফোটক। উদ্ভিদকেও বাদ দেননি—তবে সত্ত আবছায়া না রেখে চচ্চড়ি রেঁধে পাঠকদের পাতে পরিবেষণ করেছেন। অচেতন পদার্থের চৈতন্য নাই বলেই যে তাদের অবিচার করতে হবে, এমন কি কথা? তাই তাদেরও সম্মান রেখেছেন—তাদের প্রতিনিধি ঘণ্টা ও চৌকির জন্য দুটী স্থান রেখেছেন। বেশ দেখা যাচ্চে—কবিরত্ন তাঁর ঘণ্টাকর্ণের উপযুক্ত উপমা খুঁজে আকাশ পাতাল তোলপাড় করেও মনের আকুতি মেটাতে পারছেন না। আলঙ্কারিকেরা বলে থাকেন, ভাবাতিশয্যে এরূপ ঘটে থাকে। কিন্তু উপমার তো যা হোক কোনও রকম একটা সাদৃশ্য থাকা চাই; সেটা যে কোথায় আছে তা খুঁজে বের করা আমার বুদ্ধির অগম্য। পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নাই—একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। নবকুমার লিখেছেন, "ধ্যান-রসিকের তপোবনে নাড়ছো গ্রীবা গৃধ্রহে"। এইখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে একটা কথা বলে নিই। গৃধ্রের সঙ্গে কোনও কোনও বৃদ্ধের স্বভাবের মিল থাকা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু স্বভাবের মিল থাকলেই যে ছন্দের মিল হবে, এ কথা নব-কুমার দূরে থাক স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ বললেও মানবো না। সে যাই হোক্ নবকুমার ছবির বই ছাড়া রক্ত-মাংসের গৃধ্র যে কোথাও দেখেছেন তাঁর লেখা দেখে সেরূপ মনে হয় না। প্রথমতঃ গৃধ্র শ্মশান-ভাগাড়েই থাকতে ভালবাসে—তপোবনের ধার দিয়েও আসে না। তার পর দেখুন, গৃধ্রের দৃষ্টি মৃতদেহের দিকেই; কিন্তু নবকুমার যাঁকে

গৃধ্র-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেছেন, তাঁর দৃষ্টি বিশেষ করে' পড়েছে তাঁরই উপর, যিনি অফুরন্ত প্রাণের উচ্ছ্বাসে চারিদিক একেবারে প্রাণ-মুখরিত করে তুলেছেন।

২। নবকুমারের শাস্ত্র-জ্ঞান-হীনতা ও নৃশংসতা :—

নবকুমার লিখেছেন, "অবোধ মোষের ঘাড় নোয়াতে কত বা ঘি ডলবো?" কিন্তু এই ঘাড় নোয়ানোর ইচ্ছের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটা লক্ষ্য করে দেখার যোগ্য। গাড়ীর চাকায় তেল দেওয়ার কথাটা সার্ব্ব-ভৌমিক হলেও গাড়ী টানার মোষের ঘাড়ে ঘৃত-মর্দ্দনের রেওয়াজ কোথাও আছে বলে মনে হয় না। এক জগদ্ধাত্রী পূজার বলির মোষের ঘাড়ে ঘি ডলে নরম করা হয়ে থাকে বটে কিন্তু সরস্বতীর মন্দিরে লক্ষ লক্ষ কচি মেষ-শাবক বলি দেওয়ার প্রথা সম্প্রতি এ দেশে প্রবর্ত্তিত হয়ে থাকলেও বুড়ো মোষ বলি দেওয়ার কথা শাস্ত্রেও লেখে না দেশাচারেও বলে না। সুতরাং লোক-লজ্জা-বশতঃ নবকুমার আসল উদ্দেশ্যটা চেপে গেলেও বুদ্ধিমান পাঠকের চোখে ধুলো দিতে পারেন নি। তাঁর মনোগত ভাবটা পরি-স্কার ফুটে উঠেছে। কি দারুণ নৃশংসতা! তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে নবকুমার-প্রকৃতির লোকেদের দেশের ছোট বড় মাঝারি কোন রূপ লাট্ পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোনও কালেই নাই। কিন্তু এই নৃশংসতাকেও হারিয়েছে তাঁর মূর্খতার দৌড়টা! তিনি কি মনে করেন এই চির-বৃদ্ধ বিপুলবপু মহিষের কেবল একটীমাত্র স্কন্ধ যে সেটী ছেদন করলেই সে মহিষ-লীলা সংবরণ করবে? এ যে কোটী-স্কন্ধ!

৩। নবকুমারের মিথ্যাবাদ :—

বাজারে পশার রাখার জন্য নবকুমার বড়াই করে বলছেন, 'কত বা ঘি ডলবো?' অজ্ঞ পাঠক মনে করবেন তাঁর ভাঁড়ার বুঝি ঘিয়ের মটকিতে ঠাসা। কিন্তু আমরা যে হাঁড়ির খবর জানি! তাঁর ভাঁড়ে বা ভাঁড়ারে ঘি বা তেল বা ঐ জাতীয় স্নেহ-পদার্থ এক ছটাকও কোনও দিন ছিল না। যদি বা ইতিমধ্যে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট চেয়ে-চিন্তে একটু-আধটু সঞ্চয় করে থাকেন তার পরিমাণ কখনই এতো হ'তে পারে না যে দরাজ গলায় বলতে পারা যায়, "কত বা ঘি ডলবো?"

৪। নবকুমারের স্বদেশ-দ্রোহিতা :—

রবীন্দ্রনাথের কুশিক্ষায় ও কুদৃষ্টান্তে সাহিত্যে বিশ্বজনীন ভাব বলে একটা ধুয়া উঠেছে। কিন্তু ওভাবটা যে নেহাৎ আজগাবি ও বস্তুতন্ত্রহীন একটু প্রণিধান করলে সকলেই তা বুঝতে পারবেন। সংসারে 'বিশ্বজন' বলে রক্তমাংসের প্রাণী যখন কুত্রাপি নাই বা কোনও দিন ছিল না তখন "বিশ্বজনীন ভাব" জিনিসটাও শশশৃঙ্গের ন্যায় অমূলক, আকাশ-বিহারী আলোকচর কাবর আলোর স্বপন। কিন্তু এই ধুয়ার ফলে হিন্দু তার হিন্দুত্ব, বাঙালী তার বাঙালীত্ব হারাতে বসেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সরবতের সঙ্গে এই সাংঘাতিক বিষ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে পান করাচ্ছেন, তার স্বাদ যেমন বিচিত্র, গন্ধ যেমন অপূর্ব্ব, তা দেখতেও তেমনি মনোরম। কাজেই হিন্দুর

বাঙ্গালীর ভারতবাসীর বিপদ অতি ভয়ানক। এ দিকে মুস্কিল হয়েছে এই যে, ভগবান মানুষের একাদশেন্দ্রিয় ঠিক হিঁদু-য়ানীর মাপেই গড়ে তোলেন নি, কাজেই উক্ত সরবতের অখণ্ডতা প্রমাণ করবার জন্য চেঁচিয়ে গলা ভাংলেও মানুষের গুহাবাসী মন তা মানতে চায়না। উপায়ান্তর না দেখে দেশের সুধীবর্গ বিস্তর আলোচনা করে স্থির করেছেন যে, যে-পতঙ্গ আগুনের রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়, তাকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় যেমন তাকে অন্ধ করা, উপস্থিত বিপদ হতে দেশকে বাঁচাবার একমাত্র উপায়ও তেমনি দেশের লোকের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের অনুভূতিকে বিকৃত ও নষ্ট করে দেওয়া অর্থাৎ দেশের লোকের রুচির এমন আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তোলা, যাতে তারা সুন্দরকে আর সুন্দর বলে বুঝতে না পারে! উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং চেষ্টাও এমন বিপুলভাবে হচ্ছে, তাতে অচিরাৎ সুফল ফলবে, বুদ্ধিমান মাত্রেই সেরূপ আশা করছেন। আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু এই রোগের প্রতিকারের যে ব্যবস্থা ঠিক করেছেন, আমার মতে সেই-টীই সব চেয়ে সহজ আর কার্য্যোপযোগী। তিনি বহু গবেষণায় স্থির করেছেন যে গোময়কে হিন্দু যে চোখে দেখেন পৃথিবীর অপর কোনও জাতিই সে চোখে দেখেন না। বলতে গেলে ঐটাই তার সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব। সুতরাং ঐ বিশেষত্বকে বজায় রাখতে ও তার বিকাশ করতে হোলে হিন্দুর বাক্য কার্য্য চিন্তা সাহিত্য দর্শন ইতিহাস এমন কি গণিতেও গোময়ের পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক। অন্যান্য বিষয়ে যাই হোক, গণিতের মত abstract বিজ্ঞানে গোময়ের পরিচয় থাকা কিরূপে সম্ভব হতে পারে, এই প্রশ্নের মীমাংসা-চ্ছলে তিনি যে দুটী অঙ্কের উদাহরণ দিয়েছিলেন—বাস্তবিকই তা' অপূর্ব্ব।

১। একজন বিলাত-ফেরতের প্রায়-শ্চিত্ত কার্য্যে যদি একছটাক গোবর লাগে, তাহলে ১০ কোটী লোকের প্রায়শ্চিত্তে কত গোবর লাগবে ?

২। বর্ত্তমানে দেশে যদি ৩ কোটি গোরু থাকে এবং তারা বৎসরে যদি ৯ কোটি মণ গোবর উৎপাদন করে এবং তাহা সমস্ত ভারতবর্ষের উপর ছড়িয়ে দিলে যদি ½ ইঞ্চি উঁচু হয় এবং প্রতি ১০ বৎসরে লোক যদি শতকরা ৩০ হিসাবে বাড়ে ও গৌরীশঙ্করের উচ্চতা যদি ২৯০০২ ফুট হয় তাহলে সমস্ত ভারতবর্ষকে গৌরীশৃঙ্গের সমান উঁচু করে গোবর দিয়ে ঢাকতে কত বৎসর লাগবে ?

অবান্তর কথা ছেড়ে নবকুমারের বিষয়ে ফিরে আসা যাক। নবকুমার যে দারুণ স্বদেশ ও স্বজাতি-দ্রোহী তাঁর ব্যবহৃত দু'টী শব্দ থেকেই তা জলের মত পরিষ্কার হবে। "চতুর্ম্মুখের মুখ ব্যথা হয় ঢেঁকির সঙ্গে তর্কে। এক মুখে কি বলবো আমি বলদ-ধুরন্ধরকে ?" এই দুই লাইনে "ঢেঁকি ও বলদ" শব্দ দুটী যে গালাগালি-ছলে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে বোধ হয় মত-দ্বৈধ হবে না। কিন্তু এই অসম্মানের দৃষ্টি ভারতের নয়, হিন্দুর নয়, বিদেশীর ও বিধর্ম্মীর। তাঁরা বিদ্বান হতে পারেন, বুদ্ধি-মান হতে পারেন কিন্তু স্বদেশের আত্মার

(Soul of India) যে কোনই সন্ধান পান নি তা নিশ্চয়। দেবর্ষি নারদ যে হাতী ঘোড়া পুষ্পকরথ ছেড়ে ঢেঁকিকেই কেন বাহন করেছেন সে গভীর তত্ত্ব যেন নাই বুঝলেন কিন্তু চোখ মেললেই তো দেখতে পেতেন বিদেশীর অনুকরণে দুরাচারটা চালের কর্ণ হয়ে থাকলেও দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই ঢেঁকি। নবকুমার ও তাঁর দলের দু-চারজন যাই বলুন না কেন দেশের লোক ঢেঁকির মাহাত্ম্য ভালরূপই বোঝে; এককালে পৃথিবীর সব দেশের লোকেই বুঝতো। বড় বড় ঢেঁকির কপালে সিন্দুর চন্দন লেপে তাদের সামনে গড় হয়ে পড়ে থাকাটাকে মানব-জন্মের চরিতার্থতা বোধ করতো। বিশ্বাস না হয় Feudalism ও পোপ-সাম্রাজ্যের ইতিহাস পড়ে দেখুন। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ঢেঁকি-পূজা লুপ্তপ্রায় হয়ে গেলেও নানাবিধ বিপ্লবের মধ্যেও ভারত আপন স্বধর্ম্ম বজায় রাখতে পেরেছে। এই বিশেষত্বের কারণ যখন ভাবি, তখন আমাদের ত্রিকাল-দর্শী পূর্ব্ব-পুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পরিপ্লুত হয়ে ওঠে। তাঁরা যদি কঠোর অনুশাসনে আমাদের বেঁধে না রাখতেন তাহলে আমরাও তো পৃথিবীর আর পাঁচ-জনের মত ঢেঁকি-পূজা ভুলে বসতেম।

সে যা হোক আজ যে পৃথিবীর বড় বড় ঢেঁকিরা পূজার লোভে এই ভারতে এসে সমবেত হয়েছেন এবং আমরাও জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ঢেঁকির কপালেই সিন্দুর চন্দন লেপে সকলের পায়ের তলেই গড় হয়ে পড়ে আছি, এই ব্যাপারের মধ্যে বিধাতার গূঢ় অঙ্গুলির নির্দ্দেশ দেখতে পাচ্ছেন কি? এইখানেই মানব-সভ্যতার নূতন ঊষার উন্মেষ হবে,—মহা-মানবের আবির্ভাব নয়, মহা-ঢেঁকির প্রতি ভারতের খাঁটী মনোভাব যে কি, আগামী ইলেকসন্ ব্যাপার তা চোখে আঙুল দিয়েই দেখিয়ে দেবে। একটা কথা নবকুমার বলতে পারেন—এদেশের মেয়েরাও তো ঢেঁকি বলে গাল দিয়ে থাকে। সেকথা অস্বীকার করার যো নাই। কিন্তু এই অপরাধে আমরা সনাতন-পন্থীরা মেয়েদের প্রতি কি বিধান করেছি, সেটাও একবার লক্ষ্য করে দেখবেন। তাদের সূর্য্য-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ ও বেদের অধিকার কেড়ে নিয়ে কেবল বাঁচবার অধিকারটুকু মাত্র রেখে দিয়েছি—সেও কেবল আমরণ-কাল ঢেঁকি-সেবার নিযুক্ত থাকার জন্য। এই বিধানের ফলও এখন চমৎকার হয়েছে! তারা জন্ম-জন্মান্তর ঢেঁকি-সেবার সৌভাগ্যের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছে। আমরাও ঐ সেবাটুকুর লোভে চির-ঢেঁকিত্ব লাভের সাধনায় দেশ-শুদ্ধ লোক ব্যাপৃত হয়ে আছি।

এখন বলদের কথাটা আলোচনা করে দেখা যাক্। গবর্ণমেণ্ট Statistics থেকে দেখা যায় এই ভারতবর্ষের অধিবাসীর শত-করা ৭৫ জন বলদের দ্বারা চাষ করে থাকে। ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে গেলে আর একটু খুলে বলা দরকার। ভারত-বর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ২৬৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৩ বিঘা জমির আবাদ হয়ে থাকে; ১৪৯ কোটি ৭৩ লক্ষ ৩ হাজার ১৯ বিঘা জমিতে ৭৭৩ কোটি মণ খাদ্যদ্রব্য

উৎপন্ন হয়। এছাড়া গরুর গাড়ী ও ভারবাহী বলদের তালিকা দিলে একেবারে ছবির মত দেখতে পাবেন যে কত কোটি বলদ পরোপকারের জন্য আত্মোৎসর্গ করছে। ভারতের এমন পরম মিত্রকে যে ব্যক্তি অমন অনায়াসে অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারেন, তিনি যত বড় কবি ও ভাবুকই হোন্‌না কেন, একেবারে হৃদয়হীন অমানুষিক এ আমি জোর গলাতেই বলবো। নবকুমার-সম্প্রদায় আজ যদি চিরদিনের জন্য পৃথিবী-পৃষ্ঠ হতে বিদায় নেন, তাতে যে ফাঁক পড়বে সেটা খালি চোখে বোধ হয় কারো নজরেই পড়বে না। কিন্তু বলদের অভাব! কল্পনাতেও যে আতঙ্কজনক। আর কিছু না হলেও এই বলদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরাই তো চিনির বলদরূপে পৃথিবীর প্রাচীন কাল হতে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন পিঠে করে বহন করে এনেছেন—আর সে এমন নিঃস্বার্থভাবে যে এক বিন্দু রসও নিজে আস্বাদ করেন নি! এজন্যও তো নবকুমার কোম্পানির তাঁদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত! নবকুমার তো অতি অনায়াসেই বলদ তুলে গাল দিলেন—কিন্তু ধীরে রজনী, ধীরে! ইনি কি যে-সে বলদ—ইনি যে স্বয়ং তমোগুণরূপী মহাকালের বাহন। এঁর পিঠের তমোগুণের ঝুলি হতে তিনি মুঠি মুঠি অন্ধকার নিয়ে চারিদিকে ছড়াচ্ছেন—যেদিন থলি উজাড় করে ঢেলে দেবেন, সেদিন দিগ্বিদিকে বিষাণ বেজে উঠবে।

৫। বয়োজ্যেষ্ঠের অসম্মান :—

নবকুমার কোম্পানির এই একটা বিশেষ বাহাদুরির লক্ষণ সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে তাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান করেন না, সত্যেরই নাকি সম্মান করে থাকেন। কেবল যে সম্মান করেন না তা নয়, যথাসাধ্য অবজ্ঞাও দেখিয়ে থাকেন। তাঁদের যুক্তিটা এই—যে লোক এত দিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার বিন্দুমাত্র পরিচয় পেলেনা তার পিঠের বয়সের বোঝা আবর্জ্জনার রাশি বই নয় এবং আবর্জ্জনার প্রতি মানুষের একমাত্র সম্মান সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগ। যুক্তিটার যে একটু বাহ্য চটক আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—এমন কি আমারই প্রথমটা একটু ধাঁধা লেগেছিল। কিন্তু গুরুকৃপায় হঠাৎ একটা গভীর তত্ত্বের প্রতি পড়ায় এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলাম সব কথা খুলে বলার হুকুম নাই, বললেও অনধিকারীতে বুঝবে না। আভাসে ইঙ্গিতে একটু জানিয়ে দিচ্ছি। হ্যামলেটের কথাটা মনে পড়ে কি,—There are more things in Heaven and Earth ইত্যাদি? কথাটা খাঁটি সত্য, সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান-ভূত জগতের অনেক সূক্ষ্ম শক্তি আবিষ্কার করেছে এবং ক্রমশঃই করছে এ কথা সকলেই জানেন। যেগুলি ধরা দিয়েছে অজ্ঞাতের তুলনায় তা যে নগণ্য, মুষ্টিমেয়, বৈজ্ঞানিক মাত্রেই তা স্বীকার করেন। এই অজ্ঞাত শক্তিরাশির অনেকগুলি ভৌতিক বীক্ষণে কোন দিনই ধরা দেবে না—তাদের ধরার জন্য যে মনো-বীক্ষণ দরকার ভারতীয় আর্য্যেরাই তার রহস্য কতকটা বুঝেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন এই নিগূঢ় শক্তি সমূহের নিত্য

সংস্পর্শে জাগতিক পদার্থ মাত্রেই প্রতি মুহূর্ত্তে একটা অনির্ব্বচনীয় মহিমা লাভ করেছে। সুতরাং যার যত বয়স বেশী হবে সে তত অধিক পরিমাণ এই অতি তাড়িৎ শক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে—তা সে মানুষ জীব-জন্তু গাছপালা আচার ব্যবহার যাই হোক না কেন। ভারতবর্ষ যে নাগা-ইদ মাটী পাথর ইস্তক হনুমান বানর পর্য্যন্ত পূজা করেন, সে কেবল এই তত্ত্বটা কতক বোঝেন বলে। আর এরা যে মানুষের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও সে-বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারপর দেখুন অন্ধকার আলোর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে আমরা তার কি সম্মানই না করি। এমন কি আলোকটাকে হঠাৎ নবাব বলে অশ্রদ্ধায় চোখেই দেখে থাকি। উপনিষদ অন্ধকারের চেয়ে আলোর বেশী সম্মান করেছেন বলে আমরা সনাতন-পন্থীরা উপনিষদকে পর্য্যন্ত একঘরে করেছি। নব্যপন্থী ব্রাহ্মরা আছেন বলে তিনি কোনও রূপে চলে যাচ্ছেন।

৬। নবকুমার সম্বন্ধে আশঙ্কা :—

এই লেখাটায় নবকুমার কিছু বেশী মাত্রায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন সে কথা গোপন করার যো নাই। এইটী লেখার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁর মানসিক টেম্‌পারেচার যে স্বাভাবিকের চেয়ে অন্ততঃ ৪ ডিগ্রী উপরে ছিল সে কথা আমি শপথ করে বলতে পারি। তিনি হয়তো বলবেন "আসৈলে", (সাধুভাষায় যাকে অসহনীয় বলে) দেখলে তাঁর গা জ্বালা করে। কিন্তু তিনি কলিযুগে মানুষ হয়ে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন—গা-জ্বালা করাটাই যদি তাঁর প্রকৃতি হয় তাহলে সে গা জ্বালা যে রাবণের চিতার মত জ্বলবে! তার নিবৃত্তি বা কোন্ খানে এবং বিরামই বা কোন্ কালে? আর তার উপশমই বা কোন্ ঔষধ-প্রয়োগে? তাঁর শরীর ও মনের উপর এই নিদারুণ গাত্র-জ্বালার যে কি শোচনীয় ফল ফল্‌বে তা কল্পনা করতেও ভয় হয়। আবার বিপদ এই যে, এই গা-জ্বালার আগুন আপনাকে ও পরকে যৎখানি পোড়ায় সে অনুপাতে আলো দেয় না। বরঞ্চ অনেক সময়ে ধোঁয়াতে সব কলুষিত করে রাখে। যাই হোক তিনি যদি সঙ্কল্প করে থাকেন যে এই দুর্ল্লভ মানব-জন্মটা কেবল জ্বলে জ্বলেই খোয়াবেন তাহলে নাচার।

আমি জানি নবকুমার এর কি জবাব দেবেন। তিনি নাটকের নায়কের মত গম্ভীর কণ্ঠে বলবেন যে চাইনে জান্‌তে এর ফল কি হবে—মিথ্যার বিরুদ্ধে এই যে জেহাদ ঘোষণা,—শেষ রক্তবিন্দুটী পর্য্যন্ত দিয়ে এই ব্রত পালন করতে হবে। আমরা যে Soldiers in the liberation war of Humanity. কে বলে মানুষ মুক্তি চায়? সে মুক্তি-স্বপ্নের আনন্দ-বেগে জেগে উঠে বাঁধনগুলোকে আরও কড়া করে বাঁধে। যে অস্ত্রে তার পায়ের শিকল কাটে সেই অস্ত্রকেই তার গলার শিকল করে তোলে। যদিও মনে ভাবে, এ শিকল নয়, কণ্ঠহার—রুসোই বল প্রেসিডেণ্ট উইলসনই বল আর যিনিই বল মানব-মুক্তির সকল যোদ্ধার সকল চেষ্টাই লামাক্কার মহাবীরের চেষ্টারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। নানা চিত্রকরের দ্বারা

নানা চিত্র-ভূমিকায় নানা তুলিতে নানা বর্ণে সেই অতিবৃদ্ধ অদৃষ্টের পুরাতন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটাই বার বার আঁকা হয়ে চলেছে, না-জানি, কোন্ প্রতিকূল দৈত্যের প্রকাণ্ড পরিহাস-বশে! কে জানে, এ ট্রাজেডি না কমেডি?

আমি যদি স্থির জানতেম, নবকুমার ভয় পেয়ে আপনার অভীষ্ট পথ হতে ফিরে আসবেন তাহলে হয়তো তাঁর চোখের সামনে এ নিরাশার ছবিটা তুলে ধরতেম না। কিন্তু যে বাঁশী শুনেছে সে যে কতখানি দিয়ে শুনেছে সে আমি জানি। আমি জানি সত্য কত সত্য—মহৎ কেমন মহৎ, সুন্দর কিরূপ সুন্দর! Knight of the Sorrowful Countenance এর শেষ কথাটা আমার মনের কাণে বেজে উঠছে,—

Dulcinea is the loveliest Lady on the earth and I the most unfortunate of Knights. But it is not meet that my weakness shall deny the Truth. Drive home thy lance Sir, Knight!

শ্রীঅশীতিপর শর্ম্মা।

পথের বঁধু

নিতাইয়ের নেশাটা সেদিন কি রকম চড়ে গিয়েছিল, কিছুতেই ঘুম আসছিল না। অনেকক্ষণ ধরে এপাশ-ওপাশ করতে-করতে যেমন একটু তন্দ্রা এসেছে ঠিক সেই সময় দেয়ালের ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। নিতাইয়ের মনে হল কে যেন তার মগজে দু-ঘা হাতুড়ী মেরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পড়ে পড়ে সে ভাবতে লাগল ঘুম যদি একেবারে না হয়, তবে কালকে আবার আফিসে গিয়ে ঢুলতে হবে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—আরে কালকে ছুটি যে। পরম আলস্যে সে পাশ বালিসটাকে জড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে আবার ঘুমের সাধনাতে মন দিলে।

বেলা তখন প্রায় ন-টা। মুখের উপর রোদ এসে পড়াতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাত্রিতে নেশার ঝোঁকে বালিশ নিয়ে সে মেঝেতেই শুয়ে পড়েছিল। সেইখানে শুয়ে শুয়ে সে দেখলে খাটের উপর চারু পড়ে রয়েছে। তার একটা পা বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে, আর একটা পা মাটির দিকে ঝুলে।—শোয়া ও বসার মাঝামাঝি একটা অবস্থা।

ঘরের এককোনে দুটো দেশী মদের বোতল, একটা খালি, আর একটাতে তখনো একটু মদ রয়েছে। চারুর দিকে চেয়ে চেয়ে নিতাই বল্লে—ছোঁড়ার এখনও নেশা কাটেনি দেখছি, এই চেরো উঠবিনে—

চারুর কোন জবাব নেই।

নিতাই পাশ ফিরে আবার চোখ বুঁজিয়ে

ফেল্লে। আরও আধঘণ্টা এপাশ-ওপাশ করে সে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে পড়ল। গত রাত্রির ফুর্ত্তির নিশানা তখনো ঘরময় এদিক-ওদিক ছড়ান রয়েছে। সে জিনিষপত্রগুলোকে গুছিয়ে রেখে ঘরটাকে বেশ করে ঝাঁট দিলে। তারপর জাফ্‌রুলকাঠের টেবিলটার উপর থেকে একখানা আধপোড়া সিগারেট তুলে নিয়ে সেটাকে ধরিয়ে ডাকলে—এই চেরো উঠবিনে—

চারু চোখ না চেয়ে শুধু তার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে—হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে বিরাট একটা ব্যবধান।

নিতাই একটা সুখ-টান দিয়ে চুরুটটা চারুর হাতে দিলে। চারু চোক বুঁজিয়েই তাতে কষে একটা টান মেরে উঠে বল্লে—আজ ছুটি না—নিতাই টেবিল চাপড়ে গান ধরলে—

ছুটি ছুটি ছুটি
আজকে ছুটি কালকে ছুটি
পরশু ছুটিরে—
আমরা দুটি চালাই খাঁটি
মজা লুটি রে—

মকদুমপুরে রেলি ব্রাদার্সের যে তিষির আড়ত আছে, নিতাই ও চারু সেখানে কাজ করে। চারুর দুনিয়ায় কেউ নেই, দুর সম্পর্কের এক মামার বাড়ীতে সে মানুষ হচ্ছিল। এই দূর সম্পর্কের মামাকে যেদিন সুদূরের ডাকে তল্পী-তাল্পা গুটোতে হল সেই দিন থেকে তাকে নিজে চরে খেতে শিখতে হয়েছে। নিতাইয়েরও তাই, পৃথিবীতে থাকবার মধ্যে তার এক ঠাকুরমা আছে, কাশীতে থাকে। ঠাকুরমা থাকার জন্য সাংসারিক সুবিধা তার কিছুই নেই বরং অসুবিধাই আছে। কারণ প্রতিমাসে তার কুড়িটাকা মাইনে থেকে পাঁচটা করে টাকা কাশীতে পাঠাতে হত। দুজনে প্রায় সাত বছর এই মকদুমপুরে এক সঙ্গে বাস করছে, দুটীই সমান অভাগা, মিলেছেও ভাল।

চারু বল্লে আজ রাঁধাবাড়ার কি হবে? ট্যাকে ত একটা আধলাও নেই।

—কাল কি সব খরচ করে ফেলেছিস্ নাকি!

—ছিলত মোটে তিনটে টাকা—আফিস খোলা থাকলেও না হয় পাওয়া যেত, গুডফ্রাইডের ছুটি পড়ে সব মাটি হয়ে গেল। নিতাই বল্লে—তবুত ছুটির একটা দিনও কাটেনি—দে আজ ভাতে-ভাত চড়িয়ে।

—আরে ভাতে-ভাত চড়াই কি দিয়ে, চালও যে নেই, ওদিকে মাংসওয়ালা ব্যাটা এমন তাগাদা জুড়েছে যে ও-পথ মাড়াবার যো নেই।

রাস্তা দিয়ে একটা ছেলে জংলা সুরে কি একটা গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছিল, নিতাই সেই সুরে শিষ দিতে আরম্ভ করলে আর চারু তালে তালে টেবিল চাপড়ে তবলা বাজাতে লাগল।

মিনিট দুয়েক এই অপূর্ব্ব ঐক্যতানবাদন চলবার পর শিষ থামিয়ে নিতাই বল্লে—আয় তবে এবেলা একাদশী করা যাক, ওবেলা কানাইয়ালালের ওখানে আমার নেমন্তন্ন আছে আসবার সময় গোটা কয়েক লাড্ডু পকেটে ভরে নিয়ে আসব'খন।

খানিকপরে আপনার মনে সে আবার বলতে লাগল—ফরসা জামাও নেই, কি পরে যে যাই। আফিসের কোট এঁটে ত আর ভদ্রলোকের বাড়ী যাওয়া যায় না।

দুই বন্ধুতে সেদিনকার মতন একাদশীর বন্দোবস্ত করে বেলা এগারোটার সময় আবার বিছানা নিলে। দিনটা প্রায় কাটিয়ে দিয়েছিল হঠাৎ দরজা ধাক্কার আওয়াজ শুনে চারু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে দেখলে একজন আগন্তুক এসে উপস্থিত। লোকটী বাঙ্গালী, বয়স প্রায় তেত্রিশ চৌত্রিশ। চেহারা ও সাজগোজ দেখে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। আগন্তুক চারুকে নমস্কার করে বল্লে—মশায় আমি বাঙ্গালী,নাম নরেশচন্দ্র ঘোষ। আপনারা বাঙ্গালী তাই আপনাদের এখানে এসে হাজির হয়েছি।

নিতায়ের চোখ থেকে দিবা নিদ্রার জড়তাটা তখনো কাটেনি। রাত্রে তার ভাল করে ঘুম হয় নি, দিনের ঘুমটী বেশ জমে এসেছিল কোত্থেকে এই লোকটা এসে লাখ টাকার ঘুমটা মাটি করে দিলে। চোখ বুঁজিয়ে পাশ ফিরতে-ফিরতে সে বল্লে—তা বেশ করেছেন, কিন্তু এই পাণ্ডব বর্জ্জিত স্থানে আসার উদ্দেশ্য? প্রত্নতত্ত্ব বুঝি!

নরেশ বল্লে—আর সে কথা বলবেন না মশায়, যাচ্ছিলুম বাঁকিপুরে, এই ষ্টেশনে নেমে খাবার কিনতে-কিনতে ট্রেনখানা ছেড়ে দিলে। আপনারা একঘর বাঙালী আছেন শুনে এখানে এসেছি।

চারু বল্লে—তা বেশ করেছেন।

নিতাই একটা তান ধরলে—

আসিতে হে যদি নব-যৌবনে
ওগো রাজ-অধিরাজ—

—বাঃ দিব্যি গলাটী ত আপনার—

চারু বল্লে—হ্যাঁ, উনি একজন উঁচুদরের গাইয়ে—নাম নিতাই মুখুয্যে। রেলির আড়তের তিমির প্রেমে মজে এখানে আশ্রম কোরেছেন।

নিতাই তড়াক করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে বলতে আরম্ভ করলে—আর ইনি—এঁর নাম চারু দত্ত,—জাতিতে কায়স্থ বলেন বটে, কিন্তু সেটা বিশ্বাস হয় না—ইনি একাধারে কবি, গল্প লেখক, সমালোচক—বাংলার সাহিত্য-গগণের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র—মশায়, ইনিও তিমি—

নরেশ বল্লে—আপনি চারু বাবু—আপনার লেখা ত প্রায়ই পড়ি। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় আনন্দ হল। বেশ আছেন আপনারা দুটীতে—

নরেশের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে নিতাই আবার তান ছাড়লে—

আমরা দুটী
স্বর্গ লুটি
মর্ত্ত ভরেছি—

নরেশ নিতাইয়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল—আহা, বেশ আছে এরা—না আছে বড়বাবুর রক্তচক্ষু, না আছে সাহেবের দাবড়ী। দুনিয়াশুদ্ধ লোক গুডফ্রাইডেতে চারদিন ছুটি পায়, নরেশের বড়বাবু তাকে হুকুম করেছিলেন সোমবারে একবার বেরুতে হবে হে—কত কষ্টে বড় বাবুর হাতে-পায়ে ধরে চারদিনের ছুটি নিয়ে সে একটু বেরিয়ে পড়েছে। কেরাণী জীবনেও এত আনন্দ থাকতে পারে দেখে তার মনটা আপনিই খুসী হয়ে উঠছিল।

তান থামিয়ে নিতাই জিজ্ঞাসা কল্লে—এতক্ষণ ত আমরা নিজেদের বাহবা গাইলুম,

এখন মশায়ের নামটী জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—খুব পারেন, আমার নাম নরেশচন্দ্র ঘোষ। কলকাতায় চাকরী করি—

—চাকরী করেন! তবে ও নামটাতে আমার আপত্তি আছে, নামটা বদলে ফেলুন মশায়।

চারু নিতাইকে একটা ধমক দিলে—চুপ কর্। তারপর সে নরেশকে বল্লে—কিছু মনে করবেন না মশায়, ও একটু—

নরেশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে—না, না, মনে করব কেন, উনি ঠিক কথাই বলেছেন।

নিতাই খাটখানার উপর একটা চাপড় মেরে বল্লে—আচ্ছা বাবা, নরেশ নরেশই সই, নামে কি করে—What's in a name

Oh Romeo—

বাঁকীপুরে কি কাজে যাওয়া হচ্ছিল?

—বাঁকীপুরে কাল সাহিত্য-সম্মিলন হচ্ছে দেখতে যাচ্ছি, পথে এই কাণ্ড।

চারু বল্লে—জামা খুলে হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, রাত বারোটার গাড়ীতে যাবেন'খন। নরেশ জামা খুলতে লাগল, সেই অবসরে চারু নিতাইকে ইঙ্গিত করলে ভদ্রলোক এসেছে, এখন দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের কি হবে?

নিতাই নির্ব্বিকার ভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—যীশু বলিলেন হে মনুষ্যপুত্র, তোমরা শুক্রবার নিরম্বু উপবাসে কাটাইবে, কারণ ঐ দিন আমি তোমাদের স্বর্গরাজ্যে যাইবার জন্য পাশ বিলি করিব।

চারু নরেশকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

নরেশ বল্লে—এই ষ্টেশনে পুরী কিনেছিলুম কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের পুরোন পুরীতে প্রবেশ করতে সাহস হল না মশায়, ফেলে দিতে হল।

নিতাই বল্লে—চলুন তাহলে আমাদের সঙ্গে বাজারে। আপনার বেড়ানও হবে, আমরাও খাবার-দাবার কিনে এনে রান্না চড়িয়ে দিই। আপনি দয়া করে এসেছেন, অতিথি-সৎকার করতে হবে ত।

এই দুটী লোকের কথাবার্ত্তা আর ব্যবহার দেখে শুনে নরেশ বেচারী একটু ভড়কে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে কলকাতায় মানুষ হয়ে তার একটা ধারণা ছিল যে তারা অন্য জায়গার লোকদের চেয়ে একটু উচ্চ শ্রেণীর জীব। নিতাই আর চারু তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, না, তাদের ব্যবহারই ঐ রকম তাই নিয়ে সে একটু গোলমালে পড়ে গেল। যাক, যতক্ষণ এখানে থাকা যায় চুপ করে বসে না থেকে দেশটা একটু ঘুরে দেখে নিলে মন্দ কি—ভেবে নরেশ বল্লে—চলুন।

পায়চারি করতে করতে তারা বেনের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক দিন থেকে এই লোকটার তাগাদার চোটে তারা এই রাস্তা দিয়ে চলা ফেরা বন্ধ করে দিয়েছিল। দোকানে এসে চারু মস্ত একখানা ফর্দ্দ দিয়ে বল্লে—এখুনি এই জিনিস গুলো যেন বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, দামটা দিনকয়েক পরে পাবে।

বাবুদের সঙ্গে নতুন লোক দেখে বেনিয়া মহারাজ পুরোন ধারের কথাটা আর পাড়েনি কিন্তু আবার ধারের কথা শুনে

সে খাপ্পা হয়ে বল্লে—আগাড়ী যো উধার গিয়া—

—দাঁড়া না ব্যাটা, ভগা নেহি ভেজনেসে কাঁহাসে রূপেয়া দেগা ?

বেনিয়ার নন্দন অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চারুর দিকে চেয়ে থেকে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করলে—ভগা ! !

নিতাই বল্লে—হঁ।—ভগাকা নাম নেহি শুনা—এতনা বড়া ম্যাজিষ্ট্রেট—উ চারু বাবুকা দাদা হায়।

মাংসওয়ালাকেও ভগার চেক দেখিয়ে তারা সন্ধ্যের সময় বাজার করে নিয়ে বাড়ী ফিরে রান্না-চড়িয়ে দিলে।

নরেশ গায়ের কোট আর পাঞ্জাবীটা খুলে এক জায়গায় টাঙিয়ে রেখে তাদের সঙ্গে রাঁধতে লেগে গেল। ঘণ্টা খানেক পরে নিতাই চারুকে ডেকে বল্লে—ওরে আমি কানাইয়ালালের বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি, বেচারা অনেক করে বলে গেছে—গোটা চারেক গান গেয়েই পালিয়ে আসব।

—আচ্ছা, বলে আবার চারু ময়দা মাখার দিকে মন দিলে।

নরেশ চারুকে সাহায্য করছিল আর ভাবছিল, এখানে এসে বেচারীদের বড় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছি, ভাবটা একটু জমিয়ে নেবার জন্য সে চারুকে জিজ্ঞাসা করলে—চারু বাবুর দেশ কোথায় ?

চারু একচোখ বুঁজিয়ে কাঠের উনুনে ফুঁ দিতে দিতে বল্লে—আকাশের তলায়—আপনার ?

—আমার বর্দ্ধমান জেলায়, তবে দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

ফুঁ দিতে দিতে উনুনটা যখন বেশ ধরে উঠল তখন চারু মাংসর হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে গত রাত্রে যে বোতলটা শেষ করা হয়নি সেটাকে বের করে গেলাসে একটু ঢেলে নরেশকে বল্লে—আসুন।

নরেশ হাত জোড় করে বল্লে—মাপ কর্ব্বেন মশায়, ওসব অভ্যেস নেই।

—বিলক্ষণ, কলকাতায় থাকেন আর অভ্যেস নেই কি রকম, সে কি একটা কথা হল।

শনিবার হলেই নরেশদের মেসের বাবুরা মদ খেয়ে হল্লা লাগাত। সোজা মানুষগুলো জলের মতন এই একটু পদার্থ খেয়ে কি রকম ওলট-পালট হয়ে যায় দেখে দেখে ও জিনিটার উপর তার একটা ভয় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তবে জীবনে কখনো মদ ছোঁয়নি একথা সে হলফ করে বলতে পারে না। মেসের বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে তাকে দু’ একবার খেতে হয়েছিল কিন্তু নেশা হবার মতন মদ সে কখনো খায় নি। কাজেই মদ খেতে যে কষ্টটুকু পেতে হয় তার অভিজ্ঞতা নরেশের ছিল, নেশার মজাটা সে কখনো পায় নি।

সে হাত জোড় করে বল্লে—আমায় মাপ করুন চারু বাবু—আবার বারোটার গাড়ীতে যেতে হবে।

চারু বল্লে—আপনি না খেলে বুঝব গরীব বলে এই ধান্যেশ্বরীকে অবহেলা কচ্ছেন। আমায় এখন তবে বিলিতী আনতে যেতে হল।

সে আলনা থেকে জামাটা নিয়ে তাতে হাত গলাতে লাগল।

চারুকে জামা পরতে দেখে নরেশ বল্লে—আহা—না—না—আপনি পাগল হলেন নাকি—আচ্ছা দিন মশায়—আপনার কথায় এটুকু খাচ্ছি, আর খেতে বলবেন না কিন্তু—

সে চারুর হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে চোঁ করে এক চুমুকে পাত্রটা নিঃশেষ করে ফেল্লে।

সমস্ত দিন রেলের ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে নরেশের শরীরে একটা অবসাদ এসেছিল। সুরার অব্যর্থ শক্তিতে তার সে অবসাদটুকু কেটে গিয়ে মনটা একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠল। নরেশের মনে হচ্ছিল, একটা গান গাওয়া যাক্—কিন্তু চারু কি মনে করবে ভেবে এই অহেতুকী ফুর্ত্তিটাকে কোন রকমে চেপে সে জিজ্ঞাসা করলে—নিতাই বাবুর গলাটী বেশ, না? .

মাংস কষতে কষতে চারু জবাব দিলে—বেড়ে—

নরেশের মনে হচ্ছিল আর একটু খেলে হত। কিন্তু প্রথমে সে যে রকম আপত্তি করেছিল তাতে আর চাওয়া যায় না—সে ঠিক করে রাখলে এবারে বল্লে দেওয়া-মাত্র খেয়ে ফেলব। আধঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরও চারুর কোন রকম উচ্চবাচ্য না পেয়ে নরেশ মুখ ফুটে বলে ফেল্লে—দাদা, খুব কম করে আমায় আর একটু দিন ত।

চারু নরেশকে একটুখানি দিয়ে বোতলে যেটুকু ছিল নিজে শেষ করে রান্নায় মন দিয়েছিল, নরেশ আবার চাওয়াতে সে একটু ফাঁপরে পড়ে গেল। বোতলে ত এক ফোঁটা নেই, তা ছাড়া কাছে পয়সাও নেই যে আনিয়ে নেবে। তবু সে বল্লে—আর ত নেই দাদা, আচ্ছা দাঁড়াও, আনিয়ে নেওয়া যাচ্ছে—

নরেশ কোটের পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে বল্লে—চল দাদা, তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক্, ওটা এনে তারপর রান্নার দিকে মন দেওয়া যাবে।

চারু একবার মুখ তুলে দেখলে, নরেশ যেখানে কোট আর পাঞ্জাবী খুলে রেখেছিল সেখানে শুধু কোটটা ঝুলছে। পাঞ্জাবীটা অন্তর্হিত হয়েছে দেখে সে আপনার মনে বিজ বিজ করে কি বল্লে।

নরেশ বল্লে—দাদা আমাকে কিছু বলছ?

—না ভাই, ভাবছি, কাকে দিয়ে বোতলটা আনাই।

নরেশ ব্যাগটা খুলে জিজ্ঞাসা করলে—ক'টাকা লাগবে দাদা?

—ও কি, তুমি টাকা বার করছ কেন?

—ওই ত দাদা, আমাকে পর ভাবলে।

চারু পাড়ার একটা ছেলেকে ডেকে টাকাটা দিয়ে তখুনি তাকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিলে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে দেখতে পাওয়া গেল চারু মাটিতে পড়ে প্রাণপণে পাশ বালিসটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে আর বলছে—

—ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্ম্মের গৃহিণী।

আর নরেশ তার সামনে উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, তার গাল বয়ে টস টস করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে মোম-বাতিটাকে নিবিয়ে দিয়ে গেল। ঐটুকু আলোর মধ্যে একরাশ জ্যোৎস্না কি রকমে

লুকিয়ে ছিল, বাতিটা নিবে যেতেই ঘরটা চাঁদের আলোয় ভাসতে লাগল।

জ্যোৎস্না দেখে চারু পাশ বালিসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুরু করলে—

হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অন্তরের অন্তরশায়িনী! নাহি সীমা
তব রহস্যের!

ওদিকে কানাইয়ালালের আসরে বসে মাংস পোড়ার গন্ধে নিতাই চমকে চমকে উঠতে লাগল।

নরেশ তন্ময় হয়ে চারুকে দেখছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল—মাংসটা বোধ হয় পুড়ে গেল।

এঁ্যা—বলে চারু একলাফে উঠে পড়ে দেশলাই খুঁজে বাতিটা জ্বেলে মাংসর হাঁড়ি নাবিয়ে ফেল্লে। তারপর নিজে একপাত্রখেয়ে নরেশকে একটা পাত্র ভরে দিলে।

নরেশকে পাত্রটা দিয়ে সে হাঁড়ি থেকে একটা মাংসর টুকরো তুলে নিয়ে দেখছিল, সেগুলো খাবার অবস্থা পেরিয়ে গেছে কিনা এমন সময় নরেশ বল্লে—দাদা পাঞ্জাবীটা ওখানে রেখেছিলুম দেখতে পাচ্ছিনা—

—এঁ্যা, পাঞ্জাবী! তাইত গেল কোথায়। চারু বাইরের বারান্দায় গিয়ে ডাকলে—ভতু —নেতা ছোঁড়া সেই যে গেছে—তাইত মহা মুস্কিলে পড়লুম যে!

চারু ঘরে ঢুকতেই নরেশ বল্লে—খোঁজ পেলে দাদা? সেটাতে সোনার বোতাম ছিল।

—কিছু ভয় নেই, এই পাত্রটা টেনে নাও, ও পাঞ্জাবী টাঞ্জাবী কিছু মনে থাকবে না

নরেশ সে পাত্রটা নিঃশেষ করে গেলাসটা রাখতে রাখতে বল্লে—রেখে দাও তোমার পাঞ্জাবী—পড় দাদা, কবিতা পড়।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা তুমি ছেড়ে তুই-তুকারি আরম্ভ করে দিলে। খানিকক্ষণ পরে চারু প্রতিজ্ঞা করে বল্লে—তোর আফিসের বড়বাবুকে আমি খুন করে ফেলব। ঘণ্টা খানেক পরে তারা দুজনে দিব্যি করে ফেল্লে—জীবনে আর কখনো ছাড়া-ছাড়ি হব না।

রাত্রি বারোটার সময় নিতাই টলতে টলতে দুম-দাম করে ঘরের মধ্যে এসে দেখলে একদিকে একতাল ময়দা, মাখা মাটিতে গড়াচ্ছে আর একদিকে নরেশ আর চারু গলা জড়াজড়ি করে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে।

তাদের সেই অবস্থা দেখে নিতাই কীর্ত্তন ধরলে—

আমার নাগর, যায় পর-ঘর
আমারই আঙিনা দিয়া—

বারোটার গাড়ী তখন ষ্টেশনে এসে ভোঁ দিচ্ছিল, বাঁশীর শব্দ পেয়ে নরেশ ধড়মড় করে উঠে বল্লে—বারোটার গাড়ী কি চলে গেল দাদা?

নিতাই বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে ধড়াস করে খাটের উপর পড়ে সুর ভাঁজতে লাগল —যাচ্ছে যাক, কিছু বোলো না, কিছু বোলো না।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

স্মিথের ইতিহাসে

শিবাজী ও আফজল খাঁ

মিঃ ভিন্সেণ্ট, এ, স্মিথ বহুদিন ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিসে চাকরী করিয়াছেন। তখন তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস চর্চ্চা করিতেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সময় তিনি তাঁহার Early History of India সঙ্কলন করেন। তার পর ভারত-বর্ষের ললিত কলা সম্বন্ধেও তাঁহার একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হিন্দুযুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতেই তিনি আকবর সম্বন্ধে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। শাসন-সংস্কারের আলোচনা-কালেও তিনি নীরব ছিলেন না; ইতিহাসের দিক হইতে তিনি শাসন সংস্কারের প্রশ্নের যে বিচার করিয়াছিলেন তাহাতে অনেকেই ভারতের রৌদ্র-দগ্ধ বৃদ্ধ অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সুলভ সঙ্কীর্ণ-তার পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তারপর তিনি বিলাতের History পত্রে কয়েকজন উদীয়মান বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে ইঁহারা প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান গুলি গোলাপী চশমা পরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন। অবশেষে জীবনের সায়াহ্নে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের একখানি আমূলক ইতিহাস The Oxford History of India রচনা করিয়া অতি অল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

পরলোকগত কোন লেখকের রচনার আলোচনা শ্রদ্ধার সহিত না করিতে পারিলে তৎসম্বন্ধে নীরব থাকাই সঙ্গত। সুতরাং এতদিন স্মিথ সাহেবের এই অভিনব গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য থাকিলেও নীরব ছিলাম। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এত প্রচুর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে যে একই ব্যক্তির পক্ষে এক জীবনে তাহা আয়ত্ত করা অসম্ভব। সুতরাং স্মিথ সাহেবের গ্রন্থকেও কোন স্থিরচিত্ত 'সুধী ব্যক্তি সাধারণ 'স্কুল-পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা উচ্চস্থান দিবেন এ সন্দেহ আমার ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। দিন কয়েক হইল দেখিলাম একখানি দৈনিক পত্রে রাজা নন্দকুমারের ফাঁসি সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইয়াছে; তাহার মর্ম্মার্থ এই যে স্মিথের মত পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনার পর বলিয়াছেন যে নন্দকুমারের ফাঁসিতে কোন প্রকার বিচার-বিভ্রাট ঘটে নাই; অতএব এ সম্বন্ধে অতঃপর আর কাহারও কিছু বলিবার অধিকার রহিল না। এইবার প্রমাণ হইয়া গেল যে নন্দকুমারের ব্যাপারে হেষ্টিংস ও ইম্পের কোনই অপরাধ নাই। এই নন্দকুমারের বিচারের মূল দলীল-পত্র বোধ হয় বেভারিজ সাহেব অপেক্ষা কেহই অধিক মনোযোগের

সহিত পাঠ করেন নাই। বেভারিজের যুক্তি স্মিথ খণ্ডন করিতে পারেন নাই, সে চেষ্টাও তিনি করেন নাই; তিনি কেবল বলিয়াছেন বেভারিজের লেখা পক্ষপাত-দুষ্ট। ব্যস্। অতঃপর আর কোন যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নাই। স্মিথের অভিযোগ এই যে বাঙ্গালার নবীন ঐতিহাসিকেরা গোলাপী চশমা পরিয়া তাহাদের দেশের অতীতের ইতিহাস নির্ণয় করিতে চাহেন, কিন্তু exford History of India পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মিথ সাহেব নিজে ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা-কালে মসীবর্ণ চশমা পরিধান করিয়া থাকেন। হয়ত প্রকাশকদিগের চেষ্টায় এবং নাম-মাহাত্ম্যে স্মিথের ইতিহাস ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির পাঠ্য তালিকা-ভুক্ত হইবে এবং ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণ স্মিথের ফতোয়া বেদ ও কোরাণের বাক্যের মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে তাই স্মিথ সাহেব যে কি প্রণালীতে ঐতিহাসিক সত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের জানিয়া রাখা ভাল শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রে স্মিথের গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। স্মিথের গ্রন্থের সকল অংশ সমালোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তিনি মারাঠা ইতিহাস কিরূপে নিজের ইচ্ছামত বিকৃত করিয়াছেন, আমি কেবল তাহাই দেখাইব।

মারাঠী ভাষার সহিত স্মিথ সাহেবের পরিচয় ছিল কি না জানি না। পরিচয় থাকিলেও মারাঠী ভাষায় যে সহস্র সহস্র ঐতিহাসিক দলীল-দস্তাবেজ আছে তাহার সন্ধান তিনি লইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ তিনি নিঃসঙ্কোচে মারাঠা জাতিকে লুটে ডাকাতের জাতি বলিয়াছেন,—যদিও পঞ্চম বর্ষীয় বালকের বুঝিতে কষ্ট হয় না যে কেবল লুণ্ঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দীর্ঘ দেড় শতাব্দী কাল টিকিতে পারে না। যাক্, এ অভিযোগের উত্তর অন্যত্র দিতেছি। এইখানে স্মিথ সাহেব কিরূপে সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য হাজির করিতে জানেন তাহার একটি উদাহরণ দিই।

গ্রাণ্ট ডাফের ইতিহাসে শিবাজী ও আফজল খাঁ ঘটিত ব্যাপারের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত মারাঠীতে লিখিত কোন ইতিহাসের মিল নাই। গ্রাণ্ট ডাফ্ এই বিষয়ে খাফি খাঁকে অনুসরণ করিয়াছেন খাঁফি শিবাজীর মৃত্যুর বহু পরে তাঁহার ইতিহাস রচনা করেন—শিবাজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার লেশ মাত্রও ছিল না। তিনি শিবাজীকে কুকুর ও কুকুরের বাচ্ছা বলিতে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন এবং শিবাজীর মৃত্যু-তারিখ-সূচক যে বাক্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহার অর্থ কাফের জাহান্নমে গিয়াছে। সুতরাং শিবাজীর প্রতি তিনি সুবিচার করিবেন এরূপ আশা করা যায় না। আফজল খাঁর হত্যা-ব্যাপারের সঠিক সংবাদ জানিবার উপায় তাহার ছিল না বলিলেই হয়। তিনি শিবাজীর রাজত্বের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে স্থানে স্থানে বহু ভ্রম-প্রবাদ রহিয়াছে, বোধ হয় অনেক সময় দিল্লীর বাজার-গুজব শুনিয়াই তিনি এই কাফের সয়তানের চিত্র অঙ্কিত

করিয়াছেন! গ্রাণ্ট ডাফ আফজল খাঁর বিবরণে সেই চিত্রের প্রতিলিপি দিয়াছিলেন মাত্র।

মারাঠী ঐতিহাসিকেরা প্রথম হইতেই গ্রাণ্ট ডাফের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। সে প্রতিবাদের ক্ষীণ ধ্বনি বোধ হয় এদেশে অবস্থান কালে বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া উত্তর ভারতে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলার আরাম-কেদারায় স্মিথ সাহেবের কর্ণে পৌছায় নাই। কিন্তু তাঁহার আকবর নামক গ্রন্থে তিনি পারসী ঐতিহাসিক কারকারিয়ার একটি রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন; সুতরাং কারকারিয়ার রচনার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এমন অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এই কারকারিয়াই তাহার একখানি ইংরেজী পুস্তিকায় শিবাজীর কলঙ্ক-ক্ষালনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সে সংবাদ স্মিথ সাহেবের জানা ছিল কি না তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

যাহা তাঁহার জানা ছিল তাহা হইতে তিনি শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁর হত্যার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন—An imposing army, numbering about ten thousand men and equipped with mountain guns, was organised and despatched under the command of Afzal Khan, a brave and experienced officer. Sivaji not being capable of meeting his foe in the field, opened negotiations, and a Brahman envoy was sent by the Musalman general to his adversary. The envoy played the traitor, permitting his sympathies as a Hindu to outweigh his duty to his master. The Brahman and Sivaji so arranged a plot to inveigle Afzal khan into an interview at which he could be killed with little risk to the Maratha. Afzal Khan fell into the trap readily and accompanied only by a single Sayyid officer, advanced close to Partabgarh and met Sivaji, who also had but one companion Tanaji Malusre. The Maratha professed the most abject submission and threw himself weeping at the general's feet. When Afzal Khan stooped to raise him in the customary manner, Sivaji wounded him in the belly with a horrid weapon called tiger's claw, which he held hidden in his left hand, and followed up the blow by a stab from a dagger concealed in his sleeve. The treacherous attack succeeded perfectly and the Marathas ambushed in the surrounding jungles destroyed Afzal Khan's army.

স্মিথ সাহেব যদি নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের পর ইহাই সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তবে তাহার পাণ্ডিত্যে সন্দেহ জন্মাইতে পারে, সত্য, কিন্তু তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায়

না। কিন্তু তিনি পাদ টীকায় লিখিতেছেন—"For the details I follow Mankar, The Life and Exploits of Sivaji 2nd Ed. Bombay, 1886 a valuable little book, now almost unprocurable." অপর এক স্থানে তিনি বলিতেছেন:—The little book by Mankar translated from a lost manuscript, is of considerable value. It is entitled the Life and Exploits of Sivaji and has become very scarce."

মানকরের গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য সন্দেহ নাই। দুই বৎসর যাবত চেষ্টা করিয়াও আমি এখন পর্য্যন্ত উহার এক খণ্ড নিজের জন্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অনুগ্রহে দুই বৎসর পূর্ব্বে মানকরের গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তিনি স্কটল্যাণ্ড হইতে ঐ গ্রন্থের এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি তখন শিবাজীর প্রাচীনতম মারাঠী জীবন-চরিত সভাসদ বখরের ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিলাম, মানকর সভাসদের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন, সুতরাং অধ্যাপক সরকার মহাশয় আমাকে ঐ গ্রন্থখানি দেখিতে দিয়াছিলেন। স্মিথ সাহেব বলিতেছেন যে মানকর যে হস্তলিখিত পুঁথি হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা হারাইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। মানকরের ব্যবহৃত পুঁথির বয়স কত তাহা জানা যায় নাই। ঐ পুঁথি যে হারাইয়া গিয়াছে সে সংবাদই বা স্মিথ সাহেব কোথায় পাইলেন? আর যদি হারাইয়াই গিয়া থাকে তাহা হইলেই বা মানকরের অনুবাদের মূল্য কি করিয়া বাড়িল? মানকর যে গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার বহু হস্তলিখিত অনুলিপি মহারাষ্ট্রে পাওয়া যায়। আমি অনায়াসে উহার ১০।১২ খানি নূতন ও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। স্মিথ সাহেবের নিজের দেশেই ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে সভাসদ বখরের একখানি হস্তলিখিত প্রতিলিপি রহিয়াছে। এবং মানকরের গ্রন্থ যে ঐ বখরেরই অনুবাদ মাত্র, তাহা ব্লুমহার্ড সঙ্কলিত ব্রিটিশ মিউজিয়মের মারাঠী হস্তলিখিত পুঁথির তালিকার উপর একবার চোখ বুলাইয়া গেলেই স্মিথ সাহেব জানিতে পারিতেন। সকলেই জানেন যে প্রাচীন গ্রন্থের মাত্র একখানি পুঁথির উপর নির্ভর করা চলে না। মানকর একখানি মাত্র পুঁথি পাইয়া তাহাই অনুবাদ করিয়াছিলেন। আবার তাহার অনুবাদও সর্ব্বত্র মূলানুগত হয় নাই। অনেক দিন হইল রাও বাহাদুর কাশীনাথ নারায়ণ সানে অনেক পুঁথি মিলাইয়া বিভিন্ন পাঠান্তর দিয়া অনেক টীকা-টিপ্পনী সহ সভাসদ বখরের একটি সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদিন পরে প্রায় ৪০ বৎসরের পুরাতন মানকর ও এক শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত গ্রাণ্ট ডাফের দোহাই দেওয়া পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নহে?

কিন্তু এ বিষয়ে অজ্ঞতাই স্মিথ সাহেবের একমাত্র অপরাধ নহে। তিনি বলিয়াছেন যে আফজল খাঁর হত্যার যে বিবরণ তিনি তাঁহার তথাকথিত ইতিহাসে প্রদান

করিয়াছেন, তাহা মানকরের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। এই কথাটি একেবারে মিথ্যা! মানকরের গ্রন্থ এখন আমার নিকট নাই, তাহার নিজের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা আমার বেশ মনে আছে যে আফজল খাঁর বিবরণে সানের সম্পাদিত মূল বখরের সহিত মানকরের অনুবাদের কোন অনৈক্য নাই। সমস্ত মারাঠী ঐতিহাসিকই বলিয়াছেন আফজল খাঁই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শিবাজীকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছিলেন; শিবাজী আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতি-আক্রমণ করিয়াছিলেন মাত্র। একখানি মারাঠী কবিতা গ্রন্থে লিখিত আছে যে আফজল খাঁ যখন শিবাজীর কণ্ঠ নিষ্পেষণ করিয়া তাঁহার শ্বাস রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন সেই আসন্নকালে বিপন্ন মারাঠা বীর গুরু রামদাসের নাম স্মরণ করিয়াছিলেন। জানি না স্মিথ সাহেব যে বিবরণ গ্রাণ্ট ডাফ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা মানকরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন কেন? এ কি তাঁহার বার্দ্ধক্য-জনিত স্মৃতি-বিভ্রমের ফল? অথবা মারাঠা জাতির প্রতি বিদ্বেষের আতিশয্যে এই বৃদ্ধ আংগ্লো ইণ্ডিয়ান ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার পাঠকবর্গকে একখানি এমন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া প্রতারিত করিতে চাহিয়াছেন, যাহা তাঁহাদের সহজে পাইবার উপায় নাই! কে বলিবে, তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার ভ্রম সংশোধনের সুযোগ জুটিয়াছিল। বিলাতের History পত্রে তিনি কিনকেইড ও পারসনীস রচিত মারাঠা ইতিহাসের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক না কেন আফজল খাঁর সম্বন্ধীয় ঘটনার একটি নির্ভুল বিবরণ উহাতে আছে। স্মিথ গ্রন্থকারদ্বয়কে গালি দিয়াছেন—সে তাঁহার অনধিকার-চর্চ্চা। অজ্ঞতা গোপন করিবার উহাই প্রকৃষ্টতম পন্থা। কিন্তু ইহার পরও তিনি নিজের ভ্রম স্বীকারের দ্বিতীয় সুযোগ পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের শিবাজী তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; এই গ্রন্থখানি তিনি যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছিলেন এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনি অধ্যাপক যদুনাথের গ্রন্থের প্রভূত প্রশংসাও করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা এদেশে পৌছিয়াছে তাঁহার মৃত্যুর পরে। মৃত্যুর ওপার হইতে স্মিথ সাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন যে অধ্যাপক সরকার যখন মারাঠী অপেক্ষা ইংরাজী ঐতিহাসিক উপাদানেরই প্রাধান্য দিয়াছেন তখন আফজল-ঘটিত ব্যাপারে তিনি মারাঠা বখরকারের অনুসরণ করিলেন কেন? এইখানে স্মিথ সাহেব দুইটি ভুল করিয়াছেন। অধ্যাপক সরকার বিশেষ করিয়া সমসাময়িক চিঠিপত্র ও সমসাময়িক ইতিহাসের উপরই নির্ভর করিয়াছেন, একদিকে তিনি যেমন শিবাজী প্রতাপ ও সেডগাঁওকর বখর প্রভৃতি মারাঠা বখরকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন সেইরূপ তিনি ইটালীয় লেখক মেনুসী ও সুবিখ্যাত ইংরেজ লেখক অরমের সাক্ষ্যেও সবিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস রচয়িতা বিলাতের রয়াল হিষ্টীরিয়োগ্রাফার

ক্রস সাহেবের নাম করারও তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ফরাসী লেখক মিশো তাহার মহীশূরের ইতিহাসে শিবাজীর দিল্লী হইতে পলায়নের যে অদ্ভুত উপন্যাস প্রদান করিয়াছেন তাহাতেই বা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ঐতিহাসিক আস্থা স্থাপন করিবেন। আর পোর্তুগীজ লেখক গার্ডার শিবাজীর জীবন চরিতের ত কথাই নাই। দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপক সরকার আফজল খাঁর ব্যাপারে কেবল মারাঠা বখরকারগণকে অনুসরণ করেন নাই। তিনি স্মিথ সাহেবের মত মারাঠা জাতিকে ও শিবাজীকে গালাগালি দিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া লেখনী ধারণ করেন নাই। তিনি যেখানে ন্যায় বুঝিয়াছেন শিবাজীর কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন আবার যেখানে অন্যায় বুঝিয়াছেন সেখানে নির্ভীক ভাবে শিবাজীর দোষ ক্রটি প্রদর্শনে ইতস্ততঃ করেন নাই। এজন্য মহারাষ্ট্রের অধিবাসিরা তাহার গ্রন্থের অন্যায় সমালোচনাও করিয়াছে। স্মিথ সাহেব যদুনাথের শিবাজীর ৬৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা পাঠ করিলেই দেখিতে পাইতেন যে রাজাপুরের ইংরেজ বণিকেরাও জানিতেন যে শিবাজীকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক প্রতারণা করিবার দুষ্ট অভিসন্ধি আফজলের প্রথম হইতেই ছিল। রাজাপুরের ইংরেজরা মুসলমান রাজ্যে বাস করিতেন সুতরাং মুসলমান সেনাপতির প্রকৃত অভিসন্ধি জানিবার সুযোগ তাহাদের ছিল; তাহারা সুরাটের কাউন্সিলে লিখিয়াছিলেন, Against Shivaji the Queen this year sent Abdullah khan with an army of 10,000 horse and foot, and because she knew with that strength he was not able to resist Shivaji she counselled him to *Pretend friendship* with his enemy *which he did.* And the other [i. e, Shivaji] whether through intelligence or Suspicion, it is not known, dissembled his love toward him &c (Factor at Rajapur to Council at Surat 10 oct. 1659 T R. Rajapur) এই সমসাময়িক ইংরেজী পত্র সভাসদের মারাঠী বিবরণের সমর্থনই করিতেছে। সভাসদ বলেন, আফজল খাঁই শিবাজীকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন। শিবাজীর দূত পন্তাজী গোপীনাথ চতুরতা পূর্ব্বক মুসলমান সেনাপতির প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রভুকে সতর্ক করিয়া দেন। শিবাজী ও আফজলের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন উভয়ের সহিতই মাত্র দুইজন করিয়া অনুচর ছিল। শিবাজীর সহিত ছিলেন সাম্ভাজী কাবজী মহালদার ও জিউ মহালা, তানাজী মালুশ্রে নহে। এবং আফজলের সহিত কোন সৈয়দ কর্ম্মচারী ছিলেন না। শিবাজীর আপত্তিতে আফজল সৈয়দ বন্দাকে দূরে রাখিয়া আসেন। আফজল শিবাজী অপেক্ষা বলবান ও দীর্ঘায়তন। শিবাজীকে আলিঙ্গনচ্ছলে তিনি বাম কুক্ষিতলে চাপিয়া ধরিয়া যমধার তরবারির আঘাত করেন। শিবাজীর শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু তরবারির আঘাত তাঁহার লৌহবর্ম্মে প্রতিহত হইয়াছিল। তার পর তিনি হস্তস্থিত বাঘনখের দ্বারা আফজলকে আহত করিয়া তাহার হস্ত হইতে

নিষ্কৃতি লাভ করেন। প্রতারণার জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন; তাই তাঁহার সঙ্কেত-মত তাঁহার সৈন্যগণ মুসলমান সেনা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। মোটামুটি মানকরও এই বিবরণই দিয়াছেন।

এখন দেখিতে হইবে কোন বিবরণ বেশী সম্ভব। খাফি খাঁর, কি সভাসদের? ইংরেজ কুঠির পত্রে প্রকাশ আফজলের সঙ্গে মাত্র ১০,০০০ সেনা ছিল। শিবাজী সেই সময় প্রায় ২০০০০ অশ্বারোহী সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রতাপগড়ের দুর্গ অতি দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত; এইরূপ গিরিসঙ্কুল আরণ্য ভূমিতে সুবিশাল সেনা লইয়া শিবাজীকে পরাজিত করা কত কঠিন তাহা বিজাপুরের সেনাপতি বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন কারণ তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বাইর সুভেদার ছিলেন। আফজল শিবাজী অপেক্ষা দীর্ঘায়তন ও সমধিক বলশালী; সুতরাং একাকী মল্লযুদ্ধে খর্ব্বকায় মারাঠা বিদ্রোহীকে অনায়াসে পরাজিত করিবার আশা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। এক খাফি খাঁ ভিন্ন আর কেহই এই ঘটনার সংস্রবে শিবাজীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। পক্ষান্তরে সভাসদের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কারণ জাবলী বিজয় বিবরণে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে শিবাজী কৌশলে চন্দ্ররাওকে প্রতারিত করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি প্রভুর দোষ গোপনের চেষ্টা করেন নাই। হয় ত সেই অরাজকতার দিনে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশলে হত্যা করা কেহ দোষেরও মনে করিতেন না। সেই সভাসদই আফজল খাঁর ব্যাপারে প্রথম আক্রমণের দুরভিসন্ধি ও চেষ্টা মুসলমান সেনানীর উপর আরোপ করিয়াছেন কেন? ইহার অন্য কোন সদুত্তর নাই। আফজল খাঁর হত্যার ব্যাপারে শিবাজী নির্দ্দোষ, তিনি আফজলকে হত্যা করিয়াছিলেন আত্মরক্ষার চেষ্টায় সুতরাং ইংরেজী murder শব্দ এখানে খাটে না।

ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য সত্য-নির্ণয়। কাহারও প্রতি অযথা পক্ষপাত অথবা অযথা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ ঐতিহাসিকের পক্ষে আর কিছুই নাই। স্মিথ সাহেবের অপরাধ এইখানেই শেষ হয় নাই। তিনি হয় মানকর পাঠ না করিয়াই তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন অথবা জানিয়া শুনিয়া আপনার পাঠকবর্গকে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিণত-বুদ্ধি ছাত্রদিগকে প্রতারণার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।
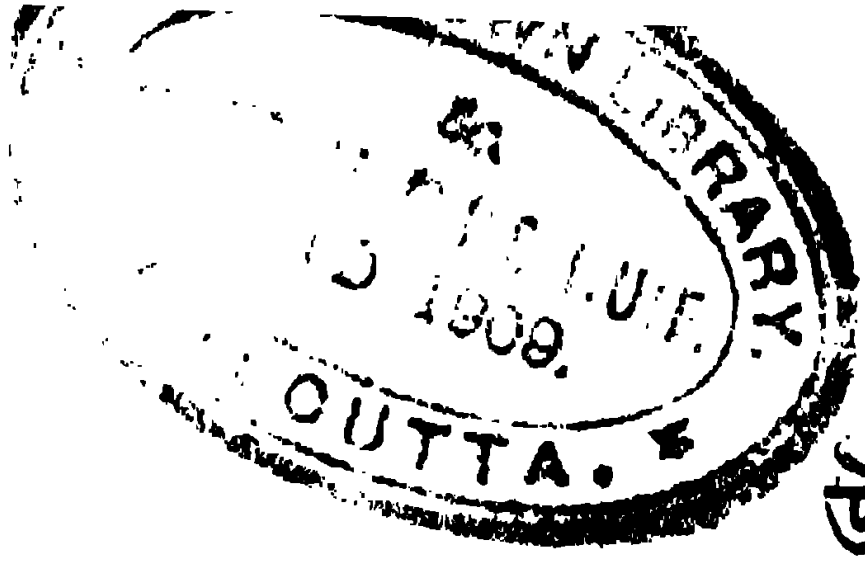
উড়ো আপদ

অমন যে সোনার টুকরো ভামিনী,—চুরুট-তামাক ত দূরের কথা, পান-সুপুরি পর্য্যন্ত তিনি স্পর্শ করতেন না। তাঁরও কিন্তু মস্ত-একটি নেশা ছিল;—সেটি হচ্ছে গোয়েন্দা-কাহিনী পড়া।

আপিস থেকে বাড়ী ফেরা এবং ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে যে নিজস্ব সময়টুকু পাওয়া যেত, সেটুকু ভামিনী গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে দিব্যি অনায়াসেই কর্ত্তন করে ফেল্‌তেন। এডগার আলেন পো, গে-বোরিও, কন্‌যান ডইল, ডিক ডনোভ্যান ও মরিস লেবলাঙ্ক প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের গোয়েন্দা-কাহিনীগুলি, ভামিনী-ভূষণ দস্তুর-মতন গুলে ভক্ষণ করেছিলেন বললেও চলে। তাছাড়া আজে-বাজে ডিটেকটিভ উপন্যাসও তিনি যে কত পড়েছেন, তা আর গুণ্‌তিতে আসে না। সে-সব গল্পের ঘটনা পড়লে ভামিনীভূষণ ছাড়া অন্য যে-কোন লোকের মাথার চুলগুলো, নিশ্চয়ই সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠত। কিন্তু ভামিনীর মাথার চুল যে খাড়া হয়ে উঠত না, তার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ, যৌবনেই তাঁর উত্তমাঙ্গের শীর্ষদেশে প্রকাণ্ড একটি টাকের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই মরুভূমির মধ্যে প্রাণপণে চুলের আবাদ করতে চেষ্টা করেও, ভামিনী কিছুতেই তাতে কৃতকার্য্য হতে পারেন নি।... ...

সেদিনও ভামিনী সন্ধ্যের সময়ে ঘরের কোণে বসে, চিম্‌নীর আধখানায় কালি-মাখা একটা হারিকেন লণ্ঠনের আলোতে, খুব মন দিয়ে সালক্ হোম্‌সের একটি বাহাদুরির ইতিহাস পড়ছিলেন। দু-তিনখানা পাতা ওল্টাবার পর, কেতাবের মাঝখান থেকে হঠাৎ কি-একখানা কাগজ বেরিয়ে মাদুরের উপরে পড়ে গেল। ভামিনী আস্তে আস্তে সেখানা তুলে নিয়ে দেখলেন, একখানা চিঠি। তিনি লেখাগুলোর উপরে একবার চোখ বুলিয়ে গেলেন, লেখা আছে,—

"জীবনেশ্বর,

যাবার দিনে সেই যে তুমি রাগ ক'রে চলে গেলে, তারপর আজ-পর্য্যন্ত আর এক-খানিও চিঠি লিখলে না। প্রাণেশ্বর, তোমার বিরহে এখানে আমি যে কি মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছি, তা তো তুমি জান না! হে নাথ, দয়া করে একখানা চিঠি লিখো, দুটো ভালোবাসার কথা বোলো! তা-নইলে আমি এখানে থাকতে পারব না, পালিয়ে তোমার কাছে চলে যাব। লোকে নিন্দা করে করুক। হেবোকে নিয়ে কোনরকমে—"

এইখানেই চিঠিখানা হঠাৎ শেষ হয়েচে, —যেন লিখতে লিখতে আর লেখা হয় নি।

... ...ভামিনীর হাত থেকে সার্লক হোম্‌সের বাহাদুরির ইতিহাসখানা ধুপ্ করে পড়ে গেল। চিঠিখানা হাতে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে তিনি বসে রইলেন—অনেকক্ষণ।

তারপর তিনি আবার একবার চিঠিখান

পড়ে দেখলেন। নাঃ,—কোন সন্দেহ নেই, এ দুর্গাকালীর হাতের লেখাই বটে! তার ওপরে চিঠিতে হেবোর নাম রয়েচে—হেবো তাঁর নিজের ছেলের নাম! চিঠিখানা তিনি উল্টে-পাল্টে দেখলেন, যে-কাগজে লেখা হয়েচে তাও তাঁরই আপিসের কাগজ। আপিস থেকে তিনি প্রায়ই কাগজ হাতিয়ে (বলা বাহুল্য, গোপনে) নিয়ে আসতেন, এ তারই একখানা

ভামিনীর বুকের শিরগুলো যেন পট্‌পট্ করে ছিঁড়ে গেল। কি ভয়ানক! যে দুর্গাকালীর মুখ চেয়ে তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরের দাসত্ব করচেন, যাকে তিনি স্বর্গের দেবী ভেবে প্রাণ-মন দিয়ে এতদিন ভালোবেসে আসচেন,—তার কিনা এই কাজ! স্বামীর সংসারে বসে পরপুরুষকে কুৎসিত চিঠি লেখা!

তাঁর ভ্রম হয় নি ত? না,—ভ্রম কি করে হবে? দুর্গাকালীর হাতের লেখা যে তিনি সহস্রবার দেখেচেন,—নিজের স্ত্রীর লেখা—সে কি ভুল হবার যো আছে? তার ওপরে চিঠির কাগজেও তাঁর আপিসের মার্কা মারা, চিঠিতে হেবোর নাম রয়েচে, চিঠিখানা পাওয়াও গেছে তাঁর কেতাবের ভিতরে,—নিশ্চয়ই দুর্গাকালী লিখতে লিখতে শেষ না করতে পেরে, চিঠিখানা তাঁর কেতাবের ভিতরে ভুলে ফেলে রেখে গিয়েচে—ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়েচে!

আবার লিখেচে কিনা লোক-নিন্দার ভয় না রেখে পালিয়ে যাবে! অ্যাঁ, এত-বড় শক্ত কথাটা লিখতে তার হাত একটুও কাঁপল না?

কেন, কিসের অভাব তার? অবশ্য, তাঁর চেহারাটি দেখতে ঠিক কার্ত্তিকের মত ততদূর সুশ্রী নয়,—কিন্তু তিনি ন্যায়ত ধর্ম্মত তার স্বামী তো বটে! সীতা-সাবিত্রীর দেশে জন্মে, হিন্দু-স্ত্রী হয়ে স্বামীতে অরুচি! জগতে সুশ্রী চেহারাই কি সব? যত্ন-স্নেহ, মমতা-আদর, প্রেম-ভালোবাসার কি কোনই মূল্য নেই?

ভাবতে ভাবতে ভামিনীর চোখে জল এল,—না কেঁদে তিনি থাকতে পারলেন না

হেবো সাম্‌নে বসে দুলতে দুলতে পড়া মুখস্থ করছিল—মনের আবেগে ভামিনী তার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। অকারণে তাঁকে কাঁদতে দেখে তার পড়া ও দোলা, দুইই একসঙ্গে এক-মুহূর্ত্তে বন্ধ হয়ে গেল। সে যার-পর-নাই আশ্চর্য্য হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্লে, "বাবা, তুমি কাঁদচ কেন?"

ভামিনী এক ধমক দিয়ে মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, "রাস্কেল, বাপের সঙ্গে জ্যাঠামো? আমি কাঁদচি? কোথায় কাঁদচি? যাঃ—বেরো এখান থেকে!"

এত সহজে পড়ার দায় থেকে নিস্তার পেয়ে হেবো একটিমাত্র লাফে একেবারে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল।

ভামিনী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন, এর একটা হেস্ত-নেস্ত করে তবে আমি ছাড়ব! পাপিষ্ঠা দুর্গাকালীকে এখন কোন কথা বলা হবে না—কোন্ শয়তান আমার বংশে কলঙ্ক দিতে চায়—আগে তার সন্ধান নিতে হবে, তারপর দুর্গাকালীর শাস্তি! আমি নরম হতেও পারি, শক্ত হতেও জানি

একগাছি মাত্র চুলের, একটিমাত্র ভাঙা বোতামের, জামা-থেকে-ছেঁড়া একটি সূতোর সাহায্যে, ডিটেকটিভ উপন্যাসের গোয়েন্দারা কত বড়-বড় অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেচে, আর এত-বড় প্রমাণ হাতে পেয়েও আমি এই স্পষ্ট ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব!

খ

ভামিনীভূষণ বেশ জানতেন যে, গোয়েন্দা-গিরির প্রথম কথা হচ্ছে, কারুকেই বিশ্বাস না করা। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে অবিশ্বাস করতে তাঁর মন কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। আজ পাকা দশটি বৎসর দুর্গাকালীকে বিশ্বাস করে করে, বিশ্বাস করাটাই তাঁর একটা বদ্-অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

আর আসল কথা বল্‌তে কি, স্ত্রীকে অবিশ্বাস করবার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত তিনি পান নি। দুর্গাকালীর জিভ একটু বেশীরকম ধারালো হলেও, স্বামীকে যত্ন-আদর করতে কোনদিনই সে নারাজ ছিল না। আপিস থেকে বাড়ী ফিরেই তিনি জলখাবারের থালাটি ঠিক নিয়মিত সময়েই হাতের কাছে পেয়েছেন। যেচে এসে গায়ে হাত বোলানো, পারিপাটি ক'রে চাদর-কাপড় কুঁচিয়ে রাখা, ঝিনুক দিয়ে ঘামাচি মেরে-দেওয়া, গুমোটের সময়ে নিজে জেগে পাখার হাওয়া করে স্বামীকে ঘুম-পাড়ানো,—এ-সব আদরের খাঁকৃতি ভামিনীভূষণ কোনদিনই অনুভব করেন-নি।

কিন্তু দুর্গাকালীকে অবিশ্বাস না করলে ত চল্‌বে না,—কাজেই ভামিনীভূষণ আজকাল মনকে চোখ ঠেরে বুঝিয়ে, জোর করে তাকে অবিশ্বাস করতে লাগলেন।

দুর্গাকালী তাঁকে আদর করলে তিনি এখন আর একটুও গলে যান না, খুব শক্ত হয়ে মনে মনে বলেন, সাবধান মন, সাবধান! আজ দশবচ্ছর কামিনীর ছলনায় তুমি বেকুব ব'নে আসচ—আর নয়, এবারে সচেতন হও—উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!

দুর্গাকালীকে হাতে-নাতে ধরে ফেলবার জন্যে আজকাল প্রায়ই তিনি আপিস থেকে অসময়ে ছুটি নিয়ে হঠাৎ বাড়ীতে ফিরে আসেন,—কিন্তু কোনদিন দেখেন, দুর্গাকালী একখানা হালফ্যাসানের তুলোর প্যাড্ দিয়ে রেশমে বাঁধানো নভেলকে বালিশে পরিণত করে, নিদ্রাসুখে নিমগ্ন হয়ে আছে, কোনদিন বা দেখেন, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে পরম উৎসাহে সে তাস খেল্‌চে, গল্প করচে।

কিন্তু দুর্গাকালীর বিরুদ্ধে যতই প্রমাণের অভাব হতে লাগল, ভামিনীভূষণের সন্দেহ ততই বাড়তে থাকল। তিনি বুঝলেন, রহস্য ক্রমেই গভীর হয়ে উঠচে

দুর্গাকালীও স্বামীর এই আকস্মিক ও অভাবিত পরিবর্ত্তনে প্রথমটা ভারি অবাক হয়ে গেল। স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে গেলে, ভামিনী এখন বিরক্ত হয়ে জোর করে তার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেন, হেসে দুটো ভালোবাসার কথা বল্‌লে তিনি মুখ গোম্‌ড়া করে বলেন, "যাও, যাও,—আর অত আত্তি দেখাতে হবে না,—ঢের হয়েচে!" তাইত, এ হোলো কি? দুর্গাকালী ভাবলে, তার বয়স বাড়চে বলেই স্বামীর আদর ক্রমেই

এমন কমে আসচে,—পুরুষজাতটাই হচ্ছে প্রজাপতি মত—এক ফুলের মধু খেয়ে বেশীক্ষণ তারা খুসি থাকতে পারে না;—তার স্বামীও তো পুরুষ, তাই তাঁর মধ্যেও এইবার পুরুষত্বের লক্ষণ ফুটতে সুরু হয়েচে!... ... ...

অতএব দুর্গাকালী স্বামীর বাঁকা মনকে আবার সিধে করবার জন্যে, নিজের চেহারাকে নূতন করে চটকদার করে তুলতে চেষ্টা পেলে। আজকাল সে রংবেরঙা কাপড়খানি না পরে, কপালে ছোট্ট একটি খয়েরের টিপ না কেটে, ঘাড়ের উপরে লোটানো এলো-খোঁপাটি না বেঁধে কিছুতেই আর স্বামীর সাম্‌নে বেরুত না।

ভামিনী কিন্তু স্ত্রীর এই ছেড়ে-দিয়ে তেড়ে-ধরা চেহারার কারুকার্য্য দেখে আরো-বেশী সন্দিহান হয়ে উঠলেন। মাঝে মাঝে আড় চোখে যখন তিনি স্ত্রীর দিকে চুরি ক'রে চাইতেন, তখন তাঁর মনে একটু-একটু লোভের উদয় হোতো বটে কিন্তু তখনি তিনি নিজের মনকে এমন-এক কড়া দাবড়ী দিতেন যে, মন আর আত্মপ্রকাশ করতে পারত না! তাঁর স্ত্রীর সাজসজ্জা যতই বাড়তে লাগল, তিনিও তাঁর পাহারাকে ততই সজাগ ক'রে তুলতে লাগলেন! তিনি বুঝলেন, হাতে-নাতে ধরা পড়তে দুর্গাকালীর আর বেশী দেরি নেই!

শেষটা সত্যি-সত্যিই একদিন চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল। সে প্রমাণটা পেয়ে ভামিনী বুঝতে পারলেন না বটে, কাকে দেখে দুর্গাকালী তাঁকে ভুলেচে, তবে এটা বেশ জানা গেল, তার স্বভাবের সঙ্গে কেতাবী সতীদের বর্ণনা মিছুই মেলে না। অবশ্য এ অমিলটা ভামিনী যে আজ এই প্রথম আবিষ্কার করলেন, তা নয়—তবে এটার দিকে এতদিন তিনি দেখেও দেখেন নি। আর সত্যি বলতে কি, ভামিনী জটিল ডিটেকটিভ উপন্যাসের রহস্য জলের মত বুঝতে পারলেও, রামায়ণী মহাভারতী সতীদের সতীত্বের মর্ম্ম, তেমন ভালোরকম বুঝতেও ছাই পারতেন না! ইন্দ্রকে আলিঙ্গন করেও অহল্যা, বিধবা হয়ে বিবাহ ক'রেও মন্দোদরী ও তারা, সূর্য্যকে আত্মদান ক'রেও কুমারী কুন্তী, আর পাঁচের চেয়ে সংখ্যা বাড়াতে চেয়েও দ্রৌপদী প্রভৃতির সতীত্বের সার্টিফিকেট কেন যে এখনো গ্রাহ্য হয়, ভামিনী বিস্তর ভেবেও এ সমস্যার কোন সমাধান করতে পারেন নি।

সে দিন রবিবার। ভামিনীভূষণ খাওয়া-দাওয়ার পর একটুখানি নিশ্চিন্ত দিবানিদ্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময়ে জান্‌লা দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, রাস্তার ওপারে ঘোষেদের বাড়ীর বারান্দায়, একটি লোকের দৃষ্টি তাঁর বাড়ীর ছাদের দিকে নিষ্পলক ও স্থির হয়ে আছে। তার সে দৃষ্টিটা এমন সন্দেহজনক যে, ভামিনীর আসন্ন ঘুম তৎক্ষণাৎ আধ-মিনিটের মধ্যেই চম্‌কে গেল। তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে তীরের মত ছাদের উপরে ছুটলেন। ছাদে উঠে ভামিনী দেখলেন, তাঁর সন্দেহ মিথ্যে নয়। সেখানে দুর্গাকালী পিঠের উপরে ভিজে চুল এলিয়ে চুপটি ক'রে বসে আছে।

ভামিনী চটে লাল হয়ে বললেন, "তোমার এ কি হচ্ছে শুনি?"

দুর্গাকালী তাঁর ক্রুদ্ধ স্বর শুনে আশ্চর্য্য

হয়ে বললে, "আজ যে একেবারে তেরিয়া মেজাজ! দেখতে পাচ্চ না, চুল শুকোচ্চি!"

—"চুল শুকোচ্চ! দেখতে পাচ্চ, ওদিকে কে দাঁড়িয়ে আছে?"

দুর্গাকালী রাস্তার ওপারে একবার চেয়েই "ওমা" বলে হেঁট হয়ে পড়ে মাথায় কাপড় তুলে দিলে। তারপর বল্লে, "আ মর্ পোড়ারমুখো, অমন চোখে আগুন লাগে না গা!"

ভামিনী কিন্তু ভোলবার ছেলে নন; টিট্‌কিরি দিয়ে বললেন, "আমাকে দেখে ওকে এখন গালাগাল দিচ্চ, কিন্তু এতক্ষণ যে তোমার মাথার কাপড় পিঠের ওপরে এসে পড়েছিল!"

ভামিনী তাকে সন্দেহ করেচেন বুঝেই দুর্গাকালী রেগে তিনটে হয়ে বললে, "তা পড়েছিল ত পড়েছিল, তাতে হয়েচে কি? ও হতভাগা না-হয় আমার পানে তাকিয়ে একটু স্বস্তি পাচ্চে, তাতে তো আমার গায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্চে না! ফের যদি অমন ছাই কথা বল, তাহলে এখনি আমি আবার মাথার কাপড় খুলে দেব! যার খুসি হয় আমাকে দেখুক-গে, তাতে আমার কি বয়ে গেল? ও দেখা-টেখায় ডরাব, তেমন মেয়ে আমি নই!"

ভামিনীভূষণ বেশ বুঝলেন যে, খাঁটি সতীদের কথা কখনোই এ-রকম স্পষ্টা-স্পষ্টি হওয়া উচিত নয়, তবু কিন্তু তিনি মনের ঝাল না ঝেড়ে চেপে গেলেন। ভাবলেন, না, এখনি বেশী ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, তাতে হিতে বিপরীত হবে।—তবে ছাদ থেকে নামবার আগে তিনি রাস্তার ওপারে এমন এক জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে এলেন যে, বারান্দার সেই রূপ-গদ্গদ লোকটি তখনি ঘাড় হেঁট ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

গ

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। ভামিনীর সতর্ক চোখ দেখলে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা লোক তাঁরই বাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে। যুদ্ধের জন্যে কল্‌কাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো কমিয়ে দেওয়া হয়েচে,—তাই তার মুখটা চিন্‌তে পারা গেল না।

কিন্তু তাঁর বাড়ীর দিকে লোকটাকে চেয়ে থাকতে দেখেই ভামিনী বেজায় ক্ষেপে উঠলেন। মনে মনে বললেন, ছুঁচো পিঁড়েরা ভেবেচে কি, আমি কি মরে গেছি? দাঁড়াও, দেখাচ্চি মজাটা!

গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে পড়ে ভামিনীর মাথা এমন চমৎকার সাফ হয়ে গিয়েছিল যে, খুব চট ক'রে তাতে ফন্দি যোগাত। লোকটার মতলব কি তা বোঝবার জন্যে, ভামিনী তখনি কোঁচার কাপড়টা খুলে গায়ে ও মাথায় দিয়ে, মুখের গোঁফ পর্য্যন্ত ঢেকে জান্‌লার কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর খড়খড়িটা ধরে নাড়তেই লোকটা মুখ তুলে চেয়ে দেখলে। ভামিনী হাত নেড়ে ইসারা ক'রে তাকে ডাকলেন।

লোকটা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "কে, দুর্গাকালী?"

গলার আওয়াজ স্ত্রীলোকের মত সরু ক'রে ভামিনী বললেন, "হুঁ।"

লোকটা পায়ে পায়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে এল।

নিষ্ঠুর আনন্দে ভামিনী চোখের পলকে আঁটসাঁট ক'রে কোমর বেঁধে ফেললেন। যখন তাঁর স্ত্রীর নাম পর্য্যন্ত জানে, তখন এ নিশ্চয় সেই লোক—যাকে তাঁর স্ত্রী চিঠি লিখেছিল।

চৌকির তলা থেকে মস্ত-এক লম্বা-চওড়া লাঠি বার করে ভামিনী বাঘের মত লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে গেলেন। সে লোকটা তখন নীচে উঠোনের পাশে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে হাত দিয়ে উপরে ওঠবার সিঁড়ি খুঁজছিল। ভামিনী নীচে গিয়ে মুখে তাকে কিছুই বললেন না, সুধু হাতের লাঠিটা মাথার উপরে তিনবার ঘুরিয়ে সটাং এক ঘা বসিয়ে দিলেন। সেই পাকা বাঁশের লাঠিটা যদি যথাস্থানে পড়ত, তাহলে সেই মুহূর্ত্তেই লোকটার দেহ থেকে মস্তকের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যেত। কিন্তু তার সৌভাগ্যক্রমে মাথায় না পড়ে লাঠিটা পড়ল গিয়ে তার কাঁধের উপরে। "ওরে বাপরে, গেছিরে" বলে চেঁচিয়ে উঠে, সে দড়াম্ করে উঠোনের উপরে আছড়ে পড়ল।

তার ভীষণ চীৎকার শুনে দুর্গাকালী রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে এল। লোকটাকে দেখবার জন্যে ভামিনীও একটা আলো নিয়ে এলেন,—তাঁর মন তখন ভারি খুসি হয়ে উঠেচে।

কিন্তু আলোটা তিনি উঁচু করে তুলে ধরতেই, দুর্গাকালী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—"ওগো, একি গো, এ যে দাদা গো!"

ভামিনীর হাত থেকে আলোটা খসে মাটির উপরে পড়ে নিবে গেল! তাইত, এ দুর্গাকালীর দাদা যোগেনই বটে!

যোগেন কাৎরাতে কাৎরাতে বললে, "দুগ্গা! তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠা রে, আমার 'কলার-বোন' ভেঙে বোধ হয় গুঁড়ো হয়ে গেছে! ভামিনী, আমার ওপরে তোমার এত যে রাগ ছিল, তা জানলে আমি ত এখানে আসতুম না ভাই!"

ভামিনী জড়োসড়ো হয়ে, চোখে সর্ষেফুল দেখতে দেখতে বললেন, "আমি—ভেবেছিলুম—চোর!"

দুর্গাকালী ততক্ষণে জল-ন্যাকড়া নিয়ে এসে যোগেনের কাঁধের উপরটা বেঁধে দিতে বসেচে। সে বললে, "কি ক'রে এ কাণ্ড হোলো দাদা?"

যোগেন বললে, "আমি তো তোদের এই নতুন বাসাটা চিনতুম না, খালি নম্বরটাই জানতুম। তোদের বাড়ীর সামনে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম, এইটেই তোদের বাড়ী কিনা—এমনসময়ে বাড়ীর ওপর থেকে একটি মেয়ে আমাকে ডাকলে। এখানে আর কেই-বা আমাকে ডাকবে, কাজেই আমি বুঝলুম, এই বাড়ীটাই তোদের। তবু একবার সন্দেহ মেটাবার জন্যে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কে দুগ্গাকালী? তুই বললি—হুঁ।"

দুর্গাকালী আশ্চর্য্য হয়ে চোখ বিস্ফারিত ক'রে বললে, "আমি বললুম হুঁ? দাদা, তুমি কি বলচ?"

—ভামিনী চেপে গেলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "ওগো, তোমার দাদাকে এখন মিছে বাকিও না—ওঁকে ওপরে নিয়ে যাও। আমি ততক্ষণে ডাক্তার ডেকে আনি।"

ঘ

সেই ভয়াবহ ঘটনার পর দু-মাস কেটে

গেছে। ইতিমধ্যে যোগেনকে লাঠি-মারার দরুণ দুর্গাকালীর মুখ থেকে, ভামিনীকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েচে। দুর্গাকালী যখন-তখন তাঁকে 'খুনে', 'গুণ্ডা', 'ঠ্যাঙাড়ে', 'গোঁয়ার' ব'লে টিট্‌কারী দেয়, ভামিনী কিন্তু সে-সব কথার বিরুদ্ধে একটিও আপত্তি প্রকাশ করেন না। যখন বড়ই অসহ্ হয়ে ওঠে, তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। স্ত্রীর কবল থেকে মুক্তি লাভের এই একটি চরম নিরাপদ উপায় তিনি আবিষ্কার করেছিলেন —বিনাবাক্যব্যয়ে ঘুমিয়ে-পড়া! দুর্গাকালী যখন কোন সঙ্গিনীর হাতে নতুন গয়না দেখে এসে রাত্রে স্বামীর কাছে সেই গয়নার সম্বন্ধে সলোভ সুখ্যাতি করতে বস্‌ত, কিংবা অনেকদিন পশ্চিমে বেড়াতে যাওয়া হয়নি ব'লে গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদত; কিংবা সাম্‌নের শনিবারের থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল পড়ে শোনাত, তখনো ভামিনী ভূমিকা সমাপ্ত হবার আগেই উপসংহারের আয়োজন ক'রে আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে অনায়াসে ঘুমের কোলে ঢুলে পড়তেন। ঘুম ছিল তাঁর পোষ-মানা কুকুরের মত;—তু বলে ডাকলেই ছুটে আসত।

কিন্তু ভামিনী এখনো হাল ছাড়েন নি। এখনো তিনি সর্ব্বদাই চোখ-কাণকে সজাগ ক'রে আছেন, এ ব্যাপারটার আদি-অন্ত সমস্ত রহস্য না-জেনে কিছুতেই তিনি ছাড়বেন না! তারপর,—দুর্গাকালীকে একবার দেখে নেবেন—হুঁ!

একদিন শেষরাত্রে হঠাৎ যেন কিসের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ভামিনীর ঘুম তো ঠুন্‌কো কাচের পেয়ালার মত অত-সহজে ভেঙে যায় না! কেন এমন অসময়ে ঘুম ভাঙল, বিছানার উপরে উঠে বসে গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে তিনি তাই ভাবতে লাগলেন।

এমনসময়ে নীচে সদর-দরজা খোলার শব্দ হ'ল। শুনেই তাঁর মনে একটা খট্‌কা লেগে গেল, বালিসের তলা থেকে তাড়াতাড়ি দেশলাই বার ক'রে তিনি তখনি জ্বেলে ফেল্‌লেন।

যা ভেবেচেন তাই! দুর্গাকালী তার বিছানায় নেই, সেখানে সুধু ছেলে মেয়ে দুটো পরস্পরের পা জড়িয়ে ধ'রে ঘুমোচ্চে।

ভামিনী তড়াক্ ক'রে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তারপর উঠি-কি-পড়ি এম্‌নি ভাবে নীচে নেমে গেলেন।

নীচে কেউ কোথাও নেই। কিন্তু সদর দরজাটা টেনে যা দেখলেন, তাতে তাঁর বুকের রক্ত শুকিয়ে জল হয়ে গেল। সদর দরজার বাইরে থেকে তালা বন্ধ।

তবে কি দুর্গাকালী ··· ··না—না আর কোনই সন্দেহ নেই—দুর্গাকালী নিশ্চয়ই তাঁকে ফেলে চম্পট দিয়েচে! পাছে তিনি তার পিছনে ছোটেন, সেই ভয়ে সে সদর দরজায় বাইরে থেকে তালাবন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে!

হায় হায়, কেন তিনি আর-একটু আগে জেগে ওঠেন নি—তাহলে তো এমন সর্ব্বনাশ হোতো না!

হঠাৎ ভামিনীর মনে পড়ে গেল,—তাঁদের বাড়ীর পিছনে একটা খিড়্‌কীর দরজা আছে। তিনি তখনি সেইদিকে দৌড়ে গেলেন। তারপর দরজা খুলে গলি দিয়ে বড় রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

নির্জ্জন পথ দিয়ে খানিক তফাতেই একটা পুরুষের সঙ্গে একজন রমণী হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছে। ভামিনীর বুঝতে দেরি হলো না যে, তারা কে? শিকারের ওপরে লাফিয়ে পড়বার সময়ে বাঘের চোখ যেমন-তারা হয়, তাঁরও চোখদুটো ঠিক তেম্নি জলে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে রমণীর একখানা হাত দুহাতে কষে চেপে ধরে, গলা থেকে এক ভয়ানক গম্ভীর আওয়াজ বার করে বল্লেন—"দুর্গাকালী!"

ছিলে ছিঁড়ে গেলে ধনুক যেমন ঠিক্‌রে ওঠে, তেম্নি করে ঠিক্‌রে উঠে রমণী ভয়ে শিউরে বল্লে, "ওগো মাগো, এ কে গো!"

কি সর্ব্বনাশ—এ তো দুর্গাকালী নয়! ভামিনী দস্তুরমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার হাত ছেড়ে দিয়ে, পিছন-হাঁটা ইঞ্জিনের মত সাঁ করে সরে গেলেন।

রমণীর সঙ্গে যে পুরুষটা ছিল, সে রুখে এসে বল্লে, "তবে রে পাজি, গেরস্তর মেয়ের গায়ে হাত!" বলেই সে দুহাতে দুই ঘুসি তুললে।

ভামিনী মিনতির স্বরে বল্লেন, "মশাই, মশাই, চ্যাঁচাবেন না,—মারবেন না! আগে আমার কথা শুনুন!"

ঠিক সেই সময় পাশের একটা বাড়ীর রোয়াক থেকে বাজখাঁই আওয়াজ এল—"আরে কোন্ শশুরা রে!"

ভামিনী স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন, লাল পাগ্‌ড়ী হাতে করে এক পাহারাওয়ালা রোয়াকের উপর থেকে নেমে আস্‌চে।

সেই লোকটা বল্লে, "পাহারাওলাজী, হাম লোক গঙ্গাস্নান করকে আতা হায়, আর এই বদমাসটা হামারা স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়া হায়!"

লালপাগড়ীটা মাথায় পরে নিয়ে পাহারা-ওয়ালা প্রকাণ্ড একটা হাই তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌লে—"কেয়া!"

এই যেম্নি 'কেয়া' বলা, ভামিনী অম্নি দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে দে দৌড়! কিন্তু পাহারাওয়ালাও ছোড়্‌নেওয়ালা নয়—সেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে সুরু করলে।

দ্রুত-ধাবনে ভামিনীর পক্ষে অসুবিধা ছিল একাধিক। কারণ ছুটতে গেলেই তাঁর দোদুল্যমান ভুঁড়িটি প্রতিপদেই তাঁকে ভূতলের দিকে সবেগে আকর্ষণ করত,—তার উপরে তাঁর বপুখানিও ছিল বিপুলজাতীয়। কিন্তু এ সব অসুবিধা ভামিনীকে আজ একটুও কাবু করতে পারলে না—বল্‌তে কি, নিজের ছোটবার ক্ষমতা দেখে ভামিনী আজ নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। কিন্তু রাতের পাহারাওয়ালারা হচ্ছে কুম্ভকর্ণের আধুনিক সংস্করণ—অসময়ে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে আর বাঁচোয়া নেই।

ভামিনী প্রথমটা যৎপরোনাস্তি বেগেই ছুটেছিলেন বটে, কিন্তু তিনটে রাস্তা পার হবার পর তিনি বেশ বুঝতে পারলেন, তাঁর ও পাহারাওয়ালার মাঝখানকার ব্যবধান ক্রমেই অত্যন্ত অন্যায়-রকম কমে আসচে।

চতুর্থ রাস্তার মোড়ে একটা মাতাল গ্যাসপোষ্টে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে, কলের পুতুলের মত আপন মনেই টল্‌মল্ করে টল্‌ছিল। ভামিনীর দ্রুত পদশব্দে অত্যন্ত চম্‌কে মুখ তুলে সে বলে উঠল—"এই, এই! ছুটিস্-নে, ছুটিস্-নে, অত জোরে ছুটিস্-নে

বাবা, টলে পড়ে মারা যাবি—হাত-পা খোঁড়া করবি।"

ভামিনীর মাথায় অম্‌নি একটা ফন্দি জুটে গেল। তিনি সাম্‌নের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলেন—"ধর্‌, ধর্‌! চোর, চোর!"

চোর-ধরায় বোধহয় মদের চেয়ে বেশী মাদকতা আছে। চোরের নাম শুনেই মাতাল লাফিয়ে উঠল! গ্যাসপোষ্টের আশ্রয় ছেড়ে সে বল্‌লে, "কৈ, কোথায় চোর?"

—"ঐ! ঐ! ঐদিকে পালাচ্চে!"

—"এ্যাঁ, আবার পালাচ্চে! তবে রে বেটা!"—বলেই সেই মাতালটা অনির্দ্দিষ্ট চোরের উদ্দেশে প্রাণপণে লম্বা এক দৌড় মারলে।

সাহসে ভর্‌ করে কপাল ঠুকে ভামিনী দাঁড়িয়ে পড়লেন, সেইসঙ্গে পাহারাওয়ালাও রাস্তার মোড় ফিরে তাঁর কাছে এসে পড়ল। ভামিনী ধাবমান মাতালের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে বল্‌লেন, "পাহারাওলাজী। ঐ দেখ, আসামী পালাচ্চে!"

পাহারাওয়ালা ভামিনীর দিকে চেয়েও দেখলে না—বেচারী মাতালকেই আসামী ঠাউরে সে তার পিছনেই ছুটল।

বুদ্ধির জোরে উপস্থিত বিপদ থেকে নিস্তার পেয়ে, ভামিনী আবার নিজের বাড়ীর দিকে দ্রুতপদে ফিরে এলেন।

সদর দরজায় তখনো তালা বন্ধ। একটা দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করে খিড়্‌কী দিয়ে তিনি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন।

৬

দুর্গাকালীকে তিনি যে এত-বেশী ভালো বাসতেন, এতদিন ভামিনী তা নিজেই আন্দাজ করতে পারেন নি। দুর্গাকালী তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে, এটা ভেবে এখন তাঁর মনে রাগের চেয়ে দুঃখই হোলো বেশী। তিনি একেবারে বিছানায় গিয়ে মুস্‌ড়ে পড়ে কান্না সুরু করলেন।

হায়রে, ঠিক বেলা ন'টার সময় আর কেউ তাঁকে ভাত-তরকারির থালা সাজিয়ে দেবে না, এটা খাও ওটা খাও বলে আর কেউ তাঁকে যত্ন করে খাওয়াবে না, পিঠের যেখানে নিজের হাত যায় না সেখানটা আর কেউ আদর করে নরম হাতে চুল্‌কে দেবে না, ময়লা জামা-কাপড় পরে বাড়ীর বাইরে যেতে গেলে, আর কেউ তাঁর জুতো-চাদর কেড়ে নেবে না, বন্ধুদের আড্ডায় গিয়ে বাড়ী ফিরতে রাত হ'লে আর কেউ তেমন মিষ্টি বকুনি বক্‌বে না—এবং সব-চেয়ে যা ভাবনার কথা, গরমে রাত্রে যখন ঘুম হবে না তখন হাতের চুড়ি রুণুরুণু বাজিয়ে, পাখার বাতাস করে আর কেউ তাঁকে ঘুম পাড়াবে না! অসহ্য শোকে মুহ্যমান হয়ে, ভামিনী গড়াতে গড়াতে বিছানার একপাশ থেকে আর একপাশে চলে গেলেন।

ভোর হ'তে আর দেরি নেই। কাদের আস্তাবল থেকে একটা মুরগী ডেকে উঠল,—সঙ্গে সঙ্গে সদর-দরজা খোলার শব্দ পেয়ে, ভামিনী কাণ খাড়া করে বিছানার উপরে উঠে বস্‌লেন।

একটু পরেই দুর্গাকালী এসে ঘরের

ভিতরে ঢুকল। ভামিনীকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে সে বল্‌লে, "ওমা একি! আজ যে বড় সূর্য্যি না উঠতেই তুমি উঠেচ!"

ভামিনী যেন তখনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। হাঁদারামের মত ফ্যাল্‌ফেলে চোখে চেয়ে, তোৎলার মত থেমে থেমে তিনি বল্‌লেন, "তুমি! তুমি—তাহলে—ফিরে—এসেচ?"

দুর্গাকালী বল্‌লে, "আজ আবার এ কি ঢং! ফিরে আস্‌বনা ত যাব কোন্ চুলোয়?"

ভামিনী বল্‌লেন, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

—"আজ যে বারুনী, গঙ্গাচানে গিয়েছিলুম।"

—"গঙ্গাচানে? একলা?"

—"একলা কেন? পাশের বাড়ীর সরোজিনী ছিল, তার মা, তাদের একজন চাকরও ছিল।"

—"আমাকে বলে গেলেই তো পারতে।"

—"তোমার তখন নাক ডাকছিল। ঘুম ভাঙালে তুমি যে রেগে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় ক'রে তুল্‌তে।"

—ভামিনী চেপে গেলেন। কথায় কথা বাড়িয়ে আসল কথা ফাঁস করে ফেলাটা তিনি নিরাপদ মনে করলেন না।

চ

স্ত্রী-হারানোর ভাবনা যেই গেল, ভামিনীর সন্দেহ অমনি জেগে উঠল। সেই চিঠিখানা তখনো বঁড়শীর মত তাঁর বুকের মাঝখানে গেঁথে ছিল—সেটা তো ফস্ ক'রে উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয়।

কিন্তু সে চিঠি নিয়ে আর গোয়েন্দাগিরি করতেও ভামিনীর সাহসে কুললো না। দু-দুবার যে ফ্যাসাদেই তিনি পড়েছিলেন! একবার বেপরোয়া লাঠি চালিয়ে ফাঁশী যেতে-যেতে বেঁচে গিয়েছেন, আর-একবার পরস্ত্রীর গায়ে হাত, পাহারাওয়ালার তাড়া—বাপরে, সে-কথা ভাবলে আর জ্ঞান থাকে না!

ভেবে-চিন্তে ভামিনী শেষটা স্থির করলেন, 'চিঠিখানা একেবারে দুর্গাকালীর সাম্‌নে ধরা যাক্! দেখি তার মুখের ভাব কি-রকম হয়,—তাহোলেই সব বোঝা যাবে!'

সেইদিনেই সন্ধ্যের সময়ে দুর্গাকালী যখন খাটের উপরে বসে বালিসে ওয়াড় পরাচ্ছিল, তখন ভামিনী তার কাছে গিয়ে বল্‌লেন, "দেখ দেখি, এই চিঠিখানা কার লেখা?"

দুর্গাকালী চিঠিখানা দেখে খুব সহজ স্বরেই বল্‌লে, "ওখানা তুমি কোথায় পেলে গা?"

—"আমার একখানা বইএর ভেতরে ছিল।"

—"দেখেচ আমার ভোলা মন! কত খুঁজেও আমি পাই-নি! ওখানা ঐ পাশের বাড়ীর সরোজিনীর চিঠি।"

—"কিন্তু এ যে দেখচি তোমারি হাতের লেখা!"

—"হাঁ, সরোজিনী যে লিখতে জানে না। তার বর রাগ করে চলে গিয়েছিল, আমি তাই তার হয়ে চিঠিখানা লিখে দিয়েছিলুম। সেদিন লিখতে লিখতে বেলা হয়ে গেল বলে, চিঠিখানা শেষ না করেই বইয়ের ভেতরে রেখেছিলুম, কিন্তু তার পরদিন খুঁজে

না পেয়ে, আমি তাকে আর-একখানা নতুন চিঠি লিখে দিয়েচি।"

—"কিন্তু তোমার সরোজিনীর চিঠিতে আমার ছেলের নাম কেন?"

"কি আশ্চর্য্য, তা জান না বুঝি? সরোজিনীর ছেলেরও ডাক-নাম যে হেবো!"

ভামিনী একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "দেখ, ভবিষ্যতে আর-কোনদিন পরের জন্যে প্রেম-পত্র লিখে, আমার কেতাবের ভেতরে গুঁজে রেখ না।"

ভামিনীর কথা কইবার ধরণ শুনে, দুর্গাকালী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বল্‌লে, "কেন, তাতে তোমার আপত্তি কিসের শুনি?"

—কিন্তু ভামিনী আবার চেপে গেলেন। তার দাদার উপরে লাঠি-চালানোর আসল কারণটা জানতে পারলে, দুর্গাকালীর জিভ যে কতটা অসংযত হয়ে উঠবে, ভামিনী সেটা আন্দাজ করেই শিউরে উঠলেন। হৃদয়েশ্বরীকেও হৃদয়ের সমস্ত কথা জানানো নিরাপদ নয়!

অতএব তিনি তাড়াতাড়ি কথা ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লেন, "দুর্গাকালী, আজ কি চমৎকার চাঁদ উঠেচে! চল, ছাতের ওপরে বেলফুলের টবের পাশে গিয়ে বসে খানিক গল্প করে আসি!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

আলোচনা

ভারতবাসীর উপনিবেশ

উল্লিখিত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত্রিপুরার আদি ইতিহাস সম্বন্ধে আভাস প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের অনেক কথাই আমরা প্রতিবাদ-যোগ্য বলিয়া মনে করি।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, ত্রিপুরার ইতিহাস প্রধানতঃ ত্রিপুরার রাজবংশেরই ইতিহাস। ত্রিপুরা-রাজাদিগের একটা প্রাচীন বংশ-বৃত্তান্তও আছে। তাহা 'রাজমালা' বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। বিদ্যাভূষণ-মহাশয় এই 'রাজমালার' ততটা অপেক্ষা না রাখিয়া অনেকটা স্বতন্ত্রভাবে ত্রিপুরার ইতিহাস গঠনেই যেন কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাহা না হইলে দ্রুহ্য-ত্রিপুর-ত্রিলোচন প্রভৃতি রাজমালায় উল্লিখিত ত্রিপুর-রাজবংশের সুবিদিত-নামা আদি পুরুষদিগের নাম বর্জ্জন করতঃ তিনি গোপাল নামক নূতন চন্দ্রবংশীয় এক রাজার সহিত ত্রিপুর-রাজবংশের যোগ-সাধনে প্রয়াসী হইবেন কেন? যাহা হউক যে গোপালের সহিত তিনি ত্রিপুর-রাজবংশের যোগ-সম্পাদন করিয়াছেন, সেই গোপাল তাঁহারই স্বীকৃতমতে হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। গোপালকে যদি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ই ধরিয়া লওয়া যায়, তবে তাঁহাকে চন্দ্রবংশীয় কোন্ ধারার ক্ষত্রিয় বলা হইবে? হস্তিনাপুরে যখন যুধিষ্ঠিরের বংশধরেরা রাজত্ব করেন, তখন গোপালই যুধিষ্ঠিরেরই বংশধারা, ইহাই বোধ হয় বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের অভিপ্রায়। কিন্তু সেই

সম্পর্কটী বিনাপ্রমাণে গৃহীত হইবে, তাহাই কি বিদ্যাভূষণ-মহাশয় আশা করিতে পারেন? আর যদি তাহা প্রমাণিত ও গৃহীতই হয়, তবে ত্রিপুর-রাজ-বংশেতিবৃত্ত 'রাজমালায়' উল্লিখিত ত্রিপুর-রাজদিগের দ্রুহ্যবংশীয় বলিয়া খ্যাতি ও ত্রিপুর-রাজবংশে তৎ-সম্বন্ধে চির-প্রচলিত কিম্বদন্তীর সহিত উহার কিরূপে সামঞ্জস্য হয়? যুধিষ্ঠির দ্রুহ্যর বংশধারা নহে, দ্রুহ্যর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুরই বংশধারা, তাহাতেই তাঁহাদের 'পৌরব' খ্যাতি সুপ্রচলিত। স্বীয় মত প্রকটিত করার পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের এই সমস্ত বিতর্কের সমাধানই কি উচিত ছিল না?

বিদ্যাভূষণ-মহাশয় গোপালের নামযুক্ত একখানা শিলালিপির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে বড়ই বলবত্তর সহায় বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই শিলালিপিতে আমাদের সন্দেহ কিন্তু আরও ঘনীভূত করিয়া দিতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, এই শিলালিপিতে ৮২ গুপ্তাব্দ অঙ্কিত আছে এবং এই গুপ্তাব্দের কাল ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হয়। ইহার পর তিনি গোপালের পুত্র জয়পালের এক শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সময় তিনি ১৮০ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৪২৬ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানে অঙ্কের হিসাবে কিন্তু বেশ গোলযোগই উপস্থিত হইতেছে। পিতার শিলালিপির ৮২ গুপ্তাব্দ, ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইলে, পুত্রের শিলালিপির ১৮০ গুপ্তাব্দ কি করিয়া ৪২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পারে? বরঞ্চ ৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হওয়াই উচিত হয়। গোলযোগ যে এইখানেই শেষ হইয়াছে তাহা নহে, অন্যত্র তিনি লিখিতেছেন:—"এই জয়পাল ও ১০৮ গুপ্তাব্দের জয়পাল অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।" এখানে জয়পালের প্রাগুক্ত ১৮০ গুপ্তাব্দের স্থলে ১০৮ গুপ্তাব্দই হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে খ্রীষ্টাব্দ আরও কম হওয়ারই কথা হয়। অথচ তিনি বরাবরই জয়পালের সময় স্পষ্টরূপে ৪২৬ খৃষ্টাব্দই লিখিয়া যাইতেছেন। আমাদের কিন্তু ধাঁধা বাড়িয়াই চলিতেছে। বিদ্যাভূষণ-মহাশয় এই ধাঁধাটী ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন কি? পিতা-পুত্রের মধ্যে তদায় সময়-নির্দ্দেশ মনুষ্য-আয়ুষ্কালকে যে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন কি? বর্মা বা নওগঙে প্রতিষ্ঠিত হস্তিনাপুরের রাজগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ই যখন হইতেছেন এবং সম্ভবতঃ পুরু বা যুধিষ্ঠিরেরই বংশধর হইতেছেন, তখন তাঁহারা বহুপূর্ব্ব প্রচলিত সংবৎ, শকাব্দ বা যুধিষ্ঠিরাব্দ গ্রহণ ও ব্যবহার না করিয়া কেন যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গুপ্তাব্দ গ্রহণ ও ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বিশেষ রহস্যময় ব্যাপারই বলিতে হইবে। ইঁহারা নিজেই পরে একটী অব্দও ত প্রচলন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরের অব্দ লইতে যাইবেন কিরূপে সম্ভবপর হয়?

তিনি দুইটী শিলালিপির উল্লেখ করিলেও একটীরও কোন প্রতিলিপি প্রদান করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। সুতরাং শিলালিপির প্রকৃত তথ্য আমাদের নিজের নির্দ্ধারণ করার কোন উপায়ই নাই। যাহা হউক শিলালিপির সময় লইয়া কেবল আমাদেরই ধাঁধা লাগিয়াছে তাহা নহে, তিনি নিজেও ধাঁধায় পড়িয়াছেন, দেখা যায়। তিনি শিলালিপি হইতে হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠার সময় ৩০০ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত করিলেও, ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে সেই প্রতিষ্ঠার সময় ৯২৩ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ উল্লিখিত রহিয়াছে, ইহাতে তাঁহার শিলালিপির সময়ের সহিত কেবল যৎসামান্য সময়ের ব্যবধান হইতেছে না, ১২০০ বারশত বৎসরের ব্যবধান হইতেছে। এক্ষণে এই এক দুই শতাব্দীর নহে, বারো শতাব্দীর ব্যবধানের সামঞ্জস্য করার কোন উপায় নাই দেখিয়া তিনি "তাহা নিতান্তই অতিরঞ্জিত" এই এক কথায়ই সমস্ত ব্যবধান মুছিয়া ফেলিলেন। তাহা না হইলে তাঁহার শিলালিপি খানা যে ভাসিয়া যায়! কিন্তু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এই সময়-নির্দ্দেশটাকে উড়াইয়া দেন নাই। আমাদের প্রত্নতত্ত্ব-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"বঙ্গদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে কার্ণেল জেরিনি প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা এ-কথা উদ্ধার করিয়াছেন যে, উত্তরব্রহ্মের তাগো নগরে হস্তিনাপুর হইতে আগত ক্ষত্রিয় রাজারা খৃঃ পূঃ ৯২৩ অব্দে রাজ্যস্থাপন করেন।" প্রাচীন সভ্যতা, ৮১ পৃঃ।

বিদ্যাভূষণ-মহাশয় স্বয়ংও এতৎ প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক বৃত্তান্তের সময়ের প্রমাণে পৃষ্ঠ-পূর্ব্বাব্দের উল্লেখ করতঃ Burmese Inscriptionএর (বর্মা-শিলালিপির) উপর বরাত দিয়াছেন। তবে তিনি কোন্ যুক্তিতে একটীকে বিশ্বাস ও অপরটীকে অবিশ্বাস করিতে পারেন? উপরে আমরা বিজয়বাবুর যে মত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে হস্তিনাপুরের ক্ষত্রিয় রাজারা ত্যমোনগরে রাজ্য স্থাপন করেন, এরূপই উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার নাম হস্তিনাপুর প্রদান করেন কিনা, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং হস্তিনাপুর নাম-সম্বন্ধেও আমরা একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিতেছি না।

বিদ্যাভূষণ-মহাশয় ত্রিপুর-রাজবংশের আদি পুরুষ গোপালের সময় যেরূপ পরবর্ত্তী করিয়াছেন, তাহাতে ত্রিপুর-রাজবংশ অন্ততঃ ১২০০ বারশত বৎসরের অর্ব্বাচীন হইয়া পড়ে। ইহাতে ত্রিপুর-রাজবংশের প্রাচীনতা কিরূপ খর্ব্ব হইয়া যায়, তাহা তিনি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এই খর্ব্বীকৃত সময়ের মধ্যে ত্রিপুর-রাজবংশের ১৪৪ জন রাজার সমাবেশ কি প্রকারে হইতে পারে, তাহাও তিনি অনুধাবন করিতেছেন কি? ইহাতে ঐতিহাসিক নিয়মানুযায়ী তিন-পুরুষে এক শতাব্দীর স্থলে যে প্রায় দশ পুরুষে এক শতাব্দী ধরার আবশ্যকতা হয়!

তৎপর তিনি গোপালের পুত্র জয়পালের সহিত তাঁহার রাজমালার তথাকথিত জয়পালের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন:—"অধিকন্তু রাজমালার প্রাচীনতম প্রাপ্ত পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জয়পাল নামক একজন ত্রিপুর নরেশ ছিলেন। রাজমালা অনুসারে ইনি ত্রিপুর হইতে সপ্তম নরপতি। এই জয়পালও ১০৮ গুপ্তাব্দের জয়পাল অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।"

জয়পাল ত্রিপুর-নরেশ ছিলেন, ইহা লিখিয়াই তিনি টীকায় লিখিতেছেন:—"পরবর্ত্তী পুথিতে লিপিকরের হস্তে ইনি রুক্মাঙ্গদ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।" 'জয়পাল' ও 'রুক্মাঙ্গদ' নামের বর্ণমালার মধ্যে এমন কি সাদৃশ্য আছে যে, লিখার সময়, এক অক্ষর সহজেই অনুরূপ অপর অক্ষরে পরিণত হইয়া যাইতে পারে? সুতরাং লিপিকরের দ্বারা জয়পাল, রুক্মাঙ্গদ রূপে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার এই কথায় আমরা কোনমতেই সায় দিতে পারিতেছিনা।

যে-ভাবে বিদ্যাভূষণ-মহাশয় ত্রিপুর রাজ-বংশের সহিত জয়পালকে সংস্পৃষ্ট করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজেই যে বিশেষ আস্থাবান্ হইতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার "অভিন্ন বলিয়া মনে হয়," এই সন্দেহমূলক কথাতেই বেশ ব্যক্ত হইতেছে। প্রাচীনতম রাজমালায় জয়পাল নাম যে আছে তাহা রাজমালা উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন না করায় এবং পরবর্ত্তী রাজমালায় ভিন্ন নামের কথা মন্তব্য করায় অথচ তাহার সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা দিতে না পারায়, এই জয়পাল নামের গোড়ায় যে যথেষ্ট গলদই রহিয়াছে, তাহাও প্রকাশ পাইতেছে। যিনি ত্রিপুর-রাজবংশের প্রকৃত প্রবর্ত্তক, তাঁহার নাম সম্বন্ধেই এত গোল থাকিলে, তাঁহার বিষয় কিরূপে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? বিশেষতঃ যখন রাজমালা-অনুসারে জয়পাল সপ্তম স্থানীয় নরপতি হইতেছেন, তখন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগকে ফেলিয়া তাঁহাকে কি করিয়াই বা প্রবর্ত্তক বলা যায়? এবং তাঁহাকে প্রবর্ত্তক বলিলে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগেরই বা কি গতি হইবে?

বিদ্যাভূষণ-মহাশয় একদিকে জয়পালকে "ত্রিপুর-নরেশ" বলিয়া আখ্যাত করিয়া, ত্রিপুর রাজবংশের আদি রাজা বলিয়া প্রচার করিলেন; অপরদিকে তৎপুত্র সোমাঙ্গ নওগঙে রাজ্য স্থাপন করেন বলিয়া, তাঁহাকেও ত্রিপুর-রাজবংশের প্রবর্ত্তক রূপেই বর্ণিত করিলেন! বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের লিখায়ই প্রকাশ যে, জয়পাল নওগঙে রাজত্ব করেন নাই, বর্ম্মায়ই রাজত্ব করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ত্রিপুরার রাজাদিগের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত হয় না। অথচ রাজমালায় ত্রিপুর-রাজদিগের মধ্যে তাঁহার উল্লেখ ও তাঁহার রাজত্বের উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা কি বিচিত্র কথা নহে? আমাদের দুষ্ট রাজমালা-মতে তিনি ত্রিপুর-রাজবংশের ১৪শ স্থানীয় রাজা, সুতরাং তিনি

আদি রাজা বলিয়া কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারেন? বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ও তাঁহাকে ৭ম স্থানীয় রাজা বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। জয়পাল নিজেই যখন বর্ম্মায় রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা হস্তিনাপুর হইতে প্রথম বর্ম্মায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন জয়পালের পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ জন বা ১৩ জন রাজার স্থান আর কোথায় থাকে? তবে দেখা যায়, রাজমালাকারের কলমেই মাত্র তাঁহাদিগের অস্তিত্ব থাকে—বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের কলমে নয়। বিদ্যাভূষণ-মহাশয় জয়পালের নাম লিপিকর-প্রমাদে পরবর্ত্তী রাজমালায় কৃষ্ণাঙ্গদ-রূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। আমরা বিশ্বকোষকার ও বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ উভয়ের প্রদত্ত ত্রিপুর-রাজবংশ-তালিকায়ই কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদ নামটীই স্পষ্টরূপে লিখিত দেখিতে পাই। তাঁহারা কৃষ্ণাঙ্গদের পুত্রকে বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের ন্যায় 'সোমাঙ্গ' লিখেন নাই, পরন্তু 'সোমাঙ্গদ' লিখিয়াছেন। এই 'সোমাঙ্গদ' নামটী কৃষ্ণাঙ্গদ নামের যেরূপ স্বাভাবিক অনুকরণ, তাহাতে 'কৃষ্ণাঙ্গদ' ভ্রমাত্মক হওয়া অপেক্ষা জয়পাল নামটী ভ্রমাত্মক হওয়ার সম্ভাবনাই কি অধিক বোধ হয় না? বিদ্যাভূষণ মহাশয় তো সোমাঙ্গকে ত্রিপুর-রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলিলেন, অথচ রাজমালায়ও তাঁহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার এই বিশিষ্ট কীর্ত্তির কোনও উল্লেখই নাই কেন? বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার রাজ্যস্থাপনের যে রাজনৈতিক কারণ অনুমান করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধেও কোনও আভাসই তাহাতে নাই কেন? এই সকল কি নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য রহস্য বলিয়াই বোধ হয় না?

সোমাঙ্গের সহিত জয়পালের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে যাইয়া বিদ্যাভূষণ-মহাশয় লিখিয়াছেন:—"রাজমালা মতে, এই জয়পালের পুত্রের নাম 'সোমাঙ্গ'।" জয়পাল হইলেন প্রকৃত বর্ম্মার রাজা, অথচ তাঁহার পুত্রের নামের প্রমাণ হইল রাজমালার বৃত্তান্তের দ্বারা। এই প্রমাণ কি বর্ম্মার ইতিহাস দ্বারা হওয়াই সঙ্গত হয় না? বিদ্যাভূষণ মহাশয় বর্ম্মা ও নওগঙ রাজ্যের মধ্যে সম্বন্ধের সূত্র প্রদর্শন জন্য যে সমস্ত "সিদ্ধান্তের স্থিরীকরণ সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন"—সেই স্থিরীকরণের ভাষা হইতেই সকলে সেই সূত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে প্রমাণ পাইবেন:—

"জয়পাল সম্ভবতঃ ৪২৬ খৃঃ হইতে ৪২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দেহত্যাগ করেন; তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে রাজ্য লইয়া বিবাদ ঘটিয়া থাকিবে। কোন পুত্র তগঙেই বাস করিতে থাকেন। ৪২৬ হইতে ৪১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনসময়ে সোমাঙ্গ তগঙ্ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক কপিলি রাজ্য বা ত্রিবেগ নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন।"

শিলালিপির অক্ষয় অকাট্য প্রমাণের যে শেষে সম্ভাবনাতে আসিয়া পরিণতি হইবে, তাহা কে ভাবিতে পারিয়াছিল?

শিলালিপি অপেক্ষাও বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের বলবত্তর সহায় 'হস্তিনাপুর' নাম। ইহাকেই তিনি ত্রিপুর-রাজবংশেতিহাসের সহিত সংযোগ-সাধক প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। বর্ম্মাদেশ হইতে জয়পালের পুত্র সোমাঙ্গ আসামে উপনিবেশ স্থাপন করতঃ ইহাকে হস্তিনাপুর নামে আখ্যাত করেন। "সোমাঙ্গ রাজনৈতিক কারণে বাধ্য হইয়া তগঙ্ বা হস্তিনাপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসামের অন্তর্গত বর্ত্তমান নওগঙ জিলার মধ্যবর্ত্তী কপিলি নদীর তীরে হস্তিনাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।" এই কথা লিখিয়াই বোধ হয় রাজমালায় ত্রিপুর-রাজদিগের কপিল-তীরে ত্রিবেগ নামক স্থানে প্রথমাধিষ্ঠানের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া যায়। তাই এইখানে ত্রিবেগের কথাও একটু বলিয়া গেলেন:—"এই স্থানই রাজমালার উল্লিখিত কপিল নদীর তীর-সমন্বিত "ত্রিবেগ।" ইহাকেই চৈনিক লেখক Kapily রাজ্য নামে আখ্যাত করিয়াছেন।" এই উক্তিটি কেবল রাজমালা-পক্ষের মনরক্ষার্থই বলিতে হইবে। নতুবা তন্নির্দ্দেশিত "হস্তিনাপুর" উল্লিখিত না হইয়া রাজমালায় কেন 'ত্রিবেগ' উল্লিখিত হইয়াছে এবং ত্রিবেগের বর্ত্তমান সংস্থান ও নাম পরিচয় কি ইত্যাদি কোন বিষয়ের মীমাংসার কথাই তাঁহার মনে স্থান পাইল না কেন? পাইবেই বা

কেমন করিয়া? হস্তিনাপুরের খেয়ালই যে তাঁহার মাথায় অনবরত ঘুরিতেছে! এই 'হস্তিনাপুরের' নাম-পরিচয় সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন:—"তখন রাজধানীর নাম হস্তিনাপুর ছিল। এখনও ঐ স্থানের নাম হস্তিনাপুর।" আমরা কিন্তু বিশ্বকোষ, Cyclopaedia of India, Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India প্রভৃতি কোন প্রামাণিক আভিধানিক গ্রন্থেই নওগণ্ড প্রাচীন কি আধুনিক কোনকালেই হস্তিনাপুর নামক কোন স্থানের উল্লেখ খুঁজিয়া পাইলাম না।

হস্তিনাপুরের সহিত ত্রিপুর-রাজবংশের যোগ-প্রদর্শন করিবার জন্য বিদ্যাভূষণ-মহাশয় পরিশেষে লিখিয়াছেন:—"ত্রৈপুর রাজ-বিবরণে সকল সময়েই রাজধানী হস্তিনাপুরের উল্লেখ আছে। কালে হস্তিনাপুরের নাম লোকে বিস্মৃত হইলেও, পরবর্ত্তী সকল রাজার অনুশাসনাদিতে রাজধানী হস্তিনাপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুর-মহারাজ কল্যাণমাণিক্য ও গোবিন্দ-মাণিক্যের তাম্রশাসনে রাজধানী "হস্তিনাপুর" ক্ষোদিত আছে। বর্ত্তমানকালে ত্রিপুর-নরেশদিগের সনদ প্রভৃতিতেও রাজধানী হস্তিনাপুরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে বিদ্যাভূষণ-মহাশয় নিজের মত নিজেই খণ্ডন করিতেছেন। তিনি "ত্রৈপুর রাজ-বিবরণে সকল সময়ই হস্তিনাপুরের উল্লেখ আছে" লিখিয়াই "কালে হস্তিনাপুরের নাম লোকে বিস্মৃত" হওয়ার কথা যখন লিখিলেন, তখন ইহা কি স্ববিরোধী কথাই হইল না? রাজমালাকেই সকলে প্রকৃত ত্রৈপুর-রাজ-বিবরণ বলিয়া জানে। তাহাতে কোথায় তো হস্তিনাপুরের উল্লেখ নাই। তবে ত্রৈপুর রাজ-বিবরণে সকল সময়েই হস্তিনাপুরের উল্লেখ থাকার কথা কি করিয়া সত্য হয়? পরবর্ত্তী রাজাদিগের অনুশাসনাদিতে হস্তিনাপুরের উল্লেখ-সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে যাইয়া তিনি ৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণের কথা বলিয়াছেন। যে বংশ তাঁহারই প্রমাণ-মতে ১২০০ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন, তাহার ৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণকে কি প্রাচীন প্রমাণ বলা যায়?

এতদপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণের অভাব সম্বন্ধে তিনি কি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন? কেবল বিস্মৃতিই কি ইহার যথেষ্ট কারণ হয়? রাজমালায় যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে ত্রিপুর-রাজের উপস্থিত হওয়ার বিবরণ আছে। এই যোগের দৃঢ়তা-সম্পাদনকল্পে যে, হস্তিনাপুরের সহিত পরবর্ত্তীকালে ত্রিপুরার দলিল-পত্রে, হস্তিনাপুরের যোগ কল্পিত হয় নাই কে বলিতে পারে? এই যোগটা রাজমালার রচনা শেষ হওয়ার পরেই যে পরিকল্পিত, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই রাজমালার কোথায়ও ঘুণাক্ষরেও হস্তিনাপুরের কোন উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ পরবর্ত্তীকালেও সনন্দাদিতে হস্তিনাপুরের উল্লেখ বরঞ্চ একটা official formality বা রাজকীয় রীতিরূপেই প্রতীয়মান হয়। তাহাতেই এতৎসম্বন্ধে সাধারণ কোন জনশ্রুতিই প্রচলিত দেখা যায় না। দলিলাদিতে হস্তিনাপুর নাম থাকার কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া বাবু কৈলাসচন্দ্র ত সিংহ মনে করেন না। তিনি লিখিয়াছেন:—হস্তিনাপুর চন্দ্রবংশের পরিচায়ক॥"

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
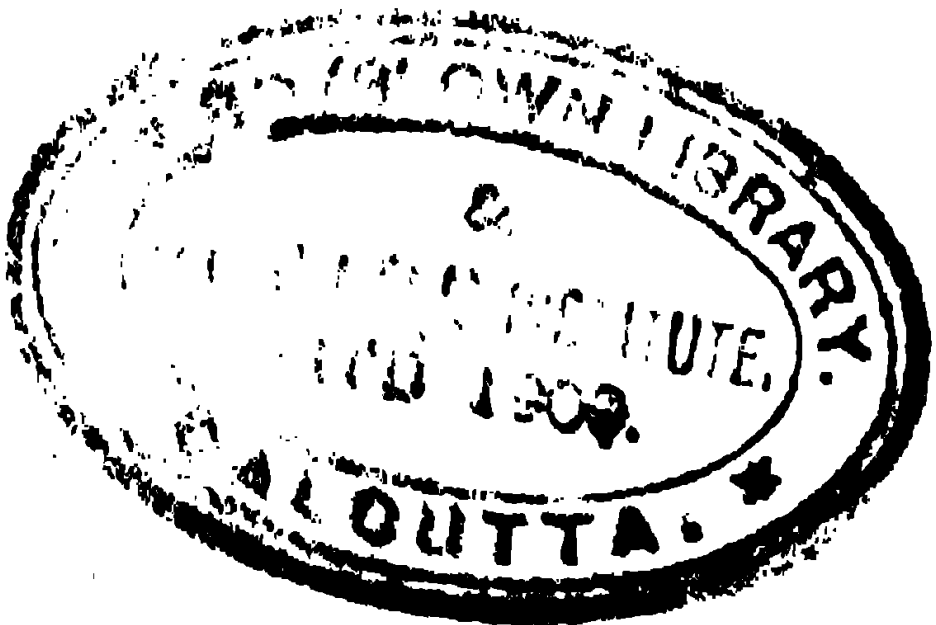
২

১৮৪—সালে, গ্রীষ্মের শেষভাগে, ফ্লরেন্‌স-নগরে আসিয়া পড়িলাম। আমার হাতে কিছু সময় ছিল, কিছু অর্থ ছিল, আর কতকগুলি সুপারিস-পত্র ছিল। আমি তখন খোষ-মেজাজী যুবাপুরুষ; আমোদ ভিন্ন আর কিছুই চাইতাম না! আমি এক পান্থশালায় আড্ডা করিলাম, একটা ফিটেন গাড়ী ভাড়া কর্‌রিলাম। বিদেশীর কাছে যার একটা মোহ অছে, আকর্ষণ আছে—এখানকার সেই নাগরিক জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। প্রাতঃকালে দেখিতে যাইতাম কোন গির্জ্জা, কোন রাজপ্রাসাদ, কোন চিত্র-শালা বেশ ধীরেসুস্থে,—কিছু-মাত্র ত্বরা না করিয়া। আর্টের অতি-ভোজনে, আমার ভিতরে আর্টের অগ্নিমান্দ্য আনিতে দিই নাই। যে-সব ভ্রমণকারীরা ওস্তাদের হাতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ রচনা তাড়াতাড়ি দেখিতে চায়, তাদের প্রায়ই শেষে আর্টে অরুচি ও বিতৃষ্ণা জন্মে। আমি কখন এটা, কখন ওটা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু একদিনে একটার বেশী দেখিতাম না। তারপর কোন হোটেলে আসিয়া, প্রাতর্ভোজনস্বরূপ এক পেয়ালা বরফে-জমানো কাফি খাইতাম, চুরোট্ ফুঁকিতাম, খবরের কাগজগুলায় চোখ্ বুলাইয়া যাইতাম, এবং পাশের দোকানে সুন্দরী ফুল-ওয়ালীর হাতের রচিত একটি ছোট পুষ্পগুচ্ছ ক্রয় করিয়া কোর্ত্তার বোতামের ছিদ্রে তাহা গুঁজিয়া, দিবা-নিদ্রা সেবনের জন্য বাড়ী ফিরিতাম। "ক্যাসি-নে"তে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বেলা ৩টার সময় আমার গাড়ী আসিয়া হাজির হইত। আমি "ক্যাসিনেতে" যাইতাম। প্যারিস্-নগরে যেরূপ সৌখীন বেড়াইবার স্থান "বোয়া-দে-বুলং", ফ্লরেন্স নগরে সেইরূপ "ক্যাসিনে"। শুধু তফাৎ এই, এখানে সকলেই পরস্পরকে চেনে। সেইখানে একটা গোলাকার পরিসরের মধ্যে অনাবৃত আকাশ-তলে, একটা যেন বড় রকমের বৈঠকখানা গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং আরমি-কেদারার বদলে কেবল বহুতর গাড়ী রহিয়াছে। গাড়ীগুলা সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে অর্দ্ধ-চক্রাকারে। জাঁকালো বেশভূষায় ভূষিতা মহিলাগণ গাড়ীর গদীর উপর অর্দ্ধশায়িত থাকিয়া স্বকীয় প্রণয়ীদিগকে, প্রণয়-পার্থী-দিগকে, ফুল-বাবুদিগকে, বিদেশী রাজদূতদিগকে আদর অভ্যর্থনা করেন। এবং ঐ সকল লোক গাড়ীর পায়-দানীতে টুপি রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আপনিও ত একথা জানেন যে,—সায়াহ্নে যেরূপ আমোদ-প্রমোদ হইবে, তাহার মৎলব ঐখানেই আঁটা হয়, ঐখানেই সঙ্কেতস্থানের নির্ণয় হয়। ঐখানেই পরস্পরের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে, পরস্পরের মধ্যে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ হয়। এ একরকম প্রমোদ-বাজার বলিলেও

হয়। সুন্দর বৃক্ষচ্ছায়ায়, অতীব রমণীয় আকাশতলে, বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্যন্ত এই বাজার বসে। যার একটু অবস্থা ভাল, তার এখানে প্রতিদিন একবার না আসিলেই নয়—আসিতে যেন সে বাধ্য। আমিও এই নিয়মের অন্যথা করিতাম না। তারপর সায়াহ্নে, ভোজনের পর, কোন বিদুষী-নারীর বৈঠকখানায়, কিংবা কোন ভাল গায়িকার গান শুনিবার জন্য "পের্গোলা" নাট্যশালায় যাইতাম।

এইরূপে আমার জীবনের কয়েক মাস অতি সুখে কাটিয়াছিল; কিন্তু এই সুখের দিন স্থায়ী হইল না। একদিন একটা খুব জাঁকালো খোলা গাড়ী ক্যাসিনেতে আসিয়া দাঁড়াইল; গাড়ীটা বার্ণিসে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, উহার গায়ে কুলমর্য্যাদাসূচক চিহ্ন অঙ্কিত; গাড়ীতে দুই তেজী ঘোড়া যোতা। অশ্বযুগলের তাঁবার সাজ। সহিস-কোচমানের জাঁকালো উর্দ্দিপোষাক; গাড়ী-দরজার হাতল হইতে যেন বিজলি ছুটিতেছে। সকলেরই দৃষ্টি ঐ জাঁকালো গাড়ীটার উপর নিবদ্ধ। বালু-ভূমির উপর একটা সুবক্র রেখা কাটিয়া গাড়ীটা অন্য গাড়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বুঝিতেই পারিতেছেন, গাড়ীটা খালি ছিল না; কিন্তু গতির দ্রুততা বশতঃ আর কিছুই ঠিক লক্ষ্য হইতেছিল না—কেবল, সাম্‌নের গদির উপর একযোড়া ক্ষুদ্র বুট্-জুতা প্রসারিত,—শালের একটা বৃহৎ ভাঁজ, এবং মাথার উপর সাদা রেশমের ঝালোর-ওয়ালা একটা ছাতা—ইহাই কেবল দেখা যাইতেছিল। ছাতাটা এইবার বন্ধ হইল, আর অমনি, একটি অনুপমা রূপবতী নারী চারিদিকে সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া লোকের নয়নপথে পতিত হইল। আমি অশ্বারূঢ় ছিলাম। তাই বিধাতার এই শ্রেষ্ঠ নারী-রচনার কোন খুঁটিনাটিই আমার চোখ এড়ায় নাই। রূপালি সবুজশাড়ী, সবুজ হইলেও ধবধবে মুখের রং-এর পাশে কালো বলিয়া মনে হইতেছিল। জরির ফুল-কাটা সাদা রেশমের একটা বড় ওড়নার ছোট ছোট ভাঁজে ভিতরের পরিচ্ছদ আবৃত রহিয়াছে। অলঙ্কারের মধ্যে হাতে একটি সোনার বালা; এবং সেই হাতে রমণী, ছাতার হস্তি-দন্তের হাতলটি ধরিয়া আছে।

"কাপুড়-দোকানদারের মতো আমি যে বেশভূষায় এই সব খুঁটিনাটি বর্ণনা করিতেছি, ডাক্তার-মশায়, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করবেন; কেননা প্রেমিকের চোখে এই সব ছোটখাটো স্মৃতির গুরুত্ব খুবই বেশী। তার ললাটদেশ তুষার-শুভ্র; তার নেত্রপল্লবের দীর্ঘ পক্ষ্ম-রাজিতে তার নীলাভ চক্ষু অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন। —যে গোলাপ কোকিলের প্রেমালাপে বা প্রজাপতির চুম্বনে লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠে সেই সঙ্কোচ-নম্র সুকুমার সাদা গোলাপের ন্যায় তার পেলব গালদুটি। কোন মানব চিত্রকরের পক্ষে তার মুখবর্ণের নকল করা অসম্ভব; তার মাধুর্য্য, তার অপার্থিব স্বচ্ছতা —তার সুকোমল আভা আমাদের স্থূল শরীরের রক্ত হইতে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যা কিছু আভাস পাওয়া যায় সে কেবল তরুণ অরুণ-রাগের মধ্যে, কিংবা কোন স্বচ্ছ গোলাপীবস্ত্রাবৃত অমল-ধবল পাষাণ-প্রতিমা হইতে বিচ্ছুরিত রমণীয় বর্ণের আভায়।

"রোমিও যেমন জুলিয়েটকে দেখিয়া রোজালিণ্ডকে ভুলিয়াছিল সেইরূপ আমি, সৌন্দর্য্যের চরম-উৎকর্ষ এই নারীমূর্ত্তি দেখিয়া আমার পূর্ব্বকার সমস্ত প্রেম-ভালবাসা বিস্মৃত হইলাম। আমার হৃদয়-গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলিতে পূর্ব্বমুদ্রিত সমস্ত অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া যেন একেবারে সাদা হইয়া গেল। সচরাচর লঘুহৃদয় যুবাদিগের ন্যায় কেমন করিয়া আমি পূর্ব্বে ইতর নারীদিগের রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, এখন তাহা বুঝিতেই পারিতেছি না। আমার মনে হইতে লাগিল আমার অন্তর্দেবতার যেন আমি অবমাননা করিয়াছি। এই প্রাণঘাতী সাক্ষাৎকার হইতে আমার জীবনে নূতন দিনের আরম্ভ হইল।

"দীপ্তিময়ী নারী-মূর্ত্তিকে লইয়া গাড়ীখানা "ক্যাসিনে" ছাড়িয়া, আবার সহরের রাস্তা ধরিল। আমার ঘোড়া লইয়া আমি এক তরুণবয়স্ক রুস্ ভদ্রলোকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ইনি একজন সৌখীন ভ্রমণকারী, য়ুরোপের সমস্ত নগরের সৌখিন মজলিসে ইঁহার খুব গতিবিধি আছে—বড় ঘরের লোকেদের ইতিহাস ইনি সমস্তই অবগত আছেন। ইঁহার নিকটে আমি এই বিদেশিনীর কথা পাড়িলাম। কথায় কথায় জানিলাম ইনি কৌনটেস্ প্রাস্কোভি লবিনস্কা; ইনি লুথানিয়া-বাসিনী, মহদ্বংশোদ্ভবা ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইঁহার স্বামী কাকেশিয়া প্রদেশে দুই বৎসর হইতে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

আপনাকে বলা বাহুল্য, কৌনটেসের দর্শন লাভের জন্য আমার অনেক কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; কেননা স্বামী প্রবাসে থাকায় তিনি কাহারও সহিত বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ করিতেন না। যাহা হউক আমি অবশেষে সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাইলাম। রাজ-পরিবারের দুই চারজন বৃদ্ধা বিধবা ও চারজন বৃদ্ধা ব্যারন্ পত্নী আমার হইয়া জবাবদিহী গ্রহণ করিলেন।

"কৌন্টেস্-লাবিনস্কা একটা জমকালো বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন—প্রাচীন প্রাসাদ,—ফ্লোরেন্স হইতে তিন মাইল দূরে। প্রাচীন প্রাসাদের কঠোর গাম্ভীর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কৌন্টেস আরামপ্রদ সমস্ত আধুনিক সাজসজ্জা ও আসবাবে বাড়ীটিকে সজ্জিত করিয়াছিলেন। সেকালের লোহার পত্তর-মারা বড়বড় দরজা একালের সূচাগ্র খিলানের সহিত বেশ মানানসইভাবে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে; আরাম-কেদারা ও সেকেলে ধরণের আসবাব সকল, কাঠের কারুকার্য্যে কিংবা ম্লানাভ 'ফ্রেস্কো'-চিত্রে আচ্ছন্ন দেওয়ালের সহিত বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্থাপিত হইয়াছে। কোন নূতন-টাট্‌কা বা উজ্জ্বল রঙে চক্ষু পীড়িত হয় না; এককথায় বর্ত্তমান, অতীতের সহিত মিলিত হইয়া একটুও বেসুরো বাজিতেছে না।

"যেমন আমি কৌন্টেসের দীপ্তিময়ী সৌন্দর্য্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম তেমনি আবার কয়েকবার দর্শনলাভের পর তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আরও বিস্ময়স্তম্ভিত হইলাম। ওরূপ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বতঃ-প্রসারিণী বুদ্ধি সচরাচর দেখা যায় না। যখন তিনি কোন চিত্তাকর্ষক বিষয় সম্বন্ধে কথা কহিতে থাকেন তখন যেন তাঁর সমস্ত আত্মা ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখা দেয়। অন্তঃপ্রভ কোন

দীপের আলোকে আলোকিত অমল-ধবল মর্ম্মর-প্রস্তরের ন্যায় তাঁর বর্ণের শুভ্রতা। কবি দান্তে স্বর্গের শোভাসৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার সময় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁর বর্ণের আভায় 'স্ফটিক' স্ফুলিঙ্গচ্ছটা ও আলোক-কম্পন যেন পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় যেন কোন দেবী স্বর্গলোক হইতে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছেন। আমার চোখ্ ঝলসাইয়া গেল; আমি আত্মহারা ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তাঁহার সৌন্দর্য্য-ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যের মধুর সঙ্গীতে বিমুগ্ধ হইয়া, উত্তর দেওয়া যখন নিতান্ত আবশ্যক হইত তখন আমি থতমত খাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিতে করিতে কতকগুলি অসংলগ্ন কথা বলিয়া ফেলিতাম, তাহাতে আমার বুদ্ধি-সম্বন্ধে তাঁর খুব হীন ধারণাই হইত সন্দেহ নাই। কখন কখন আমার থতমত ভাব ও নির্ব্বুদ্ধিতার কথা শুনিয়া একটি গোলাপ-রক্তিম আলোকরশ্মির ন্যায় তাঁর সুন্দর ওষ্ঠাধরের উপর সুহৃৎ-সুলভ সদয় উপহাসরঞ্জিত মৃদুমধুর একটু হাসির রেখা অলক্ষিতে দেখা দিত।

"আমার প্রেমের কথা এখনো পর্য্যন্ত আমি বলি নাই; তাঁহার সম্মুখে আমি চিন্তাহীন, বলহীন, সাহসহীন হইয়া পড়িতাম; আমার বুক ধড়াস ধড়াস করিত, যেন হৃৎপিণ্ডটা আমার বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমার হৃদয়রাণীর পদতলে গিয়া লুটাইয়া পড়িবে। কতবার উহাঁর নিকট আমার মনোভাব প্রকাশ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু একটা অনিবার্য্য ভীরুতা আসিয়া আমাকে আটকাইয়া রাখিল। তাঁহার মুখে আমার প্রতি একটু ঔদাস্য বা অপ্রসন্ন ভাব কিংবা একটু ঢাকাঢাকির ভাব লক্ষ্য করিলে আমার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া যাইত, অথবা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইত। কিছুই না বলিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িতাম; বাহির হইবার সময় দরজা যেন হাতড়াইয়া পাইতাম না, মাতালের মত টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতাম।

"বাহির হইয়া আসিবার পর আমার বুদ্ধি-বৃত্তি যেন আবার ফিরিয়া আসিত এবং তখন প্রজ্বলন্ত প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিতাম, খুব আবেগের সহিত আমার অনুপস্থিত হৃদয়-পুত্তলীর নিকট আমার শত শত প্রেমের নিবেদন জানাইতাম। এই সব হৃদয়-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার পর মনে হইত, এইবার বুঝি আমার রাণী স্বর্গ হইতে আমার নিকটে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন; তখন দুই বাহু দিয়া কতবার তাঁকে আমার বক্ষের উপর আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

"কোণ্টেস্ আমার মনকে এতটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, যে "প্র্যাস্‌কোভি লাবিন্‌স্কা" এই নামটি আমি মন্ত্রের মত দিবারাত্র জপ করিতাম। এই নামে যে কি অপূর্ব্ব সুধা আছে তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। জপ করিবার সময় "প্রাস্কোভি লাবিনস্কা" এই নামটি কখন বা মুক্তা দিয়া, কখনো বা ধীরে ধীরে পুষ্পমালার আকারে গাঁথিতাম, কখন বা ভক্তসুলভ বাক্য-প্রচুর অসংযত ভাষায় ঐ নাম তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতাম। আবার কখন কখন উৎকৃষ্ট কাগজের উপর, নানাপ্রকার চাঁদ ও বর্ণের

রেখা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া তাঁহার নাম সুন্দর করিয়া লিখিতাম, তারপর ঐ লিখিত নামের উপর বার বার আমার লেখনী বুলাইতাম। কোণ্টেসের সহিত আবার যতক্ষণ না সাক্ষাৎ হইত ততক্ষণ এই সুদীর্ঘ বিরহ-কাল এইরূপেই কাটাইতাম। আমি পুস্তকপাঠে কিংবা কোন কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। প্রাণ্ডোক্তি ছাড়া আর আমার কোন বিষয়েই ঔৎসুক্য ছিল না, এমন কি দেশ হইতে যে চিঠিপত্র আসিত, তাহা না খুলিয়াই ফেলিয়া রাখিতাম। অনেক বার এই অবস্থা হইতে বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করিয়াছিলাম, ভাল বাসিয়াই তুষ্ট ছিলাম, ভালবাসার কোন প্রতিদান চাহি নাই, শুধু তাঁর গোলাপরক্তিম অঙ্গুলীপ্রান্ত, আমার ওষ্ঠযুগল আলগোচে যদি একটিবার চুম্বন করিতে পারে, ইহাই আমার চূড়ান্ত বাসনা ও স্বপ্নের জিনিস ছিল, ইহার অধিক আশা করিতে আমি সাহসী হই নাই। মধ্যযুগে ভক্তেরা "ম্যাডোনার" নিকট নতজানু হইয়া যেরূপ একান্তমনে ভক্তিভরে পূজা করিত, তাহা অপেক্ষা আমার এই পূজা-অর্চনা কোন অংশেই কম ছিল না।"

ডাক্তার শেরবোনো, অক্টেভের কথা খুব মনোযোগের সহিত শুনিতে ছিলেন। কেন না, তাঁর নিকট অক্টেভের এই আত্ম-কাহিনী শুধু একটা রোম্যান্টিক গল্প নহে। অক্টেভের কথার বিরাম হইলে, ডাক্তার মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছিলেন, "যা দেখ্‌ছি, এ-তো স্পষ্ট প্রেম-বিকারের লক্ষণ; এ এক অদ্ভুত রোগ, কেবল একবার মাত্র এই রকম রোগ আমার হাতে এসেছিল; চন্দননগরে এক ডোম-রমণী কোন ব্রাহ্মণের প্রেমে পড়ে, বেচারী সেই প্রেম-রোগেই মারা যায়; কিন্তু সে ছিল অসভ্য বুনো, আর ইনি হচ্চেন সভ্যজাতীয় লোক, আমি নিশ্চয়ই এঁকে ভাল করতে পারব।" এই অবান্তর চিন্তাটা থামিয়া গেলে, ডাক্তার হাতের ইসারায় অক্টেভকে আবার আত্মকাহিনী আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন। তারপর পা ও হাঁটু দুমড়াইয়া, হাঁটুর উপর চিবুক রাখিয়া ফড়িং-এর মতো পা মেলিয়া ডাক্তার অবহিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। যদিও এই ভাবে বসা আমাদের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু মনে হয় বসিবার এই ভঙ্গীই ডাক্তারের বেশ অভ্যস্ত।

অক্টেভ আবার বলিতে আরম্ভ করিল:— "আমার এই গুপ্ত মনোবেদনার খুঁটিনাটি বর্ণনা করিয়া আর আপনাকে বিরক্ত করিব না। একদিন, কোণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অদম্য বাসনা দমন করিতে না পারিয়া, আমি যে সময়ে সচরাচর তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম, তাহার কিছু আগেই গেলাম, সে সময়ে দিনটা ঝোড়ো ও বাষ্পভারাক্রান্ত ছিল। আমি রাণীকে তাঁর বৈঠকখানায় দেখিতে পাইলাম না। পাতলা পাতলা থামে পরিধৃত দ্বার প্রকোষ্ঠে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন, উহার সম্মুখেই একটা অলিন্দ; এই অলিন্দের উপর দিয়া উদ্যানে নামিতে হয়। তিনি তাঁর পিয়ানো, একটা কোচ ও খানকয়েক বেতের চৌকি ঐখানে আনাইয়াছিলেন। থামের মাঝেমাঝে গঠিত ইষ্টক-বেদিকার উপর সুরভি-কুসুমে পূর্ণ কতকগুলি জমকালো ফুলদানা রহিয়াছে

এবং মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত-প্রদেশ হইতে দমকা বাতাস আসিয়া সৌরভে পরিসিক্ত হইয়া চারিদিক আমোদিত করিতেছে। তাঁহার সম্মুখে স্তম্ভশ্রেণীর ফাঁকের মধ্য দিয়া উদ্যানের কাটা-ছাঁটা ঝোপের বেড়া দেখা যাইতেছে। শতবর্ষবয়স্ক কতকগুলা ঝাউ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে; ইতস্তত সুগঠিত পাষাণ-প্রতিমা উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

"রাণী বেতের কৌচে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একাকী ছিলেন। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! এমন সুন্দরী এর পূর্ব্বে আমি এঁকে কখনই দেখি নি; শরীরে একটা এলানো ভাব, গরমে যেন অবসন্ন। ভারতের শুভ্র স্বচ্ছ মস্‌লিন বস্ত্রে আবৃত—যেন সাগরের অপ্সরা সাগরের ফেনপুঞ্জে পরিস্নাত; পরিচ্ছদের কিনারায় যেন তরঙ্গের রজত-ঝালর দীপ্তি পাইতেছে। একটি ইস্পাতের ব্রোচে এই স্বচ্ছ লঘু পরিচ্ছেদ বক্ষের উপর আটকানো রহিয়াছে, এবং এই পরিচ্ছদ পদতল পর্য্যন্ত লুটিয়া পড়িয়াছে। ফুলের পাপড়ীর ভিতর হইতে ফুলের মত,অমল ধবল বাহুযুগল জামার আস্তিন হইতে বাহির হইয়াছে। কোটিদেশ একটি কালো ফিতায় বদ্ধ—ফিতার প্রান্ত নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে—পায়ে বিচিত্র রেখায় অঙ্কিত নীল চর্ম্মের একযোড়া ছোট চটিজুতা;—পদতলের পরিচ্ছদের ভাঁজ হইতে উহার ছুঁচালো বক্র মুখ বাহির হইয়া রহিয়াছে।

"রাণী বই পড়ছিলেন, আমাকে দেখে পাঠ বন্ধ করলেন। এবং একটু মাথা নাড়িয়া ইসারায় আমাকে বস্‌তে বল্‌লেন। রাণী একাকী ছিলেন; এইরূপ অনুকূল অবস্থা বড়ই দুর্লভ। তাঁর সম্মুখেই একটা আসনে আমি বস্‌লাম। কয়েক মিনিটকাল ধরিয়া আমাদের মধ্যে একটা গভীর নিস্তব্ধতা ছিল। এই নিস্তব্ধতার দীর্ঘ মুহূর্ত্তগুলি বড়ই কষ্টকর। কথোপকথন-সুলভ সাদামাটা কথাও আমার মুখে যুগাইল না; আমার মাথা যেন ঘুলিয়ে গেল; আমার হৃৎপিণ্ড থেকে অগ্নিশিখা বেরিয়ে যেন আমার চোখে এসে দেখা দিল। তখন আমার প্রেমিক হৃদয় আমাকে বল্‌লে, "দেখো, এই পরম সুযোগ হারিয়ো না।"

কি করেছিলাম আমি জানি না—হঠাৎ দেখি রাণী আমার কষ্টের কারণ বুঝ্‌তে পেরে কৌচের উপর একটু উঠে বসে', তাঁর সুন্দর হাতটি বাড়িয়ে ইঙ্গিতে যেন আমার মুখ বন্ধ করতে বোল্লেন।

"একটি কথাও বোলো না অক্টেভ্‌; তুমি আমাকে ভালবাস—আমি জানি, আমি বেশ অনুভব করি, আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু আমি তা চাই না, কারণ ভালবাসা ইচ্ছাধীন নয়। অন্য রমণী যারা আমা অপেক্ষা কঠোর, তোমার উপর হয়ত রাগ করবে; কিন্তু আমি তোমাকে ভাল বাস্‌তে পারিনে বোলে, আমার কেবল দুঃখ হয়, এইমাত্র। আমি তোমার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছি—এইটিই আমার দুঃখ। আমার সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে বোলে আমি দুঃখিত—না দেখা হলেই ভাল হত। কি কুক্ষণেই আমি ভেনিস্‌ ত্যাগ করে ফ্লরেন্‌সে এসেছিলাম। প্রথমে আমি আশা করেছিলাম, তোমাকে ক্রমাগত উপেক্ষার ভাব দেখালে, যদি তুমি দূরে চলে যাও। কিন্তু আমি জানি প্রকৃত ভালবাসা—যার সমস্ত

চিহ্ন আমি তোমার চোখে দেখতে পাই—সেই প্রকৃত ভালবাসা কোন বাধাই মানে না, কিছুতেই দমে না। কিন্তু আমার অন্তঃকরণ এই কোমল ভাব, তোমার মনে যেন কোন বিভ্রম উৎপন্ন না করে, কোনও স্বপ্ন জাগিয়ে না তোলে। তোমার প্রতি অনুকম্পা করচি বলে মনে কোরো না তোমার প্রেমে আমি উৎসাহ দিচ্চি। এক জ্যোতির্ম্ময় দেবদূত, আমাকে সমস্ত প্রলোভন থেকে সর্ব্বদাই রক্ষা করচেন—তিনি ধর্ম্ম হতেও শ্রেষ্ঠ, কর্ত্তব্য হতেও শ্রেষ্ঠ, পুণ্য হতেও শ্রেষ্ঠ,—আর সেই দেবদূতই আমার প্রাণেশ্বর:—কৌণ্ট লাবিন্স্কাকে আমি দেবতার মত পূজা করি। আমার সৌভাগ্য এই যে, যিনি আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা, তাঁর সঙ্গেই আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।"

"এই অকপট আন্তরিক পতি-ভক্তির কথা শুনে আমার চোখে জল এল; আর সেইসঙ্গে আমার জীবনের মর্ম্মগ্রন্থিটিও যেন ছিন্ন হয়ে গেল।

"রাণী প্রাস্কোভি আমার কষ্টে বিচলিত হয়ে, নারীজনসুলভ স্নেহ-মমতার বশে নিজের সুরভি রুমালখানি আমার চোখের উপর বুলিয়ে দিলেন। আর বল্‌লেন—"ছি, কেঁদো না। আর কোন বিষয় ভাবতে চেষ্টা কর, মনে কর,আমি চিরকালের মত বিদায় নিয়েছি, আমি মরে গেছি। আমাকে ভুলে যাও। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে বেড়াও, কাজ কর, লোকের উপকার কর,সচেষ্ট ভাবে বিশ্বমানবের কাজে যোগ দাও—লোকের সঙ্গে মেশামেশি কর—আর্টের চর্চ্চা কর, কিংবা আর কাউকে ভালবেসে মনকে শান্ত কর।"

"আমি অস্বীকারের ভঙ্গী করলাম। রাণী আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন:—

"তুমি কি মনে কর, আমার সঙ্গে বরাবর এইরূপ দেখাসাক্ষাৎ করলেই তোমার কষ্টের লাঘব হবে? আচ্ছা বেশ, তুমি এসো, আমি তোমার সঙ্গে সর্ব্বদাই দেখা করব। ভগবান বলেছেন, শত্রুকেও ক্ষমা করবে। তবে, যারা আমাদের ভালবাসে তাদের সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহার করা ঠিক?—কখনই না। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, বিচ্ছেদই এর অমোঘ ঔষধ। দুই বৎসর কাল পরে, আমরা সহজভাবে, বিনা সঙ্কটে পরস্পরের হস্ত-মর্দ্দন করতে পারব—তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—"অবশ্য, বিনা সঙ্কটে তোমার পক্ষে।"

"তার পর দিনই আমি ফ্লরেন্‌স্ ছাড়লাম, কিন্তু কি জ্ঞানচর্চ্চা, কি দেশ-ভ্রমণ, কি কালের দীর্ঘতা কিছুতেই আমার কষ্টের লাঘব হল না। আমি বেশ অনুভব করচি, আমার মরণ নিকটে। না, ডাক্তার মশায়, আমার মৃত্যুতে আপনি বাধা দেবেন না।"

ডাক্তার বলিলেন—"তারপর রাণীর সঙ্গে আর কি দেখা হয়েছে?" এই কথা বলিবার সময় ডাক্তারের নীলচক্ষু হইতে অদ্ভুত রকমের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। অক্টেভ উত্তর করিলেন—"না,তিনি এখন প্যারিসে আছেন।" এই কথা বলিয়া অক্টেভ ডাক্তারের দিকে হাত বাড়াইয়া একটা নিমন্ত্রণ-পত্র দিলেন। সেই পত্রের উপর লেখা ছিল:—

"আগামী বৃহস্পতিবার প্রাস্কোভি কৌণ্টেস্ লাবিন্স্কা বন্ধুজনের অভ্যর্থনার্থ গৃহে থাকিবেন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রাবণ-রজনী

সেদিন বরষা-রাতি,
ঘনঘোর মেঘে জ্যোৎস্না ডুবেছে, বাতাসে নিবেছে বাতি।
সাঁই-সাঁই করে' গাছের পাতায় থেকে থেকে নামে জল,
কখনো মেঘের আড়ালে ফুটিছে চন্দ্রিকা সুবিমল।
বাতায়ন-পথে মাঠ-ঘাট-বাট যতদূর যায় দেখা—
সকলের 'পরে ছায়া-আলোকের সজল চিত্র-লেখা।
আকাশে কোথা'ও মসীর মতন জমাট মেঘের স্তূপ,
কোথা'ও ধূসর মুক্তাবরণ আলিপনা অপরূপ।
আলোক যেথানে অধিক ফুটেছে সেথানে দুধের বান,
কালো মেঘ-আড়ে চন্দ্রবিম্ব তিলকের উপমান!

একবার ফিরে' চাহিয়া দেখিনু প্রিয়া ঘেঁসে আছে শুয়ে,
কঠিন কেয়ূর বাজিছে পাঁজরে, মুখখানি আছে নুয়ে।
তুলিয়া ধরিয়া বারেক চাহিনু, কি করিল বলি শুন,
নয়নে নয়ন বারেক রাখিয়া দু'হাতে ঢাকিল পুন।
নাকের নোলক দোলাইয়া দিয়া চিবুক পরশি' যবে
কহিলাম, কিবা মানায়েছে তোমা—নোলক পরিলে কবে।
উপহাস ভাবি' নোলক তখনি নাকের ভিতরে গুঁজি'
লাজে মরে' গিয়ে মুখ লুকাইয়ে প্রিয়া রহে চোখ বুঁজি'।
যখনি কিন্তু মুখ-পানে চাই তখনি পড়ে গো ধরা—
চুরি-করে'-চাওয়া চপল নয়ন ভয়ে মুদে' যায় ত্বরা।

এমনি করিয়া অর্দ্ধ-রজনী আলসে-বিলাসে কাটে,
জ্যোৎস্না-রূপসী মেঘগুণ্ঠন খুলিল আকাশ-বাটে।
চরাচর-জোড়া ছায়া-আলো-বোনা মিহিন্ জরীর জাল
অসীম শোভার স্বপনে বাঁধিল ধরণীরে সুবিশাল।
মেঘ-আড়ে যবে জ্যোৎস্না ফুটিয়া সিক্ত ধরণী-মুখ
চুম্বন করে, মনে পড়ে মোর কবেকার সুখদুখ!

শ্রাবণ-নিশীথে নবীনা রাধার প্রাণখানি ধুক্‌ধুক্—
জানিয়াছি কেন ভরি' আছে হেন বাঙালী কবির বুক।
আমারি দেশের আষাঢ়-গগনে নবীন নীরদ-ছায়া,
স্থলে-জলে রচে বরষে-বরষে বৃন্দাবনের মায়া।
গোঠে যায় ধেনু, মাঠে বাজে বেণু—আমারি শ্যামল দেশে—
"চাঁদিনী উঠিলে ফুল্‌টি ফুটিলে কদমতলায় কে সে!"
মান-অভিমান, বিরহ-মিলন, অভিসার অভিরাম—
যাহারে ঘেরিয়া উছলিছে গীতি যুগ-যুগ অবিরাম,
মুকুল-বয়সী, গোকুলে বসতি, হৃদয়ে পীরিতি-মধু—
রাইকিশোরীর রূপগুণ হরে আমারি কিশোরী-বধূ।

মেঘের আঁধারে সাঝের আঁধার কিছু নাহি চেনা যায়,
প্রদীপ সাজায়ে শাঁখটি বাজায়ে প্রণমে দেবতা-পায়,
বিকালে-কুড়ানো বকুলের রাশ ছিল যা' থালায় ঢালা
তাই নিয়ে সারা সন্ধ্যাটি কাটে গাঁথিয়া দীর্ঘ মালা।
রাধিকারি সখী সে কমল-মুখী কিশোরী বঙ্গবালা,
তাহারি স্নেহের সন্ধ্যা-প্রদীপ ঘরে ঘরে হয় জ্বালা।
নবনীত জিনি রূপের নিছনি, পুষ্পকেশর কেশ,
কবরী ঘেরিয়া যূথিকার মালা, নীলাম্বরীর বেশ,
মিলনের বুকে বিরহের ভয়, হাসিতে অশ্রু মেশে,
এমন হাসিতে এমন কাঁদিতে কেবা পারে কোন্ দেশে!

বাহিরে ঝরিছে জল অবিরল, বায়ু করে মাতামাতি;
এত কাছে শুয়ে বুকে মাথা থুয়ে তবু ভয় সারারাতি!
কণ্ঠ আমার বেড়িয়া ধরেছে কখন ঘুমের ঘোরে,
অতি সুকোমল, 'নোয়া'-পরা ছোট একটি বাহুর ডোরে।
ঘুমন্ত মুখে ঘোম্‌টা খসেছে, উস্কখুস্ক চুলগুলি
সন্তর্পণে নয়ন হইতে ললাটে দিলাম তুলি'।
কপোলে জ্বলিছে মাণিকের মত কাণের রতন-দুল,
শিথানে পড়েছে কখন খসিয়া খোঁপার দু'চারি ফুল।
ঈষৎ-ভিন্ন অধর-পাতায় হাসিটি করিছে খেলা,
মুদিত চোখের পাপ্‌ড়ি-কিনারে স্বপন-শোভার মেলা।

বারেক চাহিনু আকাশের পানে, বারেক ধরণী-পানে,
সঘন বরষা ঘনায় আবার, ঘন চিকুর হানে।
একটু জ্যোৎস্না খসিয়াছে শুধু কোন্ সে মেঘের ফাঁকে
আমারি ঘরের বালিস-আলিশে, হৃদয়ে ধরিনু তাঁকে—
শ্রাবণের গান, কবিতার ভাণ সকলি হারা'য়ে গেনু,
বিভোর পরাণে নিমীল-নয়ানে চুমিয়া সকলি পেনু।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

বারোয়ারি উপন্যাস

৯

ক্ষিতীশ অনেক কষ্টে সেদিন হরেন্দ্রকে আবিষ্কার করে', নিজে সঙ্গে করেই তাকে বাসায় নিয়ে এসেছিল; হরেনকে উপরে পাঠিয়ে দিয়ে, চায়ের একটু আয়োজন করবার জন্যে সে নীচেই রইল।—ঠাকুর, চায়ের জল তৈরি আছে? নেই? কেৎলিটা চড়িয়ে দাও চট্ করে'। ক' পেয়ালা জল চড়াবে? চড়াও চার পাঁচ পেয়ালার মতন—আজ একটু শীত আছে। রামা, যা ত, তিনকড়ির দোকান থেকে আধ সের রসগোল্লা নিয়ে আয়—বেশ বড় বড় দেখে, বুঝলি? আর ঐ বড় রাস্তার মোড়ে, ক্যালকাটা হোটেল থেকে খানকত কেক্-টেক্—এই এক টাকার আন্দাজ, বিস্কুট ত ঘরেই আছে। যাবি আর আসবি—দেরী না হয়।—ইত্যাদি হুকুম জারি করে', ঝিকে দিয়ে পেয়ালা পিরিচ প্লেট ছুরি চামচগুলো সে ধুইয়ে মুছিয়ে চক্‌চকে করে' নিতে লেগে গেল।

দশ মিনিটের মধ্যে সমস্তই প্রস্তুত, চায়ের জলও প্রায় ফুটে এসেছে, রামা এখন বাজার থেকে ফিরলেই হয়। ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় ক্ষিতীশ পায়চারি করতে লাগল। দোতালা থেকে মাঝে মাঝে হরেনের উচ্চ-হাসির শব্দ আসে, আর তার মুখখানি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। মনে মনে সে ভাবে, দুজনে খুব জমে গেছে, দেখ্‌চি! কমলা আজ আট দিন এখানে রয়েচে, আমার কাছে কোনো দিন কোনো হাসির কথা ত বলেনি। আমার বেলায় কান্না, আর হরেন্দার বেলায় হাসি বুঝি! আচ্ছা!

ক্রমে রামা এসে পৌঁছল। প্লেটে প্লেটে খাবারগুলি সাজিয়ে, চা ঠিক করে' সেগুলি নিয়ে যাবার আদেশ দিয়ে ক্ষিতীশ উপরে গেল। দেখলে, তার বসবার ঘরটিতে হরেন একখানি চেয়ারে বসে' খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে অনর্গল কথা কয়ে যাচ্চে, সঙ্গে সঙ্গে হাসচে,—কমলা কিছু দূরে একখানি চৌড়া চক্‌চকে বেঞ্চিতে বসে' হরেনের মুখের দিকে চেয়ে তার গল্প শুনচে।

ক্ষিতীশকে দেখেই হরেন দাঁড়িয়ে উঠে সবিনয়ে বল্লে—এই যে, ক্ষিতীশবাবু যে!

আস্তাজ্ঞে হোক্। বসুন, বসুন। ওরে—

হরেনের ভাব-ভঙ্গী দেখে কমলা হেসে ফেল্লে। হরেন বল্লে—কম্‌লি, তুই হাসচিস কেন? ভাবচিস্ হরেন্‌দা এমন ব্যবহার করচেন, যেন ইনিই বাড়ীর মালিক, ক্ষিতীশ বাবু অভ্যাগত। তা, আমার কি জানিস্, আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু। অর্থাৎ সবাই যেন আমারই মতন ভূত।—বলে' সে হা-হা করে হাসতে লাগল।

ক্ষিতীশ অন্য একখানি চেয়ারে বসে, হাসতে চেষ্টা করে' জিজ্ঞাসা করলে—আপনাদের পরামর্শ কিছু স্থির হল?

হরেন বল্লে—কিসের পরামর্শ?

—এই, এঁর সম্বন্ধে। সকল কথা শুনেচেন ত? এখন এঁর কি করা উচিত......

হরেন বল্লে—আমি ত খুব ভাল পরামর্শই দিয়েছিলাম ওকে। তা, ও শোনে কৈ? আজকাল, কি জানেন ক্ষিতীশ বাবু, মেয়েরা সব হয়েচে স্বাধীন, ওরা এখন নিজের মতে চল্‌তে চায়।—বলে' হরেন মুখখানি বিষম গম্ভীর করে' বসে রইল

ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কমলার পানে চাইতেই সে বল্লে—না ক্ষিতীশ বাবু, শুনবেন না ওঁর কথা। আসল বিষয়ে কোনও পরামর্শই উনি আমাকে দেন নি। আমি যত জিজ্ঞাসা করি, হরেন্‌দা, কি হবে কি করব একটা কিছু ঠিক করুন, উনি ততই যত সব আজগুবি আজগুবি প্রস্তাব করেন। আপনার আসবার একটু আগেই উনি বলছিলেন, কম্‌লি, তুই আর দেশে গিয়ে কি করবি, বিলেত যা। রবি বাবুর বই পড়ে' পড়ে' সাহেবরা এখন খুব বাঙলা শিখে ফেলেচে—বিলেত গিয়ে, হিন্দুরমণীর উচ্চাদর্শ সম্বন্ধে বাঙলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়া।—এই রকম এই রকম সব কথা!—বলে' কমলা ঠোঁট দুখানি একটু ফুলিয়ে রইল।

শুনে ক্ষিতীশের গম্ভীর মুখেও একটু হাসি দেখা দিলে। হরেন বল্লে—মন্দ পরামর্শ দিয়েছি ক্ষিতীশ বাবু? আচ্ছা, এটা যদি কম্‌লির মনঃপূত না হয়, আরও প্ল্যান আমার মাথায় আছে ...

এই সময় চা আর তার উপকরণগুলি সে উপস্থিত হল। ক্ষিতীশ বল্লে—আসুন হরেন বাবু, একটু চা খেয়ে নিন, তার পর পরামর্শ হবে।—বলে' দুটি পেয়ালায় সে চা ঢাল্‌তে লাগ্‌ল।

হরেন জিজ্ঞাসা করলে—কম্‌লি, তুই চা খাবিনে?

ক্ষিতীশ বল্লে—উনি ত চা খান' না। বলেন, চা খেলে আমার মাথা ধরে।

হরেন কমলার দিকে চেয়ে বল্লে—চা খাস্‌নে? খাওয়া কিন্তু ভাল, যে ম্যালেরিয়ার দেশে থাকিস্! আচ্ছা, চা না খাস, দুটো রসগোল্লা খাবি আয়। আয়, হাঁ কর্, টুপ করে' মুখে ফেলে দিই। এস, লক্ষ্মী দিদি এস।

কমলা বল্লে—হরেন্‌দা যে কি বলেন তার ঠিক নেই! এখনও উনি আমাকে সেই ছোট্টটি মনে করেন!

হাসি গল্পের মধ্যে চা খাওয়া শেষ হল। তখন প্রায় ছ'টা—শীতকাল, অন্ধকার হয়ে এসেচে। ক্ষিতীশ এতক্ষণে বেশ বুঝতে পেরেচে যে হরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে' কমলা যে একটা কিছু ঠিক করে' নেবে,

তার আশা নেই, কারণ হরেন ওর সকল কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়। তাকেই সে কাজ করতে হবে। আর, পরামর্শটা কমলার অসাক্ষাতে হওয়াই ভাল। তাই সে প্রস্তাব করলে—চলুন হরেন বাবু, গড়ের মাঠে গিয়ে একটু বেড়ানো যাক্। সেইখানেই ভেবে চিন্তে একটা কিছু পরামর্শ স্থির করা যাবে।

হরেন বল্লে—ক'টা বেজেচে? ছ'টা প্রায়। আচ্ছা চলুন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ক্ষিতীশের মোটর গাড়ী আস্তাবল থেকে এসে, বাড়ীর সাম্নে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করে উঠল।

মনুমেন্টের কাছে পৌঁছে, গাড়ী রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রেখে, দুজনে মাঠে প্রবেশ করলে। কিছুদূর যেতেই, একটা গাছের তলায় একখানি খালি বেঞ্চি পাওয়া গেল। দুজনে তাতে বসে' কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলে।

ক্ষিতীশ বল্লে—হরেন বাবু, আপনি কমলার গ্রামের লোক। ওঁর বাপ-মাকেও জানেন, গ্রামের লোকদেরও জানেন। এই আট-দশ দিন নিরুদ্দেশ থাকার পর, আপনি যদি ওঁকে নিয়ে গিয়ে দেশে রেখে আসেন, তা হলে কি রকম হয় বলুন দেখি?

হরেন বল্লে—বড় সুবিধে হয় না। দেশের লোকে জিজ্ঞাসা করবে, এতদিন ও ছিল কোথায়? ওকেও জিজ্ঞাসা করবে, আমাকেও করবে। ওর বাবাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করবার সময় আপনি যা আশঙ্কা করেছিলেন, ঠিক তাই হবে।

ক্ষিতীশ বল্লে—তা হলে উপায় কি এখন? ওঁর স্বামীকে চিঠি লিখে এখানে আনানো যাবে?

হরেন প্রায় এক মিনিট কাল চুপ করে' থেকে বল্লে—তিনি এসে দেখ্বেন, তাঁর ষোল বছর বয়সের সুন্দরী স্ত্রী, রয়েচে একজন যুবাপুরুষের বাসায়, সেখানে আর কোনও মেয়েছেলে ত নেই-ই, তার কোনও পুরুষ আত্মীয়-অভিভাবকও নেই। এক আধ ঘণ্টা নয়—দশ বারো দিন......

ক্ষিতীশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—ঐটে বড্ড ভুল হয়ে গেচে।

—তা হয়েচে। প্রথমে যা ভেবেছিলেন, মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে যদি নিয়ে যেতেন, তা হলে আর এই সমস্যাটি উপস্থিত হ না।

—তখন ও কথাটা আমার মোটেই মাথায় আসেনি, হরেন বাবু। আমি ভাবলাম, ভদ্রঘরের মেয়েকে নেহাৎ হাসপাতালের ইন্‌ডোর পেশেণ্ট করে' দেওয়াটা, বিশেষ ঐ ছেলেমানুষ...

-সে ত নিশ্চয়। আপনি তখন যে দিক্ থেকে দেখেছিলেন, ঠিকই দেখেছিলেন। কিন্তু......সে যাক্, এখন আর অনুশোচনায় ফল কি?

কিছুক্ষণ ধরে দুজনে নানা রকম উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করলে, কিন্তু কোনটাই মনোমত হল না; একটা একটা করে' সবগুলোকেই বাতিল করে' দিতে হল।

তার পর কিছুক্ষণ দু'জনে নীরবে বসে' রইল।

শেষে হরেন বল্লে—দেখুন, আপনি আর আমি, দু'জনে পরামর্শ করে' এর কোনও কূলকিনারা পাব না। এই পরামর্শের মধ্যে একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে আনা আবশ্যক।

—কে সে তৃতীয় ব্যক্তি ?

—আমাদের মৈত্র মশায়—কমলার বাপ। বিশেষ জরুরী কাজ আছে বলে'—আর কিছু না বলে'—চিঠি লিখে তাঁকে আনাই। তিনি এলে, সব কথা তাঁকে খুলে' বলি। তিনি বাপ ত, নিজের সন্তানকে তিনি ত ভাল রকমই জানেন, তাঁর মেয়ে যে কোনও অন্যায় করেচে, এ সন্দেহ, আশা করি, তাঁর মনে কখনই হবে না। বাকী থাকে গ্রামের লোক —সমাজ। কি উপায় অবলম্বন করলে, তাদের নখ-দন্ত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারা যায়, সে পরামর্শ আমরা তাঁরই সঙ্গে করি আসুন।

ক্ষিতীশ কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে বল্লে—এ পরামর্শ মন্দ নয়, বিশেষ যখন এ ছাড়া অন্য কোনও পথ এখন নজরে আসচে না। কিন্তু আপনি তাঁর কাছে যতটা উদারতা আশা করচেন, সেটা কি বেশী হচ্চে না? মনে রাখবেন, তিনি সেকেলে লোক। ইংরেজিওয়ালা নন, চাণক্যশ্লোকওয়ালা। 'বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যো স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ' স্কুলের লোক। তার চেয়ে বরং কমলার স্বামীকে বিশ্বাস করানো সহজ হতে পারে যে……

হরেন বল্লে—কিন্তু আরও একটা দিক ভেবে দেখুন ক্ষিতীশ বাবু। সতীশ বাবু—অর্থাৎ কমলার স্বামী—তিনি দেখবেন প্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে, যার কাচ দুখানি খুব অল্পেই জেলসিতে ঘোলা হয়ে যেতে পারে। বাপ দেখবেন অপত্যস্নেহের চক্ষে—সে চোখ দুটি এমনি যে, খারাপ দিকটে ভাল নজরেই আসে না, ভাল দিকটে খুব উজ্জ্বল হয়েই দেখা দেয়।

ক্ষিতীশ বল্লে—এটা ঠিকই বলেছেন।

—আর, আপনি যা আশঙ্কা করচেন ক্ষিতীশবাবু, মৈত্রমশায় যদি তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে কোনও অন্যায় সন্দেহই করেন, সমাজের ভয়ে তাকে ঘরে না নিয়ে যেতে চান, তখন কমলার স্বামী ত আছেই—তাকে খবর দিয়ে আনানো যাবে।

—আচ্ছা, তবে সেই পরামর্শই ভাল। মৈত্র মশায়কে আপনি চিঠি লিখুন। তিনি যতদিন না আসচেন, ততদিন কমলা…… কোথায় থাক্‌বেন ?

—আপনার বাসাতেই, যেমন আছে, তেমনিই থাকুক।

শুনে, ক্ষিতীশ একটু স্বস্তিবোধ করলে। কথাটা জিজ্ঞাসা করবার সময় তার মনে একটু ভয়ই ছিল, হয়ত হরেন তার কোনও বন্ধুবান্ধবের পরিবারের মধ্যে কমলাকে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌বার প্রস্তাব করবে।

হরেন বল্লে—ক'টা বেজেছে দেখুন ত ক্ষিতীশ বাবু।

ক্ষিতীশ মুখের সিগারেটে জোরে দুই তিন টান দিয়ে, সেই আগুনের কাছে নিজের হাত-ঘড়িটি তুলে বল্লে—পৌনে আটটা।

—তবে এখন ওঠা যাক্, চলুন, ঐ পরামর্শই রইল।—বলে' হরেন দাঁড়িয়ে উঠল। ক্ষিতীশও উঠে, দুজনে আস্তে আস্তে রাস্তায় যেখানে মোট গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, সেই দিকে যেতে লাগ্‌ল।

কাছে আসতেই, শোফেয়ার নেমে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল। ক্ষিতীশ বল্লে—হরেন বাবু উঠুন।

হরেন বল্লে—না মাফ্ করবেন, আমায় এখন বাসায় যেতে হবে।

—কমলার সঙ্গে দেখা করে' যাবেন না? পরামর্শ যা হল, তাঁকে ত বলা উচিত।

—আপনিই বলবেন, ক্ষিতীশবাবু। আজ একটা বিয়ের নেমন্তন্ন আছে। বাসায় গিয়ে, কাপড় বদলে, সেখানে যেতে এমনিই দেরী হয়ে যাবে। আচ্ছা নমস্কার—বলে' হরেন ট্রামের চৌমাথার দিকে অগ্রসর হল।

ক্ষিতীশ বল্লে—আমার গাড়ীতেই আসুন না। আপনাকে আপনার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাই।

—আপনার ঘুর হবে না?

—হলই বা একটু ঘুর। আসুন।—বলে' ক্ষিতীশ হরেনের হাত ধরে' গাড়ীতে তাকে তুলে দিয়ে, আপনি উঠে বসল।

গাড়ীতে ক্ষিতীশ হরেনকে বল্লে—দেখুন, চিঠিখানা রেজিষ্ট্রি করে' দেবেন। কারণ সেটা পাড়াগাঁ। পিয়ন কার চিঠি কাকে দেয়, তার ঠিক কি? যতটা সম্ভব, ব্যাপারটা এখন গোপন রাখাই দরকার কি না।

—ঠিক বলেছেন। রেজিষ্ট্রি করেই পাঠাব।

—আর, খামের উপর, ফ্রম্-ট্রম্ কিছু লিখে দেবেন না। রাস্তায় পিয়নের হাত থেকে কে সে চিঠি নিয়ে দেখ্বে! মেয়ে-হারাণো মৈত্রী মশায়ের নামে, আমাদের জমিদার-পুত্র হরেনবাবু এক রেজিষ্ট্রি চিঠি লিখেছেন—পাড়াগাঁয়ের লোকেদের কল্পনা-শক্তিটে যে-রকম প্রবল, কি সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হয়ে তাই প্রচার করে বেড়াবে তার ঠিক কি? পাড়াগাঁয়ের লোককে ত চেনেন!

বলতে বলতে গাড়ী এসে বউবাজারে হরেনের বাসার সামনে দাঁড়াল। হরেন গাড়ী থেকে নেমে বল্লে—আচ্ছা, ও-সব কিছু লিখ্‌ব না। এখন আসি তা হলে—গুড্-নাইট্।

—গুড নাইট। চালাও।

মোটর গাড়ী গর্জ্জন করে' উঠল।

১০

গাড়ী গলির মোড় পার হয়ে বউবাজারের রাস্তায় এসে পড়ল। ক্ষিতীশের মনে হল—কৈ, হরেনকে ত কাল, কি পর্শু, কি মাঝে মাঝে, আমার বাসায় এসে কমলার খবর নিতে বল্লাম না। ভুল হয়ে গেছে—তা থাকৃগে। ও আপনিই আসবে'খন—অবসর পেলেই আসবে, বোধ হয়।

গাড়ী বড় রাস্তায় যখন এসেছে, ক্ষিতীশ তখন মনে মনে একটা হিসাব করতে আরম্ভ করেছে। আর ক'দিন? কাল হরেন কমলার বাপকে চিঠি লিখবে—একদিন। তিনি সে চিঠি পর্শু পাবেন—পর্শুই পাবেন কি? পাড়াগাঁয়ের পোষ্ট আপিস, দুই একদিন দেরী হলেও হতে পারে;—কিন্তু জায়গাটাও কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়। আচ্ছা, পর্শুই না হয় তিনি চিঠি পেলেন—দু'দিন। তার পর দিন, তিনি সেখান থেকে রওনা হলেন—কলকাতায় এসে পৌঁছলেন—তিন-দিন। তার পর দিন, কমলাকে নিয়ে তিনি—দেশেই হোক আর যেখানেই হোক —চলে গেলেন—চার দিন। সুতরাং, এই চার দিন মাত্র কমলাকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। তার পর? তার পর—আর কোনো দিন না, এ জীবনে না।—ক্ষিতীশের বুকটি কাঁপিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

পটলডাঙ্গায় নিজের বাসায় পৌঁছে, সিঁড়ি দিয়ে উপরে খানিক উঠেই ক্ষিতীশ দেখলে, তার বসবার ঘরে কমলা টেবিলের কাছে ঝুঁকে বসে একখানি বই হাতে করে পড়চে। সে সিঁড়ি উঠে বারান্দায় দাঁড়াল—কিন্তু কমলা এত নিবিষ্ট চিত্ত যে, ক্ষিতীশের পায়ের শব্দ তার কাণে গেল না। সমুখে বিদ্যুতের টেবিল-বাতিটি জ্বলছে, আর কমলার মুখে পড়ছে, বাতির উপরকার সবুজ শেডের ভিতর দিয়ে ছেঁকে বেরিয়ে আসা সেই মরকত প্রভাটুকু। সেই কোমল প্রভায়, কমলার মুখখানি বড় শীতল, বড় শান্ত, বড় স্নিগ্ধ দেখাচ্চে। ক্ষিতীশ মুগ্ধ হয়ে সেই মুখশোভা দেখতে লাগল। প্রায় আধ মিনিটকাল দেখে, একটি মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে মনে বল্লে—আর চার দিন।

ক্ষিতীশ ঘরের মধ্যে ঢুকতেই কমলা চম্‌কে উঠে, চোখ তুলে, বইখানি টেবিলের উপর ফেলে বল্লে—এসেচেন? হরেন দা কৈ?

এই প্রশ্নে—হরেনদার জন্যে এই আগ্রহে—ক্ষিতীশের মনটি একটু ব্যথিত হল, কিন্তু সে নিজেকে তখনই সামলে নিয়ে বল্লে—তিনি এলেন না। বল্লেন, কোথায় তাঁর নেমন্তন্ন আছে।—বলতে বলতে টেবিলের এধারের একখানি চেয়ার টেনে সে বস্‌ল।

কমলা মুখখানি নীচু করে কি ভাবতে লাগ্‌ল। শেষে বল্লে—আপনাদের পরামর্শ কিছু ঠিক হল?

—হ্যাঁ, হয়েছে একটা।

পরামর্শ যা হয়েছিল, ক্ষিতীশ সংক্ষেপে তা কমলাকে জানালে।

শুনে কমলা বল্লে—হ্যাঁ, সেই বোধ হয় বেশ হবে। বাবা আসুন—তিনি এলে আর কোনও ভাবনা নেই।

—তিনি রাগ টাগ করবেন না ত?

—রাগ করবেন? আপনাকে তিনি কত আশীর্বাদ করবেন। আপনি না থাকলে, তাঁর মেয়ে কি এতদিন বাঁচত? মরে যেত। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনার উপর তিনি রাগ করবেন? কখনই না।

একটু আগে ক্ষিতীশের মনের সে দুঃখটুকু এই কথাগুলি শুনে ধুয়ে মুছে গেল। কমলার বাপ মার কথা, তার ছোট ভাইটির কথায় দুজনের গল্প বেশ জমে উঠল। গ্রামের লোকের কথার প্রসঙ্গে কমলা বল্লে—চিঠিখানি ভালয় ভালয় এখন বাবার হাতে পৌঁছলে বাঁচি।

ক্ষিতীশ বল্লে—সে কথা আমরা আগেই ভেবেছি। হরেনকে বলেছি, চিঠিখানি রেজিষ্ট্রি করে পাঠাতে।

—রেজিষ্ট্রি চিঠি? কিন্তু কাল ত রবিবার। রবিবারে কি এখানে রেজিষ্ট্রি চিঠি পাঠানো যায়? আমাদের গ্রামের পোষ্ট আপিসে ত নেয় না।

ক্ষিতীশ বল্লে—ঠিক ত। কাল যে রবিবার তা আমাদের কারু খেয়ালই হয় নি। না, কাল রেজিষ্ট্রি চিঠি পাঠানো যাবে না। যাক্—আরও একটা দিন তবু পাওয়া গেল।

শেষের কথাটা বলে ফেলেই ক্ষিতীশের মনে হল—যাঃ, এ কি করলাম? তার মনটি ভারি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

কমলা এক দৃষ্টে ক্ষিতীশের মুখের পানে

চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলে—একটা দিন কি পাওয়া গেল?

ক্ষিতীশের মাথাটার ভিতরে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। সে বল্লে—একটা দিন? ওঃ—এই—ইয়ে—অর্থাৎ পরামর্শ টরামর্শ করবার জন্যে আরও একটা দিন—

ওঃ—বলে' কমলা একটু যেন সন্দেহের চোখে চেয়ে রইল। ক্ষিতীশ হঠাৎ উঠে বল্লে—উঃ, রাত্রি প্রায় ন'টা বাজে, রোগা মানুষ, আপনার এখনও খাওয়া হল না! রান্নার কি দেরী, দেখি।—বলে' চটপট্ সে নীচে নেমে গেল।

কমলা টেবিলের উপর কুনুই রেখে, গালে হাতটি দিয়ে বসে ভাবতে লাগ্‌ল।

একটু পরে ঝি এল, পাশের ঘরে কমলার জন্যে ঠাঁই করে দিলে। বামুন থালায় করে খাবার বেড়ে নিয়ে এসে সেই ঘরে ঢুকলো। ক্ষিতীশ এসে বল্লে—আপনার খাবার দিয়েচে, যান, খেয়ে নিন—খেয়ে শুয়ে পড়ুন গে।

খাবার ঘরের ও-পাশের ঘরখানিতে কমলার বিছানা। ঝিও সেই ঘরে শোয়। এ কদিন রাত্রে খাবার পরে, কমলা একেবারে সেই ঘরে গিয়ে ঢোকে, এ দিকটায় আর আসে না, ক্ষিতীশের সঙ্গে আর দেখা হয় না।

ক্ষিতীশ বল্লে—খাবার দিয়েচে, যান।

—যাচ্চি।—বলে' কমলা মুখখানি নীচু করে রইল। ঝি এসে বল্লে—দিদিমণি আসুন।

—চল ঝি, যাচ্চি এখনি।

ঝি চলে গেল। কমলা বল্লে—আপনি কখন্ খাবেন? আপনি কেন আগে খেয়ে নিন না।

—আমার খেতে এখনও দেরী আছে। এই ত সবে ৯টা। আপনি রোগা মানুষ, আপনি দেরী করবেন না। যান, লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে।

—যাই।

কমলা মুখে বল্লে যাই, কিন্তু উঠল না। মুখখানি নীচু করে' কি ভাবতে লাগ্‌ল। তার পর হঠাৎ মুখ তুলে বল্লে—আপনি—একটি—অধিকার আমায় দেবেন?

—কি, বলুন।

—আজ থেকে, আমি আপনাকে দাদা বলব। আপনি মনে করতে পারেন, এত দিনের পর হঠাৎ এর এ খেয়াল কেন? তা বলি। আপনি যখন আমার হিরেন দার বন্ধু হলেন, তখন আমারও দাদা হলেন। হলেন কি না?

ক্ষিতীশ একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে—হলাম বোধ হয়।

কমলা বল্লে—তবু 'বোধ হয়'? কেন, আপনার ত কোনও বোন নেই; মানুষের একটা বোন থাকা উচিত ত।

—তা উচিত বোধ হয়।

—সব কথাতেই আপনার 'বোধ হয়'!—আচ্ছা, এখন থেকে আমিই আপনার সে বোন্ হলাম। ঠিক ত?

—ঠিক।

—আচ্ছা বেশ। আর একটা কথা। আমি যখন আপনার ছোট বোনটি হলাম, আপনি আমায় আর 'আপনি' বলে কথা কবেন না।

—বেশ, তাই হবে। যাও, এখন যাও খেতে বস।

—যাই দাদা।—বলে' কমলা উঠে গেল।

মাঝের দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে, ক্ষিতীশ চেয়ারে বসে' গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল।

১১

তিন দিন পরে, রাত্রি দশটার সময় ক্ষিতীশ বউবাজারে হরেনের বাসায় গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—মৈত্র মহাশয়ের খবর কি? তিনি এসেছেন?

—না।

—চিঠিখানা ঠিক পাঠানো হয়েছিল ত?

—হাঁ, হয়েছিল বৈকি। কিন্তু তার পরদিন ছিল রবিবার—সেদিন হল না। কাল সোমবারে চিঠি রেজিষ্ট্রি করে পাঠিয়েছি।

—এখান থেকে চিঠি লিখলে আপনাদের গ্রামে কবে পৌছয়?

—আজ লিখলে কাল পৌছয়।

—তা হলে, আজ তিনি সে চিঠি পেয়েচেন। গাড়ী কখন? আসবার সময় কি তাঁর হয় নি এখনও?

—বেলা দশটার সময় আমাদের গ্রামে চিঠি বিলি হয়। চিঠি পেয়েই যদি তিনি রওয়ানা হতেন, এতক্ষণ এসে পৌছতেন বৈকি!

—কাল আসতে পারেন।

—হয়ত গ্রামান্তরে কোথাও গেচেন, বাড়ী নেই। বাড়ী এলে চিঠি পাবেন। দুই একদিন দেরীও হতে পারে। কমলা কেমন আছে?

—ভালই আছেন। আপনি ত কৈ আর তাঁকে দেখতে টেখতে আসেন না!

—সময় পাইনি ক্ষিতীশ বাবু। কাল কি পশু' বিকেলের দিকে একবার যাব এখন। আপনি বাড়ী থাকবেন ত?

—হ্যাঁ, থাকব বৈকি। আসবেন তা হলে। এখন তবে উঠি—নমস্কার!

দু'দিন পরে হরেন্দ্র ক্ষিতীশের বাসায় এসেছিল, কিন্তু মৈত্র-মশায়ের কোনও সংবাদই দিতে পারেনি। দিনের পর দিন কাটতে লাগল, সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, কিন্তু তবু কোনো সংবাদ নেই। কমলার আড়ালে, ক্ষিতীশ হরেন দুজনে বসে' এ বিষয়ে নানা রকম জল্পনা কল্পনা করে, কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারে না। চিঠি রেজিষ্ট্রি হয়েছে বলেই যে সে অমর, তা ত নয়—সেও ত মারা যেতে পারে। পূর্ব্বের চিঠিখানি ডাকে মারা গেছে অনুমান করে', হরেন ঠিক সেই রকম আর একখানি চিঠি লিখে রেজিষ্ট্রি করে' পাঠালে।

দেখতে দেখতে প্রথম চিঠি লেখবার পর তিনটি সপ্তাহ কেটে গেল, তবু কোনও সংবাদ নেই।

কি করা এখন উচিত, রোজই এ বিষয়ে জল্পনা হয়—কিন্তু কিছুই স্থির হয় না। এক মাসের উপর কমলা এখানে রয়েছে। সে এখন কান্নাকাটি আরম্ভ করেছে। ক্ষিতীশ যথাসাধ্য তাকে সান্ত্বনা দেয়। হরেনও মাঝে মাঝে এসে তাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে। কমলা বলে, আমার বাবা বোধ হয় বেঁচে নেই, থাকলে তিনি নিশ্চয়ই আসতেন, অন্ততঃ চিঠির উত্তরও আসত।

প্রথম চিঠিখানি লেখবার ঠিক একটি মাস পরে, বেলা তিনটের সময় হরেন ছুটতে ছুটতে ক্ষিতীশের বাসায় এসে তার হাতে একখানি সরকারী লম্বা লেফাফা দিয়ে বল্লে—ওহে, এই দেখ।

এই মাসে দুজনে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে, 'আপনি' 'মশাই' উঠে গেছে।

ক্ষিতীশ দেখলে, সেখানি ডেড্ লেটার্স আফিস থেকে এসেচে। ভিতরে হরেনের সেই প্রথম লেখা চিঠিখানি। তার পিঠে স্থানীয় পিয়ন মশায় স্বহস্তে লিখেছেন—

মালিক কলিকাতায় গমোন করিয়াছে মতে ডিপোজিট।

নীচে একটা তারিখ লেখা আছে। তার নীচে, আর এক সপ্তাহ পরে তারিখ দিয়ে উক্ত পিয়ন মশায়ের দ্বিতীয় মন্তব্য—

মালিক এখনো কলিকাতা হইতে আসে নাই কবে আসিবে কেহ বলিতে পারে না মতে ফিরৎ।

সেদিন হরেন সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত ক্ষিতি-শের বাসায় রইল। কমলার সঙ্গে তার এই পরামর্শ স্থির হল যে, এখন তাকে লক্ষ্ণৌয়ে তার স্বামীর কাছে নিয়ে যাওয়াই উচিত।

ক্ষিতীশ বল্লে—তবে তাই নিয়ে যান। সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলে', ওকে রেখে আসুন।

হরেন বল্লে—কিন্তু আমি একলা গেলে ত চল্‌বেনা ভাই, তোমাকে শুদ্ধ যেতে হবে। কি অবস্থায় কমলাকে তুমি কুড়িয়ে পেয়েছিলে, কি কারণে এই দীর্ঘকাল এখানে থাকতে ওকে বাধ্য হতে হল, এ সমস্ত কথা তোমার মুখেই সতীশ বাবুর শোনা উচিত। ব্যাপারটি যে রকম সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে সাক্ষী প্রমাণ ভাল রকম করে' দেওয়াই দরকার।

ক্ষিতীশ রাজি হল, কিন্তু বল্লে—এখন ত আমার কলেজ কামাই করলে চল্‌বে না ভাই! একেই আমার পার্সেণ্টেজ শর্ট পড়ে গেছে। সাম্‌নের সপ্তাহে শুক্র শনি দু'দিন ঈদের ছুটি রয়েছে, রবিবারটাও পাওয়া যাচ্চে, সেই সময় ঠিক হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মেলে রওনা হয়ে, শুক্রবার সেখানে পৌঁছে, রবিবার সেখান থেকে ছেড়ে, সোমবারে এসে আবার কলেজে হাজ্‌রে দিতে পারব।

সেই পরামর্শই রইল। সতীশ বাবুকে আগে থেকে চিঠি লিখে কিছু না জানানোই স্থির হল

যাত্রার দিনে বিকেলে ঝি যখন কমলার চুল বেঁধে দিচ্ছিল, তখন তার চোখ দুটি দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগ্‌ল। ঝি বল্লে—কেন দিদিমণি, কাঁদচ কেন?

কমলা বল্লে—যাচ্চি ত ঝি! কিন্তু কপালে কি যে আছে তা ত জানিনে!

ঝি বল্লে—কপালে কি আবার থাকবে? এমন সতী লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, তোমার কপালে ভালই আছে।

বম্বে মেলে, যে গাড়ীখানি মোগলসরাইয়ে কেটে নিয়ে আউধ রোহিলখণ্ড রেলের ডাক গাড়ীতে জুড়ে দেয়, অর্থাৎ মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদলাবার জন্যে নামতে হয় না, সেই গাড়ীতে ক্ষিতীশ একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করে' রেখেচে। সন্ধ্যার পর, ক্ষিতীশ কমলাকে নিয়ে বউবাজারে হরেনের বাসায় গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে ষ্টেশনে যাবে।

সকালে সকালে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে, দুজনে যখন বেরুবার উদ্যোগ করছিল, তখন হঠাৎ ক্ষিতীশ কলিকাতাবাসী তার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলে। বিশেষ প্রয়োজনে, অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্যে তিনি ক্ষিতীশকে দেখা করতে বলেছেন।

তাই ত! ঘড়ি খুলে ক্ষিতীশ দেখলে, সেই যোড়াসাঁকোয় গিয়ে আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা করে' ফিরে এসে রওয়ানা হ'তে হলে দেরী হয়ে যাবে, ট্রেণ ধরা যাবে না। তখনই তার

মাথায় এক বুদ্ধি এল। চাকরকে বলে দিলে—বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়া, একটা ট্যাক্সি ধর।

পাঁচ মিনিট পরে চাকর এসে খবর দিলে—ট্যাক্সি এসেচে হুজুর।

ক্ষিতীশ কমলাকে নিয়ে নীচে নামল। তার নিজের মোটর গাড়ী, আর এক ট্যাক্সি, দুখানিই দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। কমলাকে নিজের গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে শোফেয়ারকে বল্লে—এঁকে বউবাজারে হরেন বাবুর বাসায় নিয়ে যাও। হরেন বাবুকে তুলে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে যাবে। আমি একটা কাজ সেরে, এই ট্যাক্সিতে হাওড়ায় গিয়ে ঠিক সময়ে পৌছব।

ক্ষিতীশের গাড়ী, কমলাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ট্যাক্সি যোড়াসাঁকোর দিকে ছুটল।

যোড়াসাঁকোর কাজটুকু সেরে, ক্ষিতীশ ট্যাক্সিতে ফিরে এসে বল্লে—জোরসে হাঁকাও।

বম্বে মেল ছাড়বার আর পনেরো মিনিট তখন আছে। ট্যাক্সি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল।

হাওড়া পুলের কাছাকাছি এসে, একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়াটে গাড়ীর সঙ্গে ক্ষিতীশের ট্যাক্সির ধাক্কা লেগে গেল। ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়া দুটো হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গাড়ীর ভিতর থেকে দুজন প্রবীণ বয়সী ভদ্রলোক নেমে রাস্তায় দাঁড়ালেন। দুই গাড়োয়ানে মহা গালাগালি। লোক জমে গেল। পুলিস এসে ঝগড়া থামিয়ে দুই গাড়ীরই নম্বর টুকে নিলে। ক্ষিতীশের নাম ঠিকানা লিখে নিলে। ভাড়াটে গাড়ীর আরোহী দুজনের মধ্যে যাঁর গায়ে দামী শাল ছিল, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার নাম ঠিকানা?

—আমার নাম শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র। বাড়ী কালীগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা।

'কালীগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা'—শুনেই ক্ষিতীশ বুঝলে যে ইনি কমলার গ্রামের লোক। হরেনের বাপের নাম যে যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, তা সে কোনও দিন শোনে নি। আর, এটাও সে জানতে পারলে না যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কমলারই বাপ—হরনাথ মৈত্র, দুজনে এখনি ট্রেণ থেকে নেমে হরেনের বাসার দিকে চলেছেন।

ইতিমধ্যে লোক-জনে ধরাধরি করে' ঘোড়া দুটোকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। গাড়ী দুখানি নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হল।

ট্রেণ ছাড়তে তিন মিনিট মাত্র বাকী থাকতে ক্ষিতীশ প্ল্যাটফর্মে পৌছল। হরেন গাড়ী থেকে গলা বের করে' ফটকের পানে চেয়ে ছিল। ক্ষিতীশ এসে পৌছতেই বল্লে—তবু ভাল, আমি ভাবছিলাম এসে বুঝি জুটতে পারলে না!

ক্ষিতীশ বল্লে—ওঃ, হাঙ্গাম কি কম হে! রাস্তায় আসতে আসতে এক ভাড়াটে গাড়ীর সঙ্গে হয়ে গেল কলিসন!

—কি রকম?

ব্যাপারটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে' ক্ষিতীশ বল্লে—আরও মজা শোন, সে গাড়ীতে যে লোকটি ছিল, সে আবার তোমাদের দেশের লোক! বাড়ী বল্লে—কালীগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা।

কমলা বলে উঠল—কালীগ্রামের লোক? কে ক্ষিতীশদা?

ক্ষিতীশ বল্লে—তার নামটি কি ভাল, ভুলে যাচ্ছি। হ্যাঁ—যতীন্দ্রনাথ বোধ হয়। হ্যাঁ ঠিক—যতীন্দ্রনাথ মিত্র।

কমলা ভেবে চিন্তে বল্লে—যতীন্দ্রনাথ মিত্র কে আবার আমার গ্রামে? কে, মনে ত পড়চে না। কত লোক আছে গ্রামে, সবাইকে কি চিনি!

হরেনও যতীন্দ্রনাথ মিত্র বলে' কাউকে মনে করতে পারলে না।

গার্ড সাহেব হুইস্‌ল দিয়ে সবুজ বাতি দুলিয়ে দিলে। বম্বে মেল চলতে আরম্ভ করলে।

ওদিকে যোগেন মিত্র, কমলার বাপকে সঙ্গে করে বউবাজারের হরেনের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়ে বিদায় করে', উভয়ে মেসের মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন—হরেন বাবুর ঘর কোথা?

একজন দেখিয়ে দিলে—ঐ তেতলায় পুব-দক্ষিণ কোণের ঘর।

দুজনে তেতালায় উঠে, পুব-দক্ষিণ কোণের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লেন, হরেনের নিজস্ব খানসামা গোপবংশাবতংস ক্ষুদিরাম ঘোষ মেঝের উপর বসে খেলো হুঁকো হাতে করে' তার মাথায় কলকেটিতে একমনে ফুঁ দিচ্চে।

ক্ষুদিরাম নিজের জমিদার বাবুকে এই রকমে হঠাৎ সশরীরে উপস্থিত দেখে ধড়মড় করে' দাঁড়িয়ে উঠল। হুঁকাটা সরিয়ে ফেলে জমিদার বাবুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

যোগেন বাবু বল্লেন—কি রে ক্ষুদিরাম, কেমন আছিস তোরা?

—আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে, ভালই আছি হুজুর।

—হরেন বাবু কোথা?

—আজ্ঞে, তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেলেন।

—কবে?

—আজ্ঞে আজই—এই আধ ঘণ্টা হল। বোম্বাই মেলে রওনা হলেন।

—ফিরবেন কবে?

—আজ্ঞে, সোমবারে ফিরবেন বলে গেছেন।

—একলাই গেছেন? না সঙ্গে কেউ গেছে?

—আজ্ঞে, সঙ্গে ত আর কাউকে দেখলাম না, কেবল—

ক্ষুদিরাম কথাটা বলতে ইতস্ততঃ করতে লাগল। সম্প্রতি তার গ্রামের একজন গোয়ালা কলকাতায় এসেছিল, তার কাছে ক্ষুদিরাম একটা গুজবের কথা শুনেছিল।

যোগেন মিত্র চীৎকার করে' উঠলেন—কেবল কি? ঠিক করে' সব কথা বল্ হারামজাদা, নইলে জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেবো।

ক্ষুদিরাম যোড়হাতে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে—আজ্ঞে তিনি যাবার আগে দরজায় একখানা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ীর শব্দ শুনেই বাবু বল্লেন চল্। আমি তাঁর ব্যাগ ছাতা ছড়ি নিয়ে পিছু পিছু গেলাম। বাবু গাড়ীর কাছে গিয়ে বল্লেন—কমলা তুমি একলা যে। গাড়ীর মধ্যে চেয়ে দেখি, এই দাদাঠাকুরের মেয়ে, কমলা দিদিমণি গাড়ীতে বসে রয়েছেন। দিদিমণি কি করে' এখানে এলেন তাও কিছু বুঝতে পারলাম না। বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌বারও সময় পেলাম না,—বাবু গাড়ীতে উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিলে।

হরনাথ মৈত্র "হা জগদীশ্বর!" বলে, ধপ্ করে' অন্য একখানি চেয়ারের উপর বসে পড়লেন।

যোগেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কমলা দিদিমণিকে আর কোনও দিন কলকাতায় দেখেছিলি?

ক্ষুদিরাম যোড়হাতে বল্লে—আজ্ঞে না হুজুর। আর কোনো দিন দেখি নি। এই প্রথম। এ-কথা হুজুরের পা ছুঁয়ে বলতে পারি।—বলেই ক্ষুদিরাম যোগেনবাবুর পায়ে হাত দিলে।

—কোন গাড়ীতে গেছে বল্লি? বোম্বাই মেলে?

—হুঁজুর।

একটা দীর্ঘ "হুঁ" বলে যোগেন মিত্রও একখানা চেয়ারে বসলেন। ব্যাগ থেকে টাইম টেবেল বের করে, চশমাটি চোখে দিয়ে বল্লেন—দেওয়াল থেকে ঐ আলোটা নামা দেখি।

ক্ষুদিরাম আলো নামিয়ে ধরলো। যোগেন বাবু টাইম টেবেল পরীক্ষা করে' বল্লেন—বম্বে মেল, হাওড়া ছাড়ে, ৯টা ৩৫ মিনিট, ক্যালকাটা টাইম। এখন ৯টা ৪৫—দশ মিনিট হল গাড়ী ছেড়ে গেছে।

ক্রমশঃ *

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ব্যথার স্মৃতি

প্রতি নিশিদিন ফিরি উদাসীন সঙ্গী-বিহীন প্রবাসে;
লোকে ভালবাসে, কত খেলে হাসে; দিন যায়-আসে হতাশে।
মনে পড়ে যায় দুধে-আল্‌তায় রেখে দুটি পায় সেই যে—
অবনীর সার তনু সুকুমার নেই সে আমার নেই যে!
উড়ে আসে খালি শ্মশানের কালি চিতাধুম বালি পবনে,
যত কিছু আলো ক'রে দেয় কালো, লাগেনাকো ভালো জীবনে!
এ কি অবসাদ! যত সুখ-সাধ লাগে বিস্বাদ যেন গো,
আর পাপিয়ায় দখিনে হাওয়ায় তনু না কাঁপায় কেন গো!

জীবনের মত বসন্ত গত;—কাঙালের মত সরিয়া
প'ড়ে পথ-পাশে মিশে থাকি ঘাসে, চোখ জলে আসে ভরিয়া।
চুড়িওলা হাঁকে; জানালার ফাঁকে কতজনা ডাকে—'এ বাড়ী!'
আধ-ঘোম্‌টায় মুখ দেখা যায়, মন চমকায় কি-বারই!

ভাদ্র সংখ্যার লেখক—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাসন্তী-রং কাঁচের বাসন [illegible]-রকম কত কি—
পথে হেঁকে-হেঁকে যায় ডেকে-ডেকে কে তাদের দেখে নিরখি ?
ভেল্‌ভেট-পাড় জরি বুটিদার পড়েনাকো আর নয়নে ;
ফিরি আর কৈ পছন্দসই এটা-ওটা ঐ চয়নে !

চিঠি-বিলি-করা ডাক-হরকরা চলে যায় সরাসর ঐ ;—
উদ্বেগ-মাখা পথ-চেয়ে-থাকা বুকে-ক'রে-রাখা চিঠি কৈ ?
মরণের পর নেই ডাকঘর, নইলে খবর নিত সে ;
এটি-উটি-সেটি লিখে চার-পিঠই একখানা চিঠি দিত সে ;—
সেই এক সুর—আমি নিষ্ঠুর, বিদেশী বঁধুর লাগিয়া,
তার মত কৈ ভেবে সারা হই, নিশিদিন রই জাগিয়া ?
এ কি জাল-বোনা হায় কল্পনা ! মনে আল্‌পনা আঁকা গো ;
মরি কত ছলে স্মৃতি-শতদলে ধুয়ে আঁখিজলে রাখা গো !

সাগরে সলিলে আকাশে অনিলে বিশ্বনিখিলে দেওয়ালী ;—
চম্‌কায় দিল আলো রঙ্গীল—সবুজ সুনীল সোনালী !
ছোটে তর্‌-তর্‌ হাসি-নির্ঝর—মণি-মুক্তার ঝরণা
টুটি আবরণ—রেশমী বাঁধন আস্‌মানি-রং ওড়না।
হেনা-চামেলির মিঠে সুরভির মদিরে সমীর মত্ত
আনন্দ-গান ভ'রে তোলে প্রাণ নাচে আন্‌চান্‌ রক্ত।
এত আলো-গান হাসি অফুরান সবই ম্রিয়মাণ লাগে যে—
কুটির আঁধার, নিবিড় ব্যথার স্মৃতি শুধু তার জাগে যে !

তাই নিশিদিন ফিরি উদাসীন উৎসাহহীন আলসে,
ফেলি আঁখি-লোর, কোথা মনোচোর,—নয়নের মোর আলো সে ?
সেই একদিন প্রথম-নবীন স্বপ্ন-বিলীন শ্রাবণে—
লোপ সৃষ্টির শুভদৃষ্টির সুধাবৃষ্টির প্লাবনে !
আর-একদিন বিদায়-মলিন চেতনা-বিহীন চক্ষে,
হইল ধরণী পাণ্ডুবরণী হানিল অশনি বক্ষে !—
বকুলের বনে পবনে-পবনে এই-সব মনে পড়ে গো,
যে ছিল সে নাই, হ'য়ে গেছে ছাই, জলে আঁখি তাই ভরে গো

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

চয়ন

পুরাণো মিশরে নূতন আবিষ্কার

বৃষ্টিহীন ঋতু এবং বালুকারাশির শুষ্কতা, এই দুটি কারণের জন্ম প্রাচীন মিশরের শিল্পকীর্তিগুলি আজ-পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে। আজও খনকের কোদালের মুখে মিশরের প্রাচীন সভ্যতার নানান নিদর্শন প্রায়ই আবিষ্কৃত হইতেছে।

অতীতে মানুষ কোথায় কি ভুল করিয়াছে, কোথায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং এক-একটা বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা কি ভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহারই সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া একালের মানুষ তাহার জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া তুলিতে পারে। অতীতের শিক্ষার উপরেই বর্ত্তমান সভ্যতার ভিত্তি।

প্রাচীন মিশরের সমস্ত ব্যাপারের খুটিনাটি লইয়া আলোচনা করিবার সুযোগ এ যুগে নাই বটে, কিন্তু তাহার সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের বহিঃ-রেখাগুলি আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। এই মিশর পূর্ব্বে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এ কথা আমরা জানিতে পারি যে, কিরূপে "অষ্টাদশ বংশে"র রাজত্বকালে মিশরের সেই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে একতাবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পরে কিরূপে তৃতীয় টুথ্‌মোসিসের অধীনে সেই একতা-বন্ধন দৃঢ়ীকৃত হইয়া প্রাচীন মিশরকে একটি শক্তিবান সাম্রাজ্যে পরিণত করে (১৭০০ খৃঃ-পূঃ হইতে ১৪৫০ খৃঃ-পূর্ব্বের মধ্যে)।

তৃতীয় টুথ্‌মোসিস

সম্রাট টুথ্‌মোসিস্ অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সিরিয়া প্রদেশ যুদ্ধে

হারিয়া তাঁহার পদনত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বারা গঠিত বিপুল সাম্রাজ্য আড়াইশো হইতে তিনশো বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় অটুট ছিল। প্রাচীন সভ্যতার সেই যুগের অনেক ছবি এখন এ যুগের নখদর্পণে। টুথ্‌মোসিসের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত মিশর-সাম্রাজ্যের পতন হয় খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে। তৃতীয় রামেসিস্‌ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

মিশরের আর-একজন সম্রাট সভ্যতার ইতিহাসে আপনার নামকে বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম তৃতীয় আমেন-হোটেপ। টুথ্‌মোসিসের ঠিক পরেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। লুক্সরের বিখ্যাত মন্দিরের অধিকাংশই তাঁহার নির্ম্মিত। থিব্‌স্‌ নামক স্থানে যে দুটি অতিকায় প্রতিমূর্ত্তি এখন ভ্রমণকারীর বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে দুটিও তাঁহারই কীর্ত্তি।

আমেনহোটেপের অধীনে প্রাচীন মিশর শক্তি, সভ্যতা ও বিলাসিতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। মিশর-সাম্রাজ্য তখন সুডান প্রদেশ হইতে য়ুফ্রেটিস পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুদূর বাবিলনের সঙ্গেও তখন তাহার রাজনৈতিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং য়ুরোপের নানাপ্রদেশেই সে তাহার বাণিজ্য-সম্ভার প্রেরণ করিত।

লুক্সরের মন্দির

দেশের ভিতরে শান্তি থাকিলে সে শান্তি ক্রমে দুর্ব্বলতাকে ডাকিয়া আনে। প্রাচীন মিশরে এই দুর্ব্বলতা ধর্ম্ম-তন্ত্রের আকারে প্রকাশিত হয়।

মিশরের ফারোয়ারা দেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার উন্নতিবিধানের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমেন-হোটেপ ও দ্বিতীয় রামেসিস এজন্য বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। সম্প্রতি একটি অপূর্ব্ব প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ প্রফেসর নেভিলের যত্নে ও চেষ্টায় ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। পাহাড় কাটিয়া মিশরীরা যে-সকল মন্দির ও সমাধিগৃহ নির্ম্মাণ

দ্বিতীয় রামেসিসের মমি

দ্বিতীয় রামেসিসের মমির মুখ

করিয়াছিল, তাহা এখন সকলেরই পরিচিত। কিন্তু এরূপ ভূমধ্যস্থ ছাদ-সমেত প্রাসাদ এই প্রথম মিশরে আবিষ্কৃত হইল। পণ্ডিতদের মতে এই-প্রাসাদটি পিরামিড-যুগের। যদিও প্রাসাদটির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য এখন আর বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু সুবিস্তৃত স্তম্ভশোভিত গৃহমালা এবং ভিত্তিগাত্রে ক্ষোদিত চিত্রগুলি দেখিলে আজ এতদিন পরেও তাহার অতীত শ্রী অনেকটা কল্পনা করা যায়।

পিরামিড-যুগেই (৭০০—৪০০০ খৃঃ-পূঃ) মিশরের কলা-সৌন্দর্য্য সর্ব্বদিকে উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। খুফু এবং খাপরার রাজত্বকালে মিশরের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে যে শ্রী ও সত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগের শিল্পে তাহা আর দেখা যায় না। ক্রমোন্নতি প্রাকৃতিক বিধান হইলেও মিশরে সে বিধান খাটে নাই।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনুসন্ধান শেষ হইতে এখনো বাকি আছে। এখনো এমন অনেক

দ্বিতীয় রামেসিসের দ্বারা নির্ম্মিত আবুর মন্দির

ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে, যাহা দেখিয়া ছয় সাত হাজার বছরের প্রাচীন—অথচ অপূর্ব্ব-উন্নত মিশরীয় সভ্যতার বহু অজানা কথা জানা যাইতেছে। সুতরাং মিশরীয় সভ্যতা-সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার সময় এখনো আসে নাই।

আলোক-চিত্রে নব-ধারা

এটা খুব ঠিক যে, ফোটোগ্রাফ কখনো অঙ্কিত চিত্রের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। কিন্তু আধুনিক আলোক-চিত্রকর যে গত যুগের চেয়ে আসল সৌন্দর্য্যের দিকে অধিক অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ক্যামেরার সর্ব্বপ্রধান গুণ, সত্যকে সে অবিকৃত ভাবে ধরিতে পারে। কিন্তু ছবি তোলাইবার সময়ে আদর্শের যে ভাব থাকে, সেই ক্ষণিক ভাব ছাড়া সে অতিরিক্ত আর-কিছু দেখাইতে পারে না। অঙ্কিত চিত্রে ফোটে স্থায়ী ভাব আর আলোকচিত্রে থাকে অস্থায়ী ভাব।

কিন্তু আধুনিক আলোক-চিত্রকররা আপনাদের ইচ্ছামত ভাবে ছায়ালোক-সন্নিবেশ দ্বারা ফোটোগ্রাফের কঠোর বাস্তবতাকে অনেকটা কোমল ও কবিত্বপূর্ণ করিয়া আনিয়াছেন। ক্যামেরার 'লেন্স' যদি যথাযথ

আলোক-চিত্র নং

ভাবে নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হয়, তবে আলোকচিত্রকে অনায়াসেই অনেকটা অঙ্কিত চিত্রের মত করিয়া তোলা যায়।

তবে এ-শ্রেণীর আলোক-চিত্রে যাঁহারা আদর্শ হন, তাঁহাদিগেরও বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক। সাধারণত যাঁহারা আদর্শ-রূপে ক্যামেরার সুমুখে গিয়া বসেন, তাঁহারা ছবি তোলাইবার জন্যই ছবি তোলান এবং ছবি যদি বাস্তব হয়, তাহাহইলেই তুষ্ট হইয়া যান। কিন্তু তাঁহাদের সেই আড়ষ্ট ও সচেতন ভাব যে স্বাভাবিক নয় এবং বাস্তবের মধ্যে তাহা

আলোক-চিত্র নং ২

অবাস্তবকেই যে স্পষ্ট করিয়া দেখায়, এটা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। শিক্ষিত আদর্শের মধ্যে এই আড়ষ্টতা ও সচেতনতা থাকে না।

সত্যবাদী বলিয়া পরিচিত আলোকচিত্রও যে উপভোগ্য মিথ্যা বলিতে পারে, একালে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা এখানে যে ছবিগুলি দিলাম, তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবিখানির "ক্ষেত্রপৃষ্ঠ" (Back-ground) একেবারে কৃত্রিম। এই "সমুদ্র-স্নান" ও "জলবালা"র ছবিখানি আলোকচিত্রকরের ঘরের মধ্যেই কৃত্রিম দৃশ্যের সাহায্যে তোলা হইয়াছে। অথচ বলিয়া না দিলে এ গুপ্তকথাটা সুধু চোখে দেখিয়া ধরা অসম্ভব!

আলোক-চিত্র নং ৩

অপেরার লক্ষণ

"অপেরা" বা গীতিনাট্য বাঙলা দেশে অনেক লেখা হইয়াছে। কিন্তু সে-সব গীতি-নাট্য পড়িলে বা তাহাদের অভিনয় দেখিলে মনে হয়, নাট্যকাররা অপেরার আসল লক্ষণের সঙ্গে পরিচিত নন। সুধু বাঙলায় কেন,—বিলাতেও আধুনিক অপেরার ভাগ্যে যে এই একই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিই তাহার প্রমাণ।

গানই হইতেছে অপেরার সর্ব্বস্ব। কিন্তু আজকালকার শতকরা নিরানব্বইখানি অপেরায় দেখা যায়, গানের দরুণ তাহাদের নাটকীয় সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। অপেরায় এখন নাট্যাংশে এবং সঙ্গীতাংশে এমন একটা ধাকাধাকি লাগিয়া যায়, যাহার জন্য তাহা উচ্চ শ্রেণীতেও উঠিতে পারে না, দীর্ঘজীবনও লাভ করিতে পারে না।

আধুনিক অপেরায় আসল অভাব হইয়াছে প্রতিভার সঙ্গে সহজ বুদ্ধির। অপেরার নিজের একটা বিশেষ রূপ আছে। তাহা গান-ঘেঁসা নাটকও নয় বা নাটক-ঘেঁসা গীতি-মালাও নয়।

মোজার্ট ছাড়া আর-কোন লেখকই অপেরার পূর্ণ-লক্ষণ ফুটাইতে পারগ হন নাই। মোজার্টের অপেরার আগাগোড়া জীবনের রসে পরিপূর,—কারণ, তাহার পাত্র-পাত্রীদের আত্মা খালি কথাবার্ত্তাতেই ফোটে নাই—গানের মধ্য দিয়াও সমানভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন-কি, ওয়াগ্‌নার, বীথোভেন ও গ্লাক্ প্রভৃতি প্রতিভার অধিকারীরাও—ধরিতে গেলে—বিবিধ ঘটনা-সংস্থানে নাট্যরসই প্রগাঢ় করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু ঘটনা-পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে তাঁহারা গানের দ্বারা ভাবাভিব্যক্তির চেষ্টা ততটা করেন নাই,—যতটা করিয়াছেন গানের দ্বারা ঘটনা-পরিবর্ত্তনের অবকাশটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে। ওয়াগ্‌নার অপেরার আসল মূর্ত্তি যে-রকম হওয়া উচিত মনে করিতেন, তাঁহার "ট্রিষ্টান" নামে অপেরায় তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে কেবলমাত্র ঘটনা-সংস্থানই দেখা যায়। কিন্তু "রিং" রচনাকালে তিনি যে গল্পটি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত জটিল; সে-রকম গল্প উপন্যাসেরই উপযোগী—নাটকের নয়। তাই ঘটনা-সংস্থানের (Situation) জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াও ঘটনার পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে তাঁহাকে বিশেষরূপে বেগ পাইতে হইয়াছে। গল্পের ধারা যখন গতিশীল তখন গানের ধারাকে স্থির রাখিবার জন্য তিনি অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াছেন,—কারণ গানকেও তিনি গতিশীল করিতে পারেন নাই। ফলে ঘটনা-পরম্পরার মাঝে মাঝে তাঁহার অপেরার সঙ্গীতাংশগুলি গর্ভাঙ্কের মতনই বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অপেরায় আজকাল জানাশুনা চল্‌তি গল্পকে কেহই প্রায় আমোল দেন না। যে-সব গল্পে ঘটনা-সংস্থান অধিক, অপেরায় সে-রকম গল্পভাগও বড়-একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু অপেরা-লেখকদের বুঝা উচিত, যে-সকল গল্প সকলেরই পরিচিত, তাহাদের ঘটনা-সংস্থানের জন্য নাট্যকারকে নূতন-করিয়া কারণোত্তর দিতে হয় না। আধুনিক নাট্যকাররা শ্রোতাদের চিত্তে এমন উত্তেজনা ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতে চান, যাহা নাটকের পক্ষেই যুৎসই। গীতিনাট্যে তাহা অচল;—কেননা, গীতিনাট্যের রসিক শ্রোতারা কখনই 'এর পর কি হইবে'—বলিয়া দম বন্ধ করিয়া উদগ্রীব হইয়া থাকেন না। সত্যই যদি সুর বা গান আমাদের প্রিয় হয়, তবে আমরা ভবিষ্যৎ লইয়া মাথা ঘামাইব না—কারণ বর্ত্তমানের উপভোগই আমাদের মনের যথেষ্ট খোরাক যোগাইয়া দেয়। এমন-কি, অপেরার বাক্যবহুল সঙ্গীত-সম্বন্ধেও ঐ একই কথা; নাটকীয় ক্রিয়ার ভাবকে তাহারা আরো গভীর এবং উচ্চতর করিয়া তুলে। কিন্তু সঙ্গীতের মধ্যে ঘটনার বিস্ময় থাকা একেবারেই অসম্ভব। এইজন্য অপেরার আখ্যান-ভাগে ঘটনার বিস্ময় থাকা উচিত নয়।

সঙ্গীতের যে-রকম ভাবাভিব্যক্তির শক্তিই থাকুক, ইহাতে গীতি-কাব্যের ধর্ম্ম যতটা প্রস্ফুট, ততটা আর-কিছুর নয়। এবং

নাটকোচিত বিস্ময়-প্রকাশের পক্ষে গীতি-কাব্যের উপযোগিতা যে অত্যন্ত অল্প, সে কথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন। অবশ্য, গীতিকাব্যে একটি ঘটনা-সংস্থান থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে ক্রমাগত নানা ঘটনার বিচিত্র পরিবর্ত্তন কখনোই থাকে না।

গ্লাকের রচিত অন্যান্য অপেরার চেয়ে তাঁহার Orfeoর জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে কেন? কারণ, তাঁহার এই অপেরাখানিতে একটি পরিচিত প্রচলিত গল্পকেই তিনি আখ্যান-বস্তু রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ঘটনার বিস্ময় নাই, কিন্তু ঘটনা সংস্থান (Situation) আছে যথেষ্ট এবং তাহার জন্য নাট্যকারকে কারণোত্তর দিতেও হয় নাই। আবার ঘটনা-পরম্পরার মাঝে মাঝে বর্ণনামূলক সঙ্গীত ব্যবহার করাতে, গল্পের ধারাও কোথাও ব্যাহত হইয়া গর্ভাঙ্কের সৃষ্টি হয় নাই। যাঁহারা ভালো অপেরা লিখিতে চান, এ-সব দিকে চোখ না রাখিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিফল হইবেন।

প্রকাশ্য জুয়াখানা

মোনাকো ভূমধ্যসাগরের একটি অন্তরীপ। ইহার আয়তন মাত্র আটবর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা উনিশহাজার। প্রিন্স অফ মোনাকো এখানকার রাজা। এত ছোট রাজ্য পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। ত্রিশ বৎসর আগে এই জায়গাটি একটি জনশূন্য পাহাড়ে-মরুভূমির মত ছিল—এবং চোর ডাকাত ও চাষাভূষো ছাড়া তখন আর কেউ এখানে আসিত না।

এখন এখানে তিনটি ছোট ছোট সহর হইয়াছে—গোণ্ডামাইন, মোনাকো ও মন্টি-কার্লো। আজকাল এদেশে চোর-ডাকাতের অ ড্ডা না থাকিলেও, অন্যরকম সভ্যতর উপায়ে আমীরকে এখানে ফকিরে পরিণত করা হয়।

মন্টি-কার্লো এবং তাহার বিচিত্র প্রাসাদ ক্যাসিনোর নাম জানে না, য়ুরোপ-আমেরিকায় এমন লোক বোধ হয় একজনও নাই। ক্যাসিনো হইতেছে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জুয়ার আড্ডা।

একটি পাত্রের সঙ্গে একটি চক্র সংযুক্ত থাকে। পাত্রের উপরে ১ হইতে ৩৬ ও ০ পর্য্যন্ত সংখ্যা আঁকা থাকে। তারপর চাকাখানিকে একদিকে ঘুরাইয়া তাহার উল্টোদিকে একটা সাদা মার্ব্বেল গড়াইয়া দেওয়া হয়। মার্ব্বেলটি যে সংখ্যার উপরে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তাহাই হইল জিতের নম্বর। সেই নম্বরে আপনি যদি আগে থাকিতেই একশো টাকা ধরিয়া থাকেন, তবে ছত্রিশগুণ বেশী অর্থাৎ তিন হাজার ছয়শো টাকা পাইবেন। এই জুয়াখেলার নাম roulette। ক্যাসিনোতে জুয়াখেলার এমনি বারোটি টেবিল আছে। দিনের যে কোন সময়েই ক্যাসিনোতে গেলে আপনি দেখিবেন, প্রত্যেক টেবিলের চারিপাশেই অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশজন জুয়াড়ী ভাগ্যপরীক্ষায় তন্ময় হইয়া আছে।

এই জুয়ার আড্ডায় বহু দূর-দূরান্তর হইতে প্রতিদিনই শত শত লোক ছুটিয়া আসে—আগুনের দিকে পতঙ্গের মত! প্রত্যেক

জুয়াড়ীই মনে মনে নানারকম হিসাব করিয়া এইরূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আসে যে, বাজি জিতিবার সে একটা চমৎকার লাগ-সৈ পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে! ক্যাসিনোতে ঢুকিবার আগে ফিরিওয়ালারা নির্ব্বোধ জুয়াড়ীদিগকে "বাজি জিতিবার নির্ভুল উপায়" সম্বন্ধে অনেক বই বিক্রী করে। কিন্তু সত্য সত্যই এই-সব বই পড়িয়া যদি বাজি জেতা যাইত, তবে বইগুলির বিক্রী তখনি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত।

তবে এ-কথা ঠিক যে, অনেকে এখানে আসিয়া অতুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। ওয়েল্‌স্ নামে এক পাকা জুয়াড়ী ক্যাসিনোর জুয়ার আসরে মোট নয়লাখ টাকার বাজি জিতিয়াছিল। মিঃ হান্টলি ওয়াকার পনেরো বৎসর মাথা ঘামাইয়া খেলার এক নিজস্ব পদ্ধতি বাহির করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার লাভ হইয়াছিল দুইলাখ সত্তর হাজার। কর্ণেল পাওয়েল নামে একজন ধনী আমেরিকান পাইয়াছিলেন দশলাখ পঞ্চাশ হাজার। রুশ-দেশীয় এক কাউন্ট মাত্র একরাত্রের খেলায় দুইলাখ দশ হাজার টাকার বাজি জিতিয়াছিলেন। বিলাতের এক জাহাজের মালিক দুই ঘণ্টা খেলিয়া নব্বই হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু জুয়াড়ীরা যতই চালাক হউক আর যতই জিতুক, সেজন্য ক্যাসিনোর অধিকারীর ভয় পাইবার কোনই কারণ নাই। কারণ আজকাল তাহার বাৎসরিক আয় চার পাঁচ-কোটি টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে!

যুদ্ধের পরে মন্টি-কার্লোতে জুয়াড়ীর সংখ্যাও যেমন বাড়িয়াছে, লোকে ফতুরও হইতেছে তেম্‌নি বেশী। ক্যাসিনোর কাছেই একটি গুপ্তস্থান আছে,—সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। জুয়াখেলায় ফতুর হইয়া যে সকল হতভাগ্য আত্মহত্যা করে, এইখানে গভীর রাত্রে গোপনে তাহাদিগের দেহ গোর দেওয়া হয়।

প্রিন্স অফ মোনাকো নিজে কখনো জুয়া খেলেন না। কিন্তু জুয়াখানার মালিক কর বলিয়া তাঁহার হাতে বৎসরে প্রায় ত্রিশলাখ টাকা দেয়। এই আয়ের অনেক অংশ তিনি বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ব্যয় করেন। মন্দের ভালো!

মোনাকোর প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। এখানে ভ্রমণকারীদের পক্ষে দ্রষ্টব্য স্থানেরও অভাব নাই। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের শান্তিপ্রিয় বাসিন্দারা কিন্তু জুয়াখেলার অত্যন্ত বিরোধী এবং জুয়ার আসর তুলিয়া দিবার জন্য তাহারা যথেষ্ট আন্দোলনও করিয়া থাকে।

শ্রী প্রসাদদাস রায়

সঙ্কলন

বিলাতযাত্রীর পত্র

১

পাড়ি দেওয়া গেছে। প্রথম কিছুদিন লাগে নিজের সঙ্গে নিজের যানবাহনের খাপ খাইয়ে নিতে। বিষ্ণু যখন গরুড়ের পিঠে চেপেছিলেন নিশ্চয়ই তখন আরাম পান নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না, কারণ একে আমরা মর্ত্ত্য মানুষ তাতে আমরা কলিদেবতার কলবাহনকে ধার করে' নিয়েচি। গরুড়ের পাখার সঙ্গে অনন্ত আকাশের ঝগড়া নেই—

কিন্তু আমাদের এই কলের জাহাজের সঙ্গে জলের দেবতার পদে পদে বিরোধ। ঠেলাঠেলি মারামারি করে' তাকে চল্‌তে হয়, চব্বিশ ঘণ্টা হাঁসফাঁস করে' মরে, তার সেই উদ্বেগ আমাদের সর্ব্বশরীরকে উতলা করে' তোলে। যে ক্ষেত্রের উপর দিয়ে এর গতি সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে এই বাহনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকাতে আমাদের এত দুঃখ। জাপানিদের জুজুৎসু ব্যায়ামের কায়দা হচ্চে এই যে বাধাকে আপনার অনুকূল করে' তোলা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতাকেই কৌশলে আপনার স্বপক্ষীয় করে' নেওয়া, শত্রুর অস্ত্রকেই নিজের অস্ত্র করা। পাখীর পাখা বাতাসেরই গতিকে নিজের শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার আকাশ-বিহারকে সুষমায় সৌন্দর্য্যময় করতে পারে। মানুষের যন্ত্র প্রকৃতির সঙ্গে এখনো সম্পূর্ণ সন্ধি করতে পারে নি, এইজন্যে সে যতটা শক্তি ব্যবহার করে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তির অপচয় করে। যন্ত্র কেবলি বল্‌চে আমি জোর করে বাধা কাটিয়ে যাব। যন্ত্রের এই ঔদ্ধত্যে সমস্ত পৃথিবী তাপিত। প্রকৃতির সঙ্গে যন্ত্রের অসামঞ্জস্যে যন্ত্রকে এত কুৎসিত করে' তুলেচে। বাণিজ্যলক্ষ্মী যখন থেকে কলবাহনকে অবলম্বন করেচেন তখন থেকে তাঁর শ্রী নেই। তখন থেকে বিশ্বলক্ষ্মীর সঙ্গে বাণিজ্যলক্ষ্মীর মুখ দেখা বন্ধ। যন্ত্রের জবরদস্তি যে সব জঞ্জালকে ক্রমাগত জন্ম দিতে থাকে সেই তার আপন সন্তান, সেই জটিল জঞ্জালই তার সর্ব্বনাশ করে। আধুনিক কালের পলিটিক্স সেই যন্ত্র—বিশেষত বিদেশী রাজ্যশাসনে। মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে' চলবার শক্তি এর নেই, উগ্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা কেবলি বাধা ভেদ করে' চলবার জন্যে এর এত উদ্যম। এই জন্যে এই পলিটিক্স দৃপ্ত কিন্তু শ্রীহীন। শ্রী হচ্চে সকল শক্তির চেয়ে বড় শক্তি; চারিদিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যের গুণে যখন লীলাময় সহজতা জন্মে তখন দেখা দেয় শ্রী;—শক্তি তখনি সুন্দরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়—বিরোধের ভয়ঙ্কর অপচয় থেকে তখন শক্তি বেঁচে যায়। এই নিষ্ঠুর অপচয়ের হিসাব একদিন নিকাশ হবে। বোধ হচ্চে যেন সেই হিসাব তলব হয়েচে। পলিটিক্সের জঞ্জাল জমে উঠেচে; মিথ্যায় কপটতায় নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীতে দেবতার পথ-চলা বন্ধ। তাইত পশ্চিম গগনে ধূম-কেতুর মত দেবলোকের ঝাঁটা দেখা দিয়েচে, সমস্ত ধরণী কেঁপে উঠ্‌ল।

জাহাজ ত চল্‌চে সমুদ্রের উপর দিয়ে—এদিকে আমাদের মনও চলেচে কালসমুদ্রে। বাইরে যেখানে সমস্ত পরিচিত এবং অভ্যস্ত, মন সেখানে আপন চিন্তার পথে বাধা পায় না। কিন্তু অপরিচিত মানুষের মত আমাদের মনের পক্ষে এমন বাধা আর কিছুই নেই। অপরিচয় যেখানে কেবলমাত্র পরিচয়ের অভাব সেখানে বাধা অতি সামান্য—কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় মানুষ অপরিচয়ের বর্ম্ম পরে' থাকে পরস্পরকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। এই জিনিষটা কেবল অভাব নয়, ফাঁক নয়, এ একটা কঠোর জিনিষ, এ অদৃশ্য-ভাবে ঠেলা দেয়;—বিশেষত যেখানে ইংরেজ সহযাত্রী, এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজ। মনে হয় যেন জাহাজে আকাশটাও শূন্য নয়—সে যেন কুমুইয়ের গুঁতো দিয়ে ভরা। আমি স্বভাবত অবকাশবিহারী জীব, আমি চিরদিন ফাঁকায় মানুষ হয়েচি—আমার চারি-দিকের আকাশ যখন ঠেলাঠেলিতে ভরে যায়, তার মধ্যে যখন প্রকৃতির শান্তি বা মানুষের নিমন্ত্রণ থাকে না তখন আমার সমস্ত প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। যদি আমার সেই শান্তিনিকেতনে, সেই উদার প্রান্তরের প্রান্তে ফিরে যাবার কোনো পথ থাকত তবে এই মুহূর্ত্তেই আমি চলে যেতুম। কিন্তু পূর্ব্বে বলেছি আমি কলিযুগের ধার-করা বাহনে চলেচি, এ আমার ইচ্ছাকে মানবে না। সেইজন্যেই দেবতার প্রতি ঈর্ষ্যা হয়—আলাদিনের প্রদীপের স্বপ্ন দেখি।

কিসের জন্যে যাচ্চি সে কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। বেড়াবার জন্যে নয় সে আমি জানি, আর কিসের জন্যে সে আমি স্পষ্ট জানি নে। কেবল একটা কথা মনে আসে সেটি হচ্চে এই;—মন্থনে দুধের থেকে নবনী বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে; য়ুরোপে লোকসমুদ্রে যে মন্থন হয়েচে তাতে সেখানকার যাঁরা মনীষী যাঁরা ভাবুক তাঁরা আজ সেখানকার সমস্ত সমাজের মধ্যে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে নেই। বোধ হয় আজকের দিনে তাঁদের

দেখতে পাওয়া সহজ। শুধু চোখে দেখতে পাওয়া নয়—আজ তাঁরা সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চিন্তা করচেন সেই চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যাবে। একথা মনে করা ভুল তাঁদের ভাবনায় ভারতবর্ষের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সর্ব্বমানবের সমস্যার যাঁরা সমাধান না করবেন তাঁরা নিজের দেশের সমস্যার কোনো কিনারা করতে পারবেন না। কোনো জাতি যখন বড় রকমের দুঃখ পায় তখন একথা বুঝতে হবে সেই দুঃখের মূলে সর্ব্বমানবের বিরুদ্ধে একটা অপরাধ আছে। স্থানীয় পালটিক্সের ছিন্নতায় তালি লাগিয়ে এ দুঃখের প্রতিকার হতে পারবে না। আমরাও সুদীর্ঘকাল ধরে যে দুঃখ বহন করচি তার কারণটাকে সঙ্কীর্ণ ও আকস্মিক করে দেখ্‌চি বলেই মনে ভাবচি মণ্টেগু ডাক্তারের হাতে এর ওষুধ আছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক সভামঞ্চে রেজোল্যুশনের পটি লাগিয়ে ভারতের মর্ম্মান্তিক ক্ষতগুলির আরোগ্য ঘটবে।

২

আলোয়ারের মহারাজা আমাদের সঙ্গে যাচ্চেন। এঁকে দেখে বড় খুসি হয়েচি। এঁর বেশভূষা আদবকায়দা সমস্তই দেশী ধরণের। পশ্চিমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মোকাবিলা করবার সময় ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে আত্মপরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করে—আপনার ভাষা, আপনার বেশ, এমন কি, আপনার স্বভাবকে গোপন করে' তবেই যেন গৌরব বোধ করে। ইংরেজ আপনার কায়দাকেই সম্মান করে, তার সঙ্গে অল্পমাত্র পার্থক্যকেও অবজ্ঞা এবং উপহাস করে' থাকে। সেই কারণে, যেখানে অধিকাংশ লোক ইংরেজ এবং যেখানে সমস্ত ব্যবস্থাই ইংরেজি সেখানে নিজেকে যথাসম্ভব খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে ইংরেজি ধরনধারনের সুবিধে আছে, তাতে অন্তত বাইরের দিকে একটু আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু অন্তরের দিকে? এই ইচ্ছাকৃত দাসত্বের লজ্জা বহন করি কি করে?

এ সম্বন্ধে একটা তর্ক কিছুকাল পূর্ব্বে মাঝে মাঝে শোনা যেত। সে হচ্চে এই যে, বাঙালীর বেশভূষা ধুতিচাদর, কিন্তু ধুতিচাদরে পৃথিবী-পরিভ্রমণ চলে না। একথা সত্য, কেন, বাঙালী সুদীর্ঘকাল লোকসভার আড়ালে ছিল,—আপনার গ্রামে, আপনার চণ্ডীমণ্ডপেই তার দিন কেটেচে। এই জন্যে বাঙালী স্ত্রীলোক এবং পুরুষের চিরপ্রচলিত বেশভূষা পৃথিবীর জনসভার পক্ষে অত্যন্ত বেশি আটপৌরে। শুধু তাই নয়, বাহিরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবার যোগ্য আমাদের কোন আদবকায়দা নেই। এইজন্যে বাঙালী স্বভাবত উদ্ধত না হলেও বিনয়প্রকাশে সে অনভ্যস্ত, এমন কি, তাতে সে লজ্জা বোধ করে। এসমস্তই মানি তবু কিছুতেই মানিনে যে আগাগোড়া ইংরেজ সাজলেই সমস্যা মেটে। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে ব্যবস্থাকে নিজের নিয়মে মিলিয়ে নেওয়াই হচ্চে প্রাণের লক্ষণ। বাহিরের পরিবর্ত্তনকে অন্ধভাবে অস্বীকার করাও জড়ত্ব আর সেই পরিবর্ত্তনকে অন্ধভাবে স্বীকার করাও জড়ত্ব। অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি এবং সৃজনীশক্তির সাহায্যে সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে' নেওয়াই হচ্চে যথার্থ আত্মরক্ষা। পূর্ব্বাপর আমাদের কোনো একটা জিনিষের অভাব যদি থাকে তবে সেটাতে আমাদের দারিদ্র্য প্রকাশ পেতে পারে তবু তাতে তেমন বেশি লজ্জা নেই, কিন্তু কোনোকালেই সে অভাব আমাদের নিজের স্বাভাবিক শক্তিতে মেটাবার ভরসা যদি না থাকে তবে সেই চির-অক্ষমতার অগৌরবই দুঃসহ। একদিন আমাদের বাংলা ভাষার শক্তি সঙ্কীর্ণ ছিল, কারণ সে ভাষা কেবল ঘরের ভাষা গ্রামের ভাষা ছিল, এইজন্যে সে ভাষা বিদ্যার ভাষা ছিল না। এই কারণে, যারা জড়চিত্ত তারা অবজ্ঞা করে' বলেছিল বাংলা চিরকাল প্রাকৃতসাধারণের ভাষা হয়ে থাক্ আর নির্বিচারে ইংরেজি ভাষাকেই বিশিষ্টসাধারণে গ্রহণ করুক। কিন্তু আজ আমাদের গৌরবের কথা এই যে, সেই অবজ্ঞা বাংলা ভাষা স্বীকার করে নি। বাংলা ভাষা বিদ্যার ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌ল। কেমন করে হল? আপনার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে' নয়; নিজের মহলকে প্রতিদিন বাড়িয়ে তুলে, আধুনিক কালের বিদ্যা ও ভাবকে দ্বারের বাহির থেকে বিদায় না করে দিয়ে, তাদের সকলকে আতিথ্য দান করবার উপযুক্ত আয়োজন করে'—অর্থাৎ নিজের প্রাণশক্তির বেগেই বিশ্ববিদ্যা বিশ্ব-

সাহিত্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিজের সামঞ্জস্য সাধন করে'। বীণায় সুর বাঁধবার সময় বেসুর অত্যন্ত শ্রুতিকটু হয়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু তাতেও বোঝা যায় সুর বাঁধবার ওস্তাদটি বেঁচে আছে, সেইটেই মস্ত আশার কথা। তেমনি আকস্মিক অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের সময় আমাদের ব্যবহারে আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে নানা অদ্ভুত বিকৃতি দেখা দেবেই কিন্তু তাতেও বোঝা যায় সজীব ওস্তাদের কাজ চল্‌চে, সেই ওস্তাদ সমস্ত বিকৃতিকে ক্রমশই প্রকৃতির অনুগত করে' নেবেন। অতএব এই সকল উপদ্রবকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই, কেননা এ হল প্রাণের উপদ্রব। ভয়ের কারণ নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জড়তা। সেই জড়তা পরের ধনে যতই গর্ব্ব করুক তবুও তা জড়তা। যতক্ষণ নিজের শক্তি সচেষ্ট হয়ে সৃজন করচে ততক্ষণ অন্যের তৈরি জিনিষ সেই সৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চলে,—সেই রকম গ্রহণ করাকে ভিক্ষা করা ধার করা বলে না। তাকেই বলে অর্জ্জন করা। সমস্ত মহৎ এবং প্রাণবান সভ্যতা বাহির থেকে সেই রকম অর্জ্জন করে এবং করেচে। প্রাচীনকালে ভারতও তাই করেচে, যদি না করত তবে লজ্জা বোধ করতেম। শক্তিস্বাতন্ত্র্য অভাবাত্মক জিনিষ নয়—অর্থাৎ প্রাণপণে পরের পন্থা বাঁচিয়ে চলাই ওরিজিন্যালিটি নয়—উপকরণ ঘরের হোক্ আর বাইরের হোক্ সমস্তই নিজের প্রকৃতিসঙ্গত করে নেবার শক্তিকেই বলে শক্তিস্বাতন্ত্র্য। বাহিরের জিনিষ নির্বিচারে নকল করাও যেমন দীনতা, বাহিরের জিনিষ নির্ব্বিচারে বর্জ্জন করাও তেমনি দীনতা। দুইয়েতেই আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায়।

তাই আমার বক্তব্য এই যে, আজকের দিনে বিশ্বের সঙ্গে বাংলা দেশের যে সম্বন্ধস্থাপনের কাজ চল্‌চে তার প্রত্যেক অঙ্গেই আমাদের নিজের পূর্ণ জাগ্রত সৃজনী শক্তির পরিচয় থাকা চাই। এই সৃজনের মানেই হচ্চে বাহ্য উপকরণকে নিজের আন্তরিক নিয়মের অনুগত করা, অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্যবস্থার সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তাই এই জাহাজে যখন কোনো বাঙালী সাহেবকে সগর্ব্বে পদচারণ করতে দেখি তখন সেই জড়ত্বে লজ্জা বোধ করি—আবার যদি দেখতুম কোনো বাঙালী খালি গায়ে কাঁধের উপর একখানি চাদর ঝুলিয়ে এবং ফিন্‌ফিনে ধুতি পরে' অবিমিশ্র স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যে ডেকের উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে সমুচ্চস্বরে হাই তুলচেন, তাহলেও সেই জড়ত্বে লজ্জা বোধ করতুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

মেঘের সাগর

নীল আকাশের ভ্রূকুটি জুড়ে'
আজ্‌কে মেঘের হেলাফেলা,—
সাদায়-কালোয় ধূসর মিশে'
দেদার ভাসে, দেদার খেলা।
ধোঁয়ার 'পরে ছুট্‌ছে ধোঁয়া
মেঘের 'পরে মেঘের ছোটা,
ফাঁকে ফাঁকে নীলের বুকে
রবির হাসির উজল ফোটা।
ঢেউর 'পরে দুল্‌ছে রে ঢেউ
মেঘের সাগর উথ্‌লে ওঠে,
বিরাট কিসের নিবিড় স্বপন
সুপ্ত নীলের চিত্তে ফোটে!
নাটক রে ঠাঁই মেঘে মেঘে
কী এল রে আজ্‌কে ভেসে!—
জমাট-বাঁধা অশ্রু এ কার
থম্‌কে দাঁড়ায় অসীম দেশে!
নিবিড় শুধু বিপুল এ এক
ভুবন-ঘেরা স্নেহের মায়া;
কোন্ জননীর আঁচল এটি?—
বিশ্ব-মাতার বুকের ছায়া?
আজকে নিবিড় মেঘ-সায়রে
ঝাঁপিয়ে যাব, সাঁতার দিয়ে
এপার ওপার কর্‌বো ভেসে'
ডুবে' হেসে' জুড়িয়ে হিয়ে।
মেঘ-সাগরের বিপুল মাতন,
তুফান অসীম, গুম্‌রে ফেলো,
দোল্ দিয়ে যায় দেদার বুকে—
ঘর ছেড়ে যায় পরাণ ভোলা।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪৪শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩২৭ [৫ম সংখ্যা

ময়ূর-মাতন

ওকে আস্‌ছে গো মুখ ঢেকে লোর পর্দ্দায়।
ছেয়ে কদমের পেখমের ডোর জর্দ্দায়।
ওরে দূর থেকে দেখে মেতে উঠ্‌ল ভুবন,
তাই হাওয়া ফেরে ফর্‌ফর্‌ সর্‌ফর্দ্দায়।

কোন্ দেয়াসিনী রূপসীর বাজ্‌ল নূপুর।
তাই কেয়া-বনে দেয়া সনে মাত্‌ল ময়ূর!
মরি পাখ্‌নার ঢাক্‌নায় স্পন্দে তনু,
ভরি পালকের এস্‌রাজ পুলকের সুর।

—"ওরে! নড়্‌ল কি ঘোম্‌টার মেঘ্‌লা আষাঢ়?
ওরে! উড়্‌ল কি পর্দ্দার এতটুকু পাড়?
হেথা অন্তরে সন্তর্পে সাত শো স্বপন,
হোথা লাগ্‌ল কি ঢেউ তার জাগ্‌ল কি সাড়?"

কেকা- রব তুলে বলে শিখি টলে পায় পায়!
হানে লাবণির পশ্‌লা সে অবনীর গায়!
তার স্পন্দনে ছড়াছড়ি ইন্দ্রধনু!
তার গোপনের শিহরণে বীণ বেজে যায়।

আজি মন ফেরে মেঘে-মেঘে, অভ্র শিখায়—
খুঁজে দূর রাকা দূর রাস দূর রাধিকায়!
আজ আকাশের রুধি' দ্বার রসের রণন!
সারা দু'পুরের নূপুরের শিঞ্জিনিকায়!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

অবতার

৩

রাস্তার একধারে সারি-সারি বড়-বড় গাছ—আর একধারে সুরম্য উদ্যান। সৌখিন লোকের ধূলিময় ও কোলাহলময় রাস্তা ছাড়িয়া, এই নিস্তব্ধ শান্ত সুন্দর রাস্তায় অতি অল্প লোকেই আসে; কিন্তু যারা একবার আসে, তারা এখানকার একটি কবিত্ব-ময় রহস্য-ময় আশ্রমের সম্মুখে না থামিয়া থাকিতে পারে না। ঈর্ষা-মিশ্র বিস্ময়ে তাহারা যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন—যাহা অতি বিরল—ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে সুখ-শান্তি বিরাজ করিতেছ। এই উদ্যানের গরাদের নিকট আসিয়া কে না একবার থমকিয়া দাঁড়াইবে, কে না উদ্যানের হরিৎ তরুপল্লব-রাশির মধ্য দিয়া একটি সাদা বাগান-বাড়ী নির্নিমেষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিবে, এবং ফিরিয়া যাইবার সময় বিষন্নচিত্তে মনে করিবে, যেন তাহার সমস্ত সুখ-স্বপ্ন ঐ উদ্যান-প্রাচীরের পশ্চাতেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

এই উদ্যানের সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের দুইধারে বড় বড় শিলাস্তূপের প্রাচীর। অসমান অদ্ভুত আকার দেখিয়াই যেন ঐ সকল শিলাখণ্ড বাছিয়া বাছিয়া ঐখানে স্থাপিত হইয়াছে। এই আব্ড়ো-খাব্ড়ো বেষ্টনের মধ্যে সুরম্য একটি হরিৎ দৃশ্য-পট যেন আবদ্ধ রহিয়াছে। এই শৈল-প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে বিবিধ পার্ব্বত্য-বৃক্ষ অবস্থিত। নানাজাতীয় লতা প্রাচীরের গা বাহিয়া উঠিয়া প্রাচীরকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহাতে করিয়া সভ্যতার কৃত্রিম উদ্যান অপেক্ষা অযত্নসম্ভূত স্বাভাবিক অরণ্যের ভাব ধারণ করিয়াছে। শৈল-স্তূপের একটু পশ্চাতে নিবিড় পত্র-পল্লবে আছন্ন কতক-গুলি সুভঙ্গিম-তরু-নিকুঞ্জ। তরুকুঞ্জের পর হরিৎ-শ্যামল শাদ্বলভূমি প্রসারিত, মখ্মল অপেক্ষাও পেলব—যেন গালিচা বিছানো রহিয়াছে—যেন উহা চোখে দেখিবারই জিনিস—যেন উহাতে পায়ের ভর সহেনা। সুঁড়িপথটি চালনী-ছাঁকা সূক্ষ্ম বালিতে আচ্ছাদিত, পাছে,: ভ্রমণকালে উচ্চকুলোদ্ভবা সুন্দরীদিগের সুকুমার পদ-পল্লব কাঁকর-বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত হয়। ঐ বালির উপর বর-ললনাদের সুকুমার পদক্ষেপের ছাপ মুদ্রিত রহিয়াছে। বালু-পথটি হলদে ফিতার মতো এই হরিৎ পরিসরের চারিদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে।

শাদ্বল-খণ্ডের প্রান্তদেশে, গুল্মাচ্ছন্ন জমির উপর গুচ্ছ গুচ্ছ টক্টকে জিরা-নিয়ম ফুলের যেন আতস-বাজি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত হরিৎ দৃশ্যের শেষে একটি অট্টালিকা। সম্মুখে সুগঠন সুঠাম পাত্লা পাত্লা থাম ছাদকে ধরিয়া আছে। ছাদের প্রত্যেক কোণে মর্ম্মর-প্রস্তর-মূর্ত্তি পুঞ্জীকৃত। মনে হয় যেন কোন ক্রোড়পতি খেয়াল-বশে গ্রীশদেশ হইতে একটি দেব-মন্দির উঠাইয়া আনিয়াছে। অট্টালিকার

দুইপাশ দিয়া দুই পক্ষের মত দুইটি উদ্ভিদ্‌গৃহ প্রসারিত; কাঁচের দেয়াল, সূর্য্যের কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—এবং দেশবিদেশের দুর্লভ বৃক্ষের চারা উহার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। উষার প্রথম রশ্মিপাতে যদি কোন কবি প্রাতে ঐ রাস্তা দিয়া গমন করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, কোকিলের নৈশ-কুহুধ্বনির শেষ তানটুকু তখনও মিলায় নাই। কিন্তু রাত্রিকালে যখন অপেরা হইতে প্রত্যাগত গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ, নিদ্রিত জগতের নিস্তব্ধতায় মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, তখন সেই একই কবি অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইবেন, একটি সুন্দর যুবা-পুরুষের হাত ধরিয়া শুভ্র ছায়ার মত কোন বিষাদ-মূর্ত্তি ললনা নিজ প্রাসাদ-ভবনে আরোহণ করিতেছেন।

এই বাড়ীতেই—পাঠক বোধ হয় অনুমান করিতে পারিয়াছেন—কৌণ্টেশ প্রাস্কোভি-লাভিনস্কা ও তাঁর স্বামী কৌণ্ট-ওলাফ—লাভিনস্কা কিছুকাল হইতে বাস করিতেছেন। এই সাহসী বীর সম্প্রতি ককেশশের যুদ্ধে জয়ী হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এই পুনর্মিলনে প্রেমিক-দম্পতি আনন্দে উন্মত্ত। যে প্রেম পরিশেষে বিবাহে পরিণত হয় ইহাদের সেই বিশুদ্ধ প্রেমে দেব-মানব উভয়েরই অনুমোদন ছিল। কবি টমাস-মুর "দেবতার প্রেম" যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সেই ধরণের প্রেম। ইহার বর্ণনা করিতে গেলে, আমাদের কলমের মুখে, প্রত্যেক কালির মসি-আলোকবিন্দুতে পরিণত হইবে; কাগজের উপর একটা শিখা ফেলিয়া, সুরভি ধূপের একটা সুগন্ধ রাখিয়া, প্রত্যেক শব্দ বাষ্পাকারে উবিয়া যাইবে। যে দুই আত্মা পরস্পরের মধ্যে বিলীন হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া আমরা তাহার বর্ণনা করিব? যেন দুই শিশিরাশ্রুবিন্দু, পদ্ম-পত্রের উপর গড়াইয়া একত্র মিলিত হইয়া, মিশ্রিত হইয়া, পরস্পরের মধ্যে বিলীন হইয়া—শেষে একটি মুক্তাবিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। এই সংসারে সুখ জিনিসটা এতই বিরল যে, মানুষ তাহা প্রকাশ করিবার জন্য শব্দ উদ্‌ভাবন করিতে চেষ্টা করে নাই, কিন্তু পক্ষান্তরে নৈতিক ও ভৌতিক কষ্ট-যন্ত্রণার অনুরূপ শব্দে, প্রত্যেক ভাষার শব্দকোষ পরিপূর্ণ।

ওলাফ ও প্রাস্কোভি শৈশব হইতেই পরস্পরকে ভাল বাসিত। একটী নামেই উহাদের উভয়ের হৃদয় স্পন্দিত হইত; শৈশব হইতে ঐ নামই উহাদের পরিচিত ছিল, উহাদের নিকট আর কোন লোকের যেন অস্তিত্বই ছিল না; প্লেটোর বর্ণিত একাধারে স্ত্রী-পুং দেহের দুই টুকরা সেই আদিমকালের বিচ্ছেদের পর যেন আবার উহাদের মধ্যে আসিয়া পুনর্মিলিত হইয়াছিল। যেন উহারা একত্বের মধ্যে দ্বিত্বরূপে গঠিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একই বাসনার আহ্বানে উহারা পাশাপাশি চলিত, অথবা একটি কপোতযুগল একই চেষ্টায় জীবন-পথে বিচরণ করিত, উড়িয়া বেড়াইত।

এই সুখের অবস্থা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এইজন্য স্বর্গ-বায়ু-মণ্ডলের মত অসীম ঐশ্বর্য্য উহাদিগকে ঘিরিয়া ছিল। এই

সুখী-যুগল কোথাও আবির্ভূত হইবামাত্র তত্রত্য দীনদুঃখীদের দুঃখের লাঘব হইত —চীর-বস্ত্র তখনই ঘুচিয়া যাইত, নয়নাশ্রু শুকাইয়া যাইত; কারণ, ওলাফ ও প্রাস্কোভির একটা উচ্চতর সুখের-স্বার্থপরতা ছিল, উহারা আপন সান্নিধ্যে কোন দুঃখ-কষ্ট সহিতে পারিত না।

কৌণ্টের মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি, ঈষৎ দীর্ঘ, সুগঠিত পাতলা নাক, ওষ্ঠ-যুগল দৃঢ়রূপে অঙ্কিত, সুস্পষ্ট গোঁফের রেখা, গোঁফের দুই প্রান্ত ছুঁচাল, থুত্‌নী একটু ওঠানো ও খাদ-কাটা; কালো-কালো চোখ খুব তীক্ষ্ণ, অথচ দয়ার্দ্র। দেহের উচ্চতা মাঝামাঝি, পাত্‌লা গঠন, স্নায়ু-প্রধান প্রকৃতি; দেহ অতি সুকুমার প্রতীয়মান হইলেও ইস্পাতের মত দৃঢ় পেশীজাল তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। কোন রাজ-রাজড়ার বড় মজ্‌লিসে কৌণ্ট যখন হিরক-খচিত জমকালো জরির পোষাক পরিয়া আসিতেন তখন তত্রত্য পুরুষদিগের ঈর্ষা হইত ও রমণীগণের হৃদয়ে প্রেমের আগুণ জলিয়া উঠিত। কিন্তু প্রাস্কোভি তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁর যেরূপ রূপ ছিল, তেমনি আবার মানসিক গুণও যথেষ্ট ছিল।

বুঝিতেই পারিতেছ, এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অক্টেভের সাফল্যের প্রায় কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এবং পাগলা ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো যতই আশ্বাস দিন না কেন, স্বকীয় পালঙ্কে পড়িয়া থাকিয়া শান্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ভিন্ন অক্টেভের আর কোন উপায় ছিল না। প্রাস্কোভিকে বিস্মৃত হওয়াই একমাত্র উপায়, কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাঁর সহিত আবার সাক্ষাৎ করায় কি লাভ? অক্টেভ মনে মনে অনুভব করিত, এই রমণীর হৃদয় কোমল হইলেও যেরূপ অটল, তাহাতে তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা কখনই শিথিল হইবে না; নিতান্ত আবেগহীন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া আমাকে কেবল একটু কৃপাদৃষ্টিতে দেখিবেন এইমাত্র। অক্টেভের ভয় হইতেছিল পাছে যে ক্ষতের চিহ্ন এখনো বিলুপ্ত হয় নাই, সেই ক্ষতের মুখ আবার ফাটিয়া নূতন করিয়া বাহির হয় এবং পাছে সেই নির্দ্দোষ হত্যাকারিণীর চরণ-তলে তাহার রক্তাক্ত হৃদয় আবার লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু অক্টেভ তাহার ভাল-বাসার ধন ঐ মধুর হত্যাকারিণীর উপর হত্যার অভিযোগ আনিতে ইচ্ছুক ছিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রুষিয়ার সাহিত্যিক

পুশকিন রুষিয়ার সব চেয়ে বড় কবি। তবু রুষিয়ায় বহুদিন তাঁর কবিতা অনাদৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। দেশের কবি যে সময় নিজের দেশেই আদর পান নি তখন বিদেশের লোক যে তাঁকে আদর করে কোলে তুলে নেবে সে রকম আশা করা বৃথা, কাজেই ঘরে বাইরে দু-জায়গাতেই বহুদিন অবধি পুশকিনের প্রতিভার তেমন কদরদান জোটে নি।

ক্রমে যেমন রুষিয়ার মধ্যে পুশকিনের কাব্যের সমাদর হতে আরম্ভ করল সঙ্গে সঙ্গে জর্ম্মান ও ফরাসী ভাষায় তাঁর কবিতার অনুবাদ হতে লাগল। জর্ম্মানী ও ফরাসী এই দুই ভাষায় তাঁর সমস্ত কবিতার অনুবাদ হয়ে গিয়েছে। শুধু যে তর্জ্জমা হয়েছে তা নয় বেশ ভাল তর্জ্জমা হয়েছে বলা যেতে পারে। ইংরেজীতে পুশকিনের কয়েকটী কবিতার অনুবাদ করা হয়েছে বটে কিন্তু ইংরেজী ভাষার গুণে সেগুলো মূল কবিতা থেকে বড্ড দূরে সরে পড়েছে।

পুশকিনের কবিতার প্রধান গুণ ও বিশেষত্ব তার ভাষার মধ্যে। কবিতা গুলির ভাষা এত হাল্কা যে, তার ঠিক রুষীয় ভাব বজায় রেখে তর্জ্জমা করা ত একরকম অসম্ভব, আর॰ সম্ভব হলেও সে যার-তার কর্ম্ম নয়।

তাঁর কবিতার মধ্যে গেটে, শিলার শেলি, ব্রাউনিং কি ভিক্তর হ্যুগোর কবিতার মতন উচ্চ ভাব খুঁজে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু তাঁর ছন্দ, তাঁর ভাব প্রকাশ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা এবং ভাষার উপর অধিকার দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। উচ্চ ভাবের কথা ছেড়ে দিয়ে এই দিক দিয়ে বিচার করলে বোধ হয় পুশকিনের মতন বড় কবি পৃথিবীতে আর দুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। ছোট-খাটো খুঁটি-নাটি ব্যাপার, সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, মানুষের মনের এক একটা ভাবকে এমন সহজে কথার ছবি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর মতন আর দুটি নেই। তাঁর কবিতার এক এক জায়গায় সেগুলোকে এমন কায়দায় প্রকাশ করা হয়েছে যে পড়লে মনে হয় আর কোন রকমে, কোন কথা দিয়ে এটাকে এত ভাল করে প্রকাশ করা যেত না। এই খানেই পুশকিনের বিশেষত্ব। এই অনাদৃত কবিকে রুষিয়ার লোকে এখন দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে।

মস্কো সহরে এক বড় লোকের ঘরে পুশকিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের ঠাকুরদাদা একজন নিগ্রো ছিলেন। মায়ের দিক দিয়ে তাঁর শরীরে নিগ্রোর রক্ত ছিল। পুশকিনের বাবা, রুষিয়ার বড় ঘরের ছেলেরা সে সময় যেমন করে দিন কাটাত, ঠিক সেই রকমেই দিন কাটাতেন। ছেলেবেলা তাঁর ঠাকুরমা ও এক বৃদ্ধা দাসী তাঁর সঙ্গিনী ছিল। এদের নিকটেই তিনি রুষিয়ার

কথিত ও চলতি ভাষা শেখবার সুবিধা পেয়েছিলেন।

একটু বড় হতেই আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে তাঁকে সেণ্টপিটার্সবার্গে লেখা পড়া শিখতে যেতে হয়েছিল।

স্কুল থেকে বেরোবার আগেই কবি বলে দেশময় তাঁর সুখ্যাতি রটে গেল। এই সময় সেণ্টপিটার্সবার্গে তাঁর গুটি কয়েক বন্ধু জুটেছিল, তারা সব রাজনৈতিক আন্দোলন করে বেড়াত। এদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে অভিজাত সম্প্রদায় ও Serfdom রীতির উপর তাঁর অত্যন্ত ঘৃণা জন্মায়। এই ঘৃণার উত্তেজনায় তিনি সেই সময় "স্বাধীনতা" নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাটির ছত্রে ছত্রে বিদ্রোহসূচক ভাব ত ছিলই তা ছাড়া তার মধ্যে তখনকার শাসন-নীতির উপর এমন শ্লেষ করা হয়েছিল যে রাজ-পুরুষদের পক্ষে সেটা সহ্য করা একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াল। "স্বাধীনতা" কবিতার পরে উপরি-উপরি তিনি এই ভাবের আরও কতকগুলি কবিতা লিখেছিলেন। ১৮২০ অব্দে বাইশ বছর বয়সের সময় তিনি "স্বাধীনতা" নামক কবিতাটী লেখেন। এই কবিতা বের হবার কিছুদিন পরেই সরকার থেকে তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ধরে কিশিনিয়ফ নামে একটা সহরে নির্ব্বাসিত করে দেওয়া হল। এইখানে এসে তিনি সাহিত্য চর্চ্চা একেবারে ছেড়ে দিয়ে দিনকয়েক যথেচ্ছা-চারে দিন কাটিয়েছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি বেদেদের দলে ভিড়ে গিয়ে একেবারে তাদের মতন হয়ে তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু পুশকিনের যাবার হুকুম ছিল না, কাজেই যে দলে তিনি ঢুকতেন তারা যতদিন ঐ প্রদেশে ঘুরে বেড়াত তিনি তাদের সঙ্গে থাকতেন, তারা বাইরে চলে গেলেই আবার অন্য দল সন্ধান করে সেই দলে গিয়ে মিশতেন।

সেই সময় ইংলণ্ডের কবি বায়রণ এসে গ্রীসকে মাতিয়ে তুলেছেন। কবি বায়রণের প্রভাব তখন ইউরোপের প্রায় সমস্ত লোকের চেতনাকে একটু না একটু নাড়া দিয়েছিল। পুশকিন সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে জুটে পড়বার মতলব করছিলেন এমন সময় রাজপুরুষেরা সেই সংবাদ পেয়ে তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজের জমিদারীর মধ্যে বাস করতে আদেশ দিলেন। এইখানে নির্ব্বাসনের সময়ে তিনি তাঁর সব চেয়ে ভাল কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন।

নির্ব্বাসিত অবস্থায় তিনি তাঁর পুরোন বন্ধুদের কথা ভুলে যান নি। ভিতরে ভিতরে তাদের সঙ্গে তাঁর ষড়যন্ত্র ও চিঠি পত্র চলত। ১৮২৬ অব্দে এই বিদ্রোহীরা যখন সদলবলে ধরা পড়ে তখন তাদের মধ্যে পুশকিনের নামও পাওয়া গিয়েছিল তবে পুলিশের লোকজন এসে পড়বার আগেই তিনি কাগজ-পত্র যা ছিল সব তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে ফেলে সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। নচেৎ তাঁকেও তাদের সঙ্গে সাইবীরিয়ায় চালান করে দেওয়া হত।

এই ঘটনার কিছু পরেই রাজা প্রথম নিকোলাস তাঁকে সেণ্টপিটার্সবার্গে ডাকিয়ে আনিয়ে রাজ দরবারে একটী সম্মানের

চাকরী দেন। কিন্তু এই চাকরী করা তাঁর ধাদপেই ভাল লাগত না। তিনি বরাবরই অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর চটা ছিলেন, এই চাকরীতে প্রতিপদে তাঁর সঙ্গে রাজ অনুগৃহীত ধনীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধত। তিনি এই সব খোসামুদের দলকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন, তারাও যে তাঁকে খুব সুনজরে দেখত তা নয়।

পুশকিনের স্ত্রী রুষিয়ার মধ্যে খুব একজন নামজাদা সুন্দরী ছিলেন। এই সুন্দরীকে বিবাহ করে তাঁকে চিরকাল পস্তাতে হয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে মনের মিল তাঁর কোন কালেই হল না আর এই সুন্দরীর জন্যই কি একটা ব্যাপারে তিনি একজন উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীকে দ্বিরথ-যুদ্ধে আহ্বান করেন। এই যুদ্ধে ১৮৩৭ অব্দে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

রুষিয়ার সাহিত্যরসিকদের মধ্যে বরাবর একটা কথা নিয়ে ঝগড়া চলে আসছে। কথাটা এই যে, পুশকিন বড় কবি কি লারমনটফ বড় কবি। আর এক দল এই সমস্যার মধ্যে একটা মস্ত বড় "যদি" ঢুকিয়ে ব্যাপারটার একটা আপোষ—নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন। এই সম্প্রদায় বলেন যে যদি লারমনটফ বেশী দিন বাঁচতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই পুশকিনের চেয়ে ঢের বড় কবি হতেন। কিন্তু রুষিয়ার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই নবীন কবি বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। সেখানকার সাহিত্যিকদের ভাগ্য অনুযায়ী লারমনটফেরও অপঘাত মৃত্যু ঘটেছিল। চব্বিশ বৎসর বয়সে এক দ্বিরথ-যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছিলেন।

লারমনটফের দেহে স্কচ রক্ত ছিল। জর্জ্জ লিয়ারমন্থ নামে একজন স্কচ পোলাণ্ডে চাকরী করতেন, শেষে তিনি পোলাণ্ড থেকে রুষিয়ায় আসেন। এই জর্জ্জ লিয়ারমন্থই কবি লারমনটফের পূর্ব্ব-পুরুষ। লারমনটফের জননী খুব সাহিত্য রসিকা ছিলেন। শুনতে পাওয়া যায় যে, তিনি নাকি কবি ছিলেন কিন্তু তাঁর কবিতা আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। কবির দুর্ভাগ্য বশতঃ তিন বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁর জননীকে হারিয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় লারমনটফের জননীর মাত্র বাইশ বৎসর বয়স ছিল। কবির পিতা সৈন্য-বিভাগে কি একটা সামান্য চাকরী করতেন কিন্তু তাঁর মামারা খুব বড়লোক ছিলেন। লারমনটফ তাঁর মামার বাড়ীতেই মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর দিদিমা নাতিটিকে গরীব বাপের কাছ থেকে নিয়ে এসে নিজের কাছে মানুষ করতে লাগলেন।

লারমনটফ ছেলেবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়স থেকেই তিনি ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি শিলার ও সেকস্পীয়রের খুব ভক্ত ছিলেন কিন্তু একটু বয়স হতেই তিনি তাঁদের ছেড়ে দিয়ে শেলী ও বায়রণের গোঁড়া হয়ে পড়লেন। ষোল বৎসর বয়সের সময় লারমনটফকে লেখা পড়ার জন্য মস্কো বিশ্ব বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ঢুকতে হয়েছিল কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই সেখানকার একজন অধ্যাপকের সঙ্গে তিনি এমন ঝগড়া বাধালেন যে সেই অপরাধে

তাঁকে বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হতে হল। মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে লারমনটফ সেণ্টপিটার্সবার্গের মিলিটরী কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হলেন এবং আঠার বৎসর বয়সে তিনি সেখানকার ঘোড়-সওয়ার দলের এক উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

"একদিন সকাল বেলা উঠে দেখলুম আমি একজন বিশ্ব-বিখ্যাত লোক হয়ে পড়েছি" এই বাক্যটী লারমনটফের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

বাইশ বৎসর বয়সে তিনি পুশকিনের মৃত্যু উপলক্ষে একটী কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাই তাঁকে যশের রাজ্যে টেনে নিয়ে গেল। এই কবিতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর স্বাধীনতার স্পৃহা কত প্রবল ছিল, নির্ভীক চিত্তে তখনকার রাজকর্ম্মচারীদের কি রকম ভাবে তিনি আক্রমণ করেছিলেন তা কবিতাটী না পড়লে বুঝতে পারা যাবে না। কবিতার একজায়গায় তিনি বলেছেন "রাজার সিংহাসনের চারদিকে একদল অবিবেচক অহঙ্কারী ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছ, তোমাদের পেশা হচ্ছে প্রতিভাবান লোকেদের ধরে ধরে ফাঁসি দেওয়া। তোমরা স্বাধীনতাকে ধরে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছ, যশকে তোমরা নির্ব্বাসনে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছ। তোমাদেরই তৈরি আইন দিয়ে তোমরা নিজেদের ঢেকে রেখেছ, তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিচার করে পরিত্রাণের পথটাও বেশ সুলভ করে রেখেছ। কিন্তু ঘৃণ্য কাপুরুষের দল তোমরা কি জান না ঈশ্বরের বিচার বলে একটা জিনিষ আছে। তোমাদের বিচারের জন্য আর একজন ন্যায় বিচারক বসে আছেন তাঁকে তোমরা অর্থ দিয়ে কিংবা ছুটো খোসামোদের কথা বলে ভোলাতে পারবে না।......আজ তোমরা যে মহাত্মার রক্তপাত করেছ তোমাদের শরীরের কালো রক্ত দিয়ে সে রক্ত ধুয়ে ফেলতে পারবে না বরং সেটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।" এই কবিতা ছাপা হবার আগেই হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি সমস্ত রুষিয়াময় ছড়িয়ে পড়ল।

দিন কয়েকের মধ্যেই সেখানকার ছেলে-বুড়ো সকলেরই এই কবিতাটা মুখস্থ হয়ে গেল।

কবিতাটী প্রকাশিত হওয়া মাত্র লারমনটফকে পাকড়াও করা হল। সঙ্গে-সঙ্গে বিচার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়ে তাঁকে সাইবীরিয়ায় চালান করে দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। রাজ-সরকারে তাঁর কয়েকজন আত্মীয় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের অনেক চেষ্টায় তিনি নির্ব্বাসন থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন। তবে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হল। তিনি সৈন্য-বিভাগে চাকরী নিয়ে সে সময় ককেশাস প্রদেশে বাস করছিলেন তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হল।

এই পার্ব্বত্য-প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য লারমনটফের প্রাণে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কবিতার মধ্যে এই ককেসাস প্রদেশের দৃশ্যের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে যে সেগুলো পড়লে প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করবার তাঁর কি রকম অসীম ক্ষমতা ছিল, তা বুঝতে পারা যায়; শুধু তাই নয়, ককেসাস প্রদেশের একটা মোটামুটি ভৌগোলিক ধারণাও হয়ে যায়।

মহাকবি সেকস্‌পীয়র কিং লিয়ার নাটকে একজায়গায় সমুদ্রের বর্ণনা করেছেন; টুর্গেনিফ সেক্সপীয়ারের এই বর্ণনাকে বলেছেন যে প্রাকৃতিক দৃশ্যকে এমন ভাবে ফুটিয়ে তোলা একমাত্র সেক্সপীয়ারেরই পক্ষে সম্ভব। কিন্তু রুষিয়ার এই যুগের একজন সমালোচক বলছেন যে লারমনটফের এই বর্ণনার সঙ্গে সেক্সপীয়ারের সমুদ্র বর্ণনার তুলনাই হয় না। লারমনটফের বন্ধু ও তাঁর কবিতার সমালোচক বেডেনষ্টেড (জর্ম্মাণ) বলেন যে তাঁর দৃশ্য-বর্ণনায় তিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও naturalist দুই শ্রেণীর লোককেই মোহিত করেছেন।

লারমনটফের মধ্যে শেলির প্রভাব খুব বেশী রকম দেখতে পাওয়া যায়। তিনি শেলীর প্রমিথিয়স বাউণ্ড পড়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি শেলীর অনুকরণ করেন নি। মানুষের মনের ভিতরকার সৎ ও অসতের যে দ্বন্দ কবি শেলীর মনকে নাড়া দিয়েছিল, যে প্রবৃত্তিটা সামাজিক, রাজনৈতিক ও চলতি নীতির বাধন ছিঁড়ে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাস সেবন করবার জন্য মানুষের বুকের মধ্যে দিন-রাত মাথা খুঁড়ে মরছে, কবি লারমনটফ মানুষের সেই চিরন্তন স্বাধীনতার ইচ্ছাটাকে ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। লারমনটফ কি কারণে তখনকার ফরাসী রাজ-প্রতিনিধির এক ছেলেকে দ্বিরথ-যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। এই অপরাধে তাঁকে আবার ককেসাস প্রদেশে নির্ব্বাসিত করা হয়। এখানে আর একটী দ্বিরথ-যুদ্ধে সাতাশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেন, তাঁকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধের অবতারণা করা হয়েছিল এবং যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে তাঁকে হত্যা করা হয়। কবি লারমনটফের মৃত্যুর ইতিহাসটা কবি পুশকিনের মৃত্যুর ইতিহাসের মতই রহস্যজালে আবৃত। কবিতা ছাড়া পুশকিন ও লারমনটফ দুইজনেই উপন্যাস লিখেছিলেন। এ উপন্যাসগুলির এখন খুব আদর বেড়েছে।

পুশকিন ও লারমনটফের যুগে সমস্ত রুষিয়ার সাহিত্যে একটা নব জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এই যুগে সেখানে ডেলউইগ, ব্যারাটিনস্কি, ইয়জিকফ ভেনোভিটিনফ, প্রিন্স আলেকজন্দর ওডোনভস্কি প্রভৃতি আরও ক'জন বড় কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু পুশকিন ও লারমনটফের কবিতার মধ্যে যে বিশ্বজনীন ভাব ফুটে উঠেছিল, এঁদের মধ্যে তা কিছু ছিল না, তবে এঁরা রুষ সাহিত্যকে অনেকগুণে ধনী করে দিয়ে গিয়েছেন। এই কবিদের মধ্যে অনেককেই জীবনে বহুবার রাজদণ্ড সহ্য করতে হয়েছিল। কেউ কেউ আবার রাজা ও রাজপুরুষদের অত্যাচারে প্রাণে পর্য্যন্ত মারা গিয়েছিলেন।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

সোনার ফ্রেম্

(গল্প)

রায়বাবুদের বাড়ী আমি যখন প্রথম চাক্‌রি নিয়ে ঢুকি, তখন তাঁদের বাগানের মালী বেচন সর্দ্দারের মেয়ে বিলাসী এগারো বছরের, ছোট্ট, এতটুকু। বুদ্ধির প্রভায় উদ্ভাসিত ছোট একটি হাসিমুখকে ঘিরে মস্ত এক বোঝা ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল দেখে মনে হত, যেন কালো অন্ধকারের বুকের মধ্যে পুর্ণিমার চাঁদের টলটলানি!

দিনের মধ্যে একটিবার পুর্ণিমার হাসি রাহুগ্রাসে পড়ে মলিন হয়ে আস্‌ত। সেই যখন তার বড় যত্ন দিয়ে স্নেহ দিয়ে, তার শিশু-জীবনের সমস্ত আগ্রহ নিছিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা পিঙ্ক্‌ প্যান্‌সি যুঁই চাঁপা হলিহক ক্রিসেন্থিমামের গাছগুলোকে নিঃস্ব করে মুড়িয়ে ছোটবাবুর জন্যে তোড়া তৈরি হত, আর ছোটবাবু উপহারের টিকিট লাগানো সেই তোড়া হাতে করে কুলু-খানসামার সঙ্গে বাড়ীর সুমুখকার পথটি দিয়ে নেমে বেড়াতে চলে যেতেন। বাগানের রাস্তা পার হয়ে যাবার পথে সুবিধা পেলেই বিলাসীকে ছোটখাটো একটি ঠোনা, তার চুলের গুছি ধরে একটু টান দিয়ে যাওয়া ছিল তাঁর নিত্য কাজ। বিলাসী তবু কোমরে আঁচলটি জড়িয়ে খুরপি হাতে করে নিঃশব্দে গেটের দরজা অবধি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ত, তারপর লোহার কপাটে ভর দিয়ে ফুলগুলির চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত,—যেন শিল্পীর আঁকা ছবি!

ছোটবাবুর বয়স তখন উনিশ;—যে বয়সে মানুষ নিজেকে ভালো করে জানে না, কিন্তু দুনিয়ার সঙ্গে তার জানাশোনা সুরু হয়ে যায়। কাকে ফুল দিতে হয় আর কার জন্যে কেশাকর্ষণ-ব্যবস্থা, তা-সবই তার জানা আছে, কিন্তু এর কোনোটাই হাত বাড়িয়ে তার মনের নাগাল পায় না। তাই এক-একদিন হঠাৎ ব্যথা পেয়ে বিলাসী যখন উঃ করে ওঠে, বা আঁচলে মুখ ঝেঁপে বড় অপমানের কান্নাকে লুকোবার চেষ্টা করে, তখন ছোটবাবু ছোট্‌বার পথে থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায়। হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে 'ছিঁচকাঁদুনে নাকে...,' বল্‌তে বল্‌তে তার মুখখানি আপনা থেকে কালো হয়ে আসে। পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে বিলাসীর ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটিকে দুই করতলের মধ্যে নিয়ে উঁচু করে ধরে বলে, "তোর লাগ্‌ল, বিলাসী?"

বিলাসীর কান্না লুকানো আর হয় না!...

ক্রমে এমন হলো, ছোটবাবুর হাতে ছোটখাট একটু প্রহার যেদিন তার না জোটে বিলাসীর সেদিন কেমন খালিখালি লাগে। ঘরের কাজে বাগানের কাজে মনটা বস্‌তেই চায় না, কেবল উড়ু উড়ু করে। বাগানের যে পথটা থেকে ছোটবাবুর জান্‌লা

চোখে পড়ে, কেন যে সেখান দিয়ে মৃদু লঘু পদে পহর ধরে সে পায়চারি করে বেড়ায়, তা সে নিজেই ভালো করে জানে না। তার মা জলের কলসীটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মুখ উঁচু করে ডাকে, 'বিলাসী!' জান্‌লাটার দিকে চকিত চোখে একবার ফিরে তাকিয়ে ত্রস্ত হরিণীর মতো সে ছুট দেয়, একেবারে তার মায়ের বাহুমূলে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'যাই মা!'

এই রকম করে কয়েকটা বছর কাট্‌ল। বিলাসীর বয়স এখন ষোল, ছোটবাবুর চব্বিশ। কতদিন যে ছোটবাবু বিলাসীর চুলের গোছা ধরে টেনে দেয়নি, তার চুড়ি ভেঙে দিয়ে তাকে কাঁদায়নি! তার মনের তাচ্ছল্য আজ আত্মোপলব্ধিতে সচেতন, তার আর বিলাসীর মধ্যে একটা জন্মান্তরের তফাৎ; যদিও পৃথিবীর বুকের একটি স্নিগ্ধশ্যামল ছায়াশীতল স্নেহ-নীড়ে, একই বাতাসের স্নেহস্পর্শে, আলোকের সোহাগ-দৃষ্টির নীচে তারা দুটিতে পাশাপাশি বড় হয়ে উঠেছে।... বিলাসীর মন এ তফাৎকে এ ব্যবধানকে মান্‌তে চায় না। তার কেবলি মনে পড়ে সেই পুরানো দিনের কথা, ছোটবাবুর সেই-সমস্ত মমতায় ভরা নির্ম্মমতা, সেই মান অভিমানের হাজারো খুঁটিনাটি! সেগুলোকে এতদিন ধরে এতবার সে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেছে যে তার কোনো তুচ্ছ একটু জায়গার রঙ এতটুকু মলিন হতে পায়নি। তার কেবলি মনে হচ্ছে, এ যেন সেদিন! মাতাল স্মৃতির কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে খেয়ে তার মন প্রতীক্ষার ক্লান্তিকে আমলই দিতে চায় না।

দিনের মধ্যে দুটিবার সে তার দয়িতের দেখা পায়। ঝাঁকড়া চুলের বোঝাটাকে মাথা মতো গুছিয়ে, দু-একটা টকটকে লাল ফুল কাঁপা হাতে মাথায় গুঁজে, মাটি-মাখা হাতটাকে চট করে শাড়ীর প্রান্তে মুছে নিয়ে সে পথের একপাশে সরে দাঁড়ায়। বই হাতে করে তার অত্যন্ত কাছের জায়গা দিয়ে ছোটবাবু চলে যান। তাঁর দুটি চোখের অর্থহীন অলস দৃষ্টি বিলাসীর দুটি ধ্যান-নয়নের উপর এসে পড়েই ঠিক্‌রে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়, কিন্তু ঐটুকুতেই তার কানায় কানায় ভরা সুপ্ত নারীত্ব বন্যাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এ দৃষ্টি যে কত জায়গাতেই কত ভাবে ফেলা-ছড়া করে পড়ে, সে খোঁজ নেবার তার প্রয়োজনই হয় না।

সে কি কিছু আশা করে? রোজ এই দুটিবার চোখের চাওয়ার মধ্যে তাকে পাওয়া ছাড়া আর কোনো নিবিড়তর সুখের ইঙ্গিত তার মনে কি কখনো উঁকি-ঝুঁকি দেয়?

—বলা শক্ত। মন যেমন করে মনকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে চল্‌তে পারে এমন আর কিছু নয়। কোনোরকম বোঝাপড়ার মধ্যে না গিয়েই বিলাসীর ক্ষুদ্র অনাড়ম্বর জীবনটি তার নিজেরই অজ্ঞাতে প্রতীক্ষার মতো হয়ে গড়ে উঠ্‌তে থাকে।...

হঠাৎ একদিন খবর এল, ফুল চাই। ছোটবাবুর ফুলের দর্‌কার হয়েছে। বিলাসীর সেদিন আর ছোটবাবুর কলেজ যাবার পথটিতে এসে দাঁড়াবার সময় হলো না। সারা দিন ধরে কত রকম ফুলে কত তোড়াই যে বাঁধা হলো, একটা যদি তার মনে ধরত! তার অন্তরের পূজা-

নিবেদনের কাছে পৃথিবীর সমস্ত পুষ্পসম্পদ লজ্জা পায় যে! ছোটবাবুর চর বার বার এসে হাঁক ডাক করে অস্থির হয়ে ওঠে, হাতের তোড়াটির উপর নিবিড় চোখে ঝুঁকে পড়ে কাতর মিনতির স্বরে সে বলে, 'আর একটু সময় আমায় তোমরা দাও গো, অত মেহনতের কাজটাকে তাড়াতাড়িতে নষ্ট করতে বোলো না।'

সমস্ত বাগান উজাড় করে সমস্ত দিনে তার মনের প্রেম-প্রসূনের অনুরূপ করে তার শেষ তোড়াটি বাঁধা হয়। বেচনের হাতে করে সেটিকে উপরে পাঠিয়ে, অন্ধকার ঘরে অবাধ্য বুকটার সঙ্গে সে বোঝাপড়া করতে বসে। কিন্তু একদিন দেখা গেল, সেই পুরানো দিনের মতোই টিকিটের নির্দ্দেশ কণ্ঠে নিয়ে তার এত যত্নে গড়া ফুলের অর্ঘ্য বাইরে, রাজপথে জন-প্রবাহের সঙ্গে ভেসে চলেছে। এর পর এত বড় পৃথিবীতে তার ঠিক দামটি বোঝে, এমন কেউ একজন রইল না।...

রোজ ছোটবাবুর ফুলের দরকার হয়, বিলাসীর চোখের সুমুখ দিয়ে তার বুকের শিরা ছিঁড়ে চয়ন করা ফুলের রাশি তার দিকে চেয়ে পরিহাসের হাসি হাসতে হাসতে রোজকার মতো একই পথে চলে যায়। বিলাসী টেনে টেনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তারপর বুকে শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে এসে ক্ষিপ্র হাতে গাছের গোড়ায় নিড়েনি চালাতে থাকে।

তারপর একদিন, যে পথে ফুলগুলি অদৃশ্য হত, সেই পথ দিয়ে একটি সুন্দরী তরুণী দেখা দিতে এলেন। সেই ফুলগুলিই যেন তাদের হাসিকে পেলবতাকে জমাট করে নিয়ে ফিরে এল।—তারই ফুলগুলি!... বাগানের কাজ ফেলে সেদিন সে বড় দুঃখে তার ঘরের কোণে গিয়ে পড়ে রইল।—আর না, ভুল যদি ভাঙল, তাকে গড়বার পণ্ডশ্রম করে নিজের পরাজয়ের আয়ুকে আর বাড়িয়ে দেওয়া নয়! বিলাসী জোর করে চোখের জলকে চেপে রইল।

কিন্তু স্বভাব না যায় ম'লে!—

ঘরের কোণে বসেও গির্জ্জার ঘড়িতে দশটা কখন বাজবে সেইদিকে তার কান পড়ে থাকে যে! ময়লা দেয়ালগুলো স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে গিয়ে তার চোখের সামনে জেগে ওঠে রাজপুত্রের মতো একটি তরুণ নয়ন-মনোহর মূর্ত্তি।—ঐ সে বইয়ের বোঝা বগলে করে সিঁড়ির দু-তিনটা করে ধাপ একসঙ্গে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে নীচে নেমে আসচে।—বাগানের লাল সুর্কি বিছানো পথ তার জুতোর পেষণের তলায় মরমর করে বেজে উঠ্‌চে। শিস্ দিতে দিতে সে চলেছে। যেখানে কৃষ্ণচূড়ার গাছটাকে ঘিরে একটা রাধাঝুমকার পল্লব-বহুল আলিঙ্গন পথের মোড়টাকে আড়াল করে রেখেছে সেইখানে এসে সে থামল।—তার মুখের শিস্ মুখেই থেকে গেল।—ঝুঁকে পড়ে গলা বাড়িয়ে গাছের চারদিকটাকে সে একবার দেখে নিলে, তারপর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে কান খাড়া করে থেকে আবার জুতোর শব্দ করতে করতে শিস্ দিতে দিতে মোড় ঘুরে চোখের আড়াল হয়ে গেল।... বিলাসীর চিন্তাস্রোতকে প্রহত করে তার মা ডাকে, 'বিলাসী, তোর ভাত জুড়িয়ে যায়!'

বিলাসী বলে, 'আমি আজ খাব না মা, শরীরটা ভালো নেই,' বলে পাশ ফিরে শোয়। সেদিনকার জন্যে জীবনটাতে কিছু আর তার প্রার্থনীয় থাকে না।

কয়েকদিন মনটাকে উপবাসী রেখে দ্বিগুণিত ক্ষুধা নিয়ে বিলাসী শেষে একদিন আপনা থেকেই তার বরণ-করা কারাবাস থেকে বের হয়ে এল।—দশটা বাজ্‌তে তখনো বাকী আছে। কৃষ্ণচূড়ার গাছটার তলায় ঝরা পাতার ভিড় দেখে তার চোখ ফেটে কান্না আস্‌ছিল। বাগানের আনাচে-কানাচে ঝোপে-ঝাড়ে জঙ্গলে বিলাসীর এই কদিনকার অনুপস্থিতি উদ্বেগের মতো হয়ে আঁকা পড়েছে। এ উদ্বেগ যেন আরো একজন কার—

কিন্তু গির্জ্জার ঘড়িতে দশটা—এগারোটা—বারোটা বেজে গেল, সেই 'একজনের' তবু দেখা নেই! বিলাসী ভয়ে ভয়ে বাড়ীটার চারপাশ ঘুরে এল, বাড়ীতে জনমানুষের সাড়া নেই, সব জান্‌লা গুলো বন্ধ। তার মনে হতে লাগ্‌ল, যেন তার অনুপস্থিতির ফাঁকে তার সমস্ত অতীত জীবনটা তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে চুপচাপ সরে পড়েছে। তার বাবা দুহাতে একটা বড় কাস্তে চালিয়ে চালিয়ে ম্যাগ্নোলিয়ার গাছের চারিদিককার ঘাসের জমিটুকুকে সমান করে ছেঁটে দিচ্ছিল, তার কাছ থেকে খবর নিয়ে সে জান্‌লে ছোটবাবুর বিয়ে,—তাই রায়বাবুরা ছেলেপিলে নিয়ে তাঁদের দেশের বাড়ীতে চলে গেছেন, হপ্তাখানেক পর বিয়ের গোলযোগ মিটুলে আবার সহরে ফির্‌বেন।

বিলাসীর জান্‌তে ইচ্ছে হলো, কবে গেছেন। তখন কি তার অভিমানের অনাদর কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়, রঙনের ঝোপে ঝোপে, গন্ধরাজের ঝাড়ে ঝাড়ে রুক্ষ হয়ে ফুটে ওঠ্‌বার অবসর পেয়েছিল? কিন্তু জিজ্ঞাসা কর্‌তে তার সাহস হলো না। শাড়ীর আঁচলটাকে ভালো করে কোমরে জড়িয়ে একটা কাঁচি নিয়ে রঙনের সারির বাড়্‌তি পাতাগুলোকে সে ক্ষিপ্র হাতে ছেঁটে দিতে লাগ্‌ল।

সেদিন সূর্য্যাস্তের আগেই সারা বাগানটার হারানো শ্রী আবার পুরোপুরি ফিরে এল। সমস্ত বাগানটাতে কোথাও একটি শুক্‌নো ঝরা পাতা অথবা পাপ্‌ড়ি-ঝরা ম্লান ফুলের চিহ্ন রইল না। মেহেদির সার দিয়ে ঘেরা তকতকে ঘাসের জমিগুলির উপরে দিন-শেষের সোনালি আলোর রেশগুলি যেন ছুটোছুটি করে গড়াগড়ি দিতে এল।

ছোটবাবু সপরিবারে দেশ থেকে যখন ফিরে এলেন তখন বাগানের পথে পা দিয়ে তাঁর মনে হলো, তাঁর হৃদয়াধিকারিণীর বাসের যোগ্য বটে! তরুণী বধূর বুকটি আনন্দে গর্ব্বে দুরু দুরু কেঁপে উঠ্‌ল। কেউ জান্‌লে না কত বড় আত্মঘাতী একটা ফাঁকির মুখোস এর পাতায় পাতায়, এর ফুলে ফুলে। কত বড় বেদনার অশ্রুনিষেকে এর এই সতেজ শ্যামল স্বাস্থ্য।

মানুষের নিজের উপর নিষ্ঠুর হবার যত-খানি সুবিধা আছে, অপরের বেলায় তত নাই, তার কারণ নিজের বুকের মধ্যেকার বেদনা-বোধের অন্ধিসন্ধি তার একেবারে তন্ন তন্ন করে জানা থাকে। বিলাসী আজ ছোটবাবুর খাসমহলের ঝাড়ুদারণী। রাত্রিশেষে বাসক-

উৎসবের অবশেষ ছিন্ন মালার ফুল তাকে ঝেঁটিয়ে সাফ করতে হয়, ঘরের মেঝেতে ছোট একটি দুটি অলক্তক-চিহ্ন তাকেই আঁচল বুলিয়ে মুছ্‌তে হয়, সে দাগ শোণিত-চিহ্ন হয়ে তার নিজের বুকে আঁকা পড়ে।

যার জন্তে তার এই দুঃখের সাধন, দিনান্তে একটিবার সে তার দেখা পায় না। কলেজের পালা চুকেছে।

তারপর একদিন, ভোর থেকেই দিনটা কেমন মেঘাচ্ছন্ন, ঘোর-ঘোর। সমস্ত আকাশ ভরা একটা বুককাটা থম্‌থমে কান্না। এমন দিনে চারিদিকটা এ-রকম নিবিড় হয়ে চেপে আসে, যে দুর্লভ প্রিয়তমকেও অত্যন্ত কাছে, একই মেঘাবেষ্টনের মধ্যে অনুভব করে মন উদাস হয়ে ওঠে! পাশের ঘরে তরুণী বধূ অর্গান বাজিয়ে গান ধরেছে—

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা······

ওগো, নিজে মিলনকে পরিপূর্ণ করে পেয়ে কোন্ হতভাগিনীর লুকানো মনের অব্যক্ত মিলনাশাকে বাইরে টেনে এনে তোমার এই পরিহাস? মরে গিয়ে অশ্রুর অতলতায় সে আশার ত সমাধি হয়ে গেছে গো, আকাশ-ভরা আলোর এক কণাও সেখানে গিয়ে পৌঁছোয় না! বিলাসীর শিথিল হাতের মুঠো থেকে ঝাড়ুগাছটা খসে পড়ে গেল, দুহাতে বেদনাতুর বুকটাকে চেপে ধরে একটা শিকোনারের উপর মাথা গুঁজে কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল। ছোট বাবুর সোনাবাঁধানো ছোট একটি ফটোগ্রাফের দুমুখে তার এলানো কালো চুলের বোঝাটাকে মনে হচ্ছিল, তার অন্তরের সঞ্চিত নৈরাশ্যের নিবেদন।

মাথা তুলে বিলাসী ছবিটিকে প্রথম দেখ্‌লে। ফ্রেমের সোনাটাকে অন্যরকমে ব্যবহার করা হবে বলে সেটাকে সেই দিনই বাইরে বের করে রাখা হয়েছিল। দুহাতে সেটাকে খাব্‌লে নিয়ে বিলাসী ভয়ে ভয়ে একবার চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লে, তারপর মাটির উপর জানু পেতে বসে নির্ণিমেষ চোখে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। চোখ দুটি ছাড়া তার আর সমস্ত অঙ্গ তখন কাঁপ্‌ছিল। আলো লেগে ছবিটা ফিকে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে, তবু সেটাকে দৃষ্টি দিয়ে গ্রাস করতে তার ইচ্ছে যাচ্ছিল। হায়রে ভোগ, চোখের একেবারে কাছে আন্‌লে সব ঝাপ্‌সা হয়ে যায় আবার একটুখানি দূরে রেখেও তৃপ্তি হয় না।

হঠাৎ খট করে কিসের একটা শব্দ হতেই ছবিটাকে তাড়াতাড়ি জায়গামতো রেখে দিয়ে ঝাড়ুগাছটাকে উঠিয়ে নিয়ে সে আবার ঘর ঝাঁট দিতে লাগ্‌ল।

সমস্ত দিন সেই ছবি তার মনটাকে পেয়ে বসে রইল। আরো দিন-দুই ছবিটাকে নেড়েচেড়ে দেখে একদিন সূর্য্যাস্তের আধ-আলো-অন্ধকারে সে সেটাকে চুরি করলে।

চুরি, হাঁ চুরিই ত। ছবির মুখে ঐ যে অস্ফুট হাসিখানি, এ ত তার জন্তে হাসা নয়। এর দিকে চাইতে গেলে চোখের জল যে দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে দেয়।...তবু সে যে তার প্রিয়তমের জন্তে এই চুরি করেছে তাই ভেবেই চুরি তার গর্ব্বে ভরে উঠ্‌ল। যাকে জীবন ভরে কিছু দেওয়া চল্‌বে

না, তার জন্যে অপরাধ করেও কতক সুখ!

কিন্তু বিনা-অপরাধেই চোখের জলের জোয়ার যার ঘোচে না, সে যে অপরাধ করে সুখ ভোগ করবে, ন্যায়ের দেবতা এ কিছুতেই সইতে পারেন না। রায়বাবুদের বাড়ীর পাইক এসে তার জীবনের সবার বাড়া সুখের সঙ্গে সবার বাড়া লজ্জাকে টেনে বার করলে সমস্ত জগতের চোখের সামনে। সে যে চোর, আজন্ম রায়বাবুদের খেয়ে পরে তাঁদের সোনায় লোভ করে, এ কথাটা জানাজানি হয়ে গেল; কিন্তু যে সত্যটি লুকানো রইল একখানি ক্ষুদ্র বুকের পঞ্জরাস্থির অন্তরালে,রক্তগতির ভাষার মধ্যে,—আকাশের আলোয় ছলছল চোখ নির্নিমেষ হয়ে তার উপর ফুটে রইল, সে খবর আর কেউ জানলে না!

ছোটবাবু বেচনকে ডেকে বললেন, 'বিলাসীকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি, সে শেষটায়...'

বেচন মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে বললে, 'দোষ তার নয় হুজুর, বুড়োবয়সে এ দুর্মতি আমিই তাকে দিয়েছি।'

ছোটবাবু ভেবে বললেন, 'কিন্তু তুমি যে আমার অনেকদিনের পুরানো চাকর, তোমাকে ছাড়িয়ে দিই কি বলে?'

সে বললে, 'আমায় ত ছাড়তেই হবে। লোকে চোর বলে আঙুলে ইসারা করবে, এ সয়ে ত আমি থাকতে পারব না, হুজুর।'

তারা যেদিন যাবে, ছোটবাবুর পত্নী সুলোচনার সেদিন চুল বাঁধতে মন উঠল না। ভাবনায় অবসন্ন শরীরটি নিয়ে স্বামীর পাশে ঘেঁসে এসে বসে তিনি বললেন, 'বিলাসী চুরি করবে, এ আমি বিশ্বাস করিনে...এ আরেকটা কিছু...তোমরা জানো না...'

ছোটবাবু তাঁর কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন।—কিন্তু হাসতে তাঁর কেমন ইচ্ছে হচ্ছিল না।

সমস্তটা দিন ভেবে ভেবে বিকেলের দিকে বিলাসীকে চুপি চুপি তিনি ডেকে পাঠালেন। সে এলে ফ্রেম থেকে নিজের ছবিটাকে খুলে টেবিলের উপরকার বাক্সে কাগজের ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে, সোনার শূন্য বেষ্টন-টাকে তার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, 'এ জিনিষটি তোমাকে আমি দিচ্ছি; এরপর আর কারুর কিছুতে লোভ করো না।...'

এক মুহূর্ত্ত বিলাসীর চোখদুটো জলে উঠল। তখনি সেটাকে দমন করে স্থির অকম্পিত গতিতে এক পা এক পা করে সে এগিয়ে এল। তারপর হাত বাড়িয়ে জীবনে এই প্রথম প্রিয়তমের হাত থেকে পাওয়া তার পরম পুরস্কারকে সে গ্রহণ করলে, তার চরম শাস্তিকে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।
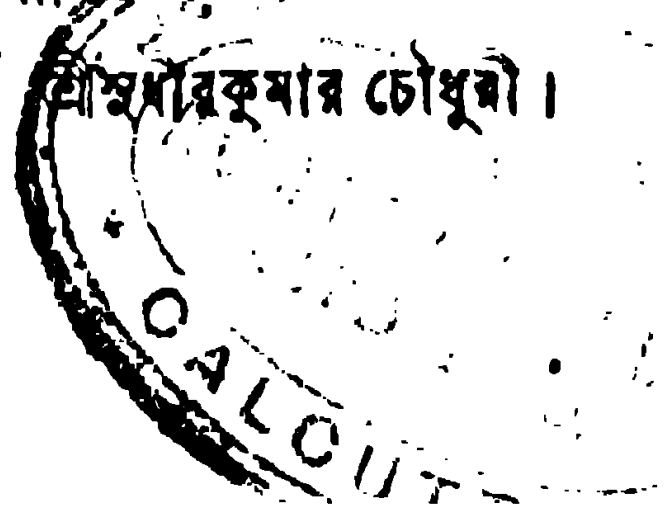
তিলক

অটল যে-জন দাঁড়িয়ে ছিল অনেক নির্য্যাতনে
মর্য্যাদারি মৌন ধ্বজা তুলে,
প্রতিষ্ঠা যার লক্ষ লোকের নিষ্ঠাপূত মনে,
চিতায় শুয়ে আজ সে সিন্ধুকূলে!

মারাঠা যার চরণ-পীঁড়ি,—কীর্ত্তি দিগ্বিদিকে,
দৃষ্টিতে যার উঠ্‌ত কমল ফুটে,
বাংলা-মুলুক সত্যি ভালো বাস্‌ত যে বর্গীকে
নেই রে সে আর হৃদয় নিতে লুটে!

তীর্থ হ'ল কয়েদখানা যাহার ইন্দ্রজালে,
নির্ব্বাসনে কাঁপ্‌ত না যার হিয়া,
দিল যে-জন দীপ্তি-তিলক দৃপ্ত দেশের ভালে
বজ্র-মেঘের বিদ্যুতে নিছিয়া;—

'কেশরী' যার বাহন ছিল—দোসর দেশের শুভ,
স্বাতন্ত্র্যে যে ছিল রাজার মত,
'স্বরাজ' ছিল স্বপ্ন যাহার, স্বদেশ-প্রীতি ধ্রুব,
সেই মহাপ্রাণ আজ্‌কে মরণ-হত!

সাঁচ্চা পুরুষ-বাচ্চা সে যে মর্দ্দ তেজের ছবি—
নয় কোনোদিন ত্রস্ত জুজুর ভয়ে;
ভিক্ষা-পন্থী নয় ভিখারী, নয় সে প্রসাদ-লোভী,
স্পষ্ট কথা বল্‌ত ঋজু হ'য়ে।

খোসামোদের তোষাখানায় ছিল না তার ঠাঁই,
আড়াই-কড়ার অনারেবল্ নয়;
সে ছিল লোক-মান্য তিলক, তুলনা তার নাই,
জাতীয়তার তিলক সে অক্ষয়!

হৃদয়ে তার নিত্য-উদয় শক্তিরূপা মাতা,
ললাটে তার বেদের সরস্বতী;
ভারত-রণের রথী ক'রে গড়েছিলেন ধাতা—
ছত্র-চামর-বিহীন ছত্রপতি!

ভুল-সময়ে এসেছিল হঠাৎ কেমন ক'রে,
বিদায় নিল তেম্‌নি আচম্বিতে,—
খুঁজ্‌ছে যখন দেশের হৃদয় খুঁজ্‌ছে সকাতরে
যুগের যজ্ঞে পৌরোহিত্য নিতে।

কারার শেষে ঘরে এসে পায়নি সে যার ত্থাথা,
সেই সতী আজ ডাক দিয়েছে বুঝি,
বৈতরণীর তরণীতে তাই পাড়ি দ্যায় একা
তারার আলোয় পায়ের অঙ্ক খুঁজি'।

চ'লে গেল ডুবিয়ে মশাল ভরা ঘিয়ের ঘটে
স্বদেশ-প্রেমের সজীব মন্ত্র দিয়ে।
চলে গেল কর্ম্মী ত্যাগী, অস্ত-সাগর-তটে
শরীর রেখে হঠাৎ ছুটি নিয়ে।

চ'লে গেল মৃত্যু-পারে, রেখে অমর-স্মৃতি,
যম-জয়ী যে তার জীবনের ভাতি,
ভবিষ্যতের অন্ধকারে তার সে ভারত-প্রীতি
জাগ্‌বে যেমন বাতি-ঘরের বাতি।

তার সে চিতার ভস্ম-কণা উড়ে হাওয়ার ভরে
পড়্‌বে যেথা নূতন তিলক হবে,
শ্মশান-শিবা যতই বলুক, সত্য-শিবের বরে
কীর্ত্তি তাহার অমর হ'য়ে রবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

৩

খোকাকে বিলেত পাঠাতে হলো। সে সুখ্যাতির সঙ্গে গণিত-শাস্ত্রে এম, এ পাশ করেছিল। তার মনের বড় বাসনা যে কেম্ব্রিজ থেকে সিনিয়র র‍্যাংলার হয়ে আসে। লোকে লাউ গাছটিরও ফুঁপি উঁচু হলে মাচা বেঁধে দেয়—আর আমি এমন ছেলের সদিচ্ছাটা কি করে অপূর্ণ রাখি! কিন্তু খরচ-পত্রের বিস্তর কাট-ছাঁট করে দিতে হলো। স্ত্রী আমার গোড়ার কয়েক মাস সেটা গায়ে সইলেন; কিন্তু পরে তাঁর জিহ্বার ধার ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠল। লীলার সাধগুলোও ত পূর্ণ করতে হয়—সে কত আদরের মেয়ে! মিনির সাজ-গোজের যতই কেন নিন্দা হোক্ না—তার অন্ধ-অনুকরণ খুব প্রবলভাবেই চল্‌লো। লাভে হতে কাঁটাল ভাঙ্গার যা-কিছু রোক-ঝোঁক, সে সবই আমার মাথায় এসে পড়তে লাগ্‌ল।

মানুষকে অর্থের চিন্তা সব-চেয়ে শীঘ্র বিকল করে দেয়; বছর দুয়েকের মধ্যে আমি যেন রীতিমত জরাগ্রস্ত স্থবির হয়ে পড়লাম। যে দেখে সেই বলে—দিন কতক ছুটি নিয়ে দার্জ্জিলিং কি সিমলা গেলে হয় না? হায় রে! ছুটি নিলে পেট চলে কোত্থেকে? সবাই মনে করে, আমার ঢের টাকা—কেবল কৃপণতা করে' আমি শরীরটা মাটি করতে বসেচি! ছুটি যতদিনে ভগবান না দিচ্ছেন—ততদিন এই জীর্ণ দেহটিকে এমনি করেই চালাতে হবে, দেখ্‌চি।

পারুল আমার উপর মোটেই প্রসন্ন নন্। তার প্রধান ক'টা কারণ আমি অনুমান করতে পারি। প্রথম, বিজ্ঞান কলেজে আমার বই-গুলোর উপস্বত্ব দিয়ে দেওয়া। মানুষের জীবনে এক একটা শুভযোগ আসে—সে সময়ে আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা থাকে না! পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা থেকে বহু-উর্দ্ধে উঠে পড়ে এমন সব কাজ সে করে বসে, যার একদিকে হাঁক-ডাকের যেমন শেষ থাকে না, তেমনি আবার অপর দিকে গঞ্জনাও অসহ্য হয়ে ওঠে! সরকার বাহাদুর আমার এই ত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ আমাকে স্যর উপাধিতে ভূষিত কর্‌লেন—আর ভিতরের দিক থেকে অন্দরের মনিব বাক্যশরে জর্জ্জরিত করতে এক মুহূর্ত্তের জন্য ত্রুটি করলেন না। দুঃখ, দেবতা আমাকে কেন ইচ্ছা-মৃত্যুর বরটা জন্মের সঙ্গে দিয়ে দেন নি!

তাঁর দু'নম্বরের অভিযোগ এই যে আমি প্রাইভেট প্রাক্‌টিশ একেবারে পরিত্যাগ করেচি! দেশ-বিদেশে যার এত নাম, সে কি ইচ্ছা করলে অন্ততঃ দুটো একটা ডাকও পায় না? হয় ত পাওয়া যেত! কিন্তু মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করতে কোন দিন আমার প্রবৃত্তি হয় না! শরীরের তত্ত্বটা এত জটিল, আর তার ধর্ম্ম আর কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধেও এত মত-ভেদ আছে যে বিবেক-বুদ্ধিকে অক্ষুন্ন রেখে কোন কাজই করা চলে না। অন্ধকারে ঢিল ফেলা বিজ্ঞানের পথ নয়; তাই ঐ কাজটি আমার কোনদিন করতে সাহস হলো না। নিছক

পরের কল্পনার উপর কাজ করা যে কত কঠিন, তা ডাক্তার মাত্রেই জানেন; এ কাজ করলে পরিবারবর্গ বিশেষত স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা যায়, সত্য বটে; কিন্তু বিবেককে গলা টিপে হত্যা করা পাপের শাস্তি, অনুতাপের, আত্মগ্লানির তুষানলের কথাই বা না ভেবে থাকি কেমন করে! কেউ ইহ-জগতের লাভটাকেই পরম লাভ বলে মনে করে; কেউ তা পারে না। মানুষের রুচি বিভিন্ন। তা নিয়ে মারামারি করা চলে কি!

তিন নম্বরের অভিযোগটি খুব হালের, সেটি লীলার বিবাহ-সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য! যে কাজে আর পাঁচজনের আগ্রহাতিশয্য ঘটেচে, তাতে মাথা গলানো আমার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। জীব-তত্ত্ব আলোচনা করে দেখি যে বাল্য বিবাহ স্ত্রী-জাতির প্রকৃতি-বিগর্হিত। অপরিণত বয়সের মস্ত বাধা যে স্ত্রী-পুরুষের মানসিক অবস্থার বৈষম্য। বাইশ বছর বয়সের আগে নারীর সন্তান-লাভের কামনা প্রায় ঘটে না; এই আকাঙ্ক্ষাটা উদ্রিক্ত হবার আগে নারী গর্ভবতী হলে বুঝতে হবে যে পুরুষের লালসা কাঁটালকে কিলিয়ে পাকিয়েছে! এমন অকাল-পক্ক ফলের কি দুর্গতি হয়, তা' সবাই জানেন। এ সব কথা জীব-বিজ্ঞানের প্রথম পৈঠের কথা—এ সব সিদ্ধান্ত বলে বহুদিন আগেই চলে গেছে—এ নিয়ে আর অযথা তর্ক করা চলে না।

তাই আমি লীলার আশে-পাশে যুবক-দলের ঘুরে বেড়ানোটা দু-চক্ষে দেখতে পারিনে; কিন্তু আমার কথা কে শুনবে! স্ত্রী আমার যা-কিছু বোঝেন এবং জানেন,—তা মোক্ষম ভাবেই। স্ত্রী-জাতি যে কত বড় একগুঁয়ে রক্ষণশীল জাত, তা না ঠেক্‌লে বোঝা যায় না!

এ সবের উপর বেশী বিকল করেচে আমাকে মিনির ব্যাপারটা। তাকে কেউ অপমানে পীড়িত করবে, এমন কথা মনে করলেও আমার অন্তরে কেমন একটা অশান্তি জেগে ওঠে। সে অশান্তির মাত্রা বেড়ে গেলে উন্মাদ পর্য্যন্ত হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নয়!

কাঁচের উপর ফাট ধরলে যেমন সেটা বেড়েই চলে, সেটা মিলিয়ে আগের মত হওয়ার অযথা আশা যেমন কেউ করে না, আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী এবং কন্যার পার্থক্যটা যখন বেড়েই যেতে লাগ্‌ল, তখন তাদের সঙ্গে মিল হবার কথাটা আমি পাগলের দুঃস্বপ্ন বলেই মনে করি! কারণ, অকারণে যারা প্রমত্ত হয়ে অহঙ্কারের চাবুক দিয়ে আশ-পাশের চারিদিককে আঘাতের উপর আঘাত করে' ক্ষুব্ধ করে তোলে—তাদের সঙ্গে জগত আর মিট্‌মাট্, কি কোন রকম একটা রফা করতে কিছুতেই রাজী হয় না। বিরোধের গহ্বরটা শেষ বৃহৎ হয়ে তাদের জঠরের মধ্যে কবলিত করবার এমন প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে টান্‌তে থাকে যে কিছুতেই তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় না।

যাদের সঙ্গে বিরোধ, তাদের ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী দুর্গতির কথা চিন্তা করে সাধারণ মানুষ ঠিক খুসী হতে পারে কি না জানিনে, কিন্তু আমার পক্ষে সেটা যে হয় নি তা' আমি স্পষ্ট অনুভব করেচি। এই

দুশ্চিন্তার উত্তাপ, চৈত্র-বৈশাখের অসহ্য তাতে আমের কসুড়ি যেমন হলদে হয়ে ওঠে, আমাকেও তেমনি অকস্মাৎ এমন করে বুড়ো করে দিয়ে গেল যে আমার পৃথিবীর সঙ্গে বিয়োগটা যে অতি-নিকটে, তা আমি পরিষ্কার উপলব্ধি করলাম। আমার দেহের সমস্ত সরসতা নিমেষে লুপ্ত হয়ে গেল,—আমি যেন হঠাৎ জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কুঁকড়ে ছোট্টটি হয়ে গেলাম। যাদের চোখে অহঙ্কারের ঠুলি পরা থাকে, তারা এ সব দেখ্‌তে পায় না। মিনি কিন্তু এটা পরিষ্কার দেখ্‌তে পেয়েছিল—তাই আমাকে নিয়ে তার ভাবনা-চিন্তার আর অবধি ছিল না!

একদিন সন্ধ্যার সময় মিনি এসে চুপ্‌টি করে ইজি চেয়ারটায় বসে রইল। তাকে দেখে আমার ভারী আনন্দ হলো—ঠিক যেমন একজন বিদেশে পথ হারিয়ে ফেলে সমস্ত দিনের পরিশ্রান্তির পর প্রিয়জনকে দেখ্‌তে পেয়ে চোখের জল না ফেলে থাক্‌তে পারে না—আমার অবস্থা তেমনি হলো—তাকে দেখে আমার চোখের জলের শুক্‌নো গাঙে বান ডাকবার উপক্রম হলো! কষ্টে সেটা চেপে আমি হাস্‌তে লাগলাম।

"আজ হঠাৎ অসময়ে যে?"

মিনি হাস্‌তে লাগ্‌লো—"আপনার সঙ্গে কথা কবার জন্যে আজ কেমন ভারী ইচ্ছা হচ্ছিল—তাই চলে এলুম-সটান্।"

"আচ্ছা,একটু রসো—একটু সবুর করতে হবে। কিন্তু আধ ঘণ্টার বেশী সময় আজ তোমাকে দিতে পারব না।"

"কেন?"

"আমাদের পুঁজিতে সময়টা ত আর খুব বেশী নেই—তাই এই খরচ-পত্রে এত নজর রেখে চল্‌তে হয়।"

দুজনেই হাসি-ঠাট্টার ভাবে কথা কচ্ছিলাম। হঠাৎ মিনির মুখটা অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল। সে ধীরে ধীরে কাছে এসে বল্লে, "কাকা, সত্যি আপনি দিনকের দিন এত কাহিল হয়ে পড়চেন যে আপনাকে জোর করে ছুটি নেয়ানো বিশেষ দরকার হয়ে পড়েচে।"

"ছুটি!" বলে আমি একটু হাস্‌লাম,—"ছুটির দিন ত সন্নিকট হয়ে আস্‌চে, মা!"

"কি সব কথা যে আপনি বলেন, ছাই-পাঁশ!" তার চোখদুটো ভারী হয়ে উঠ্‌ল।

"তবে কি চাও করতে তোমার এই বুড়ো ছেলেটিকে নিয়ে?"

"আর আমি কিছুতেই আপনার কোন কথা শুনতে চাইনে। এই গরমের ছুটির সঙ্গে আরো অন্ততঃ তিন মাসের ছুটি নিয়ে আপনাকে আমাদের সোদপুরের বাগানে গিয়ে থাকতে হবে—আমি সঙ্গে থাক্‌ব—আর কারো যদি ইচ্ছা হয় যাবেন। আমি এই চার-পাঁচ মাসে দেখিয়ে দেব যে, যত্ন করলে ঐ শরীর আবার কত ভাল হয়ে উঠতে পারে।"

আমাদের যখন এই সব কথাবার্তা চল্‌চে—তখন নীচে থেকে হাসি-ঠাট্টার গর্‌রার আওয়াজ উঠে আমাদের প্রায় বধির করে দেবার উপক্রম! লীলার বন্ধু-বান্ধবরা আজ-কাল সন্ধ্যার সময় অমনি করে থাকেন। কিছু বলবার জো নেই! ওর ভিতর কয়েকজন যুবক লীলার পাণিগ্রহণের মতলবেও আসেন না কি! তাদের সর্দ্দার মোহিতমোহন আমার

স্ত্রীর সমধিক পরিচর্য্যাভোগী,—সন্ধ্যার পর তিনি কন্যাকে সঙ্গদান করেন এবং এখানেই আহারাদি শেষ করে তবে বাড়ী ফেরেন! এই ব্যপদেশে রাত্রের আহারের ব্যবস্থাটা খুব প্রয়োজনীয় খরচ বলেই মনে করা হয়।

এতটা সময়ের মধ্যে আমার খোঁজ-খবর নিতে কেউ একবার এদিকে এলেন না। তার দরকার নেই! আমার সঙ্গে সংসারের সম্পর্ক শুধু টাকার; আমার বাঁচা-মরা সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করবার ফুরসৎ ওঁদের হয় না।

মিনি কতকটা রাগ করেই বল্লে, "এই ত যত্ন-আর্ত্তি! এর জন্যে কাকা আপনাকে আর এখেনে পড়ে থাকতে হবে না। আমি কালই সোদপুরের বাড়ীর ব্যবস্থা করচি— যত শীঘ্র পারি আপনাকে নিয়ে সেখেনে যাব।"

তার কথার ভিতর এত জোর, এত আন্তরিকতা ছিল যে বশ্যতা স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।

আমি বল্লাম, "বেশ, তবে তোমার কাকিমার সঙ্গে কথা কয়ে নেওয়া দরকার —হাজার হোক্ তিনি বাড়ীর গিন্নী ত।"

মিনি কতকটা ব্যস্ত হয়ে উঠল, বল্লে, "চলুন, তবে একবার নীচে যাওয়া যাক্।"

দুজনে নীচে নেমে গেলাম।

আমার স্ত্রী আর মোহিতমোহন তখন খুব কাছাকাছি বসে কিসের খুব গম্ভীরভাবে যেন গোপন পরামর্শ করচেন! খানিকটা দূরে লীলা আলোর সামনে একটা বই খুলে বসে আছে,—তার কাণ আর মন কিন্তু এঁদের গোপন পরামর্শটা শুনে নেবার আগ্রহাতিশয্যে ভীষণ উৎকণ্ঠিত!

আমাদের দেখে দুজনে যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। মোহিত উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রণাম আর সেলামের মাঝামাঝি কি-একটা করলে। আমি মাথাটা সামান্য নীচু করে কাছের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। মিনি তার কাকিমার সঙ্গে কথা সুরু করে দিলে।

"ওটা কি বই লীলা?"

"একখানা ফ্রেঞ্চ নভেলের ইংরিজি, বাবা, মোহিত বাবু এনে দিয়েছেন—আমি পড়িনি, শুধু পাতা উল্টে দেখচি, কেমন বই।" লীলার কথায় অপরাধীর স্বরের মত একটা জড়তা ছিল।

"কই, দেখি কি বই?"

মোহিতমোহন কথা আরম্ভ করলেন, তাঁর কোন বিষয়ে বিজ্ঞতার অভাব ছিল না।

"ফ্রেঞ্চ নভেলগুলোর এইটে মস্ত গুণ, যে সেগুলো জীবনের সত্যকে বিনা-দ্বিধায় প্রকাশ করে। লুকোচুরি জিনিষটাকে এই জাতটা একদম্ ঘৃণা করে।"

আমি দিনকতক ফ্রান্সে ছিলাম, তাই এই জাতের সঙ্গে নিতান্ত অপরিচিত নই—মোহিতমোহনের কথা শুনে আমার যেন রাগ হয়ে পড়ল। মানুষের আর সব সহ্য করা যায় কিন্তু মূর্খতার ধৃষ্টতা অসহ্য!

কথার উত্তর দিলাম না। ইতিমধ্যে লীলা কখন্ বইখানা নিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে চলে গেছে—স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, সে এই যুবকটির ইঙ্গিতেই।

লীলা ফিরে এসে অর্গানে বসলো।

"বাবা, একটা নতুন বেহাগ শিখেচি।

"বেশ, শুনি, গাও।"

মোহিত রিষ্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বল্লে, "এখনো বেহাগ গাইবার সময় হয়নি। আধ ঘণ্টা দেরী আছে।"

লীলা দ্বিধাক্রান্ত হয়ে বসে রইল।

পাঠশালার ছাত্রেরা যেমন গুরুমহাশয়ের কথার একটু নড়-চড় করতে রাজী নয়, লীলাকেও দেখ্‌লাম ঠিক সেই অবস্থা প্রাপ্ত। সে মোহিতকে ঠিক তেমনি মানে—আর ভয়ও করে যেন!

এমন সময় আমাদের ডাক হলো।

হঠাৎ মিনির উপর আমার স্ত্রীর সৌজন্য দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। তিনি তাকে খাবার জন্যে বিশেষ জেদা-জেদি করে রাজী করালেন!

মানুষকে চিন্‌তে হলে, সে কতদুর স্বার্থপর হতে পারে তার একটা আন্দাজ, কি ধারণা করে নেওয়া দরকার। আজ মিনির এই খাতিরটুকুর অর্থ, সে আমাকে তার সোদপুরের বাগান বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায় বলে।

দিন কতক থেকে আমার স্ত্রীর একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখ্‌চি; তিনি আমাকে নিজেই ক'দিন বায়ু-পরিবর্ত্তন করতে যাবার কথা বলেচেন। আমার শরীরের উপর এতটা যত্ন তাঁর কোন কালে ছিল না! মিনির এই প্রস্তাবটা তিনি সহজেই অনুমোদন করেচেন; তবে আমার সঙ্গে আপাততঃ মিনিকেই যেতে হবে; কারণ লীলার কলেজ বন্ধ হয় নি। গ্রীষ্মের ছুটি হলে তিনি আর লীলা সোদপুরে গিয়ে থাক্‌বেন।

আমি এক পাশে বসে মানুষের চিরদিনের অরুচিকর খাবারগুলি খেতে লাগ্‌লাম। রাত্রে আমার ভাগ্যে সাগুর হালুয়া আর দুধ জুটত। কিন্তু আমাদের কোন খেদ মোহিত মোহন রাখ্‌লেন না। মনে হলো, তিনি বুঝি জীবনের শেষ খাওয়া সেই রাত্রেই খেয়ে নিচ্চেন! তবুও আমার স্ত্রী অশেষ-বিধ অনুযোগ করলেন। হয় তিনি লজ্জা করে যাচ্চেন নয় তাঁর শরীর ভাল নেই; কারণ অন্য দিনের অনুপাতে সেদিনের খাওয়া নাকি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়!

মোহিতমোহন খুব দ্রুত খেতে পারেন এবং তাঁর জঠরে খাদ্য-সামগ্রীর স্থানের কোন অকুলান হয় না। যারা বেশী খায়, তাদের আমি ও চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে। তার কারণ আমার মনে হয় যে তাদের কোন জিনিষে সংযম আস্‌তে পারে না। মানুষের আহারের সংযমটা জীবনের শিক্ষার প্রথম পাঠ হওয়া উচিত। আহারের সঙ্গে শরীরের সমস্ত জিনিষের এমন একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে যা' কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। যারা আহারে সংযত হতে পারে না, তারা অনেক সময়েই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হয়। এই ছেলেটির কথায় ছিল না সংযম, আহারেও তাই; কিন্তু কি গুণে যে আমার বাড়ীতে এত-বড় প্রতিষ্ঠা তিনি লাভ করেছেন—তা ভেবেই পাইনে! চেহারাটা সুন্দর বটে আর তার চেয়ে বড় গুণপনা,—তাঁর বাপের সম্পত্তি নাকি অগাধ!

খাওয়া-দাওয়ার পর মিনি বল্লে, "চলুন মোহিত বাবু, আপনাকে পৌছে দিয়ে যাই।"

মোহিতের হাসিটা এক কাণ থেকে আর এক কাণ পর্য্যন্ত মেঘের উপর বিদ্যুৎ-প্রভার মত বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

"বেশ ত চলুন না।"

এই প্রস্তাবটা আমার স্ত্রীর কিন্তু মোটেই ভাল লাগেনি; তাঁর মনের অস্বস্তিটা দেহের উষ্‌খুস্‌নিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তিনি বল্লেন, "মোহিত, আরো একটু অপেক্ষা কর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা দরকারী কথা আছে।"

মোহিত তাতেও খুব রাজী।

আমি বল্লাম, "তোমাকে পৌঁছে দিতে আমি খুব প্রস্তুত কিন্তু ঘোড়াগুলোর অতিরিক্ত হায়রাণি হবে।"

মোহিত বল্লে, "কেন, ফেরবার সময় একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবেন।"

মিনি বল্লে, "তার চেয়ে আর একটা সহজ উপায় আছে—যদি কাকিমার মত হয়।"

"কি?" একটু আগ্রহের সঙ্গে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

"কাকা আজ আমার ওখানেই রাত্রে থাকবেন; ভোরে চলে আস্‌বেন; তাতে কারুর কোন অসুবিধা হবে না।"

"বেশ ত,আমি কি ওঁকে বেঁধে রেখেচি! ইচ্ছা হয়, যান্ না কেন! সাত'শ খুঁটি-নাটি, ওঁর নিজেরই কষ্ট হবার ভয়ে টিক্ টিক্ করে মরি।"

"তবে চলুন, কাকা, কাকিমার মত হয়েচে।"

আমরা দুজনে গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম।

গাড়ীর ভিতর বসে মনটা কি জানি কেন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। যে জিনিষে আমার আনন্দ, কিন্তু পরের নিরানন্দ, তা' নিরবচ্ছিন্ন সুখের সঙ্গে উপভোগ করা শক্ত। কাঁটার মত কি একটা জিনিষ তাকে অস্বস্তিতে পূর্ণ করে দেয়।

কিছুক্ষণ আমাদের কোন কথাই হলো না; তারপর মিনি বল্লে, "মোহিত বাবু লোকটির প্রকৃতি খুব সোজা।"

"যাকে সোজা কথায় বোকা বলা যায়!"

একটু হেসে সে বল্লে, "ঠিক বোকা নয়, বোধ-বিবেচনা যে একেবারে নেই তা নয়; কিন্তু সেগুলোকে সব সময়ে খাটিয়ে চলার অভ্যাস তাঁর খুব কম।"

আমি বল্লাম, "যাদের বাপের টাকা থাকে, এবং সংগ্রামের জন্য কোনদিন প্রস্তুত হতে হয় না, তাদের প্রায় অমনিই দেখা যায়। এই টাকা জিনিষটা মানুষের সারটাকে যেমন বিকাশ করে দিতে পারে, তেমনিই আবার মানুষকে অপদার্থ করে দেয়। ছেলেদের জন্য সম্পত্তি রেখে যাওয়াটা বোধ হয় ভাল নয়। তাতে এক হিসাবে তাদের সর্ব্বনাশ করে যাওয়া হয়।"

মিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল। হয়ত কথাটা তাকে একটা ক্ষুদ্র আঘাত দিয়েছিল।

আমি বল্লাম, "অনেক সময়েই দেখ্‌তে পাই, লোকে মেয়ের জন্য অবস্থাপন্ন জামাই খোঁজে, সেটা কিন্তু ভারি ভুল; এমন লোকের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করা উচিত যাকে নানা রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে মানুষ হতে হয়েচে। টাকার স্তূপের উপর মানুষ হলে আসল জিনিষটাই মানুষের পরিস্ফুট হতে পায় না। এই হিসাবে, লীলার জন্য মোহিতকে আমি উপযুক্ত পাত্র মনে করিনে।"

"কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমেই এমন দাঁড়াচ্ছে যাতে মোহিতের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া ছাড়া আপনাদের উপায়ান্তর থাকবে না।"

"তা আমি জানি, কিন্তু সংসারের উপর আমার কোন জোর নেই।—তার জন্যে আমার কোন জেদও নেই। আমি যেটা বুঝেছি—সেইটেই যে ধ্রুব সত্য তা কে বলতে পারে? তাই এখানে কোন জোর খাটে না। যা ঘটে যাচ্ছে, সেটাকে স্বীকার করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।"

"তা হলে মানুষ যা ভাববে, তা করবে না?"

"যদি পেরে ওঠে ত' করবে; কিন্তু সব সময়ে পেরে ওঠা যে যায় না।"

দুজনেই ভাবতে লাগলাম।

বাস্তবিক যত বয়স হচ্চে ততই যেন গভীরভাবে উপলব্ধি করচি মানুষের ক্ষমতা কতটুকু! একদিন রক্তের তেজ ছিল, সেদিন মনে হত, সবই মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। জল চাই, কে চেয়ে বসে থাকবে মেঘের আকাশে, দিনের পর দিন? খোঁড় মাটি, তোল জল পৃথিবীর গর্ভ থেকে। কিন্তু এখন বুঝেচি, হায়রে! সে কতটুকু জল ওঠে!—তাতে ক'জনের তৃষ্ণাই বা দূর হয়? সমস্ত দেশের তৃষ্ণা নিবারণ করতে হলে যে সেই মেঘের দিকে চেয়েই বলতে হয়—"হে দেবতা, প্রসন্ন হও তুমি!"

কত ছোট্ট মানুষের ক্ষমতা, আর কি বৃহৎ তার অহঙ্কারের আস্ফালন!

মনের উপর যে বিষণ্ণতা এসেছিল, দেখতে দেখতে সেটা যেন সমস্ত শরীরের উপর শীতের কুয়াশার মত ছড়িয়ে গেল! যেন আর বসে থাকতে পারিনে। দেহের ভিতর থেকে একবার আগুনের মত তাত উঠচে—আবার পরের মুহূর্তে যেন বরফের মত ঠাণ্ডা! চোখ চেয়ে থাকতে ভরসা হলো না। চোখ বুজে ফেলতেই মনের উপর যেন কে একটা আবরণ টেনে দিলে। তার পর কি হলো, জানিনে!

যখন জ্ঞান হলো, তখন দেখলাম, মিনির কোলে শুয়ে আছি; মাথার উপর পাখাটা বন্ বন্ করে ঘুরচে, পায়ের কাছে বালা বসে আছে; তার মুখের উপর আতঙ্ক যেন বিভীষিকার একটা নির্দ্দয় ছাপ দিয়ে গেছে!

ডাক্তাররা হাতে-হাতে হাজির; সবাই আমার বন্ধু-বান্ধব। আমার মনে হলো, বড় বেলা হয়ে গেছে—তাই জিজ্ঞাসা করলাম, "কটা বেজেছে?"

"সকাল সাতটা, কাকা।"

"তোমার গাড়ীখানা আনতে বল, আমাকে আবার তৈরী হয়ে কলেজ যেতে হবে।"

ডাক্তার সরকার ঝুঁকে এসে কাণের কাছে মুখ নিয়ে বল্লেন, "এখনো খুব দুর্ব্বল আছেন, বেশী কথা কবেন না। বড় সাহেব এসে দেখে গেছেন, কলেজ আজ যেতে হবে না।"

তখন বুঝতে পারলাম যে আমার অসুখ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে মানুষ যেমন পরিচিত জিনিষকে পাবার জন্য হাতড়ায়—আমিও ঠিক বিস্মৃতপ্রায় অতীতের মধ্যে থেকে ঘটনাগুলোকে স্মৃতির পথে টেনে বার করে আনবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

চোখ বুজে, ভ্রূ-দুটো কুঁচ্‌কে, যত জোর করে ভাব্‌তে যাই, ততই যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি! কিন্তু এই হারিয়ে ফেলার ভিতর একটা অপূর্ব্ব আনন্দ! এর আস্বাদ জীবনে আর কোনদিন পাইনি! এ যেন সীমা থেকে অসীমের মধ্যে একটা দোল খেয়ে ফিরে আসার মত!

দিনটা জেগে-ঘুমিয়ে, জ্ঞানে-অজ্ঞানে কেটে গেল; সন্ধ্যা হতে না হতেই আমার চোখের উপর যেন কত বছরের সঞ্চিত ঘুম এসে ঝুঁকে পড়ল। তার গুরু ভারের নীচে চোখের পাতাগুলো আপনি বন্ধ হয়ে এলো।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল,—কাদের ফিস্ ফিস্ কথার শব্দ। চোখ না চেয়ে চুপ করে শুয়ে শুয়ে শুন্‌তে লাগলাম। আমার স্ত্রী আর লীলাতে কথাবার্ত্তা চল্‌ছিল। মনে হলো, ঘরে আর কেউ নেই; এবং আমি যে দেখেছি, তাও তাঁরা বুঝতে পারেন নি।

কথাটা মোহিতমোহন সম্বন্ধেই হচ্ছিল। মোহিত লীলাকে বলে গেছেন যে আপাততঃ বিবাহ হতেই পারে না, কারণ তাঁর মার এ বিবাহে মত নেই। কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে। লীলা এ কথার আর কি উত্তর দেবে? কিন্তু তার মা বলেন, মার অমত অমতই সই; বিবাহ যথাসম্ভব শীঘ্র হওয়া চাই—আর কিছুতেই দেরী করা চলবে না।

এ সব কথার কোন অর্থ-ই আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনে। এত তাড়াহুড়ো লোকে কেন করে, এ সব ব্যাপারে! তবে আমার স্ত্রীর সব-তাতেই যেন কেমন একটা ব্যস্ততার ভাব! কোন জিনিষ ধীরে-সুস্থে রয়ে-বসে তিনি করতে পারেন না। এমন এক-এক-জন লোক থাকে, বটে—এক-একটা কা[illegible] তাদের বড় উৎরে যায়; কিন্তু বেশীর ভা[illegible] এমন ভেস্তে যায় যে তাকে সুধ্‌রে নেবা[illegible] কোন পথই থাকে না।

"মোহিত কবে ফিরবে বলে গেছে?"

"তাঁদের জমিদারিতে কি একটা গোল[illegible] মাল হয়েচে; সে সবের মিটমাট না হওয়া পর্য্যন্ত সেখেনেই থাক্‌তে হবে।"

"তবুও দুদিন পাঁচদিন কি ন-মাস ছ[illegible] মাস—? তুই নেকী এ কথাটাও জিজ্ঞাস[illegible] করে নিলিনে কেন?"

"তিনি বড় ব্যস্ত ছিলেন, তখনি গাড়[illegible] ধরতে হবে বলে।"

সাপকে হাঁড়ির মধ্যে পুরলে সে যেম[illegible] রাগে ফোঁপাতে থাকে—পারুল ঠিক তেমনি[illegible] করে ফুঁস্‌তে লাগ্‌লেন।

"উঁ, তুমি আমাকে একবার ডাক্‌তে[illegible] পারলে না?"

লীলা কোন কথা কইলে না—মনে হলো সে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করচে।

যেন কেমন একটা উৎকট ভয়ে আমা[illegible] জিভের ডগা থেকে পেটের নাড়ি পর্য্য[illegible] শুকিয়ে উঠ্‌ল। বল্লাম, "কে আছ, আমা[illegible] একটু জল দাও।"

স্ত্রী উঠে এসে জল দিয়ে বল্লেন, "কেম[illegible] বোধ হচ্চে, এখন?"

"কিছু বুঝতে পারচিনে—বড় দুর্ব্বল বো[illegible] হচ্চে—আর ঘাম হচ্চে।"

স্ত্রী একটু ব্যস্তভাবে বল্লেন, "লীলা, একবার শীগ্‌গির মিনিকে ডাক।"

তিনি আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

আহা! সেই হাতখানি, যার কোমল স্পর্শ আমার সংসারের সমস্ত দুঃখকে নিমেষে নিঃশেষ করে দিত! আজো তেমনি মধুর মনে হলো।

মিনির সঙ্গে ডাক্তার বোস্ এসে ঘরে ঢুকলেন। বোসের বয়স অল্প কিন্তু বেশ বিচক্ষণ বলে সুনাম আছে। নাড়ী পরীক্ষা করে তিনি বল্লেন, "আপনারা কি কেউ এঁর সঙ্গে কথা কইছিলেন? অত্যন্ত বেশী উত্তেজনা হয়েচে, দেখ্‌চি।"

স্ত্রী বল্লেন, "না, উনি ত' এই ঘুম থেকে উঠে জল চাইলেন, হয়ত স্বপন-টপন দেখেচেন!"

তীব্র-গন্ধ কি একটা ওষুধ খেয়ে আমার সর্ব্ব-শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে এল। মনটা জেগে থাক্‌লেও যেন দেহের প্রতি শিরা-অনুশিরা পর্য্যন্ত অসাড় হয়ে গেলো; বোধ হয়, আবার ঘুমিয়েই পড়লাম।

সেরে উঠ্‌তে আমার অনেক দিন লাগ্‌লো; কিন্তু সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হয়ে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। ডাক্তারেরা বায়ু-পরিবর্ত্তনের কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন; কিন্তু কোথায় যাই এই ভাঙা শরীর নিয়ে! শেষ পর্য্যন্ত মিনির সোদপুরের বাড়ীতে যাওয়াই স্থির হলো।

মিনি আর আমি এগিয়ে গেলাম; লীলারা পরে আস্‌বে, স্থির হলো। তার কলেজ বন্ধ না হলে বড় ক্ষতি হয়। স্ত্রী সেই কথা বার-বার করে বল্‌তে লাগ্‌লেন; কিন্তু আমাকে নিয়ে তাঁর চিন্তার অবধি রইল না! তিনি সঙ্গে না থাকাতে যে আমার ভারী অসুবিধা হবে, তা আর কেউ মনে করুক না করুক, তিনি কেমন করে সে কথা না জাহির করে থাকেন!

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আলোচনা

ভারতবাসীর উপনিবেশ

বিগত আষাঢ় সংখ্যার "ভারতী" পত্রিকায় "ভারত-বাসীর উপনিবেশ' নামক আমার প্রবন্ধ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আলোচনা করিয়াছেন। ঠিক একবৎসর পূর্ব্বে এই শ্রাবণ মাসে প্রতিবাদকারী 'নব্যভারতে'র পৃষ্ঠায় 'কণিকা' (?) গরের স্থান-নির্ণয়ে যে গভীর ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন, আজ বৎসরান্তে এই আলোচনা পাঠ করিয়া আমার তাহারই কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি লিখিয়াছিলেন—" 'কণিকা' আমাদের নিকট 'কনক' শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়, এবং 'কণিকা' স্বর্ণগ্রামেরই বোধক বলিয়া আমরা মনে করি।"—কণিকার কোন্ কণিকা দেখিয়া তিনি কনকের সন্ধান পাইলেন তাহা স্থির করা আমাদের বুদ্ধিতে কুলাইবে না। আর কনক মানে যখন স্বর্ণ, তখন

স্বর্ণগ্রাম আর যায় কোথায়? তিনি অমনই গবেষণা-বলে স্বর্ণগ্রাম যে কণিকা তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন। বর্ত্তমান আলোচনারও গবেষণা এইরূপ। এইরূপ গবেষণামূলক আলোচনার উত্তর দেওয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। তথাপি বন্ধুদিগের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার প্রতিবাদের কয়েকটী বিষয়ের উত্তর নিয়ে দেওয়া যাইতেছে। আমি দুইটী শিলা-লিপির উল্লেখ করিয়াছি, অথচ তাহাদের প্রতি-লিপি দিই নাই; সুতরাং আমার উক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধাঁধা লাগিয়াছে। গোপালের শিলালিপির সকল বিষয় যখন Upper-Burma Gazetteerএ (part I, Vol. II p. 193) আছে এবং তাহার নজীরও আমি আমার প্রবন্ধে যখন উল্লেখ করিয়াছি, তখন আমার কত গুরুতর অপরাধ হইয়াছে সুবুদ্ধি পাঠকগণই তাহা বিবেচনা করিবেন। আমার আর একটী অপরাধ হইয়াছে যে, আমি লিখিয়াছি, "তখন রাজধানীর নাম হস্তিনাপুর ছিল। এখনও ঐস্থানের নাম হস্তিনাপুর।" প্রতিবাদকারী দয়া করিয়া লিখিয়াছেন, "আমরা কিন্তু বিশ্বকোষ, Cyclopædia of India, Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India প্রভৃতি কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই হস্তিনাপুর নামক স্থানের উল্লেখ খুঁজিয়া পাইলাম না।" উত্তরে এইটুকুই বলা যাইতে পারে যে, ব্যালফোর, বিশ্বকোষ প্রভৃতি আভিধানিক গ্রন্থ দেখিয়া ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা করা যায় না এবং তাহা সঙ্গতও নয়। ঐতিহাসিক সমালোচনা করিতে হইলে একটু কষ্ট স্বীকারের দরকার। Assam District Gazetteer-এর Nowgong Volume-এ নওগঙের একখানা map আছে, তাহাতে উজ্জ্বল অক্ষরে আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানটীকে 'হস্তিনাপুর' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমি নিজে গিয়াও এই স্থানটী দেখিয়া আসিয়াছি। ভৌগোলিক অনুসন্ধানে একটু সুড়ুক সন্ধানও জানা দরকার।

তারপর, আমি শিলালিপি-নির্দ্দিষ্ট ৩০০ খৃষ্টাব্দকে হস্তিনাপুর-প্রতিষ্ঠার সময় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি এবং বর্মার 'মহারাজবংশ' নামক কিংবদন্তী-মূলক ইতিকথা-লিখিত ৯২৩পূঃ খৃঃ অতিরঞ্জিত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছি। শিলালিপি ছাড়িয়া পঞ্জিকার পক্ষপাতী হই নাই কেন, আমার এ অপরাধের দণ্ড হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। প্রতিবাদকারী ৯২৩পূঃখৃ বজায় রাখিবার জন্য শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'প্রাচীন সভ্যতা' নামক গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠা লিখিত "বঙ্গদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে কার্ণেল জেরিনি প্রভৃতি ঐতিহাসিকের এ কথা উদ্ধার করিয়াছেন যে, উত্তর ব্রহ্মে তাগো নগরে হস্তিনাপুর হইতে আগত ক্ষত্রি রাজারা খৃঃ পূঃ ৯২৩ অব্দে রাজ্যস্থাপন করেন। এই অংশ উদ্ধার করিয়া বাহাদুরীর সহিত সাফাই দিয় বলিয়াছেন—"কিন্তু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এই সময় নির্দ্দেশটীকে উড়াইয়া দেন নাই।" প্রতিবাদকারী ভাবিলেন আমাকে খুব জব্দই করিলেন। পাঠকগ দেখুন, এখানে কিন্তু সুবোধ প্রতিবাদকারী যদি একা কষ্ট স্বীকার করিয়া জেরিনির পুস্তকখানি স্বয়ং উল্টাইয় বিজয়বাবুর উদ্ধৃত মতের সহিত মিলাইয়া দেখিতে তাহা হইলেই জানিতে পারিতেন যে, জেরিনি নিজে তাঁহার বিপরীত কথা বলিয়া আমারই পক্ষ সমর্থ করিয়াছেন—"Sir A. Phayre believes th above events are historical but they have been antedated by severa centuries"—(Gerini, Further India &c p. 62); অধিকন্তু জেরিনি মহারাজ-বংশে অভিমত আমারই ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া লিখিয়াছে —'In Circa A. D. 300 a Gopal c Hastinapur, on the Ganges in India...... founded New Hastinapur on the Irawadd (ibid, pp 745, 746)। বিজয়বাবু আমাদের বয় শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র, তিনি ইদানীং অন্ধ হই পড়িয়াছেন। ভুলিয়া জেরিনির নামে ফেয়ারে ইতিকথার ৯২৩পূঃখৃঃ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। মূল গ্র দেখিয়া আলোচনা করাই যে যুক্তিসঙ্গত ও প্রত্যে ঐতিহাসিকেরই কর্ত্তব্য তাহা কি প্রতিবাদকারীকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে?

একটা কথা, ভারতী-কার্য্যালয়ের প্রুফ দেখার দোষে আমার প্রবন্ধে দুই জায়গায় গুপ্তাব্দ ভুল ছাপা হইয়াছে। তজ্জন্য যদি কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তবে তাহা ভারতী-সম্পাদক মহাশয়দের দেওয়া উচিত। সমালোচক মহাশয় যদি একটু কষ্টস্বীকার পূর্ব্বক ৩০০ খৃষ্টাব্দ ও ৪২৬ খৃষ্টাব্দ এই দুইটী সালের সঙ্গে গুপ্তাব্দ মিলাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে তিনি সহজেই বুঝিতে পারিতেন যে, গুপ্তাব্দটী ছাপার ভুলেই হইয়াছে। তিনি যে এইরূপ ছাপার ভুল দেখিয়া তাহা লেখকের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন, তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাঁহার নিজের প্রতিবাদেও আমার লিখিত "গোপাল" ছাপার ভুলে "সোপানে" পরিণত হইয়াছে। এজন্য আমরা কিন্তু তাঁহাকে দোষ দিব না।

আমার বোধহয় প্রতিবাদকারী আমার প্রবন্ধটী আগাগোড়া মনোযোগের সহিত পড়েন নাই। তাঁহার মতের সহিত হয়ত আমার মতের পার্থক্য হইতে পারে। কিন্তু আমার প্রবন্ধে আমি যে সব কথা লিপিবদ্ধ করি নাই, ইনি সেইরূপ অনেক কথা আমি লিখিয়াছি বলিয়া আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। তাঁহার একটী প্রমাণ দেখুন। আমি আমার প্রবন্ধে রাজা জয়পালকে চন্দ্রবংশাবতংস গোপালের "বংশোদ্ভূত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। প্রতিবাদকারী বলেন, "ইহার পর তিনি গোপালের "পুত্র" রাজা জয়পালের এক শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন।" আমার প্রবন্ধে কোথায় যে আমি জয়পালকে গোপালের পুত্র বলিয়াছি তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার বোধহয় প্রতিবাদকারী যদি ধীরচিত্তে আমার প্রবন্ধটী সমস্ত পাঠ করিতেন তাহা হইলে এই কাগজ-কালির দুর্ম্মূল্যতার দিনে অনেকটা অপব্যয় হইত না।

আমার প্রকাশ্যমান ইতিহাসে ত্রিপুর, ত্রিলোচনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি। ত্রিপুর-রাজবংশের মর্য্যাদার কোথাও হানি করি নাই। এ প্রবন্ধেও কোথাও সেরূপ ইঙ্গিত নাই। প্রতিবাদকারী একত্র লিখিয়াছেন, আমি জয়পালকে ত্রিপুররাজবংশের আদি নরপতি বলিয়া প্রচার করিয়াছি। আমার প্রবন্ধে এরূপ কোন কথাই নাই। জয়পাল ত্রিপুরার রাজা ছিলেন একথা আমি বলিয়াছি, প্রাচীনতম প্রাপ্ত রাজমালাও বলিয়াছে। তবে 'আদি নরপতি' বলি নাই। গোপোলের নাম কোন রাজমালায় নাই, একথা আমি জানি। আমি গোপাল কোন্ নরপতির নামান্তর তাহাও জানি। আমার প্রকাশ্যমান ইতিহাসে তৎসমুদয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটী কথা বলিয়াছি মাত্র। তারপর আমার প্রবন্ধশেষে "এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। পরে আলোচিত হইবে।" এই কথা লেখা সত্ত্বেও প্রতিবাদকারী সমগ্র মহাভারতের ফর্দ্দ চাহিয়াছেন। এইটুকুই রহস্য। প্রতিবাদ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

পর্ত্তুগীজ জলদস্যু

খৃষ্টীয় ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতসমুদ্রে নানাদেশীয় জলদস্যুর ভীষণ প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে পর্ত্তুগীজ দস্যুরা নৃশংস ও অমানুষিক অত্যাচারে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও মারহাট্টা প্রভৃতি জলদস্যুদিগকে অতিক্রম করিয়াছিল। যে হতভাগ্য ব্যক্তিরা তাহাদের হাতে বন্দী হইত, তাহাদের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না।

ইয়ুরোপীয় দস্যুরা এসিয়ার লোকদিগকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করিত না, কি ভীষণ

নিষ্ঠুরভাবে যে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিত, তাহার বর্ণনা করিতে লেখনী অক্ষম।* লাজেন বি লিখিয়াছেন—"...তাহার পর মস্কাট হইতে মুরেদের (Moors) দুটি ছোট জাহাজ আসিলে, দস্যুরা দুই একটা কামান আওয়াজ করিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিল। তাহাদের কাপ্তেন ও মহাজনকে নিজেদের জাহাজে বন্দী করিয়া আনিল, ও মস্কট হইতে নিশ্চয় অনেক ধন লইয়া যাইতেছে, এই বিশ্বাসে তাহার পরিমাণ কত স্বীকার করাইবার উদ্দেশ্যে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অত্যাচার করিয়াছিল ও নানারূপ অনুসন্ধান করিয়াছিল। তাহার পর আর কতকগুলি জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইলে এই ছোট দুটি জাহাজ লইয়া কি করা হইবে সে সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইল। কেহ কেহ বলিল যে জাহাজে যাহা আছে,—ধন, পণ্য, অশ্ব সব জলে ফেলিয়া দেওয়া হউক। পরে তাহারা জাহাজের পাইল সমুদ্রে ফেলিয়া দিল ও একটা জাহাজের মাস্তুলকে দ্বিখণ্ডিত করিল। ...আর একবার কাটীওয়ার (Kathiawar) উপদ্বীপান্তর্গত গোঘা নামক স্থান হইতে একটা ছোট জাহাজ তুলা বোঝাই করিয়া কালিকট যাইতেছিল। এই ছোট জাহাজের আরোহীদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে তাহারা অমুক নৌবাহিনীতে ছিল কি না, তখন তাহারা উত্তর দিল, 'না'। তাহাদের পুনঃ পুনঃ কাতরোক্তি ও অনুনয় সত্বেও তাহাদের কথা অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের উপর উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। সমস্ত পণ্যদ্রব্য তাহারা সমুদ্রে ফেলিয়া তো দিলই, অধিকন্তু যে নৌবাহিনী তাহারা চক্ষেও দেখে নাই, তাহাতে তাহারা ছিল ও সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সমস্ত সংবাদ জানে ইহা স্বীকার করাইবার জন্য তাহাদের অঙ্গের গ্রন্থিগুলিকে কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিল...।" এই জলদস্যুর জাতে ছিল ইংরাজ।

এ অত্যাচার পর্তুগীজ দস্যুদের নিষ্ঠুরতার শতাংশের একাংশ। পর্তুগীজ জলদস্যু সেবাষ্টি গঞ্জালিস টিবাও (Sebastio Gonzales Tibao) কাহিনী শুনিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, তাহা কিরূপ ভীষণ ও লোমহর্ষণ ছিল। এই ব্যক্তি লিসবন নগরের নিকট একটা গ্রামে কোন এক অজ্ঞাত কুলে জন্মগ্রহণ করে। ভারতে আসিবার পর বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে যুদ্ধব্যবসায়ী হয়, পরে লবণের বাণিজ্য করিয়া কিছু ধনসঞ্চয় হইলে জালিয়া নামক এক প্রকার ছোট নৌকা ক্রয় করে। সেই নৌকায় সে লবণ বোঝাই করিয়া আরাকান রাজ্যান্তর্গত দিয়াঙ্গা (Dianga) নামক বন্দরে উপস্থিত হয়।

---

* S. C. Hill—The story of the *Cassandra*, in Indian Antiquary, 1920. March P. 37.

"An account of the *Cassandra*, affords a good description of the way in whic the European pirates used to treat their prisoners and also of the infamous crucl towards Asiatics."

এই সময়ে এক বিশেষ ঘটনা ঘটে। নিকোটী (Nicote) নামক একজন বিশিষ্ট পর্ত্তুগীজ সিরিয়াম (এখন Thanliyeng) নামক স্থানে স্বীয় প্রতাপ সুপ্রতিষ্ঠিত জানিয়া প্রভাব আরও বিস্তার করিবার নিমিত্ত দিয়াঙ্গা বন্দর অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তদুদ্দেশ্যেই কতকগুলি জাহাজ সজ্জিত করিয়া স্বীয় পুত্রকে আরাকান-রাজের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। পুত্র ওই বন্দরে ১৬০৭খৃষ্টাব্দে উপস্থিত হইয়া আরাকান রাজের নিকট বন্দরটা প্রার্থনা করিলেন। সেই সময়ে সেই স্থলে কতকগুলি পর্ত্তুগীজ বাস করিতেন, তাঁহারা নিকোটীর উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহারা আরাকান-রাজকে জানাইলেন নিকোটীর উদ্দেশ্য সাধু নহে; উত্তরকালে আরাকান-রাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যেই দিয়াঙ্গা বন্দরে নিকোটীর এই পদার্পণ। রাজা ইহা শুনিয়া স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া নিকোটীর পুত্রকে রাজসভায় আসিবার নিমন্ত্রণ করিলেন ও তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সদলে হত্যা করাইলেন। শুধু ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না। জাহাজে যাহারা ছিল, তাহাদের তো হত্যা করিলেনই; অধিকন্তু প্রায় ছয় শত পর্ত্তুগীজ নিঃসংশয়ে নিরুপদ্রবে পরম শান্তিতে বাস করিতেছিল, তাহারাও বিনষ্ট হইল। অতি অল্প লোকই বনে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল, আর তাহা অপেক্ষা আরো অল্প সংখ্যক ব্যক্তি কোন ক্রমে জাহাজে উঠিয়া পলাইয়া আসিল। তাহাদের ভিতর ছিল সেবাষ্টিও গঞ্জালিস্।

মানোয়েল দে ম্যাটেস (Manoal de Mattos) নামক একজন পর্ত্তুগীজ সন্দীপ দ্বীপ অধিকার করিয়া ছিলেন। তিনি কিছুদিনের নিমিত্ত অন্যত্র গমন করেন ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে ফতে খাঁ নামক একজন মুসলমানকে দ্বীপের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যু হইলে ফতে খাঁ দ্বীপস্থিত সমুদয় পর্ত্তুগীজদিগকে স্ত্রী-পুত্রের সহিত হত্যা করেন, বস্তুতঃ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তিকে জীবিত রাখেন নাই। দ্বীপটি এইরূপে আয়ত্ত হইলে চল্লিশখানি নৌকা লইয়া তিনি একটী নৌবহর গঠিত করেন।

এধারে গঞ্জালিস পলায়ন করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। যাহারা দিয়াঙ্গাতে কোনও ক্রমে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়াছিল, তাহারা সকলে গঞ্জালিসের দলভুক্ত হইল। দশখানা নৌকা লইয়া তাহারা আরাকান রাজ্যের বন্দরে বন্দরে লুটপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল। এই দস্যুদলকে সমূলে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে ফতে খাঁ তাঁহার নৌবাহিনী প্রেরণ করিলেন। জয়ের আশায় তিনি এতদূর উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে তাঁহার পতাকায় এই কয়টী কথা লিখিয়াছিলেন—"ঈশ্বর-অনুগ্রহে সন্দীপাধিপতি ফতে খা খৃষ্টানের রক্তপাত করিয়াছিলেন ও পর্ত্তুগীজ জাতির উচ্ছেদ করিয়াছেন।" ফতে খাঁ জাবালপুর নামক একটী দ্বীপের কাছে নদীতে অতর্কিতে দস্যুদলকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু দস্যুদল ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার সন্ধান পাইয়া প্রস্তুত হইয়া ছিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দুইদলে ভীষণ যুদ্ধ হইল; অরুণোদয়ে দেখা গেল, ফতে খাঁর নৌ-বাহিনীর একটী লোকও অবশিষ্ট নাই, তাঁহার দলের

লোক হয় নিহত না হয় বন্দী হইয়াছে। তিনি স্বয়ং এ যুদ্ধে বিনষ্ট হন।

এই ঘটনায় পূর্ব্বে দস্যুদিগের বিশেষ কোন দলপতি অথবা নেতা ছিল না। অতঃপর স্থির হইল যে সেবাষ্টিও গঞ্জালিসকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া তাহারা একবার সন্দীপ অধিকার করিবার প্রয়াস পাইবে। বাঙ্গালার বন্দর ও তৎসান্নিধ্যে যে সমস্ত বন্দর ছিল—তাহা হইতে পর্ত্তুগীজরা আসিয়া দলপুষ্ট করিতে লাগিল। সেবাষ্টিও বাট্টিকালোয়ার (Batticaloa) রাজার সহিত সর্ত্ত করিল যে যদি তিনি সাহায্য করেন তবে দ্বীপ অধিকৃত হইলে তাঁহাকে দ্বীপের রাজস্বের অর্দ্ধেক দেওয়া হইবে। তিনি স্বীকৃত হইয়া জাহাজ ও দুই শত অশ্বারোহী যোদ্ধা দিয়া সাহায্য করেন। ১৬০৯ মার্চ্চ মাসে সেবাষ্টিও চারিশত পর্ত্তুগীজ সৈন্য ও চল্লিশখানি জাহাজ লইয়া সন্দীপ অধিকার করিতে চলিল। দ্বীপবাসিগণ পূর্ব্বাহ্নেই আক্রমণের সংবাদ পাইয়া দ্বীপ-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। ফতে খাঁর ভ্রাতা বহুসংখ্যক মুসলমান লইয়া দস্যুদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দস্যুদের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে শীঘ্রই দুর্গ-প্রবেশ করিতে হইল। এইখানে দস্যুগণ আসিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। কিছুদিন পরে তাহাদের রসদ ফুরাইয়া আসিল। এ অবস্থায় কি করা যাইবে যখন এই সমস্যা-সমাধানে সকলে ব্যস্ত, তখন দৈবযোগে গাসপার ডি পিনা (Gaspar de Pina) নামক একজন স্প্যানিশ কাপ্তেন আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুরুদ্ধ হইয়া সে গঞ্জালিসকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। তখন পঞ্চাশ জন লোক জাহাজ হইতে নামিয়া বহু সংখ্যক মশাল জ্বালিয়া প্রচণ্ড চীৎকার করিতে করিতে দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ তখন অনেক লোক আসিয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। দুর্গ ত্বরিতে অধিকৃত হইল, এবং একজন ব্যক্তিকেও গঞ্জালিস জীবিত রাখিল না। দ্বীপের আদিম অধিবাসিগণ গঞ্জালিসের আধিপত্য স্বীকার করিতে চাহিলে সে বলিল, দ্বীপে যে-সমস্ত বাহিরের লোক আছে তাহাদিগকে তাহার কাছে উপস্থিত করিতে হইবে। এতদনুসারে হাজার জন মুসলমান তাহার সমক্ষে নীত হইলে। সে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিবার আজ্ঞা দিল। তাহার পর গঞ্জালিস সন্দীপের স্বাধীন রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিল।

যে সমস্ত পর্ত্তুগীজের বিশিষ্ট সাহায্যে সে দ্বীপ অধিকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে সে ভূমিদান করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে সে সমস্ত ভূমি প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিল। বাট্টিকালোয়ার রাজাকে রাজস্বের অর্দ্ধাংশ দিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সহিত সে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। গঞ্জালিসের ধন-জন-প্রভাব. স্ফীত হইয়া উঠিল। হাজার দল পর্ত্তুগীজ, দুই হাজার সশস্ত্র সন্দীপবাসী, দুই শত অশ্বারোহী সৈনিক, অশীতি সংখ্যক জাহাজ ও ভাল ভাল কামান এখন তাহার অধীনে। সন্দীপ বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়ায় তথায় বণিকগণ প্রায়ই গমনাগমন করিত। গঞ্জালিস তাহাদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিয়া

প্রভূত ধন সঞ্চয় করিতে লাগিল। নিকটস্থ রাজগণ তাহার লক্ষ্মীশ্রী দেখিয়া তাহার সহিত সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিল। গঞ্জালিস বাট্রিকালোয়ার রাজার নিকট হইতে জাবালপুর ও পাতেলবঙ্গ নামক দ্বীপদ্বয় অধিকার করিয়া লইয়া তৎকৃত সাহায্য ও অনুগ্রহের প্রতিদান দিল। অন্যান্য রাজাদিগের নিকট হইতেও ভূমি অধিকার করিয়া স্বীয় আধিপত্য গঞ্জালিস সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

এই সময়ে আরাকান-রাজ স্বীয় ভ্রাতা অনপোরমের সহিত বিবাদ করিলেন। অনপোরমের একটী সুন্দর হস্তী ছিল—তিনি ভাইকে সে হস্তী ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হন নাই। ইহাই বিবাদের সূত্র। যখন অনুনয়-বিনয় অথবা ভয়-প্রদর্শনে কোন ফল হইল না, তখন বলপূর্ব্বক হস্তীটা কাড়িয়া লইয়া রাজা অনপোরমকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অনপোরম তখন গঞ্জালিসের আশ্রয় লইলেন। গঞ্জালিস তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রয়াস পাইল কিন্তু এত বড় প্রভাবশালী রাজার প্রতিবাদী হইবার শক্তি নাই বুঝিয়া সন্দীপে ফিরিয়া আসিল। অনপোরম তাঁহার স্ত্রী-পুত্রপরিবারবর্গ, ধন-রত্ন ও হস্তী লইয়া তাহার সঙ্গে সন্দীপে আসিলেন। পরে গঞ্জালিস অনপোরমের ভগ্নীকে বিবাহ করিল। তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে অনপোরমের মৃত্যু হইল। অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিল যে গঞ্জালিসই বিষ-প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। আর সন্দেহও বোধ হয় নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে—কেন না মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অনপোরমের ধনরত্ন ও অন্যান্য সামগ্রী সবই গঞ্জালিসের বিধবা পত্নী অথবা পুত্রের ভাগে পড়িল না। ইহা লইয়া পাছে একটা কেলেঙ্কারি হয় সেই জন্য গঞ্জালিস স্বীয় ভ্রাতা আনটোনিও টিবাওর (Antonro Tibao) সহিত ওই বিধবার বিবাহ দিবার ষড়যন্ত্র করিল, কিন্তু তাহাকে রোম্যান কাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে না পারায় সে ষড়যন্ত্র সফল হইল না। ইহার পর দুই ভাই মিলিয়া আরাকান-রাজকে আক্রমণ করে। মাত্র পাঁচখানি জাহাজ লইয়া আ্যান্টোনিও রাজার এক শত জাহাজ ধৃত করিল। আরাকান-রাজ ইহার পর গঞ্জালিসের সহিত সন্ধি করেন। অনপোরমের বিধবা পত্নী আরাকান রাজ্যে ফিরিয়া যান। পরে তিনি চট্টগ্রামের রাজার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।

এই সময় মোগলেরা বালুয়ারাজ্য (অথবা ভালুয়া) জয় করিতে মনস্থ করেন। তাহা হইলে সন্দীপের এত কাছে মোগলেরা আসিলে গঞ্জালিসের ভারি অসুবিধা হইবে জানিয়া সে আরাকান-রাজের সহিত বালুয়া-রক্ষণেরবন্দোবস্ত করিল। তদনুযায়ী আরাকান-রাজ আশি হাজার সৈন্য ও সাত শত হস্তী লইয়া বালুয়া রক্ষণের নিমিত্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। জলপথেও দুই শত জাহাজ ও চারি সহস্র লোক গঞ্জালিসের নৌবাহিনীর সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত পাঠানো হইল। এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে আরাকান-রাজ সৈন্য লইয়া উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত গঞ্জালিস মোগলদিগকে বালুয়া রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না; তৎপরে মোগলগণ বিতাড়িত হইলে বালুয়া রাজ্যের অর্দ্ধেক

তাহার, ও অর্দ্ধেক রাজার হইবে। গঞ্জালিস তাঁহার নৌবাহিনীর প্রতিভূ-স্বরূপ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ও সন্দীপাধিবাসী কয়েক জন পর্ত্তুগীজের পুত্রগণকে আরাকান-রাজের হাতে সমর্পণ করিল।

স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালন বিষয়ে গঞ্জালিস সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল; মোগলগণের গতিরোধ করিতে কোন উদ্যমই সে করিল না। কেহ কেহ মনে করেন যে এই অদ্ভুত আচরণের মূল কারণ হইতেছে যে হয় সে মোগলগণের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল অথবা দিয়াঙ্গায় পর্ত্তুগীজ-নিগ্রহের প্রতিহিংসা লইবার নিমিত্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল। যাহা হউক, আরাকান-রাজকে একাকীই মোগলদের সম্মুখীন হইতে হইল। প্রথমে তিনি তাহাদিগকে একবার বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু মোগলগণ দলপুষ্ট করিয়া উপচিত শক্তিতে পুনরায় আক্রমণ করিয়া আরাকান-রাজকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিল। কতিপয় অনুচরমাত্র সঙ্গে লইয়া তিনি হস্তীপৃষ্ঠে পলায়ন করিয়া চট্টগ্রাম দুর্গে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। গঞ্জালিস সম্মিলিত নৌবাহিনীকে দেশীর্ত্তা নামক দ্বীপের খালের মধ্যে লইয়া গিয়া তথায় আরাকানী জাহাজের অধ্যক্ষগণকে স্বীয় জাহাজে নিমন্ত্রণ করিল; তাহারা নিমন্ত্রণে আসিলে তাহাদের বিনাশ সাধন করে; পরে জাহাজস্থিত সমুদয় লোককে নিহত অথবা বন্দী করিয়া সমস্ত জাহাজগুলিকে আয়ত্ত করিয়া সে সন্দীপে ফিরিয়া আসে। আরাকানী সৈন্যের পরাজয়-বার্ত্তা কর্ণ-গোচর হইবামাত্র নৌবাহিনী লইয়া সে উপকূলস্থিত সমুদয় বন্দরে রক্তের স্রোত বহাইয়া অট্টালিকা ধ্বংস করিয়া আগুন জ্বালাইয়া কৃতান্তের মত ফিরিতে লাগিল। বন্দরবাসিগণ জানিত যে আরাকান-রাজের সহিত গঞ্জালিসের এখন কোন বিবাদ নাই, এই শান্তির সময়ে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই। গঞ্জালিস আরাকান পর্য্যন্ত গিয়া বিভিন্ন জাতির জাহাজ জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তন্মধ্যে সুচারু শিল্প-খচিত সুবর্ণ ও হস্তিদন্তে মণ্ডিত বৃহদায়তন রাজার প্রমোদ-বহিত্র ছিল।

এই ধৃষ্টতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ আরাকান-রাজ এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে গঞ্জালিস প্রতিভূ-স্বরূপ রাখিয়াছিল, তাহাকে শূলবিদ্ধ করিয়া আরাকান বন্দরের নিম্নে সুউচ্চ দণ্ডের উপর রাখিয়া দিতে বলিলেন যাহাতে পিতৃব্য সমুদ্র-পথে যাইবার সময় দেখিতে পায় হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের কি অবস্থা হইয়াছে। যখন গঞ্জালিস সন্দীপে ফিরিয়া গেল, তখন আরাকান-বাসিগণ অথবা মোগলগণ সকলেই তাহার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। তাহারও কেমন মনে হইতে লাগিল যে বিপদ যেন ঘনাইয়া আসিতেছে।

এইরূপ অবস্থায় গঞ্জালিস গোয়ার রাজ-প্রতিনিধির নিকট সাহায্য ভিক্ষা চাহিল। সে জানাইল যে সে সন্দীপের স্বাধীন রাজা, তিনি যদি উপযুক্ত সাহায্য দেন, তাহা হইলে সে পর্ত্তুগালের অধীন করদ রাজা হইবে ও এই অধীনতার চিহ্নস্বরূপ বৎসর বৎসর এক জাহাজ করিয়া চাউল গোয়া কিংবা মলকাতে পৌছাইয়া দিবে। আর পূর্ব্বে

যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা কেবল আরাকান-রাজ কর্তৃক নিহত দিয়াঙ্গাস্থিত পর্ত্তুগীজগণের প্রেতাত্মাগণের তর্পণের নিমিত্ত; প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করা ভিন্ন তাহার অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আরাকান-রাজের সমৃদ্ধ ধনভাণ্ডারও হয় তো পাওয়া যাইতে পারে। ধনভাণ্ডার-প্রাপ্তির লোভে রাজপ্রতিনিধি গঞ্জালিসকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ডম ফ্রান্সিস্কোর (Dom Francisco de Menezor Roxo) নেতৃত্বে গোয়া হইতে একটী নৌ-বাহিনী ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে বহির্গত হইয়া ৩রা অক্টোবর আরাকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গঞ্জালিসকে এই সংবাদ দিবার জন্য একখানি নৌকা অগ্রেই প্রেরিত হইয়াছিল।

ডম ফ্রান্সিস্কো উপদিষ্ট হইয়াছিলেন যে গঞ্জালিসের অপেক্ষা না করিয়াই যেন তিনি আরাকান-রাজকে আক্রমণ করেন। যখন ফ্রান্সিস্কো এই আক্রমণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন (১৫ই অক্টোবর) হঠাৎ শুনা গেল কতকগুলি ওলন্দাজ জাহাজকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া একটি প্রকাণ্ড নৌবাহিনী নদী বাহিয়া আসিতেছে। একটি ওলন্দাজ জাহাজ হইতে প্রথম গোলা নিক্ষিপ্ত হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। দুই দলই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইল। রাত্রে শত্রু সরিয়া গেল ও গঞ্জালিস না আসা পর্য্যন্ত ফ্রান্সিস্কো পুনরাক্রমণ হইতে বিরত থাকিবার সঙ্কল্প করিলেন ও তাঁহার আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া নদীর মোহানায় রহিলেন।

অবশেষে গঞ্জালিস সুসজ্জিত পঞ্চাশখানি জাহাজ লইয়া উপস্থিত হইল। তাহার অপেক্ষা না করিয়াই ফ্রান্সিস্কো যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন জানিয়া সে বিষম চটিয়া গেল। পরে নভেম্বর মাসের আধাআধি ভাগ করিয়া দুইজনে উজান বাহিয়া গিয়া দেখিল যে একটা নিরাপদ স্থানে শত্রুর বাহিনী নোঙ্গর করিয়া আছে তখনই; তাহারা আক্রমণের উদ্যোগ করিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই আরাকানী নৌবাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের উপর চড়াও হইল। গঞ্জালিস প্রথম আক্রমণে বিচলিত না হইয়া স্থির রহিল। সন্ধ্যার সময়ে কপালে গুলির আঘাত পাইয়া ফ্রান্সিস্কো নিহত হইলেন। গঞ্জালিস যুদ্ধে বিরত হইল। পর্ত্তুগীজরা পরাজিত হইয়া সন্দীপে আসিল ও যাহারা গোয়া হইতে আসিয়াছিল তাহারা তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরে আরাকান-রাজ প্রভূত সৈন্য লইয়া আসিয়া সন্দীপ জয় করিলেন। সেই অবধি পর্ত্তুগীজদের সহিত ঐ প্রদেশের আর কোন সম্পর্ক রহিল না। এইখানেই গঞ্জালিসের বিচিত্র জীবন-নাট্যের যবনিকা পতন হইল।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার Studies in Moghul India ও Aurangzebe * নামক পুস্তকে যে মঘ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, সম্রাট আকবরের সময় হইতে সায়েস্তা খাঁর শাসন-কাল পর্য্যন্ত মঘ ও ফিরিঙ্গি—আরাকানের দস্যুগণ জলপথে আসিয়া বাঙ্গালায় লুট-তরাজ

* The Fernighi Pirates of Chatgaon—Studies in Mughal India P. P. 118 et Seq.

করিত। হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড়, কম বেশী সকলকেই তাহারা ধরিয়া লইয়া যাইত ও তাহাদের করতল বিদ্ধ করিয়া সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া সরু বেত চালাইয়া দিত ও জাহাজের পাটাতনের উপর গাদাবন্দি করিয়া ফেলিয়া রাখিত। যেমন পাখীকে দানা দেওয়া হয়, সেইরূপ সকালে বৈকালে এই বন্দীগণের আহারের নিমিত্ত উপর হইতে চাউল ছড়াইয়া দিত। এই অত্যাচার সহ্য করিয়াও যে হতভাগ্যেরা জীবিত থাকিত তাহাদিগকে লইয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দস্যুগণ নানাপ্রকারে অপমানিত করিয়া ভূমি-কর্ষণে অথবা অন্য কোন কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করিত। অন্যান্য বন্দীকে দাক্ষিণাত্যের বন্দরে ওলন্দাজ, ইংরেজ অথবা ফরাসী মহাজনদিগের নিকট ক্রীতদাস স্বরূপ বিক্রয় করা হইত, ইত্যাদি ইত্যাদি; পরে সায়েস্তা খাঁর চাটগাঁ জয় করিবার পর দস্যুদিগের অত্যাচার নিবারিত হয়।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আমরা এই ফিরিঙ্গী দস্যুদের উল্লেখ পাই; তাহাদের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য শ্রীমন্তের নাবিকগণ দিবারাত্রি নৌকা চালাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
রাত্রিদিন বেয়ে যায় নাহি করে ডর॥
চিনি কুচনের ডাঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
রাড়িঘাট বাণপুর ডানদিকে থুইয়া॥
ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হারামদের ডরে॥

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার Studies in Moughal Indiaতে (p.128) বলিয়াছেন—"Many Feringis lived happily at Chatgaon and used to come to the imperial dominion for plunder and abduction. Half their booty they gave to the Raja of Arracan and the other half they kept. This tribe was caled *harmas*" তাহারা জলদস্যু ছিল বলিয়া তাহাদের ঐ নাম হইয়াছিল। তিনি ফুটনোটে বলিতেছেন This word (Harmad) evidently 'armad', a corruption of 'armada'.

শ্রীকালীপদ মিত্র।

পুতুল নাচের ঘরে

আজকে ঢুকে পুতুল-নাচের ঘরে
ভ্রম যে আমার ভাঙলো পরে পরে।
বাইরে শুধু আধেকখানা দেখি
বুঝবো কিসে ভিতর শুধু মেকী।
এরাই আবার দেবতা সাজে দূরে,
যশ যে এদের গাইছে ভুবন জুড়ে।
আমরা অবোধ, বাহির দেখেই ভুলি
'বামন'কে হায় 'বিরাট' করে তুলি।
অংশ দেখে পূর্ণকে নিই ধরে,
সোপান দেখেই দেউল যে নিই গড়ে।
জ্যা দেখিয়াই ধনুকখানা আঁকি
এমনি করে আপনাকে দিই ফাঁকি।
আজকে এদের ঘরের মাঝে এসে
অবজ্ঞাতে আপনি মরি হেসে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

খোকার আশা

(গল্প)

কি দুষ্টু মা-টা! না বলে লুকিয়ে মামার বাড়ী চলে গেল! অসুখ সারতে গেছে? তা বেশ ত, যাবার সময় একটু আদর ক'রে একটা চুমু দিয়ে গেল না কেন? আমি সেখানে যাবার জন্যে বায়না ধরব, তাই? সেখানে গিয়ে দুষ্টুমি করব, তাই? ওগো মাগো, তুমি এসো গো, আমি যাবার জন্যে একটুও বায়না করব না, সেখানে গিয়ে কিচ্ছু দুষ্টুমি করব না, একটিবার এসে শুধু দেখা দিয়ে যাও!

বাবাকে কতদিন বলেচি—বাবা চলো, মামার বাড়ী থেকে মাকে ধরে আনি, কিন্তু বাবার আর আপিসের ছুটিই হয় না! দোল গেল, চড়ক গেল, তবু ছুটি হ'ল না—কি বিচ্ছিরি আপিস! ইংরিজিতে কথা কইতে যে পারি না, নইলে গটমট করে গিয়ে সাহেবকে সেলাম করে বলতুম—"সাহেব-বাবু, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, মা যে আসতে পাচ্ছে না—বাবাকে ছুটি না দিলে;—ছুটি দাও!" মামাকে সেদিন অত করে বলে দিলুম মাকে আনবার জন্যে—মামাও কই আসচে না ত! চিঠি লিখতে যে জানি না, নইলে ঠাকুরমার কাছে যে পার্ব্বণীর পয়সা জমা আছে তাই থেকে একটা পয়সা নিয়ে ডাকওয়ালার কাছ থেকে একখানা খাম কিনে নিজের হাতে লিখে দিতুম—"ওগো মাগো, তুমি একটিবার এস গো! আমি আর কলতলায় গিয়ে জল ঘাঁটব না—দুধ খেতে বায়না করব না!" তা'তে যদি না আসে, তাহলে লিখব—"মা তুমি বড় দুষ্টু। এখনো আসছ না কেন? যদি শীগ্‌গির না আস, তা হ'লে দেখবে তোমার খোকা আর নেই;—বামার মার সঙ্গে বাজারে গিয়ে হারিয়ে গেছে। এমন হারিয়ে যাব যে কোথাও খুঁজে পাবে না। তখন কি করবে?"

এ চিঠি পেলে তখুনি মা ছুটে চলে আসবে। এসে কি দেখবে? দেখবে হরিণ-ছানাটা কত-বড় হয়েছে; খোকা তার লাল ফুল কালো জল ছোট পাতা অবধি পড়ে ফেলেছে, আবার একশো অবধি গুণতেও পারে! "ও খোকা তুই কি হলি রে!"—বলে মা তখন কত চুমোই না খাবে! তারপর যখন দেখবে মাছের কাঁটা বেছে নিজের হাতে ভাত খেতে শিখেছি, নিজের হাতে কাপড় পরতে পারি—তখন? একটা কিন্তু অকর্ম্ম করে ফেলেছি—মায়ের সেই আরসি-খানা সেদিন হাত থেকে ফেলে ফাটিয়ে ফেলেছি! মা যখন সিঁদুর-কৌটো, ফিতে-চিরুনি নিয়ে ঐ জানলার ধারে বসে চুল বাঁধতে বসবে আর আরসিখানা খুলেই বলে উঠবে—'খোকা তোমার এ কি কাণ্ড!' তখন কি বলব? বলব আবার কি? বলব—জানই ত খোকা তোমার দুরন্ত—তুমি তাকে একলা রেখে গিয়েছিলে কেন? সঙ্গে নিয়ে যেতে পারনি!

কিন্তু কৈ মা আসছে? ঠাকুরমাকে

জিজ্ঞাসা করি—মা কবে আসবে? ঠাকুমা বলে,—"আসবে! আসবে!" আসবে, সে ত আমিও জানি, কিন্তু কবে আসবে? এ যে অনেকদিন হয়ে গেল! মা তো এমন দুষ্টু ছিল না, কে তাকে এই দুষ্টুবুদ্ধি দিলে! আমি এত লক্ষ্মী হয়ে রইলুম তবু মা এলো না কেন? তবে আবার আমি দুষ্টুমি করব। কাঁদব—খুব চেঁচিয়ে কাঁদবো—ঠাকুমা খেল্‌না দিয়ে ভোলাতে এলে একটুও ভুলব না। কিন্তু ওগো, মা যে আছে অনেক দূরে, সেখানে তার এই ছোট্ট খোকার কান্নার শব্দ কি গিয়ে পৌঁছবে?

ঐ যে দেয়ালে টাঙানো মায়ের ছবি! আয়-মা নেমে আয়, অমন চুপ করে অসাড় হয়ে বসে আছিস্ কেন মা? দেখতে কি পাচ্ছিস না, খোকা তোর কাঁদচে—তোর কোলে যাবার জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি করছে? অমন পাষাণের মত স্থির হয়ে আছিস্ কেন মা?

"খোকার মা আসবে! খোকার মা আসবে!"—বাড়িতে একটা সাড়া পড়ে গেছে। আজ কি আনন্দ! আজ কি আনন্দ! খোকার দেহ-মন আজ নৃত্য করে বেড়াচ্চে। সে বার-বার মায়ের ছবিখানার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াচ্চে আর মনে-মনে কি বলচে! তার মনের সমস্ত আনন্দ যেন এই নির্ব্বাক ছবি-খানির কাছে নীরবে সে নিবেদন করছে। সে সবাইকে এক-কথা একশ-বার জিজ্ঞেস করছে—"হ্যাগা, আমার মা আসবে?" সবাই বলছে—"হ্যাঁরে, হ্যাঁ, তোর একটা ভালো নতুন মা আসছে!" খট্ করে এই ভালো নতুন কথাটা খোকার কানে একবার বাজলো, কিন্তু মা আসছে এই আনন্দ সমস্ত মনের মধ্যে এমন ঝঙ্কার দিয়ে তখন বাজছে, যে সে কথাটা আমোলই পেলে না! মা! মা! চারিদিকে শুধু সে ঐ মা-নামই শুনছে। সে মা নতুনও নয়, পুরানোও নয়—সে মা! সে মা সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়—ভালোও নয়, মন্দও নয়—তার আর কোন বিশেষণ নেই, সে শুধু খোকার মা!

মা আসবে এই আনন্দে খোকা যে কোথায় যাবে, কি করবে কিছুই খুঁজে পাচ্চে না! একবার ঠাকুরমার কাছে গিয়ে বলছে—"ঠাকুমা, আমায় সাবান মাখিয়ে ফরসা করে দাও, কালো ছেলে বলে মা ঘেন্না করবে যে!" একবার বাবার কাছে দৌড়ে গিয়ে বলছে—"বাবা, একটা শেলেট-পেনসিল কিনে এনো, হ্রস্ব ই লিখতে শিখেছি—মা এলেই মাকে দেখাতে হবে।" একবার গিয়ে একটা ছেঁড়া নেকড়া নিয়ে মায়ের তোরঙ্গটা সে পরিস্কার করতে লাগল—তা'তে যে ধুলো জমে আছে! মা এসে যে বলবে—খোকা তুমি বড় হয়েছ, জিনিষ-পত্তর নোংরা হয়ে রয়েছে, তুমি দেখতে পারনি? যাঃ, ঐ কুলুঙ্গির উপরে মায়ের ফিতে-কাঁটা ছিল—সেগুলো আবার কে নিলে?—কোথায় হারিয়ে গেল আরসি রয়েছে, মোটা-দাড়া চিরুনিটা রয়েছে, কিন্তু সেগুলো গেল কোথায় নিশ্চয়ই ঐ নতুন ঝীটা চুরি করেছে আচ্ছা, মা আসুক না, মজাটা টের পাই দেবে তখন!

আর একটি দিন। আজ রাত পোহালে কাল সকালে খোকার মা আসবে। অন্ধ রাত্তির বেলায় খোকা বাবার কাছে

ঘুমোয়—ঠিক, সেই জায়গাটিতে, যেখানটিতে সে আর তার মা শুতো। কিন্তু আজ সন্ধ্যা বেলা ভাত-খাওয়া হলেই সে লক্ষীটি হয়ে সুড়-সুড় করে ঠাকুরমার কাছে গিয়ে শুলো—তার বাবা যে আজ মাকে আনতে গিয়েছে! আজ যাই হোক, কাল কেমন মজা! কাল ঠাকুর-মার কাছেও শুতে হবে না—বাবার কাছেও শুতে হবে না! কাল মায়ের গলাটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, গায়ের উপর পা তুলে দিয়ে—আয় রে ছেলের পালেরা মাছ ধরতে যাই—গান শুনতে-শুনতে—না, না, ওটা না—সেই যে বাঁশবনের কাছে ভুঁড়ো শেয়াল নাচে—সেই শেয়ালটার গল্প শুনতে-শুনতে ঘুমুবে। না, না, ঘুমুবে কেন? চোখ বুজে চুপটি করে শুয়ে থাকবে—ঘুমুলেই যে মা গল্প বন্ধ করে চুপি-চুপি উঠে পালিয়ে যায়! আর খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো মনে করে মা যে পা-টিপে-টিপে পালাতে যাবে অমনি সে চোখ চেয়ে মাকে খপ্ করে ধরে ফেলবে! কি মজা!

সকালে উঠেই ভালো জামা-জুতো-কাপড় পরে খোকা বাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল,—মাকে যে-সব জিনিষ দেখাতে হবে, সেগুলো সব ঠিক আছে কি না তারই তল্লাস করে। যখন সব ঠিক হলো, তখন সে সদর-দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপটি করে—মা এলেই তার কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে! ঠাকুমা ডাকলেন—"ওরে খোকা, দুধ খাবি আয়, বেলা হোলো!" খোকা রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লে—"দাঁড়াও ঠাকুমা, এখন নয়!" পিসিমা ডাকলেন—"ওরে খোকা, আয় দুধ খাবি!" খোকা তখনো পথের পানে চেয়ে অধীর হয়ে বল্লে—"দাঁড়াও না, যাচ্ছি!" এক-একখানি গাড়ী রাস্তার মোড়ে দেখা যায় আর তার বুকটা লাফিয়ে ওঠে—ঐ মা আসছে! এম্‌নি করে অনেকখানি বেলা হলো, খোকা তবু সেখান থেকে নড়ল না। পিসিমা বলেচে, বাবা তার দশটার সময় আসবে; কিন্তু খোকার মনে হতে লাগল বুঝি পনেরোটা কি কুড়িটাই বা বেজে গেল!

হুস্ করে একখানা মোটর গাড়ী খোকার বুকে চমক লাগিয়ে বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। খোকা চেঁচিয়ে উঠল—"বাবা! বাবা! মা?" ঝড়ের মধ্যে ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস যেমন মিলিয়ে যায়, তেমনি খোকার ঐ দুটি কথা শাঁখ আর হুলুধ্বনির মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল তা কারো ঠাহরই হল না। সবাই ব্যস্ত, চারিদিকে হট্টগোল—গোলমাল। তারি মধ্যে পড়ে ছোট্ট খোকাটি এমন অসহায় ভাবে চারিদিকে চাইতে লাগল যে মনে হ'ল যেন কে এক পথহারা শিশু আপনার ছোট্ট নীড়টিকে হারিয়ে আশঙ্কার বেদনায় থর্‌থর্ ক'রে কাঁপচে! খোকা সেই জন-কোলাহলের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের মতো দেখতে লাগল—বাবা এত ধুমধাম করে ও কাকে নিয়ে এল? পিসিমা ওকে কেন কোলে করে বাড়ির ভিতর নিয়ে চলেছে? এ কে? এর গায়ে এত ঝক্‌মকে গয়না কেন? মুখে অতখানি ঘোমটা কেন? একে ত কখনো দেখিনি! এ আমাদের কে হয়? ওকি, ওর সব জিনিষ-পত্তর নিয়ে বাবার ঘরে তুল্‌ছে কেন? মায়ের তোরঙ্গটা খাটের নীচে সরিয়ে রেখে, ওর তোরঙ্গটা সেইখানে রাখচে কেন? মায়ের

বাক্সটা চৌকির উপর থেকে নড়িয়ে রেখে ওর বাক্সটা তার উপর রাখচে কেন? এসব কি অনাসৃষ্টি কাজ! তার মনে হতে লাগল কে যেন ঝড়ের মতো এসে, সব ওলোট-পালোট করে, তার সমস্ত কেড়ে নিয়ে, ঘর দখল করে নিচ্চে। ইচ্ছে হচ্ছিল, তার সেই ছোট্ট বাহু দুটি দিয়ে সজোরে তাকে হটিয়ে দেয়, কিন্তু কার সাহসে সে এগিয়ে যাবে? মা যে কাছে নেই!

বামা-ঝী খোকার কাছে এসে বল্লে—"খোকা তোর মা এসেছে!" চারিদিকে চেয়ে চীৎকার করে খোকা বলে উঠল—"কৈ, কৈ, আমার মা কৈ?" খোকার এই আকুল চীৎকার তার বুকের ভিতর থেকে একরাশ কান্না চোখের পাতার উপর এনে ঝরিয়ে দিলে। খোকার ইচ্ছা হচ্ছিল, বাবার কাছে একবার ছুটে যায়। কিন্তু বাবাকে সবাই এমন ঘিরে ধরেছে যে সেখানে যাবার ফাঁক নেই। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল! কেউ তার কাছে এলো না, কেউ তাকে কোলে নিলে না। সবাই ঐ ওর কাছেই যাচ্ছে, ওকেই দেখছে, তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। সে আস্তে-আস্তে ঠাকুমার ঘরে গিয়ে খাটের নীচে অন্ধকারে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। একলাটি খোকা সেই অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে শুনতে লাগল, শাঁখ বাজছে, হুলুধ্বনি হচ্ছে—একটা হাসি, একটা আনন্দের স্রোত চলেছে। যদিও সে ঠিক বুঝতে পারছিল না, তবু তার মনে হচ্ছিল, যেন সে একা—তার কেউ নেই! অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেলে কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে যেমন বুক-দুর্‌-দুর্‌ করে, আজ তার ঠিক তেম্‌নিতর বুক দুর্‌ দুর্‌ করতে লাগল।

ঠাকুমা সমস্ত বাড়ী খুঁজে শেষে খাটের তলা থেকে খোকাকে বার করলেন। ঠাকুমা ডাকলেন—"আয়"। সেই স্নেহের সুরে খোকা আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এসে ঠাকুমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ লুকোলে। আজ তার প্রথম মনে হ'ল, কি স্নিগ্ধ এই ঠাকুমার বুকটি! সমস্ত দুঃখ তার যেন জুড়িয়ে দিতে চাচ্চে। ঠাকুমা বল্লেন—"চ' তোর মায়ের কাছে, মা তোকে ডাকচে।" সত্যি! মা তাকে ডাকচে? খোকা লাফিয়ে উঠল। ঠাকুমা তাকে বুকে করে নিয়ে চল্লেন। খোকা যেতে-যেতে ঠাকুমার কানে-কানে জিজ্ঞাসা করলে—"কৈ মা?" ঠাকুমা দূর থেকে আঙুল তুলে বল্লেন—"ঐ যে!" খোকা আবার ঠাকুমার বুকে মুখ লুকোলে। সেই বুকের অন্ধকারের মধ্যে খোকার মনে হ'ল, যেন তার মা চুপিচুপি এসে একটি চুমু দিলে;—সে যেমন মাকে আঁকড়ে ধরতে যাবে আর অম্‌নি তার মা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলেন। খোকা বাবার কানে-কানে জিজ্ঞাসা করলে—"বাবা, মা কখন আসবে?" বাবা খোকার মুখের দিকে চোখ তুলে শুধু চেয়ে রইলেন, কোনো জবাব দিতে পারলেন না। খোকা যখনই বাবাকে জিজ্ঞাসা করত—মা কখন আসবে? বাবা বলতেন—আসবে, আসবে—শীগ্‌গির আসবে। বাবার কাছে থেকে এই আশ্বাস পেয়ে এতদিন পর্য্যন্ত খোকা আশায় আশায় ছিল, কিন্তু আজ যখন কোনো জবাবই পেলে না, তখন সে যেন বুঝতে পারলে, আর আশা নেই! তার সমস্ত মনটা কেমন নেতিয়ে পড়ল। বাবার চোখের দিকে

চেয়ে সে আর মায়ের কথা ভুলতেই পারলে না। কে যেন তার ভিতরে-ভিতরে বলতে লাগল—মা আর আসবেনা—আসবেনা! কিন্তু কেন আসবে না?—কি হয়েছে? হায়, এর জবাব কে দেবে? খোকার তখন কেবলই মনে হ'তে লাগল—বাবার এই কোল ছেড়ে ঠাকুমার হাত ছাড়িয়ে সে এখুনি ছুটে পালিয়ে যায় তার মায়ের কাছে—সেই দূরে—দূরে—অনেক দূরে—যেখান থেকে তার মা আর আসতে পারছে না।

খোকার বুঝি আজ ক্ষিদে নেই! ভাত দু'গরাস বই খেতেই পারলে না। অমন যে ডিম-ভরা বড় কইমাছটা—তাও পাতে পড়ে রইল। তার যে অমন দুষ্টুমি—যার জন্যে বাড়ীসুদ্ধ লোক হিম্‌সিম্ খেয়ে যেত, সে দুষ্টুমি আজ কোথায় গেল?

দুপুরবেলা নতুন-বউ খোকাকে চুপিচুপি কাছে ডাকলে। সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল—তার সেই বড়-বড় চোখ-দু'টি তার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তুলে। বউ তাকে কোলে নিয়ে কত আদর করলে, কিন্তু সে ঠিক পুতুলের মতো অসাড় হয়ে রইল। কে জানে এম্‌নিতর স্পর্শের আনন্দ-স্মৃতি তার বুকের মধ্যে হাহাকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কি না! আর হয়ত মনে বাজছিল যে, তার লাল-ফুল কালো-জল অবধি পড়া, একশো অবধি গোণা, নিজের হাতে ভাত-খাওয়া প্রভৃতি তারিফ করবার মানুষ তার এ সংসারে কেউ নেই। হায়, সবই ব্যর্থ হয়ে গেল!

সমস্ত দিন বাড়ীতে নানা গোলমাল চল্‌ল—খোকার মন তার কোনোদিকেই গেল না। খিড়কির বাগানে বাতাবি-লেবুর গাছে পাড়ার ছেলেরা নতুন দোলা টাঙিয়ে হুস্ হুস্ করে দুলচে—সে জানলায় দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগ্‌ল।

রাত্তির বেলায় বাবা ডাকলেন—"ওরে খোকা, আমার কাছে শুবি আয়। খোকা কিছু না বলে ঠাকুমার বিছানায় গিয়ে মুখ-গুঁজে শুয়ে পড়ল।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

বনের জ্যোৎস্না

গাছে গাছে মাথায় মাথায়
জড়িয়ে নিবিড়
আলিঙ্গনে,
তাদের পরে আধখানা চাঁদ
হাস্‌ছে বসে'
শুভ্রাসনে।

পাতার পরে হাজার পাতা—
নিশান পাশে
নিশান দোলে,
ছোট্ট হাজার মুক্ত অসি
জল্-জলিয়ে
কে ঐ খোলে!

পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি,
উঁচু নীচু
গাছের মাথা,—
নীল-সাগরে শাদা ফেনায়
হেথা হোথা
ঢেউর মাতা'!
সুদূর হ'তে দেখ্‌ছি চেয়ে
গাছের তলায়
স্তব্ধ কালো
লুকিয়ে আছে চোরের মত,
পাহারা দেয়
তীব্র আলো!
জড়িয়ে 'দেহ আঁধার বাসে
মাথায় জ্বেলে'
লক্ষ হীরে
দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো অন্ধ
ধরার বুকে
সুপ্তি তীরে।
দীর্ঘ গাছের সুপ্ত বনে
তৃপ্ত যেন
কিশের আশা,
লক্ষ পাতার কানে কানে
চাঁদের আলো
কইছে ভাষা!
ভুবন-মাঝে নেইক সাড়া,
নাইক ধ্বনি
শব্দ মোটে,
এই নিভৃতে সজীব গাছে
চাঁদের চুমোয়
শিউরে ওঠে!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

বারোয়ারি উপন্যাস

১২

বম্বে-মেল স্থান ও কালের অসীমতাকে যেন উপহাস করে ফুৎকার দিতে দিতে ছুটে চলেছিল, যেন ময়দানবের খোকা একটা হাউইএ আগুন লাগিয়ে ময়দানের বুকের উপর দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। বাহিরে মাঠের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ঝোপঝাড় গাছপালা অন্ধকারের জমাট ডেলার মতন দেখাচ্ছে; সেই অন্ধকারের মধ্যে গাড়ীর ভিতরকার আলো জান্‌লার ফুকোরে ফুকোরে উঁকি মেরে তাদের দেখ্‌ছে। এই দুর্দ্দান্ত বেগের বুকে বসে কমলা হরেন আর ক্ষিতীশ, তিন জনেই অনুভব কর্‌ছিল, এ যেন নিয়তির গতি, তাদের টেনে নিয়ে যে কোথায় ছুটেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই!

কমলা তার স্বামীর কাছে চলেছে, যে-স্বামী তাকে একদিন না দেখে থাকতে পারে না,—তার কাছে এতদিনের অদর্শনের পর ফিরে চলেছে! এতে কমলার মনে আনন্দ না ভয় বেশী হচ্ছিল, তা সে স্পষ্ট ঠাহর কর্‌তে পার্‌ছিল না। কমলা ভাব্‌ছিল, এতদিন সে বাড়ী ছাড়া, তিনি যদি এ কথা টের পেয়ে

থাকেন তা হলে কি তিনি তার কথা বিশ্বাস কোরে তাকে গ্রহণ করতে পারবেন? তার ছেলে হয়নি বোলে শাশুড়ী ত তাঁর ছেলের আবার বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়েই ছিলেন, কেবল ছেলের মত হয়নি বোলেই তিনি সঙ্কল্প পূর্ণ করতে পেরে ওঠেন নি; এখন যদি এই ছল ধোরে তিনি ছেলের বিরক্ত মনের সুযোগ পেয়ে তাঁর সঙ্কল্প কাজে পরিণত কোরে থাকেন, তা হলে সে গিয়ে দেখবে তার জায়গা আর-একটি মেয়ে এসে দখল কোরে বোসে আছে, শুধু বাড়ীতে নয়, স্বামীর হৃদয়েও,—সেখানে তার আর কোথাও ঠাঁই নেই। এতদিন হয়ত তার স্বামী তাকে কত খুঁজেছেন, কিন্তু সে ত তাঁকে এতদিন কিছুই খবর দ্যায়নি; বাপের বাড়ীতেও ত দ্যায়নি। সুতরাং সে যদি শ্বশুরবাড়ীতে ও স্বামীর হৃদয়ে বেদখল হয়ে গিয়ে থাকে তার জন্যে দায়ী তার শাশুড়ী আর স্বামী, না সে নিজে, কমলা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। যদিই তার স্বামী এর মধ্যে বাস্তবিকই বিয়ে কোরে থাকেন, তবে তার গতি কি হবে? যদিই এখন স্বামী তার সমস্ত কথা শুনে বিশ্বাস কোরে তাকে গ্রহণ করতে চান, তাহলেই কি সে সতীনের সঙ্গে ঘর করতে পারবে? যে বাড়ীতে ও হৃদয়ে সে একেশ্বরী ছিল, সেখানে আর-একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোকের সঙ্গে নিজের অধিকার নিয়ে নিত্য টানাটানি করতে হবে? আর যদি স্বামী আর শাশুড়ী গ্রহণ নাই করেন, তবে ত সব ফুরিয়ে গেল, তখন সে দাঁড়াবে কোথায়? বাপের বাড়ীতে বাপ মা তাকে ফেলতে পারবেন না হয়ত; কিন্তু একমাস পরে স্বামীর বাড়ী ও মন থেকে বিতাড়িত হয়ে সে আবার ঘুরে গিয়ে বাপের বাড়ীতে দাঁড়াবে? তাঁরাই কি তাকে আর বিশ্বাস করতে পারবেন, না আগের মমতা তাঁদের কাছ থেকে সে পাবে? স্বামী যাকে অবিশ্বাস কোরে তাড়িয়ে দিয়েছে, একমাস যে কোথায় ছিল কি করেছে কেউ জানে না, তাকে বাড়ীতে নিলে তার বাবার সমাজে মাথা তুলবার জো থাকবে না; তার বাবার উঁচু মাথা হেঁট কোরে সে পাবে শুধু ত একটু আশ্রয়—যা হবে ঘৃণায় বিষদিগ্ধ, উঠতে বসতে গঞ্জনায় কণ্টকময়! কিন্তু সে আশ্রয়ও যদি সে না পায় তবে? ক্ষিতীশ তাকে আশ্রয় দিয়েছে অসহায় বিপন্ন দেখে; তার বাড়ীতে চিরজীবন থাকবে সে কিসের অধিকারে? ক্ষিতীশই বা তাকে চিরকাল পুষবে কেন? কিন্তু তখনই কমলার মনে পড়ল ক্ষিতীশের কথা 'যাক্, আরও একটা দিন তবু পাওয়া গেল!' কমলাকে নিজের কাছে রাখবার যে আগ্রহ ক্ষিতীশের এই অসাবধানে-বলা সাবধানে-ঢাকা কথার মধ্যে ধরা পড়েছে তাতে তার এই আশ্রয়ও আর নিরাপদ নয়; ক্ষিতীশের মনের ভাব ত শুধু এই একটি কথাতেই ধরা পড়েনি, তা যে ধরা পড়ে তার চোখের প্রত্যেক দৃষ্টিতে। কমলাকে দেখতে পেলেই তার মনের খুসী চোখের কোণে উঁকি মেরে তার দৃষ্টিকে উজ্জ্বল কোরে তোলে, সে ঢাকতে চাইলেও ধরা পড়ে; সে কতবার কত ছল কোরে কমলার কাছে এসে একটা কথা বোলে যাবার চেষ্টা করে, দূর থেকে কেমন একটা মুগ্ধ কাতর দৃষ্টি ফেলে সে তার দিকে চেয়ে থাকে। এই কথা মনে হতেই কমলা চোখ ফিরিয়ে দেখলে

গাড়ীর ওপারের বেঞ্চিতে কোণে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে ক্ষিতীশ বোসে আছে, কিন্তু তার দৃষ্টিটি আরতি-প্রদীপের শিখার স্বর্ণরশ্মির মতন এসে পড়েছে তারই মুখে। কমলা মনে মনে শিউরে উঠে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌তে তার দৃষ্টি দেখে এল হরেনকে। হরেন কাম্‌রার মাঝখানের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছে, তার দৃষ্টি গাড়ীর আলো ঢাকা সবুজ ঘেরাটোপের আশে-পাশে ফানুষ-ঢাকা আলোর ধারে পতঙ্গের মতন চঞ্চল হয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। কমলা ভাব্‌লে—'হরেন-দাদা ত বড়লোক, সে আমাকে আশ্রয় দিতে পার্‌বে না?' এই কথা মনে হতেই চরম দুঃখের হতাশায় কমলার হাসি পেল—'বাপের বাড়ীতে শ্বশুর-বাড়ীতে যার ঠাঁই হল না, তাকে ঠাঁই দেবে হরেন-দা! হরেন-দার বাবা ত তার বাপের গাঁয়েরই লোক; তিনি তাঁর ছেলেকে কেন আমার মতন স্বামীর তাড়ানো বাপ-মার খেদানো মেয়েকে আশ্রয় দিতে দেবেন?' কমলা আর ভাব্‌তে পার্‌ল না, সে গাড়ীর জান্‌লার ধারে বোসে বাইরে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল—সেখানে কী বিরাট জমাট অগাধ অন্ধকার! তার নিজের ভবিষ্যৎটাকেও মনে হল অমনি অগাধ অন্ধকারের জঠরে হারিয়ে যাওয়া। যা হবে তাই দেখ্‌বার প্রতীক্ষাতেই কমলা স্তব্ধ হয়ে বোসে রইল—সে ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে আর ভাব্‌তে পার্‌ছিল না।

ক্ষিতীশ গাড়ীর এপারের জান্‌লার ধারে বেঞ্চিতে কোণে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বোসে একদৃষ্টে কমলাকেই দেখ্‌ছিল। গাড়ী দেশ ও কালকে ফুৎকারে টিট্‌কারী দিতে দিতে ছুটে যত এগিয়ে চল্‌ছিল ক্ষিতীশের ততই মনে হচ্ছিল কমলা প্রতি মুহূর্ত্তে তার স্বামীর নিকটতর হয়ে চলেছে আর তার কাছ থেকে ক্রমশই দূরে ছিট্‌কে পড়্‌ছে! তাই এই গোণা মুহূর্ত্ত কটির যতক্ষণ কমলা তার চোখের সাম্‌নে আছে সেইটুকুতেই সে নিজের মনের ভাণ্ডার পূর্ণ কোরে নিতে চাচ্ছিল, মন আগ্রহ দিয়ে ঠেলে তার চোখের কপাট খুলে রেখেছিল, চোখের পল্লব পড়্‌তে দিচ্ছিল না। কমলা বিবাহিতা, সে তাকে বোন বোলে স্বীকার করেছে, তবু তার মনে হচ্ছিল একে সর্ব্বদা কাছে রাখ্‌তে পেলে তার জীবন ধন্য হত। সে বাপ-মার একমাত্র সন্তান; কমলা যদি তার বোন হয়েই তাদের বাড়ীতে থাক্‌ত তা হলেও ত সে সুখী হত, এমন কথাও সে মনকে দিয়ে বলাচ্ছিল; মোটের ওপর তার মনের ইচ্ছাটা কেমন ঘোলা হয়ে উঠেছিল, কিছুই স্পষ্ট ছিল না। কমলাকে সে হয়ত এজন্মে আর কখনো দেখ্‌তে পাবে না; স্বামীর আদরে কমলার মনে এই কটা দিনের স্মৃতি একটা দুঃস্বপ্নের মতন আব্‌ছায়া আতঙ্কে জড়িত হয়ে থাক্‌বে; কচিৎ কখনো যখন এই দুর্দ্দিনের কথা কমলার মনে পড়্‌বে তখনই তারই মাঝে মাঝে তার কথা কমলার মনে হবে, আর হয়ত একটু কৃতজ্ঞতা তার মনের কোণে মাথা তুল্‌তে-না-তুল্‌তে স্বামীর সোহাগে সব ডুবে যাবে। কমলাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কোরে তার লাভ হল এই জীবন-জোড়া মর্ম্মজ্বালা! হঠাৎ কমলা তার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে একটু হাস্‌লে দেখে ক্ষিতীশের চৈতন্য হল, সেও একবার হরেনের দিকে
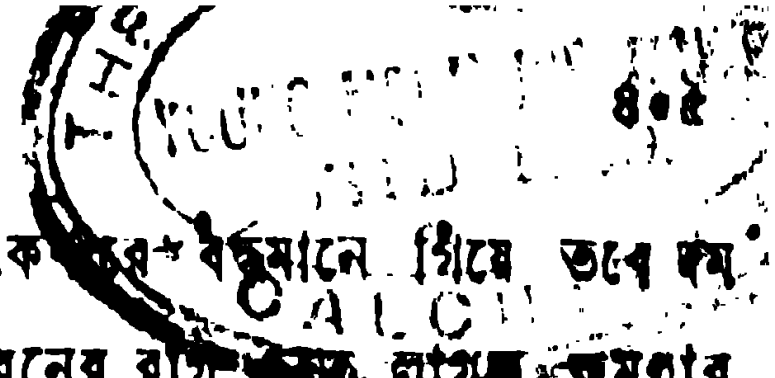
চট কোরে দেখে নিয়ে জান্‌লার বাইরে অন্ধকারের কালীর মধ্যে আপনার ব্যথিত দৃষ্টি ডুবিয়ে দিলে; আর তার যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়্‌ল, তা গাড়ীচলার হুহুশ্বাসের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

গাড়ীর মাঝের বেঞ্চিতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা দুটো বেঞ্চির পিঠের ঠেসানের ওপর তুলে দিয়ে উর্দ্ধদৃষ্টিতে আলোর সবুজ বনাতের ঘেরাটোপটার দিকে তাকিয়ে হরেন ভাব্‌ছিল অন্য-রকম ভাবনা।—'কালী-গঞ্জের যতীন মিত্তির কে? বোধ হয় ক্ষিতীশের ভুল হয়েছে—কালীগঞ্জে মিত্তির-বংশ ত তারা ছাড়া আর কেউ নেই—ক্ষিতীশ যাঁকে যতীন মিত্তির বল্‌ছে তিনি হয়ত তার বাবা, মৈত্রমশায়কে সঙ্গে কোরে কল্‌কাতায় কমলার খোঁজ কর্‌তে এসেছেন। যদি তার বাবাই এসে থাকেন, তা হলে মেসে তার খোঁজ কর্‌তে যাবেনই; এই অকস্মাৎ কলেজ কামাই কোরে কল্‌কাতা ছেড়ে আসাতে তিনি রাগ কর্‌বেন নিশ্চয়। ফিরে গিয়ে কমলার বিপদের কথা বল্‌লেই তাঁর রাগ পোড়ে যাবে। আমি কমলার সঙ্গে এক মোটারে এসেছি ক্ষুদিরাম তা দেখেছে। বাবা যদি শোনেন যে একলা কমলার সঙ্গে আমি কল্‌কাতা ছেড়ে চলেছি তা হলে তিনি কি ভাব্‌বেন? কাউকে কিছু না বোলে চোলে আসা ভালো হয়নি দেখ্‌ছি। শেষকালে কমলাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমাকে না বিপদে পড়্‌তে হয়।' ভাব্‌তে ভাব্‌তে হরেনের মনে ভয় ঘনিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে এখনই গাড়ী থেকে নেমে ফিরে যেতে পার্‌লে বাঁচ্‌ত; কিন্তু গাড়ী ত একছুটে একেবারে বর্দ্ধমানে গিয়ে তবে দম নেবে। হরেনের রাগ গিয়ে লাগ্‌ল কমলার ওপর—কম্‌লি-অর্দ্ধোদয় যোগে গঙ্গায় ডুব দিতে এসেছিল! এখন গোলযোগে সে ডুবেছে। তাকে তুল্‌তে গিয়ে যে হরেনও ডুব্‌তে চলেছে! দুজন যুবাপুরুষে সুন্দরী যুবতীকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে চলেছে—এমন নিঃস্বার্থ পরোপকার-ব্রতের ওপর আজকালকার লোকের কি তেমন বিশ্বাস হবে? কম্‌লির স্বামী যদি তাকে না নেয়? তা হলে তাকে নিয়ে আবার ফিরে আস্‌তে হবে? তারপর? হরেন তার বাবাকে আর কমলার বাবাকে কেমন কোরে বিশ্বাস করাবে যে কমলা যে হারিয়ে গেছে তা সে আগে জান্‌ত না আর জেনেছেও অনেক পরে? ভবিষ্যৎ সমস্যা অত্যন্ত জটিল বোধ হতে লাগ্‌ল বোলেই হরেন মনে কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ল ক্ষিতীশ যাকে দেখেছে সে যতীন মিত্তিরই, তার বাবা নন।

গাড়ীর কাম্‌রার তিনটি প্রাণী নিজের নিজের ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল, গাড়ী একদম চুপচাপ। হঠাৎ হরেন শরীর ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বোসে বোলে উঠ্‌ল—আচ্ছা ক্ষিতীশ, তোমার ট্যাক্সি যাদের গাড়ী ভেঙে দিয়েছিল, তাদের একজনের নাম বল্‌লে, যতীন মিত্তির।—যোগেন মিত্তির নয়?

ক্ষিতীশ আর কমলা দুজনেই জান্‌লার বাইরে তাকিয়ে ছিল; হরেনের হঠাৎ-কথায় দুজনেই চম্‌কে উঠে ঘুরে বস্‌ল। ক্ষিতীশ বল্‌লে—তাও হতে পারে, আমার

ত ঠিক মনে নেই—ঐ তাড়াতাড়ির সময় একবার মাত্র শোনা।

হরেন জিজ্ঞাসা করলে—তাঁর চেহারা কেমন বল্‌তে পারো?

ক্ষিতীশ বললে—বেশ ঢ্যাঙা শক্ত চেহারা, রং ফর্শা, খুব বড় একজোড়া আধপাকা গোঁপ আর খাঁড়ার মতন নাক, চোখ দুটো ভারী চটা রকমের—দেখ্‌লেই তাকে একরোখা লোক বলেই মনে হয়।

হরেনের মুখ শুকিয়ে গেল। কমলা বোলে উঠ্‌ল—উনি ত তাহলে মিত্তির-জেঠা, হরেন-দাদার বাবা! তাঁর সঙ্গে কে ছিল ক্ষিতীশ-দা?

আজ কমলার মুখে অসঙ্কোচ ক্ষিতীশ-দা সম্বোধন শুনে ক্ষিতীশ একটু হেসে বললে—তাঁকে ত আমি চিনিনে ভাই, তাঁর নামও শুনিনি। তবে তাঁর চেহারা বর্ণনা করতে পারি, তা থেকে তোমরা চিন্‌তে পারো যদি।—লোকটি বেঁটে, মোটাসোটা গোলগাল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দাড়ি গোঁপ কামানো, মাথায় টিকি আছে, আর নাকের ওপর একটা আঁচিল...

কমলা বোলে উঠ্‌ল—ইনি আমার বাবা। হয়ত পোষ্টমাষ্টারের কাছে শুনেছেন যে হরেন-দার রেজেষ্টারী চিঠি গিয়ে ফিরে এসেছে তাই মিত্তির-জেঠাকে সঙ্গে কোরে হরেন-দার কাছে আমার খোঁজ করতে এসেছেন।

কমলার এই অনুমান হরেনের কাছেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য বোলে বোধ হল বোলেই তার মুখ আরো শুকিয়ে গেল। হরেন আর কোনো কথাই বল্‌বার খুঁজে পেলে না। ক্ষিতীশও যে কি বল্‌বে তা খুঁজে পাচ্ছিল না। হরেন আর ক্ষিতীশ দুজনকেই চুপ কোরে থাক্‌তে দেখে কমলাই আবার কথা বললে—তা হলে এই পরের ষ্টেশনে নেমে আমাদের ফিরে গেলে হয় না?

কল্‌কাতায় ফিরে গিয়ে মেসে নিজের ঘরটিতে উপস্থিত থাক্‌বার জন্যে হরেনের মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; তার বাবা আর মৈত্রমশায় গিয়ে যেন দেখ্‌তে পান সে কল্‌কাতাতেই আছে, কমলাকে নিয়ে সে পশ্চিমে যায়নি। তাই কমলার কথা শুনে উৎসুক হয়ে হরেন ক্ষিতীশের মুখের দিকে তাকালো। ক্ষিতীশ বললে—পরের ষ্টেশন ত সেই বর্দ্ধমান? আজ রাত্রে ফের্‌বার আর ত গাড়ী নেই। কাল সকালের গাড়ীতে কল্‌কাতায় যতক্ষণে পৌছব প্রায় ততক্ষণে আমরা প্রতাপগড়ে পৌছে যাব। যার জিনিস তার হাতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা ত সোমবারই ফির্‌ব, ততদিন ওঁরা কল্‌কাতাতেই থাক্‌বেন নিশ্চয়!

ক্ষিতীশ যখন বল্‌ছিল—যার জিনিস তার হাতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা ত সোমবারই ফির্‌ব—তখন তার কথার সুরে আর চোখের দৃষ্টিতে এমন একটি বিষাদ ফুটে উঠেছিল যে তা কমলার কাছে ধরা পোড়ে গেল; কমলা নিজের স্বামীর উল্লেখে আর ক্ষিতীশের কথার ভঙ্গীতে লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে বস্‌ল; ক্ষিতীশ দেখ্‌লে কমলার মুখ কমলবর্ণ হয়ে উঠেছে, তার ওপর সবুজ রঙের ঘেরাটোপে ঢাকা সবুজ আলো পোড়ে তাকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে—যেন অরুণ-বেলার ফুটনোন্মুখ কমলের গায়ে সবুজ পাতা।

থেকে অরুণ-আভা প্রতিফলিত হয়েছে। কমলা মুখ ফিরিয়ে বসে ভাবছিল ক্ষিতীশের প্রত্যেকটি কথার নিগূঢ় অর্থ—যার জিনিস তার হাতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা ত সোমবারই ফিরব। ক্ষিতীশের কথা যা বললে তার মন যে তা বলতে চায়নি তা তার কথার বিষণ্ণ সুরই কমলাকে জানিয়ে দিয়ে গেছে—ফিরিয়ে দিতে সে যাচ্ছে বটে, কিন্তু অনিচ্ছায়, এবং ফিরবে সে নিশ্চিন্ত হয়ে যে নয় তা নিশ্চিত, এবং ফিরিয়ে দেওয়া ব্যাপারটা যে ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন হতে নাও পারে এ সন্দেহও তার মনে বিলক্ষণ আছে! কমলা লজ্জায় ভয়ে যেন মোরে যাচ্ছিল। সে অন্ধকারের মধ্যে তার লজ্জিত দৃষ্টি ডুবিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বোসে রইল।

হরেন বেচারা একরকম মরীয়া হয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ক্ষিতীশ তাই দেখে বললে—রাত হয়েছে, শুয়ে পড়া যাক। কমলা তুমিও শুয়ে পড়ো।

কমলা মুখ না ফিরিয়েই বললে—আপনারা শোন্। আমার এখনো ঘুম পায়নি।

১৩

কমলার স্বামী চাকরী করত আউধ-রোহিলখণ্ড রেলে প্রতাপগড় ষ্টেশনে। ক্ষিতীশ হরেন আর কমলা প্রতাপগড়ে নেমে একখানা গাড়ী কোরে গণেশী মহল্লায় সতীশের বাসার সন্ধানে গেল। গাড়োয়ান যখন গণেশী মহল্লায় পৌঁছে বললে—বাবু, এহি তো গণেশী মহল্লা আ চুকা।—তখন ক্ষিতীশ বললে—কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, সতীশবাবুর বাসাটা কোথায়।

হরেন সমস্ত পথটা আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে গম্ভীর হয়েই এসেছে; এখনো তার কোনো চেষ্টা বা উদ্যম দেখা গেল না; তার কেবলই মনে হচ্ছিল সতীশ যদি কমলাকে না নেয়, তা হলে সে কমলাকে নিয়ে ফিরে কালীগঞ্জে কেমন কোরে যাবে? এর চেয়ে ঢের ভালো হত যদি সে কমলাকে নিয়ে আগেই বাড়ী যেত। তারা সতীশের বাসার যত কাছাকাছি হচ্ছিল ততই তার মুখ শুকিয়ে উঠছিল। কমলারও মুখ একেবারে বোঁটাছেঁড়া পদ্মফুলের মতন দারুণ উদ্বেগে আমূলে উঠে ম্লান হয়ে পড়েছিল। কতকাল পরে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে এই সম্ভাবনা যত ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছিল, ততই লজ্জা আনন্দ আতঙ্ক অনিশ্চয়তা তার বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠছিল, তার বুক ঢিপঢিপ করছিল।

পথ দিয়ে একজন বাঙালীকে যেতে দেখে ক্ষিতীশ গাড়ীর জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—মশায়, সতীশ-বাগচীর বাসা কোন্‌টা বলতে পারেন?

সেই লোকটি জিজ্ঞাসা করলে—কোন্ সতীশ-বাগচী? যিনি পোষ্টাপিসে কাজ করেন, না যিনি ষ্টেশনে কাজ করেন? এখানে দুই সতীশ-বাগচী আছেন।

কমলার বুকের মধ্যে একটা তুমুল তোলপাড় বেধে গেল। ক্ষিতীশ বললে—যিনি ষ্টেশনে কাজ করেন তিনি।

লোকটি বললে—ঐ যে ল্যাম্পপোষ্টটা দেখা যাচ্ছে, তার সামনে ঐ যে রক-বার-করা বাড়ী—ঐটে সতীশবাবুর বাড়ী। তা তাঁরা ত এখানে কেউ নেই? তাঁর স্ত্রীর

খুব ব্যামো বোলে ছুটি নিয়ে সাত-আটদিন হল তিনি দেশে গেছেন।

ক্ষিতীশ খানিকটা হতাশ খানিকটা আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—বাড়ীতে কেউ নেই?

উত্তর হল—না, বাড়ীতে তালা বন্ধ। সতীশবাবুর মা-ঠাকরুণ কেবল এখানে ছিলেন, তিনিও সতীশবাবুর সঙ্গে গেছেন।

ক্ষিতীশ গাড়ীর মধ্যে মুখ টেনে নিয়ে বোসে পোড়ে বোলে উঠ্ল—তাইত! এখন কি করা যায়?

ক্ষিতীশ হতাশভাবে কথাটা বল্‌বার চেষ্টা করলেও তার অন্তরের আনন্দ তার চোখে মুখে ফুটে উঠ্ল। যাক, কমলা এখনো দু-চার দিন তার কাছেই থাকবে তাহলে।

আসন্ন প্রত্যাখ্যানের ভয় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কমলারও অনেকটা স্বস্তি বোধ হল; কিন্তু স্বামীর কাছে ফিরতে যত দেরী হবে তত তার কৈফিয়তের বোঝা ভারী হয়ে উঠ্‌বে আর তার স্বামীর বিশ্বাস করা তত কঠিন হয়ে পড়্‌বে ভেবে কমলা উতলা হয়ে উঠ্ল। ভদ্রলোকটি যে বল্লেন—সতীশবাবু তাঁর স্ত্রীর ব্যামো বোলে বাড়ী গেছেন—এ কথার মানে কি? সে যে অসুখ হয়ে ক্ষিতীশের বাড়ীতে পোড়ে ছিল, এ খবর কি তিনি পেয়েছেন? কেমন কোরে পাবেনই বা? সে যে হারিয়ে গেছে এক মাসেরও ওপর হল, এ খবর তিনি নিশ্চয় পেয়েছেন। এতদিন সে তাঁকে চিঠি দেয়নি, এতদিন পরের বাড়ীতে সে আছে, সে বাড়ীতে আশ্রয়দাতার কোনো স্ত্রীলোক আত্মীয় নেই, এ সমস্তই তাকে এখন ভয় পাইয়ে তুলতে লাগ্ল। স্ত্রীর অসুখ বোলে এই যে দেশে যাওয়া, এর মানে কি নতুন স্ত্রীকে বরণ কোরে ঘরে আনা; সে বাড়ীতে তার প্রবেশের দ্বার একেবারে রুদ্ধ কোরে দেওয়া? কী সর্ব্বনাশ! সে তাহলে দাঁড়াবে কোথায়? ক্ষিতীশ যখন হতাশভাবে বোসে পোড়ে বোলে উঠ্ল—তাইত এখন কি করা যায়? তখন কমলা ভয়ার্ত্ত কাতর দৃষ্টিতে ক্ষিতীশের দিকে ফিরে তাকালো, তার চোখে জল ছলছল করছিল।

হরেনও দুর্ভাবনায় একেবারে ডুবে গিয়েছিল। সতীশের হাতে কমলাকে সঁপে দিয়ে বোঝা নামিয়ে সে হাল্কা হয়ে ফিরতে পারলে তার ভাবনা অনেকখানি কোমে যেত; এখন আবার কমলাকে নিয়ে কল্‌কাতায় ফিরতে তার ভয় করছিল—সেখানে তার ও কমলার বাবা বিচার কর্‌বার জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছেন। হরেনকে তার বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন—হরেন তাঁকে কিংবা মৈত্র মশায়কে খবর দ্যায়নি কেন, অথবা কমলার বাপের বাড়ী নিকটে থাকতেও তাকে সেখানে নিয়ে না গিয়ে পশ্চিমে অতদূরে নিয়ে গিয়েছিল কোন্ আক্কেলে,—তখন সে কি উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না বোলেই হরেনের ভয় আরো ঘনিয়ে উঠ্ছিল এবং তাতে কোরে চঞ্চল হরেন একেবারে গম্ভীর থম্‌থমে হয়ে উঠেছিল। আর হরেনের এই অটল গাম্ভীর্য্য কমলাকেও ভয় পাইয়ে তুলছিল।

হরেন ও কমলাকে নির্ব্বাক নিরুত্তর দেখে ক্ষিতীশ বল্লে—তা হলে ত কল্‌কাতাতেই ফিরে যেতে হয় এখন।

হরেন দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বল্‌লে—তা ছাড়া আর উপায় কি ?

ক্ষিতীশের হুকুমে আবার ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনে ফিরে গেল এবং পরের ট্রেনে তারা তিনজনে আবার কল্‌কাতা ফিরে চল্‌ল। ট্রেন যখন চল্‌ছিল তখন কমলা আর হরেন দুজনেই ভাব্‌ছিল ট্রেনে কলিশন হয়ে তারা গুঁড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে যদি যায় ত বেশ হয়—কমলাকে তা হলে অপরাধীর মতন স্বামীর কাছে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, স্বামীর প্রত্যাখ্যানের অথবা সতীনের সঙ্গে ঘর করার দুঃখও সহ্য করতে হয় না ; আর হরেনও তার দারুণ কড়া বাবার বিচারের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়।

কেবল ক্ষিতীশের মনের মধ্যে যে আনন্দ স্ফূর্তিলাভ করছিল তার আভা তার মুখে পোড়ে মুখ উজ্জ্বল কোরে তুলেছিল।

ক্ষিতীশেরা বিকেলবেলা কল্‌কাতায় এসে পৌছলো। ক্ষিতীশ একটা ট্যাক্‌সি ভাড়া কোরে কমলাকে তাতে তুলে হরেনকে ডাক্‌লে—চড়ো।

হরেন শুষ্কমুখে বল্‌লে—তোমাদের সঙ্গে আমি আর এখন যাব না ; এখন আমি বাসায় যাই। বাবা আর মৈত্র মশায় কোথায় আছেন খোঁজ নিয়ে সন্ধ্যের পর তোমাদের সঙ্গে দ্যাখা করব।

কমলা উৎসুক হয়ে ব্যগ্রস্বরে বল্‌লে—যত শিগ্‌গির পারো তুমি এসো হরেন-দা।

হরেন বল্‌লে—আচ্ছা।

ক্ষিতীশ ট্যাক্‌সিতে উঠে বস্‌ল এবং ট্যাক্‌সি ছুটে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। হরেন অপর একখানা ট্যাক্‌সি ডেকে তাতে আপনার বিছানা ব্যাগ তুলে নিজের মেসের উদ্দেশে রওনা হল।

হরেন মেসে পৌছে চীৎকার কোরে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—ক্ষুদিরাম, ক্ষুদিরাম, ওরে ক্ষুদে !

মেসের ঝি এসে বল্‌লে—ক্ষুদিরাম ত এখানে নেই বাবু।

হরেন রেগে বোলে উঠ্‌ল—সে নবাব-পুত্তুর কোথায় হাওয়া খেতে গেলেন ?

ঝি বল্‌লে—আপনার দেশ থেকে কর্তা-বাবু এসে ক্ষুদিরামকে নিয়ে গেছেন।

হরেনের মাথার মধ্যে রক্তস্রোত সন্‌ কোরে উঠে বন্‌ কোরে ঘুরপাক খেয়ে হৃদয়ে হুড়মুড় কোরে নেমে এল। সে জোর কোরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে নিজেই ট্যাক্‌সি থেকে ব্যাগ বিছানা নামিয়ে ফেল্‌লে এবং ট্যাক্‌সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে এহাতে ব্যাগ আর বিছানার মোট ঝুলিয়ে টক্‌টক্‌ কোরে ওপরে উঠে গেল। ওপরে নিজের ঘরের দরজার সাম্‌নে গিয়ে হরেন আরো আশ্চর্য্য হয়ে থমকে দাঁড়াল—তার ঘরে তার জিনিসপত্রের চিহ্নও নেই, আছে সেখানে আস্তানা গেড়ে বোসে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত কে—সে লুঙ্গি পোরে আরামে বোসে শট্‌কার নলে তামাক ফুঁক্‌ছে। হরেন দরজার সাম্‌নে হাতের বোঝা নামিয়ে ফেলে ফিরে দাঁড়াতেই তাদের মেসের পুরোনো মেম্বর গৌরাঙ্গ তার কাছেই আস্‌ছে দেখ্‌তে পেলে। হরেনকে ফির্‌তে দেখেই গৌরাঙ্গ বোলে উঠ্‌ল—আরে হরেন যে ? কখন এলে ?

হরেন গৌরাঙ্গের হাসির বদলে হাস্‌তে না পেরে শুক্‌নো মুখেই বল্‌লে—ব্যাপার কি

গৌরাঙ্গ? আমার ঘর বেদখল—অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক?

গৌরাঙ্গ বল্লে—তুমি কিছু জানো না নাকি? যেদিন তুমি পশ্চিম গেলে, সেইদিনই তোমার বাবা আর এক কে মৈত্র-মশায় এসেছিলেন। তোমার বাবা আমাদের ডেকে বল্লেন—'হরেন আর এখানে থাকবে না; আমি হরেনের জিনিসপত্তর সব নিয়ে যাচ্ছি—এই সেসনের সীট-রেণ্ট আর অন্য কিছু যদি মেসের পাওনা থাকে আমি চুকিয়ে দিয়ে যাব।' তিনি তোমার সীট-রেণ্ট দিয়ে গেছেন; কিন্তু আমরা পরদিনই বিলাস-বাবুর শালাকে মেম্বর পেয়ে গেলাম; তাই তোমার সীট-রেণ্টের টাকা কাল মনি-অর্ডার কোরে তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

হরেন প্রাণপণ বলে খুব সপ্রতিভ থাকবার চেষ্টা কোরে সহজভাবে বল্লে—ও! আচ্ছা, এখন ভাই আমার মোট দুটো তোমার ঘরে রেখে দাও, আমি এক সময় এসে নিয়ে যাব!

গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে—এখনই এসেই কোথায় চল্লে!

হরেন সিঁড়ি নামতে নামতে বল্লে—একবার বাবার খোঁজ নিয়ে আসি, তিনি আছেন, না দেশে ফিরে গেছেন।

গৌরাঙ্গ উপর থেকেই হেঁকে জিজ্ঞাসা করলে—রাত্রে এখানে খাবে ত? ঝিকে চাল নিতে বলব?

হরেন চেঁচিয়ে বোলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্ল—না, চাল নেবার দরকার নেই।

হরেন একলা নিরিবিলিতে নিজের অবস্থাটা ভেবে তলিয়ে বুঝে নেবার জন্যে চেনা লোকের সংস্রব ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্ল। হরেন ভাবতে ভাবতে চল্তে চল্তে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গিয়ে উপস্থিত হল। সে বাগানে ঢুকে এক টেরে একটা বেঞ্চিতে বোসে ভাবতে লাগ্ল—তার বাবার হঠাৎ তাকে কোনো খবর না দিয়ে তার বাসা তুলে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য সে কিছুই বুঝতে পারছিল না; কেবল আবছায়া এই বুঝছিল যে কমলা হারানোর সঙ্গে এর একটা কিছু যোগ আছে। কিন্তু কমলা হারানোর সঙ্গে যে তার কি অপরাধ ঘটেছে তা সে মাথা আলোড়ন কোরেও আবিষ্কার করতে পারছিল না। হয়ত তাঁদের খবর না দিয়ে কমলাকে নিয়ে পশ্চিমে যাওয়াতে তিনি রেগেছেন। যাক, সে ভাবনা ভেবে কোনো ফল নেই যখন, তখন ভাবা মিছে; এখন ভেবে দেখা উচিত তার কি করা উচিত। বাবার সঙ্গে দেখা কোরে অভিযোগ শুনে কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে যাওয়ার মধ্যে একটা যে হীনতা আছে তার অপমান, বিনা দোষে অবিচারে বাবার দণ্ডদানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অভিমান এবং বাবার সামনে আসামী হয়ে বিচার-প্রার্থী হবার ভয়—তিনে মিশে আবেগময় হরেনের মন আচ্ছন্ন কোরে ফেল্তে লাগল। সে পকেট থেকে মনিব্যাগ টেনে বার কোরে দেখ্লে তার সঙ্গে এখনো একান্ন টাকা সাড়ে তেরো আনা সঙ্গতি আছে; হাতে একটা হীরের আংটি আর সোনার ঘড়ীচেনও পুঁজি আছে! এতে তার কিছুদিন নির্ব্বাবনায় চলবে। তবে সে কেন হীনতা স্বীকার করতে যাবে?

অবিচারক অত্যাচারী লোক বাবা হলেও তার কাছে হরেন কিছুতেই মাথা হেঁট করবে না। এই সঙ্কল্প স্থির করেই হরেন বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং ষ্টেট্‌সম্যান আর বেঙ্গলী কাগজের আপিসে গিয়ে দুটো বিজ্ঞাপন দিয়ে এল—Situations Wanted কলমে যা হোক একটা কিছু চাকরী নিয়ে সে নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াবে। বাবার ও খাম-খেয়ালী অনুগ্রহ-নিগ্রহের ধার সে ধারবে না।

হরেন যখন বিজ্ঞাপন দিয়ে মনকে হাল্কা করে নিজের অঙ্গীকার-মতো ক্ষিতীশের বাড়ীতে কমলাকে তার বাবার খবর দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় কালীগঞ্জে কাণা শশী খুব-খুশী মুখ থেকে পাকা লাউ-বিচির মতন বড় বড় দাঁত বার করে মৈত্রমশায়ের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বলছিল—মৈত্রমশায়, আজ রাত্তিরে আমার বাড়ীতে আপনি দয়া করে আহার করবেন; মানসিক ছিল—মা-কালীর কাছে একটা পাটা বলি দিয়েছি—এই উপলক্ষ্যে মার মহাপ্রসাদ বন্ধুবান্ধব মিলে একটু একটু মুখে দেওয়া।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।
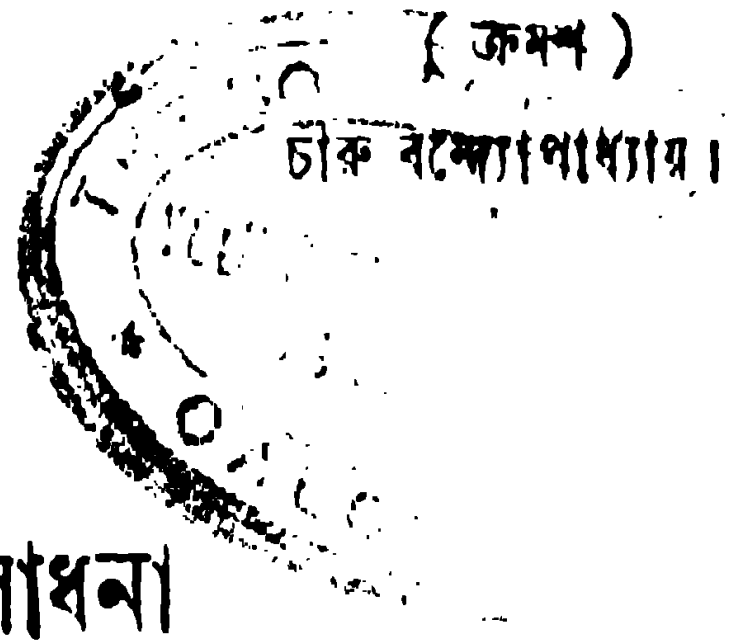
গৈরিকের সাহিত্য-সাধনা

সংসার, সাধনার তপোবন ও উপবন—উভয়ই। যদি সোনার চাবি দিয়া সোনার শিকল খুলিয়া ফেলা যায়, তবে উপবনের কুসুমতোরণ খুলিয়া যাইবে; ললিত উন্মাদনায় নবীন অযুত আবেশ-সিক্ত ধরণীর মুখখানি অমনি পটান্তরাল হইতে আসিয়া দর্শকের চক্ষু ধাঁধাইয়া দিবে। সে মুখে উচ্ছ্বসিত ভালবাসার আরক্তিম কুঙ্কুম লহরের পর লহর তুলিয়া প্রতিক্ষণে অপরূপ নৃত্যভঙ্গী লইয়া হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। এই রূপীয়সীর ফাগুয়ার ফাগ,—

"রূপের কিরণে ফাগুয়ার ফাগ
মুঠোমুঠি করি লুটিয়া ছড়ায়
দিশি দিশি তার অভিনব যাগ!"

রূপ-যজ্ঞ হইতে বিকশিত হইয়া উপবনের শ্যামলতায় গলিয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে। ইহাই সাধনার একদিক্—ইহা সাধনার উপবন, তপোবন নহে। এ জগৎকে উপবনের রূপ দিতে কত কবির চক্ষু ব্যস্ত ছিল, ব্যস্ত আছে, ব্যস্ত রহিবে—সংসারের মরণের ফাঁস রোগ-দুঃখের দারুণ ভীতি ও অদৃষ্টের অট্টহাস ভীমা লহরীর মত যখন প্রবল রুদ্রের মূর্ত্তি লইয়া প্রতি নিমেষে মানুষের সাধের সাজ-ঘর গ্রাস করিতে আসে, তখন জগতে হাসির কল্লোল আর উঠিত কি? এ দুঃসহ দারুণ দুঃখসমুদ্র-মন্থনে যখন বিশ্ব-ভুবন আত্ম-চৈতন্য-হীন, তখন মন্থনের ফলে জন্মাইল এক কবি। বিপুল সাধনা লইয়া তাহার জন্ম, বিকশিত শতদলসম তাহার চিন্তা মানস-সরোবরের ন্যায় তাহার মনের সরোবরে প্রতি মুহূর্ত্তে

দীপ্ত পুলকে ফুটিয়া উঠে—শতবরণময়ী শত-গন্ধযুতা সে চিন্তা তাহার অতুল বিত্ত। ইহাই তাহার ফুলশর। এ ফুলশর হস্তে লেখনীরূপ কার্ম্মুক-টঙ্কারে মনসিজ কবি বিদগ্ধ বিরূপ হরের অনাসক্ত কান্তিবৎ রৌদ্রময়ী ধরণীর অঙ্গে ফুলশর ফুটাইয়া দিল। এ ফুল-বাণের আঘাতে বিশ্ব-ভুবনে মূর্চ্ছনা জাগিয়া উঠিল—পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে অনঙ্গ-রঙ্গ প্রকাশ পাইল, বিশ্বময় ফুলশয্যা পাতা হইয়া গেল,—যেন পৃথিবী ব্যাপিয়া বাসরঘর আর ফুলশয্যার রাত্রি অনন্ত উৎসবের মত ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল! ধন্য কবির সাধনা, এ সাধনায় পৃথিবীর করাল কান্না চোখের আড়ালে লুকাইয়া পড়িল, মানুষের চোখে বিশ্ব-ভুবন এক উপবন-শ্রীতে ভরিয়া উঠিল। এ উপবনের কুসুম-তোরণ সোনার শিকলে আবদ্ধ,—কবি তাহার সোনার চাবি দিয়া এ দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া সকল সংসারকে ডাকিল, বলিল—'এ সাধনার উপবন,—এ পথে যাও মর্ত্ত্যলোকের দুর্লভ সুষমা এইখানে মিলিবে।' ধরার বুকের দুঃখ গলিয়া উহাতে রূপ ও রসের অমৃত-সংযোগ হইল, আর মাথায় পরানো হইল এক নব-বিবাহিতার সোনার মুকুট। সলজ্জ সরক্তিম নব-বধূকে রাজ-পাটে বসাইয়া কবি তাহার সাধনার উপবনের চক্ষুঃদান করিল।

তারপর তপোবন। ইহা সাধনার অন্ত-দিক্—উপবনের সাধনা বুঝিলে ইহাকে বুঝিতে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবটা বড় সুন্দর সহায়ক। উপবনের কবি দেখিয়াছি, তপো-বনের কবিকেও দেখিব। উপবনের কবি কাঞ্চন-সাহায্যে (চাবি) কাঞ্চন (শৃঙ্খল) খুলিয়া পাইল কি? পাইল যৌবন-চঞ্চলা বাসনা-রাগাধরা লাক্ষচরণা এক কামিনী! কামিনী ও কাঞ্চন লইয়া উপবনের কবি পঞ্চশর তূণে ভরিল—আর তপোবনের কবি? সাধনার অপর দিক্, এ তপোবন-সাধনা আসিল কোথা হইতে? এ সাধনার রহস্যগুহাহিত, প্রচ্ছন্ন আবরণের অন্তরালে ইহা কেমন যেন আত্ম-গোপন করিয়াছে। যুগের পর যুগ যায়—মানুষের স্তর বাড়িয়া চলে। অঙ্গ-সম্মিলন হইতে মানুষ জন্মায়, বাল্যে কৈশোরে যৌবনে অঙ্গ-লিপ্সা সমস্ত হৃদয় নাচাইয়া অবশেষে বার্দ্ধক্যে উহার অফুরন্ত গীতি লইয়া হাল্‌কা হাওয়ার মত শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া যায়, কিন্তু কোথায় যাইবে? ঊর্দ্ধলোকে স্বরলোকে এ কামনা-দীপ ত জ্বলিতে পারে না, তাই আবার উহার নিজ আকর্ষণেই এ কামলোক-কল্পিত-ভূর্লোকে সেই দীপশিখা নূতন জীবনের ভিতর দিয়া ফুটিয়া থাকে। এই নব কলেবরে আবার সেই লালসা-সঙ্গীত লহরের পর লহর তুলিয়া বাজিয়া থাকে—কিন্তু কখন হয়ত মৃত্যুর আড়ালে বোধ করিয়া থাকিবে যে ঊর্দ্ধে ঐ যে অনীকিনি নক্ষত্রলোক ঝক্‌মক্ করিতেছে, সেখানে স্তর-পরম্পরা সোপান ছায়াপথ বুকে নিঃশব্দে ভুবর্লোক স্বর্লোক ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধতম কেন্দ্রে পৌছিয়া থাকিবে। সেই music of the spheresএ তাহার গীতি লইয়া সুর-ঝঙ্কারে আর একটু সুর যোগ করিয়া দেয়, এ ইচ্ছা কি তাহার হয় নাই! বোধ হয়, হইয়াছিল,—কিন্তু যাইবে কেমন করিয়া? Gold and Tinsel, আত্মার সঙ্গে যে কামের কাদা মাখিয়াছিল

উহা যাইতে দিবে কেন? কিরণময় আত্মার আঁখি কামের কালি লাগিয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, একটু যাহা দৃষ্টি ছিল তাহাতেই দেখিয়াছিল সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। মনের ক্ষোভ লইয়া আবার ঘর করিতে আসিতে হইল। এই অন্তর-ইন্ধন হইতে মানুষের চোখ হঠাৎ খুলিয়া যায়—একদিন খুলিয়াছিল—সেই হইতেই ইহার সৃষ্টি। যখন একদিন মাহেন্দ্রক্ষণে এ মানুষ জাগিল, পৃথিবীর বুকের গান হঠাৎ তাহার কাণের পর্দা স্পর্শ করিল। সেই music of the spheresএর ইহা শেষ ধ্বনি অধস্তন হইতে ঊর্দ্ধতনের গীত-ঝঙ্কারের সহযোগিতা। তখনি পুরুষ বুঝিল, গীতি-ফুলমালিকার শেষ ফুল এই ধরণীর মর্ম্মে ফুটিয়াছে, এ ফুলের বোঁটার সন্ধান পাইলে, সে সূত্র ধরিয়া ওই অনন্তের সোপান মিলিবে, তাহা হইলে আর ব্যর্থ যাত্রার মর্ম্মপীড়া পাইতে হইবে না। এমনি করিয়া একদিন শুনিল, নিবাত-নিষ্কম্প হিমালয় যেন দুই হাত বাড়াইয়া ডাকিতেছে, 'আয়, আয়, এইখানে গুহা-গহ্বরে লুকাইলে সেই বোঁটার সন্ধান পাইবি,—সেখান হইতে 'সুরের সুরধুনী' বাহিয়া ঊর্দ্ধলোকে যাত্রা করিতে পারিবি!' পুরুষ যখন শুনিল, অমনি চলিতে চাহিল। পায়ে শিকল বাঁধা, আত্মার মহা-শঙ্খ ফুকারিয়া সে লালসার শিকল ভাঙ্গিয়া দিল, ধরণীর পানপাত্রখানি হেলায় ধূল্যবলুণ্ঠিত করিল, তারপর সে গুহালোকে প্রবেশ করিল।

এ গুহালোকে পুরুষ আত্মার অমর মুকুট-সন্ধানে আসিয়াছে—আসিয়া ধরণীর আর এক রূপ উন্মোচিত করিয়া দিল। উপবন-সাধনা দেখিয়াছি, এবার তপোবন-সাধনা দেখিব। ফুলশর লইয়া যে ভুবনকে কবি উপবনের বাসর-ঘর সাজাইয়া তুলিল, যে বাসর-ঘরের রাজ-পাটে নব-বধূকে বরণ করিয়া লইল, সেই ভুবনকে এ ত্যাগী ফুলশরের বদলে কার্ম্মুকের পরিবর্ত্তে পিনাক লইয়া ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে বাজাইয়া তুলিল, এইরূপে তপোবনের সৃষ্টি-কার্য্য আরম্ভ হইল। যে সোনার চাবি ও সোনার শিকল কবি উপবনের দুয়ারে রাখিল, এ ত্যাগী উহাদের পরিবর্ত্তে তপোবন-পথে ত্রিশূল ও ডমরু স্থাপনা করিল। বেদ-ত্রয়ের ত্রিশীর্ষ লইয়া ত্রিশূল, ডমরু হাঁকাইয়া জানাইয়া দিল যে,এই পৃথিবীর শীর্ষস্থল শিরোভাগ হিমালয়ের অন্তরদেশে এক মহা-তপোবন ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ তপোবন মানবের মুক্তি-তীর্থ। এ রাজ্যে হোমানল ধিকি ধিকি জ্বলিয়া আত্মার গ্লানি মুছিয়া দেয়—এ অগ্নি-পরীক্ষায় আত্মার ভোগ দগ্ধ করিয়া তবে উহাকে অ-মৃতলোকে লইয়া যাইতে হয়। তপোবনের কবি বড় গলা করিয়া কহিল, এইখানে যে বাড়বানল জ্বলিতেছে উহাতে কামিনী-কাঞ্চন ভস্মীভূত হয়। উপবনের কবি কহিল, এইখানে মানুষের দুর্নিবার দুঃখ-সমুদ্রে এই ললিত-লাবণ্যের খচিত প্রেমফুলহার ভেলার মত দুইটী হৃদয়কে শত-বিপদ-ঝঞ্ঝায় শত চমকপ্রদ কলহ-নিপুণা বাক্‌চাতুর্য্যময়ী বিদ্যুৎবিলসী রজনীর মাঝেও ধ্রুব-জ্যোতিঃর দিকে নিঃশঙ্কভাবে লইয়া যায়। হরের তপস্যা ও মদনের ফুলশরের মত এ তপোবন-সাধনা ও উপবন-সাধনা সংসারের দুই দিক লইয়া পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে উভয়ই সাধনা বটে—মহাসাধনার ফলে কবি হওয়া যায়, মহা সাধনায় সাধক হওয়া যায়।

তপোবনের কবি কহিল, 'আমার রাজ্য মুমুক্ষুর জন্য, যাহারা মুক্তি চায়।' উপবনের কবি কহিল, 'আমার রাজ্য বুভুক্ষুর জন্য, যাহারা ভোগ করিতে চায়।' এইরূপে দেখিলাম, সংসার-সাধনার তপোবন ও উপবন। উপবনে সংসার বধূ-বেশী, তপোবনে পৃথিবী মাতৃ-রূপী। উপবনের চক্ষুতে ভুবন-বলয় এক অসামান্য লাবণ্যবতীর অঙ্গ-বিকাশ, আর তপোবনের চক্ষুতে সে চঞ্চল উর্ম্মিফেনার তরলিত লাবণ্য স্থির ধীর গম্ভীর হইয়া শুক্লসন্ধ্যার মত, যে মায়ের প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু এ উভয় সাধনার কি মণি-কাঞ্চন সংযোগ হয় না? এই জগতের দুই সাধনা কি এক কবির বীণায় বাজিতে পারে না—উপবনের পথ বাহিয়া কবি কি ভিতরের তপোবন-প্রান্তরে দগ্ধ ভুবনকে স্বর্গাবিভূতি-স্নাত করিতে পারেন না! অবশ্যই পারেন। এ ধরণের প্রয়াস গৈরিক আভায় সুসম্বৃত—এ চেষ্টার সাফল্যে সাহিত্যের অঙ্গনে অবিনশ্বর মণি-দীপ জ্বলিয়াছে,—এ চেষ্টার অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ বাণ-মুখে তপোবনের ধুতুরা মানবের ভাব ও ভাষার সাম্রাজ্যে আসিয়া জুটিয়াছে—ধূর্জ্জটীর জটাজালের কর্পূরকুন্দ শুক্ল জ্যোৎস্না সেই ধুতুরার অঙ্গে লিপ্ত হইয়া সাহিত্যের দেউলে দীপ্ত হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। ইহাকেই বলে, চন্দ্রালোক, শশাঙ্ক-মৌলির চন্দ্র-জ্যোতিঃ।

এ চন্দ্রালোকে মহাকবি কালিদাসের কাব্য-বাতায়ন-পথ উদ্ভাসিত, ভবভূতির সাত্ত্বিক ভাবের উপর, বারিধির উপর জ্যোৎস্না-নৃত্যের মত চন্দ্র দীপ্তি প্রদীপ্ত। বঙ্গ কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দে চন্দ্রালোক ঝলমল্ করিতেছে—শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্রে সে তপোবন-হোমানল যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মাইকেল-হেম-নবীন-অক্ষরে সে অক্ষয় জ্যোতির রেখার ছায়া পথ সমুদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র-চিত্রে সে আলোক-প্রপ্রাত জ্যোতিষ্কের অক্ষরে ফুটিয়াছে, আর অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-সুরধুনীতে সেই চন্দ্রালোক ভাব-তন্ময় হইয়া রাম-ধনুর সপ্ত-বরণে গলিয়া পড়িল—সপ্তস্বর্গের সাতটি রং এই চিত্রকরের চিত্র-নদীতে উর্ম্মির পর উর্ম্মি রাঙাইয়া তুলিয়াছে,—সপ্তাহের সপ্তদিনে এই রঙ্-সপ্তমীর উৎসব চলিতেছে। ধন্য চিত্র, ধন্য তুলি! সত্যেন্দ্রনাথের সত্য-লোকে সে চন্দ্র-দীপ্তির বিচ্ছুরিত কিরণ জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে! এইরূপ কোথায় নয়? চন্দ্রালোকের শুভ্র-আলিপনা কম বেশী কাহার অঙ্গ না উজ্জ্বল করিয়াছে? যুরোপের সাহিত্য-মন্দিরে বাণীর অলক্তক-রাগ রহিয়াছে, কিন্তু সেই চন্দ্রালোক দান্তে গেটে শেক্স-পীয়রের লেখার উপর দাগ রাখিয়া দ্রুত অপরাপরের ভিতর দিয়া চকিতে দামিনী-রেখার মত ঝলসিয়া গিয়াছে, এই মাত্র, বসিতে পায় নাই। সে দীপ্তির ছটা বাঁধিয়া লইতে টলষ্টয় হাত বাড়াইয়াছিলেন, তাহার ফলে তথায় ইন্দ্রিয়ের অতীত সেই মহা-গান লেখার ফাঁকে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিল। শতশাখ মহীরুহের পত্রান্তরালে যেমন চাঁদের আলো নাচিয়া ফিরে, সেইরূপ টলষ্টয়ের সাহিত্য-সৌধ-বাতায়নে ক্ষুণ্ণ জ্যোৎস্না আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে, sublime in literature একদি[illegible] গ্রীসের শেষ-জীবনে গ্রীসিয় বলশেভিজ[illegible] সেক্রেটিসের চন্দ্রলোক-দীপ্ত জীবনের যবনিক[illegible] টানিয়া দিয়াছিল, আজ এই মর সংসারে

নারকী লিপ্সা. যে রুসিয়ার সর্ব্বাঙ্গ ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তাহার 'হিম্‌লকে' (hemlock) এই রুস-সক্রেটিসের কি দশা ঘটিত ? এই বল্‌শেভিজমের বিষ-পাত্র লইয়া কোন্ পৈশাচিক অভিনয়-লীলায় রুষিয়া টলষ্টয়ের সম্মুখীন হইত ! উপবন সাধনের ইহাই পরিণতি—উপবনের বাসর-ঘরের বাতি নিভিয়া এইরূপে শেষে আসিল কাল রাত্রি। য়ুরোপ উপবন-সাধনায় এতদিন ফুলবনে কমল-বিলাসী হইয়াছিল, এইবার ফুলশয্যা কাটিয়া গিয়া কালরাত্রি আসিয়াছে। ভারতের ভারতী-মন্দিরে আজও ধূপের ধোঁপায় যে চন্দ্রালোকের আরতি হয়, যে গন্ধ-দীপের সলিতা পুড়ে, উহাতে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্ত্যের বন্ধন দৃঢ় হয়, আকাশ-লোকের সহিত এ ধরালোকের বিবাহ হইয়া থাকে। এই transcendental touches and hues লইয়া ভারতের বাণী-ভবন ও কলা-ভবন পূর্ণ দীপ্ত।

'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়!' সংসারে সংসারী হইয়া in the world but out of it কবি, ঋষিত্বের প্রতিষ্ঠা আপনার মধ্যে আনিয়া সংসারের সুখ-দুঃখে আপনার গা ভাসাইয়া দেন। গৈরিক অনুভূতি জটা-বল্কল লইয়া শরীরের প্রচ্ছদ-পট না মার্জ্জিত করিলেও, ভিতরের অন্তর-লোকে সেই তপোবন প্রতিষ্ঠাপিত করে। সেখানে তপোবনের কমণ্ডলু ও তপোবনের হোমধূম এক অভিনব মানস-তীর্থ রচনা করিয়া থাকে। সেই অন্তর-লোক হইতে কবি সাহিত্য-জগৎ রচনার স্বপ্ন লাভ করেন। উপবন-সুষমার কমল-জলে শুইয়া বধূ-বেশী ধরণীর রাণী বিলাস-লাস্যে প্রীতি চাহনিতে ক্ষণে ক্ষণে যে ফুলশর হেলায় ছুটাইয়া দেয়, তাহার প্রতি শর কবি অশ্রান্তভাবে কুড়াইয়া তূণে ভরিয়া তোলেন, যে নূপুর-শিঞ্জন মাঝে মাঝে ক্ষীণ মূর্চ্ছনার মত বাজিয়া উঠে, তাহার তাল গাঁথিতে কবি এক মহা-ধ্যানে বসিয়া যান্, এই অন্তোত্থিত রস-সৃজনে কবির জীবন সাধারণের মত গঠিত হইলেও কবি উপবনের রূপ ও রসের জোয়ারে গা ঢালিয়া দেন্ না। তিনি অন্তরের অন্তরতম দেশে যে তপোবন পোষণ করেন, তাহাই তাঁহার শক্তি, তাঁহার genius,—সেই শক্তি, তাঁহার হৃদয়কে অলক্ষ্যে বন-গহনের তপোবনের সহিত এক বিজলী-দীপ্তির রেখায় বাঁধিয়া দেয়। যখন তাঁহার শ্লোক-রচনা আরম্ভ হয়—যখন দুই মিলন-দুরু-দুরু শুক-সারিকার গান ফুটাইতে থাকেন, তখন 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর' সেই অঙ্গ-মিলন-উৎসব চারু-চপল-চুম্বনাচিহ্নিত হইলেও তাঁহার মন উঠে না, সেই মনের গোপন তপোবন তাঁহাকে বলিয়া দেয়, এ কিসের প্রেম—এ যে অঙ্গ-সম্মিলন! এ লাবণ্যধার তনু ধূলার মত একদিন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া যাইবে—তখন ? তখন ত প্রেম মরিবে, কারণ এ তো প্রেম নয়, এ যে কাম! তপোবনের বৈরাগ্যের মন্ত্র, তপোবনের গৈরিক জ্যোতি আসিয়া তখন তাঁহার কাব্যে সঞ্জীবনী-শক্তি প্রদান করে! এইরূপে উপবনের রূপনদীর তরল জোয়ারে চাঁদের আলো আসিয়া পড়ে—সে আলোর কম্পনে কত ঊর্ম্মি নৃত্যপরা হইয়া উঠে,—দুইদিন পরে দেখা যায়, এক বুদ্বদেব ঊর্ম্মির

ফেন-মুকুটের মাথায় বসিয়া চন্দ্রালোক-দর্শনে আকুল হইয়া তপোবনের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—কয়দিন পরে এমনি করিয়া এক শঙ্করাচার্য্য মানব-সাহিত্যের বক্ষে শঙ্কর-জ্যোতিঃ লগ্ন করিলেন, সিন্ধুতরঙ্গে জ্যোৎস্নার ও আকাশের অপূর্ব্ব মিলন দেখিয়া একদিন একজন রামকৃষ্ণ এ চন্দ্রালোক মাথায় করিয়া সুদূর আমেরিকার বিলাস-লাস্যের ভবন-শিখরে ছড়াইয়া আসিয়াছে, এ চন্দ্রালোক হিম-শিখর হইতে বাহির হইয়াছে। ইহাই গৈরিক সাহিত্য—এই অতীন্দ্রিয় চিত্রাঙ্কনে গৈরিকের সাহিত্য-সাধনা মানুষকে কাম ও লালসা হইতে নিষ্কণ্টক করিয়া স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়াছে—বধূর কর-গ্রাস হইতে তপোবনের মাতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দিয়াছে। গীত গোবিন্দের কবি রাধাকৃষ্ণের মিলনাভিনয়ের অন্তরালে লালসার চিত্ত-বিমোহন চিত্র-অবসরে যে প্রাণের গুঞ্জন লুকাইয়াছেন, তাহা সাধারণ চক্ষুর কোণে, কাণের পর্দ্দার দ্বারে ফোটে না ও বাজে না, রসস্বাদী পাঠকের মুখে যে কল্পিত রস পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহার মূলে এক চিরন্তন উৎস রহিয়াছে উহার স্বাদ সহজে মেলে না, মিলিলে মানুষ সব ছাড়িবে। ভোগায়তন দেহের যে আত্মা শ্রীভগবানের সহিত মিলনেচ্ছায় প্রতি মুহূর্ত্তে স্পন্দিত হইতেছে, উহার মাধুর্য্য বিরলে তথায় ফুটিয়াছে। এই গৈরিক আভা একদিন মানুষের মনে বিদ্যুৎ-স্ফুরণে ফুটিয়া উঠে, অমনি মানুষ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ বলিয়া সব সুন্দরের উপাসনা সকল রূপের পূজার ডালি ফেলিয়া সেই রূপরাজের দিকে ধাবিত হয়। এইখানেই গৈরিক দ্যুতির সংযোগে তপোবন ও উপবনের মিলন-রাত্রি আসিয়া থাকে। ভারতের ভারতী-মন্দিরে এ মিলন-রাত্রি চিরন্তন রহিয়াছে য়ুরোপে পূর্ণ বিচ্ছেদের ভিতর মিলন-রাত্রির আশা কোথায়? তপোবন থাকিলে ত উপবন আসিবে, মূলেরই যে অভাব!

জন্মান্তরের অর্জ্জিত প্রতিভায়, বাসনার জগতে গোলক ধাঁধার প্রতি যখন দৃষ্টিদান হইতে থাকে, যখন বাসনার কাচের ঘর খানি নেহাৎ কাঁচা বলিয়া মনে হয়, তখন প্রতিভার পুত্র কেমন করিয়া হেথায় বসিয়া হাতে পায় ভালবাসার নিগড় বাঁধিবে, কেমন করিয়া খচিত নক্ষত্রাকাশের তলে বরণ-ডালার নীচে বর-বধূর মাথা এক করিয়া দাঁড়াইবে! সে জানে যে সংসার সে বড় ভালবাসে, সে জানে যে সংসার তাহার দুগ্ধ ধবল দৃষ্টিতে অবগাহিত করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু সে ত আসক্তির পূজা করিতে শিখে নাই। এক গৈরিক আভায় তাহার অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া সেখানে অলকানন্দার সৃষ্টি করিয়াছে সেই মন্দাকিনীর ঊর্ম্মি যখন জাগিয়া উঠে, সে ঊর্দ্ধে অসীমের মহারাজের দিকে তাকাইয়া কহে,—

আমার হৃদয় ভরিয়া, উছলি উঠে গীতিভরা ঢেউ
চরণে ছুটে কতবার!

এই গৈরিক দ্যুতিতে তাহার হৃদয়ের দীপ যে ভাবে জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতেই তাহার প্রাণের মূলে অঙ্কুরিত হইল এক ভাবের ফুল, কবিতার কৌস্তুভ-হার, সে ফুল্ল কবির পুষ্পিত অযুত ছন্দে বিকশিত হৃদয় লইয়া জন্মাইল। অন্তরে বাহিরে বৈরাগ্যের বিভূতি বিভূষিত

হইলেও, সে ত বন্ধু-গৃহের মত এ সংসার ত্যাগ করিয়া, সংসারের সকল শিকলী কাটিয়া তপোবনের হোমানলে আহুতি ঢালিতে যায় নাই। সে রহিয়া গেল সংসারের অঙ্গনে,কারণ এ খেলা-ঘরে বিধাতার আসন পাতা দেখিয়াছি, মানুষের স্বরে ভগবানের স্বর ফুটিতে শুনিয়াছি। সে এখানে ঘরে ঘরে বিশ্বেশ্বরের ক্ষুদ্র রূপ দর্শন করিয়াছে, ইহাই যে তাহার সাধন-ক্ষেত্র। এই উপবন-অন্তরে যে তাহার অন্তরের যোগ রহিয়াছে,—কারণ সে মানুষ এবং মানুষকে বড় ভালবাসে। কিন্তু সেই ভালবাসায় কোথাও আসক্তির দীপ জ্বালিতে দিতে সে একান্ত নারাজ, নারীকে মা বলিয়া জানিয়াছে, নারী যে তার মায়ের জাতি! সে যে ছেলে হইয়া জন্মিয়াছে, সে যে সন্তান! তাই বাঁধিবার মত তাহার কিছু ছিল না, সে একখণ্ড উপবীতের মত নিজের জীবন-যজ্ঞে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রাণের বোঁটায় পৃথিবীর ভালবাসা রঙীন সূতায় জড়াইয়া আছে, সে জিনিস আর কিছুই নয়, মানুষের প্রতি প্রেম! এই গৈরিকের সাহিত্য-সাধনায় উপবন আছে, তপোবনও আছে। এ গৈরিক কবি চাহে, উপবনের ফুলবন ফুটাইতে, চাহে বধূরূপী নারীর চিত্র আঁকিতে চাহে, মন্মথ-সাহিত্যের মূলে ললিত ভঙ্গীর দৃষ্টি দান করিয়া রসের উৎস খুলিতে! এই রস-পরিবেষণের অন্তরালে এক মহা চন্দ্রালোক লুকাইয়া রহিবে,—মেঘাড়ম্বরে যেমন চাঁদের আলো ঢাকিয়া যায়, সেইরূপ এ কবি রভস-আবেশের পরিরম্ভনের পটান্তরালে জীবনের মহা-গান সুপ্তব্য রাখিয়া দেয়, যেন সময় পাইলে জাগ্রত হইয়া সে গান আত্মাকে উত্তিষ্ঠত নিবোধত রূপে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে! সে গান কি? উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' 'সোঽহম' মন্ত্রে সাধনা এ জীবনের জন্য নহে, এ পৃথিবীর বৃহ-মধ্যে সমাপ্তি পাইবার নহে, এক জীবনের জন্য বাণীর দেউলে সে এ মণি-দীপ জ্বালে নাই, ইহা তাহার পূজার শঙ্খ। কবিতার প্রাণ ইহার মন্ত্র-স্বরূপ। এই মন্ত্র-সহকারে শঙ্খ-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক ভরিয়া তাহার আত্মা অনন্ত সুন্দরের বক্ষে অনন্ত কবিতা-কালিন্দী বহাইয়া সেই 'তাঁহার' দিকে ছুটিবে। সে প্রতীক্ষায় আছে,

যবনিকা সম যাবে কি খুলিয়া
ধরার অবগুণ্ঠন,—
তোমার আমার মাঝে
রহিবে না কোনও বাধা-বন্ধন।
তোমায় হেরিয়া নয়ন-সমুখে
চরণে নুয়ে পড়িব!

কেমন করিয়া এ যবনিকা ঠেলিয়া উর্দ্ধলোকে উঠিতে হয়, কেমন করিয়া জরার সংসার ফেলিয়া অজর অমর লোকে পথ খুঁজিতে হয়, এ গৈরিক কবি তাহারই চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চাহে। এ রঙ্গালয়ের মঞ্চে রূপের অবতার লইয়া বিলাস-কুসুমের পঞ্চহার পরাইয়া চুম্বনের তিলক ভালে রাখিয়া, কবি সংসার-সুষমায় আদর্শ ভালবাসায় সংসার সজ্জা দেখাইতে ক্রটি করিতে চাহে না, দেখাইতে চায় রূপের জগতে রস-সঞ্চার কেমন করিয়া বিধাতার নির্দ্দেশ মত অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিণতি লাভ করে,

দেখাইতে চায় রূপ-রস-সম্মিলনে ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী আকর্ষণ রহিয়াছে। সেই সঙ্গত সুশীল প্রেমে ধরণীর উৎপাদনী শক্তি নিহিত। কামের বিলোল কটাক্ষ, রূপের ফেনায়িত ফোয়ারা, সিরাজীর তপ্ত আভার ন্যায় রূপ-মদ-বহ্নি আলোয় পশ্চাতে যেরূপ আধার বিস্তার লাভ করে, সেরূপ গঙ্গাজলের মত মানুষের প্রেমের পার্শ্বে এইসব নারকীয় প্রেতের কীর্ত্তন অনবরত অষ্টপ্রহর গৃধিনীর রবে সংসার ভরিয়া মানুষেকে পশুত্বের পথে টানিয়া লয়—ম্যাকবেথের মত lead from darkness to darkness,—বাইরনের কথায় বলিতে হয় never anchored they shall be এই ভেলা ভিড়াইতে না পারিয়া মানুষ অকূল সমুদ্রে দিক্ বিদিক্ হারাইয়া সেই জীবনের গান হারাইয়া ফেলে। গৈরিক কবি তাহার কাব্য বিপণিতে এই সব মণি জহরতের আমদানী করিয়া কষ্টি-পাথরে ঘসিয়া দেখাইতে চায় ইহাদের মধ্যে নকল কতখানি, কোন্‌টী মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে, কোন্‌টী মানুষকে মারিয়া ফেলে। তারপর মানুষের কাণে এই কথাটী বাজাইতে চাহে

একে একে নিভিয়া বিলাস-দীপালী
গীত মুখরিত ধরণী হইবে কালো!

একদিন এ আলের বন্যা চক্ষু হইতে ঝরিয়া যাইবে। একদিন গীতি-গুঞ্জন শ্রুতিমূল হইতে বিদায় লইবে,—কিন্তু তখন? গৈরিক কবি এইরূপে মানুষকে টানিয়া লইয়া তাহার চন্দনাবতীতে দাঁড় করাইয়া বলিবে, মাটীর কাঁঠামোর সহিত মাটীর চোখ ও কাণ মরিয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি? এইবার আত্মার অমর লোক জুটিবে,—তাহার মধ্যে অবিশ্রাম যে মহা-গীতি এতদিন চাপা ভাবে বাজিয়াছিল, উহা এখনে পূর্ণ কণ্ঠে গাহিয়া সেই music of the spheres এর ধাপে ধাপে উপরে উঠিতে থাকিবে। আত্মার নয়নে সমুদ্ভাসিত হইবে সেই মহা-চন্দ্রালোক! কবি নিজে জানে যে তাহার কাব্যের বিরতি নাই, ইহার উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ছন্দে সে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিবে, সে যুগযুগান্তের কবি, অক্ষয় অনন্ত তাহার কাব্যের ভাণ্ডার। তাহার কল্লান্ত-স্থায়ী সাধনার মধ্যে সে এক মহা-সত্য প্রচার করিয়া যাইবে; মানুষের দেউলে, ধূপের সৌরভে শঙ্খঘণ্টার মঙ্গল অভিভাষণে ও ঋত্বিকের মন্ত্রোচ্চারণে সর্ব্ব-প্রকার সংযমের মধ্যে দেবতার অভ্যুদয় হয়—দেবারাধনা হয়, আর মানুষের সূতিকা-ঘরে অসংযমের মূল মন্ত্র কামের ফলে মানব-শিশুর অভিনন্দন হইয়া থাকে—শিশু আইসে মানুষের কামের আহ্বানকে স্বর্গ-দীপ্তিতে মণ্ডিত করিতে। এ কেন? একটা ইন্দ্রিয়-সেবা-সর্ব্বস্ব জঘন্য নর-পশুর যে ভাবে সৃষ্টি, সেই ভাবেই জগতের বুদ্ধ জগতের বিবেকানন্দ জগতের সক্রেটিশের জন্ম! এ কেন? তাঁহাদের জন্য এ কালের আরতি কেন? তাহারা কি ব্রহ্মার মানস পুত্রের ন্যায় এ ধরণীর গন্ধ নির্ম্মাল্যের কোলে জন্মাইতে পারিলেন না! এইখানেই ত জীবনের গভীর তত্ত্ব! গৈরিক কবি বুঝাইতে চাহেন ইহারা এমন লোকে চলিয়া গিয়াছেন, যেখানে দেবারতির সঙ্গে জন্ম লাভ করিয়াছেন, যেখানে শঙ্খ ফুকারিয়া হোমনিল জ্বালিয়া দেবতার মত তাঁহাদের অভিনন্দন হইয়াছে। কবি এই সত্য মানুষের কাছে রাখিয়া বলিতে

ইচ্ছা করেন, 'আইস ভাই আমরা দেবতা হইব!'

ইহাকেই বলে, গৈরিকের সাহিত্য সাধনা, গৈরিকের জ্যোতি কেমন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবির চিন্তা-স্তরে বিদ্যুদ্বরণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেখিয়াছি, এই শেষ অধ্যায়ে যে বাস্তব গৈরিক কবির সাহিত্য-সাধনার আভাস মিলিল, তাহা স্বাভাবিক মাত্রার বাহিরে গিয়াছে, কতকটা যেন more's utopia.—কিন্তু হইলে কি হয়, ভাবনার রাজ্যে ইহা একটা নূতন সম্পদ, সন্দেহ নাই, আর ভবভূতির

কালোহ্যয়ংনিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী

এ বিপুল ধরণীর কোলে একদিন এ চিত্র কি উদ্‌ভাসিত হইবে না!

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বর্ষার মশা

বর্ষার মশা বেজায় বেড়েছে,
খালি শোনো শন্ শন—
ক্ষুদে-ক্ষুদেগুলো থায় বা থামিয়ে
ভ্রমরের গুঞ্জন!
বাণীর অরুণ চরণ ঘিরে যে
রক্ত-কমল শোভে,
বঙে ভুলে তার দলে দলে মশা
ছুটেছে রক্ত-লোভে!
আদাড়ের মশা পাঁদাড়ের মশা
জুটেছে মানস-সরে,
রক্ত-পদ্মে রক্ত না পেয়ে
ছেঁকে ধরে মধুকরে!
চপল পাখায় বাণীর চরণ
করিয়া প্রদক্ষিণ
ভারতীরে ভণে ভ্রমর "হায় মা!
এ কি হেরি দুদ্দিন!
কোথা হ'তে এল ক্ষুদে-ক্ষুদেগুলো
উড়ে উড়ে সারে সারে,
জুড়ে বসে হের রক্ত-পায়ীরা
মধুপের অধিকারে!
বিশ্রাম নাই 'পঙ্' 'পিঙ্' 'পাঁচু'
রব করে ফিরে ঘুরে,
"মোরাও ভোমরা" ভণিতা করিয়া
ভণে যেন নাকীসুরে!
বিকট জরার শাকটিক ওরা
রোগের বাহন জানি,
সহসা ওদের হেরে বাণী-গেহে
মনে আতঙ্ক মানি।
মানসের জল হ'ল কি গরল?
হৃদয় কাঁপিছে ত্রাসে।
বাণীর চরণ ঘিরল কি ওরা
পেট পোরাবার আশে!"
হেসে বাণী কন্ "কেন উন্মন
কমল-লোভন্ ওরে!
ঘোলাটে রাতের অপচার ওরা,
প্রভাতেই যাবে স'রে।
রবির আলোর ঘোর আপত্তি
সাথী ওদের আছে,
কোনো ভয় নাই, পেচকের চোখ
ভোরাই আলোর আঁচে—
হবে অদৃশ্য; তাড়াতে হবে না
কিটিঙের গুঁড়া দিয়া,
হবে না তা ছাড়া, মশার কামড়ে
ভোমরার ম্যালেরিয়া।"

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

চয়ন

সাধারণ ও অসাধারণ

পৃথিবীর বা পৃথিবীর যে-কোন দেশের কথা মনে হলে প্রথমেই মনে পড়ে তার সাধারণ মানুষের (Average Man) কথা। তারাই প্রকৃতপক্ষে মহামানব। এই মহামানবের মধ্যে যে প্রাণ আছে সে প্রাণ মহান। ধর্ম্মের মধ্যে, কর্ম্মের মধ্যে, সুখে-দুঃখে—দৈন্যের মধ্যে, পৃথিবীর সমস্ত-কিছুরই মধ্যে এই মহা প্রাণের যে পরিচয় তা গৌরবের পরিচয় এবং তা বিশ্বব্যাপ্ত। এত-বড় গৌরবের অধিকারী এই সাধারণ মানুষরাই। কিন্তু তাদের এই গৌরবের সৌভাগ্য একেবারেই মিথ্যা হয়ে যায়, যখন তারা এই বলে দুঃখ করে বেড়ায় যে, কৈ আমাদের মধ্যে যে geniusই নাই তা আমাদের ভাগ্য ফিরবে কি, আমরা সবাই যে একেবারে নিতান্তই সাধারণ। অথচ পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত বড় বড় অসাধারণ কাজ হয়েছে সে সমস্তই এই সাধারণ মানুষদের দিয়েই হয়েছে এবং চিরকাল ধরেই তাই হবে। প্রতিক্ষণের ইতিহাস প্রতিপদে এই কথাটিকে সপ্রমাণ করছে। তবু মানুষের এই সাধারণত্বের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার অন্ত নাই, তাই দুঃখ-দৈন্যেরও অন্ত নাই।

যারা অসাধারণ এবং যাদের ঘরে অর্থের প্রাচুর্য্যের অভাব, তারাই প্রকৃতপক্ষে বেশী ধন্য, কারণ তারাই জীবনে প্রকৃত আনন্দ ও প্রাণের স্বাদ পায়। সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্তই সৎ এবং সত্য; তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণ যত বেশী কোন বিশেষ দলের (অসাধারণ) শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণ তত বেশী নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে হয়তো আদর্শ "ভালমানুষ" নাই, কিন্তু তবু তারাই সব-চাইতে ভাল মানুষ;—কারণ তারা ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসীও নয় বা কঠোর বিষমুখো Puritanও নয়। এই-সব কথার উপর যাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা নাই, তাদের সাধারণ তন্ত্রের উপরেও আস্থা খুবই কম। সাধারণের প্রতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের এই আস্থা এবং বিশ্বাসের অভাবে পৃথিবীতে কত বড় বড় অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে—যুগে যুগে প্রজা বিদ্রোহ করেছে, রাজা অত্যাচার করেছে এবং এখনও করছে। এরই জন্য মানুষ স্বার্থপর হয়েছে, নীচ হয়েছে এবং এমনি করে অপরাধটা নিজেকে ছাড়িয়ে নিজের ঘরকে ছাড়িয়ে, বাইরে ছড়িয়ে প'ড়ে যত বড় বড় জাতীয়তাকে পঙ্গু করে রেখেছে। তাই এখনও কোন দেশের সাধারণ-তন্ত্রের জড়তা ও শিথিলতা ভাল করে দূর হয় নি।

কাগজপত্রে এবং লোকের মুখে নিজের নামের বিজ্ঞাপন দিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য সমাধান করা যায় না। জীবনের উদ্দেশ্য সুখ-শান্তি দিয়ে জীবনকে ধন্য এবং স্নিগ্ধ করা। এই সুখ-শান্তি তারাই বেশী করে

পায় যারা দোষে-গুণে গড়া। তাদের সমস্ত রিপু ও প্রবৃত্তির উশৃঙ্খলতার ঘাতপ্রতিঘাতে যে সুখ-শান্তি সৃষ্ট হয়েছে তাই সংসারের আদর্শ সুখ ও শান্তি। বড় বড় লোকের (Famous men and Supermen) কাল্পনিক কথা ও অসম্ভব আদর্শকে এরা কোনদিনই প্রাণ ভরে গ্রহণ করেনি। এরা সংসারের বিষকে পান ক'রে নীলকণ্ঠের মত দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে—এরাই সব চাইতে বড় দেবতা, চিরদিনের এবং চির কালের।

পৃথিবীর এত-বড় এই ঘর-সংসার থেকে যারা কোন বিশেষ প্রতিভার জন্য নিজে পৃথক হয়ে গেছে, তাদের নিয়ে জনসাধারণ কোন দিনই সংসার পেতে সুখী হয়নি। স্বর্ণমৃগ স্বর্ণও নয়, মৃগও নয়, তাই তাকে যে চেয়েছিল তার দুর্ভাগ্যের আর সীমা ছিল না। কিন্তু প্রকৃত সুখকে যারা সর্ব্বাঙ্গীন ক'রে পেতে চায় তারা হয় মাটী খুঁড়ে শুধু সোনা আনে নয়তো বনে গিয়ে শুধু হরিণ নিয়ে আসে। দুটোকে একটার মধ্যে কোন দিনই তারা পেতে চায়নি, কারণ তারা জানে, যে দুটোকে একটার মধ্যেই পাওয়ার নামই হচ্ছে স্বর্ণমৃগ—একটা বিরাট অসম্ভবতা। এই জন্যই এরা অসাধারণ মানুষদের স্বর্ণমৃগ বলেই জেনে আসছে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা সব্বাই রাম সীতা নয়, নৈলে ভারতবর্ষের চিরদিনকার গৌরবের খ্যাতিটা লঙ্কাদ্বীপের অখ্যাতিতে ভরে থাকতো। অসাধারণ মানুষদের খ্যাতির অভাব নাই, কিন্তু তাঁদের একটা কোন বিশেষ গুণের গুরুত্ব অন্য সমস্ত গুণের সামঞ্জস্যকে ক্ষুণ্ণ করে—তারা সাধারণের সংসারে পতি ও পিতার কিম্বা সতী ও মাতার আদর্শকে কুৎসিত করেন। রামায়ণের রামের ও মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মধ্যে যত বড় দুর্ব্বলতা ছিল তত বড় দুর্ব্বলতা কোন সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই বিরল। নৈলে তাদের সংসার করা অসম্ভব হ'ত। সাধারণ-তন্ত্রের লোকরা সাম্‌না-সাম্‌নী দাঁড়িয়ে divorce চায় এবং স্পষ্ট সত্য কিম্বা স্পষ্ট মিথ্যা বলতে ডরায় না। পুরাকালে জনসমাজের শক্তি ও প্রাণ এখনকার মত বিস্তৃত ছিল না—চোখের সামনে যাদের দেখতে পেত তাদের ছাড়া তারা অ-দৃষ্ট বাইরের লোকদের সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগ রাখতো না, তাই তখন যারা বড় ছিল এখন তারা আর তত বড় হতে পারে না, কারণ, এখনকার সাধারণের শক্তি, চিন্তা ও দৃষ্টি ক্রমে বেড়ে চলেছে। জাতি-ভেদের সময় তখন যে ভাগটী অন্য তিন ভাগের উপরে আধিপত্য করেছে সেই জাতিভেদ যদি এখন আবার পাল্টে করা হয়, তবে অতীতের তিন ভাগ থেকে শুধু নয়, এখনকার ৩৬ ভাগের প্রত্যেক ভাগে এমন লোকের অভাব হবে না যাদের আসন সেই এক ভাগের মাথার উপরে।

এখনকার জনসমাজের শক্তি বিস্তৃত হয়ে গেছে, তাই একের মহাপ্রভুত্ব ক্রমেই অসম্ভব হয়ে আসছে।

শিল্পকলার ও সাহিত্যের জন্য প্রতিভার দরকার হয়। কিন্তু একযুগে দুই-একটির বেশী বড় শিল্পী ও সাহিত্যিক জন্মায় না। তবু সাধারণের মধ্যে সাধারণ শিল্পী ও

সাহিত্যিক এত বেশী দেখতে পাওয়া যায় যে তাদের কাজের পরিমাণ, শিল্প ও সাহিত্যের জ্ঞান তাদের দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত আশা ও ভরসা এই সাধারণের হাতে, তারা যা গড়েছে—তাই সত্য এবং তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

চারুচন্দ্র রায়

মানুষের বহু রূপ

কোনো একটা দুর্ঘটনা বা নিদারুণ মানসিক কষ্ট যখন অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে তখন আমরা তা ভুলতে চেষ্টা করি। এই ভোলবার চেষ্টাই মনকে দুঃখজনক চিন্তাভার হতে মুক্ত করবার স্বাভাবিক উপায়। কখনো কখনো অত্যন্ত ক্লেশকর কোনো কোনো চিন্তা আমাদের চেতনা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দু চারটি ক্ষেত্রে এমনি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয় যে, আমরা যে কেবল সেই বিশেষ স্মৃতিটিই হারিয়ে ফেলি তা নয়, তার পূর্ব্বের যাবতীয় অভিজ্ঞতার স্মৃতিও আমাদের মানসপট থেকে একেবারে মুছে যায়।

বিগত যুদ্ধে, মনের ওপর শক্ত ঘা খেয়ে অনেক লোকের মধ্যে দুইটি ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়েছিল। দারুণ ভয়ে সবল মানুষও শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়তে পারে। সে আর বয়স্ক লোকের মত কথা কইতে পারে না, পানাহারের ন্যায় সহজ কাজ করতেও তার কষ্ট হয়। সুস্থ হয়ে ঐ রোগীই আনকোরা নতুন অভ্যাস এবং নানা বিশিষ্ট গুণের পরিচয় দিতে পারে; তারপর মনে আর একটি ঘা খেয়ে হয়তো পুনরায় সহসা পূর্ব্বের ন্যায় শিশুভাবাপন্ন হয়ে পড়বে। তখন বিগত ব্যক্তিত্বের সকল অভিজ্ঞতার স্মৃতি মন থেকে একেবারে মুছে যাবে।

মনের ওপর ছোটবড় আঘাত আমাদের সবাইকেই মাঝে মাঝে সইতে হয়। দুঃখক্লেশ সম্বন্ধে যে-পর্য্যন্ত আমাদের বিচার-বুদ্ধি অটুট থাকে সে-পর্য্যন্ত আমরা সহ্য করেও থাকি। কিন্তু এমন সময়ও আসে যখন খুব বলিষ্ঠ প্রকৃতির ব্যক্তির পক্ষেও দুঃখ বা অনুশোচনা-বোধ অসহনীয় হয়ে ওঠে। পরিণামে ঘটে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে যাকে বলে neurasthenia, nervous breakdown বা স্নায়বিক বিকার এবং হিষ্টিরিয়া। Pearson's Weeklyতে একজন লেখক এমনিধারা কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একটি লাজুক ধরণের স্বাস্থ্যবতী বুদ্ধিমতী যুবতীর আঠারো বৎসর বয়সে একবার মূর্চ্ছা হয়। এই মূর্চ্ছা দীর্ঘকাল ছিল। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর কয়েক সপ্তাহ তাঁর শ্রবণ ও দর্শনশক্তি লোপ পায়। তারপর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়বার তাঁর মূর্চ্ছা কয়েক ঘণ্টা থাকে। এবার তাঁর চোখকাণ ঠিক ছিল। কোনো গোল হয়নি। তবে তিনি তাঁর গত জীবনের সকল কথা ভুলে গিয়েছিলেন;

বাক্‌শক্তিও প্রায় লোপ পেয়েছিল—শিশুর ন্যায় কয়েকটা আধ-আধ কথা বলতে পারতেন মাত্র—যদিও তার অর্থ বুঝতেন না। তাঁর শিক্ষা আবার নতুন করে' আরম্ভ করতে হয়েছিল।

তিনি যখন লিখতে শিখলেন তখন তাঁর হাতের লেখা অদ্ভুত রকমের হল—শৈশবে যখন প্রথম লিখতে শিখেছিলেন তখন যেমন মোটেই তেমন নয়। তিনি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলেন—যেন আলাদা মানুষ। দ্বিতীয় বার শিক্ষার পর তিনি আর লাজুক ছিলেন না, বেজায় আমুদে আর বাচাল হয়ে উঠেছিলেন।

এই অবস্থা ছিল মাস দুই। তারপর আর এক দীর্ঘ নিদ্রার পর তিনি জেগে উঠলেন—প্রথমে তিনি যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি, অর্থাৎ যখন তাঁর বয়স ছিল আঠারো। এই অবস্থায় ফিরে তাঁর দ্বিতীয় অবস্থার কথা তিনি একেবারে ভুলে গেলেন।

বহুদিন পরে পুনরায় তিনি তাঁর দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব লাভ করেন। সেই অবস্থায় তিনি ছিলেন পঁচিশ বৎসর।

এমনো শোনা গেছে বেশ চালাক চতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তি হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ। অনেক দিন কোনো খোঁজখবর নেই। এধারে সে অন্যত্র গিয়ে ভিন্ন নামে যা-তা একটি কাজে লেগে গেছে। পূর্ব্ব জীবনের কথা আর তার কিছুই মনে নেই। তারপর বহুদিন পরে সহসা হয়তো পূর্ব্বস্মৃতি ফিরে এসেছে, তখন সে নিজেই অবাক হয় ভাবে কোথা দিয়ে কেমন করে' কি হল!

বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও নারীর কখনো কখনো শিশু ভাবাপন্ন হওয়ার কথা অনেক শোনা যায়। খুব বুড়ো মানুষ শিশুর মত কথাবার্ত্তা কইছে বা ব্যবহার করছে এমন ব্যাপার অনেকেই দেখে থাকবেন—বাংলায় যাকে বলে 'ভীমরতি ধরা'।

এমনি সব লুপ্তস্মৃতি লোকেদের মনে হিপনটিসম্ সাহায্যে তাদের পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি জাগানো সম্ভব। মনের অ-চেতন কুঠরিতে আমাদের সকল স্মৃতি সমাহিত। হিপ্‌নটিসমের সাহায্যে ইঙ্গিতের দ্বারা সেই সব স্মৃতি জাগিয়ে তোলা যায়। কারণ, সম্পূর্ণ চেতন অবস্থায়, প্রাণপণ চেষ্টাতেও মানুষ পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণে প্রায়ই অসমর্থ হয়।

আমরা সকলেই জানি সাধারণ নরনারীর মধ্যেও দুইটি 'মানুষ' থাকে। একটি সামাজিক 'মানুষ', যেটি সবাই দেখতে পায়। অপরটির বাস আমাদের অন্তরে, সেটিকে অনেক সময় আমরা নিজেরাই চিনতে পারি না। সেটির প্রকাশ প্রচণ্ড ক্রোধের সময় এবং স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মনকে তা আচ্ছন্ন করে' রাখে।

মদের নেশায় এবং ক্লোরোফর্ম্, ইথার বা আফিমের নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় অতি বিজ্ঞ নারী ও পুরুষেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। তার কারণ, সে সময় অ-চেতন মন চেতন মনের সাহায্য ব্যতিরেকেও কাজ করতে পারে।

মানুষের মনের আশ্চর্য্য রহস্য। বলা শক্ত ঠিক কোথায় স্বাভাবিকের সমাপ্তি এবং অ-স্বাভাবিকের প্রারম্ভ

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদের মুল্লুকে 'মনিষ্যির গন্ধ' !

বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধির জোরে হাউই যে এবার সুধু তারার মুখে নয়,—চাঁদের চাঁদমুখেও ছাই ঢালিয়া দিয়া আসিবে, সে খবর আপনারা বোধ হয় এর-মধ্যেই শুনিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি তার চেয়েও আরো-টাট্‌কা একটি খবরে জানা গিয়াছে। প্রথম পরীক্ষা শেষ হইলেই,—অর্থাৎ প্রথম হাউইটি চাঁদের মুখে গিয়া ঠোক্কর মারিতে পারিলেই, দ্বিতীয় একটি হাউইয়ের ভিতরে পুরিয়া, চন্দ্রলোকে মানুষ-যাত্রী পাঠানো হইবে!

অবশ্য এই হাউইটি এমন মস্তবড় হইবে যে, তাহাকে অনায়াসেই ছোটখাট একখানি বাড়ী বলা যাইবে! আর এই অগ্নিরথে চাপিয়া যে যাত্রীটি চির-রহস্যের ঐ অজানা মুল্লুকে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, চন্দ্রলোকে যাওয়ার চেয়েও তাঁহার বুদ্ধি-ভরসা যে ঢের বেশী আশ্চর্য্য, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই!

এই সাহসী বীর আমেরিকার বাসিন্দা, নিউ ইয়র্কের উড়ো ফৌযে তিনি কাপ্তেনী করেন! তাঁহার নাম কাপ্তেন রুড আর, কলিন্স। সুধু তিনি নন, তাঁহার সঙ্গে আরো দুজন লোক সঙ্গী হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন পুরুষ, নাম কাপ্তেন চার্লস এন, ফিজজেরাল্ড; আর-একজন কুমারী মহিলা, নাম মিস্ রুথ ফিলিপ্‌স্। বলিহারি এঁদের বুকের পাটা! যে-জাতির মধ্যে এমন স্ত্রী-পুরুষ জন্মান, সে জাতির সঙ্গে আমাদের এই কুণো বাঙালী জাতটার তুলনা করিলে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা যায়!

কাপ্তেন কলিন্স বলিতেছেন, "আমার এই সংকল্পের কথা শুনে সকলে আমাকে নানারকম ভয় দেখিয়ে নিরস্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন। রোজ আমার কাছে রাশি রাশি চিঠি আস্‌ছে! অনেকে ভাব্‌ছেন, আমি বোধ হয় সংসারে বিরাগী হয়ে পড়েছি, আর বেঁচে থাক্‌তে চাই না! তাই যুবতীরা, সন্তানের জননীরা আর প্রাচীনেরা বল্‌ছেন, এমন ক'রে আমি যেন আত্মহত্যা না করি! কিন্তু এঁদের ভাবনা মিছে! কেননা, অকারণে আমি আত্মহত্যা কর্‌তেও রাজি নই এবং এই দুনিয়ায় এখনো আমি বেঁচে থেকে সুখের ষোলআনাই ভোগ ক'রে নিতে চাই!

চাঁদ বা মার্স, (মঙ্গল-গ্রহ)—যেখানেই আমি গিয়ে পড়ি না কেন, যাবার পথে আমার সময় লাগ্‌বে অনেকক্ষণ। এর-মধ্যে আমার আহার ও নিদ্রার আবশ্যক এবং নিশ্বাস ফেল্‌বার জন্যে অম্লজানেরও দরকার। তা ছাড়া আরো-এক ভাবনা আছে। হাউইটা যখন লক্ষ্যস্থলে গিয়ে মহাবেগে আছড়ে পড়্‌বে, তখন সেই বিষম ধাক্কাটা সাম্‌লাতে না পার্‌লে আমার হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা আমাকে একবাক্যে আশ্বাস দিয়েছেন, হাউইএর ভিতরে এমন কল-কাটি থাক্‌বে

যাতে ক'রে অনায়াসেই হাউইএর গতির বেগ কমিয়ে ফেলা যাবে। পৃথিবী থেকে ২৩৩৮১২ মাইল দূরে চন্দ্রলোকে যেতে গেলে হাউএর জন্য অন্তত দশমণ সাঁইত্রিশ সের বিস্ফোরক প্রয়োজন। আমার মতে, কিছু অসম্ভব নয়।"

ঢাউস দূরবীণ

ইংরেজদের কলম্বিয়ায় একটি নূতন মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেখানকার সদ্য-তৈরি দূরবীনটির মত বড় দূরবীণ দুনিয়ার আর-কোন মুল্লুকেই নাই। আমেরিকার সিকাগো সহরের দূরবীণটি (আড়াআড়ি কাঁচের মাপ চল্লিশ ইঞ্চি) এতদিন সব-চেয়ে বড় বলিয়া নামজাদা ছিল। কিন্তু এই নূতন দূরবীনের অয়নাখানির আড়াআড়ি মাপ বাহাত্তর ইঞ্চি। এর চোঙা লম্বায় চল্লিশ ফুট। চওড়াতেও এটি এত-বড় যে একখানা মোটর গাড়ী তাহার ফাঁদের ভিতর দিয়া অনায়াসেই চলিয়া যাইবে খালি এর কাঁচখানার ওজনই ছাপ্পান্ন সের গোড়ার দিকে কাঁচখানা বারো ইঞ্চি পুরু সুধু-চোখে আমরা তারা দেখি মোটে পাঁচ হাজার। কিন্তু এই দূরবীণের সাহায্যে প্রায় ত্রিশকোটি তারা দেখা যাইবে এবং চাঁদকে মনে হইবে পৃথিবী হইতে মাত্র কুড়ি মাইল তফাতে। যদিও সমস্ত দূরবীণটার ওজন এক হাজার পাঁচশো চল্লিশ মণ, তবু একজন বালকের হাতেও এই অতিকায় যন্ত্রটি খেলার পুতুলের মত যেদিকে-খুসি ঘুরাইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না।
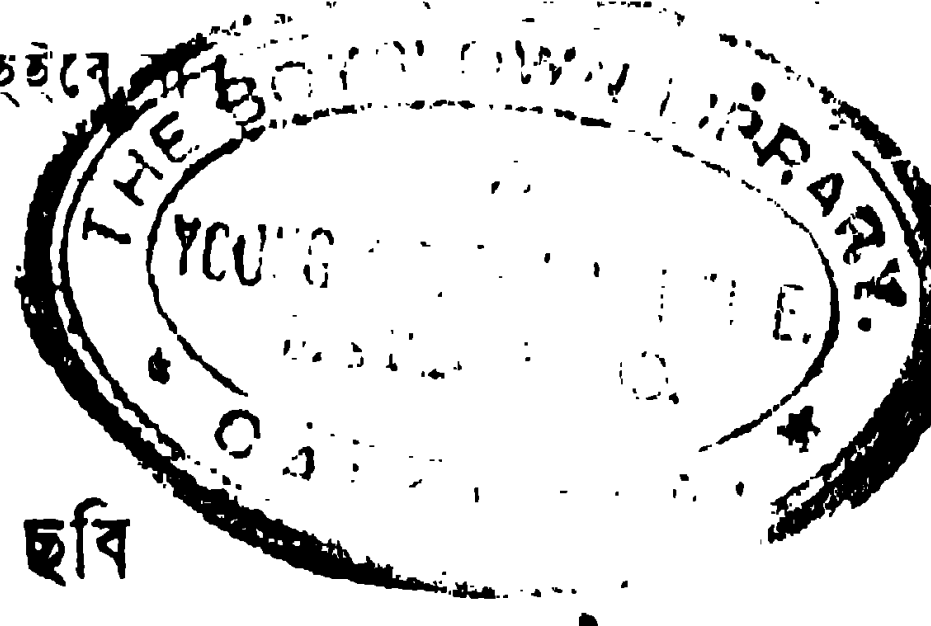
মনের ব্যামোর ছবি

ডাক্তার ওয়ালার বিলাতের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত লোক। সম্প্রতি তিনি একটি অদ্ভুত যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা অনায়াসেই মানসিক উত্তেজনার আলোক-চিত্র তোলা যায়! সেই আলোক-চিত্র আবার বায়স্কোপের পর্দার উপরে ফেলিলে, মানুষের মনের গোপন কথা সকলের চোখের সামনেই স্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিবে! আপনার মন যদি সুখে খুসি ও দুঃখে ম্লান হয়, তবে ডাক্তার ওয়ালারের যন্ত্রে তাহারও অবিকল ছবি উঠিবে। একালের সমুন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞান এখনো প্রধানত মানুষের দেহ লইয়াই ব্যস্ত হইয়া আছে—মনের ধার সে ধারে না বলিলেই চলে। তাই মনের অসুখে ডাক্তার-বৈদ্য ডাকা আর না-ডাকা দুইই সমান। কিন্তু এবার এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে মনের অসুখকেও কায়দায় আনা যাইবে।

হড়্‌কা কলের গাড়ী

দুখানা জলে-ভেজা কাঁচকে যদি গায়ে-গায়ে ঠেকাইয়া উপর-উপরি রাখা হয়, তবে সামান্য একটু ঠেলা মারিলেই উপরের কাঁচখানা হড়্‌কাইয়া চলিয়া যাইবে। আসলে মাঝখানে জলের ব্যবধান থাকার জন্য, কাঁচ-দুখানা কেউ কারুকে স্পর্শমাত্র করে না। একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার ঠিক এই পদ্ধতিতেই ভবিষ্যতের রেলগাড়ী চালাইবার চেষ্টা করিবেন। সে রেলগাড়ীর চাকাও থাকিবে না, তাহার লাইনও হইবে সমতল। গাড়ীর গায়ে লাগানো একটি দমকল হইতে লাইনের উপরে জলের ধারা পড়িবে, আর সেই জলধারায় ট্রেণখানি হড়্‌কাইয়া চলিয়া যাইবে এবং তারপরেই ঐ দমকলটিই লাইনের জল আবার শুষিয়া ভিতরে টানিয়া লইবে। জলপড়া বন্ধ করিলেই গাড়ী সেই মুহূর্ত্তেই দাঁড়াইয়া পড়িবে—সুতরাং 'ব্রেকে'রও দরকার হইবে না। বিনা-চাকায় ভবিষ্যতের এই বিচিত্র কলের গাড়ী, ঘণ্টায় খুব কম করিয়াও একশো মাইল বেগে হড়্‌কাইয়া ছুটিয়া যাইবে।

নাচে বেয়াড়া

বিলাতী রঙ্গালয়ের দেখাদেখি আজকাল এদেশেও রঙ্গালয়ে "পালোয়ানী নাচে"র সূত্রপাত হইয়াছে। সে-সব নাচে নাচুনদের কায়দা থাকিতে পারে, কিন্তু কমনীয় কলা-সুষমা যে একেবারেই নাই, বোধহয় তাহা বলা বাহুল্য।

এমনধারা "পালোয়ানী নাচ"কে বিলাতের রসিক-সমাজও দস্তুরমত ঘৃণা করেন। এ-শ্রেণীর নাচ সেই সমাজেই আদর পাইয়াছে, যে-সমাজে চার্লি চ্যাপ্লিনের চিত্রাভিনয় দেখিয়া লোকে খুসি হইয়া হাততালি দেয়। একজন সমালোচকের কথাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ঃ—

"এদেশে 'র‍্যাগটাইম' নাচ ও গানের পরমায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রতি ক্রমেই লোকের বিরাগ বাড়িয়া উঠিতেছে।

'র‍্যাগটাইম' নাচের বিরুদ্ধে আমরা সর্ব্বদাই আপত্তিপ্রকাশ করিয়াছি। বিশেষত এ-রকম নাচে, স্ত্রীলোকের দেখা পাওয়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। সুসভ্য ইংরেজদের মুল্লুকে মানুষ যে কেন অসভ্য বুনোদের মত, কিংবা বাঁদর, ভাল্লুক ও মোরগের মত নাচের ঢঙে লাফালাফি করিয়া আমোদ পায়, আমি তো কিছুতেই তা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বিশেষ, একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাও যে এমন হিল্‌বিলে সাপের বা মাকড়সার মত ভঙ্গিপ্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন না, এটা বড়ই আশ্চর্য্য!

অতএব 'র‍্যাগটাইম'কে এখন কবর দেওয়া হোক্।

আর-একটা কথা ভাবিয়াও আমরা অবাক হই। যাঁহারা নিজেদের দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাই বা কোন্ আক্কেলে এই-সব বিদেশী কুরীতিগুলোকে স্বদেশে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছেন? ইহাতে কি আমাদের নাচের জাতীয়তা নষ্ট হইয়া যাইতেছে না?"

বাঙ্‌লা রঙ্গালয়ের কর্ত্তাগণকেও আমরা ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই। একে তো তাঁহাদের কবলে পড়িয়া আমাদের শান্ত-সুন্দর দেশীয় নৃত্যের দুর্দ্দশা যতদূর শোচনীয় হইবার তা হইয়াছে, তার সঙ্গে আবার এই বেয়াড়া বিলাতী ঢং জুড়িয়া লোকের রুচির বিগ্‌ড়াইয়া দেওয়ার কি সার্থকতা আছে?

খালি "র‍্যাগ্‌টাইম" বলিয়া নয়, বিলাতে আজকাল আরো কতরকমে নাচকে যে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা হইতেছে, তা আর বলা যায় না। "ভারতীয় নৃত্যে"র নামেও তাঁহারা কাল্পনিককে তাহা বাস্তবিক বলিয়া চালাইয়া দিতেছেন।

ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে এখনো খাঁটি হিন্দু নৃত্য-কলা বাঁচিয়া আছে। আজও সেখানে উৎসবের সময়ে দলে দলে রমণী নৃত্য-লীলার অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদেরই পোষাক ও নাচ বিকৃত হইয়া বিলাতে গিয়া এমন বিশ্রী আকার ধারণ করিয়াছে যে, দেখিলেই লজ্জায় চক্ষু মুদিয়া ফেলিতে হয়!

রুসদেশের যে নৃত্যের আদর্শ পৃথিবীকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহারও একদিকে সৌন্দর্য্য

মাকড়সার মত নাচ

থাকিলেও, অন্যদিকে তথাকথিত জিম্‌নাষ্টিকের কস্‌রতের বাহুল্য দেখা যায়। ভূতপূর্ব্ব রুশসম্রাটের সভা-নর্ত্তকী শেসিন্‌স্কা নাচের মধ্যেও জ্যামিতিকে প্রকাশ করিয়াছেন! দুই পায়ের বুড়ো আঙুলের উপরে ভর দিয়া

গেবি ডেলির নাচের জিমনাষ্টিক !

পালোয়ানী নাচের নমুনা

ভারতীয় নাচের বিকৃত নকল

গেবি ডেলির আর-এক কসরৎ!

প্রচীন গ্রীসের নাচ

নাচিতে নাচিতে তিনি তাঁহার দেহকে পিছনদিকে এতটা হেলাইয়া ফেলিতেন যে, তাঁহার দেহকে প্রায় অবিকল একটি 'সমকোণ' বা right angleএর মতন দেখাইত! কিন্তু এ দৃশ্যটা আশ্চর্য্য হইলেও ইহাকে নাচ বলা যায় না।

কাব্যে ও শিল্পে সেকালের স্বপ্ন-সুষমা, একালের নানান্ রকমের উদ্ভট মৌলিকতার দৌরাত্ম্যে ক্রমেই অদৃশ্য

আজকাল নৃত্যকলার মধ্যেও সেই মারাত্মক ব্যাধি ঢুকিয়াছে,—নূতনত্বের খাতিরে এখানেও নিছক গদ্যকে পদ্য বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এই-সব নাচের পাশে প্রচীন গ্রীসের নাচকে আনিয়া রাখিলে সকলেই কি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন না?

অতি-বড় রূপসীর ঠোঁট

দুনিয়ার সব মানুষই মূলে এক, কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহার কী বিভিন্ন! এদেশে যাহা বড়ই ঠিক, ওদেশে তা বেজায় বেঠিক! বাঙ্‌লায় একগোত্রে বিবাহ পাপ, কিন্তু এমন দেশও আছে যেখানে সহোদরা হয় সহোদরের সহধর্ম্মিনী! আমরা বলি, নারী হচ্ছে পতির পদসেবার দাসী,—কিন্তু এমন দেশেরও অভাব নাই, যেখানে রমণীরা মাহিনা দিয়া স্বামীর পদে লোক নিযুক্ত করে। আবার কোথাও বা অল্পদিনের জন্ম বাজারে বিবাহ-যোগ্যা স্ত্রী কিনিতে পাওয়া যায়; কোথাও সদরে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করে রমণী আর অন্তঃপুরে বাস করে পুরুষ; কোথাও রমণী সন্তান প্রসব করিলে স্বামকেও স্ত্রীর সঙ্গে রুগ্নের মত শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়; কোথাও শূকর-শিশুকে স্তন্যপান করাইবার জন্ম মানুষ-মা গর্ভজাত শিশুকে বধ করে; আবার কোথাও-বা বিবাহের অনেক বৎসর আগে থাকিতেই কন্যাকে একটি অন্ধকার, ছোট খাঁচার ভিতরে পুরিয়া রাখা হয়!

সাজসজ্জারও নিয়ম এক-এক দেশে এক-একরকম। তবে সব দেশেই একটি ব্যাপারে ভারি সাদৃশ্য দেখা যায়। রমণীরা প্রায় সর্ব্বত্রই অলঙ্কার ও রূপের খাতিরে কষ্টকে আর কষ্ট বলিয়াই মনে করে না। সভ্য-দেশে—যেমন বিলাতী মেয়েরা ব্যথা সহিয়াও কোমর সরু করে, বাঙালী মেয়েরা নাকে কাণে ফুটো করিয়া মাকড়ী ও নোলক পরে, আর চীনা মেয়েরা পাকে ছোট করিয়া তোলে,—অসভ্য দেশেও মেয়েরা তেম্নি-সব যাতনাদায়ক উপায়ে আপনাদের রূপ বাড়াইবার জন্ম লালায়িত হইয়া থাকে। আজ আমরা তার দুটি সচিত্র প্রমাণ দিলাম। অসভ্য "সায়া" জাতীয় রমণীরা বিকৃত ওষ্ঠাধরের পক্ষপাতী। তাহারা প্রথমে
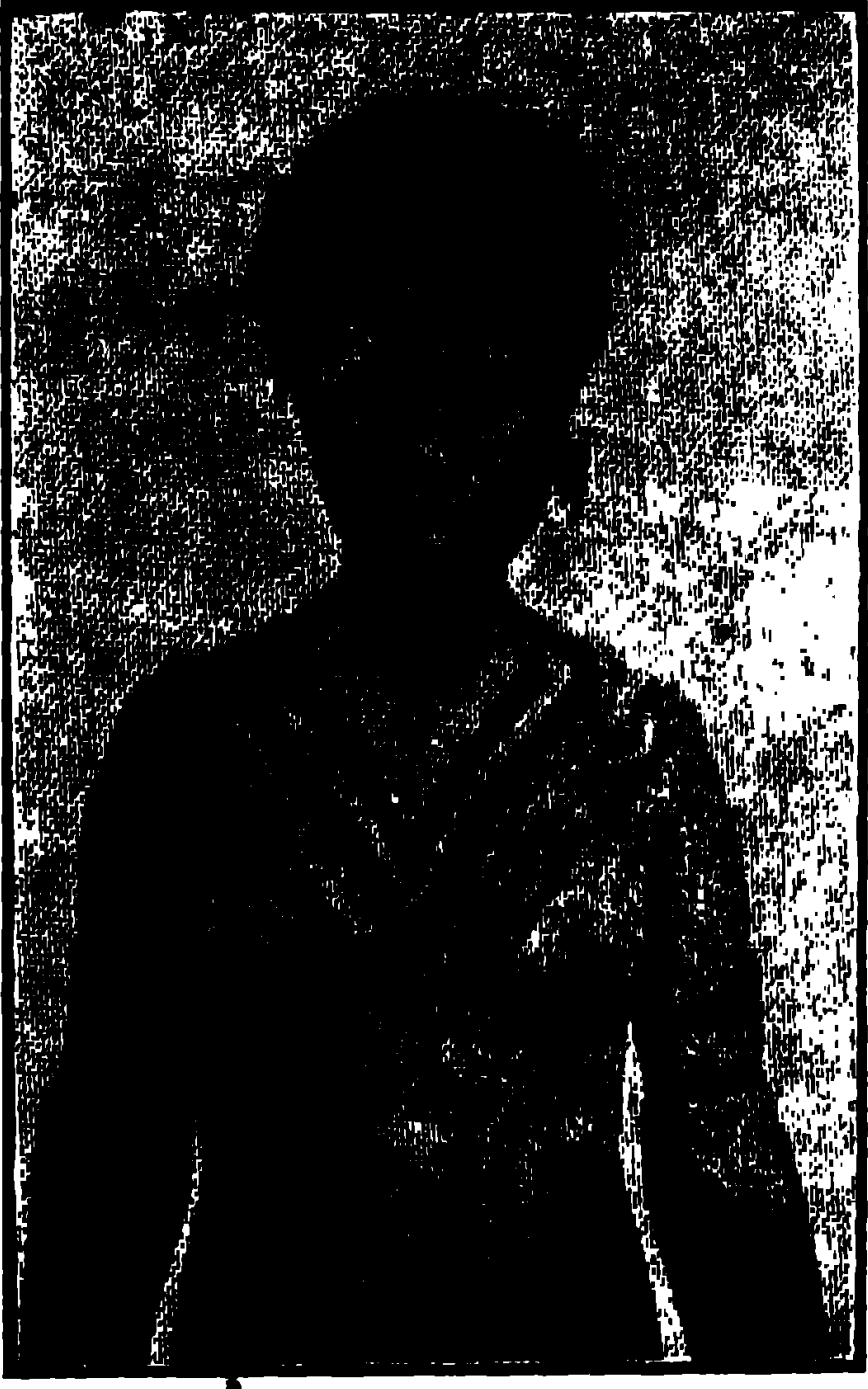
বিবাহ যোগ্যার উল্কী

ঠোঁটে একটি ছেঁদা করে। তারপর ক্রমেই সেই ছেঁদাকে কাঠের ফলকের সাহায্যে অসম্ভব-রকম বাড়াইয়া তুলিতে থাকে।

"কোইটা" নামে আর-এক অসভ্য জাত আছে, তাহাদের কুমারী কন্যার গায়ে প্রকাণ্ড উল্কীর ছবি আঁকা যখন শেষ হয়, তখনি বুঝিতে হইবে, সেই চিত্রময়ী যুবতী বিবাহযোগ্যা! মেয়ের পাঁচবৎসর বয়স হইলেই, তাহার দেহে উল্কীর সূচ ফোটানো সুরু হয়, তারপর বৎসরে বৎসরে চিত্রকরের হাতে উল্কীর সেই ছবির আকার বাড়িতে থাকে!

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

অর্থ-বিজ্ঞান

খাজানা (Rent)

ভূমি-ব্যবহারের জন্য ভূম্যধিকারীকে যে কর বা উপস্বত্ব প্রদান করা হয়, তাহাকে খাজানা বলে। এই সংজ্ঞানুসারে বন-কর, ফল কর, জল-কর, খনি-কর, বাস্তু-কর প্রভৃতি যে কোন স্থায়ী কিম্বা অস্থায়ী কর প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাদের সমস্তই খাজানা-সংজ্ঞক বলিয়া পরিগণিত হইবে। ভূমিতে যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি নিহিত আছে, যথা, বাষ্প, বিদ্যুৎ, প্রবাহ, বেগ প্রভৃতি এবং যে-সব বস্তু ব্যবহার করার জন্য কাহাকেও কোন প্রকার কর দিতে হয়, তাহাও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কথিত হইবে। আর ভূম্যধিকারীর নিজের ব্যবহারের ফলে ভূমির যে উপস্বত্বের অভ্যুদয় হয়, তাহা তাহার নিজের আয়-মধ্যে পরিগণিত হইলেও ইহা তাহার অন্যান্য আয় হইতে স্বতন্ত্র। এ সমস্তই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির মূল্য বলিয়া গণ্য হয়। এই খাজানা বা মূল্য ধার্য্য করিবার সাধারণ নিয়ম অবধারণ করাই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই আলোচনায় স্বভাবতঃ দুইটী অতি জটিল প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথমতঃ ভূমির ব্যবহারের মূল্য স্বরূপে খাজনা দেওয়ার কারণ কি? এবং কি করিয়াই বা তাহার

পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়? দ্বিতীয়তঃ সমাজে ব্যবহার ও রাষ্ট্র বিধানানুসারে এই খাজানা ব্যক্তি-বিশেষের প্রাপ্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই কল্পনা যুক্তিযুক্ত কি না, তাহারো কোন একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না, তাহার চেষ্টা হইতে পারে।

ভূমি প্রকৃতির অযাচিত দান। ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার-স্বীকারে তাহার সঙ্কোচ বিধান করা সঙ্গত কি না, সে আলোচনাও একান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। এ দুইটিই বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন, কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজেও বিস্তর মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজ-নীতি-অনুসারে সর্ব্বদেশে এই স্বত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং আমরা এই তর্কিত প্রশ্নে প্রবেশ করিব না; কেবল প্রথম প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাই কি না, তাহারই আলোচনা করিব।

ভূমির গুণ বা উৎপাদিকা শক্তি

কোন বস্তুকে একটা সামাজিক মূল্য দিতে হইলে, তাহার ব্যবহারোপযোগিতা (utility) আছে কি না, দেখিতে হইবে। যে বস্তুতে কাহারও কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন নাই, তাহার কোন মূল্য হয় না বা মূল্য করা যায় না। ভূমির খাজানাও একটা সামাজিক ব্যাপার। তাহার মূল্য ধার্য্য হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবহারিক উপযোগিতা কি, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

ভূমির উপযোগিতা বলিলে সর্ব্বাগ্রেই তাহার মধ্যগত মৃত্তিকার নিজস্ব কোন গুণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরতা প্রভৃতি গুণের কথা ছাড়িয়া দিই। এই খাজানা ধার্য্যের বেলায় তাহার একটা পরিষ্কার সংজ্ঞা হওয়া আবশ্যক। উদ্ভিজ্জ সমূহের পোষণ ও বর্দ্ধন জন্য মৃত্তিকায় যে সকল খনিজ পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রন থাকে, তাহারা নাশ প্রবণ ও পরিবর্ত্তনশীল। ভূমির অস্থায়ী কোন গুণকে তাহার নিজস্ব শক্তি বলিয়া কল্পনা করা সঙ্গত কি না, তাহা বিশেষ-ভাবেই চিন্তনীয়। মৃত্তিকার স্থায়ী গুণকেই যদি কেবল তাহার প্রকৃত গুণ বলিয়া কল্পনা করিতে হয়, তবে উর্ব্বরতা প্রভৃতি অনেক গুণকেই বাদ দিতে হয়। কিন্তু খাজানা ধার্য্যের সময়ে মৃত্তিকায় এই স্বাভাবিক সংমিশ্রন ত একান্ত উপেক্ষার বস্তু নহে। ফলতঃ ভূমির এই গুণের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই খাজানার বিস্তর ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। বিশেষ ভূমির স্থানগত মৃত্তিকার প্রকৃতি যে সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তনশীল, তাহাও নহে। কোন উচ্চ পর্ব্বতের উত্তরপাদস্থিত ভূমির মৃত্তিকাকে পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার দক্ষিণ পাদস্থিত ভূমির অনুরূপ করিয়া তোলা ত সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে ভূমির আব-হাওয়া তাহার অপরিহার্য গুণ কিন্তু ইহা মৃত্তিকার কোন গুণ নহে; অথচ তাহার উপর তাহার উৎপাদিকা শক্তি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই সকলগুণ ভূমির অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করে। সুতরাং মৃত্তিকার (soil) গুণ বলিয়া যে সকল স্বাভাবিক বা কৃত্রিম উন্নতি বিধান জন্য তাহার খাজানার ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে, তাহাদের সকলকেই ইহার গুণ বোধক বলিয়া ধরিতে হইবে। কোন কৃত্রিম উপায়ে ভূমির উন্নতি সাধন করিলে,—তাহার

সেই উন্নতি যে নাশ-প্রবণ সন্দেহ নাই,—কিন্তু আর্থিক হিসাবে তাহা কখনো নাশযোগ্য নহে।

এইরূপে ভূমির কৃত্রিম উন্নতিকেও তাহার গুণবোধক বলিয়া কল্পনা করিলে, সেই উন্নতি-কল্পে যে মূলধন স্থায়ীভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার সুদের সহিত খাজানার একটা গোল বাধিতে পারে। বহুকালের সঞ্চিত কত মূলধন যে ভূমিতে নিয়োজিত হইয়া অদ্যাপি সম্যক উঠিয়া আসে নাই, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন; তাহাকে ভূমির অন্যান্য শক্তি হইতে পৃথক করিয়া বিশ্লেষণ করা আরো কঠিন ব্যাপার। ভূম্যধিকারী-কর্ত্তৃক সেই উন্নতি বিহিত হইলে তিনি তজ্জন্য বর্দ্ধিত হারে যে খাজানা প্রাপ্ত হন, তাহা সেই মূলধনের সুদ, সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি এই সুবিধা-সুযোগ ভোগ করিবার জন্য প্রজাকে যে কর দিতে হয়, তাহার সম্যক খাজানা সংজ্ঞক বলিয়া কল্পনা করিলে এই পার্থক্য সম্পাদনের আবশ্যক হয় না। ফলতঃ বাস্তব জীবনে এতটা পার্থক্য সম্পাদন করিয়া খাজানা ধার্য্য করা সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং ভূম্যধি-কারীদিগের কৃত কার্য্যে কৃত্রিম ভাবে যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়া ভূমির পত্তন হয়, তাহাদের সকলকেই ভূমির গুণবোধক বলিয়া ধরিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ ভূমির অবস্থিতি সুবিধা,—

ভূমির অবস্থিতি সুবিধার মধ্যে তাহার স্থানগত বিশিষ্টতা জল বায়ু আলো উত্তাপ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রাকৃতিক সুবিধার উপরে খাজানার হার বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে। তথাপি মানুষের কৃত-কার্য্যের ফলস্বরূপ তাহার উৎপন্ন সামগ্রী সমূহ বাজারে পাঠাইবার যে সকল সুবিধা ও সুযোগের অভ্যুদয় হয়, তাহার প্রভাবও অত্যন্ত বেশী। এমন অনেক উর্ব্বর ভূমি ও স্বাস্থ্যকর স্থান বর্ত্তমান আছে যে ইহা বাজার হইতে অপেক্ষা-কৃত নিকটে হইলেও তাহার সহিত রেল, ষ্টীমার অথবা অন্য কোন দ্রুতগামী বা সুবিধা-জনক যান-বাহনের সংযোগ না থাকায়, তথা হইতে দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণ করিতে এত ব্যয়-বাহুল্য ঘটে যে, কোন সামগ্রীই তথায় উৎপন্ন করিয়া তাহার ব্যবসায়ে লাভ করা চলে না। সমুদ্রপথে ইংলণ্ডের সহিত বহুদূর-দেশান্তরস্থিত স্থানের এমন নৈকট্য সাধিত হইয়াছে যে তথাকার ভূমির খাজানা-বৃদ্ধির ইহাও একটি বিশেষ কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত এদেশে যে সকল রেল-পথ হইয়াছে, তাহার দ্বারা বহির্বাণিজ্যের যতটা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, দেশের আভ্যন্তরীণ ভূমির সহিত বাজারের সে পরিমাণ নৈকট্য সাধিত হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহজনক সুতরাং দেখা যায় যে ভূমির উৎপন্ন সামগ্রী বাজারে প্রেরণের সংযোগ-সুবিধার সহিত এই খাজানা ধার্য্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কলিকাতার বাজারে যখন গোধূমের দর ৬ টাকা, তখন দিল্লী হইতে কোন এক বিঘা ভূমিতে দশ মণ হারে গোধূম উৎপন্ন করিয়া আনিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিলে যে লভ্য পাওয়া যায়, সেই ব্যয়ে সুন্দরবনের কোন এক নিভৃতস্থানে এক বিঘা ভূমিতে ১৫ মণ হারে গোধূম উৎপন্ন করিয়াই যদি অতিরিক্ত বহনী খরচা দিয়া কলিকাতায় আনিয়া সেই পরিমাণ লভ্য পাওয়া যায়, তবে খাজানা ধার্য্যের বেলায় উভয়

ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সমান বলিয়া গণ্য করা অসঙ্গত হইবে না। অতএব ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বলিলে তাহার এই সকল স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উভয় গুণই ধরিতে হইবে।

কোথা হইতে খাজানার উদ্ভব হয়?

যাহারা নূতন কোন অনাবাদী-স্থানে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে, তাহাদিগকে ভূমির জন্য কোন কর দিতে হয় না। ঐ সকল ভূমিতে কোন ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা জাতি-বিশেষের স্বত্বাধিকার কল্পিত না থাকায় যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই যদৃচ্ছা আবাদে আনিয়া আপন অভাব মোচন করিতে পারেন। এই ভাবেই আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নূতন দেশ সমূহ য়ুরোপীয় জাতিগণ কর্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছে। এইরূপ কোন সমাজ কর্তৃক সর্ব্বাগ্রে উৎকৃষ্ট ভূমিসমূহ আবাদে আনা স্বাভাবিক; আর সর্ব্ব প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া এই সকল ভূমি হইতে যতটা শস্য উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে, সেই ব্যয়ের হারে মূল্য দিয়া তাহার খাজানা ধার্য্য হওয়াও স্বাভাবিক। তদপেক্ষা বেশী মূল্য দিয়া একে অন্যের উৎপন্ন সামগ্রী ক্রয় করিবে না। কিন্তু তখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, তদপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর ভূমি চাষে আনিবার ফলে, এই ভূমির উৎপন্ন ফসলের হারে মূল্য ধার্য্য হইয়া শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে। তখন সমাজকে বর্দ্ধিত হারে মূল্য না দিলে কেহই ইহা আবাদে আনিবে না। পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট ভূমি হইতে দশ মণ হারে শস্য লাভ হইত, আর যে ব্যয়ে সেই দশ মণ ফসল উৎপন্ন হইত, সেই হারে তাহার মূল্য ধার্য্য হইত; কিন্তু এক্ষণে সেই ব্যয়েই নিম্ন শ্রেণীর ভূমি হইতে আট মণ হিসাবে ফসল উৎপন্ন হইলে এই আট মণের হারেই মূল্য ধার্য্য হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ভাবে মূল্য বৃদ্ধি হইলে শ্রেষ্ঠ জমির জন্য দুই মণ করিয়া লভ্য দাঁড়াইবে; কিন্তু যদি এই লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধির সময়ে দ্বিগুণ ব্যয় করিয়া গভীরভাবে চাষ হইলে দ্বিতীয় মাত্রার জন্য নয় মণ হারে শস্যোৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইবে বলিয়া বোধ জন্মে এবং সেই ভাবে কার্য্য হয়, তার এই নয় মণের হারেই মূল্য ধার্য্য হইবে; নিম্ন শ্রেণীর ভূমি আবাদে আনার আবশ্যক হইবে না। তখন এক মণ মাত্র লভ্য স্বরূপে উদ্ভব হইবে। আর যদি দুই রসি জমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিয়া লওয়া অনিবার্য্য হয়, তবে দুই মণই উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে। কিন্তু যদি তখন আরো লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এবং সাত মণ করিয়া উৎপন্নের যোগ্য ভূমি আবাদে আনার প্রয়োজন পড়িয়া যায়, তবে প্রথম শ্রেণীর ভূমিতে তিন মণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমিতে এক মণ উদ্বৃত্ত হইবে। এই উদ্বৃত্তি হইতেই খাজানা দেওয়া যাইতে পারিবে; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ভূমির জন্য কোন খাজানা দেওয়া যাইতে পারিবে না, কারণ তাহার উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্যে ব্যয় মাত্র উঠিয়া আসিতেছে; কিছুই উদ্বৃত্ত হইতেছে না। প্রারম্ভে প্রথম শ্রেণীর জন্য কোন খাজানা দেওয়া সম্ভব ছিল না; দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমি আবাদে আনার ফলে, প্রথম শ্রেণীর জন্য দুই মণ খাজানার উদ্ভব হইল; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন খাজানার উদ্ভব হইল না; শেষে তৃতীয় শ্রেণী আবাদে আসিলে, উপরের দুই

শ্রেণীর খাজানার উদ্ভব হইল, প্রথম শ্রেণীর জন্য তিন মণ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য এক মণ, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর জন্য কোন খাজানা দেওয়া সম্ভবপর হইল না। এইরূপে পর-পরভাবে যত নিম্ন শ্রেণীর ভূমি আবাদে আনা হয়, ততই তদূর্দ্ধ শ্রেণীর জন্য উত্তরোত্তর বেশী উপস্বত্বের অভ্যুদয় হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা ভূমি যদৃচ্ছা-লব্ধ বলিয়া কল্পনা করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু তাহা না করিয়া ইহা দুষ্প্রাপ্য এবং ব্যক্তি-বিশেষের অধিকারগত বলিয়া গ্রহণ করিলেও আমাদের এই অবধারিত তত্ত্বের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে না। কারণ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তি-হ্রাস নিরাময় প্রভাবে সর্ব্বক্ষেত্রেই ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি সীমায় উৎপন্ন শস্যের মূল্যে তাহার উৎপাদন-ব্যয় মাত্র উঠিয়া আসিবে, কিছুই উদ্বৃত্ত হইবে না। বর্ত্তমান কল্পিত ক্ষেত্রে সমাজের আত্ম-প্রয়োজনে তৃতীয় শ্রেণীর ভূমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিতে হয় বলিয়া তাহার উৎপন্ন ফসলের মূল্যে যাহাতে উৎপাদন-ব্যয় উঠিয়া আসে সেই ভাবে মূল্য ধার্য্য হয়, এবং উপর্য্যুক্ত দুই শ্রেণীর ভূমির জন্য উপস্বত্বের অভ্যুদয় ঘটে। এই মূল্যই ফসলের স্বাভাবিক মূল্য (normal price)। স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার উপর মূল্য ধার্য্য হয় না। সমাজ আত্ম-প্রয়োজনে নিম্ন শ্রেণীর ভূমি চাষে আনে অথবা গভীরভাবে তাহার চাষ দেওয়ায় আবশ্যক হয় বলিয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভূমির জন্য একটা বিশেষ সুবিধা বা বিশিষ্টতার (Differential advantage-এর) অভ্যুদয় হয়। ইহাই খাজানা উদ্ভবের কারণ। ভূমিতে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার থাকা না থাকার উপরে খাজানা নির্ভর করে না। এই উদ্বৃত্ত উপস্বত্ব হইতে ভূম্যধিকারী খাজানা পাইয়া থাকেন, এই পর্য্যন্ত। তবে দেশের ভূমি জাতির সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইলে এই উদ্বৃত্ত বা উপস্বত্ব সমগ্র সমাজে বিস্তৃত হইয়া সমাজের উপকারে লাগিতে পারিত সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা করিতে গেলে বর্ত্তমান সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া একটা বিরাট বিপর্যায়ের সৃষ্টি হইবে। সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ এই উপস্বত্বকেই nationalized বা জাতির সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে চান। আর শ্রমজীবি সম্প্রদায়ও ইহা হইতে একটা অংশ পাইবার আকাঙ্ক্ষা রাখে। এই সকল ব্যাপারের ন্যায়-অন্যায় বিচার করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে ভূম্যধিকারী এই উপস্বত্ব হইতে কতটা পাইতে পারেন, তাহাই আমাদের বিশেষ আলোচ্য।

ঊর্দ্ধকল্পে ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য পরিমাণ

নানা কারণে ভূমির জন্য কৃষকের টান জন্মে। ভূমির উর্ব্বরতা, বাজারের সহিত তাহার সংযোগ-সুবিধা প্রভৃতি ভূমির উৎপাদিকা শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য কৃষকের আগ্রহ জন্মে। চাষ-আবাদের ও শস্যাদির প্রকার-ভেদেও এই টানের ইতর-বিশেষ হয়। সর্ব্বোপরি কৃষকের বর্ত্তমান শিক্ষা-দীক্ষানুসারে প্রচলিত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, তাহার বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে যে পন্থায় যে শস্য উৎপন্ন করিল, সে

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লভ্য করিতে পারিবে বলিয়া তাহার বোধ জন্মে; তাহার উপর তাহার খাজানা দেওয়ার ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। উৎপন্ন সামগ্রী হইতে প্রচলিত হারে তাহার নিজের ও শ্রমজীবিদিগের বেতন, টাকার সুদ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যয়-বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইতেই তাহাকে খাজানা দিতে হইবে। আর বৎসরে বৎসরে এই উপস্বত্বই বা গড়্ পড়্ তা কত হইতে পারে, তাহারও একটা মোটামুটি আঁচ করিয়া তাহাকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে প্রচলিত হারে মাহিনা ছাড়াও তাহার যেন কিছু লভ্য থাকিয়া যায়, এ বিষয়েও তাহার লক্ষ্য থাকা অতীব স্বাভাবিক। কেন না বেতনের উপরে কিছু লভ্য না থাকিলে, তাহার পক্ষে এই কৃষিকার্য্যের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। তথাপি যদি তাহার সমশ্রেণীর কৃষকের মধ্যে এই ভূমি পাইবার জন্য প্রবল টান জন্মে, তবে প্রতি-যোগিতা ক্ষেত্রে তাহাকে ভূমির বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক সেই পথ অনুসরণ করিয়া ভূমির শস্যোৎ-পাদিকা সীমা পর্য্যন্ত ধন ও জন-নিয়োগের ফলে যতটা উপস্বত্ব লাভের সম্ভাবনা আছে, সেই পরিমাণ জমা দিয়া তাহাকে এই কার্য্যে লিপ্ত করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় তাহাকে প্রচলিত হারে বেতন মাত্র পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তখন উপস্বত্ব ও খাজানা এক হইয়া যাইবে। ইহাই খাজানা উর্দ্ধ সীমা। এই সীমার উপর খাজানা দিতে হইলে কৃষকের ক্ষতি হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত।

সঙ্কলন

বিলাত যাত্রীর পত্র

জাহাজে বড় বেশি ভিড়। ডাঙার হাটে বাজারে যে ভিড় হয় সে চলতি ভিড়—নদীতে জোয়ারে জলের মত—কিন্তু এই ভিড় বদ্ধ ভিড়। আমরা যেন কোন্ এক দৈত্যের মুঠোর মধ্যে চাপা রয়েচি কোনো ফাঁকি দিয়ে বেরবার জো নেই। আমরা আছি তার ডান হাতের মুঠোয়, আমরা হলুম প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। কিন্তু যারা পড়েচে বাম হাতের ভাগে তাদের সংখ্যা বেশি, চাপ বেশি, স্থান কম। ঐদিককার ডেকের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয় যেন ঐ অংশে জাহাজের হাঁপানির ব্যামো, যথেষ্ট পরিমাণে নিঃশ্বাস নিয়ে উঠতে পারচে না। আমরা আছি সভ্যতার সেই যুগে যেটার নাম দেওয়া যেতে পারে সরকারী যুগ। রেলগাড়ি বল, ষ্টীমার বল, হোটেল বল, ইস্কুল বল, আর পাগলা গারদ বল সমস্তই পিণ্ডপাকানো প্রকাণ্ড ব্যাপার। কিন্তু সমষ্টি এবং ব্যষ্টির যোগেই বিশ্বজগৎ। সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টিকে যদি অত্যন্ত বেশি সংকুচিত হতে হয়, তাতে সমষ্টির যথার্থ উৎকর্ষ হয় না। এতে শক্তির অভাব প্রকাশ পায়। এখনকার সভ্যতা বলচে সমূহকে দলন করে যে পিণ্ড হয় সেই পিণ্ডই আমার বরাদ্দ অন্ন। প্রত্যেকের পূরা ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত স্থান এবং

সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু এই রকম সরকারী ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতা কি সাম্রাজ্যে কি সমাজে প্রতিদিন স্তূপাকার হয়ে উঠ্‌চে। এই অন্যায় এবং দুঃখকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যেই মানুষ নানা উক্তিতে অনুষ্ঠানে ও শাসনে রাষ্ট্রপূজা ও সমাজপূজাকে একটা ধর্ম্ম করে তুলেচে। সেই ধর্ম্ম যারা মানচে এবং দুঃখ সহ্য করচে মানুষ তাদেরই সাধু সম্বোধন করে পুরস্কৃত করচে, যারা মানচে না তাদের বল্‌চে বিদ্রোহী, তাদের দিচ্চে নির্ব্বাসন কিম্বা প্রাণদণ্ড। এমনি করে প্রভূত নরবলির উপরে মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন একদিন আস্‌চে যখন বলির মানুষ মেলা সহজ হবে না; যখন ব্যষ্টি আপন পুরা মূল্য দাবী করবে। আজ কর্ম্মিকের দল ধনিকের শাসন অমান্য করচে; তাতে ক্রুদ্ধ সমাজ অর্থাৎ সমষ্টিদেবতা তাদের প্রতি চোখ রাঙাতে ত্রুটি করচে না, এবং রাষ্ট্রধর্ম্মেরও দোহাই দিচ্চে; বল্‌চে, তোমারা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে নেশনের ক্ষতি হবে, অন্য নেশন বাণিজ্যবিস্তারে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কর্ম্মিক সে দোহাই আজ মান্‌তে চাচ্চে না; বল্‌চে, আমার প্রতি অন্যায় করতে দেবনা, আমার যা পুরা মূল্য তা আমাকে দিতেই হবে। য়ুরোপে রাষ্ট্রধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বলির মানুষকে যূপকাষ্ঠে টেনে নিয়ে আসে, এই ধর্ম্মের দোহাই শুনে কর্ম্মিকেরা ধনদেবতার রথযাত্রায় রথ টান্‌তে টান্‌তে তার চাকার তলায় পড়ে পড়ে মরে, সৈনিকেরা শক্তিদেবতার কণ্ঠহার রচনার জন্যে আপন ছিন্নমুণ্ড উৎসর্গ করে পুণ্যলাভ হল কল্পনা করে। আর আমাদের দেশে সমাজধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমরা এতকাল নরবলি দাবী করে এসেচি;—শূদ্রকে বলে এসেচি অগৌরবে তুমি সম্মত হও কেন না সমষ্টিদেবতার সেই আদেশ অতএব এই তোমার ধর্ম্ম; নারীকে বলে এসেচি কারাবেষ্টনে তুমি সম্মত হও তাহলেই সমষ্টিদেবতার কাছে তুমি বরলাভ করবে, তোমার ধর্ম্ম রক্ষা হবে। কিন্তু সমষ্টিদেবতা সর্ব্বকালে দেবতার প্রতিযোগী হয়ে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। মানুষকে খর্ব্ব করবার অন্যায় এবং দুঃখ রাষ্ট্রের এবং সমাজের স্তরে স্তরে জমে উঠচে, এমনি করে প্রলয়ের ভূমিকম্পকে গর্ভে ধারণ করচে। রাষ্ট্রের এবং সমাজের ভিত্তি টলে উঠবে—হিসাব তখন হবে, তখন বহুকালের ঋণ পরিশোধের পালায় ব্যষ্টির কাছে সমষ্টিকে একদিন বিকিয়ে যেতেই হবে। ব্যষ্টির পূর্ণতা অপহরণ করে সমষ্টি যে পূর্ণতার বড়াই করে সে পূর্ণতা মায়ামাত্র, সে কখনই টিঁকতে পারে না। আজ আমরা তাকে ধর্ম্মের আবরণ দিয়েচি কিন্তু এমন কত বলিরক্তলোলুপ ধর্ম্ম কিছুকালের জন্য জননী বসুন্ধরাকে পীড়িত এবং অশুচিকরে আজ অন্তর্দ্ধান করেচে।

এই কথা কয়দিন আমাকে বিশেষ করে বেদনা দিচ্চে, তার কারণ বলি। আমাদের যাত্রার আরম্ভে জাহাজ অল্প কিছু মন্থরগমনে চল্‌চে বলে যাত্রীরা দুঃখবোধ করছিল। মন্থরতার কারণ শোনা গেল এই যে, এঞ্জিনের জঠরানলে কয়লা যোগান দেবার ভার যাদের সেই হতভাগ্য "ষ্টোকার" দল (Stoker) বড় ক্লান্ত, তারা পুরা দমে কাজ করতে পেরে উঠ্‌চে না। শোনা গেছে বোম্বাইয়ে বিশেষ এক তারিখে ঘাটের খালাসিদের ধর্ম্মঘট করবার কথা ছিল। সেই তারিখের আগে কোনোক্রমে জাহাজ ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে অতিরিক্ত মজুরীর প্রলোভন দিয়ে ষ্টোকারদের অতিরিক্ত কাজ করানো হয়েছিল। একজন ষ্টোকার হাতায় কয়লা নিয়ে দারুণ শ্রান্তি ও অসহ্য উত্তাপে এঞ্জিনের সামনে পড়ে মরে গেল। কিন্তু জাহাজ ধর্ম্মঘটের আগেই ঘাটে পৌঁচেছিল, খনি-কারদের বলি না দিলে খনি থেকে কয়লা ওঠে না, ষ্টোকারদের বলি না দিলে জাহাজ সমুদ্র পার হয়ে খেয়াঘাটে পৌঁছয় না—এই জন্যে এদের সম্বন্ধে দুঃখবোধ করা অনাবশ্যক;—সভ্যতার মধ্যে যে একটা সমষ্টিগত ধন ও প্রয়োজন আছে তারই কথাটা এদের সকল দুঃখের উপর মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে। সবই মানি কিন্তু এও মান্‌তে হবে যে যত সুবিধা যত সুখই হোক্ না, তাকে সভ্যতা বল আর যাই বল না কেন, দুঃখ এবং অন্যায়ের হিসাব কিছুতেই চাপা পড়বে না। বলির মানুষরা আপাতত মরে কিন্তু পরে তারাই বলিদাতাকে মারে। এই কথা নিশ্চয় জেনো, গ্রীস রোম ইজিপ্ট তার বলিদের হাতেই মরেচে

আর ভারতবর্ষও তার বলিদের হাতেই বহুকাল থেকে মরচে। ইতিহাসে এনিয়মের কিছুতেই ব্যতিক্রম হতে পারে না—আমাদের শাস্ত্র বলে ধর্ম্ম হত হয়েই নিহত করে—কিন্তু সেই ধর্ম্ম নিষ্ঠুর সমষ্টিদেবতার ধর্ম্ম নয়, সেই ধর্ম্ম শাশ্বত দেবতার ধর্ম্ম। ১০ মে, ১৯২০।

৪

এডেন পার হয়ে রোহিত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে চলেচি। এদিকে গরম হাওয়ার আকাশ পেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার আকাশে প্রবেশ করচি। নানা নামের নানা দেশে মানুষ পৃথিবীকে ভাগ করেচে, কিন্তু আসল ভাগ হচ্চে ঠাণ্ডা দেশ আর গরম দেশ। এই ভাগ অনুসারে পৃথিবীর জলস্রোত পৃথিবীর বায়ুস্রোত প্রবাহিত হয়ে আকাশে মেঘবৃষ্টি ও ধরণীতে ফলশস্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করচে। এই ঠাণ্ডাগরমেই মানবপ্রকৃতির বৈচিত্র্য এমন বহুধা হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের নানা ধারা পৃথিবীর এক দিক থেকে আরেক দিকে প্রবাহিত হচ্চে এবং পরস্পর আহত প্রতিহত হয়ে ঐতিহাসিক উনপঞ্চাশ পবনের রুদ্র নৃত্য রচনা করে চলেচে, সেও এই ঠাণ্ডা-গরমের বিপরীত শক্তির ক্রিয়া। ঠাণ্ডাগরমের এই স্বাভাবিক বিরোধ এবং বৈচিত্র্য মিট্‌বে না। আমরা গরম দেশের লোক একভাবে চিন্তা করব কাজ করব, ওরা ঠাণ্ডা দেশের লোক আরেক ভাবে। আমাদের জিনিষ ওদের হাটে এবং ওদের জিনিষ আমাদের হাটে চালাচালি করতে পারব, কিন্তু ওদের ফল আমাদের ডালে আর আমাদের ফল ওদের ডালে ফলবে এ কোনোদিনই ঘটবে না। ওরা যে শক্তি জগতে চালাচ্চে সে ঠাণ্ডা হাওয়ার শক্তি—সে শক্তি জাপানের পক্ষে সহজ, কেননা জাপান আছে ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশে, আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কোনো বিশেষ শক্তি ক্ষণকালের জন্যে চালনা করতে সকল মানুষই পারে কিন্তু উপযুক্ত হাওয়ার আনুকূল্য না পেলে সে শক্তিকে নিরন্তর রক্ষা করা এবং তাকে নিয়ত বিকশিত করে তোলা অসম্ভব। দেবতার অনবচ্ছিন্ন প্রতিকূলতার ক্রমে শৈথিল্য এবং ক্লান্তি এসে পড়বে এবং ক্রমে বিকৃতি ঘট্‌তে থাক্‌বে। জাহাজে করে পৃথিবীর একভাগ থেকে আরেক ভাগে চল্‌বার সময় এই কথাটা বোঝা খুব সহজ হয়। সৃষ্টিক্রিয়ার উত্তাপের বৈচিত্র্যই শক্তি-বৈচিত্র্য, সে কথাটা ভারত-সমুদ্র থেকে মধ্য-ধরণী-সাগরের দিকে আস্‌বার সময় নিজের সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। আমার একথা শুনে তোমরা হয়ত বলবে, "তবে কি তুমি বল্‌তে চাও বাহ্যপ্রকৃতির ক্রিয়ার কাছে নিশ্চেষ্টভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে? আমরা কি ইচ্ছাশক্তির জোরে তার উপরে উঠ্‌তে পারিনে?" এ কথার উত্তর হচ্চে নিশ্চেষ্ট হতে হবে এমন কথা বলা চল্‌বে না, কিন্তু চেষ্টাকে বিশেষত্ব দেওয়া চাই। বাহ্যপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির যোগেই মানুষের সমস্ত সভ্যতা তৈরি হয়েছে, এই বাহ্যপ্রকৃতিকে মানুষ কিছু পরিমাণে বদলও করতে পারে কিন্তু সে বদল খুচরো বদল, মোটা বদল হবার জো নেই। তাহলে আমাদের ইচ্ছাশক্তির কাজটা কি? তার কাজ হচ্চে এই, যেটা পাওয়া গেছে সেটাকেই পূর্ণ উদ্যমে সফল করে তোলা, জড়তার দ্বারা সেটাকে নিরর্থক না করা। অবস্থার যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি সফলতারও বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছাশক্তি সেই বৈচিত্র্যকে দোহন করে নিতে পারে কিন্তু ভিন্ন লোকের ভিন্ন অবস্থাগত সফলতাকে একমাত্র পরমার্থ বলে লুব্ধভাবে কামনা করা শক্তি-হীনের কাজ। উপনিষদে বলেচেন, যিনি এক তিনি "বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।" তিনি তাঁর বহুধা শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিহিত অর্থ দান করেচেন। সেই নিহিত অর্থ নিজের ক্ষেত্রেই আছে; নিজের শক্তির দ্বারা সেই নিহিত অর্থ যে জাতি উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেচে সেই জাতিই সার্থক হয়েচে। কারণ, যে জাতি নিজের অর্থ পেয়েচে বিনিময়ের দ্বারা পরের অর্থকেও সেই জাতি নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পারে। নিজের নিহিত অর্থ যে জাতি উদ্‌ঘাটিত করে না, সেই জাতি ধার করে, ভিক্ষা করে, চুরি করে, পরের অর্থ কামনা করে, কিন্তু এই পন্থায় কোনো জাতি ধনী হতে পারে না, কেন না, এই পথে যেটুকু পাওয়া যায় তাতে জাতও যায় পেটও ভরে না। ইতি ২৪শে মে, ১৯২০।

দুই মহাদেশের মাঝখান দিয়ে চলেচি। বামে ইজিপ্ট, দক্ষিণে আরব। দুই তীরেই জনহীন তৃণহীন ধূসরবর্ণ পাহাড় যেন দুই ঈর্ষাপরায়ণ দৈত্যভ্রাতার মত পরস্পরের প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করচে, আর যে সমুদ্রের গর্ভ থেকে তারা উভয়েই জন্ম নিয়েচে সেই সমুদ্র যেন দিতিমাতার দুই হননোন্মুখ ভাইয়ের মাঝখানে পড়ে অশ্রুপরিপূর্ণ অনুনয়ের দ্বারা দুই পক্ষকে তফাৎ করে রেখেচে।

বামের তীর শব্দহীন, নিস্তব্ধ, দক্ষিণের তীরও তাই। কিন্তু এই দুই তীরের ভূরঙ্গমঞ্চে মানব-ইতিহাসের যে নাট্যাভিনয় হয়ে গেছে, আমি মনে মনে তারই কথা চিন্তা করে দেখ্‌চি। ইজিপ্টে যে মানব-সভ্যতা বিকাশ পেয়েছিল সে বহুদিনের এবং সে বহু সম্পদশালী। তার কত চিত্র, কত অনুষ্ঠান, কত মন্দির। আর আরবে যে জাগরণ হঠাৎ দেখা দিয়েছিল তার কত উদ্যম, কত উদ্যোগ, কত শক্তি। কিন্তু দুই বিপরীত তীরে মানবচিত্তে এই দুই উদ্বোধন সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। ইজিপ্ট আপনার বিপুল আয়োজনের মধ্যেই আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর আরব আপনার দুর্দমনীয় বেগে দেশে-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই দুই সভ্যতার প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণ ছিল দুই দেশের ভৌগোলিক পার্থক্যের মধ্যে। নীল নদীর জলধারায় পরিপুষ্ট ইজিপ্ট ফলে শস্যে পরিপূর্ণ; অভাবের কঠিন তাড়নায় সেখানকার মানুষকে নিরন্তর আঘাত করে নি। উর্ব্বরসহীন আরব-মরুভূমির সন্তানেরা নিজে অস্থির হয়েছিল এবং পৃথিবীর সকলকে অস্থির করেছিল।

বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র যেমন দুই স্বতন্ত্র প্রকৃতির ঋষি ছিলেন তেমনি ইজিপ্ট এবং আরব দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর দেশ। পৃথিবীর সকল দেশের লোককেই দুই মোটা ভাগে বিভক্ত করে' বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের কোঠায় ফেলা যায়। বসিষ্ঠ বাস করেন, আর বিশ্বামিত্র ব্যাপ্ত হন। বসিষ্ঠ ধেনুপালন করেন আর বিশ্বামিত্র ধেনুহরণ করেন। বসিষ্ঠ রামচন্দ্রের কানে মন্ত্র দেন, আর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের হাতে অস্ত্র দেন। বসিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী গৃহের পুরোহিত, আর বিশ্বামিত্র দুর্গম বনপথের নেতা।

বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষ এবং চীন বসিষ্ঠের মন্ত্রে দীক্ষিত; আর য়ুরোপ বিশ্বামিত্রের আহ্বানে চঞ্চল। এই দুই ঋষি কি কোনো দিন প্রেমে মিল্‌বেন? আর যদি না মিল্‌তে পারেন তা হলে পৃথিবীতে কি কোনো কালে বিরোধের অবসান হবে? যদি এমন আশা কর যে, দুইয়ের মধ্যে এক ঋষি যেদিন মারা যাবেন সেইদিনই পৃথিবীতে শান্তি দেখা দেবে, তবে সে আশা সফল হবে না, কেননা জগতে বসিষ্ঠও অমর। বিশ্বামিত্রও অমর। আমার বিশ্বাস একদিন এই দুই ঋষিই এক যজ্ঞের ভার নেবেন, মন্ত্র এবং অস্ত্র, অমৃত এবং উপকরণ একত্রে মিলিত হবে, সেই যজ্ঞের অগ্নিশিখা আর নিব্‌বে না। এশিয়া এবং য়ুরোপ যদি কোনো দিন সত্যে মিল্‌তে পারে তা হলেই মানুষের সাধনা সিদ্ধ হবে—নইলে রক্তবৃষ্টিতে মানুষের তপস্যা বারংবার কলুষিত হতে থাক্‌বে। ২৪শে মে ১৯২০।

শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩২৭।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা

রাহুর প্রেম ও অন্যান্য গল্প। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী বি, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীরমানাথ দাস, ১১ হরিমোহন রায়ের লেন, কলিকাতা, মেটকাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি ছোট গল্পের বহি। 'রাহুর প্রেম', 'দানের বেদন', 'প্রকৃতির ভোগ', 'প্রহসন', 'বাদুড়', 'ডায়েরি' ও 'শাস্তি'—এই কয়টি গল্প এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলির প্লট মামুলির ধরণের নয়,—ব্যঞ্জনায় কৃতিত্ব আছে। রচনায় তেজ আছে, আর্ট আছে—মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণে গল্পগুলিও বেশ উপভোগ্য

হইয়াছে। 'রাহুর প্রেম' ও 'দানের বেদন'—এই দুইটি গল্প আর-একটু ছোট হইলে উহাদের ভিতরকার রস পরিপূর্ণ জমাট বাঁধিত। আমাদের সব-চেয়ে ভালো লাগিয়াছে, এ গ্রন্থের "বাদুড়" গল্পটি। গল্প লিখিবার কায়দা লেখক বেশ আয়ত্ত করিয়াছেন এবং ভাষাও প্রায় সর্ব্বত্র সংযমের গণ্ডী ধরিয়া ভাবকে মানিয়া চলিয়াছে। আজকালকার ছোট গল্পে 'প্রাণ্' জিনিষটার বড়ই অভাব। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ বইয়ের গল্পগুলিতে সেই 'প্রাণ্' বস্তুটি কোথাও মারা পড়ে নাই। বহিখানির ছাপা বাঁধাই কাগজ বেশ নয়নাভিরাম হইয়াছে।

আত্মচরিত। ৺শিবনাথ শাস্ত্রী। কলিকাতা, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত। ২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা। বাঙলার বর্ত্তমান সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে পণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রভাব বড় অল্প নহে। বাঙলার এক যুগ-সন্ধিক্ষণে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ভাবে ও কার্য্যে আপনার ব্যক্তিত্বকে যথেষ্টই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই 'আত্মচরিতে' তিনি নিরপেক্ষতার সহিত তাঁহার মনের অবস্থা, চিন্তার গতি ও পরিণতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই চরিত-গ্রন্থখানি সেকালের নানা কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সেকালের সমাজ কি ছিল,—সেই সমাজ নানা জনের হাতে কেমন করিয়া এখনকার এই বর্ত্তমান রূপে গড়িয়া উঠিল, বাঙলার সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার কতখানি প্রভাব পড়িল, তাহারই কৌতুহলোদ্দীপক সরস বর্ণনা শাস্ত্রী মহাশয়ের অনিন্দ্যসুন্দর সরল সহজ তুলির ইঙ্গিতে একখানি মনোজ্ঞ ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইহা হইতে একদিকে যেমন শাস্ত্রী মহাশয়ের সরল জীবন-যাত্রার প্রণালী এবং বলিষ্ঠ ও দৃঢ় চিত্তের পরিচয় পাই, তেমনি বাঙলার সামাজিক ইতিহাসেরও অনেক তথ্যের সন্ধান মিলে। এ গ্রন্থ হইতে বাঙলার সামাজিক ইতিহাস-রচনার প্রচুর উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। বাঙলা সাহিত্যে এ গ্রন্থখানির মূল্য বড় সামান্য নহে।

বিভ্রাট। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম, এ প্রণীত। কলিকাতা শ্রীরাম প্রেসে মুদ্রিত। ১৫ নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, লণ্ডন লাইব্রেরী হইতে জে, মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। এখানি নাটিকা—বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার লা বিশ রচিত 'ল্য গ্রামেয়ার' নামক হাস্যরসাত্মক ফরাসী নাটিকা অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থখানি 'ব্যাকরণ-বিভ্রাট' নামে 'ভারতীতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদেশী চরিত্রগুলি লেখক নিপুণভাবেই দেশী ছাঁচে গড়িয়া আমদের সম্মুখে ধরিয়াছেন এবং ইহার অন্তর্নিহিত Humourটুকুও বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গ্রন্থে একখানি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত ছবি দেওয়া হইয়াছে। জোর করিয়া ছবির নীচে একছত্র লেখা থাকিলেও সে ছবির সহিত অবশ্য গ্রন্থোক্ত চরিত্রের কোন মিল দেখিলাম না।

দাস আমি। প্রকাশক, শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়, ৪ নং রামমোহন মুখোপাধ্যায় লেন, শিবপুর, হাওড়া। মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

স্বস্তিকা। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এখানি কবিতা-গ্রন্থ,—নানা বিষয়ের কতকগুলি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে।

আকাশের খোকা। শ্রীকানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, রায় এম, সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, ৯০-২-এ হ্যারিসন রোড কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। অস্কার ওয়াইল্ড্ রচিত একটি গল্পের অনুসরণে এই গল্পটি লিখিত—ছেলে-মেয়েদের জন্য লেখা। গল্পটিতে নীতি-কথা আছে। গল্পটি বেশ ঝরঝরে, সহজ ভাষায় লেখা—ছেলেমেয়েরা পড়িয়া আনন্দ পাইবে। বইখানিতে পাঁচটি ছবি আছে। ছবিগুলি আঁকিয়াছেন,—প্রসিদ্ধ আর্টিষ্ট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। ছবিগুলি ভালো হইয়াছে। বহিখানির ছাপা কাগজ ও বাঁধাই বেশ মনের মত হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২৫, রুক্মিণী ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পতিব্রতা পত্নীর পত্র।

ওরে ডাক্‌রা অলপ্পেয়ে বাড়ী আস্‌বি কবে ?
মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে কিরে পথ চাইতে হবে ?
হাঁস্‌ছে যত বৌ ঝিয়েরা এল আশ্বিন মাস,
কত দ্রব্য পাবে তারা মিট্‌বে মনের আশ।
চাকরে স্বামী আসবে ঘরে সখের দ্রব্য নিয়ে,
বিলাসের চূড়ান্ত হবে বৌকে সকল দিয়ে।
যম ভোলেনা তোমায় ডাকরা বল্‌বো কারে দুখ।
মাথার চুল পাক্‌লো আমার তবু দিলিনে সুখ।
এবার যদি শুধু হাতে এসো রে অলপ্পেয়ে
গায়ের ছাল তুল্‌বো তোমার খ্যাংরার বাড়ি দিয়ে।
তেল অভাবে কৃষ্ণ চুল অর্দ্ধেক গেছে পেকে ;
ঔষধ বিনে ওরে ডাক্‌রা ঘির্‌লো মাথা টাকে।
পাথরের গোপালের মত ছিল আমার রং,
খেতে মাখ্‌তে না দিয়ে তুই সাজিয়েছিস একটা সং
কোটরে ঢুকেছে চোখ মেছেতা পড়েছে মুখে,
আমি যেই মেয়ে তেঁই ঘর করি এ দুখে।
তেল অভাবে ফেটেছে গা উড়ছে তায় খড়ি,
ভাল তেল না আনলে এবার মার্‌বো ঝাঁটার বাড়ি।
কুন্তলীন তেলটা নাকি ভাল সবার চেয়ে,
ভাল চাওতো তাই আন্‌বে দো-মনা না হ'য়ে।
আটহেতে কাপড় প'রে চিরকালটা গেল ;
দশহেতে যা পূজোয় দিস তাও হয় না ভাল।
বেনারসী আনবি এবার ভাল যদি চাস ;
নইলে ঝাঁটার চোটে ভূত ছাড়াব মিটিয়ে মনের আশ
যা লিখলাম এই ভাল আর বেশী না চাই।
বিলাসের সখ মিটাতে যেন এই কয়টাই পাই।
আকুল হ'য়ে রইলাম আমি তোমার পথ চেয়ে।
জিনিষ ক'টা এনে দেখ আমি কেমন মেয়ে।

তোমারই পতিব্রতা পত্নী।
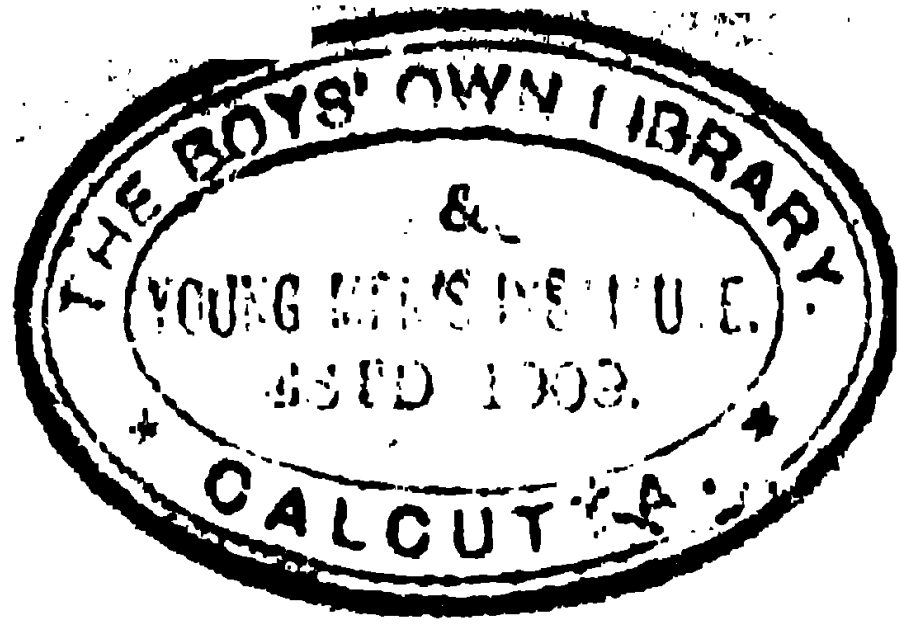
ভারতী

৪৪শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২৭ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

মার্জ্জনা

৪

সোদপুরের বাগান-বাড়ীটা হাল ফেসানের না হলেও খুব বনেদি ধরণের। ঘরগুলো সংখ্যায় কম হলেও লম্বা-চওড়ায় বড়-বড়। হল-ঘরটার একদিক থেকে আর একদিকের লোকজনকে যেন ছোট্ট দেখায়।—সাম্‌নে প্রকাণ্ড ফুলের বাগান, দেশী-বিলাতী ফুল ফুটে আলো করে রয়েচে; দুদিকে দুটো বড় বড় পুকুর; মাঝখান দিয়ে চওড়া সুরকির টক্‌টকে লাল রাস্তা; গেটের দু'ধারে দুটো প্রকাণ্ড বড় মেহগিনির গাছ;—রাস্তার দুধারে রাধাচূড়োর গাছ—ফুল ফুটে লালে-লাল। বাড়ীটাকে উপভোগ্য আর মনোরম করবার যথেষ্ট চেষ্টা যে করা হয়েচে, তা তাতে পা দেবামাত্র বেশ বুঝতে পারা যায়।

কল্‌কাতার গাড়ী-ঘোড়া লোকজনের ভিড় থেকে সেখেনে গিয়ে পড়ে আমি যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। নিরিবিলি জায়গার একটা মস্ত গুণ যে সেখানে নিজেকে উপলব্ধি করবার অন্ততঃ যথেষ্ট অবসর পাওয়া যায়। নিজেকে জানা যে একটা মস্ত কাজ, তা বেদ-বেদান্ত অনেকবার করে বলে গেছেন। বয়সের সঙ্গে যখন বাইরের উপর একটা অনাসক্তি আপনিই এসে পড়তে থাকে, ইন্দ্রিয়গুলো দুর্ব্বল আর ক্ষীণ হয়ে পড়ে, বাহ্য জগৎটাকে অনেকখানি অস্পষ্ট এবং দূর ক'রে তোলে, তখন স্বতঃই নিজেকে জান্‌বার প্রবৃত্তি আর আকাঙ্খাটা বেড়ে উঠ্‌তে থাকে, সেই সময় বনে যাবার উপদেশটা মন্দ নয়। আমার মনে হয়, নিজের আর পরের শান্তির জন্য এটা একটা খুব প্রয়োজনীয় জিনিষ। প্রবৃত্তিগুলো যখন নিবৃত্তির পথ ধরে, তখন তাদের উপর আগেকার ঝোঁক-ঝাক সয় না; অভ্যাস-দোষে সে ঝোঁক দিতে হলে জীর্ণ ঠিকা গাড়ীর মত তারা এমন একটা কলরব করতে

থাকে, যাতে ভিতরকার শওয়ারি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে! তখন তাঁকে কাজের গণ্ডী থেকে তফাৎ যে করতে পারে, সে খুব বুদ্ধির কাজই করে। দায়ে পড়ে যখন আমার এই ব্যবস্থাই ঘটল, তখন আমি শাস্ত্রকারদের বুদ্ধি এবং বহুদর্শিতার বাহাদুরি না দিয়ে থাকতে পারিনে।

মিনিকে এ'সব কথা আমি বলিনি; কিন্তু সে যেন এটা বুঝে নিয়েছিল—তাই তাকে নেহাৎ না ডাকলে সে এসে বড় আমার নিভৃত চিন্তার শান্তি ভঙ্গ করত না। তার দেহখানা নবীন থাকলেও মনে সে অনেকখানি বুড়ো হয়ে গিয়েছিল—হয়ত সেও বসে চুপ-চাপ নিজেকে উপলব্ধি করত।

মোট কথা, সোদপুরে দিনগুলো খুব ভাল কাটবে বলে আমার বিশ্বাস হওয়াতে মনটা সম্পূর্ণ উদ্বেগ-হীন হওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ বোধ করলাম।

বিকেলে হয় লোক, না হয় চিঠি কলকাতা থেকে আসত। সেই সময়ে আমরা বাগানের মধ্যে বসে চা পান করতাম। দিনের মধ্যে যা-কিছু প্রয়োজনীয় কথা বার্ত্তা আমাদের সেই অবসরে হতো। চিঠি-কাগজ-পত্র মিনিই সব খুলত, কি উত্তর দিতে হবে, আমি মুখে মুখে বলে দিতাম—সে রাত্রে বসে সেগুলোর জবাব লিখে দিত। ইতিপূর্ব্বে আমার স্ত্রী মিনিকেই চিঠি দিচ্ছিলেন; সে-ই তার জবাব দিয়ে দিত। সেদিন একখানা খামে মোড়া চিঠি আমার নামে এসেছিল, আর আমার স্ত্রী তাতে লিখে দিয়েছেন যে আমি ভিন্ন অপর কেউ যেন সেটা না খোলে।

মিনি চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বল্লে, "প্রেরকের অনুজ্ঞা যে এটা আপনিই খুলবেন।"

চিঠিখানা না দেখেই আমি বল্লাম, "কে প্রেরক?"

"কাকিমা।"

চিঠিখানা পড়ে, উদ্বেগে চিত্তটা ভরে উঠল। তিনি লিখ্‌চেন, লীলার শরীরটা ক'দিন ধরে মন্দ যাচ্ছিল; ডাক্তারেরা ভয়ের কোন কারণ নেই বলচেন; কিন্তু লীলা নিজে এত অধীর হয়েচে যে তাঁর আর একা থাকতে সাহস হচ্চে না। হয় আমাকে কলকাতায় যেতে হবে, নয় তাঁরা সোদপুরে আসবেন। যদি সোদপুরে আসেন ত লীলার জন্য উপরের ঘরটার বন্দোবস্ত করতে হবে।

মিনিকে সব কথা বললাম; মনে হাসি এল। এমন কি গোপনীয় কথা যা মিনিকে লেখা যায় না! বোঝা শক্ত, ভাব-গতিক।

মিনি বল্লে, "আপনার এ অবস্থায় কলকাতা যাওয়া হতেই পারে না। লীলাই এখানে আসুক—আমাদের ডাক্তারের ভাবনা যখন নেই, তখন আর ভয় কি! যাঁরা সেখানে দেখ্‌চেন—এবেলা ওবেলা করে এখানেই দেখে যাবেন। আর অসুখ নিতান্ত মারাত্মক নয়—এটা নিশ্চয়।"

"তবে আমার জবানি—তুমি তাদের কাল আসতে লিখে দাও।"

মিনি তখনি বসে চিঠিটা লিখে দিলে—আমিও শেষে দু-কলম লিখে দিলাম।

তার পরদিন মিনি উপরের ঘরটা ঝাড়-পোঁছ করাতে খুব ব্যস্ত রইল। সন্ধ্যা-নাগাদ লীলারা এল।

লীলা আমাকে দেখে খুব কাঁদতে লাগল।

আমি তার মুখে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লাম, "ছি মা, এমন উতলা হলে কি চলে? অসুখ হলে সহ্য করতে হয়—দু-চার দিন পরে সেরে উঠ্‌বে।"

সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে, "বাবা, আমি আর বাঁচব না।"

"পাগল মেয়ে! কি হয়েচে তোমার যে তুমি এমন করচ!" সে মুখে কাপড় দিয়ে কাঁদতেই লাগ্‌ল।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার বোস্ এসে দেখে গেলেন—কোন ভয় নেই।

খাওয়া-দাওয়ার কিছু আগেই স্ত্রী আমার ঘরে এলেন। দেখ্‌লাম, তাঁর উগ্র-চণ্ডী মূর্ত্তিটা কতটা নরম গেছে। মনে মনে একটু খুসী হলাম। এই ক'দিনের বিচ্ছেদ তাঁকে কি চমৎকার বদলে দিয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের একান্ত সান্নিধ্য যে দাম্পত্য সুখের বিরোধী তা' ইতিপূর্ব্বে লোকের মুখে শুনলেও তেমন বিশ্বাস করতুম না; কিন্তু এখন মনে হলো যে কথাটা খুবই সত্য।

দেখ্‌লাম, লীলার জন্য তিনি অতিরিক্ত চিন্তিত। তিনি বলেন,"লীলার অসুখের কারণ, মোহিতের কঠোর ব্যবহার। সে এ-পর্য্যন্ত একটা চিঠি-পত্র দেয়নি। চিঠি দিলে তার উত্তর দেওয়াটা যে প্রয়োজন তাও সে মনে করে না। সে যেমন ব্যবহার করচে, তাতে তার খোঁজ-খবর না নেওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু মেয়ে যে আমাদের।"

এই কথা শুনলেই ধাঁ করে আমার মাথাটা কেমন গরম হয়ে ওঠে। মেয়ে আমাদের, তাতে অপরাধটা কি? সে কিছু এমন কোন উৎপাত আরম্ভ করেনি, যার জন্য তুমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠ! আর তেমন যদি কিছু ঘটে থাকে, তার জন্যে দায়ী তার চেয়ে তুমি বেশী নও কি?

অনেক দিনের পর দেখা, আমার রাগটাও কম হলো, আর তা প্রকাশও করলাম না। শুধু বল্লাম, "আমাকে কি করতে হবে, তা প্রকাশ করে বল। আমি নিজে ত দুনিয়ার সব কাজের বার হয়েছি। এই দেহ আর মন নিয়ে আমি কি যে করে উঠতে পারব, জানিনে। তবুও বল, কি করতে হবে?"

"কেন, তুমি নিজে না পেরে উঠ্‌লে তোমার এত চেনা-শোনা, এত বন্ধু-বান্ধব—ইচ্ছা করলে তুমি কি না পার?"

এমন কথা শুনে বোধ হয় ভীষ্মদেবও খুসী হতেন। আমার অজ্ঞাতসারে হাসিটা বেরিয়ে পড়ল,—বল্লাম, "বেশ, তুমি তার সব ঠিক-ঠিকানা ঐ প্যাডটার উপর লিখে রাখ। দেখ, কালই আমি পাত্তা বার করবার কি চেষ্টা করি!"

দেওয়ালের উপর টিক্‌টিকিটা ঠিক এই সময়ে তিনবার শব্দ করলে—তার সঙ্গে আমার স্ত্রী বল্লেন, সত্যি! সত্যি! সত্যি! আহা, তাই হোক্!

খাবারের ডাক পড়ল।

কত রাত—ঠিক আন্দাজ করতে পারিনে, আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, পারুলের চাপা গলার ডাকে। অসম্ভব রকম ভয় পেলে যখন মানুষের বাক্‌রোধ হয়ে আস্‌তে থাকে,—এ যেন ঠিক্ তেমনি গলা!

"একবার শীগ্‌গির উপরে চল।"

"কেন, কি হয়েছে?"

"আমি কিছু বুঝতে পারচিনে। ওগো কি আমি বলব তোমাকে—তোমার পায়ে পড়ি, লীলাকে তুমি বাঁচাও—" তুবড়ীর মুখে আগুন দিলে যেমন দেরী সয় না—এও যেন তেমনি তাড়াতাড়ি,—অনর্গল বকে যাওয়া।

উপরে উঠে গিয়ে যা দেখ্‌লাম, তাতে চক্ষু স্থির হয়ে গেল। ভীষণ রক্ত-গঙ্গার মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় লীলা পড়ে আছে—মনে হয়, যেন সে আর বেঁচে নেই!

"ইস্, সর্ব্বনাশ! কত দিন এমন হয়েচে? কৈ, আমি ত কিছু জান্‌তে পারিনি।"

পারুল ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি অস্থির হয়ে ঘরের এক দিক থেকে অন্যদিক পর্য্যন্ত পায়চারি করতে লাগ্‌লাম।

হঠাৎ পারুল আমার পা জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, "তুমি ওষুধ দিয়ে রক্ষা কর, নইলে মেয়েটা আমার আর বাঁচবে না।"

আমার কোন ওষুধের কথাই মনে এল না। বল্‌লাম, "ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠাও—কাকে দেখাচ্ছিলে?"

"বোসকে।"

"রাত্তিরে গাড়ী নেই?—তাইত। আমার হাত-ব্যাগটা কোথায়?"

পারুল তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে সেটা নিয়ে এল। ব্যাগটা খুল্‌তে প্রথমেই নজর পড়ল রিভল্‌ভারটার উপর। সেটা ভরাই থাকে। মনে হলো, সেটা নিজের বুকের উপর বসিয়ে দিয়ে সব লজ্জা শেষ করে ফেলি, কিন্তু তখনি সর্ব্বাঙ্গ রাগের আগুনে প্রজ্বলিত হয়ে উঠ্‌ল। আগে বদমায়েসের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করি,—তার পর নিজের লজ্জা-নিবারণ!

ইন্‌জেক্‌সনের পিচ্‌কিরিটা দিয়ে বার দুত্তিন আর্গট দিয়ে-দিয়ে—ব্যাগটা হাতে করে নীচে নেমে গেলাম। যাবার সময় বলে গেলাম, "ভয় নেই—এতেই কাজ হবে।"

নীচে টেবিলের পাশে চেয়ারের উপর বসে পড়ে ভাববার চেষ্টা কর্‌লাম।...অসম্ভব! মনটা ঠিক গরম জলের মতই টগ্‌বগ্ করে ফুটচে!

ল্যাম্পটা চিমে জ্বল্‌ছিল। মনে হলো, তেমন আলোতে কোন জিনিষের খেই পাওয়া যায় না; সেটাকে বেশ করে তুলে দিলাম। দিতেই প্যাডের উপর পারুলের নীল পেন্‌সিলে বড় বড় করে লেখা দেখতে পেলাম; মোতিমোহন রায়, জমিদার;—পুর। এক মুহূর্ত্তে [illegible] গেলাম, আমার বয়স আর শরীরের অবস্থা। আমার দেহের সমস্ত অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত তীব্র চীৎকার করে যেন বলে উঠ্‌ল—অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে।

ব্যাগ থেকে রিভল্‌ভারটা বার করে নিজের পকেটে রাখলাম; তখন আর নিজেকে ধরে রাখ্‌তে পারচিনে; গায়ে শত হস্তীর বল, পায়ে হরিণের ক্ষিপ্রতা! একখানা কাগজের উপর লিখে দিলাম:—

"মিনি,

পাপের প্রতিবিধান একান্ত দরকার। সেই উদ্দেশ্যে বার হচ্ছি। হয়ত এ জীবনে আর দেখা হবে না। ইতি

তোমার কাকা।"

জানিনে কখন্ বাড়ী থেকে বার হয়ে কি করে পথটা অতিক্রম করে ষ্টেশনে এসে পড়েচি! গাড়ী আস্‌তেই তাতে চড়ে বস্‌লাম। তত সকালে গাড়ীতে বিশেষ

লোক-জন নেই—আমার কামরাটা একেবারে খালি। গাড়ীখানা ছুটচে, আর তার ভিতর ক্ষুধার্ত্ত পশুরাজের মত আমি হাস্-টান করচি, শোণিত-পিপাসায় আমার কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠচে! ঠিক যেন খুন চড়ে গেছে!

সমস্ত দিন মানসিক উত্তেজনা আর অনাহারের পর যখন গাড়ী—পুরে থাম্‌ল, তখন দেহটা যেন অবসন্ন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তে চায়! তখন সন্ধ্যা হয়ে আস্‌চে।

ষ্টেশন থেকে বার হয়ে পথের উপর দাঁড়িয়ে দেখলাম, সন্ধ্যার ধূসর আকাশকে মলিন করে, রাশি রাশি ধূলো উড়িয়ে দলে-দলে গরু-বাছুর মাঠ থেকে বাড়ী ফিরচে। পথে আর বিশেষ লোক-জন নেই।

রাখাল ছেলেদের মধ্যে একজনকে ডেকে বল্লাম, "ওরে জমিদার বাবুদের বাড়ী কতদূর?"

সে বল্লে, "মালতীপুর যাবেন—সে যে অনেকদূর! গাড়ী না হলে যাবেন কেমন করে?"

"গাড়ী পাবো কোত্থেকে?"

"কেন, জমিদার বাবুদের খবর দিন।"

"তুই যাবি?"

"না।" বলে সে ছুটে পালিয়ে গেল।

নিজেকে এমন অসহায় জীবনে আর কখনো বোধ করি নি। কি করি, কোথায় যাই! একটা গাছ-তলায় একখানা কাঠ পড়েছিল, তার উপর বসে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম।

এ কি পাগ্‌লামি আমার! কার অপরাধ! কে কাকে শাস্তি দেবে! এই পঙ্কিলতার মধ্যে অযথা নিজেকে টেনে এনেছি কেন? ছি ছি মানুষের অহঙ্কার কি পাগলই করে মানুষকে!

ক্রমেই অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। অবসন্নতার অত্যন্ত গুরুভারে শরীরটাও যেন নুয়ে পড়তে চায়। মদের নেশার মত যে উত্তেজনা মনটাকে জুড়ে বসেছিল, সেটা যেন হাল্‌কা হয়ে এসে দেহের সমস্ত বন্ধনকে শিথিল করে দিয়ে গেল। আমি স্পষ্ট অনুভব কর্‌লাম যে একটা বিরাট আকর্ষণে পৃথিবী আমার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে তার নিজের দিকে টান্‌চে। সে টানকে ঠেকিয়ে রাখা আমার সাধ্যের অতীত! সেই ধূলো-মাটির উপর লুটিয়ে পড়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নেই!

শুয়ে শুয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লাম, অদূরে ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীতে তার ছোট কোলের ছেলেটি মার কোলে দিনের অবসানে ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে কান্না নিয়েচে। আমারো বুকের মধ্যে থেকে যেন কান্নার ঢেউগুলো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আমিও জীবনের অবসানে ঠিক তেমনি করেই ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্চি; কেবল যা চাচ্চি, তা পাচ্চিনে বলেই—সমস্ত হৃদয়কে মথিত করে এই নিবিড় কান্নাটা ব্যথার সুরের ভিতর দিয়ে প্রকাশ হতে চায়!

ফোড়া যখন দেহের একটা জায়গায় নিবদ্ধ থাকে, তখনি তার টাটানিটা অসহ্য বলে মনে হয়; কিন্তু সেটা যখন ফাট্‌তে না পেয়ে বিষটাকে সমস্ত দেহের মধ্যে ছাড়িয়ে দিতে থাকে, তখন মৃত্যু আসন্ন হলেও ব্যথার তীব্রতা কমে এসে দেহ-মনকে আচ্ছন্ন

করে দিতে, থাকে—ঠিক তেমনিটি হয় দুশ্চিন্তায়—সে যখন মনের সীমাকে অতিক্রম করে, তখন মনটাও অসাড় হয়ে আস্‌তে থাকে, মহা-সুষুপ্তির অতল তলে ডুবে যেতে তার কিছুমাত্র দেরী হয় না!

সেই অচেনা অজানা দেশে পথের ধুলোর উপর শুয়ে পড়ে আমার চোখ দুটো ঘুমের ঘোরে এমন ভেরে এলো যে আমি নিমেষে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম।

রেলের লাইন-কাটা ঘণ্টার কর্কশ আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুয়ে শুয়ে শুনলাম, দশটা বাজা; কিন্তু গজাল শুনে বুঝলাম, দুপুর রাত, বারোটা বাজল। উঠে বসে দেখ্‌লাম, বাতিগুলো জ্বেলে দেওয়া হয়েচে। হঠাৎ এত রাত্রে এ কিসের সমারোহ সুরু করে দিলে এরা আবার! আমার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। ঠিক যেন মনে হলো, বর আস্‌বার আগে পথের বাঁধা আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে কার প্রতীক্ষায় জন-কয়েক এদিক-ওদিক ছুটো-ছুটি হাঁকা-হাঁকি করচে!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা ট্রেন এসে পড়ল। এমন করে নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে থাক্‌তে বিরক্তি হলো। উঠে পড়ে গাড়ীখানা ধরবার জন্যে চল্‌তে গিয়ে দেখি যে পা যেন চল্‌তে চায় না। মাতালের মত উঠি-পড়ি করে গিয়ে ষ্টেশনের গেটের কাছে পৌছুলাম। এসে চোখে আর কিছু দেখ্‌তে পাই না! মনে হলো, হয়ত বা ঘুরে পড়েই যাব!

যে জানে যে সে কতখানি অসহায়, সে কতখানি বেশী সতর্ক! আমার পক্ষে এতখানি বোধ-বিবেচনা স্বাভাবিক নয়; কিন্তু আজ আমি জান্‌তুম যে আমি নিতান্ত একলা; তাই সতর্কতা এমনি করে আপনি এসে জুটলো।

কতকগুলো কুলির সঙ্গে একটা মস্ত ওভার-কোট-পরা মেম সাহেব আস্‌চেন দেখে ত্রস্তে একপাশে সরে গেলাম। মেম সায়েব আমার দিকে ফিরে বিস্ময়ের সঙ্গে চীৎকার করে বল্লে, "কাকা!—আপনি!"

যে জলে ডুবে মরে, তলিয়ে যাবার আগে, তার কাণে যেমন তীরের লোকের বিলাপ-ধ্বনি অস্পষ্ট-অস্ফুট ধ্বনিতে কাণে এসে পৌছোয়—আমার কাণেও এই দুটি শব্দ এসে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞানটা কোথায় যেন তলিয়ে চলে গেল।

চোখ চেয়ে দেখ্‌লাম,—সেই আমার পরিচিত ঘর—সেই পুরোনো কোঁচের উপর শুয়ে আছি! সাম্‌নে তেপায়ার উপর থরে থরে ওষুধের শিশি সাজান রয়েচে। পারুল পায়ের কাছে বসে। তার মুখ-খানা কৌটোয়-ভরা তুলোয় মোড়া চোপ্‌সা আঙুরের মত।

আমাকে চাইতে দেখে পারুল সরে এসে বল্লে, "আজ ভাল আছ?"

আমি স্থির চক্ষে তার কপালের উপর যে একগোছা চুল ঝুলেছিল, তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লাম!

বল্লাম, "মিনি—?"

"ও-ঘরে ঘুমুচ্চে।"

"কেন?"

"রাত জেগেছিল। ডাক্‌ব?"

তাকে একবার ভারী দেখবার ইচ্ছে

ছিল; কিন্তু মুখ থেকে কেমন বেরিয়ে পড়ল—"না।"

"লীলা সেরেচে।"

"কি হয়েছিল তার?"

পারুলের মুখখানি হঠাৎ লাল হয়ে উঠল!

"তাকে মার্জ্জনা কর।"

এক মুহূর্ত্তে সে দিনের সব কথা বিদ্যুতের আলোর মত মনের একদিক থেকে অন্যদিক পর্য্যন্ত চমকে গেল।

"অসম্ভব—"বলে পাশ ফিরে শুয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ পরে চোখ চেয়ে দাঁড়া-আশিতে দেখলাম, আমার স্ত্রীর চোখ দিয়ে ধারা বয়ে যাচ্চে।

"তুমি কি মিনিকে ক্ষমা করতে পেরেচ?"

পারুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

তখন একটা হাত তার গায়ের উপর রেখে বললাম, "ক্ষমা আমাদের করতেই হবে যে পারুল। যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনকে মন্থন করে উঠচে, তার শক্তি ত ক্ষুদ্র নয়; তাকে ঠেকানো কি ঐ শিশুদের কাজ? আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে কোন্ ছেলেটি না হাত পুড়িয়ে ফেলে? চোখের কাছে দোষটাকে তুলে ধরে মানুষকে আড়াল করলে লাভ কি? দোষ বড় নয়, মানুষ বড়।"

পারুল আমার পানে চেয়ে চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল—পলক-হীন দৃষ্টি! আমি বললাম, "ডাকো মিনিকে, ডাকো লীলাকে।"

তারা ঘরে আসতে তাদের পাশা-পাশি বসিয়ে বললাম, "দেখ ত পারুল, দুটিকেই কেমন নতুন ফোটা ফুলের মত পবিত্র-সুন্দর দেখাচ্চে। জগতের কোন পঙ্কিলতা ওদের মলিন করতে পারেনি।...মানুষ মানুষের বিচারই করতে পারে না—ক্ষমা করবে কি?

পারুল কাঁদতে লাগলো, মিনি কাঁদতে লাগলো, লীলা কাঁদতে লাগলো। এই তো সেই কান্না,—যাতে সমস্ত চিত্ত ধুয়ে নির্ম্মল নিষ্কলুষ হয়!

আমার মনের উপর থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গিয়ে যেন আমাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে দিলে।

তার পর অনেককেই বলতে শুনেচি—বুড়ো দিন্ দিন্ ছোঁড়া হয়ে যাচ্চে!

কি বদলানই বদলে গেলাম!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

অর্থ-বিজ্ঞান

প্রকৃত খাজানা

(১) শস্যক্ষেত্র

বাস্তব জীবনে পূর্ব্বোক্ত ঊর্দ্ধ সীমায় যাইয়া জমা ধার্য্য হওয়া সম্ভব নহে। এই সীমা নির্দ্দেশ করিবার সময় মূলধন ও জন-বলের অভাব নাই এমনি কল্পনা করিতে হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদেশেই তাহাদের উপরের কিম্বা অন্যতমের অভাব নিয়তই অনুভূত হইয়া থাকে। তাহাদের কোন অঙ্গের অভাব হইলে, ভূমির
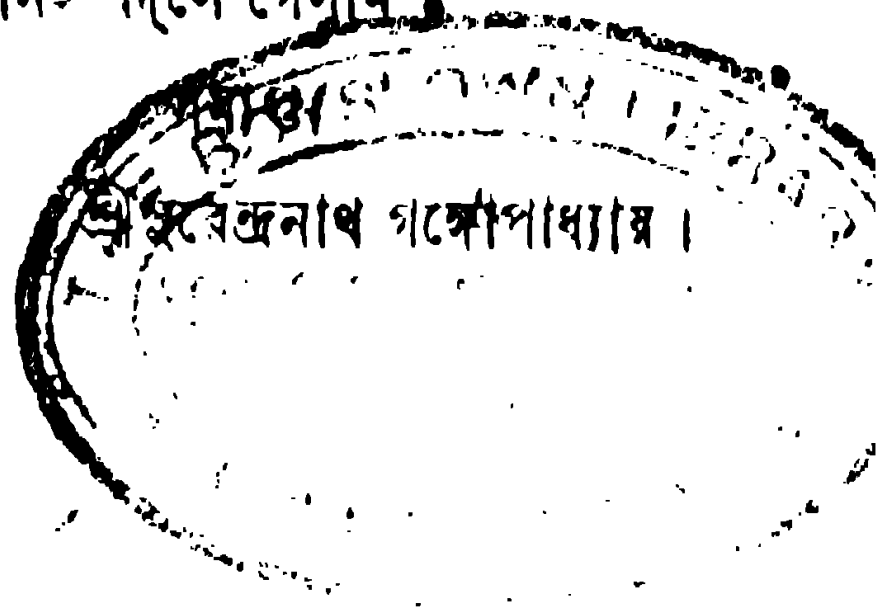
উৎপাদিকা শক্তির সীমা পর্য্যন্ত ধন ও জন নিয়োগ করিয়া ক্ষেত্র হইতে যতটা শস্য উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা করিয়া উঠা যায় না। এ দেশের ন্যায় যে-সব দেশে মূলধনের অত্যন্ত অভাব, সেই সব দেশে ভূমির অতীনোৎপাদিকা শক্তি-সীমা পর্য্যন্ত চাষ-আবাদ করা চলে না।

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে প্রায় ২৫ কোটি একর্ (acre) আবাদী ভূমি আছে। তন্মধ্যে চার কোটি একর গোগ্রাস জন্য পতিত অবস্থায় আছে; বাকি ২১ কোটি একর ভূমিতে বিভিন্ন শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যে আদম্ সুমারী হয়, তাহাতে দেখা যায় যে আট কোটি লোক একমাত্র কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রতিজনে ২০৬ একর্ ভূমির সর্ব্বপ্রকার উৎপাদনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের কৃষকগণ প্রত্যেক ১৭৩ একর ও জর্ম্মাণীর কৃষকগণ প্রত্যেক ৫'৪ একর ভূমিতে চাষ-আবাদ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে কৃষিজাত শস্যের মধ্যে যব ও গম সাধারণ। সেখানে প্রতি একর গম ও যব যথাক্রমে ১৯১৯ ও ১৬৪৫ পর্য্যন্ত এবং ভারতবর্ষে তাহাই যথাক্রমে ৮১৪ ও ৮৭৭ পাউণ্ড করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ উৎপত্তি-বৈষম্যের কারণ এই যে, তথাকার কৃষক স্বাস্থ্যে, বলে এবং শিক্ষা-দীক্ষায় এ দেশের কৃষকগণ হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তথায় চাষের পশুগুলিও বলশালী ও কর্ম্মক্ষম। সর্ব্বোপরি সে দেশের লোক এই কৃষি-কার্য্যে বহু মূলধন নিয়োগ করিয়া বাষ্পীয় ও মোটর যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকর্ষণ, শস্য-কর্ত্তন ও আহরণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সুতরাং এ দেশের কৃষকদিগের প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্নের ফলে যতটা উপস্বত্বের অভ্যুদয় ঘটে, তথায় তদপেক্ষা অনেক বেশী লাভ পাওয়া যায়। তাই সে দেশের ভূমির জন্য যত খাজানা দেওয়া যায়, এ দেশের পক্ষে ততটা দেওয়া সম্ভব হয় না।

আমাদের এই বঙ্গদেশে প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের বিধান-অনুযায়ী সেটেল্‌মেণ্ট সময়ে জমিদারদিগের পক্ষে খাদ্য-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় জমা-বৃদ্ধির জন্য হাজার হাজার আবেদন পত্র উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যে প্রকৃত জমা-বৃদ্ধি নহে, সে বোধ সকলের আছে কি না জানি না। ফলতঃ যোত-সৃষ্টির সময়ে খাদ্য শস্যের যে মূল্য ছিল, তাহার বৃদ্ধি হইলে, যে জমা বৃদ্ধি দেওয়া হয়, তদ্দ্বারা পূর্ব্ব মূল্যের সহিত বর্ত্তমান মূল্যের সমতা মাত্র সম্পাদিত হইয়া থাকে—প্রজার প্রকৃত দেয় জমার এক পয়সাও বাড়ে না। টাকার মূল্য হ্রাস হওয়ার ফলে মালিকানের যে ক্ষতি হইতেছিল, তাহাই মাত্র নিবারিত করিয়া পূর্ব্বাবস্থার সহিত এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সমতুল্য বিধান করা হইয়া থাকে। প্রকৃত জমা বাড়াইতে হইলে প্রজার জমা দেওয়ার সামর্থ্য যাহাতে বাড়ে, তাহার আনুকূল্য করিতে হয়। অর্থ ব্যয় করিয়া যোতগুলির উন্নতি-সাধন কিম্বা প্রচুর মূলধনে ব্যয় করিয়া উন্নত যন্ত্রাদির ব্যবহারে ভূমিতে গভীরভাবে চাষ ও সার প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া বৰ্দ্ধিত হারে শস্যোৎপাদন করায় ক্ষমতা কৃষকদিগের নাই। অর্থ দিয়া তাহাদিগকে

সাহায্য করিলে অথবা মালিক স্বয়ং পয়ঃ-প্রণালী ইত্যাদি কাটিয়া যোতের উন্নতি বিধান করিয়া দিতে পারিলেই কেবল তাহাদের বর্দ্ধিত হারে খাজানা দেওয়ায় সামর্থ্য জন্মিবে; তখন অনায়াসে তাঁহারাও বেশী জমা পাইতে পারিবেন। বর্ত্তমানে কৃষকগণ তাহাদের সামান্য অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধবলে মোটামুটিভাবে ভূমি, ধন ও জনের উৎপাদিকা শক্তির অঙ্গীনোপযোগিতার সমীকরণ করিয়া যতটা সম্ভব শস্য উৎপন্ন করিয়া আসিতেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ একই ভাবে এবং একই নিয়মে এই কৃষিকার্য্য পরিচালন করার ফলে, খাজানার হার প্রায়তঃ স্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। জমার বেলায় "প্রথা" বলিতে আর কিছুই বুঝায় না, উৎপাদনের তিন সাধনাঙ্গের মধ্যে একটা স্থায়ী সম্বন্ধ-স্থাপনের ফলে, প্রজার জমা দেওয়া সামর্থ্যেরও একটা জড়তা সম্পাদিত হইয়াছে, ইহা মাত্র জ্ঞাপন করে। সজীব সমাজে এই সকল ব্যাপারে "প্রথা" নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। দুই চারি মুষ্টি ভাল বীজ, দুই-চার-দশ ঝুড়ি ভাল সার, এক আধখানা শ্রমলাঘব যন্ত্র আনিয়া তাহাদের হাতে ফেলিয়া দিতে পারিলেই তাহাদের এই জড়গতি ভঙ্গ হইয়া উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে। তখন এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত নূতন করিয়া বিভিন্ন সাধনাঙ্গের শেষ-যোগ্যতার সমীকরণ করার প্রয়োজন উপস্থিত হইবে এবং তাহার ফলে তাহাদেরও আত্ম-চৈতন্যের সঞ্চার হইবে। পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলার নামই উন্নতি।

বর্ত্তমানে কোন নূতন জমি পত্তন লইতে হইলে, যদি কোন কৃষক তাহার সমশ্রেণীর অপর কৃষক কিম্বা দেশের প্রচলিত হারের খাজানা অপেক্ষা কিছু বেশী দিতে প্রস্তুত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার ইহা লইবার পক্ষে একটা বিশেষ কোন প্রলোভন আছে। এমনও হইতে পারে যে সে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া কিছু লাভ করিতে পারিবে, এরূপ কোন একটা ধারণা হইতেও ঐ বেশী জমা দিতে স্বীকৃত হইতে পারে। যে ভাবেই হউক, এইরূপ কেহ বেশী জমা দিতে স্বীকৃত হইলে, তখন উপস্বত্ব ও জমা এক কি না, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তথাপি যদি এই চুক্তীকৃত জমা অপেক্ষা উপস্বত্ব কিছু বেশী হয়, তবে কৃষকের কিছু লাভ থাকিয়া যাইবে; কিন্তু কম হইলে তাহাকে ক্ষতি বহন করিতে হইবে। তখন এই ক্ষতি হয় তাহার বেতন হইতে,—নতুবা মূলধন নষ্ট করিয়া সে-ক্ষতি বহন করিতে হইবে। তাহার ফলে, ভূমি হইতে যতটা শস্য উৎপন্ন হইতে পারিত, ক্রমে তাহার পরিমাণ হ্রাস হইয়া উত্তরোত্তর কৃষকের ক্ষতি-বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সুতরাং এই উপস্বত্বের বাহিরে খাজানা দেওয়া যাইতে পারে না। অপ্রণিধানতা প্রযুক্ত কোন প্রজা সেরূপ চুক্তি করিলে সে স্বয়ং আর্থিক ক্ষতি বহন করে, এবং সমাজও উপযুক্ত ফসল-লাভে বঞ্চিত হয়।

তবে অবস্থা-বিশেষে ভূমির প্রকৃত খাজানা অপেক্ষা তাহার পরিমাণ যে বেশী না হইতে পারে এমন নহে। কোন কৃষক নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য যোত-পত্তন লইয়া তাহার উন্নতি-কল্পে মূলধন নিক্ষেপ করিলে

এই সময়ের মধ্যে যোতের এই পরিবর্ত্তিত সুবিধা-সুযোগ হইতে সমগ্র মূলধন উঠিয়া না আসিতেও পারে। ভূমির কোন কোন উন্নতি এমনও আছে যে, তদ্দ্বারা মূলধন উঠাইয়া আনিতে অতি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। এইরূপ কোন উন্নতি বিধান জন্য মূলধন নিয়োগ করিয়া, ইহার সম্যক্ উঠিয়া আসার পূর্ব্বে যোত ছাড়িয়া দিতে হইলে, কৃষকের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। সেই ক্ষতি-নিবারণ জন্য কৃষক কিছু বেশী খাজানা স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় যোতের জন্য পত্তন লইতে পারে।

তেমন কোন প্রজাকে তাহার পুরুষানুগত যোত পরিত্যাগ করার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, কিছু বেশী জমা দিতে স্বীকার করিয়া যোতরক্ষা করার চেষ্টা অস্বাভাবিক নহে। এইরূপ যোতে প্রজার একটা মমত্ববুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। মানব-চিত্তের ভাব-প্রবণতা একান্ত উপেক্ষার বস্তু নহে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রজা যেমন কিছু বেশী জমা দিতে স্বীকৃত হইতে পারে, তেমনি পুরুষানুক্রমে যে প্রজার সহিত একটা ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক হইয়াছে, তেমন প্রজাকে উচ্ছেদ বা পীড়ন করা অপেক্ষা ভূম্যধিকারীও কিছু জমা ছাড়িয়া দিতে পারেন। কেবল আর্থিক সম্বন্ধের উপর সর্ব্বত্র খাজানা ধার্য্য হয় না; অন্যান্য সম্বন্ধও সময়ে সময়ে গভীরভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। তবে সকল অবস্থাতেই এই সম্ভাবিত উপস্বত্ব তাহার মূল ভিত্তি। ইহাকেই আদর্শ ধরিয়া প্রজার জমা দেওয়ার ক্ষমতা, অক্ষমতা, কিম্বা তাহার হারের কমবেশীর বিষয় বিবেচনা করিতে হয়।

এ-পর্য্যন্ত আমরা সমশ্রেণীর কৃষকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু বাস্তব জীবনে সম-গুণ-বিশিষ্ট লোক দ্বারা এই কৃষিকার্য্য সম্যক্ নির্ব্বাহ হয় না। কোন কোন কৃষিকার্য্য এমনও আছে যে, সুচারুরূপে তাহা নির্ব্বাহ করিতে হইলে বিশেষ অভিজ্ঞ ও যথারীতি শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকের আবশ্যক হয়। যে কার্য্যে সুদক্ষ পটু লোকের নিয়োগের প্রয়োজন হয়, অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে সে কার্য্য করিয়া যথোপযুক্ত শস্যলাভ করা সম্ভব নহে। সুতরাং তাহারা যে জমা দিতে পারিবে, কর্ম্ম-কুশল লোক তদপেক্ষা যে বেশী জমা দিতে পারিবে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

পক্ষান্তরে ভূমির একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে। সকল ভূমিতে সকল রকম শস্য উৎপন্ন হয় না। ভূমির প্রকৃতি-অনুসারে শস্য নির্ব্বাচন করিয়া বপন করিতে হয়। তাহা না করিতে পারিলে সুফল লাভ হয় না। তেমন কোন শস্য-বিশেষ উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া তাহা বিনষ্ট করা আবশ্যক। কৃষকের এই সকল নির্ব্বাচনের উপরে এক দিকে ফসল ও অন্য দিকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি দেওয়ার সামর্থ্য লাভ হয়।

এই সকল বিভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, যদি ভূম্যধিকারীর কোন ভূমি পত্তন করার অনভিপ্রায় কিম্বা প্রতিবন্ধক না থাকে এবং তিনি তাহা পত্তন করিতে সচেষ্ট হন; এবং গ্রাহকদিগের মধ্যেও সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান থাকে, তবে ভূমি

হইতে তাহার বিভিন্ন ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক পন্থার অনুসরণ করিলে, যে-পরিমাণ উপস্বত্বের অভ্যুদয় ঘটিতে পারে, তাহার সমানে সমানে ভূমির খাজানা ধার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহাই খাজানা-ধার্য্যের স্বাভাবিক গতি। ইহাকেই তাহার স্বাভাবিক বা সাধারণ নিয়ম বলা হয়। সামাজিক বহু জটিল সম্বন্ধের ফলে, তাহার পরিমাণের কিছু ইতর-বিশেষ হইলেও, মূল তত্ত্বের কোন বিপর্য্যয় ঘটে না ও ঘটিতে পারে না। সর্ব্বাবস্থাতেই ভূমির গুণ-বৈষম্য বা বিশিষ্টতার জন্য যে উপস্বত্বের অভ্যুদয় হয়, তাহার সমানে সমানে খাজানা-ধার্য্যের একটা স্থির গতির উদ্ভব হয় এবং এই উপস্বত্ব হইতেই খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং খাজানা ভূমির এই বিশিষ্টতার মূল্য বলিয়া পরিকল্পিত হয়।

কৃষি-ভূমির খাজানাকে তাহার বিশিষ্টতার মূল্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ভূমির জন্য কোন যোগান মূল্য (supply price) নাই। ভূমির খাজানা তাহার প্রয়োজন-মূল্যের (demand price) উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। কোন ভূমির জন্য মালিক কম কিম্বা বেশী জমা চাহিতেছেন, তাহার উপরে তাহার আবাদ-পত্তন নির্ভর করে না। খাজানা পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী ভাবে ভূমি মিনাহ দিলেও সেই ভূমি হইতে ব্যয় পোষাইয়া শস্যোৎপন্ন করা সম্ভব না হইলে, ইহা কখনো আবাদে আসিবে না। আমেরিকা প্রভৃতি নূতন অধ্যুষিত দেশে দেখা যায় যে বর্ত্তমানে যে-সকল ভূমি হইতে লভ্য সহকারে ব্যয় পোষাইয়া ফসল করা সম্ভব নহে, ভবিষ্যতে তাহা হইতে লভ্য পাওয়া যাইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ধনীরা তাহাতে চাষ-আবাদ করিয়া কিম্বা অন্যভাবে অর্থব্যয় করিয়া একটা ব্যক্তিগত অধিকার পরিচালন করিয়া থাকেন। যদি কেহ বর্ত্তমান চাষের অযোগ্য কোন ভূমি পত্তন গ্রহণ করেন, তবে বুঝিতে হয়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবিত আয়ের প্রত্যাশায় এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু তদ্বারা সেই ভূমি আবাদের যোগ্য কিম্বা খাজানা পাওয়ার যোগ্য এরূপ প্রতিপন্ন হয় না। ভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। পণ্য সামগ্রীর ন্যায় তাহার যোগান মূল্যের উপরে তাহার টান-যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। জমা কম কি বেশী তদ্বারা তাহার চাহিবার কোন ইতর-বিশেষ হয় না। সমাজ তাহার আত্ম প্রয়োজনেই কেবল অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ভূমি আবাদ কিম্বা গভীরভাবে চাষ করিতে বাধ্য হয় বলিয়াই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভূমির জন্য কৃষকের লভ্য বা উপস্বত্বের অভ্যুদয় ঘটে এবং তাহা হইতেই খাজানা দেওয়ার ক্ষমতা জন্মে।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় তাঁহার "ধন-বিজ্ঞান" গ্রন্থে কোন-এক স্থানের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, "উক্ত স্থানের নিকট প্রায় দশ বার হাজার বিঘা জমি পতিত রহিয়াছে। তাহার কারণ অনুসন্ধান করাতে তিনি বলিলেন, 'দুই তিন টাকা নিরিখের কম কেহ উহা ব্যবহার করিতে দিবে না'।"*

* ধন-বিজ্ঞান ৮৭ পৃঃ

কিন্তু মালিকদিগের জানা কর্ত্তব্য যে খাজানার নিরিখের উপরে ভূমির আবাদ-পত্তন নির্ভর করে না। লভ্যের সহিত অথবা একান্তপক্ষে খরচা মাত্র পোষাইয়া কৃষক তাহা হইতে ফসল উৎপন্ন করিতে পারিবে কি না, তাহার উপরই কেবল তাহার চাষ-আবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। পক্ষান্তরে "পতিত জমির উপর সরকার হইতে কর ধার্য্য না হইলে আর জমিদারগণের চৈতন্য হইবে না" বলিয়া গিরীন্দ্রবাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন নহে। দেশে অন্নের অভাব হইয়াছে ইহা খুব ঠিক কথা, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান শস্যের মূল্যে ব্যয় পোষাইয়া এই সকল জমি আবাদ করা সম্ভব কি না, তাহার কোন পরীক্ষা হইয়াছে কি? ফলতঃ এই সকল ভূমি আবাদে আনিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই তাহা সহসা আবাদে আসিয়া পড়িবে, তৎপূর্ব্বে কোন চেষ্টাই ফলবতী হইবে না। তখনও জমির হার তাহাদের বিশিষ্টতার উপর নির্ভর করিবে, এক টাকা কিম্বা পাঁচ টাকা বলিয়া মালিক গট হইয়া বসিয়া থাকিলেই সেই জমা পাওয়া যাইবে না। ফলতঃ যে স্থানে "সমস্ত জমিই বহু পূর্ব্ব হইতে প্রজাদিগকে অতি অল্প হারে মৌরষ দেওয়া হইয়াছে" সেই স্থানে বহু ভূমি পতিত থাকা বিস্ময়কর নহে। বর্ত্তমানে এই সকল জমির অবস্থা কি জানি না। অবস্থা যাহাই হউক, শস্যের টান যোগানের উপরে তাহার বাজার-দর ধার্য্য হয় এবং প্রচলিত বাজার-দরে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া তাহার উৎপাদন-ব্যয় সম্যক উঠিয়া আসিবে কিনা, তাহার উপরে মুখ্যভাবে জমির চাষ-আবাদ নির্ভর করে; খাজানা অল্প কি বেশী তাহার উপর নির্ভর করে না। তেমন জমা কমি-বেশীর উপরে ভূমিতে গভীরভাবে চাষ দেওয়া না দেওয়ারও অপেক্ষা রাখে না। যেমন সমাজের অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজনে পতিত ও অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর জমি আবাদে আসে, তেমনি অন্যদিকে গভীর ভাবে চাষ করিয়া ও নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া বর্দ্ধিত হারে ফসলোৎপন্ন করার চেষ্টা হইয়া থাকে। এই ভাবে ভূমির পরিধি-বিস্তার কিম্বা গভীরভাবে চাষ করার ফলে যে উপস্বত্বের অভ্যুদয় হয়, তাহা হইতে খাজানা দেওয়া না দেওয়ার উপরে কৃষিজাত সামগ্রীর টান-যোগান নির্ভর করে না। এই উপস্বত্বের সমস্তটা প্রজার হাত হইতে টানিয়া আনিয়া মালিকের আয় বৃদ্ধি করিলেও দেশের চাষ-আবাদের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন হইবে না। তেমন মালিকদিগকে বঞ্চিত করিয়া প্রজাকে তাহার সম্যক উপভোগ করিতে দিলেও সে তাহার কৃষিকার্য্যের পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিবে না। তবে প্রজার মূলধনের অভাব থাকিলে এই আয় তাহার থাকিয়া গেলে, সে তাহার যোতের উন্নতি সাধন করিয়া আরো লাভবান হইতে পারে কি না, সেই চেষ্টায় ব্রতী হইতে পারে। কিন্তু তাহার মূলধনের অভাব না থাকিলেই কেবল কৃষিজাত সামগ্রীর টান বৃদ্ধি হইলে, তাহার পক্ষে নূতন ভূমি আবাদে আনা কিম্বা গভীরভাবে চাষ দেওয়া সম্ভব হয়। মূলধনের হিসাবেই কেবল ষোল আনা উপস্বত্ব প্রজার হাতে থাকা না থাকার একটা মূল্য আছে; কিন্তু মূলধনের কথা ছাড়িয়া দিয়া মাত্র খাজানা দেওয়া না দেওয়ার প্রতি

লক্ষ্য করিলে, আমাদের এই খাজানা-তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্যের উপলব্ধি জন্মিবে। আর যোতে প্রজার কোন একটা স্থায়ী অধিকার না থাকিলে, তাহার উন্নতি বিধান জন্য তাহার পক্ষে যদৃচ্ছা ব্যয় করা স্বাভাবিক নহে। আমাদের এ দেশে চাষি জমির উপরে প্রজার দখলের স্বত্ব কল্পিত হওয়ায়, মূলধন পাইলে তাহারা দ্বিধাশূন্য চিত্তে যোতের উন্নতি বিধান করিতে পারে। এ দেশে কৃষি-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত না হওয়ার প্রধান কারণ অর্থাভাব। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে যে-কিছু সামান্য মূলধন আছে, তাহাও নিকৃষ্ট পতিত জমির আবাদেই বিশেষভাবে নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু বর্দ্ধিত হারে ফসল পাওয়ার চেষ্টায় প্রযুক্ত হইতেছে না। আমাদের পূর্ববঙ্গে অনেক নিকৃষ্ট ভূমি চাষে আসিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ টাকার মূল্য-হ্রাস। তাহার সহিত লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধিরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; এতদ্ভিন্ন বহির্বাণিজ্যের টান। প্রধান ভাবে এই তিন কারণে ফসলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্ব আবাদী ভূমির অত্যাবশ্যকীয় উপযোগিতা বৃদ্ধি হওয়ায় নিম্নশ্রেণীর ভূমি আবাদে আসিয়াছে। ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৮২০ লক্ষ একর ভূমি-আবাদ ছিল। ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে তাহা ১৯৫০ লক্ষে এবং ১৯১ খৃষ্টাব্দে ২১০০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। তাহার ফলে উৎকৃষ্ট জমির জন্য কিছু আয় বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই আয়-বৃদ্ধি ভূমির উন্নতি-বিধানের ফলে সম্ভাবিত হয় নাই। বর্দ্ধিত হারে শস্য উৎপন্নের সীমা উত্তরোত্তর দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই মূল্য বৃদ্ধির ফলভোগ করিতে পারিলে, প্রজা উপকৃত হইত; তাহা না হওয়ায় প্রজারা অতি সামান্যই লাভবান হইয়াছে। বর্ত্তমানে টাকার মূল্যাভাবে কৃত্রিম উপসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহার স্বাভাবিক ফলোদয় হইলে, অনেক নিকৃষ্ট জমি চাষ হইতে ঝরিয়া পড়িবে। তবে বর্ত্তমানে যে পরিমিত টাকা প্রচলনে আছে, তাহার একাংশ প্রত্যাহৃত না হইলে, স্বাভাবিক ফলোদ্ভবের সম্ভাবনা খুবই কম।

এই আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে এই বৃদ্ধির সময়ে প্রকৃত খাজানা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে। তাহার ফলে পূর্ব্ব-প্রচলিত নিরিখে কিম্বা তাহার বেশী হারে অনেক পতিত জমির পত্তন হইয়াছে। তবে কত জমি কি নিরিখে পত্তন হইয়াছে, তাহার কোন তালিকা নাই।

(২) বাস্তুভূমির খাজানা

কৃষিভূমির আলোচনায় যে সাধারণ নিয়মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বাস্তু ভূমির খাজানা-ধার্য্যের উপর তাহার কতটা প্রভাব বা উপযোগিতা আছে, এখন তাহাই দেখা যাক। পল্লীবাসের জন্য যে ভূমির আবশ্যক হয়, তাহার সহিত সহর মোকাম ও ব্যবসায়-কেন্দ্রস্থিত ভূমির বিস্তর পার্থক্য আছে; কিন্তু তথাপি তাহাদের তত্ত্বগত বিশেষ কোন বৈষম্য নাই। সুদূরবর্ত্তী ভূমি হইতেও কৃষিজাত সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া আনিয়া উপভোগ করা চলে, কিন্তু বাস্তুভিটা নিয়ত বাসের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মানুষের পক্ষে তাহার বাসভূমির সহিত স্বীয় ব্যবসায়-কেন্দ্রের সহজ সংযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার স্থান নির্ব্বাচন করা খুবই

স্বাভাবিক। যে স্থান হইতে ব্যবসায় পরিচালনা করিতে অযথা শ্রম ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করা সম্ভব নহে। স্থানের জল, বায়ু, আলো-উত্তাপ প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লোকে বাস্তুভিটা নির্ম্মাণ করে। সুতরাং বাস্তু ভূমির চাহিদার উপরে স্থানগত অবস্থিতি সুবিধা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

অস্থায়ী জমায় পল্লীগ্রামের ভিটা ভূমির বিষয়ই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা যাক। ভূম্যধিকারীদিগের কৃতকার্য্যে যে সকল ভূমি বাসের যোগ্য হইয়া উঠে, তাহাকে ভূমির গুণ-বোধক বলিয়াই ধরিতে হইবে। চাষি ভূমির ন্যায় এই সকল ভূমির ও বিভিন্ন ব্যবহারের উপরে তাহাদের খাজানার হার সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তবে এ দেশে পল্লীগ্রামে যে সকল ভূমিতে গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তথায় গৃহকর্ত্তা স্বয়ং বাস করেন। অন্যত্র ভাড়া দিয়া অর্থ-লাভের উদ্দেশ্যে কেহ কখনও এই সকল ভূমির পত্তন গ্রহণ কিম্বা গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন না। সুতরাং এই ব্যবহারের ফলে ভূমি হইতে কতটা লাভ হইতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সকল ভূমির টান কিম্বা খাজানা ধার্য্য হয় না। সাধারণতঃ এই সকল ভূমির সহিত সংযুক্ত এবং শস্যোৎপাদনযোগী যে দুই-এক টুক্‌রা ছাট্‌ বা পালান ভূমি থাকে, তাহার সম্ভাবিত উপস্বত্ব, গৃহাদি তুলিয়াও তরি-তরকারী এবং শাকসব্জী করিবার মত যে একটু স্থান থাকে তাহার এবং দুই-দশটা ফলবান বৃক্ষ থাকিলে কিম্বা করিবার মত স্থান থাকিলে, তাহাদেরও একটা মোটামুটি উপস্বত্ব ধরিয়া খাজানা ধার্য্য হয়। তাহার সহিত স্থানগত অবস্থিতি সুবিধার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়া থাকে। স্থানের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর না হইলে অন্যান্য সুবিধা থাকা সত্বেও ভূমির তেমন টান হয় না। পল্লীবাসের ভূমি কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং তাহার জমা তদপেক্ষা উচ্চ-হারে ধার্য্য হইয়া থাকে। এদেশে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে পল্লীগ্রামের জমা চুক্তি-হারে ধার্য্য আছে। এক সময়ে ভূম্যধিকারীর ডাকে-হাঁকে কাজে-কর্ম্মে সাধারণ গৃহস্থ প্রজাকে পাওয়া যাইত বলিয়া তাহাদের এই সকল কার্য্যের বিনিময়ে মিনাই সূত্রে কিম্বা নামমাত্র জমায় এই সকল ভিটার পত্তন ছিল। বর্ত্তমানে সে পন্থা প্রায়ই পরিত্যক্ত হইয়া ইহা চুক্তি জমায় পরিণত হইয়াছে। তথাপি এই সকল ভূমির মধ্যে যেগুলি কৃষিক্ষেত্র কিম্বা বাস্তুভিটাস্বরূপ যদৃচ্ছা ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই সকল অন্যান্য চাষিজমি হইতে উচ্চ ও উন্নত। ইহাই ভিটা ভূমির মধ্যে ন্যূনোৎপাদিকা শক্তি-সম্পন্ন ভূমি। সুতরাং তাহাদের জমা সম্ভাবিত শস্যের উপস্বত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধার্য্য হইতে পারে। ইহাই তাহার নিম্নসীমার জমা। তাহার তুলনায় যেগুলিতে যে পরিমাণ বিশিষ্টতা আছে, সেই হারে তাহাদের জমা ধার্য্য হইয়া থাকে। এই বর্দ্ধিত জমা তাহাদের বিশিষ্টতার মূল্য। সুতরাং এক্ষেত্রেও সাধারণ নিয়মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সহর-মোকামে অথবা ব্যবসায়-কেন্দ্রে দোকান পাট, হাট, বাজার প্রভৃতি

সংস্থাপন জন্য যে সকল ভূমির প্রয়োজন হয়, তাহাদের পক্ষে অবস্থিতি সুবিধাই বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হইয়া পড়ে। কোন প্রকার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য কলিকাতার ন্যায় ব্যবসায়-কেন্দ্রে প্রকাশ্য রাস্তার উপরে একখণ্ড ভূমির জন্য যে টান, নিভৃত কোন পল্লীর ভিতরে তেমন স্থান থাকিলে, তাহার জন্য সেরূপ টান হওয়া স্বাভাবিক নহে। তথাপি উভয় ক্ষেত্রেই তাহাদের উপরে পাকা-বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া যে সম্ভাবিত লভ্য পাওয়া যাইতে পারে তাহার উপরে খাজানা দেওয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। এই সকল ভূমির উন্নতি-সাধনের জন্য স্থায়ীভাবে যে মূলধন নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা অন্য-ভাবে নিয়োজিত করিলে যে লভ্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তদপেক্ষা এই কার্য্যে প্রয়োগ করিলে বেশী লাভ পাওয়া যাইবে, এরূপ বোধ না করিলে, কাহারও পক্ষে এই উন্নতি বিধান জন্য অর্থব্যয় করা সম্ভব নহে। অর্থের বিভিন্ন ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লোকে এই সকল পাকা বাড়ী নির্ম্মাণে স্থায়ীভাবে অর্থ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। যেমন কৃষি-কার্য্যের বেলায় নূতনাধিকরণ বা পরিবর্ত্তন পদ্ধতির নিয়মানুসারে ভূমির বিভিন্ন ব্যবহার ও শস্যাদির প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তাহাদের বিভিন্নাঙ্গের মণ্ডীনোপযোগিতার সমীকরণ করার ফলে যতটা উপস্বত্বের উদ্ভব হইতে পারে, তাহার উপর প্রজার জমা দেওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করিতেছে, এই সকল ভূমির বেলায়ও সেই নিয়মেরই প্রভাব দৃষ্ট হয়। ইহাদেরও বিভিন্ন ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক অনুষ্ঠানের ফলে, যতটা উপস্বত্বের উদ্ভব হইতে পারে, তাহার উপর গ্রাহকগণের জমা দেওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করিবে। এইরূপ কোন ভূমিতে পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইলে, মূলধনের কোন ক্ষুদ্র ব্যষ্টি মাত্রার হিসাবে পর পর ভাবে নিয়োগ করিতে করিতে, শেষ যে মাত্রায় ব্যয় সম্ভাবিত আয়ের দ্বারা উঠিয়া আসিবে বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই এই উন্নতিকল্পে শেষ মাত্রা এবং এই মাত্রায় উৎপাদিকা শক্তি লভ্যের সমান হইয়াছে। এই মাত্রার উপর ব্যয় করিলে অনুষ্ঠাতাকে ক্ষতি বহন করিতে হইবে। এই অধীন মাত্রার লভ্যে বাড়ীর স্থিতিকাল মধ্যে সমস্ত ব্যয় উঠিয়া আসিবে। তাহার উপর যে আয় হইবে, তাহাই ভূমির উপস্বত্ব; এই উপস্বত্ব হইতে খাজানা দেওয়া যাইতে পারিবে। এই বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য যিনি সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এই দায়িত্বের জন্য তাঁহার কিছু লভ্য পাওয়া আবশ্যক; কিন্তু ভূমির টান বেশী হইলে, তাঁহাকে মূলধনের সুদ মাত্র পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সুতরাং কৃষি-ক্ষেত্রের [illegible] বেলায় যে নিয়ম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এক্ষেত্রেও তাহা প্রযুক্ত হয়; তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্য নাই।

পল্লীবাসের [illegible] বেলায় তাহার উন্নতি-কল্পে যে মূলধন নিয়োজিত হয়, তাহাকে পৃথক্ করিয়া চিন্তা করা হয় নাই; কিন্তু এই সকল পাকাবাড়ী সম্বন্ধে ইহা পৃথক্ করিয়া ধরা হইয়াছে। পাকা বাড়ীর মূলধন ভূমি হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করা যায়, কৃষি-ক্ষেত্রের উন্নতিকে তেমন ভাবে বিশ্লেষণ করা চলে না।

এই পাকাবাড়ীর স্থায়িত্ব-কাল বলিয়া যে সময়ের নির্দ্দেশ করা গেল, তাহার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অবধারণ করা যায় না। তবে ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই সকল বাড়ী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করার আবশ্যক হয়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সামাজিক বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া তাহার ব্যবহারোপযোগিতা নষ্ট ও মূল্য হ্রাস হইয়া পড়িতে পারে। এই মূল্য-হ্রাস-হেতু তাহার বর্ত্তমান খাজানার একটা বিষম দায় মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। তখন এই বাড়ীর সামান্য পরিবর্ত্তন বিধান করিয়া, এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য ও দায় লাঘব করা যায় কিনা, তাহার চেষ্টা চলিবে। এমনও হইতে পারে যে এই পরিবর্দ্ধিত অবস্থার সহিত ঐক্য সাধন করিতে হইলে, এই দালানটা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। এই সকল নানা কারণে বাস্তুভূমির উন্নতি-কল্পে যতটা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, চাষি-জমির বেলায় সেরূপ কিছু হয় না। চাষি-ভূমিতে নিক্ষিপ্ত মূলধন অতি অল্প সময়ে উঠিয়া আসে, কিন্তু দালান এমারতাদির টাকা অতি দীর্ঘ সময়েও অল্পে অল্পে উঠিয়া আসে। মূলধন যত সত্বর উঠিয়া আসে, ততই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সমন্বয় করিয়া পুনরায় নিয়োগ করা যায়। আর কৃষি-কার্য্যের মূলধন কতক উঠিয়া আসার ফলে, মূলধন জ্ঞানে তাহা রক্ষা করিবার জন্য একটা মমত্ব-বুদ্ধি জন্মে কিন্তু বাড়ী ভাড়া রূপে যে অর্থের সমাগম হয়, তাহার একাংশ যে মূলধন সে বোধ প্রায় থাকে না; সুতরাং খরচার মুখে আয় স্বরূপে বাড়িয়া বাড়িয়া যায়। সুতরাং কৃষি ভূমির জন্য যে একটা সাধারণ টান জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, সহর মোকামের স্থানের জন্য সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। তাহার ফলে, ভিটা ভূমির জমা যথাসাধ্য উচ্চহারে ধার্য্য হয় না। তেমনি যে সকল কৃষি-ভূমিতে বর্ষার জল উঠিয়া প্লাবিত হয়, তথায় স্রোতের মুখ হইতে ফসল কাড়িয়া আনায় উপভোগ করার যে দায়িত্ব, তাহাতে সে সকল ভূমির খাজানাও অতি নিম্নসীমায় ধার্য্য হইয়া থাকে।

ব্যবসায় স্থানে যে সকল ভূমির আয়ে তাহার উন্নতির ব্যয় মাত্র উঠিয়া আসে, তাহারা অত্তীনোৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন। এই সকল ভূমির কোন জমা হইতে পারে না। বাস্তুভূমির পক্ষে তাহারাই অত্তীন-যোগ্য। তাহাদের তুলনায় যে ভূমিতে যে পরিমাণ উপস্বত্বের অভ্যুদয় ঘটিতে পারে, সেই অনুপাতে তাহাদের জমা ধার্য্য হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও খাজানা তাহার বিশেষত্বের মূল্য।

এ পর্য্যন্ত আমরা মূলধনের কোন অভাব না থাকার কল্পনা করিয়া আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু মূলধনের অভাব নিয়তই অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং ভূমির যতটা উন্নতিসাধন করা যাইতে পারিত; সাধারণতঃ তাহা করিয়া উঠা যায় না। তবে এই কার্য্যে যতটা মূলধন নিয়োজিত হয়, তদ্দ্বারা ভূমির যে ভাবে যতটা উন্নতি করা যাইতে পারে, মোটামুটি ভাবে তাহাদের বিভিন্ন অঙ্গের শেষোপযোগিতায় সমীকরণ করিয়াই ব্যয়িত হইয়া থাকে। তাহার ফলে, অবস্থানুযায়ী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপস্বত্বের উদ্ভব হয়। কিন্তু তাহার ভূমির শেষোৎপাদিকা শক্তির সীমায় যাইয়া উন্নতি-সাধনের ফলে যাহা পাওয়া

যাইত, অপেক্ষা ইহা কম। সুতরাং দেশে মূলধনের অভাব থাকিলে উপযুক্ত খাজানার উদ্ভব হয় না।

(৩) ভাড়া

যেমন ভূমির উন্নতি করিলে যে উপস্বত্ব পাওয়া যায়, তাহা হইতে খাজানা দেওয়া হয়; তেমনি এই উন্নতির সুবিধা-সুযোগ ভোগ করার জন্য যে খাজানা দেওয়া যাইতে পারে, তাহাকে ভাড়া বলে। ভাড়া হইতে মূলধনের সুদ, বাড়ীর ব্যবহার-জনিত ক্ষয়, মেরামত-খরচা ইত্যাদি বাদে যাহা লাভ হয়, তাহা হইতে খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে; তেমন যাহারা এই বাড়ী ব্যবহার করিয়া, তাহাতে বাণিজ্য-ব্যবসায় ইত্যাদি পরিচালন করিবেন, তাহারা তাহাদের ব্যবসায় হইতে যে উপস্বত্ব লাভ করিতে পারিবেন, তাহা হইতেই ভাড়া দেওয়া হইবে। তাহারা তাহাদের বিভিন্ন ব্যবসায় হইতে যতটা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া অনুমিত হইবে, তাহার উপরে ভাড়া নির্ভর করিবে। বড় বড় ব্যবসায়-কেন্দ্রেও সকল ব্যবসায় সমভাবে চলে না। তন্মধ্যে যে সকল ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছে, তাহাদেরই প্রতিযোগিতায় ভাড়া ধার্য্য হইবে। তবে বড় রাস্তার উপরে যে সকল দোকান-পাট বা ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী লাভ হইয়া থাকে। যে স্থানে যত বেশী জিনিষের কাট্‌তি হয়, সেই স্থানের বাড়ীর জন্য বেশী ভাড়া দেওয়া যায়। ব্যবসায়ীদের মাল কাট্‌তির উপরে তাহাদের ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে। যাহারা প্রকাশ্য রাস্তার উপর বড় বড় দোকান খুলিয়া কারবার পরিচালন করিয়া আসিতেছে, তাহারা বাড়ী ভাড়া বেশী দিলেও তদ্দ্বারা পণ্যদ্রব্যের মূল্যের ইতর-বিশেষ হয় না। এই ভাড়ার টাকা পণ্য-দ্রব্যের মূল্যে ধরা হইতে পারে না। বরং যাহারা প্রকাশ্য স্থানে বেশী ভাড়ার বাড়ীতে কারবার পরিচালনের ফলে অতিশয় বেশী মাল কাটাইতে পারে, তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে মাল বিক্রয় করিয়া থাকে। নিভৃত কোন পল্লীর ভিতরে সেরূপ সস্তায় মাল বিক্রয় করা সম্ভব নহে। তাহার প্রধান কারণ মাল-কাট্‌তির বৈষম্য। যাহারা বাড়ী ভাড়ার কমতি দেখাইয়া সস্তায় মাল বিক্রয়ের ভাণ করে, তাহারা সর্ব্বত্র লাভের মর্য্যাদা রক্ষা করে, এমন মনে হয় না।

যে সকল বাড়ীতে বিক্রীত মালের লভ্য দ্বারা প্রচলিত হারে অনুষ্ঠাতার বেতন, কর্ম্ম-চারীগণের বেতন ও কারবারের আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচা মাত্র উঠিয়া যায়, কিছুই উদ্বৃত্ত হয় না। সেই সকল বাড়ীর জন্য কোন ভাড়া দিয়া কারবার পরিচালন করা চলে না। কারবারের পক্ষে এইগুলিই অন্তীনোৎ-পাদিকা-সম্পন্ন। এই সকল বাড়ীর অনুপাতে অন্যান্য বাড়ীর যতটা সুবিধা আছে, সেই অনুপাতে তাহাদের ভাড়া ধার্য্য হয়। এই ভাড়াও বিশিষ্টতার মূল্য।

(৪) খনির খাজানা

খনি কাটিয়া খনিজ সামগ্রী আহরণের জন্য মালিককে যে কর দেওয়া হয়, তাহার সবই খাজানা সংজ্ঞক বলিয়া গণ্য করা যায় না। তাহার একাংশ খাজানা ও অপরাংশ খনিজ সামগ্রীর মূল্য।

কোন ভূমি পত্তন দেওয়ার সময়ে তাহার

প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে ভূম্যধিকারীকে নজর দেওয়া হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি পত্তন দিলে মৃত্তিকার স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করা হইবে, এইরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে না। প্রজার ব্যবহার কিম্বা ফসল করার প্রকৃতি-অনুসারে যে শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এইরূপ মনে হইলে নজর না দিলে পত্তন দেওয়া হয় না। তেমন কোন কৃষিক্ষেত্রের একাংশ কর্ত্তন করিয়া অপরাংশে বাড়ী নির্ম্মাণের অধিকার প্রদত্ত হইলে বুঝিতে হয় যে ভূমির প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এ সকলই নজর গ্রহণের কারণ। তেমন খনি হইতে যে সকল খনিজ দ্রব্যের আহরণ হয়, তাহার ফলে তাহার যে অপচয় ঘটে, তজ্জন্য উত্তরোত্তর খনির মূল্য হ্রাস হইয়া আসে। এই অপচয়ের মূল্য না পাইলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে ইহা পত্তন করা সম্ভব নহে। কোন খনি হইতে কম ব্যয়ে কোনটা হইতে বা অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যয়ে খনিজ সামগ্রী আহরণ করা সম্ভবপর হয়। পক্ষান্তরে সকল খনির সহিত বাজারের সংযোগ-সুবিধাও সমান নহে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন খনি হইতে যে খনিজ বস্তু আহৃত হয়, তাহাদের শেষ মাত্রায় উৎপাদন ব্যয় সমান নহে। খনিতে উৎপন্ন হ্রাস-নিয়মের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ভাবে কার্য্য করে। তবে বর্ত্তমান উন্নত ও শ্রম-লাঘব যন্ত্রের সাহায্যে খনি কাটার ফলে, অনেক খনি হইতেই লভ্যের সহিত খনিজ বস্তু আহরণ করা সম্ভব হইয়াছে, তথাপি যে সকল খনির উৎপন্ন সামগ্রীর বাজার মূল্যে উৎপাদন-ব্যয় মাত্র কাণায় কাণায় পোষাইয়া যায়—কিছুই উদ্বৃত্ত হয় না, সেই সকল খনির জন্য কোন জমা দেওয়া চলে না। এই খনিজ সামগ্রী আহরণের হিসাবে কষ্টসাধ্য। তদপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর খনি কাটিয়া ব্যবসায় চালাইলে অনুষ্ঠাতাকে লোকশান দিতে হইবে।

এই সকল অপ্রাচীনোপযোগী খনির জন্য খাজানা দেওয়া সম্ভব না-হইলেও তাহা হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করার অধিকার লাভ করিতে হইলে, তাহার অপচয়ের ক্ষতিস্বরূপ মূল্য দিয়া সে অধিকার লাভ করিতে হইবে, অন্যথায় ভূম্যধিকারীর পক্ষে সম্মতি দেওয়া ও এই অপচয় সহ্য করা সম্ভব নহে। উৎপন্ন সামগ্রীর বাজার মূল্যে এই অপচয়ের মূল্যসহ অন্যান্য উৎপাদন-ব্যয় পোষাইলেই কেবল তাহা হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। যদি এই মূল্য দেওয়া না হয়, তবে মালিক কখনও সম্মতি দিবে না। তাহার ফলে এই খনি হইতে যতটা খনিজ দ্রব্য পাওয়া যাইত, তাহার আমদানী বন্ধ হইবে। তখন দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে; অন্যান্য খনিওয়ালাদের লাভের মাত্রা বৃদ্ধি হইবে। তখন অন্য লোক আকৃষ্ট হইয়া এই অস্তীন-খনির অধিকার পাওয়া যায় কিনা, তাহার চেষ্টা করিবে। তখন তাহার মূল্য দিয়া সামগ্রী আহরণ করিলে, আমদানী বৃদ্ধি হইয়া বাজার মূল্যের স্বাভাবিক অবস্থা সম্পাদিত হইবে। আর যদি এই দায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়, মালিক যদৃচ্ছা আহরণের অনুমতি দেন তবে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট খনি হইতেও দ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভব হইবে; তখন আমদানি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে মূল্য হ্রাস হইয়া কাটতি বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং অন্য সামগ্রীর উৎপাদন

ব্যয়ের ন্যায় এই অপচয় মূল্য তাহার টান যোগানের উপর গভীরভাবে ধার্য্য করে, কিন্তু কোন ভূমিরই টান-যোগানের উপর খাজানার কোন প্রভাব নাই। খাজানার উপরে ভূমির যোগান নির্ভর করে না। সমাজের আত্মপ্রয়োজনে নিকৃষ্ট ভূমিও ব্যবহারে আনিতে হয় বলিয়া, উৎকৃষ্ট ভূমির জন্য একটা উপস্বত্ব বা খাজানার অভ্যুদয় হয়। খাজানার হ্রাস-বৃদ্ধিতে ভূমির যোগানের ইতর-বিশেষ হয় না কিন্তু খনিজ বস্তুর অপচয়ের মূল্য দেওয়া না দেওয়ার উপরে তাহার যোগান সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং এই অপচয় মূল্য উৎপাদন-ব্যয়ের একাংশ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু এই অত্যুৎপাদিকা শক্তি-সম্পন্ন ভূমির ব্যয়ে যে সকল খনি হইতে তদপেক্ষা বেশী সামগ্রী আহরণ করা যায়, এই উদ্বৃত্ত সামগ্রীর উপস্বত্ব হইতেই খনির খাজানা দেওয়া হয়। খনির জন্য যে রয়েলটি দেওয়া হয়, তাহাকে খনিজ দ্রব্যের মূল্য বলিয়া গণ্য করিলে তাহার উপরে যাহা দেওয়া যায় তাহাকে খাজানা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

এই সকল বিভিন্ন আলোচনায় ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য যে সকল ভূমির উপযোগিতা আছে, তন্মধ্যে যেটার গুণ অল্পই, যাহার উৎপন্ন সামগ্রীতে উৎপাদন-ব্যয় মাত্র পোষায়, তাহার জন্য কোন খাজানা দেওয়া চলে না এবং এই ভূমির তুলনায় সেই কার্য্যের জন্য অন্যান্য যে-সকল ভূমির যতটা বিশিষ্টতা বা শ্রেষ্ঠত্ব আছে, সেই ভূমির সেই অনুপাতে খাজানার উদ্ভব হয়। যে ভূমিতে নালিতা করা সম্ভব নহে, তেমন ভূমিতেও উৎকৃষ্ট ধান জন্মাইতে পারা যায়। নালিতার পক্ষে ইহা অনুপযুক্ত হইলেও ধানের জন্য তাহার উপযোগিতা আছে। তেমন সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে গভীরভাবে চাষ করিয়া শাক-সব্জী করা সম্ভব হইলেও, পল্লীগ্রামের কোন ভূমিতে সেরূপ গভীর চাষ করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। এইরূপে কৃষিকার্য্যের বিভিন্ন প্রণালী ও শস্যের বিষয় চিন্তা করিলে, কোন ভূমিই খাজানার একান্ত অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। তবে প্রস্তরময় ভূমি বা মরুভূমির কথা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষা-অনুসারে এইরূপ ভূমি চাষের যোগ্য বলিয়া কল্পিত হয় না; তবে প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াও ব্যবসা চলে।

তদ্রূপ প্রাকৃতিক শক্তির খাজানা ধার্য্য করিতেও তাহার অত্যুৎপাদিকা শক্তি সীমার হিসাব করিয়া উপস্বত্ব বাহির করিতে হয়। এদেশে এই সকল শক্তির বহুল ব্যবহার অদ্যাপি হয় নাই। সুতরাং তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা গেল না। তবে জাগী ও গোচারণ ভূমি সম্বন্ধে পৃথকভাবে কিছু বলা আবশ্যক। আমরা নিম্নে তাহারই আলোচনা করিব।

(৫) গোচারণ ভূমি

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে যে চারি কোটী একর জমি গোচারণের জন্য পতিত আছে, তাহা দেশের প্রয়োজনের হিসাবে একান্ত অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই। এইরূপ পতিত থাকার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া Industrial Commissioner মহোদয়গণ বলিয়াছেন, "In India fallows are due, as a rule, to accidental misfor-

tune or to land being on the very margin of cultivation. Indian Industrial Commission Report 1916-18 58 (note) কোন আকস্মিক বিপদ-পাতে অথবা ভূমিগুলি অণ্ডীনোৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন বলিয়া পতিত রহিয়াছে। আকস্মিক কারণে সামান্য ভূমি পতিত থাকিলেও অধিকাংশ ভূমিই যে-কোন প্রকার শস্য উৎপন্নের অযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল ভূমিতে যথারীতি চাষ করিয়া গোগ্রাস উৎপন্ন করিলে, তাহাদের খাজানার উদ্ভব হইতে পারে। এইরূপ কোন পতিত ভূমির জন্য খাজানা অবধারিত থাকিলে বুঝিতে হয় যে তাহা পতিত রাখার পক্ষে কৃষকের কোন প্রলোভন আছে। তদ্বারা ইহা খাজানার যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। প্রকৃত খাজানার উদ্ভব হইতে হইলে রীতিমত গোগ্রাসোৎপন্ন করিতে হয়। অন্যান্য সভ্যদেশে গবাদি পশুর আহার যোগাইবার জন্য যথা-নিয়মে চাষ-আবাদ করিয়া ঘাস উৎপন্ন করা হয়। আমাদের কৃষকদল তাহার কিছুই করে না। অথবা লোক বৃদ্ধি ও বহির্বাণিজ্যের প্রভাবে শস্যের টান বৃদ্ধি হওয়ায় সাবেক গোচারণ ভূমিসমূহ চাষে আসিয়াছে। তবে প্রাকৃতিক সুবিধা-সুযোগ ভেদে তাহাদেরও কোন কোন ভূমির যে সামান্য জমার উদ্ভব না হয়, তাহা নহে।

আমাদের পূর্ব্ব-বঙ্গে বিলাভূমিতে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে স্বভাবজাত ঘাস উৎপন্ন হইত। বর্ষাকালে প্রজারা উহা যদৃচ্ছা কাটিয়া আনিয়া গরুর আহার যোগাইত। দেশের লোকের অত্যাচার নিষ্ক্রিয়তার ফলে প্রকৃতির প্রতিশোধ স্বরূপে বর্ত্তমানে আর তাহাতে ঘাস গজায় না। তন্মধ্যে যে সকল ভূমিতে এখনও কিছু ঘাস জন্মে, তাহাতে প্রায় জমার পত্তন হইয়াছে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে এই স্বভাব-জাত ঘাসই বিঘা প্রতি ২০।২৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। তদ্বারা দেশে গোগ্রাসের উৎকট অভাব মাত্র সূচনা করে। রীতিমত ঘাস উৎপন্ন করিলে যে লভ্য না আছে তাহা নহে। বর্ত্তমানে ধানী জমির খড়ই প্রজার দেয় খাজানার উপরে বিক্রয় হয়।

আর সুদিনে পল্লীগ্রামে গোচারণ ভূমির যে অভাব, তাহা পল্লীবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। তাহার ফলে গোজাতি নষ্ট হইতে চলিয়াছে।

(৬) ভাগী জমি

বর্ত্তমানে আমাদের এই বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের যে যৎসামান্য খামার জমি আছে, তাহাই ভাগে পত্তন হয়। সাধারণতঃ কৃষকগণ সর্ব্বপ্রকার উৎপাদন-ব্যয়-ভার আপনাদের শিরে লইয়া, উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধাংশ মালিককে দেওয়ার সর্ত্তে এই ভাগাউড়ী পত্তন লইয়া থাকে। প্রজাদের নিজ নিজ যোত জমিই যথারীতি চাষ-আবাদ করিবার মত মূলধন তাহাদের নাই, তদবস্থায় পরের জমিতে উপযুক্ত ফসল উৎপন্ন করা শক্তির অতীত। কারণ আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে দেখিতে পাই, জলপ্লাবনে মধ্যে মধ্যে ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপে ফসল একবার নষ্ট হওয়ার ফলে যে মূলধন নষ্ট হইয়া যায়, তাহা পূর্ণ করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া পড়ে; তখন মালিকের প্রাপ্য দেওয়ার প্রবৃত্তি থাকে না। পরন্তু তাহাদের অন্যান্য কার্য্যের অবসর সময়ে

এই সকল ভাগের জমির কাজ করে এবং যাহা কিছু পায় তাহাই লভ্যের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকে। তাহার ফলে ভাগের জমিতে ভাল ফসল জন্মায় না। আর যদি বা কখনো হয়, তাহাও সকলে ঠিক মত মালিককে দেয় না। যে দেশে টাকার সুদ শতকরা মাসিক তিন টাকা হইতে আট-নয় টাকা, সে দেশের প্রজার এইরূপ নৈতিক অধঃপতন বিস্ময়কর নহে। ফলতঃ এই ভাগের জমি হইতে যথারীতি ফসল লইতে হইলে মালিককে সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়া মাত্র হেফাজৎ ও কাটনি প্রজার শিরে রাখিলে সুফল লাভ হইতে পারে। যে ভাবেই হউক প্রজাকে, টাকা দিয়া সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এই ভাগের প্রথা আমূল পরিবর্তিত না হইলে উপযুক্ত ফল-লাভ করার প্রত্যাশা বৃথা।

ভূমির মূল্য

ভূম্যধিকারী হইতে কোন ভূমি পত্তন লইতে হইলেই কেবল খাজানার প্রশ্ন উপস্থিত হয়। তথাপি ভূমি হইতে শস্য উৎপন্ন করিতে যে শ্রমজীবিদিগের বেতন, টাকার সুদ, কৃষক বা অনুষ্ঠাতাগণের বেতন-স্বরূপে নিম্নসীমায় লভ্য হইয়া থাকে, তাহা হইতে এই উপস্বত্বের কোন পার্থক্য থাকিলে, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তাহা পৃথক করিয়া দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভূম্যধিকারী স্বয়ং সমস্ত কার্য্যের ভার লইলেও এই উপস্বত্ব তাঁহার অন্যান্য আয় হইতে একটা স্বতন্ত্র বস্তু। ভূম্যধিকারীর বেলায়ও এই কার্য্যে-লিপ্ত অন্যান্য অনুষ্ঠাতাগণ যে বেতন পাইয়া থাকে, সেই বেতনকেই তাহার বেতন বলিয়া কল্পনা করিয়া অন্যান্য খরচা সহ ইহা বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই তাহার বিশেষ আয়। এই আয়ের উপর ভূমির মূল্য ধার্য্য হয়। কাহাকেও ভূমি ক্রয় করিতে হইলে, যে মূলধন স্থায়ীভাবে নিক্ষেপ করিয়া সুদের দ্বারা এই উপস্বত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাই ভূমির মূল্য। এদেশে—ভূমির বার্ষিক উপস্বত্বের উপরে বিশগুণ দরে ভূমি খরিদ-বিক্রয়ের প্রথা বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। এই হিসাবে টাকার সুদ বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকা হয়। ইহাই প্রচলিত বা স্বাভাবিক সুদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে ভূমি ক্রয় করিলে ভূস্বামী স্বরূপে যে একটা সামাজিক পদ-গৌরব ও আভিজাত্য-মর্য্যাদার অভ্যুদয় হয়, অথবা হয় বলিয়া লোকের ধারণা আছে, তদ্দ্বারা মানব-চিত্ত নিয়ত অভিভূত রহিয়াছে। তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে, ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তেমনি সময়ে এই ভূমির অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া, ভিটা আবাদ-যোগ্য অথবা অন্য কোনভাবে ইহার মূল্যের ইতর-বিশেষ হইতে পারে। এই রূপ কোন সম্ভাবনা থাকিলে, তাহারও মূল্যের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তবে সর্ব্ব অবস্থাতেই ইহা হইতে কতটা উপস্বত্ব লাভ করিতে পারা যাইবে, তাহাকে মূল ভিত্তি ধরিয়া মূল্যের ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। সুতরাং তখন ভূমি পত্তন হউক কি না হউক, এই উপস্বত্ব-ধার্য্যের নিয়মের একটা স্পষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক হয়। এই কারণেও খাজানার বিশেষ সার্থকতা আছে।

স্থায়ী জমায় কোন ভূমি পত্তন করা বিক্রয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। পার্থক্য এই যে বিক্রয়ের সময় সম্পূর্ণ উপস্বত্ব ধরিয়া মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, আর স্থায়ী জমায় পত্তন-সময়ে যে জমা রাখা হয়, তাহার পরিমাণ মূল্য বাদ দিয়া নজর-স্বরূপে মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে।

শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত।

সন্ধ্যাকালী

আজ বরষার দিবস-শেষে
তোমার পূজা সন্ধ্যাকালী।
শ্মশান রচে অর্ঘ্য তোমার
উল্কামুখীর দেউটী জ্বালি ;
ধূপ জ্বলে আজ আলেয়াতে
নৃ-কঙ্কালে মাল্য গাঁথে
চিতায় চিতায় হোম করে সে
মজ্জা-বসার আজ্য ঢালি ॥

বিদ্যুতেরি খড়্গ ঘায়ে
পশ্চিমাকাশ ধূপাঙ্গনে,
কালো মেঘের মেঘ-মহিষের
রক্ত ছুটে প্রস্রবণে।
ঢলছে তমাল ঝাউয়ের চামর
তুলছে সমীর তুমুল ডামর
জবায় কানন, অব্জে তড়াগ,—
সাজায় তোমার পূজার ডালি ॥

জোনাক করে ভোগ-আরতি
ঢাক বাজে মেঘ-মন্দ্রে আজি,
দাদুরী দেয় হুলুধ্বনি
ঝাঁঝর বাজায় ঝিল্লীরাজি।
বিল্বদলের মাঝে মাঝে
নীপযূথী নৈবেদ্য রাজে,
অট্টহাসে পট্টবাসে
নদ-নদী দেয় করতালি ॥

শ্রীকালিদাস রায়।

সাতের কথা

"তিন" অপেক্ষা "সাতের" আধিপত্য বেশী কিনা এই বিষয় লইয়া অনেক দিন হইতে একটা গোল রহিয়া গিয়াছে। সাতের তরফ লইয়া বোধ হয় কেহ বেশী কিছু লেখেন নাই, কিন্তু সাতের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে। হিন্দুশাস্ত্রে, জ্যোতিবিদ্যায়, ভূগোলে, খেলায় ও অন্যান্য ব্যাপারে সাতেরই প্রভাব খুব বেশী দেখা যায়।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র :—

সপ্তাহ সাত দিনেই হয়, ছয় দিনে নয়, আট

দিনেও নুর। আবার সাতটি গ্রহের নামে সাতটি বারের নামকরণ হইয়াছে—হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র-মতে রাহু-কেতুকে বাদ দিয়া রবি, সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিকে প্রধান ধরায় সপ্তাহের বারগুলির নামও তদনুসারে করা হইয়াছে। রাহু-কেতুকে ধরা হয় নাই, কারণ বাস্তবিক রাহু ও কেতু গ্রহ নয়; চন্দ্রের কক্ষ (orbit) পৃথিবীর কক্ষকে যে যে স্থানে কাটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে উত্তরবিন্দু ও দক্ষিণ বিন্দু—এই দুইটিই রাহু ও কেতু। আবার ইংরাজী জ্যোতিষ শাস্ত্র-মতে আমরা আমাদের এই পৃথিবী হইতে দেখিতে পাই প্রধান গ্রহ সাতটি, যথা,—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনাস, ও নেপচুন। নক্ষত্র-পুঞ্জের মধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডলই প্রধান। তাহারই দুইটী নক্ষত্রের সাহায্যে ধ্রুবতারা বা উত্তরদিক নির্ণীত হইয়া থাকে।

ভূগোল :—

হিন্দু ভূগোল শাস্ত্র বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে সমুদ্র সাতটি, যথা,—লবণ সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র, সুরা সমুদ্র, নবনী সমুদ্র, দধি সমুদ্র, দুগ্ধ সমুদ্র, জল সমুদ্র; এবং এই সপ্তসমুদ্রই সাতটি দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে,—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শক এবং পুষ্কর। পাহাড়ও সাতটি—সুমেরু, হিমাবত, হেম, কেতু, নিষধ, শ্বেত, শৃঙ্গি। আধুনিক ভুগোল শাস্ত্র-মতে পৃথিবীর মধ্যে মহাদেশ সাতটি,—যথা—এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওসেনিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া।

সামাজিক ব্যাপারে দেখা যায়, হিন্দুদের বিবাহের সময় কন্যাকে বরের চারিদিকে সাতটি পাক দিতে হয়, এবং সেই সাতটি পাকের বন্ধন বা জোর এত বেশী যে উল্টা দিকে সাত-সাতে উনপঞ্চাশ পাক দিলেও তাহা খোলে না, তাহার প্রমাণ—হিন্দুদের Divorce আইন নাই। বিবাহের পর কন্যাকেও সাতদিনের পর স্বামী-গৃহ হইতে পিতৃগৃহে আসিতে হয়;—সপ্তশলাকা।

এখন দেখা যাক্ পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তি করিয়া যে বিজ্ঞানের সৃষ্টি, তাহার সহিত এই সপ্ত-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ কতদূর। প্রথমতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ের কথা আলোচনা করিলে দেখি যে সঙ্গীত-শাস্ত্রে সাতটি সুরই প্রধান,—যথা—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। এই সাতটি সুর ও তাহাদের শ্রুতি-বিভাগের উপরই কি পাশ্চাত্য, কি প্রতীচ্য, সর্ব্বদেশেরই সঙ্গীত-শাস্ত্রের সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি। এই সাতটি সুর বিশেষরূপে আয়ত্ত করার জন্যই মাদাম মেল্‌বার ফী পাঁচ-শ' গিনি,—কারণ তাঁহার "কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর, সাতটি যেন পোষা পাখী!"

তারপর দর্শনেন্দ্রিয়ের কথা—ইহারই উপর আলোক-শাস্ত্রের ভিত্তি। আলোকের আকর সূর্য্য। সেই সূর্য্যের আলো বিশ্লেষণ করিলে আমরা সাতটি রং পাই। তাহাদের নাম ও ক্রম—বেগুণী, নীলের (indigo) রং, নীল, সবুজ, হলদে, কমলালেবুর রং ও লাল। আস্বাদ সম্বন্ধে জানা আছে যে মিষ্ট, তিক্ত, কষায়, কটু, ঝাল, লবণ ও টক্‌—এই সাতটিই প্রধান আস্বাদ।

গন্ধ-শাস্ত্রের যতদূর আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে প্রধান গন্ধ সাতটি, আর সকলই তাহাদের সংমিশ্রণ বা বিভাগ। এ বিষয়ে যিনি বিস্তারিত অবগত হইতে ইচ্ছা

করেন, তিনি গস্‌নেল্‌ কোম্পানীর pamphlet পাঠ করুন।

সুগন্ধির মধ্যে—চন্দন, ধুনা, গোলাপ, বকুল, মৃগনাভি, ও দুর্গন্ধের মধ্যে পুরীষ ও গলিত দ্রব্য—সর্ব্বশুদ্ধ এই সাতটি।

স্পর্শ-সম্বন্ধে অনেকেই জানেন না বোধ হয়, যে, স্পর্শানুভূতি সাত প্রকার; যথা,—নরম, শক্ত, আঠার মত চট্‌চটে, জলীয়, শীতল, উষ্ণ ও ধারাল। মানুষের গায়ের বর্ণ যাহার উপর জাতি-ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে,—তাহাও সাতভাগে বিভক্ত; যথা—শ্বেত, গোলাপী, শ্যাম, হলুদে, গৌর, লাল ও কৃষ্ণবর্ণ।

রূপ, রস গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—সকল ইন্দ্রিয় এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র লইয়া দেখা গেল, যে সকলগুলিই প্রধানতঃ সাত ভাগে বিভক্ত। যদি কেহ তর্ক করিতে আসেন, আমি তাঁহাকে বুঝাইতে পারি যে সাতের অধিক অন্য যাহা-কিছু আছে, তাহা ঐ প্রধান সাতেরই সংমিশ্রণ বা বিভাগ।

হিন্দু আইন-শাস্ত্র-বেত্তারা অবগত আছেন যে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত পিণ্ডের অধিকারী, এবং উপরিতন ও অধস্তন সাত পুরুষকে সপিণ্ড বলে। কোন কিছু পাপ করিলে আমরা বলি, কখনও সাতপুরুষ কখনও বা সাত দুকুলে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়। মৃতাশৌচ চার সপ্তাহ অর্থাৎ ২৮ দিন—কারণ ২৯ দিনে ক্ষৌরকার্য্য করা হইয়া থাকে।

হিন্দুর গর্ভোপনিষদে লিখিত আছে যে রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এবং ওজঃ—এই সাতটি ধাতু লইয়াই মনুষ্য-দেহ গঠিত হয়।

থিয়সফিষ্টদের মতে জীবাত্মার অভিব্যক্তি সাতটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা কোষ নিরীকৃত হইয়াছে। যথা—জলময় কোষ, মৃত্তিকাময় কোষ, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আকাশময় কোষ।

যুদ্ধ সম্বন্ধে সাতের আধিপত্যের কথা বলিতে হইলে বলিব, এই যে এত-বড় যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহাতে জর্ম্মানির বিরুদ্ধে সাতটি প্রধান শক্তি একত্র হইয়াছিল—ইংরাজ, ফরাসী ইতালী, জাপান, আমেরিকা, বেলজিয়াম ও রুষ।

মহাভারতের বীর অভিমন্যুকে বধ করিবার জন্য সপ্তরথীকে এক-জোটে মিলিতে হইয়াছিল। আধুনিক যুদ্ধে সাত রকম সৈন্য নিয়োজিত হয়, যথা,—পদাতিক, অশ্বারোহী, কামান-বাহী, বিমানবাহী, গোলন্দাজ বা জল-সৈনিক, ট্যাঙ্ক ও গ্যাসবাহীদল। মানুষ মারিবার জন্য সাত প্রকার অস্ত্রশস্ত্র এই মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে,—গুলি, গোলা, বেয়নেট, বর্ষা, বোমা, গ্যাস, ও টরপেডো।

যুদ্ধের উপরিতন কর্ম্মচারীর গ্রেড্‌ সাতটি,—লেপ্টেনেন্ট, কাপ্তেন, মেজর, লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও ফিল্ড মার্সাল।

এদেশের শাসন-বিভাগেও সাতটি ক্রম বা গ্রেড্‌ দেখা যায়,—বড়লাট, প্রদেশিক লাট, কমিশনার, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট, থানার দারোগা, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট।

তারপর আপনারা আলিপুরের কাছারিতে যান, দেখিবেন, সাত রকম কাছারিতে সাত রকম মোকদ্দমার বিচার-নিষ্পত্তি হইতেছে,—

(১) আপীল
(২) দাওয়ানী (নিম্ন)
(৩) ফৌজদারী (নিম্ন)
(৪) দায়রা
(৫) রেভিনিউ
(৬) Land Acquisition
(৭) রেজিষ্ট্রেশন।

তাসের খেলায় গ্রাবু খেলিতে হইলে দুকুড়ি সাত ফোঁটা না রাখিতে পারিলে খেলা কিছুতেই হইবে না। অপর পক্ষ বিন্তি হাঁকিলে তোমার তিন কুড়ি সাত দেখানো চাই; আর ইস্তক বিন্তি থাকিলে তোমাকে চার কুড়ি সাত দেখাইতে হইবে। অর্থাৎ কুড়ি বা দশ যতই হউক, তাহার সহিত সাতটি ফোঁটা থাকা চাইই। গল্পে আছে যে কোথাকার এক রাজা তাস খেলিতে ছিলেন; খেলিতে খেলিতে একবার বাজিতে এক ফোঁটা কম হয়। তাহাতে নাকি খুব বেশী বাজি হারিয়া যাইবার কথা। তিনি নিজের আঙুল কামড়াইয়া রক্ত দিয়া গণিয়া দেখিবার সময় এক ফোঁটা বেশী দেখাইয়া দুকুড়ি সাতের খেলা বাঁচাইয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ তাসে ফোঁটা বসাইয়া দিলেন, এ-সব জেরা করিলে মুস্কিলে পড়িব কারণ সে রাজার ইতিহাস এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই।

তাসের ব্রিজ খেলাতেও সাতটি পিট না হইলে পিট্ই গণ্য হয় না। আর মোটে বারোটি পিট থাকায় এবং ৬ এর উপর যে কয়টি পিট হইতে পারে এই নিয়ম থাকায় কোন পক্ষেরই সাতের অধিক গণনীয় পিট হইতে পারে না।

রূপকথায় সাত সমুদ্রের কথা কে না পড়িয়াছেন? সাত শ' রাক্ষসীর দেশ, সাত সমুদ্রের পার ও সাত ভাই চম্পার কথা যিনি বিস্তারিত জানিতে চাহেন, তিনি কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ছেলেদের গল্পের বই একখানি কিনিয়া পড়ুন। সাত রাজার ধন এক মাণিকের কথাও সকলে জানেন। সাত গেঁয়ের কাছে মামদোবাজী বচনটির কথা এই সঙ্গে ভাবিয়া দেখা উচিত।

নেশার মধ্যে প্রধান সাতটি, যথা—মদ, আফিম, গাঁজা, গুলি, চরস, কোকেন ও তামাক।

সাহিত্যে—বাল্মীকি যে তাঁহার রামায়ণ সাতকাণ্ডে শেষ করিয়াছেন, তাহা কি সাতেরই সম্মান-রক্ষার জন্য নয়?

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই সাতের মান রাখিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—"সপ্ত-কোটি-কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ করালে"; এবং চতুর্দ্দশ না লিখিয়া "দ্বি-সপ্ত কোটি-কণ্ঠৈধৃ্ত খরকরবালে" লিখিয়াছেন। আর সরস্বতীর বরপুত্র ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন এমন যে স্যর আশুতোষ তাঁহাকেও সাতটি পরীক্ষা—এন্‌ট্রেন্স, এফ্-এ, বি এ, এম্-এ, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ, বি-এল, ও ডি-এল পাশ করিতে হইয়াছে। আর তিনিই অনেক ভাবিয়া এই সাতেরই মর্য্যাদা রাখিবার জন্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাশ সংখ্যা ধার্য্য করিয়াছেন, ৭ × ১০০ = ৭০০।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

ভোরাই
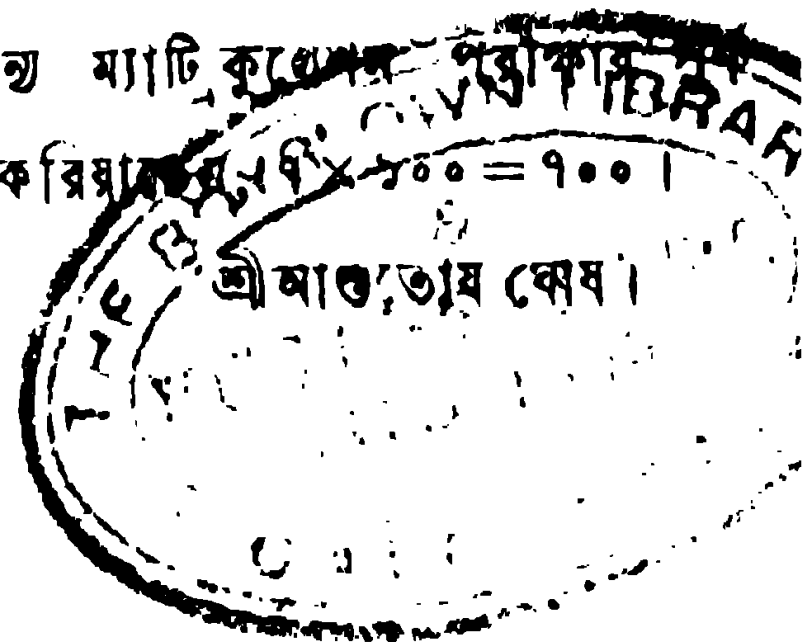
ভোর হ'ল রে, ফর্সা হ'ল, ছুল্‌ল উষার ফুল-দোলা !
আন্‌কো আলোয় যায় স্থাখা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা !
জাগ্‌ল সাড়া নিদ্‌মহলে, অ-থই নিথর পাথার-জলে—
আল্‌পনা স্থায় আল্‌তো বাতাস, ভোরাই সুরে মন্ ভোলা !

ধানের ক্ষেতের সব্‌জে কে আজ সোহাগ দিয়ে ছুঁপিয়েছে !
সেই সোহাগের একটু পরাগ টোপর পানায় টুপিয়েছে।
আলোয় মাঠের কোল ভরেছে, অপ্‌রাজিতায় রং ধ'রেছে—
নীল-কাজলের কাজল-লতা আস্‌মানে চোখ্ ডুবিয়ে যে।

কল্পনা আজ চল্‌ছে উড়ে হাল্‌কা হাওয়ায় খেল্ খেলে !
পাপ্‌ড়ি-ওজন পান্‌শি কাদের সেই হাওয়াতেই পাল পেলে !
মোতিয়া মেঘের চামর পিঁজে পায়রা ফেরে আলোয় ভিজে
পদ্মফুলের অঞ্জলি যে আকাশ-গাঙে যায় ঢেলে !

পূব্-গগনে থির নীলিমা ভুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে !
পশ্চিমে মেঘ মেল্‌ছে জটা—সিংহ কেশর ফুলিয়েছে !
হাঁস চলেছে আকাশ-পথে, হাস্‌ছে কারা পুষ্প-রথে,—
রামধনু-রং আঁচ্‌লা তাদের আলোর পাথার ছুলিয়েছে !

শিশির-কণায় মাণিক ঘনায়, দূর্ব্বাদলে দীপ জ্বলে !
শীতল শিথিল শিউলি-বোঁটায় সুপ্ত শিশুর ঘুম টলে !
আলোর জোয়ার উঠ্‌ছে বেড়ে গন্ধ-ফুলের স্বপন কেড়ে,
বন্ধ চোখের আগল ঠেলে রঙের ঝিলিক্ ঝল্‌মলে !

নীলের বিথার নীলার পাথার দরাজ এ যে দিল-খোলা !
আজ কি উচিত ডঙ্কা দিয়ে ঝাণ্ডা নিয়ে ঝড় তোলা ?
ফির্‌ছে ফিঙে ছুলিয়ে ফিতে, বোল ধ'রেছে বুল্‌বুলিতে !
গুঞ্জনে আর কূজন-গীতে হর্ষে ভুবন হরবোলা !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৪

পাঠকের বোধ হয় মনে আছে, অক্টেভ লাবিনস্কাকে ভাল বাসে এই কথা লাবিনস্কাকে সে বলিতে উদ্যত হওয়ায় লাবিনস্কা তাহাকে থামাইয়া দেন, সে কথা তার মুখ হইতে বাহির করিতে দেন নাই; সে কথা তিনি শুনিতে চান নাই। তখন হইতে দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সুখ-স্বপ্নের উচ্চ শিখর হইতে এই রূপ দারুণ পতন হওয়ায়, অক্টেভের চিত্ত নৈরাশ্য ও বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় এবং অক্টেভ, লাবিনস্কাকে কোন সংবাদ না দিয়া দূর দেশে চলিয়া যায়।

যে একটি মাত্র কথা অক্টেভ লাবিনস্কাকে লিখিতে পারিত সেই কথাটিই মুখ দিয়া বাহির করিতে অক্টেভকে নিষেধ করা হইয়াছে। কাজেই লাবিনস্কা অক্টেভের কোন সংবাদ পান নাই। অক্টেভের এই নিস্তব্ধতাতে ভীত হইয়া, লাবিনস্কা বিষন্ন চিত্তে স্বকীয় ভক্ত উপাসক বেচারী অক্টেভের কথা মধ্যে মধ্যে চিন্তা করেন। :—সে কি আমাকে ভুলিয়া গেছে?" লাবিনস্কা চাহিতেন যে সে তাহাকে ভুলিয়া যায়—কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিতেন না। কেন না, অক্টেভের চোখে তিনি যে প্রেমের আগুন জ্বলিতে দেখিয়াছেন, তাহা নির্ব্বাণ হইবার নহে; কৌন্টেস্ তাহার হৃদয়ের অবস্থা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। প্রেম ও দেবতাদের মধ্যে বেশ একটা চেনা পরিচয় আছে—ইঁহারা পরস্পরকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারেন। তাই এই প্রেমের কথাটা মনে হওয়ায় তাঁহার সুখের স্বচ্ছ আকাশের উপর দিয়া যেন একটি ক্ষুদ্র মেঘ চলিয়া গেল, পৃথিবীর দুঃখকষ্টে স্বর্গের দেবতাদের যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ লঘু ধরণের একটু দুঃখ তার মনকে অধিকার করিল। তাঁহার জন্য কোন হতভাগ্য কষ্ট পাইতেছে মনে করিয়া সেই মমতাময়ী দেবীর অন্তঃকরণ একটু দ্রবীভূত হইল। কিন্তু আকাশের কোন উজ্জ্বল তারকায় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যদি কোন সামান্য মেষপালক উদ্বাহু হইয়া হাত বাড়ায়, তাহা হইলে সেই তারকা তাহার জন্য কি করিতে পারে?

প্যারিসে আসিয়া, কৌন্টেস্ লাবিনস্কা অক্টেভের নামে লৌকিক ধরণের একটা সাদামাটা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন। ঐ পত্রখানিই ডাক্তার বাল-থাজার-শেরবোনো অন্যমনস্কভাবে এক্ষণে আঙ্গুলের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। কৌনটেশের ইচ্ছা সত্ত্বেও যখন কৌন্টেশ দেখিলেন অক্টেভ আসিল না, তখন তাঁর মনে হইল, সে এখনো তাঁহাকে ভালবাসে, তবে হয়ত কোন বিশেষ কারণে আসিতে পারে নাই। এই মনে করিয়া কৌন্টেশের হৃদয় উৎফুল্ল হইল; তবু তো এই রমণী স্বর্গের দেবতার মতো বিশুদ্ধ-চরিত্র ও হিমালয়ের উচ্চতম শিখরস্থ তুষারের মতো শুভ্র নিষ্কলঙ্ক। ডাক্তার অক্টেভকে বলিলেন:—"তোমার বর্ণিত

সমস্ত কথা আমি বেশ মন দিয়ে শুনেছি, আমার মনে হয়, এখন কোনপ্রকার আশা করা তোমার পক্ষে নিতান্তই পাগলামী। কোণ্টেস্ কখনই তোমার ভালবাসা গ্রহণ করবেন না।”

—“দেখুন ডাক্তার, এইজন্যই আমার প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করবার কোন হেতু দেখ্‌তে পাই নে।”

ডাক্তার বলিলেন :—“আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, সচরাচর উপায়ে প্রাণ বাঁচাবার কোন আশা নাই। কিন্তু এমন-সব গুহ্য তত্ত্ব ও নিগূঢ় শক্তি আছে যার সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান একেবারে অনভিজ্ঞ। মূর্খ সভ্যতা যে সব দেশকে অসভ্য বলে, সেই সব বিদেশভূমিতেই এই গুহ্য বিদ্যার চর্চ্চা বংশ-পরম্পরায় চলে আস্‌চে। সেই-খানেই জগতের আদিমকালে, মানবজাত প্রাকৃতিক শক্তির সহিত অব্যবহিত সংস্রবে আসায় তার গুহ্য তত্ত্ব জানতে পেরেছিল। লোকের বিশ্বাস—সে-সব তত্ত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সাধারণ লোকে তার কিছুই জানে না। ঐ সব গুহ্য তত্ত্বের জ্ঞান প্রথমে মন্দির দেবালয়ের রহস্যময় নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে শিষ্য-পরম্পরায় প্রচারিত হয়; তার পর, ইতর লোকের অবোধ্য পবিত্র ভাষায় উহা লিপিবদ্ধ হয়, ইলোরার ভূগর্ভস্থ প্রাচীরের গায়ে খোদিত হয়। তুমি এখনও দেখ্‌তে পাবে, যেখান থেকে গঙ্গা নিঃসৃত হচ্ছে সেই উচ্চতম মেরু-শিখরে, পুণ্যনগরী বারাণসীর প্রস্তর-সোপানের তলদেশে, সিংহলের ভগ্নদশাগ্রস্ত ডাগোবার গভীরদেশে কতকগুলি শতায়ুষ্ক ব্রাহ্মণ অপরিজ্ঞাত পুঁথির পাঠোদ্ধার করচেন, কতকগুলি যোগী অনির্ব্বচনীয় ওঁ-শব্দের জপে ব্যাপৃত রয়েছেন—ইতিমধ্যে আকাশের পাখী তাঁদের জটার মধ্যে বাসা বাঁধ্‌চে—সেদিকে তাঁদের লক্ষ্যই নাই; কতকগুলি সন্ন্যাসী যাঁদের স্কন্ধদেশ ত্রিশূলবিদ্ধ ক্ষতের চিহ্নে অঙ্কিত—তাঁরা নষ্ট গুহ্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন এবং তা-থেকে আশ্চর্য্য ফল লাভ ক'রে, তা কাজে প্রয়োগ করচেন। আমাদের য়ুরোপ ভৌতিক স্বার্থে নিমগ্ন হয়ে, কল্পনাও করতে পারে না—ভারতের তপস্বীরা আধ্যাত্মিকতার কত উচ্চ ধাপে আরোহণ করেছেন, তাঁদের নিরম্বু উপবাস, তাঁদের ধ্যানধারণার ভীষণ একাগ্রতা, কত কত বৎসর ধরে', দুঃসাধ্য আসন রচনা করে' একভাবে উপবিষ্ট থাকা, প্রখর সূর্য্যের নীচে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে বসে শরীরকে শোষণ করা,—এ-সব য়ুরোপের সাধ্যাতীত। তাঁদের হাতের নখ বর্দ্ধিত হয়ে তাঁদের হাতের তেলোতে বিদ্ধ হয়ে আছে—দেখ্‌লে মনে হয় যেন "ইজিপশ্যান মমি" তাদের সিন্দুক থেকে সদ্য বের হয়ে এসেছে। তাঁদের দেহের বহিরাবরণটা যেন প্রজাপতির খোলস; প্রজাপতিরূপ অমর আত্মা ঐ খোলস ইচ্ছা-মতো ত্যাগ করতে পারে কিংবা আবার গ্রহণ করতে পারে। যখন উঁহাদের ভীষণ-দর্শন জীর্ণ-শীর্ণ জড়বৎ দেহ-পিণ্ডটা একস্থানে পড়ে থাকে, তখন উঁদের আত্মা, সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে খেয়ালের ডানায় ভর করে' গগনাতীত উচ্চ প্রদেশে অলৌকিক জগতে উড়ে যায়। তখন তাঁরা অদ্ভুত দৃশ্য অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌তে থাকেন। অনন্তের সাগর-বক্ষে বিলীন যুগযুগান্তের যে

সব তরঙ্গ ওঠে, তাঁরা যোগানন্দের উচ্ছ্বাসে সেই সব তরঙ্গ অনুসরণ করেন; তাঁরা বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে সাহায্য করেন, দেবতাদের জন্মগ্রহণ ও যোনিভ্রমণে সাহায্য করেন, সর্ব্বতোভাবে অসীমের মধ্যে তাঁরা বিচরণ করেন। প্রলয়কাণ্ডের দরুণ যে-সব বিজ্ঞানবিলুপ্ত হয়েছে সেই সব বিজ্ঞান, এবং আদিম মানব ও পঞ্চভূতের বিবরণ তাঁদের স্মরণে আসে; এই উদ্ভট অবস্থার মধ্যে, তাঁরা এমন-এক ভাষার শব্দ বিড়বিড় ক'রে উচ্চারণ করেন, যে ভাষায় বহুকাল যাবৎ কোন জাতিই আর কথা কয় না। সেই আদিম শব্দ-ব্রহ্মকে তাঁরা আবার পেয়েছেন,—যে-শব্দব্রহ্ম পুরাতন অন্ধকারের মধ্য হতে, আলোকের উৎস ধারা ছুটিয়ে দিয়েছিল। লোকে তাঁদের পাগল মনে করে, আসলে তাঁরা দেবতা।"

এই অদ্ভুত গৌড়চন্দ্রিকায় অক্টেভের উদ্দীপ্ত কৌতূহল শেষ-সীমায় আসিয়া পৌঁছিল, ডাক্তারের কথার গতি কোন্‌দিকে বুঝিতে না পারিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসার ভাবে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অক্টেভের ভালবাসার সহিত ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে, অক্টেভ তাহা কিছুই অনুমান করিতে পারিল না।

ডাক্তার অক্টেভের মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া, কোন প্রশ্ন করিতে মানা করিবার ভাবে, হাতের একটা ইসারা করিয়া বলিলেন:—বাপু, একটু ধৈর্য্য ধর; এখনি তুমি বুঝিতে পারবে—আমি যা বল্লুম, এসব অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক কথা নয়—মূল বিষয়ের সঙ্গে, তার বিলক্ষণ যোগ আছে।

পরীক্ষাগারের মার্বেল-মেঝের উপর বসে,' শব-দেহের উপর ছুরি চালিয়ে পরীক্ষা-করে' ক'রে ক্লান্ত হয়েছি, তার থেকে কোন সাড়া পাই নি; জীবনকে খুঁজতে গিয়ে কেবল মৃত্যু-কেই দেখতে পেয়েছি! তখন একটা মৎলব আমার মনে হল। মৎলবটা খুব দুঃসাহসীর মতো বলতে হবে। এ দুঃসাহস আগ্নিহরণ-উদ্দেশে প্রমেথিউসের স্বর্গ-আক্রমণের মতো দুঃসাহস। মনে করলাম, আমি আত্মাকে হঠাৎ পাকড়াও করব, তার পর তাকে বিশ্লেষণ করব, শবচ্ছেদের মতো খণ্ড খণ্ড করে দেখব। আমি কারণের উদ্দেশে কার্য্যকে ত্যাগ করলাম। জড় বিজ্ঞানের উপর আমার গভীর অবজ্ঞা হল—কেন না, তার থেকে কেবল মৃত্যুরই প্রমাণ পাওয়া যায়। আমার মনে হল, কতকগুলো আকারের উপর পরীক্ষা করা, কতকগুলো বিচ্ছিন্ন উৎপন্ন পরমাণু-রাশির উপর পরীক্ষা করা—এ তো স্থূল-প্রত্যক্ষবাদের কাজ। যে সকল বন্ধনে দেহা-বরণটা আত্মার সঙ্গে আবদ্ধ রয়েছে, চুম্বক-শক্তির যোগে সেই সব বন্ধন শিথিল করবার জন্য আমি চেষ্টা করতে লাগলাম। এই পরীক্ষা-কার্য্যে 'মেস্‌মের' প্রভৃতি মোহিনীশক্তির আবিষ্কারকদেরও ছাড়িয়ে উঠলাম। খুব আশ্চর্য্য ফল পেলাম। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হলাম না। মৃগীরোগ, সশরীরে স্বপ্নভ্রমণ, দূর-দর্শন, "দশা-পাওয়া" অবস্থায় চিত্তের উজ্জ্বলতা,—এই সব ব্যাপার আমি স্বেচ্ছাক্রমে উৎপাদন করতে পারতাম। এই-সব ব্যাপার ইতর লোকের বুদ্ধির অগম্য—কিন্তু আমার কাছে

খুবই সোজা। আমি আরও উচ্চে উঠলাম। য়ুরোপীয় মঠের যে সব মহাপুরুষ ধ্যান-ধারণা সমাধির দ্বারা আশ্চর্য্য বিভূতি অর্জ্জন ক'রে, তার দ্বারা নানাপ্রকার অলৌকিক কাণ্ড করতেন আমি তাও করতে সমর্থ হলাম। কিন্তু তবু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। আত্মাকে আমি কিছুতেই ধরতে পারলাম না। আমি আত্মাকে অনুভব করতে পারতাম, বুঝতে পারতাম, আত্মার উপর কার্য্যফল উৎপাদন করতে পারতাম। আমি আত্মার বৃত্তিগুলিকে জড়ীভূত কিংবা উত্তেজিত করতে পারতাম। কিন্তু আত্মা ও আমার মধ্যে যে মাংসের আবরণ আছে সেটাকে কিছুতেই অপসারিত করতে পারতাম না—পাছে আত্মাটা উড়ে পালায়। ব্যাধ যেমন জালে পাখী ধরে' জালটা তুলতে সাহস করে না—পাছে পাখীটা আকাশে উড়ে যায়—এ সেই রকম।

শেষে আমি ভারতবর্ষে যাত্রা করলাম—এই আশা করে' যে, সেই পুরাতন জ্ঞানের দেশে আমার দুর্জ্ঞেয় সমস্যার মন্ত্রটি আমি পাব। আমি সংস্কৃত ও প্রাকৃত শিখ্‌লাম। আমি পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কথা কইতে সমর্থ হলাম; যেখানে থাবা পেতে বসে' বাঘরা গর্জ্জন করে, সেই-সব জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম। যে-সব পবিত্র সরোবরে কুমীরের বাস, সেই সব সরোবরের ধার দিয়ে চল্‌তে লাগলাম। লতাগুল্মে আচ্ছন্ন দুর্লঙ্ঘ্য অরণ্য পার হয়ে গেলাম। আমার পায়ের শব্দে বাদুড়ের ঝাঁক উড়ে গেল, বানরের পাল পালিয়ে গেল। যে পথে হরিণরা বিচরণ করে, সেই পথের বাঁক নেবার সময় একেবারে হাতীর মুখামুখী এসে পড়লাম। এইরকম ক'রে অবশেষে একজন প্রসিদ্ধ যোগীর কুটীরে এসে পৌঁছলাম। আমি তাঁর মৃগচর্ম্মের একপাশে বসে', যোগানন্দের উচ্ছ্বাসে দশা-পাওয়া অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে যে-সব অস্পষ্ট মন্ত্র নিঃসৃত হচ্ছিল তাই খুব মন দিয়ে শুনতে লাগলাম; এইরকম করে কতদিন কেটে গেল। তার মধ্য থেকে বেছে যে শব্দগুলা খুব শক্তিমান সেই-সব শব্দ, যে মন্ত্রে প্রেতাত্মাদের আবাহন করা যায় সেই-সব মন্ত্র, তারপর শব্দ-ব্রহ্মের মন্ত্র, আমি মনে করে র'খ্‌লাম; দেবমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কক্ষে যে-সব খোদাই কাজের বিগ্রহ আছে সেই সব বিগ্রহের তত্ত্বালোচনা করতে লাগলাম। এই-সব গুপ্ত বিগ্রহ অদীক্ষিত লোকের অদর্শনীয়। কিন্তু আমার ব্রাহ্মণের বেশ ছিল বলে' আমি সেই গুপ্ত কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম; সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য, লুপ্ত সভ্যতার অনেক কাহিনী আমি পড়তে পারলাম; দেব-দেবীরা তাঁদের বহু হস্তে যে-সব জিনিস ধারণ করেন, তার রূপক-অর্থ আমি আবিষ্কার করলাম।

ব্রহ্মার চক্রের উপর, বিষ্ণুর পদ্মের উপর, নীলকণ্ঠ শিবের সর্পের উপর আমি ধ্যান করতে লাগলাম। গণেশ তাঁর স্থূলচর্ম্ম শুণ্ড নাড়তে নাড়তে দীর্ঘপক্ষ্মবিশিষ্ট ছোট ছোট পিট-পিটে চোখ মেলে, একটু মৃদু হেসে যেন আমার এই সব গবেষণার চেষ্টায় উৎসাহ দিচ্ছিলেন। এই-সব বিকট মূর্ত্তি তাদের প্রস্তর-ভাষায় আমাকে যেন বল্‌তে লাগ্‌ল:—আমরা কতকগুলি আকার বই

আর কিছুই নয়, আসলে আত্মাই জড়পিণ্ডের পরিচালক।"

"তিরুণামলয়"-মন্দিরের পুরোহিতের কাছে আমার সঙ্কল্পের কথা খুলে বলায়, তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষের ঠিকানা আমাকে বলে দিলেন। সেই সিদ্ধ পুরুষ যোগী এলিফ্যান্টার গুহায় বাস করেন। আমি সেখানে গেলাম, গিয়ে দেখলাম—গুহার দেয়ালে ঠেসান দিয়ে, বাকল বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে, হাঁটু চিবুকে ঠেকিয়ে, হাতের আঙুলগুলো পায়ের উপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। চোখের তারা ওল্টানো—কেবল চোখের সাদা দেখা যাচ্ছে—ঠোঁট অনাবৃত দাঁতকে চেপে আছে। গায়ের চামড়ায় কষ ধরেছে;—চর্ম্ম অস্থিলগ্ন। চুল জটা পাকিয়ে পিছনে ঝুলে আছে। তাঁর দাড়ি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে; গৃধ্রের নখের মতো তাঁর নখ্ বেঁকে ঘুরে গেছে।

ভারতবাসীর মতো তাঁর গায়ের রং স্বভাবত শ্যামবর্ণ, কিন্তু প্রখর সূর্য্যের তাপে কালো পাথরের মত কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম দৃষ্টিতে আমার মনে হ'ল, লোকটা মৃত; বাহু ধরে নাড়া দিতে লাগলাম—মৃগীরোগে যে-রকম হয়—বাহুদুটো শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আমাকে যাতে দীক্ষিত বলে জানতে পারেন, তাই আমার দীক্ষা-মন্ত্র তাঁর কানের কাছে উচ্চৈস্বরে বলতে লাগলাম; কিন্তু তবুও নড়ন-চড়ন নেই, চোখের পাতা একেবারে স্থির নিশ্চল। আমি তাঁকে চাগিয়ে তুলতে না পেরে চলে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একটা অদ্ভুত ফট্-ফট্ শব্দ শুনতে পেলুম; বিদ্যুৎ-আলোর মত একটা নীলাভ স্ফুলিঙ্গ চকিতের ন্যায় আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল; সেই স্ফুলিঙ্গ যোগীর আধ-খোলা ঠোঁটের উপর মুহূর্ত্তকাল সঞ্চরণ ক'রে একেবারেই অন্তর্হিত হল।

ব্রহ্মলোগম্ (এই তাপসের নাম) মনে হল যেন নিদ্রাবস্থা থেকে জেগে উঠ্‌লেন: তাঁর চোখের তারা আবার যথাস্থানে এল; তিনি সদয়ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

"দেখ্, তোর বাসনাপূর্ণ হয়েছে; তুই একটি আত্মাকে দেখতে পেয়েছিস্। আমার ইচ্ছামত আমার আত্মাকে শরীর থেকে আমি বিযুক্ত করতে পারি। জ্যোতির্ম্ময় ভ্রমরের মত এই আত্মা শরীর থেকে বাহির হয়, আবার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, তা কেবল সিদ্ধ পুরুষেরই দৃষ্টিগোচর হয়। আর কেউ দেখ্‌তে পায় না। আমি কত উপবাস করেছি, কত আরাধনা করেছি, কত ধ্যান ধারণা করেছি, কি কঠোর ভাবেই দেহকে শীর্ণ করেছি—তবে আমি আমার আত্মাকে পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পেরেছি এবং অবতার-মূর্ত্তি-গ্রহণের সময় যে রহস্যময় মহামন্ত্র বিষ্ণু-অবতারকে পথপ্রদর্শন করেছিল, সেই মহামন্ত্র বিষ্ণুদেব স্বয়ং আমার নিকট প্রকাশ করেছেন। যদি নির্দ্দিষ্ট মুদ্রাভঙ্গী-সহকারে আমি সেই মন্ত্র উচ্চারণ করি, তাহা হইলে, পশু কিংবা মানুষ, যার শরীরে তোমার আত্মাকে আমি প্রবেশ করতে বল্‌ব তার শরীরেই তোমার আত্মা প্রবেশ ক'রে তাকে সজীব ক'রে তুলবে। এই

পৃথিবীতে আমি ছাড়া এই মন্ত্র আর কেহই জানে না—এই গুপ্তমন্ত্রটি তোমাকেই দিয়ে যাচ্চি—কারণ, বুদ্বুদ যেমন সাগরে মিশিয়ে যায়, আমি সেইরূপ এখন অকৃত অমৃত ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে চাই।” তারপর এই যোগী সিদ্ধপুরুষ, মুমূর্ষুর অন্তিম-শ্বাসের ন্যায় অতি ক্ষীণ স্বরে কতকগুলি শব্দ আবৃত্তি করলেন—সেই শব্দের উচ্চারণে আমার পিঠের উপর দিয়ে যেন একটা মৃদু কম্পনের তরঙ্গ চলে গেল।

অক্টেভ বলিয়া উঠিলেন :—

—এখন আপনি কি বল্‌তে চান ডাক্তার মশায়? আপনার মৎলবটা কি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি নে।

ডাক্তার বলথাজার-শেরবোনো শান্তভাবে উত্তর করিলেন :—আমি তোমাকে এই কথা বল্‌তে চাই —

আমার বন্ধু ব্রহ্মলোগমের মায়া-মন্ত্রটি আমি এখনো ভুলি নাই। কৌণ্ট ওলাফ্-লাবিন্‌স্কার শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট অক্টেভের আত্মাকে যদি কৌণ্টেশ লাবিন্‌স্কা চিন্‌তে পারেন তাহলে বুঝব, কৌণ্টেস্ লাবিন্‌স্কার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি এ জগতে আর কেহই নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলার গীতিকবিতা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ

কবিতা কি? এই প্রশ্নের একটি সহজ উত্তর আছে। সেটি এই যে, কবিতা তাহাই যাহা মানুষের অন্তরে অনির্ব্বচনীয় একটি আনন্দ-সঙ্গীত বাজাইয়া তোলে, অথবা মানুষের অন্তরে যাবতীয় অনুভূতির সূক্ষ্মরসকে ঠিক সচেতন করিয়া তোলে।

আমাদের দেশে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম সেদিন মাত্র হইয়াছে। এই ছন্দের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ তেমন গভীর নহে। যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাহিত্য বিশেষ অনুরাগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন, যে-জাতির সাহিত্য আছে, সে-জাতির সাহিত্যের প্রথম জাগরণ ছন্দের ভিতর হইতে, সঙ্গীতের ভিতর হইতেই হইয়াছে।

সাহিত্যের প্রথম জাগরণের মধ্যে ছন্দ ছিল। মিত্রাক্ষরের ছন্দের মধ্যে যে সঙ্গীত বাজিয়া ওঠে, সে সঙ্গীত মানব-জীবনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবগুলির উপর এমন একটি মধুর বেদনা-ব্যঞ্জক ঘা মারে যাহাতে মানুষ নিজের অন্তরের কতগুলি অনুভূতির পরিচয় চাক্ষুষ উপলব্ধি করিতে পারে। মানুষের প্রকৃতির দুইটি দিক আছে, একটি স্থূল, অপরটি সূক্ষ্ম। বাহিরে প্রকৃতির মধ্যেও আমরা প্রতিনিয়ত দুইটি স্বতন্ত্র দিকের পরিচয় পাই—একটি প্রমত্ত অপরটি অপ্রমত্ত। এই দুইটি দিকের সহিত মানব-প্রকৃতির বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এইজন্য সাহিত্যের মধ্যেও আমরা মানব-প্রকৃতির দুইটি স্তরের পরিচয় পাই।

সাগরের বাহিরের তরঙ্গ-নৃত্যই তাহার এক মাত্র দিক নহে; তাহার অন্তরে যে একটি প্রগাঢ় স্তব্ধতা আছে—সেটিও সাগরের একটি দিক। এই দুই দিক লইয়াই সে সম্পূর্ণ। ঠিক তেমনি মানব-প্রকৃতি তাহার দুইটি দিক লইয়াই সার্থক।

কবিতার মধ্যে যে দুইটি ছন্দের সহিত আমরা পরিচিত অর্থাৎ মিত্রাক্ষর আর অমিত্রাক্ষর, সে দুটি ছন্দ মানব-প্রকৃতির ঐ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সুরের জন্য। কাব্যের মধ্যে মানব-জীবনের বিচিত্র অনুভূতি এবং ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত বিচিত্র ভঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া উঠে, এইজন্য কাব্যের মধ্যে মিত্রাক্ষর আর অমিত্রাক্ষর পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রীর মত তাল মিলাইয়া চলিতে পারে। মারামারি কাটাকাটি হানাহানির মধ্যে যে ভৈরব সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে, সে সঙ্গীতের যোগ্য ছন্দ অমিত্রাক্ষর। জীবনের বিচিত্র লীলাকে বৃহৎ ভাবে, ভাব-ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিবার পক্ষে অমিত্রাক্ষর ছন্দই যোগ্য ছন্দ; কেন না সেখানে বক্তব্যের গতি অবাধ রাখা প্রয়োজন। প্রাণবান বেগকে অনেক দূর পর্য্যন্ত চালানোর প্রয়োজন হইলে সেখানে মিত্রাক্ষর ছন্দ বেখাপ হইয়া পড়ে, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেখানে মিলের নূপুর বাজাইতে গেলে বীর সহস্রবার চেষ্টা করিলেও খাপ হইতে তরবারি বাহির করিতে পারিবে না। মাইকেল যে সুরে তাঁহার কাব্যযন্ত্রটিকে ঠিক করিয়াছিলেন সে সুর প্রমত্ত। মারামারি কাটাকাটির মধ্যেই যে প্রমত্ততা আছে তাহা নহে; পরন্তু, আনন্দ-আবেগেরও একটা দিক বেজায় প্রমত্ত। হো হা করিয়া বিষম হট্টগোলের মধ্যে দেহ-মনকে শ্রান্ত করিয়া ফেলে এমন আনন্দের পরিচয়ও আমরা যে পাইনা তাহা নয়। এ শ্রেণীর আনন্দ-তাণ্ডবের ধ্রুপদে ছন্দের মিত্রাক্ষরের প্রভুত্ব বোধ হয় খুব বেশী চলে।

মিত্রাক্ষরের ছন্দের মধ্যে যে রস উদ্বেলিত হইয়া উঠে—সে রসের ধারা শ্রাবণ-বর্ষার মত অফুরন্ত ভাবে কথার পর কথার কসরৎ করিয়া চলে না—সে রস মানুষের মনে অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াই শান্ত। অর্থাৎ লিরিকের কিম্বা গীতি-কবিতার উদ্দেশ্য, ভাষা ও ছন্দের কসরৎ দেখাইয়া লম্বা পাড়ি মারা নহে। অল্পের মধ্যে দু-একটি কথায় ছন্দের দুইচারিটি ঝঙ্কারে মনের মধ্যে দুএকটি অনির্ব্বচনীয় রসাবেগ সৃষ্টি করাই লিরিকের ধর্ম্ম। গীতি-কবিতার বিশেষত্ব এই যে, তার ছন্দে যে একটি সঙ্গীত আছে তাহা রসে রসে বক্তব্য বিষয়কে অপরিসীম করিয়া তোলে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঝঙ্কার মৃতকে হয়ত বা মত্ততায় জাগাইয়া দিতে পারে, কিন্তু সে ঝঙ্কারে শরৎকালের অন্তর-প্রকৃতির করুণ ব্যথাকে মনের মধ্যে সচেতন করিতে পারে না।

"নীল আকাশের নীরব কথা
শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা"র

যে রস, সে রস অমিত্রাক্ষর ছন্দে সৃজন করা অসম্ভব না হইলেও কঠিন। গীতি-কবিতার ভাবই তার ছন্দকে চালায়, ছন্দ ভাবকে চালায় না। সত্যকার কবি ব্যতীত ঠিক গীতি-কবিতার সুর সৃজন আর কাহারো দ্বারা সম্ভব নয়। মিলের ঝুমঝুমি বাজাইলেই "লিরিক" হয় না। যে গীতি-কবিতার মধ্যে গীতি-প্রাণ নাই, সে গীতি-কবিতা কানের উপর
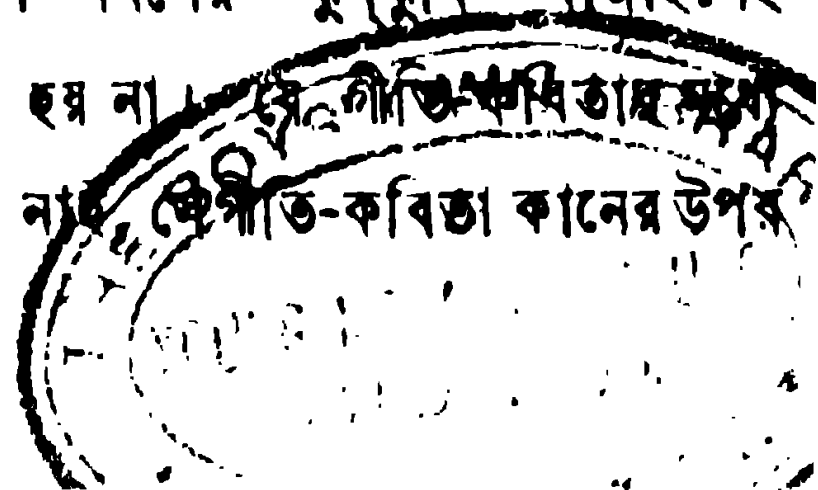
দিয়া শব্দ-ঝঙ্কারের একটা বন্যা বহাইয়া দিলেও সে ঝঙ্কার নিস্ফল, কেননা তা কান পর্য্যন্তই থাকে, প্রাণ পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।

২

গীতি-কবিতার স্বভাব এই যে তাহা ইঙ্গিতেই সঙ্গীতের ঝঙ্কার তোলে এবং ইসারা করিয়াই মানব-চিত্তকে সৌন্দর্য্য-রসের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। তাছাড়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্পর্শী আনন্দ-টুকুকে, যেন ভাব ও ভাষার তুলিকায় চোখের সামনে একেবারে ছবির মত ফুটাইয়া দেয়। সে ছবিতে নানারঙের ছোপ্ থাকে না—থাকে কয়েকটি রেখার, মাত্র কয়েকটি রঙের আল্‌গোছ স্পর্শ। তাই সে বর্ণ, সে রেখা ভোরের শিশিরে-ভেজা জুঁইফুলের মত স্নিগ্ধ এবং কমনীয়। যুক্তি-তর্কের বাঁধন দিয়া বক্তব্য বিষয় কচ্‌লাইয়া ব্যক্ত করা গীতি-কবিতার স্বভাব নহে। সে স্বভাব গদ্যের, তারপরেই মিত্রাক্ষরের। গীতি-কবিতা কতকটা শ্যামের বাঁশির মত। সে তার সঙ্গীতে চিত্তকে একটা ব্যাকুল বেদনায় ঘর-ছাড়া করিয়া জীবনকে আনন্দ-নদীর কিনারে আনিয়া হাজির করে কিন্তু ঠিক জায়গায় পৌঁছায় না। চিত্ত সেই নদীতীরে দাঁড়াইয়া সমস্ত জগৎকে রাধিকার মত বিরহ-বেদনায় ভরাইয়া তোলে।

"আমি জানতেম না যে বাঁশি আমার
বাজবে এমন সুরে,
এমন গানের শিখা উঠবে কেঁপে
প্রাণের গোপন পুরে।"
(একতারা)

প্রাণের ভিতরে সূক্ষ্মভাবে ঘা দিতে মিত্রাক্ষর বিশেষ মজবুত। মানুষের হাসি-কান্নার একটা অনুভূতি অন্তরের অন্তঃস্থলে থাকে—যে অন্তঃপুরে গীতি-কবিতার সুর-নারী ছাড়া অন্যের প্রবেশ নিষেধ। গীতি-কবিতা যে অবগুণ্ঠিতা যুবতী বধূ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবটা তো নজরে পড়ে না, অল্প যেটুকু পড়ে, সেইটুকুই প্রাণের মধ্যে রসাবেগ সৃজন করে। ঘোমটার ফাঁকে ঐ যে একটু নিমেষের সলজ্জ চাহনি সেই চাহনিই যথেষ্ট। ঐ সামান্য চাওয়ার মধ্যেই যে প্রেমিকের অন্তরে পাওয়ার অসীম আনন্দ আন্দোলিত হইয়া ওঠে। মানুষের সঙ্গে গীতি-কবিতার সম্বন্ধ এই রকমের। মনের কথা বিবৃত করিয়া বলিবার পক্ষে হয়ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রশস্ত, কিন্তু গীতি-কবিতা মনের কথা বলে না—মনের ভাবকে ছন্দে বাজায়। এসরাজের তারের ঐ যে সুর, সে ত আর কথা বলে না—জাগায় ভাব। গীতি-কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য ভাব ফুটানো, অর্থ ফুটানো নহে। এইজন্যই প্রেমিকের দরবারে গীতি কবিতার সমাদর এত বেশী। গীতি কবিতার পরতে পরতে ইঙ্গিত, ইসারা, তাই তাহা এত মধুর, এমন মনোরম। বলিয়াছি, গীতি কবিতা অবগুণ্ঠিতা যুবতী। তার অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে আমরা সৌন্দর্য্যের যে কণামাত্র পরিচয় পাই, সেই কণামাত্র পরিচয়েই সে অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-রসের ক্ষুধাকে মনের মধ্যে জাগাইয়া দেয়।

"তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
হৃদয় আমার পাগল হেন
তরী সেই সাগরে ভাসায়
যাহার কূল সে নাহি জানে।"

এই যে অকূলের দিকে ইসারা,—এই ইসারাই গীতি কবিতার ধর্ম্ম; সামান্য

কয়েকটি কথার অসামান্য ভাব-রস অন্তরে সৃজন করে। এই ইঙ্গিতেই মানুষ পাগল, তাই যুবতীর অবগুণ্ঠন আমাদের কাছে এত মধুর, এত সরস। হাজারো কবিতা ঘোমটার উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল তবু ঘোমটার পসার কমিল না, তার মোহ গেল না। খোলাখুলি কথার মধ্যে বোঝাবুঝির সমস্যার সমাধান হয় সত্য, সে ধর্ম্মগ্রন্থের। গীতি কবিতায়—বোঝার চেয়ে কাঁদায় বেশী, মাতায় বেশী, রস অনুভূতির মধ্যে ডুবায় বেশী। বিদ্যাপতির—

"এ-ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর—"

গানে বর্ণনার ঘটা নাই। কয়েকটি মাত্র শব্দ-যোজনা। কয়েকটি শব্দে মানব অন্তরের চিরকালের বিরহকে যেন নব বেদনায় উদ্বেলিত করিয়া দেয়।

"মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া"

এক-একটি পদে, অন্তরের শেষ বেদনাটুকু যেন একেবারে অশ্রুজলে ব্যক্ত। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে, রসানুভূতির সার্থকতা এই-জন্যই, এবং এইজন্যই বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে রসের ঢেউ এত প্রচুর।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

বারোয়ারি উপন্যাস

১৪

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান আপিস থেকে বেরিয়ে বরাবর ধর্ম্মতলার পথ ধোরে হরেন ক্ষিতীশের বাসার দিকে চলেছে, হঠাৎ মনে হলো চাকরির জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়াটা ভারি অন্যায় হয়েছে। একবার সে ফিরে দাঁড়ালো, ভাবলে, যাই ওটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। আবার ভাবলে, দূর হোক্‌-গে ছাই, বিজ্ঞাপনটা না হয় বেরিয়েই গেল, চাকরি নেওয়া না-নেওয়া তো তারই হাতে।

হরেনদের কলেজে একটি সমিতি ছিল; তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ থেকে চাকরি-গ্রহণের প্রবৃত্তি সমূলে নির্ম্মূল করা; হরেন এই সমিতির একজন প্রধান পাণ্ডা। চাকরিতেই যে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করলে, এই মর্ম্মে সে ওজস্বিনী ভাষায় প্রায়ই বক্তৃতা করত এবং প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করেছিল যে প্রাণ গেলেও সে কখনো চাকরি গ্রহণ করবে না। শুধু নিজে স্বাক্ষর নয়, পথে-ঘাটে যেখানে যাকে পেত, তর্ক কোরে বুঝিয়ে, খোসামোদ কোরে ধোরে, তাতেও না হলে ধমক-ধামকে, শেষে ঘুসি-বাগিয়ে এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিত। এমনি কোরে প্রায় হাজারটা স্বাক্ষর সে সংগ্রহ করেছিল। অল্পদিনেই এতখানি কাজ সমিতির কোনো মেম্বর করতে পারেনি—সেই জন্য সমিতির সবাই তাকে বাহবা দিত। এবং হরেনের নিজের মনেও এই নিয়ে খুব-একটা গর্ব্ব ছিল যে তার দ্বারাই সমিতির এবং দেশের অনেক-খানি কাজ অগ্রসর হয়েছে। মনের উদ্বেগে বাবার উপর অভিমান কোরে, সাত-তাড়াতাড়ি

চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়ে আসাতে হরেনের বুকের ভিতরে একটা দারুণ অনুশোচনার কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। সে কি করবে ঠিক করতে না পেরে, চাঁদনির সামনে ফুটপাথে কেবলই এদিক-ওদিক কোরে পায়চারি করতে লাগল। প্রতিজ্ঞাপত্রের দু-একখানা কাগজ তখনো তার বুক-পকেটে ছিল; হরেনের মনে হতে লাগল, সেগুলো যেন তাকে ভ্রূকুটি করছে! সে রেগে পকেট থেকে সেগুলো বার কোরে কুচিকুচি কোরে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলে। তখন তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল সেই সব লোকের মুখ-ভঙ্গী, যারা এই প্রতিজ্ঞাপত্র নিয়ে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তারা বলত, স্বাক্ষর করা সহজ; কিন্তু কার্য্যকালে—। হরেন বাকি কথাটা আর মনে আনবার ধৈর্য্য রাখতে পারলে না। তার মনে হতে লাগল, ঐ কার্য্যকালটাই তার সমস্ত আত্ম-অভিমানকে অপমানে কালো কোরে তুলেছে। প্রথম-প্রয়োজনের কাছেই ত সে হার মেনে গেল! বুদ্ধি, বিচার দিয়ে এখন না-হয় ত্রুটি সংশোধন করা চলে; কিন্তু প্রথম-অভাবেই ভিতরকার প্রেরণা ত তাকে দাসবৃত্তির পথেই ঠেলে নিয়ে ফেল্লে! ধিক্ তাকে!

হাজার বিজ্ঞাপন দিক্, চাকরি সে কিছুতেই করবে না, এ যদিও স্থির, তবু যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনের পাপের মতো চাকরির ইচ্ছার পঙ্কটা তো তাকে গায় মাখতে হল! এতে নিজের উপরে তার ভয়ানক রাগ হতে লাগল;—কেন ঐ প্রতিজ্ঞা-পত্রের কথাটা তার যথাসময়ে মনে হল না? কিন্তু মনে হবে কি কোরে? হরেনের মনটি এম্‌নিভাবে গড়া যে যখন যেটা তার মনের ভিতর ঢুকে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, সেইটি ছাড়া আর-কোনো দিকে তার খেয়াল থাকেনা—খেয়াল সে রাখ্‌তেই পারে না—মন এম্‌নি একবগ্‌গা হয়ে ছোটে। হরেন মনে-মনে খুব জোরের সঙ্গে বল্লে, বিজ্ঞাপন দিয়েছে, বেশ করেছে, লক্ষ টাকা মাইনের চাকরি এলেও সে তা গ্রহণ করবে না! কিন্তু করবে কি? একার টাকা সাড়ে-তেরো-আনা সঙ্গতি নিয়ে ত চিরজীবন চলে না? তা চলে কি, না চলে, কে জানে? হরেনের সেজন্য কোনো দুর্ভাবনা দেখা গেল না। এবং দুর্ভাবনা যে আগেও হয়েছিল, তা ঠিক নয়। বাপকে এবং বাপের টাকাকে অগ্রাহ্য কোরে সে নিজে কি করতে পারে, এরই উত্তেজনায় চাকরি করতে গিয়েছিল। যাক্, চুলোয় যাক্ চাকরি! সে নিজের আত্মমর্য্যাদা সবল কোরে নিয়ে জোরে-জোরে পা ফেলে আবার চল্‌তে লাগল।

১৫

সাম্‌নে শ্যামবাজারের একখানা ট্রাম এসে থামল। হরেনের পা তার অজ্ঞাতে তাকে সেই ট্রামের কাছে ঠেলে নিয়ে গেল। গাড়ির ঠাণ্ডা হাতলটায় আপনা-হতে হাত পড়তেই তার চমক ভাঙলো। ট্রাম লোকে লোকারণ্য। হরেনের মন তখন নির্জ্জনতা খুঁজছিল। সে ট্রাম ছেড়ে আবার ফুটপাথে উঠল। একবার মনে হল, অনেকটা দূর, ট্রামেই যাই। আবার ভাবলে, নাঃ, হেঁটেই চলি। অন্যমনস্কে পা-দুয়েক গেছে, এমন সময় তড়াক্-কোরে ট্রাম থেকে লাফিয়ে কে-একজন একেবারে হরেনের পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—পিছন থেকে

তার জামার ঘাড়টা টেনে চীৎকার কোরে বল্লে—"পালাও কোথায় ?"

হঠাৎ বাধা পড়াতে হরেন থম্‌কে গেল। পিছন থেকে জামার ঘাড়ের কাছটা এমন কক্‌ড়ে কোরে ধরা যে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখ্‌তেই পেলে না, কে তাকে ধরেছে। তার মনে হল, নিশ্চয় কোনো গুণ্ডা। তখন দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাজপথে দু-একটা রাহাজানির কথা খবরের কাগজে মাঝে-মাঝে বার হচ্ছে এবং তাই নিয়ে চারিদিকে আন্দোলন চলেছে। হরেনের মনে হল, এ তারই একটা পুনরাবৃত্তি। গুণ্ডার সঙ্গে ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি তখন তার ছিল না; পুরুষমানুষ হয়ে সাহায্যের জন্যে চীৎকার কোরে পাড়া মাথায় করাটাও তার লজ্জাজনক মনে হতে লাগল। সে পকেট থেকে একান্ন টাকা সাড়ে-তেরো-আনার ব্যাগটা বার কোরে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে—"এই নে! যা!" হরেনের গলার কাপড় যে ব্যক্তি ধরেছিল, সে কাঁপতে-কাঁপতে ব্যাগটা তুলে নিয়ে, সজোরে সেটা ছুঁড়ে হরেনের মুখের উপর মারলে।

আঘাতের ধাঁধাটা চোখ থেকে কেটে গেলে হরেন দেখলে, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অরুণ—রাগে ফুলছে। অরুণকে দেখেই সে আনন্দে এতটা অভিভূত হয়ে পড়ল যে অরুণের সেই ক্রুদ্ধমূর্ত্তির জন্যে কোনো বিস্ময় তার মনে আমোলই পেলে না; ব্যাগটা যে অরুণই ছুঁড়ে মেরেছে, এমন কোনো সংশয়ও তার মনে এল না। সে সাদরে অরুণের দিকে হাত বাড়িয়ে বল্লে—"আরে অরুণ! তুই কখন্‌ কলকাতায় এলি? কার সঙ্গে এলি? আমায় খবর দিস্‌নি কেন? চল্‌, চল্‌!"—এই বোলে, তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্ল। মানিব্যাগটা পথেই পড়ে রইল।

অরুণ যতটা রাগ নিয়ে হরেনকে আক্রমণ করেছিল, হরেনের এই স্নেহের ব্যবহারে তার সবটাই যেন কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে যতগুলো কড়া-কথা শোনাবে বোলে এতদিন ধোরে ঠিক কোরে রেখেছিল, তার একটাও বল্‌তে পারলে না। চিরকালই অরুণ হরেনকে দাদার মতন দেখে এসেছে, ছেলে-বেলা থেকে তার কাছে কত আদর-আব্দার করেছে, তার কাছ থেকে কত স্নেহ, ভালোবাসা পেয়েছে;—এই সমস্ত এতকালের সঞ্চিত স্নেহপ্রীতির আবেগ তার সেই ক্ষণিক উত্তেজনার মূলে প্রবল নাড়া দিতে লাগল। প্রথম যখন ট্রাম থেকে সে দেখে, হরেন গাড়িতে উঠতে-উঠতে উঠল না, তখন তার মনে সন্দেহ হয়েছিল যে হরেন তাকে দেখেই পালাচ্ছে, তাই সে বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে তার গলা ধরেছিল; তার পর যখন হরেন তার দিকে ব্যাগটা ফেলে দিলে, তখন তার মনে হল, হরেন তাদের যা ক্ষতি করেছে, তারই মূল্যস্বরূপ যেন এই টাকা ধোরে দিচ্ছে; তাই অপমানে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই টাকার ব্যাগ সে হরেনের মুখে ছুঁড়ে মেরেছিল। কিন্তু এখন তার মুখের দিকে চেয়ে অরুণের মনে হতে লাগল, এ সেই হরেন-দাদা,—সেই চিরদিনের হরেন-দা! হরেনের বাহুস্পর্শে সমস্ত উত্তাপের জ্বালা যেন তার জুড়িয়ে গেল। মনে হল, গ্রামের সেই কুৎসা-গ্লানি স্কুলের সম-পাঠীর বিদ্রূপ, মা-বাপের মর্ম্মান্তিক শোক—সে সমস্তই

মিথ্যা, মায়া! হরেনদাদা তাদের চিরদিনের মিত্র ;—শত্রু নয়।

অরুণ খুব সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করলে—"দিদি কোথায়, জানো হরেন দাদা ?"

হরেন সোৎসাহে বল্লে—"আরে, সেইখানেই ত তোকে নিয়ে যাচ্ছি।"

অরুণের মনটা আবার খট্‌-কোরে বেঁকে দাঁড়ালো। তবে তো মিথ্যা নয়—গ্রামের সমস্ত কুৎসা তবে ত সত্যি! সে চল্‌তে-চল্‌তে থেমে পড়ল। হরেন বল্লে—"থাম্‌লি কেনরে ?"

অরুণ উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ গলার মধ্যে চেপে ঘাড়-বাঁকিয়ে বল্লে—"তা হলে সত্যিই তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করেছ !"

হরেন বিস্মিত হয়ে বল্লে—"সর্ব্বনাশ ?"

অরুণের মনে হল, যেন হরেন বল্‌তে চায়—এ আর সর্ব্বনাশ কি! এতবড় গুরুতর ব্যাপারকে হরেন এমন তাচ্ছিল্য করছে ভেবে অরুণের বিষম রাগ হতে লাগল। সে সজোরে হরেনের হাত ছাড়িয়ে বল্লে—"সর্ব্বনাশ নয়ত কি ? পরের বিবাহিত মেয়েকে—" অরুণ কথাটা শেষ করতে পারলে না।

হরেন আরো বিস্মিত হয়ে বল্লে—"পরের বিবাহিত মেয়েকে কি করেছি ?"

"কি করেছ আবার জিগ্‌গেস্ করছ ?"

অরুণের ঐ কথার সুরে কেমন-একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক যেন হরেনের বুকের মধ্যে ধীরে-ধীরে জমা হতে লাগল। সে বল্লে—"অরুণ, তোমার কথা আমি ভালো বুঝতে পারছি না।"

অরুণ হরেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। সে মুখ সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক ; তার মধ্যে প্রতারণা, অবিশ্বাসের ছায়ামাত্র নেই। সেই মুখে পানে চেয়ে অরুণের কেমন ধাঁধা লাগে লাগল।

হরেন অধীর হয়ে বল্লে—"চুপ কো রৈলি কেন ? বল্‌, কি বল্‌ছিলি!"

অরুণ কি-কোরে কথাটা বলবে ঠি করতে না পেরে খানিকটা আম্‌তা-আম্‌ করতে লাগল। শেষে একনিশ্বাসে বোলে ফে—"তুমি আমার দিদিকে লুকিয়ে রেখেছ ?"

হরেন খুব-একটা বিস্ময়ের সঙ্গে বল্লে-"তোমার দিদিকে আমি লুকিয়ে রেখেছি লুকিয়ে রাখতে যাব কেন ?"

অরুণের মনে হল যেন হরেন কথা প্যাঁচ দিয়ে ব্যাপারটা চাপা দিচ্চে। সে বলছে লুকিয়ে রাখবো কেন ? অর্থাৎ...কি বো জিজ্ঞাসা করলে হরেন আর ফাঁকির পথ পা না, অরুণ অনেকক্ষণ ভেবেও তা ঠিক কর পারলে না। সে খানিকটা থেমে বল্লে-"তবে দিদি কোথায় ?"

হরেন বল্লে—"তোমার দিদি আছে ক্ষিতীশবাবুর বাসায়।"

অরুণ অবাক হয়ে বল্লে—"ক্ষিতীশবাবু সে কে ?"

"যিনি তোমার দিদির প্রাণ রক্ষ করেছেন।"

"প্রাণ রক্ষা ?"

"হ্যাঁ, তোমার দিদি ভিড়ের চাপে ভি গিয়ে রাস্তায় পড়েছিলেন, ক্ষিতীশবাবু তাঁ তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচান্।"

অরুণ আশঙ্কা-রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক—"দিদি ভালো আছে ত ?"

"হ্যাঁ।"

অরুণের চোখের সাম্‌নে থেকে যেন একটা প্রকাণ্ড কুয়াশা কেটে গেল। তার সেই বালক-হৃদয়ের মধ্যে তখন কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কোনো প্রশ্ন আর রইল না। সে দিদিকে দেখবার জন্যে অধীর হয়ে হরেনের হাত টানতে-টানতে বোলে উঠল—"চল, শীগ্‌গির কোরে চল—দিদিকে দেখব!"

হরেন অন্যমনস্কে বল্লে—"চল।" তার মনের মধ্যে সেই অজ্ঞাত আতঙ্কটা যেন ক্রমেই আরো জমাট বাঁধছিল। সে তারই দিকে চেয়ে-চেয়ে ভিতরে-ভিতরে কেমন অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল।

অরুণ যেতে-যেতে বল্লে—"হরেন-দাদা, তোমাদের ঐ শশী মুখুজ্জেটা কি পাজি!"

হরেন কথাটার উপর কোনো মনোযোগ না দিয়েই বল্লে—"কেন, সে আবার কি করলে?"

"সেই তো তোমার নামে আর দিদির নামে যত কুৎসা রটিয়েছে।"

হঠাৎ কেমনতর-একটা ধাক্কা হরেনের বুকে এসে লাগল। সে কিছুই বুঝতে না পেরে বল্লে—"কি কুৎসা?"

"সেই তো রটিয়েছে যে তুমিই দিদিকে সরিয়ে রেখেছ। আগে থাকতে তোমাদের সব ঠিক্‌ঠাক্ ছিল।"

হরেনের সমস্ত শরীর রাগে জ্বলে উঠল। সে বলে উঠল—"পাজি নচ্ছার! তাকে আমি দেখে নেব!"

হরেন খুবই রেগে উঠেছিল বটে, কিন্তু সেই রাগের ঝাঁঝ বেশীক্ষণ রইল না। তার সেই ভিতরকার অজ্ঞাত-আতঙ্কের অন্ধকারে সেটা যেন কেমন তলিয়ে যেতে লাগল।

কমলা এতদিন বাড়ী-ছাড়া—নিরুদ্দেশ; এ নিয়ে একটা বিষম গোল হবে, এ দুর্ভাবনা তার ছিল; আবার সময়-সময় আশা হতো হয়ত কোনো গোল নাও হতে পারে; কিন্তু সে যে ষড়্-কোরে কমলাকে কুলের বার করেছে, এত বড় অপবাদ রাষ্ট্র হবে—এ কথা সে ভাবতেও পারে নি। কোথায় ছিল কমলা, আর কোথায় ছিল সে—কতদিন তাদের ছাড়াছাড়ি! এর মধ্যে পরামর্শ হলই বা কখন্ এবং কেমন কোরেই বা হল? এর কোনো সাক্ষীসাবুদ না পেয়েই লোকে যে কেমন-কোরে এই কুৎসা রটালে সে তা বুঝতে পারছিল না। সে ভাবছিল, এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে? সে জিজ্ঞাসা করলে—

"অরুণ, এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করেছে?"

"করেছে বৈ কি!"

"কে করেছে?"

"সকলেই!"

"বাবা করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"মা?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার বাবা-মা?"

"তাঁরাও।"

"তুমি?"

"করেছিলুম বৈ কি। না, না, প্রথমটা করিনি! সবাই যখন বলতে লাগল, ঠাট্টা করতে লাগল, তখন বিশ্বাস না কোরে করি কি হরেন-দা?"

হরেন আর কিছু বল্লে না, কেবল তার

বুকের গভীরতা থেকে একটা দীর্ঘ হুঁ-শব্দ বার হল মাত্র। তার সমস্ত মন একটা প্রকাণ্ড অভিমানে ভরে উঠল। বাপ-মা থেকে আরম্ভ কোরে পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই তাকে এমন হীন ভাবতে পারলে মনে কোরে সমস্ত পৃথিবীর উপর যেন একটা বিতৃষ্ণা জেগে উঠল। সে কী করেছে—তার চরিত্রে, ব্যবহারে লোকে এমন কী পেয়েছে, যাতে এতবড়-একটা কলঙ্ক তার বুকের উপর দাগ্‌তে কেউ একটু ইতস্তত করলে না? তাকে একবার কেউ জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করলে না! একটা পরীক্ষা কর্‌লে না যে এ সত্য, কি মিথ্যা! একেবারে বিচারের রায় বেরিয়ে গেল!—তার মনে হল, জগতে কেউ তার মরমী বন্ধু, মুখ-চাইবার আপনার জন নেই। বাপ-মা পর্য্যন্ত না। এই জন্যই সে মায়ের কাছ থেকে এতদিন ধোরে কোনো চিঠি পাচ্ছে না, এই জন্যেই, বাবা এসে রেগে বাসা উঠিয়ে তাকে তাচ্ছিল্য কোরে চলে গেছেন!

হরেন জিজ্ঞাসা করলে—"বাবা কি বলছেন?"

অরুণ বল্লে—"শুনচি তিনি আপনাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন।"

হরেন আপনার মনে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"বেশ! বেশ!"

অরুণ পথে যেতে-যেতে বকর্‌-বকর্‌ কোরে কত কথাই বলছিল, তার কোনোটাই হরেনের কানে যাচ্ছিল না, কোনো কিছুই তার মনকে আকর্ষণ করছিল না—সে যেন পৃথিবীর মাটিতে পা না দিয়েই চলে যাচ্ছিল।

নিজের কথা ভাবতে-ভাবতে হরেনের মনে এল কমলার কথা। হরেন বল্লে—"অরুণ, কমলাকে সবাই কি বলছে?"

অরুণ বল্লে—"দিদির নিন্দেয় তো দেশে কান পাতবার যো নেই—তাই তো আমি গ্রাম ছেড়ে, বাবা-মাকে না বোলে পালিয়ে এসেছি—তোমাকে ধরবার জন্যে।"

"তোমার বাবা-মা কি বলছেন?"

"তাঁরা বল্‌ছেন—"কম্‌লিটা যদি মর্‌ত, তাহলে আমাদের এত দুঃখু হত না।"

এই বাপ-মা! কমলা এমন কি করেছে যে তার বাপ-মাও মেয়ের মৃত্যুকে বরণীয় মনে করলে? কমলারও তবে ইহ-সংসারে কেউ নেই! তারও অবস্থা, তার নিজেরই মতন। হরেনের মনে হচ্ছিল, এক রশিতে দুজনকে বেঁধে পৃথিবীর লোক যেন অগাধ সমুদ্রে তাদের ফেলে দিয়েছে! আহা, বেচারা কমলা! কমলার কথা ভাবতে-ভাবতে হরেনের হৃদয় আকুল হয়ে উঠতে লাগল। সে ব্যস্ত হয়ে বোলে উঠল—"তবে কমলার কি হবে ভাই অরুণ?"

অরুণ নিজের মনের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেয়ে ভারি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। সে বল্লে—"হবে আবার কি! যখন কানে ধোরে প্রমাণ কোরে দেব যে সমস্ত কুৎসা মিথ্যা, তখন লোকের মুখে জুতো পড়বে না!"

হরেনের মনে হল, এ কথা এই বালক-হৃদয়ের উৎসাহ নিয়ে সেও যদি বলতে পারত, তাহলে বেঁচে যেত! হায় প্রমাণ! এ সংসারে প্রমাণের অপেক্ষা কে রাখে? এত বড় কলঙ্ক যারা তাদের কপালে এঁকে দিতে পেরেছে, তারা সেই কলঙ্ক দেবার

সময় কি প্রমাণের অপেক্ষা করেছিল? কি প্রমাণ? কোথায় প্রমাণ? প্রমাণ যদি বলবান, তবে এতখানি অবিচার তাদের উপর হলো কেমন কোরে? যে-প্রমাণ মানুষের এতদূর অবজ্ঞেয়, সেই প্রমাণের ভরসায় তারা মুক্ত হবে? বাতুলতা! কমলা সহরের রাস্তায় মূর্চ্ছিত হয়েছিল, এক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তার প্রাণ রক্ষা কোরে, নিজের বাড়িতে রেখেছে, এ কথা কি এখন তারা মানতে চাইবে –মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আনন্দ করা যাদের ব্যবসা?

তবে কমলার কি হবে? হরেনের মনের ভিতর এই কথাটা একটা করুণ আর্ত্তনাদ কোরে ফিরতে লাগল। সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিল না যে, কমলা বিনা-দোষে বাপ্-মায়ের কাছ থেকে পরিত্যক্ত হবে। সে অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"অরুণ, তোমার বাবা-মা কি কমলাকে এখন বাড়িতে ফিরিয়ে নেবেন?"

অরুণ চোখ-মুখ পাকিয়ে বল্লে—"কেন নেবেন না?"

কেন নেবেন না?—এ কথার জবাব যে কতখানি জটিল, হরেন তা কেমন-কোরে এই ছেলেমানুষকে বোঝাবে? বাপ-মায়ের হৃদয়ের উষ্ণ রক্তও যে পাষাণের মতো কঠিন শীতল হয়ে আসতে পারে, এ কথা হরেন মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করলেও, অরুণকে তা বোঝাবার চেষ্টা করলে না। সে নিজের মনের কাৎরানি শুনতে-শুনতে পথ চলতে লাগল।

যখন প্রায় ক্ষিতীশের দরজার গোড়ায় এসেছে, তখন যেন হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে উঠে হরেন জিজ্ঞাসা কল্লে—"অরুণ, সতীশবাবুর খবর কিছু জানো?"

সতীশবাবুর কথা উঠতেই অরুণের অতখানি উৎসাহ কেমন যেন দমে গেল; তার উজ্জ্বল মুখের উপর একটা কালো ছায়া এসে পড়ল। সে ধীরে-ধীরে বল্লে—"জানি।"

হরেন বল্লে—"সে সব শুনেছে?"

"শুনেছে।"

"বিশ্বাস করেছে?"

"বোধ হয়।"

"বোধ হয় কেন?"

"না, বোধ হয় নয়; ঠিকই বিশ্বাস করেছে।"

"কি কোরে জানলে, বিশ্বাস করেছে?"

"শুনলুম তার নাকি আবার বিয়ে হচ্ছে।"

"বেশ!"—বোলে হরেন যেন সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপর একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিলে।

১৬

ক্ষিতীশের বাসায় ঢুকতেই ক্ষিতীশ, অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"এত দেরী হল যে হরেনবাবু? উনি আপনার জন্যে ভারি ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

হরেন গম্ভীরভাবে বল্লে—"কে, কমলা?"

ক্ষিতীশ অরুণের মুখের দিকে একটা সন্দেহের সঙ্গে চেয়ে বল্লে—"হ্যাঁ।"

এই আগন্তুকটি কে? তাই জানবার জন্যে ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে হরেনের মুখের দিকে চাইলে। পূর্ব্বের মতো গম্ভীরভাবেই হরেন বল্লে—"ও আমাদের অরুণ।" যেন তাইতেই

তার সব পরিচয় দেওয়া হয়ে গেল! ক্ষিতীশ অবাক হয়ে হরেনের মুখের দিকে চেয়ে রইল—আরো-কিছু বিশদভাবে শুনতে; কিন্তু হরেনের মুখ থেকে উত্তরের কোনো আভাষ পাওয়া গেল না। মৈত্রমহাশয়ের খবর কমলাকে দেবার জন্যে ক্ষিতীশ ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এই অপরিচিতের সামনে কমলা-সম্বন্ধে কোনো কথা উত্থাপন করাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছিল না।

ওদিকে কমলা হরেনের জন্যে সেই বিকেল থেকে ঘর-আর-বার করছিল। যতই দেরী হচ্ছিল, ততই তার উৎকণ্ঠার সঙ্গে একটা ভয় বেড়ে উঠছিল। স্বামীর দেখা না পেয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে আসাটা যেন শুভ লক্ষণ নয়—এই রকম একটা শঙ্কা কেবলই তাকে উৎপীড়িত করছিল। এই যে একটা অশুভ সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো—তার কঠোর মূর্ত্তি নিয়ে, এ যে কি কোরে তবে ছাড়বে, তা কে বল্‌তে পারে! এতদিন কমলার মনে কোনো দুর্ভাবনা শিকড় গেড়ে বসতে পারে নি। আজ না হয় কাল, বাপ-মায়ের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে দেখা হবেই—এই আশার উত্তেজনায় তার দিন কাটছিল। স্বামীর দেখা না পেয়ে ফিরে আসার নৈরাশ্য তাকে এই প্রথম ধাক্কা দিলে। সেই থেকে কেবলই তার মনে হচ্ছে যেন কোথায় কি-একটা ভয়ানক-কিছু তালগোল পাকিয়ে উঠছে। বাড়িতে ফিরে যাওয়া প্রথমে যত সহজ মনে হয়েছিল, ততটা সহজ বুঝি নয়;—যেন সে একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেছে, তা থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা শক্ত! কি হবে? কে জানে?—এই রকম একটা অনিশ্চিতের আশঙ্কা ক্রমাগতই তার বুকের উপর আঘাত দিচ্ছিল। সেই জন্য একটা-কিছু ভালো নিশ্চিত খবর পাবার জন্যে সে ছট্‌ফট্‌ কোরে বেড়াচ্ছিল। হরেনের যতই দেরি হচ্ছিল, ততই সে আরো উতলা হয়ে উঠছিল ঘর থেকে কেবলই ছুটে-ছুটে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াচ্ছিল। এতক্ষণে নীচে হরেনের গলা পেয়ে সে দুর্‌দুর্‌ কোরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বৈঠকখানা-ঘরের পাশটিতে চুপ-কোরে দাঁড়ালো। তারপর যেই অরুণের নাম শুনলে অমনি ঝড়ের মতো ছুটে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কমলাকে হঠাৎ দেখে ক্ষিতীশ চম্‌কে উঠল। বালক হলেও অপরিচিতের সাম্‌নে এমন কোরে আসাটা ঠিক হলোনা। সে অরুণের হাত ধোরে তাকে পাশের ঘরের দিকে ঠেলে দিতে যাচ্ছে, এমন সময় অরুণ চেঁচিয়ে উঠল—"দিদি!" কমলার মনের আবেগ এতটা বেড়ে উঠেছিল যে সে কোনো কথাই কইতে পারলে না—সে এগিয়ে এসে শুধু অরুণের হাতখানি ধরলে। তার পর ভাই-বোনে দুজনে মুখোমুখি খানিক চেয়ে রইল। কমলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ধীরে-ধীরে বল্লে—"ভাই অরুণ, এসেছিস?" অরুণ শুধু বল্লে—"দিদি!"

কমলা চমক-ভেঙে বল্লে—"অরুণ, ক্ষিতীশ দাদাকে প্রণাম কর।" অরুণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ক্ষিতীশের মুখের পানে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল; তারপর প্রণাম করলে। অরুণের মনে হল, এই ত তার দিদি, সেই দিদিই আছে—কৈ কিছুই ত বদল হয়নি! তবে! হরেন চুপ-কোরে চেয়ে ভাই-বোনের এই

মিলনের আনন্দ দেখছিল। আর তার মনে হচ্ছিল, এই কঠোর সংসার-মরুভূমে এমনি-তর স্নেহের নির্ঝর যদি তার একটি থাকত!

কমলা বাপ-মায়ের কুশল জিজ্ঞাসা কোরে অরুণের হাত ধোরে তাকে উপরে নিয়ে গেল। যেতে-যেতে অরুণের মনে হতে লাগল, এই ঘর, এই বাড়ি, এই ক্ষিতীশদাদা, হরেনদাদা, এদের আশপাশ সমস্ত কেমন-একটি শুভ্র শুচিতায় ভরা। এর সমস্তখানি যেন হৃদয়ের প্রীতি দিয়ে মাখানো; কোথাও যেন কোনো মলিনতা, নিষ্ঠুরতা নেই। লোকের টিট্‌কারি আর নিন্দা শুনে-শুনে তার মনে কেমন সন্দেহ হয়েছিল যে দিদি যেখানে আছে, সে স্থানটা বুঝি নরক। আজ এই পবিত্রতার মধ্যে দিদিকে অধিষ্ঠিত দেখে তার মনের সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে হৃদয় নির্ম্মল আনন্দে ভরে উঠল।

বাড়িতে নতুন অতিথি, রাত্রিও হয়েছে, তার উপর কমলার আজ আনন্দের দিন! ক্ষিতীশ বড়-গোছের একটা ভোজের আয়োজন করতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার মনে হচ্ছিল—হায়, কমলা এইবার চলে যাবে! নিশ্চয়! তিন দিন পুজোর পর বিজয়ার দিন পুজো-বাড়িটা যেমন খাঁ-খাঁ করে, তার মনের ভিতরে তেমনিতর একটা শূন্যতার আভাষ জেগে উঠছিল। এই বাড়ি-ঘর, এই আসবাব-পত্র, নিজের হাতে টাঙানো ছবি, নিজের হাতে সাজানো লাইব্রেরী—এ সবই যেন কেমন মিছে মনে হতে লাগল। কমলা চলে যাচ্ছে [illegible] ফিরিয়ে নিয়ে।

যদি সে পারত তাহলে রূপকথার দৈত্যের মতো এই কমলাকে সকলকার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে চলে যেত—সে কোন্ অজানা নিরালা গুহার মধ্যে!

হরেন একা চুপটি কোরে সেই ঘরে বসেছিল। তার আহত হৃদয় ক্রমেই অভিমানে ভরে উঠছিল। এ অভিমান শুধু বাপ-মায়ের উপর নয়—এ অভিমান জগৎ, সংসার, সমাজ, সবার উপর! যতই এ অভিমান বাড়ছিল, ততই একটা বিতৃষ্ণা তার সমস্ত মনকে তেতো কোরে তুলছিল। সে মনে-মনে বলছিল, কিছু চাইনা, কাউকে চাইনা! কিন্তু কমলা? তার মনে হতে লাগল, এই কমলাকে যেন নিয়তি তার বুকের উপরে আছড়ে এনে ফেলেছে! এই কমলা, ছেলে-বেলাকার সেই কমলা! দিন-রাত যার সঙ্গে খেলাধূলো, মান-অভিমান, হাসি-কান্নায় কেটেছে। কেমন কোরে ক'দিনের জন্যে এ কমলা তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, কে জানে? আবার কমলা ফিরে এসেছে। কোথা থেকে, কি কোরে এল, কিছুই জানিনা—শুধু দেখছি, সে এসেছে! সকলকার কাছ থেকে পরিত্যক্ত হয়ে সে আমার কাছে ফিরে এসেছে। কে যেন সংসার থেকে তাকে ছিঁড়ে এনে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেল। তার আর কে আছে? কেউ নেই। বাপ-মা নয়, স্বামী নয়;—কেউ তাকে গ্রহণ করবে না। সে অনাথ, সে আশ্রয়-ভিখারী।—সে আমার কমলা! হরেন যতই ভাবতে লাগল ততই আশঙ্কা হতে লাগল যে কেমন কোরে নিয়তির অজ্ঞাতে তারা দুজনে একই দড়িতে বাঁধা পড়ে পাশা-

পাশি এসে দাঁড়াল। এ যেন প্রলয়ের পর কেবলমাত্র দুটি প্রণয়ীর চারিদিক-জলে-ঘেরা একটুকরো ডাঙায় মুখোমুখি চেয়ে থাকা! হরেন বসে-বসে স্বপ্ন দেখতে লাগল।

১৭

অরুণকে পেয়ে কমলার মনে হতে লাগল. যেন তার সাম্‌নের দুর্দ্দিন-দুর্ভাবনাগুলোর অস্তিত্ব আর নেই; যেন সেই ঘুর্ণাবর্ত্ত থেকে সে বেরিয়ে এসেছে। অরুণ নিজের মনের স্ফূর্ত্তি দিয়ে কমলার সমস্ত আশঙ্কা মুছে দিয়েছিল; এবং যেটা আসল ভয়ের কথা, সে-ভয়টার আগাগোড়াই যখন মিথ্যা, তখন সে-সম্বন্ধে অরুণের মনে কোনো খোঁচ্ না থাকাতে, সে-কথা দিদির কাছে সে আর উত্থাপনই করেনি। অরুণের হাবে-ভাবে কথাবার্ত্তায় কমলা এমন একটা আশ্বাসলাভ করলে যে তারও মনে যেন আর কোনো আশঙ্কা রইল না। সে মনের উল্লাসে গঙ্গাস্নান করতে আসার পর থেকে যত ঘটনা ঘটেছিল, একে-একে অরুণকে বল্‌তে লাগল। এর অধিকাংশই ক্ষিতীশের কথা। তার স্নেহ, তার যত্ন, তার আদর যে কমলার মনের এতখানিটা অধিকার কোরে বসে আছে, অরুণকে বল্‌তে গিয়ে কমলা তা এই প্রথম টের পেলে। কমলা এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্ষিতীশের কথা বল্‌ছিল যে শুন্‌তে-শুন্‌তে অরুণের মনও ক্ষিতীশের প্রতি একটা প্রগাঢ় প্রীতিতে ভরে উঠতে লাগল। কমলা বল্লে—"এতদিন পরের বাড়িতে আছি, কিন্তু একদিনের তরেও মনে হয়নি যে এ পরের বাড়ি! সত্যি বলচি ভাই অরুণ, এই ক্ষিতীশদাদা নিশ্চয় কেউ আমাদের আপনার লোক!"

অরুণ কি বল্‌বে খুঁজে না পেয়ে বোলে উঠল—"ক্ষিতীশবাবু সত্যিই বড় ভালো লোক!"

কমলা বল্লে—"শুধু ভালো লোক নয়—ভালো লোক তো ঢের আছে, কিন্তু আপনার লোক পৃথিবীতে কটা পাওয়া যায় ভাই?"

অরুণ বল্লে—"তা তো বটেই! দেখ না, নিজের কাজকর্ম্ম ফেলে তোমার জন্যে কি না করেছেন! তোমায় ঘাড়ে কোরে বিদেশ পর্য্যন্ত ঘুরে এলেন! কিন্তু ভাই-দিদি, হরেনদাদাও তোমার জন্যে অনেক করেছেন বল্‌তে হবে!"

কমলা বল্লে—"আরে, হরেনদাদা ছিল কোথায়! তাকে ত ক্ষিতীশবাবুই খুঁজে-পেতে আনলেন!"

অরুণের মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল, সে বল্লে—"তা বোলে হরেনদাও তো কম করেনি!"

কমলা বল্লে—"হরেন-দাদা তো কর্ব্বেই! সে হল আমাদের গ্রামের লোক—আপনার লোক বল্লেই চলে;—সে করবে না তো করবে কে? কিন্তু অজানা অচেনা এই ক্ষিতীশবাবু—"

অরুণ বল্লে—"তা বটে! ক্ষিতীশবাবুকে দেখে অবধি আমারও তাই মনে হয়—"

কমলা বল্লে—"সেই জন্যেই ত ওঁকে আমি ক্ষিতীশ-দা বলে ডাকি।"

অরুণ বল্লে—"আমিও এখন থেকে ক্ষিতীশদাদা বলব!"

কমলার খট্‌-কোরে মনে হল,—এখন থেকে বটে, কিন্তু আর কতদিন? একটা কি দুটো দিন বৈ তো নয়। তারপর এই ক্ষিতীশ-

দাদা থাকবেন কোথায়, আর আমি থাকব কোথায়? ক্ষিতীশদাদা নানা কাজে হয়তো আমায় ভুলে যাবেন, কিন্তু আমি ভুলতে পারব না। সেই বিদেশে—যেখানে আপনার লোক বেশী নেই—সেই খোট্টার দেশে প্রতি-অবসরে আমার মনে পড়বে এই ক্ষিতীশদাদাকে! এঁকে দেখবার জন্যে কত মন-কেমন করবে কিন্তু দেখতে পাব না;—হয় ত ইহজন্মেই আর পাব না! কেবল থেকে-থেকে মনে পড়বে এই কটা দিনের স্মৃতি; শুধু মনের সম্বল হয়ে থাকবে এই কটা দিনের ক্ষিতীশ-দাদা! ভাবতে-ভাবতে কমলার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠল। চোখে জল এল।

খাবার জায়গা হয়েছে বোলে অরুণকে ডাকতে এসে ক্ষিতীশ দেখলে, কমলার দু-চোখে দু-ফোঁটা জল—মুক্তোর মতো টল্‌টল্ করছে। কমলা এ-বাড়িতে এসে অবধি কখনো কেঁদেছে কি-না ক্ষিতীশ জানেনা, সে কোনো দিন তার চোখে জল দেখেনি। এই সে প্রথম দেখলে। কান্না দেখলে মানুষের মনে দুঃখ হয়, কিন্তু কি-জানি-কেন ক্ষিতীশের মনে হতে লাগল—কি সুন্দর ঐ দুফোঁটা জল! যদি ঐ দু-চোখের দুটি ফোঁটা সে পায়, সাত-রাজার ধন মাণিকের মতো সোনার কৌটোয় লুকিয়ে রাখে—চিরদিন, চিরজীবন! তার মনে হল, জীবনের সমস্ত ক্ষতি যেন এই দুফোঁটা চোখের জল পূরণ কোরে দিতে পারে!

চোখের জল ঝরে পড়ে গেল, তবু ক্ষিতীশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই চোখের পানে চেয়ে রইল। কমলা চমক-ভেঙে বলে উঠল—"এই যে ক্ষিতীশদাদা!" কিন্তু ক্ষিতীশের চমক ভাঙল না। তার সেই অপলক চোখের দিকে চেয়ে কমলার মনে হতে লাগল, কে যেন তার মনের অন্ধকারটা হাৎড়ে-হাৎড়ে দেখছে—এখানকার জিনিস ওখানে ওলোট-পালোট কোরে! তাইতে সে ভিতরে-ভিতরে ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল—তাড়াতাড়ি উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

হরেন ও অরুণ খেতে বসলো। কমলা বল্লে—"ক্ষিতীশদাদা, তুমি বসলে না যে?"

ক্ষিতীশ বল্লে—"আগে ওঁদের হোক। ওঁরা হলেন অতিথি!"

কমলা বল্লে—"অতিথি-টতিথি এখানে কেউ নেই—সবই আপনার লোক! তুমি বোসো।"

ক্ষিতীশ বল্লে—"আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই কমলা!"

ক্ষিতীশ বল্লে বটে, ব্যস্ত হবার দরকার নেই, কিন্তু কমলা অনুভব করলে আজ নিজের হাতে পরিবেষণ কোরে ক্ষিতীশদাদাকে খাওয়াবার জন্যে তার সমস্ত হৃদয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে বল্লে—"না ক্ষিতীশদাদা, সে হবেনা, তোমাকে বসতেই হবে।"

ক্ষিতীশ বল্লে—"আমার জন্যে তোমার এত ভাবনা কেন কমলা? আমি লক্ষ্মীছাড়াটা তো যেখানে-সেখানে যখন-তখন যা-পাই খাই।"

কমলা বল্লে—"আজ তা হবে না। আজ আমি তোমায় নিজের হাতে পরিবেষণ কোরে খাওয়াবো।"

ক্ষিতীশ বিস্মিত হয়ে একবার কমলার মুখের দিকে চাইলে, তারপর বল্লে—"আজ তোমার এ খেয়াল চাপলো যে?"

কমলা একটা ব্যথাভরা সুরে

"দাদা, আর তো তোমায় কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পাব না!" বলতে-বলতে তার গলার স্বর ধোরে-আসতে লাগল। গলাটা পরিষ্কার কোরে নিয়ে সে বোলে উঠল—"কাল যে আমি চলে যাচ্ছি।"

হরেন এতক্ষণ চুপ কোরে ছিল, সে গম্ভীর ভাবে বল্লে—"কোথায়?"

কমলা বল্লে—"কালীগ্রামে!"

হরেন বল্লে—"কার সঙ্গে?"

—"অরুণের সঙ্গে। তুমিও চলনা, হরেন-দাদা!"

হরেন সংক্ষেপে কিন্তু খুব-একটা দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লে—"না!"

কমলা বল্লে—"তোমার যদি পড়ার ক্ষতি হবে মনে কর, তাহলে না-হয় আমি একা অরুণের সঙ্গে যাই।"

হরেন বল্লে—"না!" এই না-শব্দটা এমন-একটা গভীর গম্ভীর সুরে সজোর ধাক্কার মতো বেজে উঠল যে কমলা অনেকক্ষণ কোনো কথা কইতে পারলে না।

হরেন যে তার বাড়ি ফিরে যাওয়ায় কোনো আপত্তি করবে, কমলা কখনো তা স্বপ্নেও ভাবেনি। কেন যে করছে তাও সে ঠিক বুঝতে পারলে না; সে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"বারণ করছ কেন হরেনদাদা?"

হরেন কোনো উত্তর দিলে না। কমলার কেমন ভয় হতে লাগল। সে এবার হরেনের কাছে এগিয়ে গিয়ে আবদারের সুরে বল্লে—"কেন হরেনদাদা বারণ করছ ভাই?" তার মনে হচ্ছিল, কোনো-রকমে এখনই হরেনের কাছ থেকে যাবার সম্মতি না নিতে পারলে যেন তার নিস্তার নেই!

হরেন বল্লে—"না। তোমার যাওয়া হতে পারে না।"

অরুণ ও কমলা দুজনেই আশ্চর্য্য হয়ে হরেনের মুখের পানে চেয়ে রইল। তাদের মনে হল, হরেন যেন এমন-একটা জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে সে হুকুম করবে, তাদের মানতে হবে! কমলার একবার প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা হল, কিন্তু তার উপযুক্ত বল সে মনের ভিতর থেকে সংগ্রহ কোরে উঠতে পারলে না। তখন সে আর-একবার আব্দারের সুর ধরলে, কিন্তু হরেনের মুখের দিকে চেয়ে বেশী অগ্রসর হতে পারলে না। সে কি করবে ঠিক করতে না পেরে হরেনের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখতে লাগল। চেয়ে-চেয়ে বুঝতে পারলে হরেনের ভিতরটা যেন একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের অপেক্ষায় স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কমলা ছেলেবেলা থেকে জানে, হরেনের এই অবস্থায় কিছুতেই তাকে টলানো যায় না, নড়ানো যায় না। সে ভীত হয়ে বলে উঠলো—"তোমার আজ হলো কি হরেনদা? তুমি অমন-কোরে রয়েছ কেন?"

হরেন একটা গম্ভীর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লে—"না, কিছু হয়নি।"

ক্ষিতীশও চেয়ে দেখলে হরেন যেন আজ মোটেই হরেনের মতো নয়। কেন এমন হল, সে কিছুই ধরতে পারলে না।

কমলা হরেনের দিক থেকে হতাশ হয়ে ক্ষিতীশের দিকে ফিরলো। সে অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কি বল ক্ষিতীশদাদা, অরুণের সঙ্গে কালীগ্রামে যাবো না?"

ক্ষিতীশ বল্লে—"হরেন যখন বারণ কচ্চে, তখন না যাওয়াই ভালো।"

কমলার কেমন ভয় হচ্ছিল যে হরেন জোর কোরে তাকে রেখে ভালো করছে না; যতই দিন যাবে, ততই তার পক্ষে অমঙ্গল। সে ক্ষিতীশের দিকে করুণ প্রার্থনার দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—"কিন্তু কেন উনি বারণ করছেন, তাতো কিছু বলছেন না।"

"কারণ আবার কি! আমি বারণ করচি, যেতে পাবে না।"—বোলে হরেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

এই হুঙ্কারে অভিমানের সঙ্গে কমলার একটু রাগও হল। সে বোলে উঠল—"আমি যাব। তুমি বারণ করবার কে?"

হরেন কি-একটা কড়া-কথা বলতে যাচ্ছিল, ক্ষিতীশ তার অবসর না দিয়ে বোলে উঠল—"না কমলা, হরেন ভালো কথাই বলছে। তোমাদের বাড়ি থেকে কেউ না নিতে এলে তোমার যাওয়াটা ঠিক—সঙ্গত হবেনা। তুমি ছেলেমানুষী কোরোনা।"

ক্ষিতীশের এই কথার মধ্যে কেমন-একটি স্নেহের সুর ছিল, যাতে কমলার বিরুদ্ধ মন এক-নিমেষে বশ্যতা স্বীকার কোরে ফেল্লে। তার মনে হল, ক্ষিতীশদা যা বলছেন, তাই তার করা উচিত। কিন্তু নিজের অবস্থার সেই অসহায়তায় তার কেমন কান্না পেতে লাগল। সে চাপা কান্নার সুরে বোলে উঠল—"তবে কি আমি এইখানে পড়ে থাক্‌ব না কি?"

হরেনের বুকের মাঝে এই কান্নার সুর গিয়ে বেজে উঠল; সে বল্লে—"এখানে কেন থাকবে কমলা? আমি তোমায় আমার কাছে নিয়ে যাব।"

কমলা বল্লে—"সে তো একই কথা!—তা হলে এখানে থাকতেই বা আমার কি!"

হরেন প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে বোলে উঠল—"না, না, এ হল পরের বাড়ী, এখানে তোমায় থাকতে হবে না।"

কমলা আহত হয়ে বল্লে—"ছি, ছি, অমন কথা বোলোনা হরেনদা! ক্ষিতীশদা কি আমাদের পর!"

হরেন এর কোনো উত্তর খুঁজে পেলে না। কমলার জন্যে ক্ষিতীশ যা করেছে, তাতে কমলার কথা ঠিক বটে; কিন্তু কমলা যে-সুরে সেটা বল্লে, হরেনের সে সুরটা তেমন ভালো লাগল না। তারপর ক্ষিতীশের কথাতেই কমলার বাড়ি-যাবার জেদ ছুটে গেল—এটাও তার মনের মধ্যে কেমন খোঁচা দিতে লাগল। সে আবার গুম্ খেয়ে গেল।

অরুণ বল্লে—"তাহ'লে আমি কাল ভোরেই বাড়ি ফিরে যাই—বাবা-মাকে খবর দিই-গে?"

ক্ষিতীশ বল্লে—"সে বেশ কথা!"

হরেন কোনো সাড়া দিলে না।

পরদিন ভোরে অরুণ যখন দিদির কাছে বিদায় নিতে গেল, তখন কমলা বল্লে—"ভাই অরুণ, তোকে আমার একটি কাজ করতে হবে লুকিয়ে—কেউ যেন না জানতে পারে।"

অরুণ বল্লে—"কি কাজ?"

কমলা একখানা খাম-আঁটা চিঠি অরুণের হাতে দিয়ে বল্লে—"এই চিঠিখানি নিজের হাতে তোকে দিয়ে আসতে হবে।"

অরুণ বল্লে—"কাকে ?

কমলা বল্লে—"শিরোনামাটা পড়ে দেখুন।"

অরুণ দেখলে খামের উপর লেখা আছে —"শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগ্‌চি শ্রীচরণেষু।"

অরুণ প্রথমটা কেমন-একটু থম্‌কে গিয়ে দিদির মুখের দিকে খানিক ফ্যাল্‌ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইল; শেষে মুখ নামিয়ে বল্লে—"আচ্ছা।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সঙ্কলন

মানুষের আয়ু

বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে চিকিৎসা-শাস্ত্রকে দাঁড় করাইয়া রোগ-নিবারণের যে কত চেষ্টা দেশবিদেশে চলিতেছে, তাহা আমরা সকলেই দেখিতেছি। জীবাণুর সহিত নানা রোগের সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হওয়ায় রোগের মূলে ঘা পড়িতেছে এবং যে সকল রোগ পূর্ব্বে অনারোগ্য বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, তাহা এখন জীবাণুমূলক চিকিৎসায় সহজে আরোগ্য হইয়া যাইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বে লোক যে রকম পীড়ায় যন্ত্রণা ভোগ করিত এখন তাহা করিতেছে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার যে কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে তাহার সংখ্যাই হয় না। ইহাতে বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি অনেক মহামারীর প্রকোপ কমিয়াছে। ক্ষত-রোগে পূর্ব্বে সকল দেশেই হাজার হাজার লোক মরিত, আধুনিক শস্ত্র-চিকিৎসার গুণে এবং ক্ষত নির্বিষ করার নূতন উপায়ে এই রোগের মৃত্যু অনেক হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আমেরিকা বা য়ুরোপের কোন বড় সহরে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যত লোক মরিত, তাহার সহিত এখানকার মৃত্যু-সংখ্যার তুলনা করিলে দেখা যাইবে মৃত্যুর হার কমার দিকেই চলিয়াছে। এ সকলি সত্য। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্র মানুষের আয়ুর পরিমাণ বাড়াইতে পারিল কিনা জানিবার জন্য কাগজ-পত্র খুঁজিলে বড়ই নিরাশ হইতে হয়। দেখা যায় এখনকার উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যনীতি মানুষের পরমায়ু বাড়াইতে পারে নাই। অর্থাৎ এক-শত বৎসর পূর্ব্বে অধিকাংশ মানুষই যেমন সত্তর আশী বা নব্বই বৎসরের মধ্যে মরিত, এখন তাহারা ঠিক সেই রকম বয়সেই মরিতেছে। এত চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ কেন দেড়শত বা দুইশত বৎসর বাঁচিতেছে না, সে সম্বন্ধে সম্প্রতি কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক নানা পরীক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাহারি আলোচনা করিব।

মোটামুটি বলিতে গেলে, জন্ম এবং মৃত্যুকে বিশেষ বিশেষ রসায়নিক ক্রিয়ার ফল ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। কোন আকস্মিক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন যখন স্থায়িভাবে প্রাণীর শ্বাস রোধ করিয়া দেয়, তখনি মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কোন্ সূত্রে এই পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা বলা যায় না। কখনো বাহিরের আঘাত, কখনো পীড়া বা বিষ ইহার সূত্রপাত করিয়া দেয়। কাজেই বলিতে হয়, প্রাণীর স্বাভাবিক মৃত্যু নাই,—সকল মৃত্যুই আকস্মিক দুর্ঘটনা হইতে উৎপন্ন হয়। কয়েক জন বৈজ্ঞানিক এই কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং সকল রকম আঘাত ও পীড়ার বিষ হইতে বাঁচাইয়া প্রাণীকে অমর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ বা অপর বড় প্রাণী লইয়া এই পরীক্ষা করা চলে নাই। ইহাদের পাকাশয় ও অন্ত্র সর্ব্বদাই নানা পীড়ার জীবাণুতে পূর্ণ থাকে—কাজেই খুব সাবধানে রাখিলেও এই সকল প্রাণীদের শরীর কখনই রোগবিষ হইতে মুক্ত হয় না। রুসিয়ার বৈজ্ঞানিক বগ্‌ডানাও (Bugdanow) মাছি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। জীবাণুর অগম্য স্থান নাই। মাছিরা যে ডিম প্রসব করে তাহাতে অসংখ্য জীবাণু বাস করে। বাগডানাও সাহেব

এই সব দেখিয়া মাছির সদ্যপ্রসূত ডিমগুলিকে প্রথমে ক্লোরাইড অব মার্কারি নামক বিষে ডুবাইয়া জীবাণু-বর্জ্জিত করিয়াছিলেন। মাছিদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত। বলা বাহুল্য ইহাতে অনেক ডিমই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শেষে যে দুই চারিটি ডিম ভাল ছিল, সেগুলি হইতে মাছি জন্মিলে তিনি মাছিগুলিকে জীবাণুবর্জ্জিত খাদ্য দিয়া পালন করিয়াছিলেন। মাছিদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত চলে। অল্প দিনের মধ্যেই সেই দুই চারিটি মাছি সন্তান-সন্ততি লইয়া প্রকাণ্ড এক ঝাঁক মাছি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহাতে বাহিরের আঘাত অপঘাত গায়ে না লাগে বা বাহিরের জীবাণু আসিয়া গায়ে আশ্রয় না লয়, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু মাছিরা অমর হইল না,—যথাসময়ে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে তাহারা গণ্ডায় গণ্ডায় মরিতে লাগিল। বাগড়ানাও সাহেবের দেখাদেখি ফ্রান্সে এবং আমেরিকায় অনেক বৈজ্ঞানিক ঠিক ঐ প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল স্থানে ঠিক একই ফল দেখা গিয়াছে।

এই অকৃতকার্য্যতায় পরীক্ষকগণ নিরুদ্যম হন নাই। তাঁহারা বুঝিলেন, যে সকল রাসায়নিক পরিবর্ত্তন প্রাণী-দেহে জীবনীশক্তির সৃষ্টি করে, তাহাই শরীরে নানা বিষ পদার্থ উৎপন্ন করিয়া প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। রাসায়নিক কার্য্যকে সংযত রাখা কঠিন নয়,—তাপপ্রয়োগে এই কার্য্য দ্রুত চলে এবং ঠাণ্ডা দিলে তাহা মন্দীভূত হয়। পরীক্ষকগণ ভাবিলেন, যদি কোন উপায়ে প্রাণীদের দেহ শীতল রাখিয়া শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়াকে সংযত করা যায় তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রাণীরা দীর্ঘজীবী হইবে।

পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ডাক্তার লয়েব এবং নরথ্রপ জীবাণুবর্জ্জিত মাছি লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মানুষ এবং অপর উন্নত প্রাণীদের দেহের উষ্ণতার এক-একটা সীমা আছে; খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডায় রাখিয়া এই উষ্ণতার পরিবর্ত্তন করা যায় না; কিন্তু পতঙ্গদের দৈহিক উষ্ণতার সে প্রকার কোনো সীমা নাই। বাহিরের তাপ-অনুসারে ইহারা দেহের উষ্ণতা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত করে এবং তাহাতে কোনো অসুস্থতা বোধ করে না। কাজেই মাছি লইয়া পরীক্ষা করায় পরীক্ষকগণের অনেক অসুবিধা হইয়াছিল। উষ্ণতা কমাইয়া দেওয়ায় প্রথমে কতক মাছি মরিয়া গেল। শেষে সেণ্টিগ্রেডের কুড়ি ডিগ্রি উত্তাপ কমাইলে যেগুলি বাঁচিয়া রহিল, পরীক্ষকগণ তাহাদিগকে সেই নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে রাখিয়া সাবধানে পালন করিতে লাগিলেন। ইহাতে যে ফল পাওয়া গেল তাহাতে তাঁহারা অবাক হইয়া গেলেন। পরীক্ষকগণ দেখিলেন যে-সকল মাছি জন্মের এক মাসের মধ্যে মারা যাইত, তাহারাই ঠাণ্ডায় থাকিয়া নয় মাস পর্য্যন্ত বাঁচিতে লাগিল। কিন্তু এই পরীক্ষা মানুষের উপর করা হইল না। মানুষের জটিল দেহযন্ত্র বেশী ঠাণ্ডা পাইলেই বিকল হইয়া যায়। তাই দেহকে সুস্থ রাখিবার জন্য মানুষের শরীরে স্বভাবতই একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতা থাকে। ইহা কোনো কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘকাল কমাইয়া রাখিলে মৃত্যু হয়। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষকগণ বলিতেছেন, মানুষের দেহের উষ্ণতা যদি কোনো ক্রমে কুড়ি ডিগ্রি পরিমাণে কমাইয়া রাখার উপায় থাকিত, তবে এখন যে সব মানুষ যাট বা সত্তর বৎসরে মরিতেছে, তাহাদিগকে দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু তাহা হইবার নহে,—এই উপায়ে কোনো কালে যে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করা যাইবে, তাহার সম্ভাবনা আজও দেখা যাইতেছে না।

মানুষ বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া কখন যৌবনে পা দেয় এবং তার পরে কি করিয়া কবে যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া জানিবার উপায় নাই। কিন্তু পতঙ্গ উভচর প্রাণী লইয়া পরীক্ষা করিলে, বাল্য এবং যৌবনের সীমারেখা সুস্পষ্ট চেনা যায়। ভেকেরা ডিম হইতে বাহির হইয়াই ভেকের আকার পায় না। বেঙাচির আকারে তাহারা কয়েক সপ্তাহ জলে সাঁতার দেয়। ইহাই ভেকের শৈশব কাল। তার পরে যখন তাহাদের লেজ লোপ পাইয়া যায়, পা গজাইতে থাকে এবং গায়ের চামড়া ও মুখ রূপান্তরিত হইয়া পড়ে, সেই সময়টা তাহাদের যৌবনারম্ভ কাল। মানুষের যৌবনের কাল বাড়াইয়া তাহাদিগকে দীর্ঘজীবী করা যায় কিনা জানিবার জন্য Gudernatch নামে

অনেক বৈজ্ঞানিক কিছুদিন ধরিয়া ভেকের শারীরিক পরিবর্ত্তন পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। ইহাতে এসম্বন্ধে অনেক নূতন খবর পাওয়া গিয়াছে। বড় প্রাণীদের কণ্ঠনলীর কাছে একটি বিশেষ মাংসপিণ্ড আছে, ইহাকে ইংরাজিতে Thyroid gland বলে। ইহা হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা প্রাণীদেহে অনেক অত্যাশ্চর্য্য কাজ করে। শীতকালে তিন চারি সপ্তাহের পূর্ব্বে ব্যাঙাচি কখনই ব্যাঙের মূর্ত্তি পায় না। পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকটি খুব ছোট ব্যাঙাচিকে অপর প্রাণীর Thyroid gland খাওয়াইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে যে ফল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বড়ই অদ্ভুত। Thyroid Gland খাইয়া অপুষ্টাঙ্গ ছোট ছোট ব্যাঙাচি এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যাঙের মূর্ত্তি পাইয়াছিল। পরীক্ষক বুঝিয়াছিলেন, প্রাণীদের Thyroid Glandই তাহাদের যৌবনের বিকাশ করে এবং শেষে যখন তাহা দুর্ব্বল হইয়া যায় তখন বার্দ্ধক্য দেখা দেয়। কয়েকগুলি ব্যাঙাচির দেহের Thyroid Gland সাবধানে কাটিয়া ফেলিয়া এলেন্ নামক একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতেও আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছিল; ব্যাঙাচিগুলির মধ্যে একটিও যৌবন প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা আজীবন লেজযুক্ত ব্যাঙাচিই থাকিয়া গিয়াছিল।

এই পরীক্ষা মানুষের উপর চলিতেছে কিনা জানি না। দেহের Thyroid Gland কাটিয়া মানুষকে আজীবন শিশু করিয়া রাখা ত সম্ভব নহে। সম্ভব হইলে ইহাতে মানুষের দুঃখই বাড়িয়া যাইবে, আয়ু বাড়িবে না। কাজেই বলিতে হইতেছে, মানুষের আয়ু বাড়াইবার জন্য এ পর্য্যন্ত যত চেষ্টা হইয়াছে তাহার কোনোটিই সার্থক হয় নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

শান্তি নিকেতন, শ্রাবণ ১৩২১।

নারী-স্বাতন্ত্র্য

পাশ্চাত্যে মেয়েরা যতটা পুরুষালী হইয়া উঠিতে পারে তার চেষ্টা করিতেছে, আর প্রাচ্যে মেয়েরা যতটা মেয়েলী হইয়া থাকিতে পারে তাই যেন চাহিয়াছে। এই দুইটাই সীমার বাহিরের জিনিষ। নারীকেও মানুষ হইতে হইবে, কিন্তু তার অর্থ পুরুষ হওয়া নয়। আবার নারীত্ব হারাইবে না বলিয়া সে যে "মেয়ে মানুষ" হইয়া থাকিবে এমনও কোন কথা নাই। পুরুষও মানুষ হইবে, মেয়েও মানুষ হইবে—দুজনে হুবহু এক রকমের না হইলেও, আবার সম্পূর্ণ আলাদা রকমেরও নয়। কিন্তু এখন সমস্যা হইতেছে দু'য়ের মধ্যে কোথায় সেই ছেদরেখা টানিব।

আমাদের দেশে ছেদটা খুব সহজে স্পষ্ট করিয়াই টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেয়ে থাকিবে ঘরে, পুরুষ থাকিবে বাহিরে। মেয়েরা বাহিরে যাইতে পারিবে না—যদিই বা কখন কদাচিৎ যায় তবে পুরুষের ছায়ায় ছায়ায় চলিতে হইবে, থাকিতে হইবে গলগ্রহ হইয়া; আর পুরুষেরাও অন্দরমহলে ঢুকিতে পারিবে না, যদিই বা ঢুকিতে চায় তবে যেন মেয়ের মুখোস পরিয়া মেয়েটি হইয়া তাহাকে ঢুকিতে হইবে,—পুরুষের পুরুষত্ব হারাইয়া দুই জনের দুইটি আলাদা প্রাচীর-ঘেরা রাজ্য—মাঝে আনাগোনার একটা ছোট দরজা আছে কি নাই।

আমাদের দেশে পুরুষের জীবন একান্ত বাহিরে—আড্ডায় সমাজে সভা-সমিতিতে কেবল পুরুষেরই সংসর্গে। জ্ঞানের চর্চ্চায়, কার্য্যানুষ্ঠানে, এমন কি আনন্দ-উৎসবেও আমাদের সাথী হইতেছে পুরুষ। এ সব বিষয়ে নারীর স্থান নাই। নারীর কথা যখন মনে জাগে, তখন ফিরি ঘরে, ওসকল কথা ভুলিয়া গিয়া, ইহাদের মুখে ছিপি আঁটিয়া দিয়া আরম্ভ করি মেয়েলি কথা—ঘরকন্না, ছেলেপিলে, বড়-জোর দুই-একটা রসালাপ। মেয়েরাও বাহিরের কোন খবর রাখে না, স্বামীর জীবনের অর্দ্ধেকটাই তার অজ্ঞাত। বাহিরের জগৎ ডুবিল কি বাঁচিল সে দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন—ঘরের খাওয়া-পরা চলিলেই সব হইল। মেয়েরা মেয়ের সাথে জানে কেবল ঘরকন্নার কথা বলিতে, গালগল্প করিতে, পরের আলোচনা

করিতেন। পুরুষ যদি অন্তঃপুরে আসিয়া দৈবাৎ কোন গম্ভীর বিষয় সুরু করেন তবে মেয়েরা অগাধ সলিলে যেন ঠাঁই পায় না। *

এই বিচ্ছিন্নতার ফলে দাঁড়াইয়াছে কি? আর কোন ক্ষেত্রে মিলনসূত্র না পাইয়া পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ কেবল শারীরিক ক্ষেত্রেই বিপুল বিকটভাবে দেখা দিয়াছে—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক যৌন সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠে নাই। পুরুষ ও নারীর মধ্যে আর কোন সম্বন্ধ যে হইতে পারে, সে কল্পনাও আমরা সহজে করিতে পারি না। পুরুষ নারী একত্র দেখিলেই আমাদের চোরের মন বোঁচকার দিকে ধায়—তাহাকে অশ্লীলতা উচ্ছৃঙ্খলতা কত কি নাম দিই। আমাদের শাস্ত্রকার তাই শাসাইয়া রাখিয়াছেন—পুরুষকে জানিবে আগুন বলিয়া, আর নারীকে জানিবে ঘৃত বলিয়া; দুটীকে কদাপি একত্র হইতে দিবে না। তাই ঘরে বাইরের সমস্যা আমাদিগকে এতখানি বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে—বাহিরকে যতদূর পারি বাহিরে ঠেলিয়া দিয়াছি, ঘরকে যতদূর পারি ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিয়াছি। দুই-এর যেন মুখোমুখী করিতে নাই।

অনেকে বলিবেন দেশের সামাজিক অবস্থার সঠিক চিত্র আমি দিতে পারি নাই। আমাদের স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের গভীর অর্থটা আমার মোটা বুদ্ধিতে ধরা দেয় নাই। তাঁহারা বলিবেন আধুনিক ইউরোপের মত আমাদের ধর্ম্ম-প্রণেতৃগণ পুরুষ ও নারীকে একাকার করিতে চাহেন নাই। পুরুষ ও নারীর পৃথক পৃথক স্বভাব ও স্বধর্ম্ম জানিয়া সেই অনুসারে উভয়ের পৃথক পৃথক কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পুরুষের রাজ্য বাহিরেই, নারীর রাজ্য ঘরেই। এ কথার অর্থ কি? পুরুষের কাজ লোক-সমক্ষে, নারীর কাজ গোপনে নীরবে। পুরুষ দিবে কর্ম্ম, নারী দিবে ভালবাসা। পুরুষ যুদ্ধ-বিগ্রহ করিবে, নারী কিন্তু সান্ত্বনা-বারি লইয়া ফিরিবে। কঠোরবৃত্তি, পুরুষত্ব যাহাতে প্রয়োজন তাহা পুরুষের ধর্ম্ম; কোমলতা কমনীয়তা নারীর ভূষণ। পুরুষের মস্তিষ্ক, পুরুষের বাহু জীবনের এক দিক, আর নারীর হৃদয়, নারীর কোমল হস্ত আর এক দিক। নারী ঘরেই থাকুক আড়ালে আবডালে থাকিয়া সেখান হইতেই সে ভাল রসসঞ্চার করিতে পারে, তীব্র রৌদ্রাতপে আসিয়া তাহাকে শুকাইয়া পুড়াইয়া ফেলিও না। নারীর অঞ্চলের স্নিগ্ধ ছায়াতেই পুরুষ সরস সতেজ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িতেছে—Love of Ladies, Death of warriors এ শুধু আমাদের দেশের কথা নয়, ইউরোপ যখন ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় নাই, বর্ণসঙ্করে একাকার উচ্ছৃঙ্খল হয় নাই, তখন সে আমাদের ভাবেরই ভাবুক ছিল।

তাই বলিয়া বলিও না নারীকে অবলা অশক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। পুরুষের বল ও শক্তি এক ধরণের, নারীর শক্তি ও বল আর এক-রকম ধরণের। পুরুষের হইতেছে আক্রমণ করিবার বল (Active), নারীর হইতেছে সহ্য করিবার বল। আমাদের সমাজে সংসারের যে ভার তাহা পড়ে মেয়েদেরই উপর। পুরুষ যে যতটুকু পারে কেবল অর্থ আনিয়া দিয়াই খালাস। কিন্তু সংসারকে দক্ষতার সাথে চালান, সকল দুঃখ-ক্লেশ আধিব্যাধির মধ্যে ধীর স্থির থাকিয়া সংসারের হালটি ঠিক ধরিয়া থাকার যে কতখানি শক্তির দরকার তাহা পুরুষে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পুরুষের শক্তিতে ডাকহাঁক, বাহির-চটক থাকিতে পারে—কিন্তু পর্দ্দার আড়ালে যিনি একটু উঁকি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন সেখানে মেয়েদের মধ্যে কি নীরব সামর্থ্য, কি অকাতর শ্রম, কি অটুট অধ্যবসায়, কি শালীনতা, কি শোভনতা,—মেয়েদের জন্যই সমাজ দানা বাঁধিয়া শক্ত সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে!

তারপর জ্ঞানের দিক দিয়া আমাদের মেয়েরা বিদুষী পণ্ডিতানী না হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিতে প্রকৃতজ্ঞানে —ধর্ম্ম-বিষয়ে—পুরুষের চেয়ে তাহারা কোন অংশে হীন নয়, অনেক স্থলে ইহারাই পুরুষের আদর্শ হইবার

* আমি দেশের সাধারণ অবস্থারি কথা বলিতেছি। বিশেষ কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির পক্ষে আমার কথা প্রযুজ্য না হইলে কেহ যেন আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া না উঠেন।

উপযুক্ত। নিরক্ষরা হইলেই মূর্খ হয় না, পাশ্চাত্যের মোহে পড়িয়া এই সহজ কথাটি আমরা এখন আর বুঝিতে পারি না। পুরুষের বিদ্যা পুরুষের মস্তিষ্ককে কৃত্রিম অস্বাভাবিক (sophisticated) করিয়া ফেলিয়াছে, আমাদের মেয়েদের বুদ্ধি কিন্তু সহজ স্বাভাবিক সরল সতেজ। বেশী কতকগুলি কথা জানিয়া ফল কি? সে ত চপলতা চটুলতা মাত্র। আমাদের মেয়েদের মুখে খলিফৎ আন্দোলনের কথা অথবা পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনীতির কথা শুনিতে পাই না বটে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? দরকার হয়, পুরুষ সে কথা লইয়া বাদ-বিচার করুক। কিন্তু নারীকে আবার তাহার মধ্যে টানিয়া আনা কেন? নারীর কাছে চাই ধর্ম্ম-কথা, নীতিকথা, আদর্শের কথা, ভিতরের কথা। পুস্তকের বিদ্যা, খবরের কাগজের কাহিনী সব নারীর জানা নাই থাকিল। কিন্তু স্বভাবকে চরিত্রকে যাহা উন্নত করে মার্জ্জিত করে সেই সকলের সাথে পরিচয় থাকিলেই যথেষ্ট। পুরুষ বিজ্ঞান লইয়া থাকুক; নারী যেন তাহার জ্ঞান লইয়া থাকে। পুরুষ তাহার মস্তিষ্ক লইয়া থাকুক, নারী যেন থাকে তাহার হৃদয়-প্রাণ লইয়া।

আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থাকে ধর্ম্মকর্ম্মকে আরও কতদূর যে আদর্শোচিত বলিয়া ব্যাখ্যান দেওয়া যাইত তাহা জানি না। কিন্তু যেটুকু দিয়াছি তাহাই বোধ হয় যথেষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে ইহা বাস্তবে কতদূর সত্য, আর সত্য হইলেও ইহাই চরম আদর্শ কি না? আমাদের জননীরা মমতাময়ী, ধৈর্য্যশীলা শক্তিমতী, বুদ্ধিমতী, জ্ঞানশীলা, এই-সব কয়টি গুণ আমাদের সমাজ পূর্ণমাত্রায় নারীকে দিয়াছে, কল্পনায় এ কথা সহজেই সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের কষ্টিপাথরে এই সত্যকে যিনি ঘসিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনি ইহার মধ্যেও অনেকখানিই—বেশীর ভাগই যে খাদ মিশিয়া আছে, তাহা চিনিতে পারিবেন। আর এ কথা যদি সত্য বলিয়াই জানি, তবে সে সত্য কেবল একটু ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতার মধ্যে,—আপন সংসার, আপন পরিজন, আপনার স্বামী ও সন্তানের বাহিরে নয়। যে সব গুণের খেলার জন্য যথেষ্ট জায়গা, বহুল আশ্রয় নাই, তাহারা যে ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষু প্রাণহীন হইয়া পড়িবে তাহা ত খুব স্বাভাবিক। ক্ষেত্র যদি বড় না হয় তবে শক্তি আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। শুধু গভীরত্বের দোহাই দিলে চলে না—যে গভীরত্বের সাথে গতিবেগ নাই, যে গভীরত্বকে আটকাইয়া রাখা হয় কঠিন বাঁধের মধ্যে, সে গভীরত্ব বেশী দিন থাকে না, ক্রমে তাহা পাতলা হইয়া আসে, ক্রমে তাহাতে পচ ধরে। আমাদের নারীসমাজে কি তাই হয় নাই?

নারীর কাজ নীরবে গোপনে, নারী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এ সব কথা দিয়া আমরা চোখের ঠারে মন ভুলাইতে চেষ্টা করি মাত্র। এখানে আছে একটা আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়াস। নারীকে যথার্থতঃ হীন (untouchable বলিব কি?) বলিয়াই মনে করা হয়, তাহাকে ছোট ক্ষেত্র ছোট বিষয় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সে সকলের নাম ও উপাধি দেওয়া হইয়াছে বড় বড়। হাতা বড়া লইয়া থাকাকে বলা হয় সংসার করা, পরিবারের কাহারও অসুখ-বিসুখের সময় পথ্যাদি দেওয়া বা শুশ্রূষা করাকে বলা হয় সেবাধর্ম্ম মহাপ্রাণতা, আর সীতা সাবিত্রীর উপাখ্যান জানাকে বলা হয় ধর্ম্মজ্ঞান। আমাদের এ কথায় একটু রং চড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু মূলতঃ ইহা যে কতখানি সত্য তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

পুরুষের ক্ষেত্র বাহিরেই হউক আর নারীর ক্ষেত্র ভিতরেই হউক, আমরা কি স্পষ্ট দেখিতেছি না, পুরুষ নিজের ক্ষেত্রে যতখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, নারী তাহার ক্ষেত্রে ততখানি অগ্রসর হইতে পারে নাই, হওয়া তাহার দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে! যে সব নূতন ভাব নূতন চিন্তা নূতন প্রেরণা পুরুষ জাতিকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, নারী যদি সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিল তবে কি পুরুষ কি নারী কাহারও সার্থকতা হইবে কি? সমাজের গোটা জীবন সতেজ সমুন্নত হইবে কি? নারীকে আমরা সহধর্ম্মিণী বলিয়া থাকি—কিন্তু সে ধর্ম্ম কি ঘরের মধ্যে ব্রতপূজা আচার অনুষ্ঠান না শুধু সংসার-পালন? আমাদের মনে হয় মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে, জ্ঞানে ও প্রাণে—বাহিরে ও ভিতরে

--একটা বিচ্ছেদ রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই আমাদের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিরাট অসামঞ্জস্য, সমাজে ঢুকিয়াছে অস্বাস্থ্যের বীজ। যে ভয়ে ঘরে ও বাহিরের মধ্যে আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছি, সেই ভয়ই আমাদের কাল হইয়াছে; যে তুচ্ছ তাচ্ছল্য বা উদাসীনতার জন্য সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গকেই পঙ্গু করিয়া রাখিতেছি, তাহাতে অপর অর্দ্ধাঙ্গও পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে, সমাজ-শক্তি পূরা সামর্থ্য পাইতেছে না।

নারীর শোভা শ্রী, হ্রী, এই বচনের দোহাই দিয়া নারীকে অবগুণ্ঠনে মুড়িয়া একটা জড় পুঁটুলি বানাইতে পুরুষেরা সচেষ্ট, ইহাতে নারীরও সুবিধা স্বস্তি হয় না, পুরুষেরও ভারটাই কেবল বেশী হয়। লজ্জা শালীনতা শোভনতা—হৃদয় ও প্রাণের বৃত্তি যে কেবল ঘোমটার অন্তরালে, ঘরের কোণেই বাড়িয়া উঠে এ সত্য মানিয়া লওয়া একটু কঠিন। তা ছাড়া পুরুষ যে সকল জিনিষকে কেবল আপনারই একচেটিয়া বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা সত্য সত্যই কতখানি তার একচেটিয়া, কতখানিতে বা নারীরও সমান অধিকার, সমান কর্ত্তব্যই আছে তাহাও বিচার করিবার বিষয়। নারী গৃহে গৃহিণী, শয্যাপ্রান্তে সখী; সেই নারীই আবার জীবনক্ষেত্রে সচিব, জ্ঞানের সাধনায় আর কিছু না হউক অন্ততঃ প্রিয়শিষ্যা হইবার যোগ্য নয়?

ইউরোপে আজ যে নারীর বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহার ভিতরের কথা হইতেছে নারীর অন্তরাত্মার মুক্তির প্রয়াস। পুরুষের দেওয়া, নিজের মানিয়া লওয়া শতাব্দীর সংস্কার বা অভ্যাসকে নারী আর সনাতন স্বভাব বা ভগবানের বিধান বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছে না। অন্তরাত্মার অনুযায়ী নূতন ক্ষেত্র নূতন জীবন সে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। অন্তরাত্মার প্রথম মুক্তি-আবেগ তাই দেখা দিয়াছে বিদ্রোহের রূপে, শুধু উপরের চাপের বিরুদ্ধে আক্রোশের ভাবে। নারী তাই চাহিতেছে পুরুষের সকল প্রতিষ্ঠানকে অধিকার করিতে, সম্মুখে আর কিছু না পাইয়া সর্ব্ববিষয়ে পুরুষেরই মত হইয়া উঠিতে।

ভারতে বাংলা দেশেও নারী-সমাজের অন্তরে এই রকম একটা বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে, তাহা কি দেখিতেছি না? শুধু তাহাই নয়, পুরুষেরা নিজেরাই ইহাতে ইন্ধন জোগাইতেছে না কি? নারীকে বাহিরে জীবনের সঙ্গিনীরূপে না পাইয়া পুরুষের মধ্যেও যে অভাব গুমরাইয়া উঠিতেছে তাহার পরিচয় আজ-কালকার সাহিত্যে--গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে—অজানিত অতর্কিতভাবেই ফুটিয়া উঠিতেছে। পুরুষের সে অভাব—সে অশান্তিবোধ জীবনের কর্ম্মের মধ্য দিয়াও নারীকে গিয়া আঘাত করিতেছে। পুরুষের সে অভাব আজকাল বিবাহের বাজারে মেয়ের পিতামাতা কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন।

মেয়েদের এই নবীন শিক্ষা দীক্ষা অনেকটা যে পুরুষেরই অনুকরণে হইবে, তাহা গোড়ায় খুবই স্বাভাবিক,—কারণ সজীব শিক্ষা দীক্ষার আদর্শ মেয়েরা কি মেয়ের পিতামাতারা আর কোথাও পাইতেছেন না। ইংরাজ এ দেশে আসিলে আমরা ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষায় যে রকম মাতিয়া উঠিয়াছিলাম, এও সেই রকম—পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা দেখিয়া মেয়েরাও তাহাতে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাতে আশঙ্কার বিশেষ কিছু নাই, ইহা আশারই কথা। এখন যেমন ইংরাজী বুলি কপচাইয়া আর আমরা তেমন গৌরব অনুভব করি না, সেটাকে প্রাণের ভাষা বলিয়া আর মনে হয় না, এখন স্বদেশের ভাষায় নিজের প্রাণের কথার খোঁজ করিতে ফিরিয়া চলিয়াছি, সেই রকম নারীও পুরুষের মুখোস পরিয়া চলিতে পারিবে না, নিজের অন্তরাত্মার প্রয়োজনেই তাহার শরীর তাহার আয়তন গড়িয়া লইবে।

কিন্তু সকলের আগের কথা হইতেছে নিজেকে মানুষ ভাবা, নিজের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া। আগে নর কি নারী নয়, আগে হইতেছে মানুষ। নারী অন্ত-রাত্মার পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিতে যাইয়া যদি আপাততঃ খানিকটা পুরুষের মত হইয়া উঠে, তাহা নিরসন করিবার দরকার নাই। ভুল করিবার যার পথ অধিকার আছে, সেই ত সত্যকে পাইবারও পথ অধিকার পায়। আর সকল ক্ষেত্রে এ সত্যটি খাটিলে, নারীর পক্ষে এ কথা খাটিবে না কেন? নারী তাহার

ভিতরের মানুষকে মুক্তি দিক আগে, পরে বুঝিয়া স্থির করিয়া লইবার সময় আসিবে সে নারী। প্রকৃত মনুষ্যত্বকে পাইলে প্রকৃত নারীত্ব আপনা হইতেই তাহার মধ্যে বিকশিত সজ্জিত হইয়া উঠিবে।

ঘরে ও বাহিরের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে যে প্রাচীন পুরাতন প্রাচীর, তাহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ফাটল ধরিয়াছে, জোড়া তালি দিয়া মেরামত করিলেও তাহা থাকিবে কি না সন্দেহ। সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে—খোলা ক্ষেত্রে স্বভাব-নিয়ত কর্ম্মই পুরুষের ও নারীর সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, ঘর বাহির যদি দরকার হয় তবে তাহার পদ্ধতিটা সেই স্বভাব আপনা হইতেই ক্রমে ফুটাইয়া তুলিবে। পুরুষের রাজসিক অহঙ্কার নয়, নারীর তামসিক আনুগত্যও নয়—পুরুষ নারীর সম্বন্ধ উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া দিবে উভয়ের ভাগবত প্রেরণা, উভয়ের মধ্যে সাধারণ মানবপ্রকৃতির বৈবিভিন্ন অথচ সামঞ্জস্য-বিধৃত গতি।

আগে চাই পূর্ণমাত্রায় স্বাতন্ত্র্য, আত্মসংস্থা—Self-determination, তবেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে হইবে প্রকৃত ঐক্য, সামঞ্জস্য। তা না হইলে এক জন আর একজনের সত্তায় আত্মবলি দিবে মাত্র, উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইবে ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃ সম্বন্ধঃ। নারীকে আগে গালাগালি দিতে হইলে বলা হইত স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসিনী অথবা স্বৈরিণী, ইহাতেই বুঝিতে পারি নারীর উপর পুরুষের কি ভাব, নারীর নিকট পুরুষে কি চায়? কিন্তু আজকালকার যুগে এ ভাব কতদূর চলিবে, তাহা চক্ষু একেবারে বুজিয়া না আছেন যাঁহারা, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

নারায়ণ—ভাদ্র ১৩২৭।

অনাসৃষ্টি

(চিত্র)

শীতকালের ভোর,—তখনো পূর্ব্ব দিক ভাল করে ফর্সা হয় নি; চারিদিক ভোরের কুয়াসায় আর দরিদ্র-পল্লীর ঘুঁটের ধোঁয়ায় ভরে রয়েছে। গলি রাস্তায় ময়লা-ফেলা গাড়ীর ক্যাঁচ-ক্যাঁচানি শব্দ, আর দু-একটা ধাওড় ছেলেমেয়ের তর্ক-বিতর্ক ছাড়া আর কোন কোলাহল তখনো জাগে নি। ময়না ওরফে ঊষারাণী ঘুম ভাঙ্গতেই তাড়াতাড়ি গায়ের লেপটা ছুড়ে ফেলে বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো।

বাইরে এসে সে দেখে, কি সুন্দর দিন! সূর্য্যের প্রথম উদয়ের রাঙা আলোয় তার দুই চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। এমন ভোরে কিছু সব দিন তার ঘুম ভাঙ্গে না, ভোরের এমন সৌন্দর্য্য দেখাও তাই তার ভাগ্যে কোন দিন ঘটে না; সেদিন তার অন্তরের নিগূঢ় আনন্দের তুফান তার সারা মনটিতে যে মিঠে দোল দিচ্ছিল, সেই দোলাতেই রঙিন চোখে সে চেয়ে দেখ্‌লে, বিশ্ব-সংসারে আনন্দে আর ফাঁক কোথাও নেই।

তার আনন্দোজ্জ্বল মুখের উপর আলোর ঝলক ঢেলে সূর্য্যোদয় হল। পাশের ঘর থেকে তার বড়-জা বেরিয়ে এসে তাকে দেখে হেসে বললে, "হ্যাঁ ভাই ময়না, আজ কি বার রে!" ময়নার তো কান অবধি লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লো। তার মনের গোপন বার্ত্তা

[ত]ার কিছুই অগোচর নেই! সে আঁচলটা [তু]লে মুখে চেপে বললে, "আমি জানিনে তো!"

আদর করে তার মুখখানি নেড়ে দিয়ে [বড়-জা] বললে, "না, তুমি তো জানো না কিছুই, [অ]ন্যদিন ডাকাডাকি করলেও ঘুম ভাঙ্গে না, [ব]ড় শীত করে, আর আজ বুঝি বার-মাহাত্ম্যে [শী]ত-টিত সব ঘুচে গেছে!"

ময়না নিতান্ত উদাস অজ্ঞতার ভাণ করে বল্লে, "ওঃ, আজ বুঝি শনিবার? তা [হ]বে।"

কিন্তু সে আজ এক সপ্তাহ ধরে এই শনিবারটিরই প্রতীক্ষা করে আছে! বড়-জা হেসে বল্লে, "তা হলে তুই ঐ দেওয়ালের গায়ে যে ক্যালেণ্ডারখানা আছে, সেখানা ভাল করে দেখে নে, আমি স্নান করে আসি।"

ময়না ব্যস্ত হয়ে বললে, "না ভাই বড়দি, আমিই আগে নেয়ে আসি—তুমি পরে নেয়ো।"

সকৌতুকে বড়বৌ বললে, "কেন, শীত করবে না আজ? এত সকালে নাইবার চাড় হল যে?"

কচি মুখখানি যথাসাধ্য গম্ভীর করবার চেষ্টা করে ময়না বললে, "কেন আবার! বেশ তো, তবে যাও, তুমিই নেয়ে নাও গো, আমি নাইবো না। কিন্তু কাজের দেরী হলে তখন আমাকে দোষ দিতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি।" বড়-জা চলে যেতে যেতে হাসি-মুখে বললে, "আহা, তাই তো! আজ তো আর ভাবনা নেই-যে চিঠি ডাক পাবে না!" এবারে একটু রাগ দেখিয়ে সে বললে, "আচ্ছা, যাও।" বলতে বলতে হঠাৎ তার মুখ ভরে হাসি এসে পড়ে সব রাগটুকু মাটি করে দিলে, সে ফিক্ করে হেসে আঁচল তুলে মুখ ঢাকলে।

স্নানের পর সে দিন তার বেশ-ভূষার পারি-পাট্য দেখে বাড়ীশুদ্ধ তরুণী জা-ননদের দল তো তাকে ক্ষেপিয়ে পাগল করে তোলবার যোগাড় করলে। মেজ ননদের ছোট মেয়ে বেলা তার সেই আধ-ময়লা সাদা কাপড়-খানা জলের টবে ফেলে দিয়ে তার মুড়োটা ভিজিয়ে ফেলেছে বলেই যে সে এই নীলাম্বরী-খানা পরতে বাধ্য হয়েছে, এই সহজ কথাটা কেউ তারা বিশ্বাস করতে চায় না! আর চুল—? তা না আঁচড়ালে তো তোমরাই বকো বাপু! বকতে বকতে সে যে কোথায় যায় তা ভেবে পাচ্ছে না, এমন সময়ে শাশুড়ী বড়ির ডালা-টালাগুলো রোদ্দুরে ধরে দেবার জন্য এক-জনকে ডাকলেন। এদের চোখ এড়িয়ে সরে পড়বার এই সুযোগ পেয়ে ময়না বলে উঠলো, "আচ্ছা, মরো তোমরা এই শীতে, আমি ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে বড়ির ডালাটা হাতে করে নিয়ে ছাতে যাই।" বড় বৌ হেঁকে বললে, "আচ্ছা, দেখা যাবে, তুই নাবিস কি না?"

ময়নার স্বামী কুমুদ এখনো ছাত্র; হোষ্টেলে থেকেই সে পড়াশোনা করে। কলকাতাতেই বাড়ী হলে কি হয়, বাড়ী থেকে বড় বেশী দূর পড়ে, তাই হোটেলেই তাকে থাকতে হয়। না হলে সারাদিন ঠিক সময়ে ক্লাসে উপস্থিত হতে পারে না। সপ্তাহে দুটি দিন সে বাড়ীতে থাকে—সে এই শনিবারে আর রবিবারে। তা-ও অন্য শনিবারে সে সন্ধ্যা বেলাতেই বাড়ী আসতো—সে দিন কি একটা ছুটি-ছাটা ছিল তাই সকালেই তার আসবার কথা।

কাজেই নির্জ্জন ছাদের উপর আটক থাকাটাও ময়নার পোষাচ্ছিল না। সে শীতকালের রোদ পোহাতে পোহাতে ছাতের আল্‌সের ধারে ঝুঁকে মুখ দিয়ে দেখছিল, কেউ আসচে কি না? তাদের বাড়ীর সামনে সরু গলি-রাস্তাটুকুতে তখন বেশ লোক-চলাচল সুরু হয়েছে, ফে'রওয়ালার রকম-বেরকম চীৎকারও শোনা যাচ্ছিল।

২

ঝী কলতলায় বসে বাসন মাজ্‌ছিল, কুমুদ দুখানা বই হাতে করে নিয়ে বাড়ী ঢুকেই তাকে প্রশ্ন করলে, "মা কোথায় রে?" তার হাতের বই-দুখানা হয়তো নিতান্তই ব্যাগারের বোঝা,—কিন্তু হাতে বই না থাক্‌লে তো আর ছাত্র বলে চেনা যায় না, তাই সে অনধ্যায়ের দিনেও অধ্যয়নের প্রমাণ দিতে ভুলতো না!

ঝী তার কাদা-মাটিমাখা হাতের কনুই দিয়ে মাথার কাপড়টা নামিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "মা উপরকে আছে।" তারপর কি ভেবে নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে নাকি সুরে হেঁকে বললে, "অ গো ও গিন্নি-মা ছোট বাবু এ্যায়েছে গো!"

কুমুদ ব্যস্ত হয়ে বললে, "থাক্‌, থাক্‌, আমি তো উপরেই যাচ্ছি।" তেতলার ছাদের উপরেও ময়নার কানে গিয়ে ঝীয়ের গলার স্বর পৌছুলো, এই সময়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়তে পারলেই বেশ হত, কিন্তু সে হয় কি করে?

এই সকালেই কুমুদের মাথায় ফিট্‌ফাট টেরির বাহার! সেই দুঃসহ শীতের দিনেও গায়ে একটি ফিন্‌ফিনে পাৎলা ফ্যান্‌সী পাঞ্জাবি, তবে শালখানায় অবশ্য মেয়েদের গাড়ীর মত করে আগাগোড়া ঢাকা।

কুমুদ বরাবর দোতলায় উঠে ডাকলে, "মা, ও মা—" মা তখন আহ্নিকে বসেছেন, তিনি তো আর কথা বলতে পারেন না, সুমুখে বড় বৌ। তিনি তাকেই ইসারা করে বললেন, "তুমিই যাও।" বড় বৌ তখন তর-কারির ঝুড়ি নিয়ে কুট্‌নো কুট্‌তে বসেছে; মটরশুঁটির খোসা ছাড়াতে ছাড়াতেই বেরিয়ে এসে হাস্‌তে হাস্‌তে কুমুদের দিকে চেয়ে বললে, "ওমা! এ-ও যে স্নান-টান সারা দেখ্‌চি! খাওয়া দাওয়াও সারা হয়ে গেছে, বোধ হয়?"

কুমুদ বল্‌লে, "বাঃ, সকাল বেলাতেই স্নানাহার সেরে এসেছি, কি রকম?"

"কৈ, যে-রকম ফিট্‌ফাট দেখচি, তাতে অনাহারী বলে ত মনে হচ্ছে না!"

কুমুদ শালের মধ্যে হাত দুখানা ঢেকে নিয়ে বললে, "তা বৈ কি!" তার পর বললে, "উঃ, কি শীত বৌদি!"

বড় বৌ একটু হেসে বললে, "রোদ পোয়াবে? তা যাও না, ছাতে খুব মিষ্টি রোদ্দুর আছে, সেবন কর গে!"

আশে-পাশে যারা ছিল, সবাই মুখ টিপে হাস্‌তে আরম্ভ করলে, অর্থাৎ কুমুদের আর বুঝতে বাকী রইল না যে ছাতে রোদ্দুর বলে কি পদার্থ আছে!

এদিকে ময়না বেচারী কি যে করে, ভেবে পাচ্ছিল না। উঠোনের দিকে এক-সার রেলিং ছিল, তার উপরে ভর দিয়ে সে নীচের দিকে চেয়েছিল। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল, শুধু এক-তলায় স্নানের ঘরের ছাদটুকু। হঠাৎ অতর্কিতে দুখানা সবল পরিচিত হাত তাকে ঘিরে ধরতেই অতর্কিত

আনন্দে মুখ ফিরিয়ে সে হেসে ফেললে! অনেকক্ষণ ধরে রোদের তাত লেগে ময়নার পিঠের কাপড় বেশ গরম হয়ে উঠেছিল,—কুমুদ বললে, "গরম হয়ে গেছ যে!"

মাথা নেড়ে ময়না বললে, "তা হবো না,—কোন্ সকাল থেকে ছাতে বসে আছি!" তার মাথা-ঝাঁকানির ভঙ্গী দেখে কুমুদ হাসলে, বললে, "কেন?"

"কি করি, ওদের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, দ্যাখো না আমার পিছনে লেগেছে!"

"অপরাধ!"

"এমনিই। দ্যাখো না,—আচ্ছা, তুমিই বল দেখি, আমি না কি সাজ-গোজ করেচি?"

কুমুদ এক পলক তার দিকে চেয়ে থেকে বললে, "কি জানি! আমি অত বুঝিনে, তা সাজবার দরকারও তো বিশেষ কিছু নেই, ভগবান্ দয়া করে এমনিই যা দিয়েছেন, তারি জ্বালায়—"

ময়নার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌লো, সে বললে, "ঐ নাও, আবার তুমিও ঐ সব সুরু করলে বুঝি?"

নীচের তলায় গিন্নির পূজো সারা হয়েছিল। তিনি আসন ছেড়ে উঠে বললেন, "কৈ, ছোট বৌমা গেল কোথায়?"

বড় বৌ বললে, "সে তো সেই বড়ি রোদে দিতে ছাদে গেছে।"

শাশুড়ী বললেন, "ওমা,—আর নাবে নি? কুমুদ তো জলটল খেলে না, সেও ছাতে গিয়ে উঠেছে বুঝি?"

বড় বৌ একটু হাসলে; শাশুড়ী একটু বিরক্তভাবে বললেন, "এদের সবই অনাছিষ্টি, বাপু!"

বিকেলে মায়ের কাছে বসে জল-খাবার খেতে খেতে কুমুদ আস্তে আস্তে কি-সব বলছিল, মাও আগ্রহ করে তাই শুনছিলেন দেখে বাড়ীর সব তরুণ-দলের চাঞ্চল্য ভয়ানক বেড়ে গেল। কি যে এমন কথা হতে পারে অনেক ভেবে-চিন্তেও কেউ ঠাওর করতে পারলে না! বাড়ীর কর্তা অন্যদিন অফিস থেকে বাড়ী এসে বিকেল বেলাটা প্রায়ই বেড়াতে যান—সেদিন রাত ন'টা অবধি শুধু কুমুদের সঙ্গে গল্প করেই কাটালেন—এও একটা কম আশ্চর্য্যির কথা নয় তো! কেন না কুমুদ ইচ্ছে-সাধ্যে তো তার বাবার ত্রিসীমা মাড়াতে চাইত না, বরং প্রাণপণে সেদিকটা এড়িয়েই চলতো। অফিসের ছোট-খাট কেরাণীরা তাদের সাহেবকে যত না ভয় করে, কুমুদ তার বাবাকে তার চেয়ে বেশী ভয় করতো, তার আসা-যাওয়াটা তো বেশীর ভাগ তার বাবা টেরই পেতেন না। এমন যে কুমুদ,—তার হঠাৎ বাবার সঙ্গে অত ভাব হয়ে যাবার কারণ কি, কেউ তা বুঝে উঠতে পারলে না! ময়না কোন রকমে কিছু না বুঝে বড়বৌকে গিয়ে বললে, "ব্যাপার কি ভাই বড়দি? কিছু শুনলে?"

বড় বৌ হাসি চেপে বললে, "শুনলুম বৈ কি, তা কি করবি, বল্? দুটো বিয়ে তো কত লোকই করে, তাতে আর কি হয়েচে এমন?"

একেবারে অবাক্ হয়ে ময়না বললে, "তুমি কি বলচো তার ঠিক নেই—যাও!"

বড় বৌ তার শুকনো মুখের ভাব দেখে বললে, "আমি কি আর সাধ করে

বল্‌চি! কোন্ এক বড় লোকের ডাগর সুন্দরী মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে ঠাকুরপো বাবার কাছে বিয়ের কথা পেড়েছে যে! হয় না হয়, তুই জিজ্ঞেস করে দেখিস্।"

কথাটা একেবারে অবিশ্বাস করেও সেদিন কুমুদের বাড়াবাড়ি রকম আদর পেয়ে ময়নার মনটা খুবই দমে গেল। তার এই সব ছোট-খাট দুষ্টুমি, খুনসুটি ভালো রকম জমে না উঠতেই কুমুদ আদর দিয়ে থামিয়ে দেবে, এটা সে একেবারে পছন্দ করতো না।

দিন সাতেক পরেই জানাজানি হয়ে গেল যে কুমুদ বিলেত যাচ্ছে। আগে জানাজানি হলে, যদি যাত্রাটায় বাধা পড়ে, তাই ব্যাপারটা নিয়ে এত কানাঘুষো চল্‌ছিল। বাবার স্ফূর্ত্তিতে, আর পাঁচ জায়গায় সমাদরে নেমন্তন্নের ধূমে কুমুদের বুকখানা উৎসাহে ফুলে উঠ্‌ছিল। সে তার স্ফূর্ত্তির ভাগ দিয়ে ময়নাকেও খুসী করতে চাইছিল, কিন্তু বেচারী ময়না যে কিছুতেই সে ভাগ নিতে পারছিল না! যদিও সে সাফ বলতে পারছিল না যে ওগো তুমি যেয়ো না,—কেন না তার মত ছেলেমানুষ ছেলের মা হলেও কাজের কথায় কথা কইবার মত দাম তো তার হয় নি! সে কেবল মধ্যে মধ্যে বলতো, "তা বেশ তো, তুমি যাও না, আমি মরে যাবো'খন। তুমি তখন আবার খুব সুন্দর দেখে মেম বউ নিয়ে এস।"

কুমুদ শুনে হাসত।

যাবার দিন কাছে এসে পড়লো, গোছ-গাছের তাড়ায় কুমুদ ময়নার দিকে ভাল ক'রে চাইবারও অবকাশ পেত না,—তা পেলে হয়তো ময়নার মুখের চেহারা দেখে সে শিউরে উঠ্‌ত।

কুমুদের সাধের ফটো-ক্যামেরা প্রায় মাস কতক ধরে একটা শেল্‌ফের উপর তোলাই ছিল, অনেক দিনকার অব্যবহারে তাতে সাত-পুরু ধূলোমাটি জমে রংয়ের পালিস-টালিশ একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, অনেক-দিন মানুষের হাত না পড়ায় মাকড়সা তাকে জালে বেশ দখল করে নিয়েছিল, হঠাৎ অসময়ে সেইটে পেড়ে নিয়ে কুমুদ পরিষ্কার করছিল!

চুল-বাঁধা শেষ করে তার সাজ-সরঞ্জাম, চিরুণী, সিঁদুর-কৌটো এই সব নিয়ে ঘরে রাখতে এসে ময়না থম্‌কে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি হবে গা ওটা?"

এক টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে ক্যামেরা সাফ করতে করতে কুমুদ বললে, "এটার কাজ আছে—একজন সুন্দরীর তস্‌বীর তুলে নিতে হবে।"

ময়না বললে, "তা ভালো। সেখানে সুন্দরী রূপসীর তো আর অভাব হবে না।"

কুমুদ ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে বল্‌লে, "না, এইবার থেকে তিনি বুকে-বুকেই থাক্‌বেন।"

ময়না উদাসভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, "তা থাকুনগে যান।" তারপর একটু থেমে অলক্ষ্যে গলাটা সাফ করে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সে বললে, "আচ্ছা, বিলেতে ক'বচ্ছর থাকতে হয় গা?"

এর উত্তর হয় তো তার একশো বারই শোনা হয়ে গেছে, তবু সে কেবলি যেন ভুলে যাচ্ছিল! কুমুদ স্নেহ-কোমল গলায় বললে,

"ক বছর! বেশী দিনতো নয়, ছ'তিন বছর মোটে!"

"তিন বছর! সে বড় কম দিন হল, বুঝি? তাহলে তুমি না হয় ছ'বছরই করো।"

বেশ নরম হয়ে কুমুদ বললে, "তা এ আর কটা দিন গো!"

"এক হাজার আশী দিন! বড্ড অল্প দিনই হল, নয়?"

একটু বিস্মিতভাবে কুমুদ বল্‌লে, "দিন, ঘণ্টা সব গোণা-গাঁথা হয়ে গেছে দেখ্‌ছি যে!"

চোখের জলে-ভেজা ভারী গলায় "হুঁ" বলে ময়না মুখ ফিরিয়ে পশ্চিম দিক্‌কার ফাগ-মাখা মেঘের ঢেউয়ের মাঝে ঝল্‌মলে সূর্য্যের অস্ত যাওয়া দেখতে লাগলো। তার টুক্‌টুকে মুখখানিতে রাঙা আলো লেগে সেখানিকে আরও রাঙিয়ে তুলেছিল।

৪

ছ'মাসের উপর হল কুমুদ চলে গেছে। বিলেতে পৌছেই টেলিগ্রাম করে পৌছন-খবর দিতে সে অবশ্য ত্রুটি করে নি; চিঠি-পত্রও রীতিমত আসছিল! সে দিনটাও ছিল বিলেতের ডাক আসবার দিন! কিন্তু সেদিন চিঠির জবাব না পেয়ে ময়নার শুধু যে ভাবনাই হয়েছিল তা নয়, অভিমানও হয়েছিল অনেক-খানি। সে যে নতুন জিনিষটি পেয়েছে, তার আসার খবর পেয়েও তিনি উত্তর দিতে পারলেন না! মেয়ে বলেই কি তিনি অগ্রাহ্য করলেন? ছোট্ট বিছানায় শুয়ে যেখানে তার সজীব পুঁতুলটি হাত-পা নেড়ে খেলা করছিল, সেইখানে উঠে গিয়ে ময়না তার কচি গালে একটি চুমু খেয়ে নিলে।

পরের ডাকে কুমুদের চিঠি এল। তখন ময়না তার ছোট বোনের বিয়েয় বাপের বাড়ী এসেছে। বিয়ের গোলমালে, নানা কাজ-কর্ম্মের ভিড়ে কারো নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় নেই, ময়নার এক ভগ্নীপতি চিঠিখানা হাতে করে এনে বললেন, "কোথায় গো উষা! তোমার সমুদ্দুর-পারের সন্দেশ এসেচে, ইলার বাবার পাঠানো, নাও।"

ইলার বাবা! কথাটা শুন্‌তে নূতন হলেও ময়নার কাণে বেশ মিষ্টি লাগলো; আগ্রহে আনন্দে সে চিঠি খুলে দেখলে, কুমুদ অনেক কথাই লিখেছে। গেল বারে একটি বাঙালী ছাত্রের অসুখের পরিচর্য্যায় ছিল, তাই সে-ডাকে সে চিঠি দিতে পারেনি,তাও লিখেছে, আর এই সব কথার ফাঁকে-ফাঁকে সে যে তার বুক-পকেটের ছবিখানি এক মিনিটের জন্যও হারায়নি, বরং দিন্‌কের-দিন সেখানির মধুরতা বেশী হয়ে উঠছে, এ খবরটিও দিতে ভোলেনি! কিন্তু নেই একটিও কথা খুকুর সম্বন্ধে! নিজের আদর অত-বেশী তার ভাল লাগলো না! তার ভারী দুঃখ হল, দেখলেন না বলে বুঝি তিনি খুকীর খবরটিও নেবেন না?

বোনের বিয়ের আমোদ-আহ্লাদে দিন-কতক কাটিয়ে সে যখন শ্বশুরবাড়ী এল, তখন তার খুকু বেশ হাস্‌তে শিখেছে, তার জা এবার তার বদলে তার ইলাকেই বুকে করে চুমু খেলেন। ময়না মনে মনে খুসি হলেও মুখে বল্‌লে, "আমি বুঝি আর কেউ নই?"

[illegible] দিকে চেয়ে শুধু একটু হাসলে!

[illegible] খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বাড়ীর
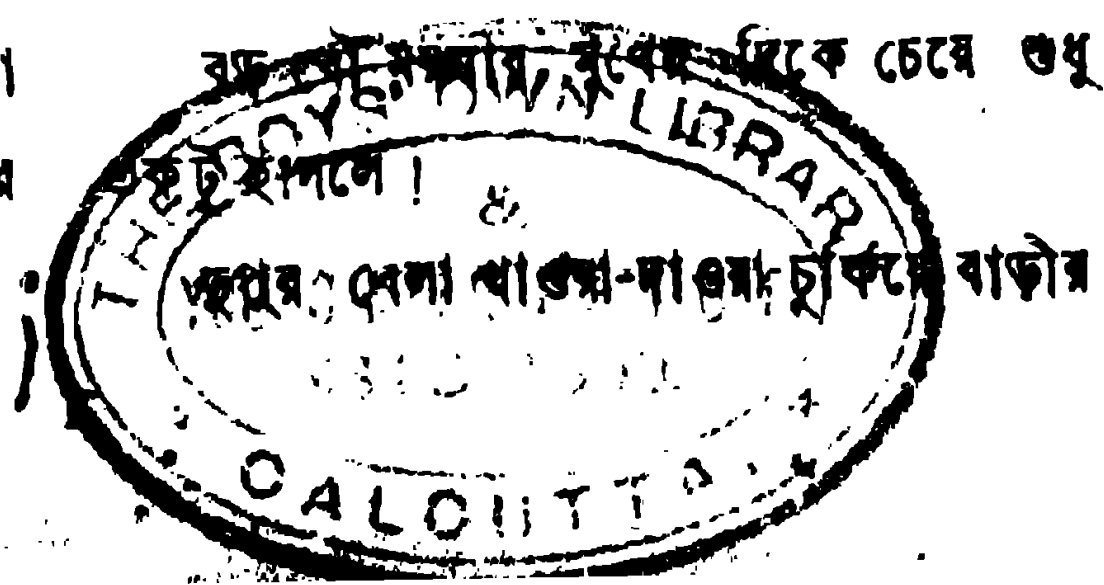
সবাই প্রায় ঘুমিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছিল। প্রখর রৌদ্রে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে,—রোদের ঝাঁঝ এড়াবার জন্যে জানলা বন্ধ করে ঘরের শানের মেঝেটি গামছায় মুছে ঠাণ্ডা করে নিয়ে তারি উপর শুয়ে ময়নার সঙ্গে গল্প করতে করতে বড়বৌও ঘুমিয়ে পড়ল! কিন্তু ময়নার চোখে ঘুম এল না। চোখ বুজে আর কতখানি সময় ফাঁকি দিয়ে কাটানো যায়? সে মনে মনে হিসেব করতে বসলো। তিন বছর পুরতে আর কত দেরী আছে? আর কতদিনে তিনি আস্‌বেন?

হিসেবটা তার পূর্ণ হতে না হতে দোলনা থেকে ইলা চীৎকার করে কেঁদে উঠল। মাকে আর ভাববার চিন্তবার সময় মোটেই দেবে না, এই যেন তার কচি মেয়ের মতলবখানা।

ঢং ঢং করে পাঁচটা বেজে গেল। অফিস-ফেরত কর্ত্তার তীব্র গলার স্বরে ময়না একেবারে আকাট হয়ে থেমে পড়লো, একটা অজানা ভয়ে বুকের মধ্যকার ধ্বক্‌-ধকানিটা বেশী রকম বেড়ে গিয়ে তার দু'চোখের সামনে সব যেন শর্ষে ফুলে ছেয়ে দিলে। একটু পরেই খবর এল, বিলেতের ডাক এসেছে, কুমুদের ফেলের খবর নিয়ে।

খবর শুনে ময়না তাড়াতাড়ি গিয়ে ইলাকে বুকে চেপে ধরলে। ফেল! তবু ভালো!

কর্ত্তা তো তখনকার মত খুবই রেগে গিয়ে ছিলেন। এক রাশ টাকার শ্রাদ্ধ করে ছোঁড়াটা যে তাঁর বাঁদর হয়েই ফিরবে, তখনকার মত এতে আর তাঁর কোনো সন্দেহই ছিল না। কুমুদ গিয়েছিল সিভিল্‌ সার্ভিস্‌ দিতে কিন্তু তা আর হবার উপায় রইল না। সে লিখেছে যে ইঞ্জিনিয়ার হবার চেষ্টায় আছে;—শুনে তার বাবা হতাশ হয়ে বল্‌লেন, "আর তার মাথা হবে!"

কুমুদের এক ভাগ্নে একবার ফিপ্‌থ ক্লাসে ফেল করে প্রোমোশন না পাওয়ায় মহা দুঃখে কান্নাকাটি জুড়ে বাড়ী-শুদ্ধ লোকের হাড় জ্বালাতন করে তুলেছিল, সেই সময় কুমুদ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, "Try again." কথাটা সময়গুণে সে ছেলেটির খুবই ভালো লেগেছিল। সে বুঝেছিল যে তার ছোট মামা তবু একটু সহানুভূতি দেখালেন তো! সেই ভাগ্নে যখন ময়নাকে একটু গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বার হতে দেখ্‌লে, তখন খুব উৎসাহ দেখিয়ে বল্‌লে, "তার আর কি ছোট মামী, তুমি লিখে দাও না, আর একবার চেষ্টা করলেই ও হয়ে যাবে!"

ময়না একটু হেসে বল্‌লে, "না বাবা, তাঁর আর কিছু হবে না!" কিন্তু ছেলেটি তখন বেশ করে মাথা ঘামিয়েও ঠিক করতে পারলে না যে আর-একবার পড়লে না হবে কেন? বিশেষ ফিপ্‌থ্‌-ক্লাসেও যখন হয়!

৫

ইলা এখন সাত বছরের মেয়ে। লেখা পড়া নিয়ে, গান নিয়ে, অনর্থক আব্‌দার জুড়ে দিয়ে, তার মায়ের অর্দ্ধেক সময় সে দখল করে থাকে।

কুমুদ ফিরে আস্‌ছে ব্যারিষ্টার হয়ে। তবু যে করে খাবার পথ একটাও করে নিতে পেরেছে সে, তাতে তাঁর বাবা খুসীই হলেন, অবশ্য! তাঁর আগ্রহ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছিল।

বাড়ী থেকে কুমুদের দাদা আর বাবা তাকে আন্‌তে হাওড়া ষ্টেশনে যাবার সময়

ইলার স্ফুর্তি দেখে কে! সে তার পুসিটার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে শুনিয়ে দিলে যে তার বাবা আসছেন। কিন্তু যেই তার দাদামশায় যাবার সময় তাকে ডাকলেন, "চল্‌রে ইষ্টিসন থেকে বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে আনিগে—" অমনি তার সমস্ত আগ্রহ নিভে গেল, অজানা অচেনা বাবার সঙ্গে দেখা করবার উৎসাহ না দেখিয়ে সে গিয়ে তার মায়ের পাশ ঘেঁসে দাঁড়ালো। ময়না তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা দর্শনীয় বস্তু করে তোলবার প্রকাণ্ড চেষ্টা করতে বসলো। বড় বৌ হেসে বল্‌লে, "ওকে সাহেবি পছন্দয় সাজাস্‌রে ময়না, নাহলে বাপ মেয়েকে চিনতে পারবে না।"

ময়না চুপ করে শুনলে, কিছু বল্‌লে না। শুক্তি তার বুকে মুক্তার সৃজন করে, সেই মুক্তাকে ঔজ্জ্বল্য দিতে গিয়ে যে নিজেকে সকল সারাংশ থেকে বঞ্চিত করে, করেই সে সুখী হয়, হয়তো মাও তেমনি নিজেকে নিঃশেষ করে সন্তানকে দিয়ে দেন। ময়নাও ভাবছিল, কেমন করে সাজালে তার মেয়েকে তার চেয়েও ঢের বেশী সুন্দর দেখাবে, কুমুদ দেখলেই বুঝবে, এমন জিনিষটি আর কারো নেই!

ক্রমে যখন বিরক্ত কুকুরের মত ভ্যাক্ ভ্যাক্ করে হর্ণ বাজাতে বাজাতে গলির লোক সরিয়ে ট্যাক্সি মোটর বাড়ীর দুয়োরে এসে থামলো, আর তা থেকে পুরাদস্তুর সাহেব সেজে কুমুদ তার বাপ-দাদার সঙ্গে নেমে বাড়ী ঢুকলো, তখন ইলা একেবারে ময়নার গোপন উল্লাসে, অদমনীয় চাঞ্চল্যে বুকের মধ্যেকার হৃদয় যন্ত্রটা যেখানে লাফালাফি জুড়ে দিয়েছিল, ঠিক সেইখানে মুখ লুকিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌লে, "মা, সাহেব!"

বুকের অশ্রান্ত দাপাদাপিতে ময়না যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। মাথা হেঁট করে ইলাকে একটা চুমু খেতে গিয়ে সে মুখ তুলে নিলে,—চুমু খাওয়া হল না। ইলার মুখে পাউডার দিয়ে ইলাকে সাজিয়েছে সে,—চুমু খেতে গেলে সেটুকু উঠে যায় যে!

মশ্ মশ্ করে জুতোয় কঠোর শব্দ তুলে কুমুদ সহাস্য মুখে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল, সাহেবী হ্যাট্‌টা বাবার পায়ে প্রথম প্রণাম করবার সময়েই খুলে রেখেছিল, সেটা আর তখন মাথায় ছিল না; সাহেবি পোষাকের বোঝা খুলতেই সে ঘরে ঢুকেছিল, এ বাড়ীতে সে-ই প্রথম বিলাত-ফেরত সভ্য, এর আগে কেউ তা ছিলেন না, কাজেই "ড্রেসিং রুম" বলে একটা আলাদা জায়গা এ বাড়ীতে ছিল না, ওটা শয়ন 'রুমে'ই চলতো!

কুমুদ থম্‌কে দাঁড়ালো! থপ্ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও কথাও বল্‌তে পারলে না, সে যেন কত নতুন! কুমুদ অবাক হয়ে দেখ্‌লে, তার চোদ্দ বছরের চঞ্চলা ময়নাটির বদলে একজন পরিপূর্ণা নারী তার সন্তানকে বুকে চেপে দাঁড়িয়ে আছে, এ তো সেই মুখ-ভরা চাপা হাসির জলুস্ নিয়ে কৈ কাছে ছুটে এল না? বুক-ভরা কতখানি আবেগ কি নিঃশব্দে যে সে চেপে যাচ্ছে তা তার করুণ চোখের স্নিগ্ধ সজল দৃষ্টিতেই ধরা যায়। এক মিনিটেই কুমুদ বুঝে নিলে তার সে-ময়নাকে সে কাল-সাগরে হারিয়ে ফেলেছে;—এবার এই নূতনকে নিয়ে ঘর করতে হবে।

মেয়ের দিকে নজর না করে কুমুদ ময়নার দিকেই এগিয়ে এল। ময়না ব্যস্ত হয়ে মেয়েকে ঠেলে দিয়ে বললে, "প্রণাম করো ইলা, প্রণাম করতে হয়!"

তাদের দুজনের মাঝখানেই এত বড় যে একটি জীব গড়ে উঠেছে, এতখানি খেয়াল কিন্তু কুমুদের হয়নি। পোষাকের বোঝা ছেড়ে ছুড়ে সাত বছর পরে সাদা ধুতি পরে সে যখন ঘর থেকে বার হল, তখন তার বৌদিদি আসন পেতে খাবার দিয়ে তাকে ডাকলে, সে খেতে বস্‌ল। বৌদি হেঁকে বললে,—

"ইলা মা, একবার এদিকে আয় তো।"

ইলা ঘর থেকেই একটু খানি মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলে, তারপর খুব আস্তে আস্তে অনেকখানি ঘুরে জেঠাই-মার পিঠের দিকে গিয়ে দাঁড়ালো; বড় বৌ হেসে বললে, "এটিকে চিন্‌তে পারো ঠাকুরপো? বল দেখি এ কে?" কুমুদ মাথা নেড়ে একটু হাস্‌লে, আড়াল থেকে তার সে হাসি দেখে ময়নার চোখে যেন অমাবস্যার পর চন্দ্রোদয় হল। বড় বৌ বাঁ হাত দিয়ে ইলাকে জড়িয়ে ধরে সামনের দিকে টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লে, "ইনি আমাদের ব্যারিষ্টার সাহেবের মেয়ে, মিস্ ইলা—"

কুমুদ অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরে যেন নূতন চোখে চারদিক চেয়ে-চেয়ে দেখছিল, সে বৌদিদির কথায় অত কাণ করেনি, মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, "কি হল নামটা? ইলা, না?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তা নইলে ব্যারিষ্টার সাহেবের মেয়ের নাম কি আর নারান-দাসী হলে মানায়? না মাতঙ্গিনী হলে মানায়?"

দিন কয়েকের মধ্যেই মেয়ের সঙ্গে কুমুদের বেশ ভাব হয়ে গেল। পথে-ঘাটে অবধি চেনা লোকে দেখ্‌তো যে ঘষা ফুলো চুলে রিবন-বাঁধা, ফ্রক পরা ফুট্‌ফুটে সুন্দর একটি মেয়ে কুমুদের বাঁ হাতের আঙুল ধরে দিব্যি হাস্‌তে হাস্‌তে পথে চলেছে।

তবে ময়নাকে আগের মত সুলভভাবে পাওয়া আর তার হয়ে উঠ্‌লো না। মাঝের সাতটা বছর তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে সে মা হয়েছে, সংসারী হয়েছে। তখন আর এখন—দু'য়ে আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। এখন যেন আর কথায় কথায় হাসি-ঠাট্টা চিম্‌টি কাটা, খোঁপা খুলে দেওয়া কিছুতেই চলে না—সে উৎসাহ তার আর নেই!

৬

ব্যারিষ্টার কুমুদ মজুমদারের গোষ্ঠীর কোনো মেয়ের তেরো পেরিয়ে বিয়ে হয় নি, কথা সে পাড়ার সকলেই জান্‌তো, আর এমন কথা কখনো কারো মনেও হয় নি যে এমন কাজ কেউ করতে পারে যাতে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়, তাও আবার সখ করে।

ব্যারিষ্টার সাহেবের মেয়ের কিন্তু চৌদ্দও উৎরে চল্‌লো। কিন্তু তার আর বিয়ের নাম-গন্ধও শোনা গেল না। ঐ একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে, তারপর সারাদিনকার পরিশ্রান্ত দেহখানি টেনে বাড়ী এসে কার মুখ দেখে জুড়োবে—ভাবতে বস্‌লেই বাড়ীর একটি মাত্র ঐ ফুটন্ত হাসির ফুলটির নির্ব্বাসন চিন্তায় সমস্ত মন বিষিয়ে উঠ্‌তো।

আশ-পাশের পাড়া-পড়শীর কথার খোঁচা পাঁচবার খেয়ে ময়না এক-আধ বার মেয়ের বিয়ের কথা তুল্‌তো, কিন্তু তার কথার উত্তরে কুমুদ এম্‌নি এক-একটি গুণধর পাত্রের নাম

করতো যে তার আর কথা কইবার যো থাকতো না। মাগো! এমন সব পাত্তরের হাতে কি আর তার ইলাকে দেওয়া চলে? তার চেয়ে বেশ আছে সে।

সেদিন সন্ধ্যে উৎরে যাবার পর কুমুদ একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "এইবারে ইলা-মাকে বিদেয় করবার একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্চে, সেটা আমার নেহাৎ খারাপও মনে হচ্ছে না।" ময়না স্বামীর মুখ-পানে চেয়ে বললে, "কোথা থেকে?"

কুমুদ তখন চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসে সব কথা ভেঙ্গে চুরে বললে, পাত্রটি নিতান্ত গরীব, তাকে খরচ চুকিয়ে মানুষ করে নিতে হবে, দেখ্‌তে ছেলেটি খুব সুন্দর, বেশ বুদ্ধিমান, নাম অরুণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ময়না এ সব খবরও শুনে নিলে, এর পর আর তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতের কোন অমিল রইল না।

মাস দুই পরে বোশেখ মাসের মাঝামাঝি একদিন কুমুদ তার আদরের ইলাকে পরের হাতে সম্প্রদান করে দিলে। বিয়েয় কন্যা দান করবার সময় মেয়ের বাপের বুকে যে বাষ্প ভরে উঠেছিল, তরুণ অরুণের হর্ষোৎফুল্ল মুখে ঠিক সেই পরিমাণেই আলোর দীপ্তি জেগেছিল। আর সেই আলোতেই দরিদ্র অরুণ ইলাকে অভিনন্দন করে নিলে। মনের সম্পত্তি ছাড়া বাইরে কাণা কড়ির সংস্থানও তার ছিল না যে!

বিয়ের পর অরুণের সমস্ত ভার পড়লো কুমুদের মাথায়। সে—নিজের জন্যে এককালে যে ব্যবস্থা ছিল—জামাইয়ের জন্যেও তাই করে দিলে, অর্থাৎ হোষ্টেলে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ছুটি-টুটি পেলে শ্বশুর বাড়ী আসা,—অবশ্য কুমুদের ওখানে ছিল নিজের বাড়ী আসা! ব্যবস্থাটা করবার সময় কুমুদের নিজের কথাটা ঠিক মনে পড়েনি—কিন্তু চৌদ্দ বছর আগেকার কত কথা ময়নার সেদিন কেবলই মনে পড়ছিল।

৭

চৌদ্দ বছর পরে যে শীত-কালটি বছর বছরকার সেই হাড়-গোড় বের করা জরাগ্রস্ত পঙ্গু চেহারা নিয়ে কাশের সাদা চামর দুলিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে এসে দেখা দিলে, তার চেহারা আসলে হয়তো এখনো যেমন, চৌদ্দ বছর আগেও ঠিক তেমনিটিই ছিল, তবে মানুষের যেমন বাঁধা গৎ আছে তেমনি সে বছরও সবাই বলছিল যে, এমন ভয়ানক শীত আর কখনো পড়েনি, এই প্রথম পড়ছে! ইলাও তার চোদ্দ বছরের অভিজ্ঞতায় রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়ে শোবার সময় ময়নাকে বলছিল, "এমন শীত আর কক্ষণো পড়ে নি, না মা?"

ময়নাও উত্তর দিয়েছিল যে হ্যাঁ, এবার শীতটা বড্ড বেশী পড়েছে! কিন্তু রাত পোহাতে ঘুম ভেঙ্গেই সে দেখ্‌লে, ইলার খাটের বিছানা একেবারে খালি—সে কখন্ উঠে গিয়েছে! ছোট্টটি থেকে এমন দিন খুব কমই হয়েছে যে মা ডাকাডাকি না করতেই তার ঘুম ভেঙ্গেছে, তা ছাড়া তার জলচোরা মেয়েটি শীতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মাথার খোঁপা কাঁধে এসে ঢলে পড়লেও স্নানের নামেই আলগোচ। হাত পা আর মুখটুকু সাবান ঘসে ধুয়ে ফেলতে পারলেই যে

একটা যুদ্ধ জয় করার পূর্ব্বে নিজেকে মস্ত সাহসী মনে করে, সাত সকালেই তার গা-টা ধোওয়া সারা হয়ে গেছে! ছাতের আল্‌সের তার ভিজে চৌখুপী ডুরে সাড়ীখানি আর সেমিজটি শুকুতে দেওয়া ঝুলছিল। কেবল ইলাই কোথায় লুকিয়ে পড়েছে, তার খোঁজ নেই। অবশ্য ময়নার বুঝতে দেরী হল না যে মেয়ে তার বাগানে গিয়েই বসে পড়েছে হয়তো!

বাস্তবিকই ইলা তখন তাদের বাড়ীর পশ্চিম দিক্‌কার বাগানে বেঞ্চের উপর বসে কতকগুলো ফুল তুলে তোড়া বাঁধ্‌ছিল, এমন সময় পিছন দিককার ফটক দিয়ে অরুণ এসে ঢুকে পড়লো,—ইলা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মাগো! লিখ্‌লে কিনা পাঁচটায় আস্‌বে,—এই বুঝি তোমার পাঁচটায় আসা!"

অরুণ বললে, "আস্‌তুম, তা তোমার ঘুম তো জানি! অত ভোরে যে ভাঙবে না। তা বুঝতে পেরেই দেরী করলুম।"

"ইস্‌, তা বই কি! আমি আজ কখন্‌ থেকে এসে বসে আছি, জানো মশাই?... তা অসময়ে এলে যে। আজ কি কলেজ বন্ধ না কি?"

"না গো, কলেজ অত সদয় নয়, আমি এখান থেকে ফিরে গিয়ে কলেজ করবো, তুমি বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে খবর দিয়ে রাখনি তো!"

"না, তুমি গিয়ে কলেজ করবে! পারবে তো?"

"খুব পারবো—" বলে অরুণ পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে, "এই হল সাতটা,—সাড়ে আটটায় বেরুলেই চল্‌বে।"

ইলা অরুণের পানে একটু চেয়ে থেকে বল্‌লে, "তুমি এসেছ, তা কি কাউকে বলবো না?"

অরুণ ইলার পিঠে হাত চাপড়ে বল্‌লে, "না, লক্ষ্মীটি!"

"কিন্তু সাড়ে সাতটায় চা খাবার সময়, বাবা আমাকে খুঁজবেন যে!"

অরুণ বল্‌লে, "তা তিনি খুজ্‌তে খুঁজ্‌তেই আমি চম্পট দিতে পারবো—আমার সাইকেল আছে!"

সকাল বেলা চা জল-খাবারের সময় প্রায়ই কুমুদের কাছে ইলা উপস্থিত থাক্‌তো, ময়না এ সময়টা সংসারের অন্য কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকতো, সে এদিকে আস্‌তে পারতো না, এলেও বসতে পারতো না—তাই ইলার সঙ্গেই একটু গল্প করে চা খেয়ে কুমুদ বাইরে চলে যেত। সেদিন ইলাকে সামনে না দেখে কুমুদ বল্‌লে, "হ্যাঁ গা, আজ ইলা গেল কোথায়?"

ময়না সেইখানেই ছিল, সে বললে, "কেন তাকে?"

"না, এমনিই বলচি।"

ময়না স্বামীর খুব কাছে সরে এসে ইলার তিরোধানের কারণটি জানিয়ে দিতে দিতে নিজেদের এই বয়সের সেই মিষ্টি স্মৃতি মনে করে হাস্‌লে, কিন্তু কুমুদ যখন আর এক পাক ঘুরে এসে শুনলে, ইলা বাগানে,—তখন সে ভ্রূটা ঈষৎ কুঁচ্‌কে বহুদিন আগেকার তার মা-বাপের কথারই যেন প্রতিধ্বনি করে আপন-মনে বলে উঠল, "এদের এ কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড!"

শ্রীনীহারবালা দেবী।

সেকালের নকল চোখ

মিসরের পুরাতত্ত্ববিদ্ এবার্স সাহেব বলেন যে, নকল চোখ-ওয়ালা "মমী" (mummy) এপর্যান্ত পাওয়া যায় নাই বটে. কিন্তু ঈলিয়ট্ স্মিথ্ প্রণীত কায়রো যাদুঘরের মমী-বিভাগের নির্দ্দেশ-পুস্তকে নকল চোখের উল্লেখ আছে—যদিও তিনি বিশেষ কোন বিবরণ দেন নি।

ব্রসেল্‌সের যাদুঘরে মার্ব্বেল পাথরের, পোড়ামাটির, এনামেলের আর কাঁচের চোখ আছে, এগুলোকে "মমীর চোখ" ব'লে নামকরণ করা হয়েছে। এই সকল চোখ মার্ব্বেল পাথরের উপরে কাঁচ বসিয়ে মমীর মুখোসের জন্যে তৈরী করা হ'ত। কাঁচটা চোখের কালো তারার জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হ'ত। সাধারণত এইরকম চোখই তৈরী হ'ত, কিন্তু কখনও কখনও ব্রোঞ্জ ধাতু ও অন্যান্য পদার্থও ব্যবহার হ'ত আর তাতে অনেক কার্য্য সৌষ্ঠবও থাকৃত।

পরবর্ত্তী উন্নত-যুগে পোড়া মাটি আর এনামেল দিয়ে চোখ তৈরী হ'ত। চোখের সাদা অংশটায় অনুজ্জ্বল সাদা এনামেলের আর তারার জায়গায় পাঁশুটে নীল রংয়ের কাঁচ ব্যবহার হ'ত। মিসরবাসীরা এইরকম চোখ তৈরী করতে খুব ওস্তাদ ছিল। শাসনকর্ত্তার আর দেব-মূর্ত্তিগুলির চোখ খুব কারিকুরি ফলিয়ে তৈরী করত আর তাতে দামী দামী সব পাথর বসানো থাকত। কলিকাতার যাদুঘরে যে মমী আছে তার মুখোসে সাদা এনামেলের উপর নীল-পাথর-বসানো চোখ আছে—এটা নাকি চার হাজার বছরের পুরানো। কিন্তু সে সময়ে জীবন্ত মানুষ যে নকল চোখ ব্যবহার করৃত, এ-রকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

প্রোফেসর ভ্যান্ ডুস্ বলেন, প্রথম যে ব্যক্তি নকল চোখ ব্যবহার করেন তাঁর নাম পল্, ইনি এজিনা দেশের লোক, আর সাত শতাব্দীতে ইনি জীবিত ছিলেন। হিব্রু আইন-পুস্তক তাল্‌মুদে (Talmud) এই রকম চোখ সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে সেটা যদি সত্য হয় তাহ'লে আরও পূর্ব্বে—দ্বিতীয় ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে—জীবন্ত মানুষ নকল চোখ ব্যবহার করেছে ব'লে স্বীকার করতে হ'বে। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ইহুদী চক্ষু-চিকিৎসক প্রোফেসর হার্সবার্গ বলেন, তাল্‌মুদে চোখের যে উল্লেখ আছে, সেটা আজকাল নকল চোখ বলতে যা বুঝায় ঠিক সে-রকম কোন জিনিষ নয়।

শ্রীবামাপদ বসু।

অ্যাক্রোপলিস্

প্রাচীন গ্রীস যে সভ্যতায় কতটা উন্নতি-লাভ করিয়াছিল, এথেন্স নগরের অ্যাক্রো-পলিস্ এখনো তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

গ্রীক ভাষায় acros অর্থে উচ্চতম এবং polis অর্থে নগর। আসলে অ্যাক্রোপলিস্ একটি ক্ষুদ্র শৈল। নীলাচলের উপরে যেমন হিন্দুদের জগন্নাথ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, গ্রীসের এই শৈলের উপরেও তেমনি প্রাচীনকালে

যুবক আপলো (খৃঃ-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী)

অনেক গ্রীক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শৈল "The sacred rock of Athena on the plain" বলিয়া বিখ্যাত।

খৃষ্টজন্মের বহুযুগ পূর্ব্বে এই অ্যাক্রো-পলিসকে আশ্রয় করিয়া গ্রীক তথা জাগতিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ ভাবের মাধুর্য্য বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীকজাতির মত শিল্পী জাতি পৃথিবীতে আজ-পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। আমরা তাঁহাদের চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য কলার সম্পূর্ণ নিদর্শন আর দেখিতে পাই না, কারণ তাহার অধিকাংশই কালের ও মানুষের অত্যাচারে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। যাহা আছে, সেকালের তুলনায় তাহাও না-থাকারই মধ্যে,—ভাঙাচোরা, অস্পষ্ট। কিন্তু সেই ভগ্নাবশেষের মধ্যে এখনো ছিটেফোঁটার মত যেটুকু পাওয়া যায়, তাহা অপূর্ব্ব এবং আর-কোথাও দুর্লভ।

অ্যাক্রোপলিসে এখন যে-সব ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে, পার্থেনন। ৪৬০ হইতে ৪৩৫ খৃঃ-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এথেন্স নগরের কর্ত্তা ছিলেন পেরিক্লিস। পেরিক্লিসের চরিত্রে প্রধান বিশেষত্ব ছিল, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা। পেরিক্লিসের চেষ্টায় ও তাঁহার বন্ধু ভাস্কর ফিডিয়াসের পরিশ্রমে গ্রীসের এই অপূর্ব্ব পার্থেননের প্রতিষ্ঠা। এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনী পার্থেনস্ এই মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ। আগেও তাঁহার একটি পাথরের মন্দির ছিল বটে, কিন্তু ৪৫০ পূর্ব্বাব্দে পারসীকরা সে মন্দির ভাঙিয়া দেওয়াতে, পেরিক্লিস এই নূতন মন্দিরের পত্তন করেন। ৪৩৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে প্রথম শ্রেণীর মর্ম্মর প্রস্তরের দ্বারা পার্থেননের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হয়। তারপর পার্থেননের উত্তর দিকে ইরেচথিয়াম নামে দুইটি-মন্দিরবিশিষ্ট মর্ম্মর দেবালয় ৪০৮ পূর্ব্বাব্দে গড়িয়া তোলা হয়।

সাধারণতঃ সেকালের গ্রীক মন্দিরগুলি আকার হইত সমকোণ চতুর্ভুজ। তাহাদের

পার্থেননের চাঁদনা

দরজা থাকিত, কিন্তু জানলা থাকিত না। তাহাদের চারিদিকেই এক বা দুই সার-বিশিষ্ট স্তম্ভ, দেবালয়ের মৌন প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া ছাদের ভার বহন করিত। মন্দিরের যে দুটি দিক অপেক্ষাকৃত ছোট হইত, সেই দুইদিকের ছাদের উপরটা হইত তিনকোণা। গ্রীকরা তাহাকে বলিত pediment এবং কোন কোন স্থলে তাহার উপরে পাথরের পুতুল ক্ষোদা হইত। মন্দিরের দেয়ালে উপর-অংশেও ক্ষোদা মূর্ত্তি থাকিত।

পার্থেননের অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্যে সকলের আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহার আগাগোড়ার আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য। স্তম্ভ ও pedimentএর দীর্ঘতা, স্তম্ভের স্থূলতা এবং মন্দিরের আকৃতির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে এমন-একটা সুসামঞ্জস্য আছে, যে পার্থেননের কোনদিকই হাল্কা বা ভারি বলিয়া মনে হয় না—সমস্ত মন্দিরটি দেখিলেই দর্শকের প্রাণে শক্তি ও সুষমার একটি নিখুঁত আদর্শ জাগিয়া উঠে। সেকালে সিমেণ্ট দিয়া কোন কিছু যোড়া হইত না, কিন্তু পার্থেননের মস্ত মস্ত লম্বা-চওড়া মর্ম্মর পাথরের যোড়ের মুখগুলি পরস্পরের সঙ্গে এমন খাপ খাওয়াইয়া মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, যে, স্যাকরারা সোনার গয়নার যোড়ের মুখও তার চেয়ে বেমালুম ভাবে মিলাইয়া দিতে পারে না। ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলিতেও এই গঠনপটুতা দেখা যায়।

পার্থেননের একাংশ
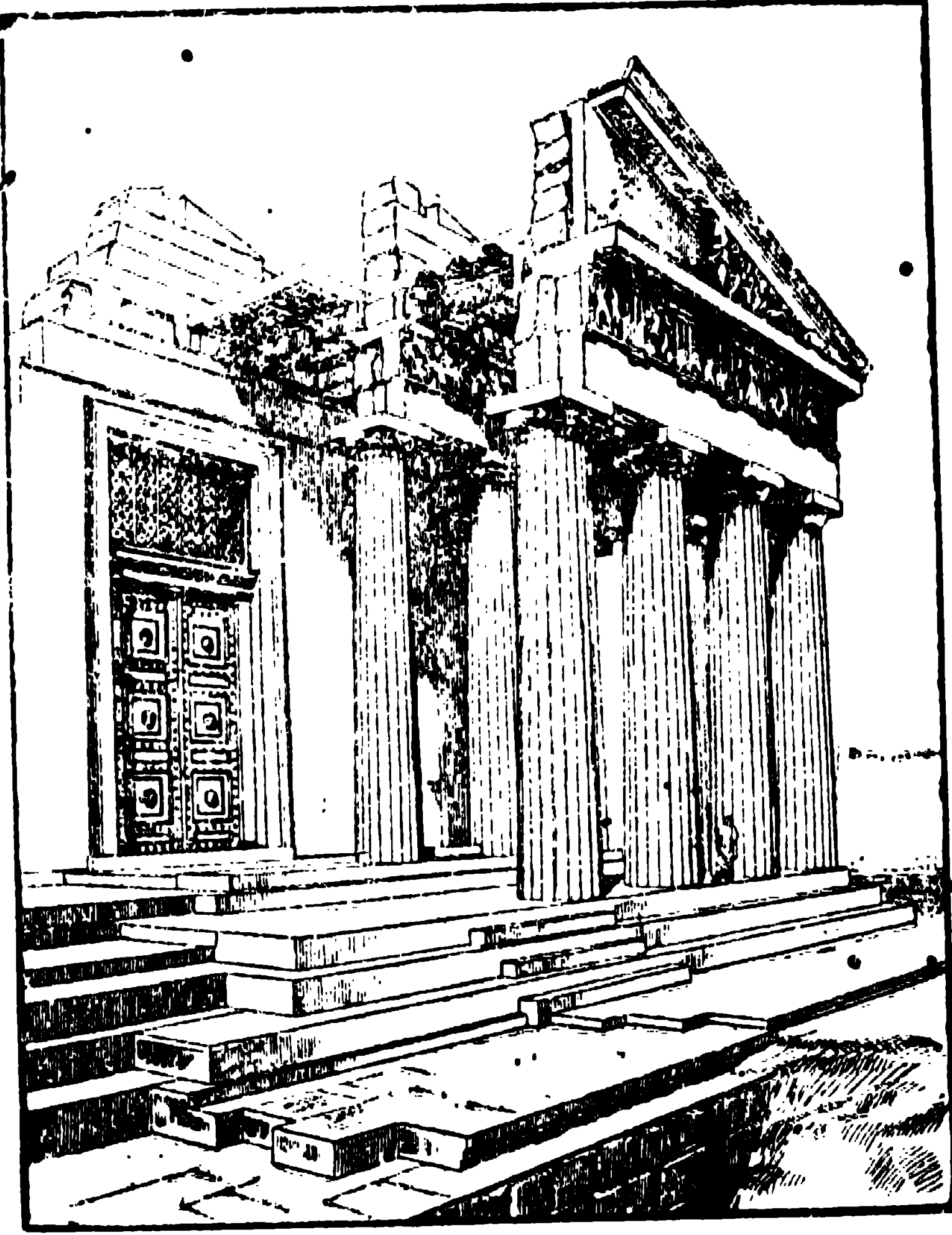
পার্থেননের যে পার্শ্বটা সমুদ্রের বেশী কাছাকাছি, সেইদিকে একটি চাঁদনী (portico) আছে। এই পরমসুন্দর স্থাপত্য-কার্য্যের নাম প্রপেলিয়া। একসময়ে ইহা চিত্রমালায় অলঙ্কৃত ছিল,—তাহার কোন চিহ্নই আর নাই।

অ্যাক্রোপলিসের নীচেই ডায়োনিসাসের বিখ্যাত রঙ্গালয়। যে-সব গ্রীক নাটক আজ-পর্য্যন্ত জগতে অতুলনীয় হইয়া আছে, এই রঙ্গালয়ে হাজার হাজার দর্শকের সামনে তাহাদের অভিনয় হইত। এই রঙ্গালয়ের দেয়ালেও অনেক মূর্ত্তি কোদা আছে।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি, অ্যাক্রোপলিসের শিল্পকীর্ত্তি এখন নষ্ট ও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাইজান্টাইনরা একসময়ে পার্থেননকে গীর্জ্জারূপে ব্যবহার করিয়াছিল। তারপর ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহার ভিতরে বারুদে আগুন লাগাতে, ইহার অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া যায়। সেই অগ্নিকাণ্ডের এবং নানা সময়ের লুঠ-তরাজের পরেও পার্থেননের ভিতরে ভাঙা-অভাঙা যে-সব কারুকার্য্যে রমণীয় মূর্ত্তি প্রভৃতি ছিল, লর্ড এলগিন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সেগুলিকে বিলাতে লইয়া যান। বাদবাকি যাহা-কিছু ছিল, ফরাসী ও অন্যান্য জাতিরা গ্রীকদের অসহায়তায়

ডায়োনিসাসের রঙ্গালয়ের দেওয়ালে খোদিত মূর্ত্তি সারি

সুযোগে আসিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত আভরণ-শূন্য হইয়াও পার্থেননের ভগ্ন দেহ এখনো নির্ব্বাপিত-চিতা শ্মশান-ভূমিতে কঙ্কালের মত পড়িয়া আছে। সৌন্দর্য্যসাধক আজও তাহার রূপ দেখিয়া অভিভূত হইয়া যান, শিল্পীর কাছে আজও তাহা পবিত্র তীর্থের ভাঙা দেবতার মত ভক্তির অঞ্জলি লাভ করে। প্রাচীন পার্থেননে বিকসিত ভাবের ও আদর্শের ছায়া এখনো পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির শিল্পের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে,—কারণ অতীতের সেই প্রতিভাবান শিল্পী ফিডিয়াসের স্বর্গীয় কল্পনার কাছে, আধুনিক যুগের সমস্ত শিল্পীই মাথা হেঁট করিতে বাধ্য।

অ্যাক্রোপালিসের রমণী-মূর্ত্তি

পুরুষ বনাম নারী

হ্যাভেলক ইলিসের নাম এখন পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই বিখ্যাত। আমরা এখানে এই চিন্তাশীল লেখকের একটি আধুনিক রচনার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

গত এক শতাব্দী ধরিয়া আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতেছি, সমগ্র জগতে নারীত্বের নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নারীত্বের দিক হইতে অনেকে গর্বপ্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, এই জাগরণের দ্বারা নারী তাহার পুরুষ-প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে জয়লাভ করিয়াছে।

মিথ্যা কথা। কারণ নারীত্বের ঘুম ভাঙাইবার পক্ষে রমণীর সঙ্গে পুরুষও বড় কম চেষ্টা করে নাই। এতদিন যে রূপার কাটি রমণীকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল এবং যাহার জন্য এই পৃথিবী "পুরুষের পৃথিবী" বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই রূপার-কাটি নারী (যদিও অনিচ্ছায় ও আপনাদের অজ্ঞাতসারে) এবং পুরুষের হাতে প্রায় সমান ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

দেবী এথেনী
(ফিডিয়াসের আসল মূর্ত্তির নকল)

সামাজিক জীবনে নারীত্বের ন্যায্য দাবী এখন মানিয়া নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আজ আবার এক নূতন কথা উঠিয়াছে। পুরুষরা নাকি আপনাদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য নারীর স্বার্থকে দাবিয়া রাখিবার ফিকিরে আছে!

এখানে আমরা নারীর স্বার্থকে নারীত্ব এবং পুরুষের স্বার্থকে পুরুষত্ব বলিয়া ধরিয়া লইব।

অনেক বিখ্যাত লোককেই স্বার্থপর পুরুষপক্ষের দলের-চাঁই বলিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু আসলে সেটা ঠিকঠাক নির্দ্দেশ করা এতটা সহজ নয়।

পৃথিবীর সকল দেশেই, সকল সময়েই একটি সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট। সভ্যতার ইতিহাসে নারীজাতির প্রতি

বরাবরই পক্ষপাতিতার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। প্রাচীন মিশরে বা রোমে বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে, যখনই সভ্যতার উপরে বিপুল কোন ভাবের আঘাত লাগিয়াছে, তখনই তাহার উপরে রমণীর প্রভাব পড়িয়াছে।

অ্যাক্রোপোলিসের রমণী-মূর্ত্তি

য়ুরোপের কুরুক্ষেত্রে যখন কিছুকালের জন্য পাশব-শক্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তখন নারীজাতি ও নারীত্বের সমস্ত আন্দোলনকেই পিছনে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছিল। রণক্ষেত্র চিরদিনই পুরুষত্বের বিচরণ-ক্ষেত্র —নারীত্বের প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ।

যদিও নারীত্ব ও যুজেনিক্সের মত ইহার বিরোধী, তবু কিন্তু য়ুরোপে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়া, এদিকে সকলকার চোখ খুলিয়া দিয়াছে।

আমরা বুঝিয়াছি, আধুনিক নারীত্ব প্রকাশ্যে আপনাকে যতই পুরুষের সমকক্ষ বলিয়া প্রচার করুক, পুরুষত্বের ছদ্মবেশ পরা তাহার পক্ষে একান্ত নিষ্ফল। শান্তির সময়ে জাগ্রৎ নারীত্বের যে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও অভিভূত হইয়াছিলাম, আসল যুদ্ধের সময়ে এক মুহূর্ত্তেই তাহা ছেলে-খেলার মত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। নারীত্বের অধিকার-লাভের জন্য কোন আন্দোলনের কথাই তখন আর শুনা যায় নাই।

যুদ্ধের আর একদিক আমাদের চোখে পড়িয়াছে, যাহার সঙ্গে "যুজেনিক্সে"র একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এ কথা প্রায়ই শুনা যাইত যে, সামরিক আদর্শের প্রতি অনুরাগ না থাকিলে এবং যুদ্ধ উঠিয়া গেলে, পৃথিবী হইতে বীরত্বের ও পুরুষত্বের সমস্ত গুণই লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং জাতির জীবন ক্রমেই অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইবে। অতএব অবিরাম শান্তি অমঙ্গলের হেতু।

কিন্তু গত যুদ্ধে দেখা গিয়াছে, নানা দেশের শান্তিপ্রিয় কেরাণী, শিল্পী ও চাষা-ভূষো,—যাহারা কোনদিনই যুদ্ধ দেখে নাই বা যুদ্ধে অভ্যস্ত নয়—তাহারাও দলে দলে রণ-ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইয়াছে এবং আগ্নেয়াস্ত্রের

পার্থেনোনের একটি ভাঙা মূর্ত্তি

হইবে, যাহাতে সমাজ ও সভ্যতা যথার্থ উপকার লাভ করে।

আজ এই মহাযুদ্ধের পরে, সুধু নারীত্বের নয়,—পুরুষত্বের দিক হইতেও বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, যুদ্ধ-ব্যাপারটা প্রাচীন বর্ব্বরতারই পুনঃপ্রকাশ মাত্র এবং একালকার যুদ্ধের বীভৎসতা কোন অসভ্য জাতিও সহ্য করিতে পারিবে না। যুদ্ধকে নরসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য সমস্ত সভ্যদেশে এখন প্রাণপণ চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং বলা যায়, ভবিষ্যতে পাশব সামরিকতাকে পুরুষত্বের ভিত্তি বলিয়া আর ধরা হইবে না।

সুশিক্ষিত ও যুদ্ধরত সৈন্যগণের মতই সমান বীরত্ব ও শক্তির পরিচয় দিয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হইলেও পুরুষরা কাপুরুষ হইয়া পড়িবে, এমন আশঙ্কা করিবার আর কোনই কারণ থাকিবে না।

কিন্তু এখন আর এক বিষয় লইয়া আমাদের মাথা-ঘামানোর দরকার। পুরুষত্বকে আর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রাখা উচিত নয়। এমন বিষম হত্যাকাণ্ডের দ্বারা সভ্যতার কষ্টলব্ধ সমস্ত সুফল নষ্ট হইয়া যায়। যাহার উপরে "যুজেনিক্সে"র ভিত্তি, যুদ্ধের ফলে সে ভিত্তিও আর শক্ত থাকে না। অতএব পুরুষত্বকে এখন এমন বিষয়ে নিযুক্ত রাখিতে

রমণীর শক্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ভবিষ্যতের জীবনে আশা করি, নারীর প্রভাবের সঙ্গে পুরুষের অধিক-নম্র এবং যথার্থকল্যাণকর চরিত্র-প্রভাব একত্রে মিলিত হইয়া সভ্যতা ও সমাজকে প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যাইবে। পুরুষের দ্বারা এবং পুরুষের জন্য, আদিম কালে যে-সব বিধি-বিধান গঠিত হইয়াছিল, তাহার বাঁধনে নারীজাতিকে আর বাঁধিয়া রাখা হইবে না। আবার, যে-সব কাজ এখন অনায়াসে নারীর দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে এবং পুরুষরা অকারণে যে-সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে আপনাদের জড়াইয়া রাখিয়াছে, সে-সমস্ত অনর্থক কর্ত্তব্য-বাহুল্য হইতেও ভবিষ্যতের পুরুষত্ব মুক্তিলাভ

করিবে। পুরুষ তাহার সমগ্রতা লইয়াই পুরুষ এবং নারীও তাহার সমগ্রতা লইয়াই নারী। আধুনিক বিজ্ঞান যে Hormone রসের কথা আবিষ্কার করিয়াছে, পুরুষ ও নারীর দেহের ভিতরে এবং মনের উপরে তাহা ভিন্নভাবে কাজ করিয়া যায়। কাজেই পুরুষ ও নারীর স্বভাব ও শক্তিসামর্থ্য চিরকালই অসমান থাকিবে বটে, কিন্তু আপন আপন বিভাগে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালন করিলেই ভবিষ্যতে পুরুষত্ব ও নারীত্বের দ্বারা, সমগ্র মানব-সভ্যতা সম্পূর্ণ উন্নত হইয়া উঠিবে।

ঘরবাড়ীর সুর-জ্ঞান

সম্প্রতি একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বড় বাড়ী ও সেতু প্রভৃতি সঙ্গীতের এক-একটা বিশেষ সুরে অভিভূত হয় এবং সেই সুরের প্রতিধ্বনি তাহাদের মধ্যে জাগিয়া তাহাদের জড়-দেহকেও এমন ভাবে কাঁপাইতে থাকে যে, তাহারা ভাঙিয়া মাটির উপরে পড়িয়া যাইতে পারে। আপনি যখন কোন জন-বহুল সেতুর উপর দিয়া যাইবেন, তখন লক্ষ্য করিলে দেখিবেন যে, সেতুটির ভিতর হইতে একটা অব্যক্ত ধ্বনির অনুরণন ফুটিয়া উঠিতেছে। এই ধ্বনিই তাহার নিজস্ব সুর এবং সুরটা যদি খুব বেশী করিয়া জাগানো যায়, তবে কম্পনের ফলে সেতুটি হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া যাইতে পারে! বৈজ্ঞানিকরা আরো বলেন যে, বড় বড় অট্টালিকার কোন কোন বিশেষ স্থলে, অট্টালিকার নিজস্ব সুরের পর্দ্দায় বাজনা বাজাইয়া, ইচ্ছা করিলেই তাহাকে ভূমিসাৎ করা যায়! পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক স্থপতিরা প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণের সময়ে, বিশেষ সুরের কম্পন হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেন।

সাহিত্যের বিজ্ঞাপন

প্রতিভাবান লেখকদের পুস্তক ও বাস-স্থান বিলাতের অনেক নগর ও পুরাতন জায়গাকে সমৃদ্ধিশালী ও অধিকতর বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছে।

সেক্স্পিয়ারের জন্মস্থান ষ্ট্রাট্ফোর্ড-অন্-অ্যাভন্ দেখিবার জন্য সারা য়ুরোপ ও বিশেষ করিয়া আমেরিকা হইতে দলে দলে সাহিত্য-রসিক যাত্রী ইংলণ্ডে গিয়া উপস্থিত হয়। সেক্স্পিয়ার যদি সেখানে না জন্মিতেন এবং তাঁহার রচনায় ষ্ট্রাট্ফোর্ডের উল্লেখ না থাকিত, তবে আজ তাঁহার নাম পৃথিবীর কেহই জানিতে পারিত না। প্রতি বৎসরেই গড়ে

প্রায় দশ হাজার করিয়া লোক সেক্‌স্‌পিয়ারের স্মৃতিমন্দির দেখিবার জন্য মোট প্রায় নয় হাজার টাকার টিকিট কেনে। মিউজিয়মের টিকিট বিক্রী করিয়াও বৎসরে নয় হাজার টাকা ওঠে। আনা হাথাওয়ের কুটিরে বৎসরে দর্শনীর টাকা পাওয়া যায় সাড়ে-চারহাজার টাকা। আর এই যাত্রীদের দৌলতে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড সহরের বাৎসরিক লাভ হয় তিনলাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা! লাভের পরিমাণ বৎসরে বৎসরে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।

স্কটের ভক্ত যাত্রীদের জন্যও এডিনবার্গ সহরের বাৎসরিক কয়েক লাখ টাকা লাভ হয়। তা ছাড়া স্কটের উপন্যাসে-উক্ত প্রাচীন কেনিলওয়ার্থ দুর্গেও প্রতি বৎসরে প্রায় ছত্রিশ হাজার টাকা, দর্শনীস্বরূপ চল্লিশ হাজার যাত্রীর কাছ হইতে আদায় হয়!

চাষা কবি বার্ণসের জন্মগৃহ দেখিবার জন্য যাত্রীরা প্রতি বৎসরে সাড়ে সাতহাজার টাকা দর্শনী দেয়। কবির জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আর দুটি সহরের জন্যও দর্শকদের কাছ হইতে বাৎসরিক প্রায় দেড় লাখ টাকা করিয়া পাওয়া যায়।

স্যর হল কেনের উপন্যাসে স্থানলাভ করিয়া আইল অফ ম্যানও আজকাল অনেক ভ্রমণকারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। সেখানকার একজন রাজকর্ম্মচারী বলেন, বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন দিয়া হল কেন এদেশের রাজভাণ্ডারে প্রতি বৎসরেই দেড় লাখ টাকা পাওনার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

একালের শিক্ষিত ও সহুরে বাঙালীর প্রাণে কিন্তু এ-রকম কোন উৎসাহই নাই। কয়জন লোক ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিম ও মাইকেল প্রভৃতির জন্মভূমি দেখিতে যায়? কিন্তু যাহাদিগকে আমরা পাড়াগেঁয়ে ও অশিক্ষিত বলিয়া অবহেলা করি, কবিদের মর্য্যাদা ও স্মৃতির পূজা বরাবরই তাহারা করিয়া আসিয়াছে। বাংলার প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন কবির জন্মভূমিতে বৎসরে বৎসরে এখনো যে-সব মেলা ও উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহা পল্লীবাসীদের কবি-প্রীতিরই পরিচয় দিয়া থাকে।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

পান্নার ভুল

ক্লাশে আমরা যে-কটিতে একজোট ছিলাম তার মধ্যে অবিনাশ ছিল সকলের চেয়ে বয়সে বড়। হাতের আর গলার বোতাম ছেড়ে চটি-পায় ছেলেদের দলে সে সর্দ্দারি করে বেড়াত। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শীতের ঝরা পাতার মত কে কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে তার ঠিক নেই, আমি তখনো ল, কালেজের একটা শুক্‌নো ডালে আমার নিরানন্দ নীরসতা নিয়ে আট্‌কা পড়ে আছি।

পথে-ঘাটে কংগ্রেসে-কন্‌ফারেন্সে অবি-

নাশের সঙ্গে কালে-ভদ্রে দু-একবার দেখা হত ; বছর তিনেক ধরে তাও বন্ধ। চিরকালটা ভবঘুরে গোচেরই তার স্বভাব, কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে যে তার খবর জান্‌ব সেও বড় সহজ ব্যাপার ছিল না ; তবে তার খবর জান্‌বার জন্যে আমার যে ব্যস্ততা কিছু ছিল ভদ্রতার খাতিরেও সে মিথ্যাটা আমি বল্‌তে পার্‌ব না, সুতরাং একটু একটু করে তাকে ভুলেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় একদিন ময়দানে খেলা দেখ্‌তে গিয়ে লোকের ভিড়ের ঠেলা-ঠেলির মুধ্যে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হলো।

পরস্পর মামুলি কুশল-জিজ্ঞাসার পর আমি তার এই তিন বৎসরের ইতিহাস জান্‌তে চাইলাম। সে বল্‌লে, এই প্রশ্নের জবাব সে কেবল একটি কথায় দেবে। ইতিমধ্যে সে বিয়ে করেছে। ভারবাহী জানোয়ারের আর যত রকম উপসর্গই থাকুক, ইতিহাস থাকে না।

আমি লৌকিকতার ভাব থেকে তাকে বিস্ময়ভরা প্রচুর আনন্দ জ্ঞাপন করে বল্‌লাম, 'দুজনাতে খুব দেশ দেখে বেড়াচ্ছ বুঝি ?'

সে রুমাল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লে, 'আরে রাম ! তুমি বিয়ে করনি, এ আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি। কলুর বলদও ঘোরে, তার সেটাকে কি দেশ দেখে বেড়ানো বল্‌তে চাও ?'

তার প্রতি-কথায় স্ত্রীর সম্বন্ধে ভারি একটা নাগালছাড়া ঔদাসীন্যের ভাব লক্ষ্য করে ব্যথিত হলাম ; ছেলেবেলা থেকেই দেখ্‌তাম, স্নেহ-প্রীতি মান-অভিমান প্রভৃতি জিনিষ-গুলোর উপর তার কেমন একটা উগ্র, অবজ্ঞা-মাখানো কৃপাদৃষ্টি ছিল। অন্তরাল-বর্তিনী কোন এক উপেক্ষিতার আয়ত কালো চোখের কোণে সে-দিনকার সন্ধ্যাটি অশ্রু-বিন্দুর মতো টলটল করতে লাগ্‌ল।

একটা গাড়ী ডেকে অবিনাশ আমায় তার শ্যামবাজারের বাড়ীতে নিয়ে গেল।

তার স্ত্রী ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তার টেবিলে-পড়া কাগজগুলোকে গুছিয়ে ঠিক করে রাখ্‌ছিলেন, আমাদের সাড়া পেয়েই ত্রস্ত হরিণীর মতো তাড়াতাড়ি সে-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। চকিতের মতো তাঁকে একটুখানি দেখ্‌লাম। তারপর অবিনাশকে বিস্ময়-ভরা যে আনন্দ আমি জানালাম, তার মধ্যে লৌকিকতার নামগন্ধও ছিল না।

অবিনাশ দুঘণ্টা ধরে আজেবাজে কত কি যে বকে গেল, কাজের কথাও তার মধ্যে ছিল অনেক, কিন্তু আমার মনে হলো, আজকের এমন ধ্যানস্তিমিত সন্ধ্যাখানি পণ্ড নিরর্থক হয়ে গেল। দু-একগাছা চুড়ির আচমকা ঠিনিঠিনি, ক্যাশ-বাক্সের ডালা খোলার শব্দ, এবং চাপাগলার ছোট দু-একটি ফিসফিস ছাড়া আর-সমস্ত ধ্বনিকে সেদিনকার সন্ধ্যায় কেউ যদি টুঁটি টিপে ধরে চুপ করিয়ে দিত, তাতে পৃথিবীর কিছু লোকসান হত কি ?

আমি একটু-আধটু গাইতে পারি। সেই ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করে অবিনাশের বাড়ীতে উপর-উপরি কয়েকদিন আনাগোনা ঘটল। কিন্তু তার স্ত্রীকে আর দেখ্‌লাম না। যতক্ষণ থাকি, রাজ্যের আর-সমস্ত কথারই আলোচনা হয়, ঐ কথাটি ছাড়া। সে বাড়ীটাতে সে নিজে ছাড়া আরো যে কেউ আছে, এ কথাটা অবিনাশ এমন চমৎকার ভুলে থাক্‌তে পারে যে সে আর কি বল্‌ব।

বড় ইচ্ছে হত, এই অনাদৃতার নিঃসঙ্গ

জীবনের বোঝাটাকে আমি আমার ভ্রাতৃত্ব দিয়ে একটু লাঘব করে তুলি, একটা ভাই-ফোঁটা বা এমনি একটা-কিছু উপলক্ষ্য করে তার সঙ্গে পরিচিত হই! আমার এই হতভাগ্য জীবনের কোথাও কি ফুল ফোটে না! পাখীরা কলকণ্ঠে গেয়ে ওঠে না! এ জীবনে এমন আলোর বিকাশ কি হয়নি যা পৃথিবীর আর সকল আলো থেকে আলাদা, এমন সৌরভ যা বিশেষ করে আমারই সৌরভ! তাকে দেবার মতো সম্পদ আমার কিছু কি নেই?

কিন্তু কেবল দিতে পারার অধিকার নিয়ে ত কিছু দেওয়া চলে না। তাই রুদ্ধ দরজায় নিরুপায়ের দেবতাকে ডেকে বলি, অত যে সুন্দর, সুখে তার অধিকার আছে, সে সুখী হোক্! তারপর তার কথা ভাবতে বসি।

যখন জানাশোনা ঘটবার কোনো ভরসাই আর নেই, তখন হঠাৎ একাদন বেড়াতে এসে তার সমস্ত কথার পুঁজি নিঃশেষ করে শেষটা অবিনাশ বল্‌লে, 'দীপ্তি ধরেছে, তোমাকে অবসর-মতো মাঝে-মাঝে গিয়ে তাকে গান শেখোতে হবে।

আমি বল্‌লাম, 'আমি আবার গাইতে জানি নাকি?'

সে তার একত্র মুঠি-বাঁধা হাত-দুটোকে টেবিলের উপর রেখে বল্‌লে, 'তুমি গাইতে জানো; এমন কথা ত বলা হচ্ছে না। এ ক'-দিন যেমন করে চ্যাচালে, মাঝে মাঝে গিয়ে আধঘণ্টাটাক সেই-রকম চেঁচিয়ে আসতে পারবে কি না সেইটে জানতে চাচ্ছি।'

একরকম জোর করেই সে আমায় ধরে নিয়ে গেল। তার বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে যখন সঙ্কট আসন্ন তখন আর ফাঁকি দেওয়াটা সুযুক্তি নয় মনে করে খোলাখুলিই বল্‌লাম, 'আমার কিন্তু ভাই ভারি লজ্জা করবে।'

সে ঘাড়টাকে শিথিল করে অবজ্ঞায় মাথা নেড়ে বল্‌লে, 'হুঁঃ!' সে অবজ্ঞা আমার লজ্জা-করাকে কতখানি, আর যাকে লজ্জা তাকেই বা কতখানি, সেটা ঠিক বুঝতে পারা গেল না।

অনেকক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করলাম। আমি স্বজনহীন মা-হারা, তার উপর বাঙালীর ছেলে। একটু পরে স্থৈর্য্যে-ভরা একখানি প্রেমমণ্ডিত মুখকে একটা তৃপ্তির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে নিয়ে একটি জীবন্ত দেবীপ্রতিমা আমার চোখের দৃষ্টির আরতি-প্রদীপের সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন। আমার মাকে ভগিনীকে কন্যাকে এক-সঙ্গে তাঁর মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করলাম।

উনি কাছাকাছি হতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। অবিনাশ পিছন থেকে দুহাতে আমার মাথাটাকে চেপে নুইয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'দাঁড়িয়ে দেখছিস কি হাঁ করে? গড় কর্, হতভাগা, গড় কর্।'

অস্বস্তিতে দীপ্তির মুখের দীপ্তি মিলিয়ে গেল। আমিও মহা বিরক্তির সঙ্গে তার হাত-দুটোকে সরিয়ে দিয়ে বল্‌লাম, 'আঃ কি ছেলেমানুষী করচ!'—কিন্তু আমার মন যে তার সমস্ত প্রণিপাত ঢেলে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ল সেই দুটি পদ্মকোরকের মতো কোমল পায়ের তলায়।

অবিনাশ বল্‌লে, 'ইনি তোমার বৌদি।'

আমি দুটি হাত জোড় করে তাতে অন্তরের সমস্ত উপলব্ধি দিয়ে বল্‌লাম, 'বৌদি!'

মহা উৎসাহে দীপ্তি সাকুয়েদি আরম্ভ

করলে। কিন্তু থেকে-থেকে আচম্কা এক-একবার তার সেই উৎসাহ ফটোগ্রাফের কাগজের সাদার মতো কিসের তাপে পলকে কালো হয়ে মিলিয়ে যেত। তখন এস্রাজের তারের উপর তার আঙুল আর নড়তেই চাইত না। গানের মাঝখানে অর্গানের পর্দার উপর হাতটাকে আছড়ে আছড়ে হঠাৎ এক সময় সে টুল ছেড়ে উঠে পড়ত। পাছে আমি কিছু মনে করি, এই ভয়ে রোজই তার একটা-না-একটা ওজর খাড়া করবার চেষ্টা দেখতুম।

এ-সত্ত্বেও বুদ্ধির প্রাখর্যে আর স্বাভাবিক গীতি-কুশলতার গুণে আমার কাছ থেকে শেখবার যা-কিছু সবই সে আয়ত্ত করে নিলে, আমার বিদ্যার পুঁজি নিঃশেষ হয়ে যেতে দুটি দিনের বেশী লাগল না। তবু কর্তৃপক্ষের দিক থেকে তুষ্টির কিছুমাত্র ঘাটতি দেখা গেল না বলে কাজটিতে আমি বাহালই থেকে গেলাম।

ক্রমাগত আসা-যাওয়া করে নানা খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে আমি বুঝতে পারলাম, স্ত্রীর সঙ্গে অবিনাশের ব্যবহার খুব ভদ্র এবং মোলায়েম নয়। দালালির কাজে তার সমস্ত দিনটা এবং রাতেরও অধিকাংশ সময় কাটে, তার স্ত্রীর দিন কাটে কি করে তারপর সে খবর নেবার তার সময়ই হয় না। তার প্রসঙ্গ তুলে আমি কোনো কথা কইতে গেলে দীপ্তি ত্রস্ত হয়ে সেটাকে চাপা দিয়ে দেয়। বুঝতে পারি এদের সম্পর্কের মধ্যেকার কোনো এক জায়গায় কাঁটার মত একটা-কিছু কেবলই ফুটছে, তার বেদনাটা কোনো সময়ই বস্তি ডাকার মতো গুরুতর হয়ে ওঠে না, কিন্তু অলক্ষিতে জীবনের মধ্যে তিক্ততা সঞ্চার করে দিতে থাকে।

এই উদ্ভাবনাটা আমাকে একটুখানি বিব্রত করে দিয়ে গেল। নানা গুরুতর কাজের চাপ অগ্রাহ্য করেও এই অত্যন্ত অকাজের বিশ্রম্ভালাপের মজলিসে, গীত-অধ্যাপনার অভিনয়ে আমাকে যোগ দিতে হত। একটি দুঃখী নিষ্পাপ চিত্ত আমার সামান্য একটু সঙ্গ আশা করে পথ চেয়ে বসে আছে, এইটুকু আমি তাকে যদি না দিতে পারি, তবে কিসের জন্যে এত আড়ম্বর করে তৈরি হচ্চি! এর চেয়ে বড় কোন্ কাজটায় আমি লাগব? মাঝে মাঝে দীপ্তি যে ছট্‌ফট্ করতে থাকে সে আমি বুঝতাম না, তা নয়। আমার মনে হত, এই ছটফটানি ঘোচাবার জন্যেই আমার সঙ্গ বেশী করে দরকার। আমি এস্রাজ ফেলে স্বরদে সুর বাঁধতাম, সঙ্গীতের প্রবাহ চৌতাল থেকে ঠুংরীতে গড়িয়ে পড়ে ফেনিল হয়ে উঠত।

ক্রমে আমরা গান থেকে পরস্পরের সুখ-দুঃখের আলোচনায় সময় দিতে লাগলাম বেশী। একের কাছে অপরের আর-কিছু বড় লুকানো রইল না। কেবল স্বামীর প্রসঙ্গে দীপ্তির আঘাত লাগে বলে সতর্কতার সঙ্গে সেদিকটাকে আমি এড়িয়ে চলি।

আমাদের এই নূতনতর সম্পর্কের মাঝখানে অবিনাশকে কোথাও খাপছাড়া লাগল না। একদিন সে একটুক্ষণের জন্যে আমাদের আড্ডায় যোগ দিতে এলে দীপ্তির চেয়ারের পিঠটার উপর কনুয়ের ভর রেখে দাঁড়িয়ে তাকে বললাম, 'আমরা আর দেবর না, বৌদি না, এখন থেকে আমরা বন্ধু!'

অবিনাশ উৎসাহিত হয়ে বল্‌লে, 'বটে! তাই নাকি? তাহলে ভালো করে কিছু জল-যোগের ব্যবস্থা করা যাক্‌। ওরে কেষ্টা—"

দীপ্তি উৎসুক হয়ে ছিল; তাকে দেখে মনে হলো, তার শরীরের সমস্ত রক্ত কোন্ একটা অদৃশ্য জায়গায় কিসের টানে গিয়ে জমা হয়েছে। ঠোঁট-দুটিকে কাঁপিয়ে একটু বিচলিত হয়েই সে বলে উঠ্‌ল, 'বন্ধু হতে পারা কি এমনি মুখের কথা ঠাকুরপো, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি?'

আমি বল্‌লাম, 'বা রে, শাস্ত্রে যে রয়েছে—সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বম্‌······সাপ্তপদম্‌ মৈত্রম্‌······'

কিন্তু আমার পরিহাসে হাসির সুরটি লাগ্‌ল না।

মুখের কথাই বটে! কিন্তু বল্‌বার ত উপায়ও নেই। তাই মুখের কথার বেশী কী আমার ক'র্‌বার আছে সেই ভাবনাতে আমার দিনের পর দিন কাটতে লাগ্‌ল। তারপর একদিন—

আচ্ছা ঋণ জিনিসটার সৃষ্টি কত-দিনকার? কে প্রথম এর প্রবর্ত্তন করেছিল? টাকার ঋণ টাকা দিয়েই কি সব সময় শোধ কর্‌তে পারা যায়, তার সঙ্গে এমন কিছু কি থাক্‌তে পারে না যা অপরিশোধনীয়?...

সেদিন আর কালেজ যেতে ইচ্ছে হলো না, শীতের ভোরের কুয়াসা ভালো করে না কাট্‌তেই অবিনাশের চায়ের টেবিলের একধারে একটা কেদারা নিয়ে গিয়ে বসে পড়্‌লাম। অবিনাশ এক হাতে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আর-এক হাতে কতগুলি কাগজপত্র উল্টে যাচ্ছিল, ভালো করে না তাকিয়েই বল্‌লে, 'এসো।' আমাকে এক বাটি চা ঢেলে দিয়ে দীপ্তি মুখটিকে ভারি গম্ভীর করে শুধু-শুধু একদিকে চেয়ে বসে রইল।

তখন টাউন্‌-হলে স্বদেশী-মেলার উৎসব। গল্পের আগুনটাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে আমি তারই কথা পাড়্‌লাম। দীপ্তি চোখের কোণে অবিনাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অকস্মাৎ অতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে বলে উঠ্‌ল, 'আমায় নিয়ে চল না ঠাকুরপো।'

আমি পুলকিত হয়ে বল্‌লাম, 'বেশ ত। কবে যাচ্ছ, বল।'

সে বল্‌লে, 'আস্‌চে রবিবারে। সে দিন ত তোমার ছুটি।'

অবিনাশের সম্মতির জন্যে তাকে এ বিষয়ে একটু সচেতন করে দিতেই সে-চোখ না তুলে তার কাগজ-পত্রের এক জায়গায় আঙুল বুলোতে বুলোতে বল্‌লে, 'একটু সকাল-সকাল যেয়ো, তা না হলে সব দেখে উঠ্‌তে পার্‌বে না।'

দীপ্তির এর পর এ আলোচনায় আর উৎসাহ দেখা গেল না। উদাস চোখদুটির দৃষ্টিকে বাইরে আকাশের দিকে প্রেরণ করে জান্‌লা ঘেঁসে শুব্ধ হয়ে সে বসে রইল।

শনিবার বিকালে, কাল আগে থাক্‌তে তৈরি হয়ে থাক্‌বার জন্যে তাকে তাড়া দিতে গিয়ে শুনি, সে উৎসবে যাবে না! আমাকে একলা রেখে বাইরে থেকে দরজার পরদাটাকে টেনে দিয়ে সে চলে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে একই ভাবে ব রইলাম, তারপর কখন এক সময় উঠে আ আস্তে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌লাম মনে নে পথে পড়ে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌ল

দোতলায়, তার জানলার কপাট-দুটি দুহাতে খুলে ধরে বড় বড় কান্না-ভরা চোখে সে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরদিন দুপুর না পেরতেই দীপ্তির আহ্বান এল। গিয়ে তাকে কতকটা প্রসন্ন দেখলাম। খুব সাদা সহজ পোষাকে আমার সঙ্গে সে উৎসব দেখতে চলল। সমস্ত দিনটা কল-টেপা পুতুলের মতো সে আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালে, তবু সেই একটি মাত্র উৎসব-রজনীর একটি দুটি স্মৃতি আমার দৈন্যে ভরা সমস্ত জীবনটার জন্যে পুঁজি করা আছে। সেগুলি শোনবার আগ্রহ অনেকের হয়ত হবে, কিন্তু বলবার আগ্রহ আমার একেবারেই নেই, কেননা আমি জানি কেউ সেগুলির মূল্য বুঝবে না।

দীপ্তি এবং তার সঙ্গিনী মেয়েটিকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন রাত ন'টা। খাওয়ার চেষ্টায় নীচে দেরি না করে সোজা ছাতে চলে গেলাম। দীপ্তিদের বাড়ীর দিকে চোখের দৃষ্টিকে যতদূর পারা যায় প্রেরণ করে এই কথাটা ভেবেই আমার গর্ব্ব হলো যে, এতদিন ধরে এমন একটু-কিছু আমি পাইনি বা পেতে আশা করিনি যাতে পৃথিবীর কারুকে প্রবঞ্চিত করা হয়। আমার অন্তরের আনন্দের সম্পদ আমার অন্তরেরই সম্পদ, অন্তর্যামী সে কথা জানেন।

ভোর হতেই দেখি দীপ্তির চিঠি নিয়ে বেহারা বসে আছে। সে লিখেচে—

আমার কানের পান্নার দুল-একটা লোকের ভিড়ে কাল আমি হারিয়ে এসেচি। উনি যদি জানতে পারেন, তা হলে কি হবে? এর আগে আরো একবার আর-একটা দুল আমি হারিয়েছি, তখন কিছু বলেননি, এবার কি আর আস্ত রাখবেন? আপনি এ বিপদে কয়েকটি টাকা দিয়ে যদি আমাকে সাহায্য করেন তবে আমি রক্ষা পাই। ধর্ম্মতলায় শ্যামলাল কানহাইয়ালালের যে জহরতের দোকান আছে সেখান থেকে দুলজোড়া কেনা হয়েছিল। আপনি আমাকে কী হয়ত ভাবচেন, কিন্তু আমি বিপন্ন এবং দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়েছি। ইতি—দীপ্তি।

বৌদি বলে টাকাটা চাইতে তার বেধেছে, লিখেছে দীপ্তি!...আমার পরীক্ষার ফীর টাকা ডাকঘরে জমা করা ছিল, সেটাকে উঠিয়ে নিলাম। দুবার এগ্‌জামিন দেওয়া হয়নি, এবারেও হবে না,—না হোক। যাদের সঙ্গে ভালো করে কথা কইনি তাদের কাছেও হাত পাততে হলো। তারপর ছুটে গিয়ে হারানো দুলটার একটা জুড়ি সংগ্রহ করে লুকিয়ে তাকে দিয়ে এলাম। সে হাত বাড়িয়ে সেটাকে নিয়ে বললে, টাকাটা শীগ্‌গিরই দিয়ে দেবে, এবং, এ যে নিতান্তই তার ঋণ-গ্রহণ, এই কথাটাকেই খোঁচা দিয়ে স্পষ্ট করবার জন্যে আমায় ধন্যবাদ জানালে না।

সেদিন চায়ের টেবিলে সে যখন এসে বসল, তার দু কানের দুটি দুলের মধ্যে থেকে আমার এত দুঃখের দানটিকে আমি নিজেই খুঁজে বার করতে পারলাম না, অন্যের চোখে আর সে পড়বে কি? স্বামীকে ডেকে সে সংসারের কথা তুললে। তবু মনটাকে কেন যে সেদিন এমন কানায়-কানায় ভরা মনে হয়েছিল জানিনে। টাকাটা দীপ্তি যেন আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল, তাকে ফিরিয়ে দিয়ে

নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। ঋণমুক্ত লোকের যেমন সাহস বাড়ে, আমি তেমনি সাহসী হয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে তাদের ঘরকন্নায় দুটো-একটা পরামর্শ দিতে সুরু করলাম।

দীপ্তি এতে খুসি হলো না। কেমন একটা ছাড়াছাড়া দূরদূর ভাব তার মধ্যে লক্ষ্য করি। দেখা হলেই খামকা ঘেমে লাল হয়ে সে টাকাটার কথা পাড়ে। বলে, দিয়ে দেব।

আমি একদিন বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তুমি যদি মনে করে থাক, টাকাটার জন্যে আমার ঘুম হচ্চে না, তবে সেটা দিয়ে দিলেই ত পার।'

সে বলে, 'আপনি দুটি মাস আর সময় দিন!...'

আমি যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। রোজ ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই মনে হত, বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেই তাদের বাড়ীর বেহারাকে দেখ্‌ব, চিঠি নিয়ে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। শুতে যাবার আগে ভাব্‌তাম, আজকেই ছাড়াছাড়ির শেষ দিন। কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে গেলেও পথ-চাওয়া পরোয়ানা যখন এল না, তখন একদিন অকারণে অনেক পথ ঘুরে শ্যামবাজারের পরিচিত এবং প্রিয় একটি দোতলা বাড়ীর সামনে গিয়ে ডাক্‌লাম, 'অবিনাশ!'

একটি চশমা-পরা ছেলে বর্ম্মা-চটি পায় বাইরে বেরিয়ে এসে বল্‌লে, 'এ বাড়ীতে অবিনাশ বলে ত এখন কেউ থাকেন না, সম্ভবত আমাদের আগে তাঁরা এখানকার ভাড়াটে ছিলেন। আপনি কোথা থেকে আস্‌চেন? ভিতরে এসে বসুন।'

আমি কোনো কথা না বলেই সেখান থেকে চলে এলাম। অবিনাশের ক্লাবের লোকেরা বল্‌লে, 'আছে কোথাও, ভারতবর্ষ ছেড়ে যায়নি এ-পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি মশায়।'

বাড়ী এসেই তার ঠিকানা-ছাড়া একখানা চিঠি পেলাম। তাড়াতাড়ি কোলের উপর কাগজ রেখে পেন্সিলে সে লিখেচে—

'আপনার টাকাটা ফিরিয়ে না দিতে পারা পর্য্যন্ত আপনাকে মুখ দেখাতে পারব না, মাপ করবেন। দুল-হারানোর ব্যাপারটা একবার লুকিয়েই আমি বিষম ঠেকে গিয়েছি। গোড়াতেই ওঁকে বল্‌লেই চুকে যেত; ওঁর ভালোবাসাতে এবং ক্ষমার শক্তিতে প্রথম থেকেই অকারণে সন্দেহ করে আমি যে অন্যায় করেছি, তার শাস্তি আমায় ভোগ করতে হবে ত।...'

সে সন্দেহকে আশ্রয় দিয়ে এবং সাহায্য করে আমি যে অপরাধ করেছি, আমাকেও তারই শাস্তি ভোগ করতে হচ্চে। বুঝ্‌তে পারচি, বন্ধুর প্রতি আমি কর্ত্তব্য করিনি।

তাও বলি, পৃথিবীতে উপকার জিনিষটাকে লোকে ভুল্‌তে পারে না কেন? যারা দেয় এবং যারা নেয় তারা সকলেই টাকাটাকে কেন এত বেশী করে দেখে? ভাব্‌চি, দেড়শোটি টাকার সংস্থান আমার যদি না হত তবে পৃথিবীতে আমার কিছুরই অভাব থাক্‌ত না।

বন্ধু, আমার এই কছত্র লেখা তোমার চোখে কি পড়্‌বে? তোমার কৃতজ্ঞতার স্মৃতির আড়াল ঘুচিয়ে তুমি কি আমায় বাঁচাবে? দিতে পারার গর্ব্ব আমার ত টুটেই গেছে, তোমারও কি ঐ কটা টাকা ছাড়া আর-কিছু আমায় দেবার ছিল না?

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

ঘুমপাড়ানি গান

নীল আকাশে কাঁপন তুলে অলস সুরে ঐ—
ডাকছে পাখী 'ফটিক জল'—'ফটিক জল' কৈ ?
আতা-গাছে তোতা-পাখী, ডালিম-গাছে মউ ;
ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে লিখচে চিঠি বউ ;
মনের মত হয় না চিঠি, দেড়টা বেজে যায়,
সার বুঝি ঐ পাওয়া হোলো,—চমকে ফিরে চায় !
ঘুম-পাড়ানে সুরের টানে যাচ্ছি কোথা ভেসে ;—
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে।

এলিয়ে দিয়ে শুকোয় ভিজে মেঘের মত চুল,
ছাদের পরে কাদের মেয়ে—কানে মোতির দুল ?
তাস-খেলা[illegible] বারাণ্ডাতে লীলা মাদুর পাতে,
বলচে বীণা—না, না, না, না, ঘুম হয়নি রাতে !
এই কথা নে রঙ্গ-ভঙ্গ ছুটলো হাসির রোল,
হাল্‌কা হাওয়ার পান্‌সী যেন একটুতে খায় দোল !
সুরের জরি বুনচে পরী আ মরি, সেই কে সে !
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে।

গাঁয়ের পথে উড়িয়ে ধুলো গোরুর গাড়ী চলে,
বাবুদের ঝি বাসন মাজে খাঁ-পুকুরের জলে,
পেয়ারা-ডালে দুলিয়ে দোলা খায় ছেলেরা দোল,
ইস্কুলেতে পড়ছে যারা তাদের ঘাড়ে গোল !—
দশমিকের ত্রৈরাশিকের—শিশুহত্যার কল,—
সরস্বতী আঁচল দিয়ে মোছেন চোখে জল।
ভগ্ন-অংশ একটি গানের লাগছে কানে এসে,
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে !

দুধের বাটি ঝিনুক দিয়ে বাজনা বাজায় কে গো !
দুষ্টু ছেলে দুধ খাবে না, ভুলিয়ে তাকে দে গো !
উঠবে ছেলে পাশের ঘরে শব্দ করিসনে ;
এই শুয়েচে, কাঁচা-ঘুমে জাগিয়ে তুলিস্‌নে !
বামুন-দিদি কয়ের কোরে আনচো কা'কে ধরে ?
কচ্ছিল চোর আচার চুরি লুকিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ?
বয়েস হলে দেখচি ওটা ডাকাত হবে [illegible]।
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, [illegible] দেশে।

মায়ের মুখে প্রথম আমি শুনেছি এই তান,
আজকে কোথা সে মা আমার, মায়ের মুখের গান !
এমনিতর দুপুর-বেলা কোলের কাছে শুয়ে,
শুনেছি গান-গল্প কত মুখটি বুকে থুয়ে,—
বেগুন চুরি করতে গিয়ে ফুটলো কাঁটা নাকে,
কাক্কাহুয়া করে শেয়াল, নাপিত-ভায়া ডাকে !—
সুখের স্মৃতি দুখের ব্যথা এক-সুরেতে মেশে,
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে !

হারিয়ে গেছে কোথায় আমার হট্টমালার দেশ—
আদর স্নেহ শৈশবেরই স্বপ্ন-অবশেষ।
চল্‌তে পথে নেইকো যে আর আম-বাগানের ছায়া,
মাছের কাঁটা ফুটলে পায়ে দোলায় চেপে যাওয়া,
ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি তারাও গেছে ম'রে ;
শান্তি-সুখের ঘুমটি আমার দেয়না চোখে ভরে।
নতুন কোরে লাগচে কানে পুরোনো সুর এসে,—
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে !

এমনিতর দুপুর-বেলা গাইত মোর প্রিয়া
ঘুম-পাড়ানি হাজারো গান খোকায় কোলে নিয়া,
বাজতো দু'টি সোনার চুড়ি ঝিনিক্ ঝিনি ঝিন্—
তেমনিতর মিষ্টি গান শুনিনি কোনোদিন !
সে মোর প্রিয়া নাহিকো আজ, নাহিকো সেই গান ;
কাঁদচে দুটি আকুল শিশু—আকুল দুটি প্রাণ !
আর কে তাদের ঘুম পাড়াবে ভুলিয়ে ভালোবেসে ?
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে।

ঘুমোয় ছেলে, জুড়োয় পাড়া, জুড়োয়নাতো বুক—
পড়ছে মনে একশোবারি হারিয়ে-যাওয়া মুখ !
আকাশ থেকে চাঁদকে ডেকে, আর কে ধোরে দেবে ?
দুধ খাইয়ে পরিয়ে কাজল আর কে কোলে নেবে ?
যৌবনেরো সোনার [illegible]
খোয়া গেল, [illegible] পথে-পথে !
আঁধার হেরি চারদিকেতে খুঁজে না পাই দিশে—
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে ?

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা

মায়ে-পোয়ে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত ও শ্রীরজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

নিবৃত্তির পথে। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীসুবোধচন্দ্র রক্ষিত, ২৬ কটন ষ্ট্রীট কলিকাতা। মেটকাফ প্রেসে ও কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থে লেখক ষড়্‌দর্শন প্রসঙ্গ ও পৌরাণিক সাধনা-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। রচনায় বেশ একটি ঐতিহাসিক ধারা রক্ষিত হইয়াছে; এইটুকুই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীইন্দুভূষণ রায়, ৮নং আশুতোষ দে'র লেন, কলিকাতা। কৌমুদী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইংরাজ জাতির ইতিহাস, ইংরাজের রাজ্য পরিচালনার প্রণালী ও ইংরাজের ভারত-শাসন-পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ক্যাটালগের মত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইলেও এ গ্রন্থ হইতে ইংরাজের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ হইবে।

পল্লী-ছায়া। শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার গণ প্রণীত। কলিকাতা মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে পল্লীর সুখ-দুঃখ ও সুবিধা-অসুবিধার কথা অমিত্রাক্ষর ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে—রচনায় কবিত্ব না থাকিলেও লেখকের উদ্দেশ্য ভালো।

ভৈষজ্য মণিমালিকা। প্রথম খণ্ড। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা বাণীপ্রেসে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান আয়ুর্ব্বেদ লাইব্রেরী, ২৬ নং কড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা। এই গ্রন্থে বিভিন্ন রোগে আয়ুর্ব্বেদে যে সব পাঁচন, ও মুষ্টিযোগের প্রচলন আছে, তাহারই মূল শ্লোক অনুবাদসহ সংগৃহীত হইয়াছে।

দেবজন্ম। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস চন্দন নগর হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থে দেবজন্ম ধর্ম্ম, ভোগঃ যোগায়তে, দুর্গমঃ পথস্তৎ, সুখ দুঃখ ও আনন্দ, আত্মসমর্পণের কথা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র, কর্ম্ম ও যোগ-জানা ও অজানা, বিশ্ব-সৌন্দর্য্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং ভারত প্রতিভা এই বারটী সন্দর্ভ সংগৃহীত হইয়াছে। ধর্ম্মের উদার দিক্ জ্ঞানের সত্যের নিরপেক্ষতার দিক দিয়া সন্দর্ভগুলি লিখিত সন্দর্ভগুলিতে কোথাও সংকীর্ণতার ছাপ নাই। নিশ্চেষ্টতা বা উচ্ছ্বাস-সমষ্টির উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে সুনিপুণ তর্ক-যুক্তির দ্বারা লেখক ভাগবৎ সত্তার অদ্বিতীয় একত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সন্দর্ভগুলি পাঠ করিয়া লেখকের দার্শনিকতা, ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ বা পুলকিত হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ জাতির ইতিহাস। শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী এম-এ প্রণীত। শ্রীরামপুর হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, সিদ্ধেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার লেখক দেখাইয়াছেন,—সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতিই অসবর্ণ-বিবাহ-সম্ভূত, এবং এই অসবর্ণ-বিবাহ অনুলোম-ক্রমে; (২) সবর্ণ-বিবাহ-সম্ভূত সবর্ণজ ব্রাহ্মণজাতি পৃথিবীতে কোথাও নাই; (৩) অসবর্ণ-সম্ভূত-বিবাহমাত্রেই নিন্দনীয় বা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নহে বা সেরূপ বিবাহে ব্রাহ্মণের জাতি-নাশ হয় না

বেদমাতা। শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত, এমএ, এ-আর-এ-সি প্রণীত। কলিকাতা, মঙ্গলগঞ্জ-মিশন প্রেসে কে, পি, নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বেদই জগতের আদি ধর্ম্ম-নিদান বা Primeval Revelation ইহাই লেখক আলোচনাদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি পাঠে লেখকের জ্ঞানানুরাগ ও দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—৯৯ কড়িয়া ষ্ট্রীট কাত্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।